# সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা

**দ্বিতীয় প্রকাশ**
**আশ্বিন : ১৩৯৪**
**অক্টোবর : ১৯৮৭**

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৯২
আগস্ট : ১৯৮৫

প্রকাশক
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
ভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

(C) গৌতম ভাদুড়ী

**দাম : পঞ্চাশ টাকা**

# সূচীপত্র

| | |
|---|---|
| প্রসঙ্গ ঃ সতীনাথ নির্বাচিত | |
| উপন্যাস ঃ | ক-খ |
| জাগরী | ১-১৪৮ |
| ঢোঁড়াই চরিতমানস ( প্রথম চরণ ) | ১-১৩৩ |
| ঢোঁড়াই চরিতমানস ( দ্বিতীয় চরণ ) | ১৩৩-২৬৪ |
| চিত্রগুপ্তের ফাইল | ১-৫৯ |
| শ্রেষ্ঠ গল্প ঃ ( কুড়িটি গল্পের সংকলন ) | ১-১৯৯ |

---

সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনার সুলভ সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত। নতুন প্রজন্মের পাঠকেরা—যাঁরা আগের সংস্করণ সংগ্রহ করতে পারেননি—তাঁরা যাতে অল্পমূল্যে সতীনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, তার জন্যে সুযোগ সৃষ্টির পথে এ এক পদক্ষেপ। পাঠক সমাজের কাছ থেকে সমাদর লাভ করলে আমাদের প্রয়াস সার্থক মনে করব।

---

সতীনাথ ভাদুড়ী

জন্ম ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬

মৃত্যু ৩০শে মার্চ ১৯৬৫

## প্রসঙ্গ ঃ সতীনাথ নির্বাচিত

‘সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা’ এক খণ্ডে প্রকাশিত হল। তিনটি উপন্যাস এবং বাছাই করা কুড়িটি গল্প নিয়ে এই সংকলন। উপন্যাসগুলি বিন্যস্ত হল কালানুক্রমে।

সতীনাথ তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপিতে লিখেছিলেন ঃ ‘দেশ সাহিত্যিক আর কবি consious হয় ঠিক কবি বা লেখকের মৃত্যুর পর। মৃত্যু একটা rude shock দিয়ে লোককে সচেৎ করিয়ে দেয়—একটু অনুতাপ—একটু ভাব এঁর উপর বুঝি-বা অবিচার করা হয়েছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরই রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন বিভূতি বন্দো—নরসিংদাস প্রাইজ পেয়েছেন মোহিতলাল—ভারত সরকারের Academy prize পেয়েছেন জীবনানন্দ দাশ।’

অবশ্য সতীনাথের নিজের বেলায় এ-আক্ষেপ খাটে না। আত্মপ্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ‘জাগরী’ উপন্যাসের জন্যে—তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারের প্রথম প্রাপক।

‘জাগরী’র প্রথম সংস্করণ ঃ অক্টোবর, ১৯৪৫। প্রকাশ করেন সমবায় পাবলিশার্স। প্রথম প্রকাশকালে ভূমিকা লেখেন স্বয়ং লেখক।

—রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোন কোন স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতে আঘাত করিতেছে।—এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী। গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে। কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানার উদ্দেশ্য নয়।

স্থানীয় বর্ণবৈচিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক স্থলে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। ছাপা কার্যের অনবধানতায় কিছু কিছু ত্রুটি রহিয়া গেল ; আশা করি পাঠকবর্গ মার্জনা করিবেন।

পূর্ণিয়া ৭।৯।৪৫ — সতীনাথ ভাদুড়ী

অতুলচন্দ্র গুপ্ত দেশ পত্রিকায় ( ১৯৫২ সালের ৩০ চৈত্র ) সতীনাথের ‘জাগরী’ প্রসঙ্গে লেখেন ঃ ···বইখানি পড়া শেষ করে মনে যে বিস্ময় জেগেছে তাতে মনে পড়ল শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের ‘গড্ডালিকা’র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন। ‘ভোরে দরজা খুলে সামনে যদি দেখি একটা নূতন আগাছা, বিশেষ কিছু মনে হয় না। যদি দেখি ডালপালা ছড়ানো একটা বটগাছ, পূর্বদিন যা ছিল না, তবে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। লেখকের আর কোন লেখা পড়িনি। তার নামও শুনিনি। কিন্তু এ বই একেবারে ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা। প্রথম চেষ্টায় জড়তার চিহ্ন কোথাও নেই। শক্তির ছাপ সর্বত্র। নবীনত্বে ঝলমল করছে।’···যে ঘটনা দেশের মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছে, যার ফলাফল এখনো প্রত্যক্ষভাবে লোকের মনে কাজ করছে, ইতিহাস হয়নি, তা নিয়ে সার্থক কাহিনী রচনার বিপদ অনেক। এ রকম ঘটনা সম্পর্কে

পাঠকের মন আপনা থেকেই উত্তেজিত থাকে। তার সুযোগে গল্পে ও চরিত্রে কোনও সাহিত্যিক পরিণতি না থাকলেও কেবল সেই চাঞ্চল্যকর পটভূমিকার জোরে অনেক পাঠককে মোহাবিষ্ট করা যায়। স্বল্পক্ষম লেখকের কাছে এ প্রলোভনের আকর্ষণ প্রবল। ১৩৫০ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে যে সব গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত তাতে পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের যে নিরপেক্ষ সম্বন্ধের প্রয়োজন, এ রকমের বিষয় সম্পর্কে শক্তিশালী লেখকের পক্ষেও সে মানসিক দূরত্ব আয়ত্ত করা কঠিন। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের মৌলিক মন যে উদাসীন নয়, স্পর্শকাতর, তা গ্রন্থের উৎসর্গপত্র থেকেই বোঝা যায়। এ গ্রন্থ তিনি তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন—'যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ জাতীয় ইতিহাসে কোনোদিনই লিখিত হইবে না।' ভূমিকায় নিজের ঠিকানা দিয়েছেন পূর্ণিয়া—তাঁর উপন্যাসের ঘটনাস্থল। কিন্তু এই মমত্ব ও নৈকট্য লেখকের সাহিত্যিক সত্যদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করেনি।...

'জাগরী' উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন বিহার সাহিত্য ভবন। এই হিন্দী সংস্করণের 'প্রাক্-কথন' লেখেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ

( ১৪ই জুলাই ১৯৪৮ )

...শ্রীযুক্ত গুপ্তজীকে* সমালোচনা পঢ়কর ম্যঁয় ভী ইস গ্রন্থপর আকৃষ্ট হুয়া থা ঔর সংযোগসে ইসকী এক প্রতি হাথ আনেসে কঈ ঘন্টোমেঁ এক হী আসনপর বৈঠ ইসে সমাপ্ত কর লিয়া। মেরা ভী বিচার হ্যায় য়হ গ্রন্থ কেবল বঙ্গসাহিত্যকে লিয়ে গৌরবস্থল নহীঁ বনা হ্যায়, বল্কি বিশ্বসাহিত্যমেঁ অপনা স্থান ইনসে বনা লিয়া হ্যায়। কবিতা, উপন্যাস, কহানী—ইন তীনোঁ ক্ষেত্রোঁমেঁ আধুনিক বঙ্গলা সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যকে ভন্ডারমেঁ লক্ষণীয় দানসম্ভার লায়া হ্যায়; রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র অব সমগ্র ভারতকে লিয়ে হো গেয়ে হুঁ্যায়। কবিতামেঁ রবিকে অস্তমিত হোনেকে বাদ অব কেবল তারে দৃষ্টিগোচর হোতে হ্যায়, পূর্ণচন্দ্রকা প্রকাশ অভী দূরকী বস্তু মালুম পড়তা হ্যায়। পর উপন্যাস ঔর কহানীকেঁ বঙ্কিম শরতকে ঝন্ডেকো উঁচা রখনেকে লিয়ে কেদারনাথ তারাশংকর বলাইচন্দ্র ( বনফুল ) অন্নদাশংকর অচিন্ত্যকুমার বিভূতিভূষণ ব্যানার্জী, বিভূতিভূষণ মুখার্জী, মাণিকচন্দ্র, শৈলজানন্দ, মনোজ বসু ইত্যাদি কিতনে লেখক অব মৌজুদ হ্যায় ঔর ইস জ্যোতিষ্কমন্ডলমেঁ অপনী নঈ প্রকাশভঙ্গী লেকর অব উপস্থিত হুয়ে হুঁ্যায় শ্রী মান্ সতীনাথ।

ম্যঁয় সমালোচক নহীঁ হুঁ—কেবল এক অনুভূতিকামী পাঠক হুঁ। 'জাগরী' পড়তে সময় লেখককে সত্যদর্শন, সত্যসমীক্ষণ ঔর সত্যপ্রকাশনকী শক্তিসে মেরা হৃদয় আনন্দসে ভর উঠতা হ্যায়। কিস সহানুভূতিকে সাথ ইন্‌হোঁনে আপনে আপনে মুহঁসে উপন্যাসকে চার পাত্রোঁকে বাহ্যজীবন তথা আভ্যন্তর প্রেরণাকা উদ্‌ঘাটন কিয়া হ্যায়।...

---

* অতুলচন্দ্র গুপ্ত ( দেশ পত্রিকা, ১৯৫২, ৩০ চৈত্র )

প্রথম চরণ 'ঢোঁড়াই চরিত্রমানস' প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালের বৈশাখ মাসে। প্রকাশ করেন বেঙ্গল পাবলিশার্স। এই উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়, ১৩৫৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ২৬শে ভাদ্র পর্যন্ত ষোলটি সংখ্যায়।

দ্বিতীয় চরণ 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' প্রকাশিত হয়, ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রকাশ করেন বেঙ্গল পাবলিশার্স। দ্বিতীয় চরণও ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়, ১৩৫৭ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০শে ভাদ্র পর্যন্ত সতেরোটি সংখ্যায়।

'জাগরী' প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলার রসিকসমাজে আলোড়ন উঠেছিল। রাতারাতি সতীনাথ বরণীয় হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্য-সংসারে। কিন্তু স্বয়ং লেখকের মতে 'জাগরী' নয়, 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। অবশ্য শ্রেষ্ঠ কথাটা অনেক-ক্ষেত্রেই অর্থহীন। আসলে এর মাধ্যমে বোঝা যায় লেখকের নিজস্ব পছন্দটুকু। লেখকের এই পক্ষপাতের কথা মনে না রেখেও বলা যায়—'ঢোঁড়াই চরিতমানস' বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর উপন্যাস। এ এক অদ্ভুত রচনা……যার পাতায় পাতায় প্রয়োজন হয় পাদটীকার। তুলসীদাসী রামায়ণের স্বাদে আদিকান্ড বাল্যকান্ড রামিয়া কান্ডের মধ্যে দিয়ে পূর্বাগত কালপ্রবাহ থেকে ছিন্ন না হয়েও এ রচনা আমাদের এক নতুন কালের মুখোমুখি নিয়ে আসে। এ উপন্যাসের পরিধি বাংলার অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে আটকে নেই, এর জগৎ বিহারের 'অন্ত্যজ' ধাঙড়-তাৎমাদের নিয়ে। সতীনাথ যথার্থই লেখকের লেখক। আজকের উপন্যাস-ছোটগল্পে তাই নায়ক 'ঢোঁড়াই' 'অন্ত্যজ' সমস্যা সামনে রেখে ফিরে ফিরে আসছে। ঢোঁড়াই কিন্তু একটাই হয়। তাই মুজতবা আলীর মত লেখক এই রচনা পড়ে অভিভূত হয়ে বলে-ছিলেন যে এ-রকম ঠাস বুনোটের বই বিদেশি ভাষাতেও তিনি পড়েছেন অল্প। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এর তৃতীয় চরণ লেখার পরিকল্পনা সতীনাথের ছিল।

স্বাধীনতার পর দেশশাসনের সরকারী অব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা, অর্থলোলুপতা, স্বার্থপরতা, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা—যা পরবর্তী লেখায় তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্পে প্রকাশ পেয়েছে—এই সব লেখার ইচ্ছা ছিল—ঢোঁড়াই তৃতীয় চরণে।

লেখকের কথায় ঢোঁড়াই ঃ

ঢোঁড়াই চরিত্র মানসসরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম এক গন্ডুষ গল্পের মধ্যে ধরতে। পারিনি। এক সময়ে ভেবেছিলাম যতকাল বাঁচব ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকে যাব। মনে মনে এর পরের খন্ডের নাম হবে ঠিক করেছিলাম 'উত্তর ঢোঁড়াইচরিত'। এ বিষয়ে নিজের অপর্যাপ্ততা ভাল ভাবে বোঝবার পর সে সংকল্প ছেড়েছি।…

তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক বছর আগে স্বর্গে গিয়েছে। এখানকার গ্রামাঞ্চলে ও নামটা খুব চলে। তবে তার হিন্দীতে বানান হল ঢোঢ়াই ; উচ্চারণ ঢোড়হাই। বাঙালিরা নিজেদের ধরনে করে নিয়েছে ঢোঁড়াই। আমি বাংলাভাষীদের ভুল বানানটা নিয়েছিলাম, এই নামের অনুষঙ্গে নির্বিষ সাপের ঈঙ্গিতটুকু আনবার জন্য।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২১ জুন, ১৯৫১) সতীনাথ ভাদুড়ীকে

এক দীর্ঘ পত্র লেখন। পত্রের কিছু অংশ 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' প্রসঙ্গে এখানে উপস্থাপিত হল :···আপনি 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এ বিহারের নিরক্ষর চাষীর প্রাণের কথা জানিয়েছেন,—কী করে তার মনের নিভৃত কোণের এই অদ্ভুত প্রকাশ আপনি করলেন তা ভেবে বিস্মিত হই। ও বইখানিও document হিসাবে অপূর্ব তো বটেই, psychological মূল্যেও অসাধারণ। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এর হিন্দী অনুবাদ চাই—আর দেহাতী লোকের কথা থাকবে দেহাতী মৈথিল বুলিতে, তলায় দরকার মতো খড়ীবোলী হিন্দীতে থাকবে অনুবাদ, তাতে verisimilitude পুরো বজায় থাকবে, অপূর্ব বই হবে হিন্দীতে, আর রাজনৈতিক প্রগতির এক দলিল হয়ে থাকবে।···

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালে ভাদ্র মাসে। প্রকাশ করেন বেঙ্গল পাবলিশার্স।

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় শুরু হয় ১৩৫৫ সালের ভাদ্র মাসে। কিছু দিনের মধ্যেই এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। পরে 'মাসিক বসুমতী'তে 'মিনাকুমারী' নামে ধারাবাহিকভাবে বেরুতে থাকে। গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় পুরোনো 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' নামটি ফিরে আসে।

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' জনজীবনের রাজনৈতিক উপন্যাস। এই কাহিনী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নেই। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'-এর কাহিনী-কাল স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছর পূর্ব থেকে গান্ধীজীর মৃত্যুর পরদিন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরাই মুখ্য। বিহারের কাটিহার জুটমিলের ধর্মঘটের সময় শ্রমিক শোষণের করুণ অভিজ্ঞতা লেখককে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' রচনায় প্রেরণা দেয়।

বাছাই করা কুড়িটি গল্পের মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ। গল্পগুচ্ছের সঙ্গে ভূমিকাটি সংযোজন করা হল।

# জাগরী

## ফাঁসি সেল

দুই নম্বর ওয়ার্ডের অশথ গাছটির উপরের শাখাটিতে গোধূলির ম্লান আলো চিকচিক করিতেছে। অনেকগুলি পাখি একবার এ ডালে একবার ও ডালে যাইতেছে। এক দন্ডও বিশ্রাম নাই! কিছুক্ষণের মধ্যেই তো চতুর্দিকে অন্ধকার ঢাকিয়া যাইবে। তাহার পর সারা রাত নিঝুমের পালা ;—তাই বোধ হয় শেষ মুহূর্তের এই চঞ্চলতা, এত ডানা ঝটপটানি, এত আনন্দ উৎসব—যতটুকু আনন্দ সময়ের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া যায়। সত্যই কি পাখিগুলি এই জন্য সন্ধ্যার সময় এত চঞ্চল হয়? এই সেলে আসিবার আগে দু নম্বর ওয়ার্ডে যখন ছিলাম, প্রত্যহ সন্ধ্যায় লক-আপের পূর্বে আমরাও সকলে বাহিরের খোলা হাওয়া খানিকটা খাইয়া লইতাম। সত্যই কি দরকারের জন্য? না। হয়তো ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি। কোন দরকার নাই বাহিরে আসিবার। তথাপি বাহিরে একবার আসা চাই-ই। বেশির ভাগ রাজবন্দীরই তো এই মনোবৃত্তি দেখিতাম। ওয়ার্ডাররা বিরক্ত হইত, নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করিত—ভাবটা এই যে স্বরাজীরা তাহাদের ইচ্ছা করিয়া জ্বালাতন করে। কিন্তু কেহই ওয়ার্ডারদের বিরক্ত করার জন্য এ-কাজ করিত না। যতটুকু উপভোগ করিয়া লওয়া যায় তাহা কেহ ছাড়িবে কেন?

ওগুলি বোধ হয় কাক—এত দূর হইতে ঠিক চেনা যায় না···পাখিরা কিন্তু রাত্রেও ডানা ঝটপট করে···

সেই একবার বকড়ীকোলে মিটিং করিয়া ফিরিবার সময় কামাখ্যাথানের বিরাট বটগাছের নিচে আমাদের সারারাত থাকিতে হইয়াছিল। এখানকার মাটিতে শুইয়া থাকিলে নাকি কুষ্ঠ রোগ সারিয়া যায়। দূর দূরান্তর হইতে কত লোক এই উদ্দেশ্যে এখানে আসে। অনেকগুলি কুষ্ঠরোগী আশপাশের গাছগালির নিচে শুইয়া রহিয়াছে। ছিলাম আমি আর নীলু; আর সঙ্গে ছিল বোধ হয় সহদেও। সারারাত পাখির ডানা নাড়ার সে কী শব্দ! গাছতলায় তিনজন পাশাপাশি শুইয়া আছি। এই গাছতলায় আস্তনা লওয়ার জন্য নীলুকে যেন একটু বিরক্ত মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এগুলো ডানা ঝটপট করছে কেন বলতে পারিস?' নীলু বলিল, 'পিঁপড়ে টিপড়ে কামড়ায় বোধহয়!' উহার ভাবিতে সময়ও লাগে না। সব বিষয়েই উহার স্থির মত আছে। মতের সহজে নড়চড়ও হয় না। চিরকাল নীলুটা ঐ রকম।···

সন্ধ্যার লালিমা ধূসর হইয়া আসিতেছে। অশত্থ গাছের ডগাটিতে সিঁদুরে আকাশের আভা লাগিয়াছে। গাছের পাতাগুলি আর ঠিক সবুজ বলিয়া ধরা যাইতেছে না। যাক, গাছের পাতার সবুজটা গেল—ঐ একটু সবুজই তো এখান হইতে দেখা যাইত। এ ছাড়া দেখা যায় এক ফালি নীল আকাশ—লোহার গরাদের মধ্য দিয়া—লোহার তারের টোস্টারের মধ্যে এক স্লাইজ পাঁউরুটির মতো, সেলের বাসিন্দার কাছে সেই রকমই বাস্তব,—সি ক্লাস-বন্দীর ডায়েটের চাইতে তৃপ্তিকর। আর দেখা যায় জেল

'গম্মটির'র[১] উপরতলা—তাহাদের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা—"পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল, বিহার।' আকাশের ঐ ফালিটুকু আমার একান্ত আপন—ও যে আমার নিজস্ব জিনিস। যতক্ষণ দেখা যায় ঐ স্বচ্ছ নীল রঙ দেখিয়া লইয়াছি। এমন করিয়া, আমার মতো করিয়া, আকাশের ঠিক ঐ অংশটুকুকে কি আর কেউ পাইয়াছে? আমার নীল আকাশ মুহূর্তে রূপ বদলাইতেছে। সিঁদুরে রঙ বেগুনি হইয়া উঠিল,—দেখিতে দেখিতে ধূসর হইয়া উঠিতেছে—আবার এখনই জমাট অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। এমন বৈচিত্র্যময় রসের উৎসকে জেলর সাহেব একজন সর্বহারা বন্দীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিতে কেন যে দিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। বোধ হয় তাঁহারা জানেন না—জানিতে পারিলে হয়তো কাল হইতেই রাজমিস্ত্রি 'কম্যাণ্ডের'[২] কয়েদীদিগকে আমার সম্মুখের প্রাচীর আরও উঁচু করিবার কাজ দেওয়া হইবে—হুকুম হইবে 'ঔর উঁচা' ঔর ভী উঁচা, জরুরৎ পড়ে তো, আসমান্ তক্ ভিড়া দো'[৩]। ঐ গাছের সবুজটুকু, ও আকাশের টুকরোটি ছাড়া, এখান হইতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা কেবল লোহা, ইট আর সিমেন্ট, ইট আর লোহা। উহা চক্ষুকে প্রলুব্ধ করে না—দৃষ্টিকে প্রতিহত করে মাত্র, তাহাকে ঠিকরাইয়া দেয়। ঐ সবুজ আর নীল ছাড়া, আর যে কোনো রঙই দেখি, সবই রুক্ষ ও কঠোর মনে হয়—চক্ষুকে পীড়া দেয়। সেলের চুনকাম করা সাদা দেওয়াল তাহাও বড় প্রাণহীন, বড়ই পান্ডুর। তাহার উপর কতদিন চুনকাম করা হয় নাই কে জানে! দেওয়াল ভরিয়া নানা-রকম দাগ—থুতুর দাগই বেশি—কেমন যেন পাঁশুটে রঙ—বোধ হয় আমার পূর্বের কোনো বাসিন্দাকে সিপাহীজীরা 'খয়নি' খাওয়াইয়াছিল। সে কবে সব ছাড়িয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে,—কেবল রাখিয়া গিয়াছে দেওয়ালে সিপাহীজীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ছাপ।

কথা বলিবার লোক নাই। সেইজন্য সেলের বাহিরের জেল-জগতের সহিত সম্বন্ধ কান দিয়া। কথা বলিতে পারি একমাত্র ওয়ার্ডারের সঙ্গে—তাহাও ভাল লাগে না। চারিদিকে দেওয়াল। যে দিকে তাকাও দৃষ্টি দেওয়ালে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু সর্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকি, যদি বাহির হইতে কিছু শোনা যায়। ষোল পা লম্বা দশ পা চওড়া ঘর। সম্মুখের দিকে মোটা লোহার গরাদের দরজা। দক্ষিণ দেওয়ালে ছাতের কাছাকাছি একটি ছোট গবাক্ষ। তারই নিচে, মেঝের সঙ্গে, এক হাত চওড়া ও দেড় হাত লম্বা দুইখানি মোটা লোহার পাত দেয়ালে বসানো। ইহাতে কতকগুলি ছিদ্র আছে। ইহার প্রয়োজন কী তাহা জানি না—বোধ হয় বাতাস আসিবার জন্য। কিংবা বোধ হয় এই ছিদ্রপথে বাহিরের ওয়ার্ডার শুনিতে পায় কয়েদী কী বলিতেছে। সম্মুখের গরাদের দরজার নিকটে তো একজন ওয়ার্ডার থাকেই—সে তো কয়েদী কী করিতেছে না করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাবেই দেখিতে পায়। তবুও কেন এই ব্যবস্থা বলিতে পারি না। ঘরের আসবাবের মধ্যে দুইটি আলকাতরা মাখানো মাটির মালসা (স্থানীয় জেলের ভাষায় 'টোকরী') এককোণে রাখা রহিয়াছে। ঐ কোণটিতে মেঝে চুনকাম করা—বৃত্তের চতুর্থাংশের আকারে। সেলের বাহিরে গবাক্ষের দিকের দেওয়ালের পাশ দিয়া গিয়াছে একটি চাওড়া পাকা রাস্তা। রাস্তাটি বৃত্তাকারে

---

১ Central Tower, জেলের ভিতরের কর্মকেন্দ্র।

২ জেলের কয়েদীদের কাজের বিভাগ।

৩ আরও উঁচু, আরও একটু উঁচু; দরকার পড়িলে আকাশ পর্যন্ত ঠেকাইয়া দাও।

জেলের সব ওয়ার্ডগুলিকে ঘিরিয়া আছে। এই রাস্তার অপর পারে জেল হাসপাতালের প্রাচীর। এই রাস্তাটি দিয়া কত লোক যাতায়াত করে—কত কয়েদী, ওয়ার্ডার, ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, ঠিকাদার, অফিসার, মন্ত্রী—আরও কত লোক। দিনের বেলায় বেশ জনবহুল মফস্বল শহরের রাস্তার মতো মনে হয়। আর এই বিরাট পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল শহর হইতে কম কিসে? সাধারণ সময় থাকে প্রায় পঁচিশ শত কয়েদী। আর এখন ১৯৪৩ সালের মে মাসে আছে সাড়ে চার হাজার। আরও বাড়ে না কেন তাহাই আশ্চর্য। বাহিরে না খাইতে পাইয়া পথে ঘাটে মরিয়া পড়িয়া থাকিবে—তথাপি আমাদের দেশের লোক এমন কিছু করিবে না, যাহাতে তাহাদের জেলে আসিতে হয়। একবার 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলিলে, বা ময়রার দোকান হইতে একমুঠো খাবার তুলিয়া লইলে যদি ছয় মাসের মধ্যে অন্নজল ও মাথা গুঁজিবার স্থানের বন্দোবস্ত হইয়া যায়—তবে না খাইয়া মরিবার প্রয়োজন কী···সাড়ে চার হাজার···কোনো শহরে পাঁচ হাজার লোকের বসতি হইলেই, তাহা মিউনিসিপ্যালিটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। জেলও যেন একটি ছোটখাট শহর। এই শহরের নাম 'লৌহগরাদ' হইলে বেশ হয়, ধ্বনির ঝংকারে ঠিক লেনিনগ্রাদের মতো শুনিতে লাগে।···লোহার পাতের ছিদ্রপথে কান দিয়া বসিয়া থাকি। মানুষের গলার স্বর, এত মিষ্ট লাগে! জেলের পলিটিক্স, জেলের বাহিরের পলিটিক্স, সব এখানে বসিয়া থাকিলে জানিতে পারা যায়,—সুপারিন্টেন্ডেন্টের সহিত জেলার বাবুর বনিবনা হইতেছে না, হেড জমাদারকে জেলার বাপু 'আপ' বলেন না 'তুম' বলেন, জাপানীদের রণকৌশলের কথা, জেলে কয়েদীর সংখ্যাধিক্যের জন্য কত কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (জেলের ভাষায় 'ছাঁটাইয়া'), বর্মার জেলস্টাফ দল পাকাইয়া বিহারী জেল-কর্মচারীদিগকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিতেছে—এই সব কথা—আরও কত কথা কানে ভাসিয়া আসে। রাজবন্দীদের উপর সেদিনকার লাঠি চার্জ হওয়ার পর, কয়বার হাসপাতালে স্ট্রেচার আসিল গেল, তাহার হিসাব করা গিয়াছিল এইখানে বসিয়াই। ঝনঝন লোহার শব্দ শুনিলেই বুঝিতে পারি যে, যে কয়েদীটি যাইতেছে তাহার 'বার ফেটাসে''র (স্থানীয় ভাষায় 'ডান্ডাবেড়ী') সাজা হইয়াছে, বোধ হয় সে কোনো জেল-কর্মচারীর হুকুম অমান্য করিয়াছিল।···

কী মজা! সন্ধ্যা হইলে আর কি রক্ষা আছে? সেদিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কোনো জিনিসপত্রের দরকার আছে কি না অর্থাৎ যাহা চাও সম্ভব হইলে দিব। ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে ফাঁসির আসামীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে; আর অধিকাংশ লোকই ভাল খাবার-টাবার খাইতে চায়। নূতন সুপারিন্টেন্ডেন্টও কি আমার নিকট হইতে এরূপ প্রার্থনা আশা করিয়াছিলেন নাকি? আমার খুব লোভ হইয়াছিল একটি মশারির কথা বলিতে—যে কয়দিন আরামে ঘুমাইয়া লওয়া যায়; কিন্তু বলিবার সময় বলিতে পারিলাম না। কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল! বলিলাম, 'ধন্যবাদ, আমি বেশ আরামেই আছি। কোনো জিনিসে দরকার নাই—'। ওয়ার্ডারটা পরে আমাকে বলিয়াছিল—উড়িষ্যার কোন্ করদরাজ্যের দুজন 'স্বরাজী' বাবুর এই জেলে ফাঁসি হইয়াছিল—একজন ছিল আপনার এই এক নম্বর সেলে, আর একজন দুই নম্বরে—তাহারা সাহেব মারিয়াছিল—'একদম জান্‌সে—পাঁচ সালকি বাৎ'[১]—তাহারা নাকি ফাঁসির আগের দিন অনেকগুলি করিয়া মুরগীর আন্ডা ভাজিয়া খাইয়াছিল। তাহার পর রাত্রে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' আরও কী কী 'নারা'[২] লাগাইতে থাকে। শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত তাহারা 'নারা' লাগায়। সে

১ একেবারে প্রাণে—পাঁচবছর আগের কথা। ২ জয়ধ্বনি।

রাত্রে কোনো কয়েদী ঘুমাইতে পারে নাই। আপনিও যে জিনিস খাইতে ইচ্ছা করেন চাহিলেন না কেন?

ওয়ার্ডারের কথা অবিশ্বাস করি নাই। কিন্তু তাহার উপদেশ মনে ধরে নাই। এই ওয়ার্ডাররা অশিক্ষিত; সুবিধা পাইলেই চুরি করে; কয়েদীদের উপর প্রভুত্ব ফলায়; দুর্বলচিত্ত কয়েদীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। কিন্তু রাশভারী কয়েদীদের সমীহ করিয়া চলে। ইহারা সরল প্রকৃতির লোক—কথার মারপ্যাঁচ বোঝে না—সৌজন্যের ধার ধারে না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতি সকলেই শিষ্টাচারের খাতিরে আমার সম্মুখে ফাঁসি বা তৎসংক্রান্ত কোনো বিষয়ের উল্লেখ করেন না। কিন্তু ওয়ার্ডাররা প্রত্যেকেই দুই একটি কথা বলিবার পরই ফাঁসির কথার উল্লেখ করে। প্রথম কয়েক দিন কথাটি শুনিলেই কেমন বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত—একটু যেন নিজেকে দুর্বল দুর্বল মনে হইত—কেমন যেন আনমনা হইয়া যাইতাম—ফাঁসির সমস্ত দৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। হয়তো আমার ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া যাইবে—এই বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে হইত। দিন কয়েকের মধ্যে ঐ সকল কথা সহিয়া গেল। আর এখন ও কথায় কিছু মনে হয় না। সেলের ঠিক পশ্চিমেই ফাঁসির মঞ্চ। ওয়ার্ডাররাই আসিয়া খবর দেয়—আজ ফাঁসিকাষ্ঠে কালো রঙ দিয়াছে—আজ দড়ির সহিত আমার ওজনের একটি বালির বস্তা বাঁধিয়া ঠিক মজবুত কিনা তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে; আরও কত এই রকম খবর।

আশ্চর্য আমার মনের গতি! কালো রঙ-এর কথা শুনিয়াই ভাবি, ব্ল্যাক-জাপান না আলকাতরা? ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করি, আলকাতরা না কি? দড়িটি কিসের? শনের না কি? নিজের মনের উপর নিজেরই বিদ্রূপ করিতে ইচ্ছা হয়। এখনও কি দড়িটা কিসের তৈরি সেই কথাটি জানাই আমার বেশি দরকার! চিরকাল আমার মনের এই অদ্ভুত গতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রয়োজনীয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয়েই আমার আকর্ষণ বেশি। পরীক্ষার পূর্বে সকলেই প্রশ্নগুলি তৈয়ারী করিতেছে—আর আমার তাহা তৈয়ারি না থাকিলেও হয়তো তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো তুচ্ছ কথার উপর আমার মনোযোগ ন্যস্ত। জ্যামিতির প্রয়োজনীয় থিয়োরেম অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় এক্সট্রার উপর আমার অযথা মনোযোগ;—ফুটনোট ভূমিকা প্রভৃতি হয়তো পরীক্ষার আগের দিনও দেখিতেছি। বৎসরের প্রথম হইতেই মনে হইয়াছে—দরকারী জিনিসগুলি তো পরে পড়িতেই হইবে—এখন খুঁটিনাটিগুলি পড়া যাক। হয়তো শেষ পর্যন্ত আসলটিই পড়া হয় নাই।

মনে পড়িতেছে কাশী বিদ্যাপীঠে পড়িবার সময়ের একটি রাত্রের কথা। রাত জাগিয়া পড়িতেছি আমি আর শকলদেও। এক টিপ নস্য লইয়া রাতদুপুরে সে "আজ"-এর সম্পাদকীয় পড়িয়া আমাকে শুনাইতে লাগিল।···কাশী বিদ্যাপীঠে পড়িবার সময় সেবার যখন পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে—সন্দেহক্রমে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের চার্জে—তখন স্বতঃই ফাঁসির কথা মনে হইত। পরে পুলিশ প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেয়। সত্যই আমি উহাতে লিপ্ত ছিলাম না। কিন্তু ফাঁসি যাওয়ার ভয় আমার বিলক্ষণ ছিল। বোধ হয় এখন সত্যসত্যই ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভয় কমিয়া গিয়াছে। দূর হইতেই ভয়টা বেশি থাকে। যাহারা জেলে আসে নাই তাহারা জেলে আসাটাকেই কী কঠিন ব্যাপার মনে করে, কিন্তু আসিয়া পড়িলে তখন ভয় ভাঙিয়া যায়।

উঃ! মশার কামড়ে সত্যই বড় কষ্ট হয়। কেন জানি না আমাদের গান্ধী আশ্রমের মশাগুলি ইহাদের অপেক্ষা জোরে ডাকে, আকারেও বড়, কিন্তু মনে হয় কামড়াইলে জ্বালা কম করে। নীলু থাকিলে ঠিক আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, 'এরা আশ্রমের মশা কিনা—অহিংস উপায়ে রক্ত খেতে শিখেছে।' মা হাসি চাপিয়া মুখে বিরক্তির ভাব আনিয়া বলিতেন, 'আচ্ছা হয়েছে, আপনি এখন আসুন তো।' মায়ের এই সময়ের মুখখানি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। চোখের কোণে দুইটি করিয়া বলিরেখা পড়িয়াছে।...মা'র মনে সব সময় একটা ভয় ভয় ভাব দেখিতে পাই—এই বুঝি নীলু বাবাকে ঠেস দিয়া কিছু বলিল! অথচ কিছু বলিলে সে কথাটা যাহাতে বাবার কানে না ওঠে তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা দেখিয়াছি। নীলু চিরকাল স্পষ্টবক্তা! তাহার জন্য কতবার গোলমালে পড়িয়াছে। কিন্তু অপর লোকে তাহার কথায় কিছু মনে করিতে পারে বা তাহার কাজে ক্ষুব্ধ হইতে পারে এ জিনিসটাকে চিরকাল তাচ্ছিল্য করিয়া গিয়াছে। সূক্ষ্ম জিনিস তাহার মনে সাড়া দেয় না। নীলুর মন ও দৃষ্টিভঙ্গি স্থূল। কলম তুলিকা তাহার জন্য নয়—সে বোঝে কায়িক পরিশ্রমের কথা, হাতুড়ি কাস্তে শাবলের কথা, আর তার হাতে শোভা পায় ইস্পাতের ক্ষুরধার অসি—পরশুরামের কুঠারের মতো, নিষ্করুণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। একবার নীলু বলিয়াছিল যে তাহার কবিতা ভাল লাগে না। আমি বলিয়াছিলাম যে, এমন কবিতা লিখিয়া দিব যাহা তাহার নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। লিখিয়া দিয়াছিলাম ধনিক শ্রমিক প্রভৃতি দেওয়া একটি লাঠিমারা গোছের সনেট। নীলুর খুব ভাল লাগিয়াছিল। কবিতাটি মনে নাই—এক লাইনও না। নীলু সেটিকে বাঁধাইয়া আশ্রমের ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছিল—মা'র ঘরে!...

মনে হইতেছে মা দাওয়ায় বসিয়া আছেন। মাথা নাড়িতে নাড়িতে নীলুর দিকে তাকাইয়া, দন্তমূলে জিহ্বা ঠেকাইয়া একটু শব্দ করিলেন—'চিক্'। তারপর ছড়া কাটিলেন 'স্বভাব না যায় ম'লে'। নীলু আমার দিকে চোখ দিয়া ইশারা করিল—ভাবটা এই যে 'দাদা এইবার!' দুজনে যাহা ভাবিয়াছিলাম—ঠিক যাহা ভাবিয়াছিলাম—মা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন—'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনশ্চ ন মুঞ্চতে'। আমরা দুইজনেই হাসিয়া উঠিয়াছি—মা ঠিক 'মলিনশ্চ' বলিয়াছেন। এইবার আমাদের হাসি শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ভুল হইয়াছে। বলিলেন, 'ছাই কি মনে থাকে?' নীলু বলিল, 'তবে বলার দরকার কী?' মা'র কথার এই ভুলগুলি আমাদের মুখস্থ। অবশ্য নীলুই দেখাইয়া দিয়াছে।—তাহা না হইলে আমি হয়তো খেয়ালও করিতাম না। মা বলেন, 'দয়া দাক্ষিণাত্য।' আমি একদিন মাকে বলিয়াও দিয়াছিলাম—'দয়াদাক্ষিণ্য' বলিতে। মা'র দেখিয়াছি কথা বলিবার সময় এটি মনেই থাকে না। বলিয়া দিতে গেলে অপ্রস্তুত হইয়া যান বলিয়া আমি আর ভুল দেখাইয়াও দিই না। নীলু কিন্তু এ দিকটা ঠিক বোঝে না। অপরের যে কোনো দুর্বলতা, চালচলনে বিদ্রূপের খোরাক ওর সহজেই নজরে পড়ে; কিন্তু উহার কথার ফলে অপরের মনে কিরূপ আঘাত লাগিতে পারে, এ দিকটা সে ভাবিয়াও দেখে না।...বাবার নিকট হইতে আমরা একটু দূরে দূরেই চিরকাল থাকি। প্রয়োজনের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাও বড় একটা হয় না। সেইজন্য বাবার এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলের খাইবার পর, আমি আর নীলু মা'র সঙ্গে খাইতে বসি। একটু দুধ না হইলে মা'র খাওয়া হয় না। এটিই বোধ হয় মা'র একমাত্র বিলাসিতা। আশ্রমে অনেক লোকজন তো থাকে। আর সময়ে অসময়ে নূতন অতিথি আসা, ইহাও প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই জন্য দুধ

অনেক সময়েই কমিয়া যাইত। অল্প দুধ আছে, মা হয়তো আমাকে আর নীলুকে দিলেন। আমি আর একটা বাটিতে, আমাদের বাটি হইতে অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া মা'র জন্য রাখিলাম। নীলু দেখিয়াছি, এইরূপ সময় নিশ্চয়ই বলিবে, 'মা'র দুধ না হলে খাওয়াই হয় না।' কথাটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু মা'র মুখটি একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল,—যেন কোনো গোপন দুর্বলতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নীলুর এত জিনিস চোখে পড়ে, কিন্তু এটি পড়ে না!···

মা'র অসুখ করিলে, অসুখ একটু বেশি হইয়াছে বলিলেই যেন একটু খুশি হন। সেইজন্য জানিয়া শুনিয়াও হয়তো মা'র কপালে হাত দিয়া বলিলাম—'গা'টা পুড়ে যাচ্ছে—বেশ জ্বর হয়েছে'। নীলু সেখানে উপস্থিত থাকিলে—হাঃ হাঃ করিয়া ঘর কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিবে···

···সুপারিন্টেন্ডেন্টকে আমার কোনো জিনিসের দরকার নাই বলিবার পর সেদিন মনে বেশ তৃপ্তি হইয়াছিল—খালি তৃপ্তি না, গর্বই। 'সাহাব' তো একা আসেন না, সঙ্গে জেলর, ডাক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলর, জমাদার, কয়েকজন দেহরক্ষী, ওয়ার্ডার ও মেট সকলেই ছিল। হ্যাঁ, আর যে শিখ কয়েদীটি সাহেবের খাকী রঙ-এর বিরাট রাজছত্রটি ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায় তাহার কথা তো উল্লেখ করিতে ভুলিয়াই গিয়াছি, সত্যই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেল-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতি···সেদিন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার পর কারও মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। কেমন যেন সব গুলাইয়া গেল—অথচ ইচ্ছা হইতেছিল আমার কথার ফল উহাদের উপর কেমন হয় তাহা জানার। নিজেকে বেশ নাটকের নায়কের মতো মনে হইতেছিল। ···সেই সন্তোষদার মুখে ছোট-বেলায় স্বদেশী যুগের গল্প শুনিয়া কতবার চোখে জল আসিয়া গিয়াছে—অমর মৃতের সেই স্মৃতি আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। 'এখন আর বিরক্ত করিও না। শান্তিতে মরিতে দাও।' বন্দুকের গুলিতে আহত মরণাপন্ন শহীদদের সেই কথার সহিত আমার কথাটির তুলনা করিয়াছিলাম। ঐ গল্প শুনিয়া আমার চোখে জল আসিত—আর আমার কথাটি কি শ্রোতাদের মনে কোনোই সাড়া দেয় নাই! হয়তো দেয় নাই। ইহারা নিত্যই এক জিনিস দেখিতেছে। ইহারা বয়স্ক, সংসারে অভিজ্ঞ—বালকের ন্যায় ভাবপ্রবণ নহে। লোকে প্রশংসা করুক, আমার গল্প করুক, তাহাই যেন আমি চাই—ইহা আমার মনের দুর্বলতা। এক এক সময় নিজের উপর সন্দেহ হয়, হয়তো বা দেশের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা আমার নামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বেশি সজাগ। সত্যই কি তাই? একদিনের জন্যও জীবনের স্থূল উপভোগের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিই নাই। দেশের জন্য যাহা ভাল মনে করিয়াছি তাহা করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই। নিজের ব্যক্তিগত সুখ বা ভবিষ্যতের কথা ভাবি নাই। তাহার পরিবর্তে যদি চাই যে দেশের লোক আমার সম্বন্ধে দুই-একটি প্রশংসাসূচক কথা বলুক, তাহা হইলে কি আমার আকাঙ্ক্ষা অন্যায্য? জেল-ডাক্তার নিশ্চয়ই নিজের বাড়িতে আমার কথা বলিয়াছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলর তখনই হয়তো আপার ডিভিশন রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে গিয়া এই কথা গল্প করিয়া আসিয়াছে। বাবাও তো সেই ওয়ার্ডে থাকেন। তাঁহার কানেও নিশ্চয়ই কথাটি উঠিবে। বাবা নির্বিকার লোক, বাহির হইতে দেখিয়া মনের ভাব বুঝিবার উপায় নেই। একান্তে বসিয়া চরকা কাটিতেছেন। চোখের কোণের দু-ফোঁটা জলে সুতো ঝাপসা হইয়া গেল। না, বাবার নিকট হইতে অতটা ব্যাকুলতা আশা করি না। হয়তো একটু উন্মনা হইবেন, চরকায় তন্ময়তা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য কমিতে পারে—সুতা দুই একবার বেশি ছিঁড়িতে পারে মাত্র। নিজের মনে সন্দেহ হইতেছে, আশঙ্কা হইতেছে যে,

যেরূপ আশা করিয়াছিলাম জেলস্টাফের মনে সেরূপ ভাবের উদ্রেক করিতে পারি নাই। জোর গলায় বলিতেপারি নাই—চোখ নামাইয়া লইয়াছি। হয়তো উহারা ভাবিল আমার মন সরল নয়। আমার হাবভাব যেন সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিমান দেখানোর মতো লাগিল। উহারা দিনরাত চোর, ডাকাত, খুনে লইয়া কাজ করে। ইহার ফলে উহাদের মনের ভাবপ্রবণতা ও অনেকগুলি কোমলবৃত্তি শুকাইয়া আসিতেছে। রাজবন্দী-দিগের ইহারা অন্যান্য চোর ডাকাত অপেক্ষা পৃথক বলিয়া ভাবে না। ব্যবহারে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা কেবল গোলমালের ভয়ে, না হয় স্বার্থের খাতিরে। যে ডাক্তার ডিভিশন থ্রির রাজবন্দীদিগকে রোগ হইলে গালাগালি করে, 'আমাশা হইয়াছে, ঔষধ দাও' বলিলেইবলে 'But don't expect Dahi' অর্থাৎদই খাইবার প্রত্যাশায় যদি চেষ্টা করিয়া অসুখটি করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিরাশ হইবেন, সেই ডাক্তারই উচ্চশ্রেণীর রাজবন্দীদিগেরকাছে কী মাটির মানুষ। এই তো দুই বৎসর পূর্বে 'ব্যক্তিগতসত্যাগ্রহের' সময় এই জেলস্টাফকে কংগ্রেসের নেতাদের আশেপাশে ঘুরিতে কাজে অকাজে খোশামোদ করিতে দেখিয়াছি। তখনও যে তাহারা ভাবিত যে কংগ্রেস আবার বিহারে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারে। আর আজ…

এই জেল-কর্মচারীদিগকে কি সেদিন আমার কথা আর ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত করিতে পারিয়াছি? ইহা অপেক্ষা যদি নাটকীয় ভঙ্গিতে জোর গলায় বলিতে পারিতাম —'জুতো মেরে গরু দান। তোমাদের কাছ থেকে আমি করুণা চাই না।' কিংবা ঐ ধরনের অন্য কিছু তাহা হইলে ইহারা বেশি প্রভাবিত হইত। একটু থিয়েটারী ভাব দেখাইত বটে কিন্তু যাহা চাই তাহা হইত। মনে পড়িতেছে—দুই নম্বর ওয়ার্ডে অক্টোবর মাসে লাঠিচার্জের পর মাথাফাটা অবস্থায় শুকদেওএর বক্তৃতা—শুইয়া শুইয়া—একটানা সুরে—থিয়েটারের মরার সিনের মতো—'তুম লোগোকে শরম নহী আতা'[1] বলিয়া আরম্ভ। এখনও স্পষ্ট কানে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি স্কুলে একবার প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের সময় মেঘনাদবধ আবৃত্তি করিয়াছিলাম। কালীবাবু অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার শিখাইতেছিলেন—'এই পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে বলবে—তারপর একেবারে শুয়ে পড়ে টেনে টেনে আস্তে আস্তে চোখ বুজে বলবে, "কেবা এ কলঙ্ক তোর ভুঞ্জিবে জগতে কলঙ্কি।"…' শুকদেওএর বক্তৃতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত একেবারে খাপ খায় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, ইহার বিসদৃশতা অল্প লোকের চোখেই ধরা পড়িয়াছিল।…

'বাবু বিজে ভৈল বা?' (বাবু খাওয়া হইয়াছে?)

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিলাম ওয়ার্ডার সাহেব সম্মুখে। কথার স্বরে একটু যেন সহানুভূতির আমেজ। অনেকক্ষণ হইল বাহিরে আলো দিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। আলোটি সেলের ভিতর দিলে ইহাদের কী ক্ষতি হইত বুঝিতে পারি না। কেরোসিন তেল লাগাইয়া আত্মহত্যা করা খুব আরামের জিনিস নয়। তথাপি ইহারা সাহস পায় না। হবেও না। উহাদের প্রত্যেক নিয়মই অনেক অভিজ্ঞতা প্রসূত। কেবল এইরূপ একটি আপাততুচ্ছ নিয়মের জন্যই গত বৎসরের জেল-মিউটিনি সফল হইতে পারে নাই। গেটওয়ার্ডারকে মারিয়া কয়েদীর দল চাবির গোছা হাতে পাইয়াছিল। কিন্তু বিরাট রিংএ ছিল প্রায় দুই শতাধিক চাবি এবং তাহার ভিতর অধিকাংশই ছিল অপ্রয়োজনীয়। জেলের নিয়ম, এইরূপ বহুসংখ্যক বাজে চাবি রিংএ

---

১ 'তোমাদের লজ্জা হয় না'।

রাখিতে হইবে। জেলবিদ্রোহীগণ এই চাবির গোছা হাতে পাইয়াও কোন্ চাবি তালায় লাগিবে তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিতে করিতে পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে 'পাগলী' ( alarm ) বাজিল—বন্দুক, সিপাহী, ফৌজ পেঁছিয়া গেল···তাহার পর···

সিপাহীজীর প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন কটা বেজেছে?'

সিপাহীজী বলিল, 'দফা বদলির টৈন হইয়াছে'—অর্থাৎ ইহাদের স্থানে রাত্রে ডিউটি দিবার ওয়ার্ডারের দল আসিয়া গিয়াছে। গুমটিতে ( সেন্ট্রাল টাওয়ার ) এখন কোন্ ওয়ার্ডে কত কয়েদী বন্ধ হইল, আজ নূতন কয়েদীর 'আমদানি' কত, কত 'খরচা' অর্থাৎ ছাড়া পাইয়াছে, তাহার পর একুনে মিলিল কিনা তাহার হিসাব হইতেছে। সিপাহীজী তখনও দেখি তাহার প্রশ্নটি ভুলে নাই। আবার জিজ্ঞাসা করে, 'ভোজন নহী কিয়ে?'

দেখিলাম সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, আমি ভাত খাই নাই। বলিলাম—'না, খিদে পায় নি।'

সে বলিল, 'দহি হ্যায়; থোড়া ভোজন কর লিয়া যায়।' সপ্তাহে একদিন করিয়া নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দীরা দই খাইতে পায়—পিতলের থালার উপর পাতলা মহুয়া দই—উহাতে আবার একটা পোড়াপোড়া গন্ধ;—কংগ্রেস মিনিষ্টির প্রবর্তিত নিয়ম—তৃতীয় শ্রেণীর রাজবন্দীদের নিত্য উপহাসের জিনিস। লক্ষ কংগ্রেসের বড়কর্তাদের প্রতি—কেন তাঁহারা সকল রাজবন্দীদিগের একটি মাত্র শ্রেণী করেন নাই? উচ্চশ্রেণীর নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দী রাখিবার অর্থ কী? উচ্চশ্রেণীর দশ আনা 'খোরাকি' ও নিম্নশ্রেণীর সাড়ে তিন আনা—ইহার মাঝামাঝি একটি শ্রেণী কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য করিলে কী হইত? নিম্নশ্রেণীর রাজবন্দীদিগকে নিজের পয়সা খরচা করিবার অধিকার দিলে কী হইত? বাহির হইতে তাহাদের জন্য খাবার বা অন্য কোনো জিনিস আসিলে, তাহা লইতে দিলে, বড়কর্তাদিগের কোন্ পাকা ধানে মই পড়িত? মাসে দুইখানি করিয়া চিঠি লিখিতে দিলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? নিজের পয়সায় বিড়ি সিগারেট খাইবার অধিকার দিলে তাঁহাদের কী ক্ষতি হইত? আরও কত কী অভিযোগ।

উঁচু গুমটির উপর হইতে সুর করিয়া জলদমন্দ্র স্বরে রাগিনী উঠিল—'বোলোরে এক নম্বার? বোলোরে দু নম্বার। বোলোরে তি-ই-ইন্-নম্বার! বোলোরে—চা-আ-র-নম্বার! বোলোরে-এ-এ-এ পাঁচ নম্বার! বোলোরে-এ ছে-এ নম্বা-আ-আ-র! বোলোরে-এ-এ নয়া গোল? বোলোরে আওরৎ কিতা-আ-আ!

সব ওয়ার্ডের জবাব আসিল না—বোধ হয় আমার সেল পর্যন্ত সে শব্দ পেঁছাইল না। গুমটির উপরের সিপাহীটিও যেন সব ওয়ার্ড হইতে উত্তরের প্রত্যাশা রাখে না। তাহার কাজ যন্ত্রের মতো, কলের গানের মতো একবার করিয়া চিৎকার করিয়া যাওয়া। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে উত্তর আসা উচিত কতগুলি করিয়া কয়েদী প্রতি ওয়ার্ডে বন্ধ হইয়াছে। ইহার 'খোটাল' আগেই গুমটির নিচের তলায় জেলকর্মচারীরা করিয়া রাখিয়াছে—চিৎকারটি কেবল একটি নিয়মরক্ষা মাত্র। সব ওয়ার্ডার 'মেট' বা 'পাহারা'ই[১] এ কথা জানে। সেইজন্য ইহার উত্তর দিয়া বৃথা পরিশ্রম করিতে রাজী নয়। ঢং ঢং করিয়া ঘন্টা পড়িল। 'গিনতি মিলান্'[২] হইয়া গেল। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। কালকের 'গিনতি মিলান্' আর শুনিতে হইবে না······গুমটির উপরে আলোটা নিশ্চয়ই

---

১ Convict Overseer-দের দুইটি শ্রেণী। ২ মোট ( total ) মিলিয়া যাওয়া।

পাঁচশ ক্যান্ডল পাওয়ারের। ব্ল্যাক আউটের জন্য উহার কালো ঢাকনা! কিন্তু ঠিক তাহার নিচেই বাঁশের চাটাই-এর বোনা প্রকান্ড একটি ছাতা—ওয়ার্ডারকে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য। ব্ল্যাক আউটের জন্য গম্বুজটিতে কালচে রঙ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ছাতাটির উপরে আলো পড়িয়া এত আলো চারিদিকে প্রতিফলিত হইতেছে যে, একটানা বেশিক্ষণ উহার দিকে তাকানো যায় না। ছাতাটি ব্ল্যাক আউটের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছে।...গম্বুজটি ও তাহার উপরের ছাতিটা দেখিলেই কাশীর অহল্যাবাই ঘাটের কথা মনে পড়ে। ঘাটের সেই গম্বুজটির উপর আমাদের নিত্যকার সান্ধ্য আড্ডা ছিল।...সিনহেশ্বর স্কুল একদিন উহার উপর হইতে পানের পিচ ফেলিয়াছিল—তাহা লইয়া কী হুলস্থূল কান্ড! অদ্ভুদ সাহস সিনহেশ্বরের! সে দেখিয়াছি মরিতে একটুও ভয় পায় না। সে এমন তাচ্ছিল্যের সহিত ফাঁসি যাওয়ার কথা বলিত যে, শুনিয়া আমার হিংসা হইত। বুঝিতে পারিয়াছিলাম সে আমাকে তাহাদের দলের সদস্য করিতে চায়; কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। অন্তরের ভিতর খোঁজ করিয়া যখন দেখি, তখন এক এক সময় মনে হয় যে, আমার সাহসের অভাবের জন্যই বোধ হয় তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে প্যারি নাই—তাহাদের কার্যক্রম পছন্দ হয় নাই বলিয়া নয়। কিন্তু আজ সে ভয় গেল কোথায়? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়াছি লোকের মৃত্যুভয় বাড়ে। আমার বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল নাকি? সিনহেশ্বরের সহিত এখন দেখা হইলে কত কথা হইত! অনেকদিন পরে তাহার সহিত রামগড় কংগ্রেসের সময় হঠাৎ দেখা। সে কংগ্রেস মিনিষ্ট্রির সময় বেরিলি জেল হইতে ছাড়া পায়,—মেল ডাকাতিতে তাহার সাজা হইয়াছিল—লক্ষ্ণৌর কাছের সে জায়গাটির নাম মনে পড়িতেছে না, পিপরাহা না কী যেন নাম...

নূতন সিপাহী কখন আসিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। চমক ভাঙিল সে যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, একটা বিড়ি খাবেন?'

আজ ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত অন্তরঙ্গ হইতে চায়—যদি আমার কোনো উপকার করিতে পারে—যদি আমাকে একটু খুশি করিতে পারে। এই সহানুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত—কৃত্রিমতা ইহাতে নাই। তাহার সহানুভূতির দান প্রত্যাখ্যান করাতে বোধ হয় সে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইল। একটু কিন্তু কিন্তু করিয়া সে তাহার ডিউটি সারিয়া লইল। একবার তালাটা খটাং করিয়া নাড়িয়া শব্দ করিল। পরে হড়হড় করিয়া গরাদের দরজাটা নাড়াইয়া দিল। এ কাজ তাহার আগেই করা উচিত—আগের প্রহরী থাকিতেই। উদ্দেশ্য যে দরজা ঠিক বন্ধ কিনা আর হুড়কো ঠিক পড়িয়াছে কি না তাহা দেখা। আগের ওয়ার্ডারদের সঙ্গে কয়েদী বন্দোবস্ত করিয়া তালা ঝুলাইয়া রাখিতে পারে,—অথচ কয়েদী পলাইলে আগেকার ওয়ার্ডারের কোনো দায়িত্ব নাই, কেননা, সে তাহার পরের ওয়ার্ডারকে চার্জ বুঝাইয়া দিয়াছে। এই জন্যই এত সতর্কতা, এই ব্যবস্থা। কিন্তু আগের ওয়ার্ডার চলিয়া গিয়াছে। ঘরমুখো গরু এ সময়টুকুর তর সয় না। এক নাগাড়ে দিনে আট ঘন্টা ডিউটি দিয়াছে—দোষই বা কী?

সিপাহীজী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে করিয়া কথা বলিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ওদিককার 'ডিগরী' গুলোর ( Cell ) কাজ শেষ করিয়া আসিতেছে নাকি?

বলিল, 'হ্যাঁ। দশ নম্বর, নয় নম্বর, সাত নম্বর, তিন নম্বর আর এক নম্বর এই পাঁচটি ডিগরীতে 'আসামী' আছে। আজ দশনম্বর থেকেই আরম্ভ করিয়াছি। ওয়ার্ডের সিপাই তো কোথায় বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছে। আমার আর তিন নম্বর সেলের সিপাহীর উপরই 'গিন্তীর' ভার দিয়াছে।...'

'কনডেম্‌ড্‌ সেল্‌স' এর পাঁচজন কয়েদী। জেলের ভাষায় এই ওয়ার্ডটির নাম 'ফাঁসি সেল'। 'Condemned cell' শুনিলেই আমার মনে হয় যেন সেলগুলি এন্‌জিনিয়ারিং বিভাগ কর্তৃক condemned, ইহা যে condemned prisoner-দের জন্য—তাহা হইতেই যে ওয়ার্ডের এই নাম, কথাটা মনে আসে না। নয় ও দশ নম্বর সেলে থাকে দুইজন বোমার কেসের আসামী—আণ্ডারট্রায়াল। উহাদের এ সেলে কেন রাখিয়াছে জানি না। 'ফাঁসি সেলের' কুড়িটি সেল ব্যতীত, এ জেলে আরও চল্লিশ পঞ্চাশটি সেল আছে। তথাপি ইহাদের কেন এখানে রাখিয়াছে বলা শক্ত। হয়তো পুলিশের আদেশ সেইরূপ। বোধ হয় পুলিশ ইহাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি পাইবার আশা রাখে। সেই জন্য অপর রাজবন্দীদের সহিত মেলামেশা করিতে দিতে রাজী নয়। সাত নম্বরে থাকে একজন পাগল। সে আপন মনে বাজে বকে। ওয়ার্ডার দেখিলেই অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয়। নয় ও দশ নম্বর সেলের দরজা সারাদিন খোলা থাকে। কোনো দিন তাহারা আমার সেলের স্পেশাল ওয়ার্ডারকে বিড়ি, চিনি প্রভৃতি দিয়া তাহার পরিবর্তে আমার সহিত দুই-একটি কথা বলিয়া লয়। সন্ধ্যা-বেলা তাহাদের দরজা বন্ধ হইবার পর, তাহারা নিজের সেল হইতে পাগলটিকে চটাইতে থাকে। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেই সে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে। ওয়ার্ডাররা বলে যে লোকটি মিথ্যা পাগলামির ভান করে। ঐরূপ তাহারা কত দেখিয়াছে। 'সরকার ওত্তা বুড়বক্‌ নহী হ্যায়,'[১] রেহাই পাওয়া অতটা সহজ নয়।... তিন নম্বরে থাকে একটা খুনী আসামী। ভাইকে খুন করিয়াছে। সে এক অতি কুৎসিত কাহিনী। তাহার পারিবারিক জীবনের কদর্য পঙ্কিলতার বিবরণ, তাহার স্ত্রী জজসাহেবের এজলাসে সর্বসমক্ষে বলিয়াছে। হাইকোর্টে আপীল হইয়াছিল, তাহাও খারীজ হইয়া গিয়াছে। লোকটি দিনরাত 'সীতারাম সীতারাম' বলে আর ভজন গায়।...

ওয়ার্ডার যে আমাকে 'আসামী' বলিল, কথাটি আমার পছন্দ হইল না। মনে হইতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা ভদ্র ভাষা তাহার ব্যবহার করা উচিত ছিল। ছোটবেলার শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার আমার মনে যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা একেবারে মুছিয়া ফেলা শক্ত। সত্যই তো, ওয়ার্ডার তো ঠিকই বলিয়াছে। আমাকে আসামী বলিবে না তো কী বলিবে? আজ তো আমিই জেলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আসামী। যাহার ফাঁসি শীঘ্রই হইবে সে-ই এক নম্বর সেলে থাকে। এক নম্বর সেলের পরেই একটি দরজা। কেবল ফাঁসি দিবার সময় এই দরজাটি খুলিয়া আসামীকে ফাঁসির মঞ্চে লইয়া যাওয়া হয়। অন্য সময় এই দরজাটি বন্ধ থাকে।...সেই চরম মুহূর্তের পূর্বে একবার দরজাটি দেখিতে ইচ্ছা করে। উহার তালাটি কি মরচে পড়া?...আমার সহিত মৃত্যুর ব্যবধান কেবলমাত্র এই দরজাটি। তথাপি 'আসামী' কথাটিতে আমার মনটা খুঁতখুঁত করিতেছে। বোমার বাবুদেরও তো সিপাহীজী 'আসামী' বলিল, তাহা কিন্তু আমার কানে কটু বোধ হইল না। বোধ হয় 'বোমার মামলার আসামী' কথাগুলিতে আমার কান অভ্যস্ত। ঐ কথাগুলির সহিত দেশসেবকদিগের স্বদেশপ্রেমের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে—অন্তত আমার মনে। কিন্তু ফাঁসির আসামী কথাটি শুনিলেই আমার সাধারণ খুনে ডাকাতের কথা মনে পড়ে। ইহাদের চিত্রই ঐ কথাগুলির সহিত আমাকে চোর ডাকাতের সহিত এক করিয়া দিল। এই জন্যই বোধ হয় কথাটিতে আমার অপছন্দ ও আপত্তি। অন্তরের ভিতর বেদনার অনুভূতি জাগে—একজন ওয়ার্ডারের চক্ষেও

১। 'সরকার এত বোকা নয়।'

আমি পূজ্য দেশসেবক নাই। আমি তাহার নিকট হইতে আশা রাখি প্রশংসার—কথায় না হউক অন্তত হাবভাবে, আমার ত্যাগের জন্য। ইহাদের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দিতেছি, কোথায় ইহারা কৃতজ্ঞ থাকিবে—তা নয়, কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে ইহারা দিতে জানে সহানুভূতি,—শহীদের প্রতি সহানুভূতি নয়, যে হতভাগ্য মাত্র আর আর কয়েক ঘণ্টা এই লীলাময়ী ধরণীকে উপভোগ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি করুণা...

মনে পড়িল মাসিমাকে। নৈহাটী স্টেশনে মাসিমাকে পশ্চিমের গাড়িতে তুলিয়া দিতে গিয়াছি। মাসিমার মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, গেরুয়া-বস্ত্র পরা, গলায় তুলসীর মালা। নিজের সংসারের সহিত বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নাই। মঠে বা আশ্রমে থাকেন। নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবন যাইতেছেন। সঙ্গে বিস্তর লটবহর,—সোনামুগের বস্তা, ডাব, ছানাবড়ার ক্যানেস্তারা, মাজা তিল। গুরুভাইবোনদের জন্য যাইতেছে। এই জিনিষগুলি গাড়িতে তুলিয়া দিবার জন্যই আমার আসা। মাসিমা গাড়িতে উঠিলেন। সব জিনিস কুলির মাথা হইতে নামাইয়া গাড়িতে রাখিলাম। মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সব জিনিস উঠেছে তো?' আমি এক-দুই করিয়া গনিয়া বলিলাম 'হ্যাঁ, মোট বাইশটি মাল উঠেছে।' নিমেষে মাসিমার চোখে জল আসিল। আমিও অপ্রস্তুতের একশেষ। বুঝিতে পারিলাম নিজের অজ্ঞানতায় কোনো অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি! পরে মাসিমাই তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন - রেশমী কাপড় দিয়া ঢাকা তাঁহার স্বর্গীয় গুরুদেবের তৈলচিত্রটিকে আমি 'মালে'র মধ্যে গনিয়াছি। সেই সময় মাসিমার এই মনস্তত্ত্ব আমার নিকট অদ্ভুত মনে হইয়াছিল;—আর আজ 'আসামী' কথাটি শুনিবার পর নিজের চিন্তাধারা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতেছি।...ফাঁসির আসামীকে আসামী না বলিলেই আশ্চর্য হইবার কথা।

ফাঁসির মঞ্চ কথাটিতেও যেন কত শহীদের স্মৃতির সুবাস ঘিরিয়া আছে; কিন্তু উহাকেই 'ফাঁসিকাঠ' বলো, মনে পড়িবে খুনী আসামীর কথা। আর সব চাইতে আশ্চর্য, মানসনেত্রে দেখি একটি মৃতদেহ জিমনাষ্টিকের হরাইজ্যাণ্টাল বারে ঝুলিতেছে—অসার পা দুখানি শূন্যে ঘুরপাক খাইয়া দুলিতেছে—ধীরে একঘেয়ে গতিতে,—উত্তর, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব, পূর্বদক্ষিণ, দক্ষিণ, দক্ষিণপশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্বদক্ষিণ, পূর্ব, উত্তরপূর্ব, উত্তর,—কোনো ইংরাজি নভেলে পড়া একটি দৃশ্য।...

দশ নম্বর সেল হইতে ওয়ার্ডার ডিউটি আরম্ভ করিয়াছে বলিল। তাহার মানে আজ এগারো হইতে বিশ নম্বর সেল খালি! যে সকল কয়েদী জেলের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে জেল-কর্তৃপক্ষ সাধারণত সেলের সাজা দেন। তাহারা ঐ সেল-গুলিতে থাকে। সেলে একাকী কিছুদিন বাস করিতে হইবে ইহাই শাস্তি। কয়েকদিন নির্জনবাস যে কী সাজা তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না। ওয়ার্ডের হট্টগোলের ভিতর হইতে দিনকতক মধ্যে মধ্যে নির্জনবাস খুব খারাপ লাগিবার কথা নয়। ঐ সেলগুলির ব্যবহারও হয় খুব। আজ সব ঘর খালি কী করিয়া হইয়া গেল। এরূপ তো কখনও হয় না। বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের স্থানান্তরিত করা হইয়াছে,—হয়তো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদের শাস্তি মাপ করিয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বোধ হয় চাহেন, আজ রাত্রে যত কম লোক 'কনডেম্‌ড্‌ সেল্‌স'-এ থাকে ততই ভাল। হয়তো আজ এখানে থাকিলে তাহাদের মনের উপর কিছু প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। সেই জন্য যাহাদের এই স্থান হইতে সরাইতে পারা যায়, তাহাদের সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তেরো নম্বরের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কয়েদীটিকেও কি জেনারেল ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে? এক এক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক এক রকম খেয়াল। মেজর

ফিল্‌পট্‌স্‌কে দেখিয়াছি, নারীচিত্র সংবলিত পুস্তক তিনি কখনও জেলে 'পাস' করিতেন না। তিনি শুনিয়াছিলাম মানসিক ব্যাধিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাহার মত ছিল যে নারীদেহের প্রতিকৃতি, যাহারা কিছুকাল যাবৎ জেলে আছে, তাহাদের মনের উপর নানারূপ প্রতিক্রিয়া আনিতে পারে। সেবার হাজারীবাগ জেলে এই লইয়া রামখেলাওন-বাবুর সহিত 'সাহেবের' কী বচসা! বেচারির অত সখের 'রয়াল একাডেমি'র সেই বৎসরের ছবিগুলির বই হইতে দশ পনরখানি পাতা কাঁচি দিয়া সযত্নে বাদ দেওয়া অবস্থায় তিনি পাইয়াছিলেন। ছবিগুলি পাইলে তাঁহার মনের উপর কী প্রতিক্রিয়া হইত, তাহা হয়তো আমরা দেখিতে পাইতাম না;—কিন্তু না পাইয়া সাময়িক প্রতিক্রিয়া কী হইয়াছিল, তাহা আমরাও দেখিয়াছিলাম, ফিল্‌পট্‌স্‌ সাহেবও দেখিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার চৌদ্দদিন নির্জন সেলের শাস্তি হয়।

বড়ই গরম। সেলে বায়ু চলাচলের রাস্তা নাই। বৈশাখ মাস শেষ হইয়া গেল, এখন বোধ হয় সেলের বাহিরেও এইরূপই গরম। দরজার উপর মেঝেতে,গরাদ ধরিয়া বসিয়া থাকি,—যদি বাহিরের ঠাণ্ডা কিছু পাওয়া যায়। ঘরের বন্ধ গুমোট হাওয়ায় মাথা কেমন যেন ভার ভার মনে হয়। লক্ষ্য করিয়াছি যে এই সময়, কিছুক্ষণ গরাদের ফাঁক দিয়া মুখ নাক যতদূর বাহির করা যায় ততদূর বাহির করিয়া, বাহিরের মুক্ত বাতাস সেবন করিলে, ধীরে ধীরে মাথার ভার ভার ভাবটি কাটিয়া যাইতে থাকে।··· আগে মাথার কষ্ট আরও বেশি হইত। কিছুদিন হইতে স্নান করিবার সময় ওয়ার্ডার একটু করিয়া সরিষার তেল দেয়। কোথা হইতে একটি পুরাতন মাখনের টিনে একটু তেল জোগাড় করিয়াছে। ফাঁসির আসামীর প্রতি এই অনুকম্পা,—প্রথমে ভাবিয়াছিলাম লইব না। কিন্তু সে যখন কোনো কথা না বলিয়া হাতে ঢালিয়া দিল, তখন আপত্তি করি নাই,—বোধ হয় মাথার অস্বস্তির কথা মনে করিয়া—আর কোনো কথা না বলিয়া সিপাহীজী যে তেলটুকু হাতে ঢালিয়া দিল, তাহা দেখিয়া। বাকসংযম ইহারা জানে না। দিনে আট ঘণ্টা করিয়া ডিউটি, আর রাত্রে দুই ঘণ্টা করিয়া। বড় একঘেয়ে ইহাদের জীবন। এই ডিউটির সময়ের মধ্যে কথা বলিলে, একঘেয়েমির একটু লাঘব হয়। সে একটাও কথা বলিল না, তাহার উপর মাখিবার জন্য সরিষার তেল দিল,—এতখানি সরিষার তেলের মায়া ছাড়িয়া দিল। আশ্চর্য! ইহারা যে জিনিস পায় জেল হইতে চুরি করে।. কাপড়-কাচা সাবান, চালভাজা, চীনাবাদাম, আলু, নারিকেল দড়ি, লোহার পেরেক, হারিকেন লণ্ঠনের ছিপি প্রভৃতি কোনো জিনিস ইহাদের হাত এড়াইতে পায় না। উচ্চশ্রেণীর রাজবন্দীদের চায়ের পেয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া, গামছা পর্যন্ত, সব জিনিসই চুরি যায় রাত্রে, যখন ওয়ার্ডাররা ব্যতীত জেলের সকল লোকই ওয়ার্ডে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে। চোরেরা ঘরে তালাবন্ধ, তথাপি চুরি বন্ধ হয় না। এহেন ওয়ার্ডারের এই উদারতা আমাকে বিহ্বল করিয়াছিল। আরও আশ্চর্য হইয়াছিলাম, যখন সেদিন, পাগল কয়েদীটিকে দিয়া আমার কুর্তা ও জাঙিরা কাচাইয়া দিল। স্নান করিয়া শুকনো ইজার পরিয়াছি, আর অমনি আমাকে একরকম জোর করিয়াই সেলে ঢুকাইয়া দিল। আমাকে আপত্তি করিবারও অবকাশ দেয় নাই। তাহার পর নিজের হাফপ্যাণ্টের বেল্ট আলগা করিয়া পিছনের দিকে কোমরের নিচে হাত ঢুকাইয়া দিয়া একটি বিড়ি বাহির করিল। বিড়িটি পাগলকে দিয়া নিজের দিয়াশলাই দিয়া ধরাইয়া দিল,—বুঝিলাম তাহার কাপড় কাচার পারিশ্রমিক। কোনো কথা না বলিয়া কেহ যদি কোনো কাজ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা বড় শক্ত। মনে হইল সিপাহীজীটি আমার ত্যাগ ও দেশভক্তি সম্বন্ধে সচেতন—ঠিক অন্য সিপাহীর

মতো নয়। মন বেশ হালকা বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর হইতে আজ কয়েক-দিন দিনের বেলায় দেখি সেই সিপাহীরই ডিউটি থাকে।...

তেল মাখে না আমাদের পার্টির চন্দ্রিমা। বলে, তেল লাগালেই তাহার মাথা গরম হইয়া ওঠে। বেঁটে ছোটখাট্ট মানুষটি,—অতি সরল, নীরব অক্লান্তকর্মী। অপরের কোনো কাজে আসিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যায়। দুই নম্বর ওয়ার্ডে দিনরাত চরকির মতো এক স্থান লইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাথার একরাশ রুক্ষ বাবরি চুলে তেল দেয় না। ১৯৩২ সালে মিলিকগঞ্জ কংগ্রেশ আশ্রমে 'জপতী উদ্ধার' সত্যাগ্রহের সময়, তাহার কানে নাকি সাইকেলের পাম্প দিয়া হাওয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হয়! সেই হইতে সে কানে শুনিতে পায় না।...চোখের সম্মুখে দেখিতেছি—আজ সকালে চন্দ্রিমা, দুই নম্বর ওয়ার্ডে ঘরের ভিতরে শোকসভার আয়োজন করিয়াছে। নীরব শোকসভা, রামভজনবাবু সভাপতি। সভাপতির সহিত এক মিনিট নীরবে দাঁড়াইল—তাহার পর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। চন্দ্রিমা দাঁড়াইয়া আছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রুক্ষ চুলের বোঝা দুই হাত দিয়া কানের পাশে সরাইয়া দিল—সিংহের কেশরের মতো দেখাইতেছে চুলগুলিকে। কয়েদীর হাতে হাতকড়া দিয়া দাঁড় করাইয়া দিলে সে যেরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়ায় সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া আরম্ভ করিয়াছে, 'মেরে গোলাম ভাইয়োঁ! আজ...' চতুর্দিক হইতে গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। সবাই চন্দ্রিমাকে থামিতে বলিতেছে; এখনই হয়তো জেল কর্তৃপক্ষের কাছে মিটিংএর খবর চলিয়া যাইবে; এখনই হয়তো লাঠি চার্জ হইবে, 'হমহী লোগোঁকে ভিতর কিৎনে সি আই ডি হ্যঁয়'; 'শোকসভামে কহী ভাষণ হোতা হ্যায়'; 'বয়রা হ্যায়, উহ কুছ নহী শুনেগা'; আরও কত প্রকারের মন্তব্য। চন্দ্রিমা কিন্তু আমার কথা বলিয়া চলিয়াছে—আমার ত্যাগের কথা—আমার দেশভক্তির কথা—তাহার সহিত আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথা, আপার ডিভিশন ওয়ার্ডের বর্তমান বাসিন্দা, আমার বাবা 'মাস্টার সাহেবের' প্রতি সমবেদনার কথা—আওরৎ কিতার কয়েদী দেবীজী বিলুবাবুর মা যাহাতে এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি পান, তাহার জন্য ইচ্ছা জ্ঞাপন এই 'রাষ্টীয় পরিবার'[১] ভারতের সম্মুখে কী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিযাছে তাহার কথা—শ্রোতাদের কর্তব্যের কথা—আরও কথার পর কথা গাঁথিয়া চলিয়াছে। অর্ধ নিমীলিত চক্ষের কোণে জল আসিয়া গিয়াছে।...সকলে ধরিয়া চন্দ্রিমাকে বসাইল। স্থির হইল মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য সকলে সারাদিন উপবাস করিবে...চন্দ্রিমার উপবাসে চিরকাল আপত্তি। তাহার পার্টির লোকেরা রাজনীতি ক্ষেত্রে উপবাসের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া স্বীকার করে না। চন্দ্রিমা কয়েকজন সন্দিগ্ধচেতা শ্রোতাকে বুঝাইতেছে যে, ইহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য উপবাস নয়, শত্রুর হৃদয় পরিবর্তন করিবার জন্য উপবাস নয়, 'বিলুবাবুকে প্রতিষ্ঠাকে খেয়ালমে দেশপ্রেমীকে নাতে হাম য়হ করনা হ্যায়।'[২]

তারপর দুই নম্বর ওয়ার্ডে অশথ গাছটির নিচে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির মেম্বারদের একটি মিটিং বসিয়াছে। গোরে সিং বক্তৃতা দিতেছে—সব জিনিস objectively দেখিতে হইবে।...প্রতি মার্ক্সিস্টের কর্তব্য...আরও কত কী। জাতীয় সংঘর্ষে পার্টির দানের জন্য তাহারা গর্বিত; কিন্তু একজন কমরেডের মৃত্যুতে তাহারা শোকে মুহ্যমান নয়। কিন্তু পার্টির যে ইহাতে খুব ক্ষতি হইল এরূপ ভাব তাহারা

১। যে পরিবারের লোকেরা রাজনৈতিক কর্মী।

২। 'বিলুবাবুর খ্যাতির কথা মনে করিয়াও আমরা স্বদেশপ্রেমী বলিয়া আমাদের ইহা করা উচিত'।

দেখায় না।...কত লোক আসিবে যাইবে।—কত প্রকারের সামাজিক বন্ধন ও অচ্ছেদ্য পারিবারিক শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে নামিয়াছে—সকলে না হউক অনেকেই। নিজের আদর্শের জন্য তাহারা কেহই প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নয়। নিজের প্রাণকে তাহারা মূল্যবান মনে করে না,—অপরের প্রাণের উপরেও তাহাদের সেইরূপ দরদ কম। কমরেড ভোলা পিছনে বসিয়া হাসিতেছে। একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি রাজবন্দীদিগের মধ্যে। যে রাজনৈতিক কয়েদী দেশের জন্য নিজের স্বার্থ ও নিজের ভবিষ্যৎ সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছে, যে, স্বদেশের জন্য হাসিমুখে সর্বদা মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত, তাহাকেও জেলের মধ্যে সামান্য স্বার্থের জন্য জঘন্য নীচ মনের পরিচয় দিতে দেখিয়াছে। কমরেড ভোলা ফাঁসির সাজা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, কিন্তু কয়েকটি মোকদ্দমা মিলাইয়া মোট তেত্রিশ বৎসরের শাস্তি হইয়াছে। অসম্ভব ফুর্তিবাজ, সর্বদা হাসিমুখ,—ফাঁসির সাজা হইলেও নিশ্চয়ই মুখের কোণের হাসিটি লাগিয়াই থাকিত,—যে কাজে যত বিপদ তাহাতে তাহার তত আনন্দ বেশি। এই বালকের মতো সরল একনিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমীটির ভাবিবার ক্ষমতা অল্প কিন্তু হুকুম তামিল করিতে সে দ্বিধাহীন। এই কমরেডকেও দুই নম্বর ওয়ার্ডে থাকিবার সময় ডালের লংকা লইয়া কামেশ্বর প্রসাদের সহিত মাথা ফাটাফাটি করিতে দেখিয়াছি।

রাজবন্দীদের এই সকল দুর্বলতা নিত্য জেল-কর্মচারীদিগের নজরে পড়ে। দেশের লোক রাজবন্দীদিগকে যে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে জেলের কর্মচারীগণ কেমন করিয়া সে দৃষ্টিতে উহাদের দেখিবে? এই জন্যই বোধ হয় দেশের লোকের প্রশংসা ব্যতীত উহাদের প্রশংসার জন্য আমি এত লালায়িত।...জেলর একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বুঝাইতেছিলেন যে, নয় ও দশ নম্বর সেলের কয়েদীরা খুব ভালো; 'They never grouse ard grumble'—ইহাই উহাদের প্রশংসার মাপকাঠি।... সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন সেদিন আমাকে আমার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন জেলরবাবু একটি পকেটবুক খুলিয়া, ফাউণ্টেনপেন লইয়া আমি কী চাই তাহা নোট করিতে একেবারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভদ্রলোকটিকে খুব হতাশ করিয়াছি।...সেলের বাহিরে যেখানে কুঁজাটি আছে ঠিক সেইখানে জেলরবাবু সেদিন দাঁড়াইয়াছিলেন।

...ঘরের বাহিরে দরজার সম্মুখে একটি কুঁজায় জল থাকে। এটি কিন্তু বাহিরে থাকে, আমাকে আত্মহত্যার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নয়; সেলের সকল কয়েদীকেই ইহা হইতে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়—অবশ্য নয় নম্বর ও দশ নম্বর বাদে। যাহার তৃষ্ণা পায় সে সিপাহীজীকে ডাকে, না হয় সেলের ঘণ্টা বাজায়। সিপাহীজী নিজের ইচ্ছা ও অবকাশ মতো উঠিয়া তাহাকে জল দেয়। সাধারণত যে যখন জল চায় সে তখনই জল পায় না। অনেকের কাকুতি-মিনতি যখন একসঙ্গে বেশ মুখর হইয়া উঠে, তখন সিপাহীজী উঠিয়া কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া দেয়। এক নম্বর সেলের বিশেষ খাতির, সেইজন্য আমার দরজার সম্মুখে কুঁজাটি রাখা থাকে। কুঁজার নলটি গরাদের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া গ্লাসে জল গড়াইয়া লইলাম। যতদূর পারি জল গরাদের বাহিরে ফেলিতে চেষ্টা করিয়া, মুখচোখে জল দিয়া লইলাম। মুখচোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। সেলে নালী নাই। এই দরজার নিচ দিয়াই জল বাহিরে যাইবার কথা। মুখচোখ ধুইবার সময় জল বেশির ভাগ ভিতরেই পড়িল। কুলকুচা করিয়া বাহিরে ফেলিলাম,—দেওয়াল আর মেজের সংযোগ-স্থলের সেই ছোট গাছটির উপর। এই গাছটিতে কুলকুচা করিয়া আমি প্রত্যহ জলসিঞ্চন করি। প্রতিবারই যখন

কুলকুচা করি, কতদূরে জল ফেলা যায় তাহার পরিক্ষা করি। মোটামুটি এ সম্বন্ধে ধারণা হইয়া গিয়েছে। দাঁড়াইয়া, বসিয়া, মুখের ভঙ্গি বদলাইয়া, কত রকমে নিজের সহিত প্রতিযোগিতা করি—আগের রেকর্ড ভাঙিবার চেষ্টা করি। দ্বিপ্রহরে যখন বাহিরের সিমেন্টের মেঝে তাতিয়া আগুন হইয়া থাকে, তখন কুলকুচা করিয়া তাহার উপরে জল ফেলি। তাহার পর এক দুই করিয়া গনিতে থাকি, কতক্ষণ জল নিশ্চিহ্ন হইয়া শুকাইয়া যায়। কী গাছ জানি না, তামাটে রঙ-এর পাতা। পাতাগুলি নিমের পাতার মতো দেখিতে। লন্ঠনটি কাছেই থাকায় গাছটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ছোট লতানে গোছের গাছ, দেওয়ালটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। লন্ঠনের আলোতে ছোট ছোট হল্‌দে ফুলগুলিকে দেখা যাইতেছে না। কী বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা গাছটির! ইট আর সিমেন্টের মধ্যে ফাটল। তাহারই মধ্য দিয়া ইহা জীবনী-শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, আমার অবর্তমানেও লইতে থাকিবে। আমার কুলকুচার জলের প্রত্যাশা সে রাখে না। গাছটির দিকে তাকাইলে মনে হইতেছে উহারা ডাঁটা ভাঙিলেই সাদা ঘন দুধের মতো রস বাহির হইবে। ক্ষেতপাঁপড়া, যাহাকে আমরা বলি ক্ষীরুই, তাহার রসও ঠিক এইরূপ দেখিতে।···সেই রস জ্যাঠাইমা আমার কন্ঠার নিচে একটি ফোড়ার উপর লাগাইয়া দিয়াছিলেন, ফোড়া ফাটাইবার জন্য। তাহার পর হইতে দুর্গাদির খেলাঘরের জন্য একটি পুরাতন মাটির প্রদীপে, আমি আর নীলু কতদিন ক্ষীরুয়ের দুধ সংগ্রহ করিয়াছি।

দুর্গাদির ছোট বোন টেপী, আধময়লা ফ্রক পরা, মাথায় বেড়া বিনুনি। আমি আর নীলু তাহাকে আশ্রমের কাছে গ্যাঞ্জেস-দার্জিলিং রোডের উপর রবার গাছের নিচে লইয়া গিয়াছিলাম, কেমন করিয়া রবারের রস জমাইয়া রবার তৈয়ারি করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য। আমি গাছে উঠিয়া ছুরি দিয়া একটি ডালের উপরের ছাল কাটিয়া দিলাম। টপটপ করিয়া দুধের মতো রস পড়িতেছে; নীলু টেপীকে ধরিয়া তাহার নিচে দাঁড় করাইয়া দিল। বলিল, 'উপরে তাকাস না, খবরদার! তোর মাথার উপর ইরেজার তৈরি করে দিচ্ছি।' পরে টেপী বেচারির কী কান্না! রবারের রস জমিয়া তাহার মাথার চুল কামড়াইয়া ধরিয়াছে। মা'র কাছে আমরা দুই ভাই সেদিন কী প্রহারই খাইয়াছিলাম! ভাগ্যিস বাবা 'দেহাত'[১] গিয়াছিলেন। তাহার মাসখানেক পরেই টেপী মারা যায়। আমার আর নীলুর তাহার পর কী মানসিক দুশ্চিন্তা! কী অনুশোচনা! আশ্রমের শিশুগাছের তলায় বসিয়া আমরা ঠিক করিয়াছিলাম; রবারের রস মাথায় দিয়াই তাহার ডিফ্‌থিরিয়া হইয়াছে। নীলু আমার আগেই খবর আনিয়াছিল, কার্তিক ডাক্তার টেপীর গলা কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে রবারের রস বাহির করিয়াছে।··· দুর্গাদির বাড়ির সব ছেলেপিলেদের, মা সেদিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে লইয়া আসিয়াছিলেন। টেপীর ভাই ভোঁদা, এই বৎসর উকিল হইয়াছে, তখন সে কত ছোট। মা'র কাছে শুইয়াছিল। রাত্রে বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরিয়া কী কান্না!···

দরজার সম্মুখে বসিবার উপায় নাই, জলে ভিজিয়া গিয়াছে। নীল ডোরাকাটা ইজারটি দিয়া জল মুছিয়া লইলাম। ইজার ময়লা হইলেও আর ক্ষতি নাই। কাল তো আর ওটি পরিতে হইবে না। নয় বৎসর আগে ভূমিকম্পের সময় মেঝেতে এই স্থানে গর্ত হইয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রহিয়া পি. ডব্লু. ডি'র কর্মনিষ্ঠার সাক্ষ্য দিতেছে। এক নম্বর সেলে যে থাকে তাহার আবার এত বাছ-বিচার! ফাঁসির মঞ্চ হইতে সর্বাপেক্ষা নিকটে এই ঘর, আর যে আসামীর ফাঁসির দিন সর্বাপেক্ষা

১ মফস্বল।

নিকটবর্তী তাহারই দাবি এই ঘরের উপর। সেলের সাড়ে চার হাজার বাসিন্দার মধ্যে এই ঘরের উপর আমারই দাবি সর্বোচ্চ। পি. ডব্লু. ডি'র লোকেরা ঠিকই ভাবিয়াছে—ভিজা মেঝের উপর বসিয়া বাতগ্রস্ত হইতে যতদিন সময়ের দরকার, এ বাসিন্দাকে ততদিন বাঁচিতে হইবে না। আর যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়া তাহার 'মার্সি পিটীশন্' মঞ্জুর হইয়া যায়, তাহা হইলে সামান্য রোগের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আজিকার দিনেও কিন্তু মনে হইতেছে, এই ভিজার উপরে বসিয়া অসুখ করিতে পারে। একটা গল্প পড়িয়াছিলাম,—একজন লোক আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। বিষের শিশি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার বন্ধু বাহির হইতে ইহা দেখিয়া, পিস্তলটি তাহার দিকে নিশানা করিয়া বলিল, 'ফেলে দে বলছি গেলাসটা, না হলে এখুনি গুলি করলাম।' হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া গেল। কে বুঝিতে পারে মনের এই গতি!

হয়তো দরজার সম্মুখের এই গর্তটি ভূমিকম্পের পর মেরামতের সময় নজরে পড়ে নাই। এন্‌জিনিয়ারের বিশেষ দোষ নাই। হঠাৎ নজরে পড়ে না। কাছাকাছি জল পড়িলে সব জল ঐ স্থানে জমা হয়—তখন বুঝা যায়—ঐ স্থানে একটা গর্ত।…কী কাণ্ড সেবার ভূমিকম্পের সময়! ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বলিতেছি।—পাটনা ক্যাম্প জেল হইতে উত্তর বিহারের সকল রাজবন্দীকে গভর্ণমেন্ট ছাড়িয়া দিল—ভূমিকম্পপীড়িত জনগণের সেবার জন্য। নীলু ১৯৩২-এর শেষের দিকেই ছাড়া পাইয়াছিল। বাবা, মা দুজনেই জেলে। নীলু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়ে। আমরা বি. এন. ডব্লু রেল দিয়া আসিতেছি। প্রতি স্টেশনেই ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার চিহ্ন বিদ্যমান। 'পথ্‌হারা' না কোন্ স্টেশনের কাছে একদিন বসিয়া থাকিতে হইল। পুল ভাঙিয়া গিয়াছে। নৌকায় পার হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে তিন আনা খোরাকি পাওয়া গিয়াছিল। সেই নদীর ধারের হাটে, দইওয়ালার সহিত 'ঠিকা' হইল চার পয়সায় যে যত দই খাইতে পারে। নাগিন্দর সিং প্রায় চার পাঁচ সের দই খাইল,—বিনা মিষ্টিতে লালচে রঙ-এর মহুয়া দই। সঙ্গে পয়সা নাই। কারাগোলারোড স্টেশন হইতে পুর্ণিয়া পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতেই হইবে। গ্যাঞ্জেস-দার্জিলিং রোডে কী বড় বড় ফাটল! হরদার পুলটি ভাঙিয়া গিয়াছে। হরদাবাজারের নিকট গিয়া পা আর চলে না। দুবেজী কংগ্রেসকর্মী। তাহার দোকানে উপস্থিত হইতেই তাহার স্ত্রী দৌড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই 'পরণাম' এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল। দেখিলাম মিলের শাড়ি বদলাইয়া সবুজ পাড়ের খদ্দরের শাড়িখানি পরিয়া আসিয়াছে। গায়ের রঙ এত বয়স সত্ত্বেও সুন্দর ফুটফুটে,—ঋজু দেহ, টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাকটি—সর্বোপরি চোখমুখের একটি আত্মমর্যাদার ভাব বৃদ্ধার রূপকে আরও শ্রীময়ী করিয়া তুলিয়াছে। দুবেজীর স্ত্রী ও দুবেজী কি খাতিরটাই করিল!—দুধে চিঁড়ে ভিজাইয়া, সে চিঁড়া দই দিয়া আমরা রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে তৃপ্তি করিয়া খাইলাম। কৌতুকের লক্ষ্য দুবেজী। সকলেই তাহার ভোজপুরী বুলি অনুকরণ করিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। দুবেজী 'পৌঁছাইলাম'কে 'চৌপল' বলেন, তাহা লইয়া কী হাসি? বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাও এই হাসিতে যোগ দিয়াছে। আগুনের 'ঘুরের' ধারে অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুবেইনের সহিত গল্প হইল—মা'র কথা—এইবার সাদি করিতে হইবে—আরও কী কী মনে পড়িতেছে না। দুবেইন 'নিমক সত্যাগ্রহের' সময় লবণ তৈয়ার করিয়া জেলে গিয়াছিল। কিন্তু পুলিস কেন জানি না, দুবেজীকে ধরে নাই, বোধ হয়, বয়স হইয়াছে বলিয়া। তাহার পর হইতে 'দুবেইন' নিজেকে দুবে অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে—দুবেজী আমার কাছে এই সব নালিশ করিল। ভারি

সরল মন, এই স্বামী স্ত্রী দুই জনের। নিজেদের সামান্য জমি-জমা যাহা ছিল কংগ্রেসকে দান করিয়াছে। রাত্রিতে শুইয়া আছি ; উহারা মনে করিল আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, আমাদের কম্বলের উপর আর একখানি করিয়া কম্বল চাপা দিয়া গেল। তাহার পর ঐ স্থান হইতে রওনা হইবার পূর্বে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের দিকে আমাকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিল, 'আমাদের একটি অনুরোধ রাখতে হবে। আমাদের ছেলেপিলে নেই। তোমাকে কতদিন থেকে, সেই যখন তুমি এতটুকু ছিলে, তখন থেকে দেখছি। মাস্টার সাহেবের ছেলে তো আমাদেরও ছেলে। আমরা গরিব মানুষ, তোমরা হলে বাঙালী, বিলুবাবু। কিন্তু আমাদের একটি কাজের দায়িত্ব তোমাকে নিতেই হবে। আমাদের যে কয়েক বিঘা জমি আছে, তার আয় আমি কংগ্রেসের কাজেই খরচ করি। এগুলো লেখাপড়া করে দিয়ে যেতে চাই। আমরা মরে যাবার পর তুমি এগুলো মহাত্মাজীর কাজে লাগিও। আমরা আর কটা দিনই বা বাঁচব ?' তাহাদের কাছে কথা দিয়াছিলাম। দুবেইন এখনও বোধ হয় সেই রঙীন কাগজের রথের মধ্যস্থিত রামজীর 'মুরতের' সম্মুখে বসিয়া, প্রদীপের আলোয়, তকলিতে এণ্ডির সুতা কাটিতেছে।

…হরদাবাজার হইতে পূর্ণিয়া পৌঁছিলাম পরের দিন দুপুর বেলায়। 'গান্ধী আশ্রম' গভর্ণমেণ্ট 'জপতো' করিয়াছে। তথাপি সেই দিকেই চলিলাম।…দূর হইতে দেখিতেছি, জেলা কংগ্রেস অফিসঘরের পাশের শিশু গাছটি পীতাভ-জরদ রঙ এর বিগ্নোনিয়া ফুলে ফরিয়া গিয়াছে। আমি সেবার লতাটি ঐ গাছে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। পতাকাস্তম্ভের জাতীয় পতাকা পূর্বে বহুদূর হইতে দেখা যাইত। এখন তাহা নাই। কিন্তু ভাসমান, সাদা মেঘখণ্ডের পটভূমিকায়, বিগ্নোনিয়া ফুলে ভরা 'শিশু' গাছটি জাতীয় পতাকারই কাজ করিতেছে—সাদা, জাফরানী, সবুজ তিনটি রঙ !…আশ্রমের বাড়িগুলি খড়ের। আমাদের বাড়ির বেড়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। টিউবওয়েলের উপরের অংশটি নাই। এস. ডি. ও সাহেবের সীল করা দরজায়, তালার চিহ্নমাত্র নাই। তক্তাপোশ ও বড় আলমারিটি ছাড়া আর কোনো জিনিসই ঘরে নাই ; ছোটখাট সব জিনিসই যে পারিয়াছে সে-ই লইয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের দরজার কপাট দুইটিও কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। মহাত্মাজীর ছবিখানি চুরি গিয়াছে। ন'দির তৈয়ার করিয়া দেওয়া ফ্রেমে বাঁধানো তুলার পেঁচাটি দেখিলাম না। সহদেওএর বোন সরস্বতীর ছোটবেলার তৈরী কার্পেটের উপর বোনা Untouchability is a sin'—'সিন'-এর Nটি Zএর মতো করিয়া লেখা—তাহাও নাই। আমার লেখা একটি কবিতা, নীলু পেস্টবোর্ডের উপর আঁটিয়া টাঙাইয়া দিয়াছিল—সেইটি রহিয়াছে। লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর আমারই আঁকা রবিবাবুর ছবি, পিজবোর্ডের উপর আঁটা, এখানিও দেখিলাম কেহ লইবার যোগ্য দ্রব্য বিবেচনা করে নাই। হয়তো ফ্রেমে বাঁধানো নয় বলিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। ফুলের গাছগুলি চুরি হইয়া গিয়াছে। কেবল গোলাপী আর সাদা ভিনকা ফুলে আঙিনাটি ভরিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় উহার গাছ ছাগলে গোরুতে খায় না। মধ্যে মধ্যে দুই একটা ভ্যারেণ্ডার গাছ মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে. আভিজাত্যহীন নগণ্য ভিনকাকে তাচ্ছিল্য করিবার জন্য। গুটি-পোকার চাষের বাড়ি একেবারে পড়িয়া গিয়াছে। গোরুর গাড়ির চাকা দুইটি কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। তেলের ঘানির ঘরটি খাড়া আছে। কিন্তু ঘরের ভিতরটি অড়র গাছের মতো দেখিতে এক প্রকার আগাছায় ভরা। ভিতরে যাইবার উপায় নাই। আশ্রম লাইব্রেরির বই একখানিও নাই। হলঘরের মধ্যে দেখিলাম রাশীকৃত আবর্জনা

—অনেকগুলি ছাগল ও গোরু প্রত্যহ বাঁধিবার চিহ্ন তথায় বর্তমান। প্রতিবেশীরা দেখিতেছি কংগ্রেসের এই দুর্দিনেও ঘরটিকে ভুলে নাই।...

মন উদাস হইয়া গেল। আশ্রম হইতে বাহির হইয়া জ্যাঠাইমার বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকলাম। এটা বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ি। বাড়ির ঠিক সম্মুখে একটি তাঁবু। তাঁবুর দরজার উপর একটি সাদা ছাগল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া এক মনে একটি লতাপাতার এমব্রয়ডারি করা টেবিল ক্লথ চিবাইতেছে। ননীদির মেয়ে বুড়িয়া, আর তাহার খেলার সাথীগণ, মাঠের মধ্য দিয়া যে বিরাট ফাটলটি চলিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সকলে দৌড়াইয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওখানে কী করছিলি?' বলল, 'ছোটমা বলেছে যে, ফাটলের মধ্যে দিয়ে আমেরিকা দেখা যায়।'...বাহির হইতে চিৎকার করিতে করিতে বুড়িয়া বাড়ি ঢুকল—'দিদিমা দেখ, কে এসেছে।' জ্যাঠাইমা আর ন'দি হবিষ্যি ঘরে খাইতে বসিয়াছেন। 'কোথায় ন'দি' বলিয়া ঢুকিতেই দুইজনেই খাওয়া ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। জ্যাঠাইমার ডান হাত এঁটো। বাঁ হাত দিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইলেন। নিলু দেখি ঘরের মধ্যেই ছিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিল। 'জ্যাঠাইমার খাওয়াটি নষ্ট করলে তো—এখন জ্যাঠাইমার পাতে বসে ওগুলি গেলো'—বলিয়া উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল। ন'দি বলিল, 'দেখেছ, দেখেছ, আমাদের তো হয়েই গিয়েছিল। ন'দির চোখে কপট ক্রোধের চিহ্ন। জ্যাঠাইমা নীলুকে তাড়া দিয়া কহিলেন, 'তুই আবার ঐ ভাঙা ঘরে শুয়েছিলি! ঘর চাপা পড়ে মরবি না কি? তোকে নিয়ে আর পারি না। আর আমি তোকে এখানে রাখব না। পাঠিয়ে দেব মামার বাড়িতে। কী ডাকাত! কী ডাকাত! কাল রাতেও ঐ আটফাটা ঘরে শুয়েছিল!' তারপর কত কথা, কত গল্প! নীলুর কথাই ফলিল। সেই পাতেই আমাকে খাইতে হইল। আমরা কখনও জ্যাঠাইমাদের বাড়িকে নিজেদের বাড়ি ছাড়া ভাবিতে পারি নাই। জ্যাঠাইমাদের বাড়ি চিরকাল আমাদের 'ও বাড়ি'।

জ্যাঠাইমাকে মনে পড়ে—সম্মুখের দুইটি বড় বড় দাঁত মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। কপালে দুই ভ্রূর মাঝে একটি নীল উল্কার দাগ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ছোট্ট মুখখানি। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। আর হাসিলেই দেখা যায় সম্মুখের নিচের পাটির দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। পরনে মটকার থান। জ্যাঠাইমার চোখে মুখে কথাবার্তায়, এমন মাতৃত্বের ভাব যাহা সচরাচর দেখা যায় না। রাফায়েলের মাতৃমূর্তি বড় গম্ভীর, কেমন যেন একটু আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব; সর্বশরীরে সাবলীল ছন্দ ও স্বচ্ছন্দগতির অভাব; হাসপাতালের নার্সদের মেট্রেনের মতো যেন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ভরা; কিন্তু জ্যাঠাইমা যেন দেশী পটুয়ার আঁকা যশোমতির ছবি,—চাকচিক্য নাই কিন্তু আন্তরে সাড়া দেয়। আমার মা'র যে-ভাব আমার আর নীলুর প্রতি, জ্যাঠাইমার সেই ভাব পাড়ার সব ছেলেমেয়ের প্রতি। সকলেরই এখানে অবারিত দ্বার; কিন্তু আমার গর্ব যে আমার স্থান তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চে। নীলুরা তো যখন-তখন জ্যাঠাইমাকে এই বলিয়া ক্ষ্যাপায় যে, তিনি আমার উপর পক্ষপাতিত্ব করেন; আর সকলকে না দিয়া, লুকাইয়া আমার জন্য খাবার রাখিয়া দেন। আমি জলে থাকিবার সময় জ্যাঠাইমা একবার খুব অসুখে পড়েন। সেই সময় নাকি তাঁর সব সম্পত্তি আমাকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন দেখা যায়, তাঁহার নিজের সম্পত্তির মধ্যে আছে একটি পুরনো বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ছাব্বিশটি টাকা,—আর এক কলসী পুরনো ঘি—প্রতিমাসে কিছু কিছু করিয়া জমানো। নীলু রসাইয়া এই সকল গল্প

করে এবং যখন-তখন জ্যাঠাইমাকে এই জন্য উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে।

…সেই একবার জ্যাঠাইমার ভাইয়ের নাতনীর বিয়েতে জ্যাঠাইমাকে লইয়া গিয়াছিলাম তাঁহাদের দেশে। পাবনা জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম; যমুনা নদীর তীরে। জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহাদের গ্রাম দেখিতে বাহির হইয়াছি। তাঁহার কবিরাজদার ভিটে; গ্রামের বাবুদের ভাঙা মন্দির; ভৈরব ভূঁইয়া—যাঁহার নামে শুকনো গাছে ফল ধরিত, বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটী; আরও কত জায়গা দেখিলাম। জ্যাঠাইমার কাছে বাল্যকাল হইতে এই সকল স্থানের এত গল্প শুনিয়াছিলাম যে, কিছুই যেন নূতন লাগিতেছিল না। তাহার পর জামাইদীঘির ধারের বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছি,—জ্যাঠাইমা দেখাইলেন, এইখানে নবদ্বীপ ডাক্তার সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। 'তখন এ জেলায় একখানি মাত্র সাইকেল ছিল। সাইকেল দেখবার জন্য আমরা পাড়ার সবাই এখানে এসে দাঁড়িয়েছি—বেচারা হুড়মুড় করে পড়ে গেল দীঘির জলের ভিতর, একেবারে সাইকেল-টাইকেল নিয়ে!' আমি বলিলাম, 'জ্যাঠাইমা, সে যে বলেছিলে ফেরিমেণ্টের-রাস্তার ( আসলে কথাটি Ferry Fund ) উপর।' 'আর! এই বাঁধের উপর দিয়ে এইটাই ফেরিমেণ্টের রাস্তা। আর দ্যাখ, তোকে একটা কথা বলি; বোস এখানে। তুই যে আমাকে জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা বলে ডাকিস, আমার একটুও ভালো লাগে না। আমাকে মা বলতে পারিস না!' আমি কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, আগ্রহান্বিতভাবে, জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আমার উত্তরের প্রতীক্ষায়। প্রগাঢ় স্নেহপূর্ণ মাতৃত্বের ঝলকে মুখ উদ্‌ভাসিত! প্রশ্নটি এত অপ্রত্যাশিত যে আমার মুখে উত্তর যোগাইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, 'জ্যাঠাইমাও যা মাও তাই। দুই-ই তো একই।' দেখিলাম আমার উত্তরে তিনি বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হইয়াছে। অপরাধীর সুরে বলিলেন, 'তোর মা আছে; তোকে এই অনুরোধ করা আমার অন্যায় হয়েছে!' তাঁহার দৃষ্টি দীঘির অপর পারে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের উপর নয়।…

সেই দিন হইতে অপর সকলের অসাক্ষাতে জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলিয়া ডাকি। সকলেই কথাটা জানে, কিন্তু তথাপি 'জ্যাঠাইমা' ডাকে ছোটবেলা হইতে এমন অভ্যস্ত যে, সকলের সামনে 'মা' বলিয়া ডাকিতে কেমন যেন সংকোচ হয়। নবদ্বীপ ডাক্তারের সাইকেল হইতে পড়িয়া যাইবার স্থান দেখাইবার সময় জ্যাঠাইমার হঠাৎ আমার মা হইবার ইচ্ছা কেন হইল, তাহা আজও ঠিক করিতে পারি নাই।…

…ইহার কিছুদিন পরের কথা। যাহা ভয় করিয়াছিলাম ঠিক তাই! আমার জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলা, মা পছন্দ করেন না। আমি আর নীলু রান্নাঘরে দাওয়াতে খাইতে বসিয়াছি। মা পরিবেষণ করিতেছেন। পরিবেষণ করিয়া মা আমাদেরই সঙ্গে খাইতে বসিবেন। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, 'মা, জানো, জ্যাঠাইমা তিলবাঁটা দিয়ে একরকম এমন সুন্দর ঝিঙের ঝোল রাঁধেন?' 'তা সেখানে খেলেই পারো। এখানে আর খাওয়া দরকার কী?' কী কথার কী উত্তর! মা স্বভাবতই মিষ্টভাষিণী। তাঁহার কথার এই আকস্মিক ঝংকার আমাকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। নীলু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আজকে মাকে বলেছি কিনা যে, তুমি জ্যাঠাইমাকে মা বলো, তাই মা চটেছে। দেখলে না 'তুমি' বললেন।' সত্যিই মা বেশি রাগ করিলে আর আমাদের 'তুই' বলেন না। নীলুটাও আবার এমন বোকা; মা'র আড়ালে খবরটি আমাকে দিলেই পারিত। দেখিলাম মা'র দু'চোখ দিয়া জলে আসিতেছে, তাহা ঢাকিবার জন্য

রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমার মনে হইতে লাগিল যে একটি গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি।

—মা যে ওয়ার্ডে আছেন, তার নাম 'আওরৎ কিতা'। আজ আর ঘুমাইতে পারিবেন না। মা বোধ হয় মশারি ফেলিয়া জপে বসিয়াছেন। মন খারাপ হইলেও মা দেখিয়াছি জপে বসে। নীলু যখন দেউলীতে গত বৎসরের প্রথম দিকে অসুখে পড়িয়াছিল, তখনকার কথা বলিতেছি। হঠাৎ খবর আসিল নীলুর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করা হইয়াছে, আজমীর হাসপাতালে। সেদিন সারারাত মা পুজোর ঘরে থাকিলেন। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় কেবল একবার আমার ঘরে আসিয়া আয়নার পাশে ও তাকের উপর, শিশিগুলির পাশে কিছু খুঁজিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল মা হয়তো নীলুর অসুখের সম্বন্ধে আমার সহিত কথা বলিতে চাহেন। অথচ সাহস পাইতেছেন না, পাছে আবার আমি অসুখের গুরুত্ব বা প্রাণের আশঙ্কা সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া ফেলি, সেই জন্য। বোধহয় জপ করিয়া মনে সম্পূর্ণ বল পান নাই। মা ভাবিলেন আমার দৃষ্টি বই-এর দিকে নিবদ্ধ—তাঁকে আমি দেখিতেছি না। দেখিলাম অতি ভক্তিভরে দেওয়ালে টাঙানো গান্ধীজীর ছবিটিকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার আলনায় টাঙানো, গুছানো কাপড়গুলিকে আবার গুছাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন আমি মাকে বলিলাম 'অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন' অতি সাধারণ ব্যাপার। সকলেরই সেরে যায়। আজকাল বিলেতে সুস্থ লোকে এই অপারেশন করিয়ে নেয়।' মা এমন ভাব দেখাইলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার কোনো চিন্তা বা উৎসুক্য নাই। 'দেউলী থেকে আজমীর কতদূরে রে?' আবার সারারাত্রি জপেই কাটিল!...

গুমটির উপর হইতে একজন ওয়ার্ডার একটানা চিৎকার করিয়া চলিয়াছে—'বোলোরে নয়াগোল; বোলোরে জুভলিন (Juvenile Ward)...।' রাত্রি এখনও কিছু বেশি হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে অধিকাংশ ওয়ার্ডের 'পাহারা'ই দায়সারা ভাবে জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওয়ার্ডার গানের মতো সুর ধরিয়া বলিতেছে 'বোলোরে...'। 'বোলোরে পাঁচনম্বর' বলিতে, আমার ষোল গুনিতে যত সময় লাগিল, ততটা সময় লাগিল। একজন ওয়ার্ডার আমায় একদিন বুঝাইয়াছিল, তারা যে গানের সুরে কথাগুলি বলে তাহাতে কষ্ট কম হয়, আর গলা ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রতি ওয়ার্ডে চারটি করিয়া বড় বড় হল—দুইটি উপরে, দুইটি নিচে। জেলের ভাষায় এই হলগুলির নাম 'খাটাল'। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের প্রথম হল হইতে জবাব আসিল—ভাঙা খনখনে গলায় 'পাঁচ নম্বর, পহলা খাটাল—জমা একশো সত্তাওন—আসামী, তালা, বাত্তি[১] ঠিক হ্যায়।' লোকটির গলা শুনিয়া মনে হইতেছে উহার মুখজোড়া খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফ, ভারি কর্তব্যনিষ্ঠ; তাহার মাথায় নীল টুপি, অর্থাৎ সে 'পাহারা'। মাসে চার আনা করিয়া বেতন তাহার নামে সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে জমা হয়। তাহার বদলে দুই ঘণ্টা রাত্রি জাগিয়া এই পাহারা দেওয়ার কাজ করে। সে সরকারের 'নিমক' খায়, কাজে ফাঁকি দিবে কেন? পাঁচ নম্বরের অন্য তিন খাটাল হইতে যে উত্তর আসিল তাহা এত স্পষ্ট নয়। তাহারা সব কথাগুলি বলিও না। কেবল একটা 'হো-ও-ও-ও....হৈ'-এর মতো শব্দটি শুনাইল; গ্রামের চৌকিদারের নিশুতি রাতের হাঁকের মতো। গানের সুরে বলিবার চেষ্টা নাই—কেবল দিনগত পাপক্ষয় করিবার ধরনে বলা। ইহারা নিশ্চয়ই সাদাটুপিধারী 'মেট'

১ আলো।

অর্থাৎ ইহার 'পাহারা' অপেক্ষা পুরাতন কয়েদী। মাসিক আট আনা করিয়া বেতন পায় বটে, কিন্তু তাহারা জেলের অনেক কিছু দেখিয়াছে শুনিয়াছে। তাহারা জানে যে এই কাজ ভাল করিয়া করার উপর তাহাদের 'মার্কা' (remission) নির্ভর করে না। আর জানে কী করিয়া হেড জমাদারকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। একজন মেট নেহাত কেউকেটা নয়। তাহার অধীনে আছে এতগুলি কয়েদী। তাহাদের শাসনে রাখিতে হইলে জেলের কর্মচারীদের প্রতি, জেলের নিয়ম-কানুনের প্রতি একটি বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইতে হইবে।...

'বোলোরে নয়াগোল' ( Segregation Ward )। যতক্ষণ 'বোলোরে' বলিতেছিল আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলাম যে পাঁচ নম্বরের পর ছয় নম্বর বলিবে, না নয়াগোল বলিবে। তাহা হইতেই বুঝা যাইবে ওয়ার্ডার নূতন না পুরনো। ছয় নম্বরের আর একটি নাম 'দামলী কিতা'। যাহাদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহারাই এ ওয়ার্ডে থাকে। এই কয়েদীরা অন্য ওয়ার্ডের কয়েদীদিগকে 'কদ্দুচোর' বলিয়া ঠাট্টা করে ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তাহারা নাকি লাউ চুরি করিয়া জেলে আসিয়াছে। এই দামুলীদের ( lifer ) সকল ওয়ার্ডারই একটু সমীহ করিয়া চলে। আর পুরনো ওয়ার্ডারদের সহিত ইহাদের একটি বন্দোবস্ত আছে। তাহারা গুমটির উপর ডিউটিতে থাকিলে ইহারা সারারাত শান্তিতে ঘুমাইতে পায়। মেট পাহারার চিৎকার ও সংখ্যাগণনা হইতে তাহারা অব্যাহতি পায়। আর সারাদিন বেচারারা জেলের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। একটু অবিচ্ছিন্ন নিদ্রার সুযোগ না পাইলে ইহারা সারাজীবন এই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিবে কেমন করিয়া!...নূতন ওয়ার্ডার হইলে নিশ্চয়ই 'বোলোরে ছয় নম্বর' বলিয়া হাঁক দিত। দুই নম্বর ওয়ার্ড হইতে ছয় নম্বর ওয়ার্ডের দিকে তাকালেই যেন মনে হয়, একটি বড় জংশন রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া আছি। এ ওয়ার্ডটি একজন রাজা বাহাদুরের দান। দানের পাত্র, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বাছিবার প্রতিভা রাজাবাহাদুরের নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। যাহা হউক এই দানের দ্বারা রাজাবাহাদুরের কোনো গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইয়াছে কি না জানি না, তবে যে হতভাগ্য আজীবন কারাগারে কাটাইবে, তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেয়। লাইফাররা সাধারণত লোক ভালো। পাকাচোরের ছ্যাঁচড়ামি বা নীচতা তাহাদের মধ্যে নেই। জেলকেই ঘরবাড়ি করিয়া লইয়াছে। কেহবা ওয়ার্ডের আঙিনায় সযত্নে তুলসী গাছ পুঁতিয়াছে; কেহ অল্প জায়গা পরিষ্কার করিয়া নিকাইয়া বসিবার স্থান করিয়া লইয়াছে। অনেকেরই নিজের নিজের লংকা ও পুদিনার গাছ আছে। এই গাছগুলির উপর তাহাদের কী মায়া! স্নেহ, ভালবাসা, সন্তানবাৎসল্যের স্বাভাবিক প্রেরণা, তাহারা এই গাছগুলির উপর নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দেয়...

...হাজারীবাগ জেলের সেই ফিরিঙ্গি উইলিয়মস্ সাহেবের ছাড়া পাইবার দিন কী কান্না! চৌদ্দ বৎসর সে জেলে কাটাইয়াছে। তাহার পোঁতা পেয়ারা গাছটি কত বড় হইয়াছে। তাহারই হাতের লাগানো গোলাপজাম গাছটি পাউডারপাফের মতো ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। অশ্বত্থ গাছটির নিচে সে বসিবার জন্য উঁচু বেদী তৈয়ারি করাইয়া লইয়াছিল। তাহা লইয়া সুপারিন্টেন্ডেন্ট পি. ডব্লু. ডি. এন্‌জিনিয়রের মধ্যে কত মনকষাকষি হইয়া গেল—সব জিনিসের দিকে তাকায়, আর ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে। একজন বয়স্ক লোককে এরূপ করিয়া কাঁদিতে খুব কমই দেখিয়াছি। বাড়ি যাইবার ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখিবার আনন্দ অপেক্ষা এই সকল গাছপালা ও জেলের বন্ধু-বান্ধবকে

ছাড়িয়া যাওয়ার দুঃখ তাহার অনেক বেশি হইয়াছিল।...

একই ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া ডান পা-খানি অবশের মতো হইয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করিলাম, পায়ের ঝিনঝিন সারাইবার জন্য দরজার গরাদ ধরিয়া আড়াআড়ি ভাবে যখনই বসি, দেখি নিজের অজ্ঞাতে ডান দিকে ভর দিয়াই বসিয়াছি। আর ডান হাত দিয়া গরাদগুলি ধরিয়া রহিয়াছি। কখনও ভুলক্রমেও বাঁ কাঁধ গরাদের সঙ্গে ঠেকাইয়া বাঁ দিকে ভর দিয়া বসি না।

...তখন আমরা কত ছোট! স্কুলে যাই না। বোর্ডিংয়ের কাছে হেড মাস্টারের কোয়ার্টার। বাবা স্কুলে গিয়াছেন। মা বসিয়া সুপারি কাটিতেছেন। আমার আর নীলুর মধ্যে কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। নীলু বলিতেছে মা'র ডান কোলটি তাহার; বাঁ কোল আমার লইতে ইচ্ছা হইলে আমি লইতে পারি। কেন জানি না, আমার বাঁ কোলটি লইতে অপমান বোধ হইতেছে। দুই জনেই মা'র ডান কোলের উপর হাত রাখিয়া, নিজের নিজের দাবি কায়েম রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। এই হুড়াহুড়ির মধ্যে হঠাৎ নীলুর পায়ে লাগিয়া, কাটা সুপারি রাখিবার বেতের কাঠাটি উল্টাইয়া গেল। মা ঠাস-ঠাস করিয়া আমার পিঠে দুই চড় বসাইয়া দিলেন; 'বুড়ো ছেলে, লজ্জা করে না, যত বয়স হচ্ছে তত গুণ বাড়ছে!' আমি জবাব দিলাম, 'আমি সুপারি ফেলেছি নাকি?'

'ফের কথা! ছোট ভাই ডান কোল চাচ্ছে, তা ওনারও ডান কোল নিতে হবে। ডান কোল নীলুর। আর একটু হলেই আমার হাত জাঁতিতে কেটে গিয়েছিল আর কি!'

ক্রোধে, লজ্জায়, অপমানে চোখে জল আসিয়া গেল। খানিকটা দূরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নীলু কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া চলিয়া গেল,—বোধ হয় দাবিদার না থাকায় তাহার ঝগড়া করিবার সাধ মিটিয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ হইতে অনুভব করিতেছিলাম যে মা মধ্যে মধ্যে আড়চোখে আমি কী করিতেছি দেখিতেছেন। তাহার পর সুপারি কাটা শেষ হইলে কাঠাটি দেরাজের উপর রাখিয়া, আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'তুই এত বোকা কেন? বাঁ কোলটাই তো ভালো। দেখিস নি ঝিনুক করে দুধ খাওয়ানোর সময়, ডান হাত দিয়ে খাওয়ায়; বাঁ কোলে মাথা দিয়ে ছেলে শুয়ে থাকে। তুই তো ডান কোলেও শুয়েছিস। বাঁ কোলটা এখন তোর হল। ওঠ, দ্যাখ, সে দস্যিছেলে আবার কোথায় গেল!' যুক্তিটি সে সময় অকাট্য মনে হইয়াছিল।...

ডান পায়ের অবশ ভাবটি কাটিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছি দেখিয়া, ওয়ার্ডার দরজার কাছে আসিল—যেন জানিতে চায়, আমি কী ভাবিতেছি, কেন হঠাৎ রাত-দুপুরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলাম। বোধ হয় ভাবিতেছে যে বাবুর মনের ঠিক নাই। আর আজকের দিনে তো থাকিবার কথাও নয়। গরাদের বাহির হইতে ওয়ার্ডার দেখিতেছে। মনে হইতেছে যেন চিড়িয়াখানার দর্শক খাঁচার ভিতর কোনো বন্যজন্তু দেখিতেছে!

চিড়িয়াখানার কথায় মনে পড়িল কাশীতে আমার বন্ধু নীরেশের ছোট ঠাকুমা তীর্থ করিতে গিয়াছেন। কোন দূরসম্পর্কের ছোট ঠাকুমা। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হইয়াছিল এক বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হন। কাশীতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন ছোট ঠাকুমা, কিন্তু বয়স এতকম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাদের লইয়া আমি আর নীরেশ প্রচুর উৎসাহের সহিত কাশীতে দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখাইয়াছিলাম। রাজার চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছি। বাঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। বাঘটি দুই পা আগে বাড়াইয়া দিয়া একটি বিকট শব্দ করিল। উহার মুখের

ভাব হাই তোলার মতো লাগিল। নীরেশের ছোট ঠাক্‌মা 'মাগো' বলিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, বোধ হয় ভয়ে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। সম্ভবত ব্যাপারটি তাঁহার মা, বাবা বা নীরেশ কাহারও চোখে পড়ে নাই। পড়িলেও অন্তত বিসদৃশ ঠেকে নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র মুহূর্তটিকে উপলক্ষ্য করিয়া মনে মনে কত স্বপ্ন-জাল বুনিয়াছি! নীরেশের উপদেশমতো ছোট ঠাক্‌মার মাকে মাসীমা বলিলাম। কাশীতে তাঁহাদের বাসায় নীরেশের সঙ্গে গেলাম, একেবারে রান্নাঘরে যেখানে তিনি রাঁধিতেছেন। মাসীমা অতি ভাল মানুষ, কথাবার্তা বিশেষ বলিতে পারেন না। শিক্ষিত শহুরে ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে গিয়া, কী বলিতে কী বলিব কেবলই সেই ভয়। আমি রান্নাঘরে ঢুকিতেই বলিলেন, আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো।' কী ভাবিয়া এই কথা বলিলেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর খুন্তিখানি হাতে করিয়া কেমন যেন জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—মুখেএকটি অর্থহীন হাসির ভঙ্গি। ইহার পরের কয়েকদিন উঁহাদের লইয়াই আমরা ব্যস্ত রহিলাম। ছোট ঠাক্‌মার বাবার জন্য চার রকমের চারটি টর্চ কত দোকান ঘুরিয়া কিনিলাম; বাজারে বাহির হইলেই তাঁহার ঐরূপ কোনো একটি জিনিস কিনিবার কথা মনে পড়ে। গ্রাম্য অমার্জিত কথাবার্তা ভদ্রলোকের। মেয়ের অভিভাবক; জামাইয়ের অবর্তমানে সম্পত্তির দেখাশুনা তিনিই করেন। একমাত্র কন্যার বৈধব্যে বিশেষ দুঃখিত বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাঁহার দারিদ্র্যময় পূর্বজীবনের অতৃপ্ত শখগুলি মিটাইবার সুযোগ পাওয়ার, আত্মম্ভরিতা যেন কিছু বাড়িয়াছে। একমাত্র ভয় করেন মেয়েকে।...কাশীতে ছোট ঠাক্‌মার মা'র অসুখ করিল। অসুখের সময় তাঁহার বাতিক হইল, আমার হাত ছাড়া আর কাহারও হাতের ঔষধ খাইবেন না। প্রত্যহ বিশ্বনাথের মন্দিরের পান্ডার বাড়ি হইতে ডাব লইয়া যাইতাম—রোগীর জন্য। বাড়িতে ঢুকিতেই, ছোট ঠাক্‌মা বলিতেন, 'এই যে সন্ন্যাসীঠাকুর এসেছেন। এতক্ষণে মা'র নিশ্চিন্দি।' তখন আমার মনে কেমন একটা কৃচ্ছ্রসাধনের শখ জাগিয়াছে। আমি তখন বাবরি চুল রাখি। গোঁফদাড়ি উঠিয়াছে কিন্তু কামাইতে আরম্ভ করি নাই। সেই জন্য ছোট ঠাক্‌মা আমাকে সন্ন্যাসী-ঠাকুর বলিলেন। তাঁহার কথা মনে পড়িলেই তাঁহাকে দেখি—নীলাম্বরী শাড়ি পরনে, হাতে বোম্বাইবেঁকী চুড়ি, গলায় মোটা চেন হার—বোধ হয় তাঁহার মা প্রাণে ধরিয়া তাঁহার একমাত্র মেয়েকে বৈধব্যবশে লইতে দেন নাই। গায়ের রঙ কালো এবং তাহার সহিত চিড়িতন পাড় নীলাম্বরী শাড়ি একেবারে মানায় নাই। নেহাত সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থবাড়ির মেয়ে—ছোট ঠাক্‌মা। বলিবার মতো রূপগুণ তাঁহার ছিল না। কিন্তু আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাঁহার রূপের স্নিগ্ধতা, সম্পূর্ণ আপন করিয়া লওয়া ব্যবহার আর কথাবার্তার আন্তরিকতা। তাঁহারা যেদিন দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন,—আমি, নীরেশ তাঁহাদের ট্রেনে উঠাইয়া দিতে গিয়াছি। নীরেশ আর ছোট ঠাক্‌মার বাবা পানওয়ালার নিকট হইলে, শেষ মুহূর্তের মনে পড়া, কিছু ভাল কাশীর জর্দা কিনিতে গিয়াছেন। আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া—হাত দুইটি গাড়ির জানালার উপর। জানালার সম্মুখে বসিয়া ছোট ঠাক্‌মা আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া। তাঁহার দুইচোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিতেছি না। আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, 'সন্ন্যাসীঠাকুর, আমাদের ওখানে একবার যেয়ো।' তাঁহাকে কথা দিয়াছিলাম। অনেক দিন পর্যন্ত ইচ্ছাও ছিল যে কথা রাখিব। ছোট ঠাক্‌মারা চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন সব খালি খালি বোধ হইয়াছিল—কোনো কিছুতেই মন বসে না—ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি মুখ সর্বদাই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। চিঠির

প্রত্যাশায় পোস্ট-অফিস পর্যন্ত গিয়া হাজির হইতাম।…

তাহার পর সেই নীলাম্বরী শাড়ি, সেই বোম্বাইবেঁকী চুড়ি কবে স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে মনের অজ্ঞাতে। চার পাঁচ বৎসর পূর্বে পুরাতন চিঠির গোছা পুড়াইয়া ফেলিবার সময় একখানি নীল রঙ-এর কাগজে লেখা চিঠির দুইছত্র পড়িয়া তাহার অমার্জিত ভাব বড়ই দৃষ্টিকটু লাগিয়াছিল।—'সন্ন্যাসীঠাকুর, বিয়ের ভোজে ফাঁকি দিও না আমাকে; ভোজের জন্য আমি পেট চাঁচিয়া বসিয়া আছি।' 'পেট চাঁচিয়া' কথাটি বড়ই সুরুচির দৈন্যের পরিচায়ক। চিঠিতে এরূপ ধরনের কথা লেখা যায় একথা ভাবিয়াই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যে মন ভরিয়া যায়।…

খট্ খট্ খট্। ভারী মিলিটারি বুটের শব্দ হইতেছে শানবাঁধানো আঙিনার উপর। তিনটি নূতন সিপাহী আসিল। পূর্বের ওয়ার্ডারের নিকট হইতে চার্জ বুঝিয়া লইয়া ঘরের তালা ঠিক আছে কিনা দেখিল। কোনো সেলের সম্মুখে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া চ্যাঁচামেচি করিল না। বুঝিলাম সেলের কোনো আসামীই এখনও ঘুমায় নাই। ঘুমাইয়া পড়িলে ওয়ার্ডার নিশ্চয়ই ডাকিয়া তুলিত। যখন চার্জ বদল হয়, তখন নূতন ওয়ার্ডার প্রতি সেলের আসামীকে ডাকিয়া তুলিয়া দেখে যে, সে জীবিত আছে কি না! যদি কেহ সেলের দরজার কাছে বসিয়া থাকে কিংবা কাশিয়া বা কোনো উপায়ে সাড়া দিয়া বুঝাইয়া দেয় যে সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে, তাহা হইলে আর তাহাকে ডাকে না। কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। সেলের আসামী—তাহার আবার একটানা দুই ঘণ্টার অধিক প্রগাঢ় নিদ্রার প্রয়োজন কি? কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'এহি রুল হ্যায় বাবু।' যদি কেহ অজ্ঞান হইয়া গিয়া থাকে, বা অসুখ হইয়া গিয়ে থাকে, বা অসুখে হইয়া বাক-শক্তি রহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা না ডাকিলে জানিতে পারিব কী করিয়া, 'ডাকদার' কে খবর দিব কেমন করিয়া?' সত্য কথা বলিতে কি, ইহাতে সেলের কয়েদীদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। মশা, ছারপোকা, পিঁপড়া, দিবারাত্র কর্মহীনতা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা কারণে, স্বাভাবিক কর্মজীবনের গভীর নিদ্রা সেলের বাসিন্দাদের নাই।…

দশ নম্বর সেল হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

'শহীদোঁ কে টোলী নিকলী…'

টোলী কথাটি শুনিলেই পাটনা ক্যাম্প জেলের ১৯৩২ সালের 'সেবাদল' ট্রেনিং-এর কথা মনে পড়ে। আমি আর নীলু দুই জনেই 'সেবাদল ট্রেনিং লইব বলিয়া ঠিক করিলাম। প্রথম দিন 'কবায়ৎ' ( drill ) শেষ হইলেই, নীলু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'টোলী কী রে?' আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে কয়েকজন 'সিপাহী' মিলিয়া একটি 'টোলী' হয়। 'সিপাহী' মানে হচ্ছে 'প্রাইভেট' আর 'টোলীনায়ক' হচ্ছে এন. সি. ও.। নীলু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, 'ওসব তো আজকে টেণ্ডুলকার ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি 'টোলী' কথাটা এরা পছন্দ করল কেন? আর কোনো কথা পেল না!' 'টোলী' এই বলিয়া কী হাসি! সেই দিনই বিকাল বেলায় টেণ্ডুলকার যখন 'কদম খোল' ( Stand-at-ease ) আর 'সাবধান' ( Attention )এর অর্থ বুঝাইতেছিল, নীলু একেবারে ড্রিলের মধ্যে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল। টেণ্ডুলকার তো চটিয়া আগুন। সে হুবলুতে হরদিকারের ক্যাম্পে ট্রেনিং লইয়াছে, বোম্বাই এ ক্যাম্প চালাইয়াছে; প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির বিশেষ অনুরোধে সে মহারাষ্ট্র ছাড়িয়া বিহারে সেবাদলের কাজ করিতে আসিয়াছে। সেবাদল ট্রেনিং সম্বন্ধে তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতা, কিন্তু ড্রিলের সময় এরূপ ডিসিপ্লিনের অভাব সে পূর্বে কখনও

দেখে নাই। সে ভাল হিন্দী বলিতে পারে না। রাগে তাহার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। 'তোমকো এহি লকড়ী মিলেগা' বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া নীলুকে একটি গুঁতা মারিল। নীলু তাহার হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া বলিতেছে, 'লকড়ী মিলেগা! উসব মহারাষ্ট্রমে কিজিও, য়হাঁ উসব নহী চলেগা। রাষ্ট্রভাষা বোলনে নহী আতা হ্যায়। পুণা শহরকো পঁড়ে বালতা হ্যায়। আওর হিন্দীমে বাত বোলনেকো সওখ হ্যায়।' নীলু টেন্ডুলকারের হাত ধরিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিক হইতে সকলে গিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই এই খবর জেলের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ক্যাম্পজেলে তখন প্রায় সাড়ে চার হাজার রাজবন্দী থাকে। যে ওয়ার্ডে যাও, সকল স্থানেই ছোট ছোট দল এই বিষয়ই আলোচনা করিতেছে। জেলের প্রতি কোণে, আকাশে বাতাসে সজীব গুঞ্জনধ্বনি। জেলের কেন্দ্র—যাহার নাম আমরা দিয়াছিলাম 'চওক'—সেখানে বেশ কয়েকটি বড় দল জটলা পাকাইতেছে। ওয়ার্ডাররা সুদ্ধ রাজবন্দীদের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের জেলের পলিটিক্সে উৎসাহ কম নয়। একজন বক্তৃতা দিয়া আসল পরিস্থিতি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন,—বিহারের সুনামে কলঙ্ক পড়িবে ; বাহিরের লোক টেন্ডুলকার। তাহার প্রতি অতিথি সৎকার কি এমন করিয়াই করা হইল! তাহার উপর রাষ্ট্রভাষা লইয়া উপহাস! তাহার পর নিকটস্থ শ্রোতাদের বিশ্বাসের পাত্র বিবেচনা করিয়া যেন একটি গুপ্তকথা বলিতেছে, এই ভাব দেখাইয়া গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন—'বাঙ্গালী কিনা।' তাহার পর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি আনিয়া তাহার দ্বারা ব্যক্ত করিতে চাহিলেন, 'তোমরা তো সব জানাই! তোমাদের কি আর বুঝিয়ে দিতে হবে।' লজ্জায় অপমানে আমার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। ইহারা নীলুর মনের ভাব জানে না। তাহারা ব্যবহারের একটি মনগড়া অর্থ করিয়া লইয়াছে। এই অর্থটি তাহাদের বেশ মনের মতো হইয়াছে। সন্ধ্যার পর ওয়ার্ডে নীলুর সহিত দেখা, খাইবার সময়। সূর্যাস্তের পূর্বেই খাওয়া হইয়া যায়। সে সময় ক্ষুধা হয় না বলিয়া আমরা রুটি লইয়া ওয়ার্ডে রাখি। পরে একটু অধিক রাত্রে খাই। নীলু নিজেই কথা পাড়িয়া আমার সংকোচ ভাঙিয়া দিল। বিকালের ঘটনায় আমি লজ্জিত হইয়াছিলাম ; নীলু কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় নাই।…সে বলিয়া ছলিয়াছে—'এই সমস্ত ড্রিলের অর্ডারগুলো ইংরেজিতে রাখলে কী ক্ষতি হত। কুইকমার্চ, স্টান্ড-এট-ইজ বললে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া কি দুর্ঘট হয়ে যেত নাকি? হিন্দী জানেন না, আবার হিন্দী বলা চাই। ম্যানার্স্ জানে না। ছোটলোক। ওকে আবার খাতির কিসের?' কোনো বিষয়ে অযাচিত উপদেশ আমি নীলুকে কোনো দিনই দিই নাই। এখনও হয়তো আমি কোনো কথা বলিতাম না, যদি ও নিজেই কথাটি না পাড়িত। অন্যান্য রাজবন্দীরা নীলুর আচরণের কী কদর্থ করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলাম। নীলু চটিয়াগেল—বলিতেলাগিল, 'এরা আবার স্বরাজ নেবেন!' তাহার পর অনর্গল কত কী বলিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম সব রাগ গিয়া পড়িল কোনো অজ্ঞাত সাথীর উপর, যে তাহার গুড় চুরি করিয়া খাইয়াছে। রবিবারের দিন যে সকল রাজবন্দী 'এতোয়ার' করেতাহারা ভাতের বদলে গুড় রুটি বা ছয় পয়সার ফল খাইতে পায়। রবিবার দিন আমার ভাত আমরা দুজন মিলিয়া খাই। আর এই অসুবিধাটুকু স্বীকার করিয়া, আমরা সারা সপ্তাহ একটু একটু করিয়া গুড় খাই। সেই গুড় চুরি গিয়াছে। কাজেই নীলুর মন তিক্ত হইয়া যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমার খারাপ লাগিল, নীলুর চিৎকার করিয়া সকলকে শুনাইয়া রাজবন্দীদের উপর কটু মন্তব্য করা,—বিশেষত যখন

আবহাওয়া ইহার পক্ষে অনুকূল নয়। সারা পৃথিবী নীলুর বিরুদ্ধে যাক—নীলু কখনও নিজের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না। একবার সে মত স্থির করিয়া ফেলিলে আর কেহই তাহাকে টলাইতে পারিবে না। আমি সব সময়ে ভয় করি, এই বুঝি নীলু কোনো একটি কান্ড করিয়া বসে। জেলের রাজবন্দীদের সময় কাটাইবার খোরাক চাই। যে অসীম কর্মপ্রেরণা জেলের বাহিরে থাকিতে তাহাদের সর্বদা চালিত করিয়া বেড়ায়, তাহারই তৃপ্তির জন্য তাহাদের জেলের মধ্যে নানাপ্রকার জটলা, দলাদলি ও পলিটিক্সের অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু নিত্যনূতন প্রোগ্রাম না পাইলে মন বসিবে কেন? এইজন্য নীলুর ব্যাপার সেবার বেশিদূর গড়াইল না। পরের দিন সকালেই জলখাবার বিতরণের সময় কে যেন কথা উঠাইল যে, প্রত্যহ ভিজাছোলা জলখাবার দেয়; ইহার পরিবর্তে যদি চিড়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।…সঙ্গে সঙ্গে ছড়া বাঁধা হইল 'চেনা-কা[১] বদ্‌লে চূড়া লেঙ্গে'; জেলসুদ্ধ লোক সমস্বরে এই চিৎকার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে থালা ও গেলাস বাজানো হইতেছে। কেহ শিস্‌ দিতেছে; কেহবা দরজার গরাদগুলির উপর দিয়া নিজের থালাখানি হড়হড় করিয়া টানিয়া যাইতেছে। তাহাতে একটি বিকট শব্দ হইতেছে। অনেকে জানলার উপর উঠিয়াছে। দুইজন জানালা বাহির টিনের ছাদের উপর উঠিল। হঠাৎ যেন কোনো যাদুদন্ডের স্পর্শে সকলে একসঙ্গে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদের অতি ধীর ও গম্ভীর বলিয়া জানিতাম, তাহারাও দেখি উৎসাহের আতিশয্যে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিতেছে না। কয়েকজন পাগলের মতো ওয়ার্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 'কম্বল' 'কম্বল' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে দৌড়াইতেছে। তাহাদের কথায় অনেকে একটি নূতন প্রোগ্রাম পাইল। রাশি রাশি কম্বল দেখিতে দেখিতে কয়েকজন বাহিরে আনিয়া ফেলিল। কম্বলগুলি টুকরো টুকরো করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। একজন রান্নাঘর (জেলের স্থানীয় ভাষায় 'ভাঠহা') হইতে এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লা লইয়া আসিয়া খানকয়েক কম্বলের উপর ফেলিল। তাহা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া ও উৎকট গন্ধ বাহির হইতেছে। দুইজন দৌড়াইয়া গিয়া, যে লোহার পাত্রটিতে ভিজা ছোলা রাখা ছিল, তাহা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। নিকটস্থ ওয়ার্ডার 'পাগলী' (alarm) হুইসল্‌ বাজাইতেছে। একটানা হুইস্‌ল্‌ সে বাজাইয়া চলিয়াছে। ইহা শুনিয়া, জেলের সর্বত্র, যেখানে যে ওয়ার্ডার আছে, সকলেই বাঁশি বাজাইতেছে। ফুটবল রেফারিদের সহিত এন্‌জিন ড্রাইভারদের যেন হুইসেলের ঐকতান প্রতিযোগিতা হইতেছে। অগণিত বাঁশির তীব্র শব্দ জেলের আবহাওয়াকে একটি নূতন রূপ দিয়াছে। গুমটি হইতে একখানা ঘন্টা বাজিয়া চলিয়াছে—ঢং ঢং ঢং ঢং…। জেল-গেটে আর একটি ঐরূপ ঘন্টা বাজিতেছে। একেবারে বইয়েপড়া জাহাজডুবির দৃশ্য! অরেএদিকে তুমুল কোলাহল 'কম্বল জ্বলতে রহে,' 'থারিয়া বাজাতে রহে' 'নৌকর-শাহী নাশ হো'—আরও কতকী যাহা ঠিক স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। জেল-কর্মচারী যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। গুমটিতে একটি সাইনবোর্ড টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে 'ওয়ার্ড নম্বর ১৭—১৮—১৯।' লাঠি লইয়া গেট হইতে ওয়ার্ডাররা আসিতেছে গুমটির দিকে। অনেকেরই উর্দি নাই, খালি গা, খালি পা। হরেনবাবু জেল-ডাক্তার একটি গেঞ্জি গায়ে দিয়া আসিয়াছেন। গুমটি হইতে একটি ওয়ার্ডার চিৎকার করিয়া বলিয়া চলিয়াছে—'সতরহ, আঠারহ, উনইশ নম্বর।' আর সকলে ঐ ওয়ার্ড

১ ছোলার।

গুমটির দিকে দৌড়াইতেছে। হঠাৎ গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল 'মিলিটারি আ রহী হ্যায়।' বন্দুক হাতে একদল মিলিটারি জেল-গেট দিয়া ভিতরে ঢুকিল। ইহাদের হাবভাবে ব্যস্ততা নাই। কুইকমার্চ করিয়া তাহারা গুমটির নিকট আসিল, পরে তিনটি ওয়াডের কমনগেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।—ওয়ার্ডের কোণে রাখা ছিল একরাশি বেল। আগের দিন ওয়ার্ডের বেলগাছটা কাটা হয়েছিল। সকলে গাছের উপর চড়িয়া 'গান্ধীজীকা জয়' বলিত, কংগ্রেস-পতাকা টাঙাইয়া দিত। জেলের বাহিরে বহুদূর হইতে ইহা দেখা যাইত। সেইজন্য এই গাছটি কাটিয়া ফেলিবার হুকুম হইয়াছিল। প্রথমেই চারজন ওয়ার্ডার আসিয়া এই বেলগুলি ঘিরিয়া দাঁড়াইল—যাহাতে লাঠি চার্জের সময়ে, কয়েদীরা ঐগুলি ওয়ার্ডারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করিতে পারে। মিলিটারিগুলি ওয়ার্ডটিকে ঘিরিয়া ফেলিল! তাহার পর একদল ওয়ার্ডার তাহাদের সঙ্গে জনকয়েক 'মেট' ( convict overseer ) এবং কয়েকজন জেল-কর্মচারী ওয়ার্ডের ভিতর ঢুকিল। তাহার পরই আরম্ভ হইল লাঠি চার্জ—সরকারী ভাষায় মৃদু লাঠি চার্জ। ইহাতে দোষী নির্দোষের বিচার নাই—যাহারা নির্বিরোধ ও শান্তিপ্রিয় তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশি প্রহার খায়। মারিবার সময় সিপাহীরা মুখ দিয়া কেমন যেন একটি শব্দ করিতেছে। 'উধার কই একঠো ভাগা।' ইস বদমাসকো মারো।' ওয়ার্ডারেরা চিৎকার করিতেছে। 'মেট'দের উৎসাহের অন্ত নাই। অফিসারেরা যেদিকে দাঁড়াইয়া আছে, সেইদিনকার কয়েদীদের কিছুতেই নিস্তার নাই—কারণ ওয়ার্ডাররা, তাসাদের কর্মনৈপুণ্য উপরওয়ালার নিকট দেখাইতে ব্যগ্র। কতকগুলি লোক পড়িয়া গিয়াছে, মাথায় চোট লাগিবার পর বসিয়া পড়িল। দ্বারভাঙ্গার একজন নিরীহ রাজবন্দী জপ করিতেছিল। সেও নিস্তার পাইল না। উহারা আমাদের দিকে আসিতেছে। বেশ নার্ভাস বোধ হইতেছে,—মার খাইব জানি; প্রতিরোধ করিতে পারিব না তাহাও জানি। কিরূপ আঘাত কপালে আছে তাহার কল্পনা করিতেছি; একটি লাঠি আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া পড়িল। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন দুই হাত দিয়া মাথা ঢাকিয়াছিলাম জানি না। বুঝিলাম যখন হাতে চোট লাগিল; লাঠির উপরের দিকে একটি লোহার আংটা লাগানো আছে, তাহা দিয়া হাত কাটিয়া গেল। আরও দুই তিনটি লাঠি এই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। আমি বসিয়া পড়িয়াছি। নীলু আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। বলিতেছে, 'আবার মাথা ঢাকো, মাথা ঢাকো।' নীলুর উপর কয়েক ঘা লাঠি পড়িল—আমার উপর আর একটি। নীলুর মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ওয়ার্ডারগণ অন্যদিকে চলিয়া গেল। একস্থানে তাহারা বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করিতে পারে না...সারা ওয়ার্ডে কেমন একটি থমথমে ভাব। কেহ কেহ শুইয়া পড়িয়া আছে। যে ভাগ্যবানেরা আহত হয় নাই তাহারা কেহ আহতদের জন্য জল আনিতেছে, কেহ অচৈতন্য সাথীর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতেছে, কেহ বা খবরের কাগজ বা গামছা দিয়া নিস্পন্দ বন্ধুকে বাতাস দিতেছে। অপেক্ষাকৃত কম আঘাত যাহাদের লাগিয়াছে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রাথমিক চিকিৎসা করিতেছে, জেল হাসপাতালের উপর নির্ভর করিলে হয়তো আজ আর উঠিবে না। যাহাদের একেবারেই কোনো প্রকারের আঘাত লাগে নাই, তাহারা আহতদের জেনারেল ইন্সপেক্সনে বাহির হইয়াছে—ঘোর কালবৈশাখীর পর যেমন লোক গ্রামের ক্ষতির পরিমাণ দেখিতে বাহির হয়। তাহার পর আসিলেন ঔষধপত্র লইয়া জেলের ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার, সঙ্গে কয়েদীরা আনিয়াছে কয়েকটি স্ট্রেচার—যাহারা অধিক আহত তাহাদের হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য।...

'বোলোরে অস্পতাল'। হাসপাতালের পাহারার গলার স্বর এখান হইতে পরিষ্কার শোনা যায়। সে লোকটা কিছু কথা না বলিয়া বাজখাঁই স্বরে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। —বোধহয় ঝিমাইতেছিল,—হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছে। এই চিৎকারে বোধহয় হাসপাতালের কোন রোগীর ঘুম হইতেছে না। সেবাশুশ্রূষা করার লোক নাই, তাহার উপর এইরূপ দিনের পর দিন নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহিত করা। এর আগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়ম করিয়াছিলেন যে, হাসপাতালের 'পাহারা'র রাত্রে গুমটির ডাকের উত্তর দিবার দরকার নাই। 'মেডিকাল গ্রাউণ্ডস্'-এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীদিগকে নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা দিতে পারেন। এই বিরাট পেষণযন্ত্রের ভিতর, এই মেডিকাল গ্রাউণ্ডস্এর রন্ধ্র পথেই কিছু আলোবাতাস ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। সহানুভূতিশীল কর্মচারীরা ইহারই অজুহাতে কয়েদীদিগকে কিছু সুখ-সুবিধা দেন। নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া পাহারার হাঁকের পুরাতন নিয়ম আবার প্রচলিত করিয়াছেন। দরদ ও সেবার জন্য লালায়িত রুগ্ন কয়েদীরা কি রোগশয্যায় শুইয়া, তাহাদের শ্রীপুরপরিজনের কথা ভাবিতেছে না? রোগ হইলেই, জেলে বাড়ির কথা বেশি করিয়া মনে হয়। সাধারণ কয়েদীরা জেলের বাহিরে থাকিবার সময় হয়তো দুই বেলা খাইতেই পাইত না। জেলে আর কিছু না হউক অন্তত দুই বেলা দুই মুঠা ভাত খাইতে পাওয়ার সম্বন্ধে কোনো অনিশ্চিয়তাই নাই। কিন্তু তাহা হইলে কী হয়,—রোগ হইলে তাহারা নিজেদের একেবারে অসহায় মনে করে। এই রুগ্ন কয়েদীরা কি শত চিন্তার মধ্যেও আজ আমার কথা একবার না ভাবিয়া থাকিতে পারিবে? সহানুভূতিতে না হউক, আতঙ্কেও তাহারা আজ আমার ফাঁসির কথা নিশ্চয়ই ভাবিতেছে,—ঠিক আমার কথা নয়, একজন অপরিচিত ফাঁসির আসামীর কথা, যে এক নম্বর সেলে আছে।...

হাসপাতালের দোতলার উপর একটি খোলা বারান্দায় টি. বি. রোগীরা থাকে। সেই স্থান হইতে ফাঁসির মঞ্চ পরিষ্কার দেখা যায়। আজ মঞ্চের চতুর্দিকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—শান্ত্রীরা মঞ্চটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে,—কী জানি আবার কেহ যদি টাকা পয়সা খরচ করিয়া, ওয়ার্ডারদের দিকে মঞ্চের কলকব্জা কাজের অযোগ্য করিয়া রাখিয়া দেয়। ঐ টি. বি. রোগীরা এই দীপালি উৎসব দেখিতেছে, আর হয়তো তাহাদের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাহারা তিলে তিলে মরিতেছে। তথাপি ফাঁসির কয়েদীর অপেক্ষা তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। তাহাদের দীর্ঘ-নিশ্বাস ও অযাচিত করুণা মাথায় লইয়া আমাকে যাইতে হইবে। আমার ফাঁসি তো তবু জেলের ভিতর একটি সাময়িক চাঞ্চল্য ও বিষাদ আনিবে। আর ইহাদের মৃত্যুর কথা তো কেহ জানিতে পারিবে না। নিকট আত্মীয়ের নিকট একখানি সার্ভিস পোস্টকার্ড পৌঁছাইবে—আর হাসপাতালের মৃত্যুর সংখ্যায় একটি বৃদ্ধি দেখানো হইবে। উহার মৃত্যুর রাত্রে, নাইট ডিউটি জেল-ডাক্তার হয়তো লেপের ভিতর হইতে বাহিরই হইবেন না। হাসপাতাল ওয়ার্ডের পাহারা কেবল রাত্রে হাঁক দিবার সময় 'জমা'র সংখ্যা হইতে হঠাৎ একটি কম সংখ্যা গণনা করিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। আর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুমটির ওয়ার্ডারকে রসিকতা করিয়া খবর দিবে 'এক আসামী একদম রিহা।'[১]

রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ শুনা যাইতেছে। বারোটা কখন বাজিয়া গেল? এই ট্রেন

১ একজন কয়েদী একেবারে ছাড়া পাইয়া গিয়াছে।

ছাড়িল। স্টেশন অনেক দূরে, তবু যেন মনে হয় প্ল্যাটফর্মের কোলাহল কানে আসিতেছে।...

যাত্রীদের হুড়াহুড়ি, 'কুলি! কুলি! ইধার!' সেই রাউতারা স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের চিৎকার 'ঘন্টা! ঘন্টা!' সিগনালের ঘন্টা দেয়।...

রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ জেলের সীমিত জগতের সহিত উন্মুক্ত উদার পৃথিবীর সংযোগের সূত্র। এত প্রাণ উদাস করা, মত উতাল করা বাঁশির স্বর কোন বৈষ্ণব কবিও কোনোদিন কল্পনা করিতে পারেন নাই। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'—আজ আর ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাসমাত্র নয়। কোন অজ্ঞাত ইথারের কম্পন মনের অবরুদ্ধ তন্ত্রীকে এত তরঙ্গিত করে? চটকলের ভোরের ভেঁপু মজুর-বস্তিতে সাময়িক আলোড়ন জাগায় বটে, কিন্তু রেলের বাঁশি আনে প্রতিটি কয়েদীর হৃদয়ে দ্রুততর স্পন্দন; প্রাণে জাগায় কত সুপ্ত মধুর স্মৃতি, রূপ দেয় কত কায়াহীন আকৃতি ও বাসনাকে।... রেলগাড়ি চলার শব্দ শুনা যাইতেছে; দূরে, কতদূরে চলিয়া যাইতেছে—আঁধারে দুই পাশের কিছু দেখা যায় না,—কেবল অনুভব করা যায় বিশালসীমাহীনতা;—কোনো প্রাচীরের বাধা নাই।

বি. এন. ডবলু. আর বদলাইয়া বোধহয় সব গাড়ির উপর লেখা হইয়াছে ও. টি আর। বি. এন. ডবলু নাম যে কোনোদিন পরিবর্তিত হইতে পারে ইহা ভাবিতেই কেমন লাগে। পৃথিবীতে দিকে দিকে কত পরিবর্তন অহরহ ঘটিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও কত জিনিসের আমরা এক স্থির অপরিবর্তিত রূপ ব্যতীত কল্পনা করিতে পারি না। বাবার দাড়ি গোঁফ কামানো মুখের কথা আমি কখনও ভাবিতে পারি না। ভাবিলেই হাসি আসে। দূর! তাহাও কি হয় নাকি?...

কেবল রেলগাড়ির শব্দ নয়, বাহিরের যে কোনো আওয়াজ, জেল কোয়ার্টাসের কুকুরের ডাকটি পর্যন্ত শুনিতে মিষ্ট লাগে।...সেদিন জেলের বাহিরের রাস্তা দিয়া একদল ছেলে 'হিপ্, হিপ্, হুররে' চিৎকার করিয়া চলিয়া গেল। বোধ হয় কোনো ম্যাচ খেলিয়া ফিরিতেছিল। কত পুরনো স্মৃতির সহিত ঐ ধ্বনির সম্বন্ধ;—ছোট ছেলেমেয়ে কত দিন দেখি নাই,—হাফপ্যান্ট-পরিহিত নয়-দশ বছরের ক্যাপ্টেন নীলু একটি চীনামাটির কাপসরার লইয়া, গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিতেছে, হিপ্, হিপ্, হুররে! গরমের পরিশ্রমে চিৎকারে মুখ লোহিতাভ।...

বেলা তিনটায় আর রাত্রি সাড়ে বারোটায় বাজে রেলগাড়ির বাঁশি। সকাল পাঁচটায় আর বিকাল সাড়ে ছয়টায় বাজে স্টীমারে ভেঁপু;—আমার ঘড়ি,—সেলের সম্মুখের ছায়া অপেক্ষাও অনেক নিশ্চিত—আমার কল্পনা বিলাসের সাথী! যখন তখন এরোপ্লেনের শব্দ শুনি। রাত্রে তো প্রতি দুই ঘন্টায় একখানি করিয়া যায়—বোধ হয় ডাক লইয়া যায় আসাম ফ্রন্টে; কিন্তু সে শব্দ মনে কোনো স্মৃতির সুবাস জাগায় না। হয়তো মুহূর্তের কৌতূহল—প্রত্যহ কোথায় যায়, রাত্রে পথ কেমন করিয়া ঠিক করে, কম্পাস ম্যাপ রেল-লাইন গঙ্গা,—এর বেশি নয়। দিনের বেলায় যেদিন অনেকগুলি এরোপ্লেন একসঙ্গে যায়—আমি সেলের মধ্য হইতে শুনি যে, নয় ও দশ নম্বরের বোমার বাবু দুইটি আমাকে খবর দিবার জন্য চিৎকার করিয়া গুণিতেছে—এক, দুই তিন, চার। কিন্তু কি জানি কেন, এরোপ্লেনের শব্দ আমার মনে কোনো সাড়া জাগায় না। আমার পরিচিত জগতের মধ্যে ইহাদের স্থান নাই; কারণ মাটির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ গৌণ। এই জন্যই বোধ হয়, কাক শালিক, চড়ুই প্রভৃতি যে পাখিগুলি জেলের ভিতর দেখিতে পাই, সেগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাত্র, মনকে উদ্‌বেলিত করিতে পারে না।

এগুলি একঘেয়েমির জীবনে পরিবর্তন আনিবার কাজ করিতে পারে, কিন্তু তার বেশী নয়। বিরহী যক্ষের মেঘদূত, বিরহিণী রাধার হংসদূত কেবল কবির কল্পনা-বিলাস, বাস্তব মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতার ছাপ উহাতে নাই।

সিপাহীজী বসিয়া ঢুলিতেছে। অতি-পরিচিত বিড়ালটি ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতেছে। বিড়ালটি থমকাইয়া দাঁড়াইল,—বোধ হয় আমি দরজার উপর বসিয়া আছি বলিয়া আসিতে সাহস পাইতেছে না। প্রত্যহ দিনে ও রাত্রে আসে থালা চাটিবার জন্য; সপ্তাহে একদিন একটু-আধটু দই পায়, অন্যদিন কী খাইতে আসে? জেলে থাকিয়া অল্প অল্প নিরামিষও খাইতে শিখিয়াছে। আশ্রমে সহদেও-এর যে কুকুরটি ছিল সেটিও দেখিতাম নিরামিষই পছন্দ করিত? এখন কুকুরটি কোথায় আছে? সহদেও-এর দাদা বোধ হয় উহাকে বাড়ি লইয়া গিয়াছে। লন্ঠনের আলোতে বিড়ালটির গায়ের রঙ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। বাঘের মতো হলদে, কালো ও ধূসর ডোরা কাটা। বেশ দেখিতে বিড়ালটি। সেদিন জেলার সাহেব রসিকতা করিলেন—'কী, বিড়ালটির সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছেন নাকি? কী নাম দিয়াছেন?' আমি জবাব দিই —'না এমনি এসেছে।' 'তাহলে এর নাম দিন 'তোজা'।' তাহার পর নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠেন। জেলর-সাহেবের দাঁতগুলি মুক্তার মতো সাদা—টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের দাঁতের মতো।…

আমি উঠিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম, বিড়ালটিকে পথ দিবার জন্য! বিড়ালটি একবার ডাকিল—এখনও আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ভাতের থালা হইতে একটু তরকারি উঠাইয়া লইলাম—ধোঁদলের তরকারি। বিড়ালে ধোঁদল খায় নাকি? এক টুকরা ছুড়িয়া বিড়ালকে লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। বিড়ালটি 'মেও' করিয়া পালাইল। ধোঁদলের টুকরাটি কিন্তু গরাদে লাগিয়া গিয়াছে, দরজার বাহিরে যায় নাই।…

আমি আর নীলু কমলালেবু খাইতেছি—আশ্রমে মা'র ঘরে তক্তাপোশের উপর বসিয়া। দুইজনের ভিতর প্রতিযোগিতা চলিতেছে, কমলালেবুর ছিবড়া জানালার গরাদের ভিতর দিয়া বাহিরে ফেলিতে হইবে, গরাদে যেন না লাগে। কিন্তু কী আশ্চর্য। অধিকাংশই গরাদে লাগিয়া যাইতেছে। কয়টাই বা গরাদে লোহা, আর কতটুকু জায়গাই বা উহা ঢাকিয়া আছে; কিন্তু তথাপি ছিবড়ার অধিকাংশ উহাতেই লাগিবে।…

…ঘুরিয়া ফিরিয়া কেন নীলুর কথাই বার বার মনে পড়ে? যে জিনিস ভুলিতে চাহিতেছি তাহারাই জন্য নয় তো? জ্ঞানত যে কথা আজ কতদিন হইতে মনে মনে বলিতেছি, এ কথা কি আমার অজ্ঞাতমন কিছুতেই লইতে পারিতেছে না? সত্যই, আমি জানি যে নীলু আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া নিজের কর্তব্য করিয়াছে। কোনো আত্মসম্মানশীল, সত্যনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীর ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ইহা হইল যুক্তির কথা। সুপ্ত চেতনা হয়তো ভাবে যে এ যুক্তি কোর্টে চলিতে পারে, বই-এ ছাপার কালিতে ইহা দেখিতে ভাল, কিন্তু অন্যত্র ইহার স্থান নাই। তাহা না হইলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীলুর কথাই মনে হইবে কেন? নিজের পার্টির প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য সহোদর ভাইয়ের ফাঁসির পথ সুগম করিয়া দেওয়া হৃদয়ের সততার প্রমাণ, না রুগ্ন মনের শুচিবাইয়ের পরিচয়? বোধ হয় নীলুর ব্যবহার আমার ভিতরের আসল আমি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছি না; তাই উপরের আমি পুরাতন স্মৃতির মধু দিয়া সেই দহনের জ্বালা স্নিগ্ধ করিতেছি।

আবার আসিয়া দরজার সম্মুখে বসি; এবার বাঁ দিকে ভর দিয়া—বাম হাত দিয়া

গরাদ ধরিয়া। ডান দিকে ভর দিয়া, ডান হাত দিয়া গরাদ ধরিয়া বসিয়া যেরূপ স্বাভাবিক ও স্বস্তিকর মনে হয়, বাঁ দিকে ভর দিয়া বসিলে সেরূপ মনে হয় না। ঠিক নিচু জায়গাটির উপর বসিয়াছি। খুব বড় বুড়ো হাতির ঘাড়ের উপর, ঠিক মাহুতের পিছনে বসিয়াছি মনে হইতেছে। এমন সব উদ্ভট কল্পনা মাথায় আসে! উদ্ভট আবার কিসে হইল?

....সেই কারহাগোলার ধনী গৃহস্থ ধনপৎ যাদবের গ্রামে গিয়াছিলাম। পুলিসের ধারণা তাহার ডাকাতের দল আছে, তাহার উপর বি. এল. কেস চলিবে। তখন কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময়। সে আমাদের লইয়া গিয়াছে নিজের গ্রামে, মিটিং করিবার জন্য। উদ্দেশ্য দারোগাকে ভয় দেখানো;—দারোগা যাহাতে ভাবে যে সে কংগ্রেসের লোক। খুব ঘটা করিয়া মিটিং হইল। সে খাওয়া-দাওয়ার পর বলিল, চলুন শিকারের আয়োজন করিয়াছি। বাবলা ও ক্যায়া গোলাপের জঙ্গলের দিকে হাতির পিঠে চলিয়াছি। আমি ঠিক মাহুতের পিছনে; বুড়ো হাতি—ঘাড়ের কাছটি একটি বেশ বড় গর্তের মতো হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বেশ আরাম করিয়া পদ্মাসনে বসিয়াছি। জঙ্গল আরম্ভ হইল। সেখান হইতে কিছুদূর আগে গিয়াছি। সম্মুখে একটি প্রকান্ড অশ্বত্থ গাছ। হঠাৎ হাতিটির অশ্বত্থ পাতা খাইবার খেয়াল হইল। শুঁড়টি তুলিয়া একটি ছোট শাখা ভাঙিবার চেষ্টা করিল। নিমেষে কী যেন হইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল যেন আমাকে জাঁতার মধ্যে ফেলিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। যে গহ্বরের মধ্যে বসিয়াছিলেন, হাতিটি মাথা উঁচু করায় তাহা সংকুচিত হইয়া আমার নিম্নাঙ্গ চাপিয়া ধরিয়াছে। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিলাম। মাহুত বুঝিতে পারিয়া হাতির শুঁড়টি নামাইয়া দিল। আমি নামিয়া পড়িলাম—পায়ের দিকটা অবশের মতো হইয়া গিয়াছে।...

আমার সেলের ওয়ার্ডার দেওয়ালে হেলান দিয়া ঘুমাইতেছে। পাগড়িটি খুলিয়া পাশে রাখিয়াছে! তিন নম্বর সেলের ওয়ার্ডারও বোধহয় ঘুমাইতেছে। আর বাহিরে এই ওয়ার্ডের ওয়ার্ডারের পদশব্দ শোনা যাইতেছে। সেলগুলি শান্ত। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাগলটিও কি আজ ঘুমাইয়া পড়িল? বোমার বাবুরা বোধ হয় আলো জ্বালিয়া পড়িতেছে। ঝিঁঝির ডাক শুনা যাইতেছে। কিন্তু আশ্রমের ঝিঁঝির ডাকের মতো ঐকতান অত সজীব নয়। শীতের রাত্রে ছোটবেলায় ঘুম ভাঙিলে, ঝিঁঝির ডাক যে রহস্যের রংমহল খুলিয়া দিত, এ ডাক সেরূপ প্রাণবন্ত নয়। নীলু বলিত যে, উহা এক রকম পিঁপড়ার ডাক। কে উহার সহিত তর্ক করিবে? জেলের আবহাওয়ার সহিত ঝিঁঝির ডাক যেন খাপ খায় না। রুটিন, সংখ্যা গণনা, শৃঙ্খল, প্রাচীর, নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এই বিলাসের স্থান কোথায়? কিন্তু দেওয়াল আর গরাদ দিয়া কি সব জিনিস আটকানো যায়?

হুড়মুড় করিয়া নূতন দলের ওয়ার্ডারগণ ঢুকিল। তাহা হইলে একটা বাজিল। নিশ্চয়ই উহারা তিনজন—একজন আমার সেলের, একজন তিন নম্বর সেলের, আর একজন ওয়ার্ডের। একজন আমার সেলের আঙিনায় ঢুকল। সে নিদ্রিত ওয়ার্ডের পাগড়িটি উঠাইয়া আস্তে আস্তে বাহিরে রাখিয়া আসিল। তাহার পর ওয়ার্ডারি ডাকিল, 'এ হায়দার, আজ কি এখানেই ঘুমাবে নাকি?' সে ধড়মড় করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছে,—জেলরসাহেব আসেন নাই তো! নাঃ! কে কিসুনচন্দ? নয়া দফা আসিয়া গিয়াছে? এ ভাই, দিল্লগী করিও না। পাগড়িটি কোথায় রাখিয়াছে বলো। নূতন সিপাহী বলে, আমি কী জানি? বা রে বা! আমি তো এই আসিতেছি।

হায়দার প্রথমে বিশ্বাস করে না—পরে আতঙ্কে তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যায়। সে সবে নূতন চাকরিতে পাকা হইয়াছে। চাকরিতে ঢুকিয়াই গল্প শুনিয়াছে, জেলরসাহেব রাউণ্ডে আসিয়া নিদ্রিত সিপাহী দেখিলে—তাহাকে তখন কিছু বলেন না—কেবল তাহার পাগড়িটি সরাইয়া রাখেন, পরে তাহার জরিমানা হয়। এই তো গত সপ্তাহে হরেকিষুন। ওয়ার্ডারের 'তক্‌দীরে'[1] এরূপ ঘটিলে, সে 'কাপড়া গুদামের, ইনচার্জ' কয়েদী বির্জবিলাসকে দেড় টাকা দিয়া একটি পাগড়ি যোগাড় করিয়াছিল। জেলরসাহেব পরের দিন প্যারেডের সময় তাহার পাগড়ি দেখিয়া, এ পাগড়ি কোথায় পাইয়াছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে হরেকিষুন 'সাফ ইন্‌কার গিয়া'[2]। তাহার পর সে জেলরসাহেবের জেরায় সব কথা বলিয়া দেয়। মাঝের থেকে সে নিজে একা গেল না; বির্জবিলাসকেও সঙ্গে সঙ্গে 'লিয়ে দিয়ে সাফ'[3]। কিসুনচন্দ্র মুখভঙ্গির সহিত একটি তুড়ি দিয়া তাহার গল্প শেষ করিল। হায়দার এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে। সে খোশামোদ করিয়া পাগড়িটি ফেরত চায়। ঘরমুখো অপর দুইটি ওয়ার্ডারও আমার সেলের সম্মুখে আসিয়া জড়ো হয়। হায়দার পাগড়ি ফেরত পাইল, সকলে মিলিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিল, কাল দুপুরে হায়দারের আপার ডিভিশন রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে ডিউটি থাকিবে; সেখান হইতে একগ্লাস দুধ কাল সে কিসুনচন্দ্রকে খাওয়াইবে। হাসিতে হাসিতে সকলে বাহিয় হইয়া যায়।

ইহাদের এই কর্মক্লান্ত জীবনের মধ্যেও সুখ আছে,—নিশ্চিত বেতন, স্ত্রী-পুত্র পরিবার।······টুর হইতে ফিরিয়াছি। সরস্বতীর সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া, হাসি হাসি মুখ—সলজ্জ উৎকন্ঠার সহিত বলে, 'বোসো, একটু চা করে নিয়ে আসি।' আমি উত্তর দিই না। হাসিতে হাসিতে তাহার পিছনে পিছনে গিয়া রান্নাঘরে পিঁড়ি পাতিয়া বসি। ভিজা কাঠে ফুঁ দিয়া আগুন ধরাইবার চেষ্টায় আরক্তিম ও ঘর্মাক্ত মুখমন্ডল একরাশ অসংবৃত চুলে ঢাকিয়া গিয়াছে।—হইতেপারিত···

কিন্তু আমার জীবনে কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শে গড়িয়া তোলা; আর যদি আমার মনের বাসনা অন্যরূপও হইত, তাহা হইলেই কি উপায় ছিল। চিরকাল পাড়া-প্রতিবেশি সকলের মুখে শুনিয়াছি, 'বিলুর মত ছেলে দেখা যায় না।' আর এই প্রশংসা বজায় রাখিবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির পথ হইতে আমাকে কখনই বিচ্যুত হইতে দেয় নাই। মনের কত দুর্নিবার বাসনাকে কশাঘাতে সংযত করিয়াছি। কিন্তু আমার ভাবধারার sublimation হইয়া কি আমি কোনো উচ্চতর স্তরে পেঁীছিয়াছি? না, তাহা হইলে আজ মনে এ সংশয় জাগিবে কেন? কত প্রকারের ভোগের আকাঙ্ক্ষা কেন মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারিবে?···কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না। ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। কেবল ফুটবল ম্যাচের টিকিট-ক্রয়ার্থীদের ন্যায় দেশসেবকদের অন্তহীন বিসর্পিল লাইনে নিজের স্থান করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম মাত্র। আমার কথা আমার প্রতিবেশীরাও বোধ হয় আগামী সপ্তাহে ভুলিয়া যাইবে—এখনই মনে আছে কি না কে জানে। তবে এতদিন কী করিলাম? আমি তো অতিমানব নই; অতিসাধারণ রক্তমাংসের মানুষ—মানুষের সকল দোষ ভ্রান্তি দুর্বলতা আমার মধ্যে। কীট্‌স্‌ পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন—শেলী ত্রিশ বৎসর। পিট্‌ তেইশ বৎসর বয়সে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর আমি তেত্রিশ বৎসর বয়সে কুকুর বিড়ালের মত মরিব। কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না, কেহ দু-ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ফেলিবে না,

১ ভাগ্য ২ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ৩ ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন।

যাহা কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এ নিষ্ফল প্রয়াসের কোনোই মূল্য নাই। কবি যতই ছন্দ গাঁথুন যে, কিছুই পৃথিবীতে ব্যর্থ হয় না, যে নদী মরু পথে ধারা হারায় সেও সার্থক—এ সকল কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। যে কবির ব্যর্থতার অনুভব নাই, ইহা তাঁহারই ভাব-বিলাস।

না, হয়তো ইহা সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। আমার ন্যায় দুই-চারটি জীবনের মূল্য কী? যাহা দেখিয়াছি—জনশক্তির প্রকৃতি স্বরূপ—গত আগষ্ট মাসে যাহা দেখিয়াছি যুগযুগ সঞ্চিত জগদ্দল পাথরের নীচে যে সুপ্ত শক্তির সন্ধান পাইয়াছি—তাহা সচেতন হইলে কী যে করিতে পারে, তাহার পূর্বস্বাদ লোককে বুঝাইতে আমার দান নগণ্য নয়। রাজনৈতিক কর্মীর পথ বড় কঠিন, বন্ধুর। 'তখৎ ইয়া তখ্‌তা' (সিংহাসন অথবা ফাঁসির মঞ্চ)—আশা রাখিবে ফাঁসির রজ্জুর, হয়তো গৌরবের রাজমুকুট পাইতে পারো। অপার ক্লেশের জীবন। দিন দিন তিলে তিলে নিজের জীবনীশক্তি, উৎসাহ ক্ষয় হইয়া যাইতে দেখিবে। নিজের মনের তৃপ্তি ছাড়া, আর কিছুর আশা রাখিলে নিরাশ হইতে হইবে। পুঞ্জীভূত তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতার ভারে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবে। একপদ অগ্রসর হইতে যাও—একশত লোকের স্বার্থে আঘাত লাগিবে—প্রত্যেকে হইয়া দাঁড়াইবে তোমার শত্রু। একজন লোকের সম্মান আকর্ষণ করিতে পারো, কিন্তু পদে পদে অনুভব করিবে যে তুমি দশজন লোকের উপেক্ষা ও উপহাসের পাত্র। এ জীবন হইতে জেলে আসিতে পারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা—মৃত্যুদণ্ডও শাপে বর। কত লোক তো যুদ্ধে মরিতেছে, বিনা অপরাধে। কেন, তাহা তাহারা বোঝে না। কত লোক অনাহারে মরিতেছে, বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে। অপরাধ—যে জন্মের উপর তাহার কোনো হাত ছিল না, তাহারই অমোঘ নির্দেশ। পথে গাড়ি চাপা পড়িয়া মরার মতো, মাঠে সাপে কামড়াইয়া মরার মতো রাজনীতি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডও একটি সামান্য আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। তাহার বেশি কিছু নয়। দলের বাহিরে পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষ। কত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহিত সংঘর্ষ! তাহার জন্য তো সকল রাজনৈতিক কর্মী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ভিতরে?—ভিতরে সংঘর্ষ আরও ভয়ানক। উপদলে উপদলে সংঘর্ষ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, প্রদেশে প্রদেশে সংঘর্ষ;—প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এ সবই রাজনীতি খেলার নিয়মের মধ্যে,—নিষ্ঠুর নিষ্করুণ নিয়ম; দুর্বলের স্থান এখানে নাই। সবাই আগে চলিয়াছে; পিছনের লোকে পড়িল কি মরিল, তাহা ফিরিয়া দেখিবার দরকার নাই।

'বাবু, খুব মশা কামড়াইতেছে নাকি? ওয়ার্ডার জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, কেন?'

'একটু মিট্টিকা তেল (কেরাসিন তেল) 'বদনমে' (শরীরে) লাগাইয়া লউন না কেন? সরিষার তেল এখন তো পাওয়া যাইবে না—না হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।'

'আচ্ছা দাও।'

আর ভাবি যে সরিষার তেল না পাওয়া যাওয়াই ভাল। সেদিন সরিষার তেল লাগাইয়া শুইয়াছিলাম। ঘুম ভাঙিয়া দেখি অসংখ্য পিঁপড়াতে সর্বশরীর ভরিয়া গিয়াছে। ছোট লাল পিঁপড়াগুলি বোধহয় তেল খাইতে ভালবাসে। ওয়ার্ডার লণ্ঠনের কাগজের ছিপিটি খুলিয়া, তাহারই খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া একটি লম্বা করিয়া পাকায়। আর তাহা ডুবাইয়া ডুবাইয়া আমার হাতে দুই এক ফোটা করিয়া কেরোসিন তেল দেয়। আমি তাহা সর্বাঙ্গে বেশ করিয়া মাখি। কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে—

অডিকোলনের মতো…ডিগবয়ে কি মশা নাই ?

করিয়াছিল বটে মেজর গোমেস পাটনা ক্যাম্প জেলে। কেরোসিন তেল দিয়া কী একটা ইমাল্‌সন তৈয়ারি করাইয়াছিল। অত বড় জেলে একটিও মশা ছিল না। সাহেব খামখেয়ালি হইলে কী হয়, ছিল কাজের লোক। পাগলাটে গোছের কালো লম্বা—বলিত, আমি ইণ্ডিয়ান! একদিন গয়ার একটি রাজবন্দীকে বলিয়াছিল, 'জোয়ান, তুম ভি শালা হম ভি শালা ; মৈ সব শালাসে মাফী মাঙ্গতা হুঁ।'[১] সকলকে 'জোয়ান' বলিত…

…'হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো'…বড় বড় গাছের গুঁড়ি গড়াইয়া আনিয়া রাস্তায় স্তূপীকৃত করিতেছে, কবৈয়া গ্রামের শতাধিক লোক। হাসাকৌতুকের মধ্যে ধামদাহা—পূর্ণিয়া রোডের উপর গাছের গুঁড়ির একটি 'ব্যারিকেড' গড়িয়া উঠিল। অদম্য উৎসাহ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। যে গরীব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই, তাহাদের আজ হইল কী ? প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বলিবার আছে। এ কয়দিন সকলেরই কিছু কিছু গল্প জমিয়াছে। অভাব শ্রোতার। বাঁরগাঁও থানায় গুলি চলিয়াছে, সাতচল্লিশ জন মরিয়াছে 'ঘায়েলে'র[২] তো অন্ত নাই। দারোগাসাহেবের স্ত্রী বলিয়াছেন যে দারোগাসাহেব যদি চাকরিতে ইস্তাফা না দেন, তাহা হইলে আর তিনি উহাকে রাঁধিয়া দিবেন না। গ্রাম্য পঞ্চায়েত হরখু হাজামকে জরিগানা করিয়াছে, সে নায়েববাবুর 'হজামৎ'[৩] করিয়াছিল—হরখু সকলের সম্মুখে 'কসুর'[৪] স্বীকার করিয়াছে—সে বলে, 'নায়েববাবুকে গান্ধীটুপি পরিতে দেখিয়া আমি ভাবিলাম 'মহাত্মাজীমে'[৫] নাম লিখাইয়াছেন, আমাকে যাহা ইচ্ছা সাজা দাও ; কেবল আঙুলটি কাটিয়া লইও না।' টমি আওর পল্টন সব' কুশী নদীর মধ্যে স্টীমারে রহিয়াছে—ডাঙার উপর রাত্রি কাটাইবার সাহস নাই। আরও কত রকমের গল্প।…

কাঠের গুঁড়ির স্তূপ অনেক উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—আর মিলিটারি লরি আসিতে পারিবে না। এতক্ষণ মনে পড়ে নাই—রহুয়ার কাছে রাস্তার ধারে বড় বড় বটগাছ! 'চলো-ও!' 'চলো-ও'! কুড়ুল, কোদাল, দা, কাটারি, যে যাহা পাইয়াছে হাতে লইয়াছে। কুইক মার্চ নয়, বেশ দ্রুত দৌড়! পরিশ্রান্ত হইলেও থামিবার উপায় নাই। —হরেশ্বরের হাতে ছোট একটি কংগ্রেস পতকা। সে সবে মাত্র মাস কয়েক আগে কংগ্রেস সেবাদলের ট্রেনিং পাইয়াছে। জেলা কংগ্রেস কমিটি গ্রাম্যরক্ষীদলের জন্য একটা ট্রেনিং ক্যাম্প খুলিয়াছিল, তাহাতে। গ্রামে তাহার এখনও কদর কত! কিছুদিন হইতে সে গ্রামে দেখাইতেছিল তাহার নূতন-শেখা যুযুৎসুর প্যাঁচ, লাঠির পাঁয়তারা, আর সাইকেল চড়া। সে গান আরম্ভ করিয়াছে—'নৌ-জোয়ান নিকলে…।' হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাল-বৃদ্ধ সকলে উহা বলিবার চেষ্টা করিতেছে।

রহুয়া। রহুয়াগ্রামের লোকেরাও আসিয়া জুটিল। দুই ঘণ্টায় রহুয়ার পর্ব শেষ। আবার 'চলো-ও! চলো-ও!' কৃত্যানন্দনগর রেল-স্টেশনের দিকে। রাস্তা

---

১। 'জোয়ান, তুমিও শালা, আমিও শালা ; আমি সব শালার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি।,

২। আহত। ৩। ক্ষৌরকার্য। ৪। দোষ

৫। স্থানীয় অশিক্ষিত লোকেরা কংগ্রেসে কাজ করাকে বলে 'মহাত্মাজীমে নাম লিখানা'।

বন্ধ করায় কোনো উদ্দীপনা নাই। থানা জ্বালাইবার পর এসব কাজ নেহাৎ পানসে লাগিতেছে। এবার কবৈয়া রহুয়ার সমবেত দল—ভূতাবিষ্ট ও নেশাগ্রস্তের মতো। আমাকে সাইকেল হইতে নামিতে দিবে না। সকলে মিলিয়া সাইকেল ঠেলিয়া লইয়া যাইবে। অত লোকের মধ্যে কি সাইকেলে বসিয়া যাওয়া যায়? কে কাহার কথা শুনে। 'গান্ধীজীকা জয়!' সম্মুখে কাদা। 'কুচ পরোয়া নহী হৈ।' 'ভারতমাতা কী জয়!' উহার ভিতর দিয়াই সাইকেল চলিবে। 'বোম্বাইসে আয়া তাজা খবর!' কত নূতন খবর। রহুয়ার একটি ছাত্র পকেট হইতে একটি লিথো-করা কাগজ বাহির করিয়া আবৃত্তির ভঙ্গিতে পড়ে। কাগজখানির উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'দেশ কী পুকার' (দেশের আহ্বান)। 'জিন্না সাহেব গিফতার হো গয়ে। ভিজায়লক্‌সমী পণ্ডিত পর গোলী চালায়ী গয়ী। মুঙ্গের জিলা মে স্বরাজ হো গয়া।' আরও অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। আজ আর সম্ভব অসম্ভব বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। থাকিবেই বা কেমন করিয়া? গত কয়েক দিনে তাহারা কত অসম্ভব জিনিসকেই সম্ভব হইতে দেখিয়াছে। কোনো কথাই মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে তাহারা ভরসা পায় না।...সদর কলেক্টরি যেদিন দখল করা হইবে সেদিন রহুয়াকবৈয়ার সম্মিলিত 'জথা'[১] কে নেতৃত্ব করিবে, তাহা লইয়া বেশ বচসা জমিয়া উঠিয়াছে;—কবৈয়ার হরেশ্বর না রহুয়ার তিলকধারী সিং? হরেশ্বর সেবাদল ট্রেনিং পাইলে কী হয়, এখনও ভাল করিয়া 'মোচ'ও উঠে নাই। কবৈয়ার লোকেরা বলে, ও তো 'বুৎরু'[২]। আর তিলকধারী—সে তো 'বত্তিস-মে হো আয়া হ্যায়' অর্থাৎ ১৯৩২ সালে জেলে গিয়াছিল। এই বুঝি আমাকে সালিশ মানে।...

রহুয়া গ্রামের ভিতর রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে এক বৃদ্ধা, আর কতকগুলি অর্ধোলঙ্গ বালক-বালিকা। শুনিলাম বাদর বাহরগামিয়ার মা। জাতে মুচি। গ্রামের ভিতর থাকিবার প্রথা নাই—সেইজন্যেই তাহাদের বলে 'বাহরগামিয়া'। একটি ছেলের হাতে গাঁদাফুলের মালা। বাদরের মা আর সব ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বলিয়া উঠে 'পরণাম'। বোধহয় পূর্ব হইতেই শিখানো। বৃদ্ধা সংকুচিতভাবে আমাকে বলে, 'আপনাকে তো 'খাতিরদারী'[৩] কিছু করিতে পারিলাম না। আর করিতামই বা কী? আপনার 'মঞ্জুরী রহট' (মঞ্জুর করা কুয়া) ছিল বলিয়া সুখে দিন কাটিয়া যাইতেছে। দুই বৎসর হইতে কিছু কিছু বালি জমিতেছে।' বৃদ্ধা দেখিলাম খুব কথা বলিতে ভাল-বাসে। মনে পড়িল 'আর্থকোয়েক রিলিফ'-এর কুয়াটির কথা। কংগ্রেস ভলান্টিয়ার বিরিঞ্চি, মকসুদন সিংএর নিকট হইতে পাঁচ টাকা ঘুষ লইয়া, তাহার 'কামতে'[৪] কুপটি তৈয়ারী করাইয়া দিবার কথা দেয়। আমি ইন্‌সপেকশনে আসিয়া কুয়াটি বাদর বাহরগামিয়ার কুটিরের নিকট ধামদাহ-পূর্ণিয়া রোডের ধারে তৈয়ারি করাইয়া দিই।

বলি—'এক লোটা পানি পিলাও মাই,—একদম ঠণ্ডাহ।' দেখি তোমার কুয়োর জল কেমন।

বৃদ্ধা যেন এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধে কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মুখে সম্মান অপেক্ষা ভীতির চিহ্নই অধিক পরিস্ফুট। জনতার মধ্যে তাহার গ্রামের যে সকল লোক আছে, তাহাদের মুখের দিকে প্রশ্নের ভঙ্গিতে তাকায়। এই কুয়ার জল মাস্টারবাবুর বেটা খাইবে নাকি? গ্রামের আর কেহ তো ইহার জল ব্যবহার করে না। বলে কী! সে জল আনিয়া দিবে! তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া

১ দল। ২ শিশু
৩ সম্মান। ৪ যে জমি গৃহস্থ বা জমিদার নিজে আবাদ করে।

পড়িয়াছে। তিলকধারী সিং তাহাকে সাহস দিয়া বলে, 'লোটা মাজিয়া জল ভরিয়া আন? বিল্টুবাবু বলিতেছেন।' লোটায় করিয়া জল আসে। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী বাদরের স্ত্রী সঙ্গে দিয়াছে শালপাতায় মোড়া, ধুলাভরা, বহুদিন সঞ্চিত খানিকটা গুড়। সলজ্জ বালকবালিকাদিগের মৌখিক আপত্তি ঠেলিয়া, তাহাদের হাতে একটু একটু গুড় দিই। নিজেও গুড় ও জল খাই। বাদরের মা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। চোখের চাহনি, ঠিক খাইতে বসিবার সময় মা পাখা হাতে করিয়া বসিলে যেমন লাগে, তেমনি। আমাকে খাওয়াইবার সময় সকলেরই চোখে একই ভাব ফুটিয়া ওঠে, মা'র, জ্যাঠাইমার, ন'দির, সহদেও-এর মা'র, দুবেজীর স্ত্রীর, সরস্বতীর। ধ্বনি উঠে, 'বোলো গান্ধীজীকা জয়!' হরেশ্বর বলে, 'বাদরমাই, আমাকেও জল খাওয়াও।' বালতিতে করিয়া জল আসে। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া, বাহরগামিয়ার ছোঁয়া জল খাইতেছে। গ্রামের উপর, সমাজের চোখের উপর এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড করিবার সাহস আজ ইহারা হঠাৎ পাইল কোথা হইতে? সকলের মুখে চোখে একটা বাহাদুরি দেখানোর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'গান্ধীজীকা জয়! জয়, মহাৎমাজীকা জয়!' অবিরাম জয়ধ্বনির মধ্যেও সকলেই তাহাদের মনের উদারতা আমাকে দেখাইতে সচেষ্ট। আর এখানে দাঁড়াইবার কি সময় আছে? 'নওজোয়ান নিকলে···।' বৃদ্ধার চোখের কোণ যেন একটু চিকচিক করিতেছে—কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে। ইহাই তাহার দেওয়া গ্রামবাসীদের উদারতার মূল্য। মহাত্মাজী তাহার 'গোঁসাই' (গৃহদেবতা) অপেক্ষা জাগ্রত দেবতা। সেই কথাই সে ভাবিতেছে। এই রাস্তা দিয়েই তো ভূমিকম্পের পর মহাৎমাজী হাওয়াগাড়িতে ধামদাহার দিকে গিয়াছিলেন। হাওয়াগাড়িতে অত লোকের মধ্যে সে মহাৎমাজীকে চিনিতেও পারে নাই। কেবল মাস্টারসাহেবকে চিনিতে পারিয়াছিল। বাদর বলে, মহাৎমাজীর 'বদনসে জিয়োতী' বাহির হইতেছিল।[১] সে গান্ধীজীর উদ্দেশে প্রণাম করে···

জনতা চলিয়াছে। আগে চলিয়াছে, পিছনে ফিরিয়া তাকাইবে কেন? কত বাদরের মা কত স্থানে ঐরূপ প্রণাম করিতেছে। ইহাদের দেখিবার সময় কোথায়? ইহাদের হাতে এখন কত কাজ। মাথায় কত বড় দায়িত্ব! 'জয় বিল্টুবাবুকা জয়!' একদল বলিতেছে, 'বোম্বাইসে আই আওয়াজ'; আর একদল বলিয়া দিতেছে, সে 'আওয়াজটি' কী। উহার সহিত সুর মিলাইয়া বলিতেছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' কবৈয়ার উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের 'গুরু'টি[২] জয়ধ্বনি দিবার সময় নাচিতেছে—যেন নগর সংকীর্তন হইতেছে। তাহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছে। হাঁপানি রোগী কাশিবার চেষ্টা করিবার সময় যেরূপ শব্দ হয়, জয়ধ্বনি দিবার সময় সেইরূপ একটি শব্দ হইতেছে মাত্র; কিন্তু না আছে তাহার উৎসাহের অন্ত, না আছে তাহার নিজের ছাত্রদিগের সম্মুখে আত্মসম্মান রাখিবার প্রয়াস।...একজন লোক ঘোড়ায় চড়িয়া কৃত্যানন্দনগরের দিক হইতে আসিতেছে। আমাদের দেখিয়া নামিয়া পড়িল। 'প্রণাম'। সে আমাকে খবর দেয় যে আপনার ভাইসাহেব তো কৃত্যানন্দনগরে আসিয়াছেন—হরখচন্দ মারোয়াড়ীর গোলায়। কেরোসিন তেলের দাম তদারক করিতে। লোকটি আমাকে আর কিছু বলে না, কিন্তু পাশের দুই একজন লোককে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কী যেন বলিতেছে। জনতা যেন কথা প্রকাশ করিতে চাহে না। বুঝিলাম নীলু—'পিপ্‌লস্‌ প্রাইস কণ্ট্রোল' কমিটির সেক্রেটারি আসিয়াছে কেরোসিনের স্টক কিংবা অন্য কিছুর তদারক করিতে। আর সে বোধহয় কৃত্যানন্দনগরের লোকদের রেললাইনে উঠানো, রাস্তা বন্ধ করা, আর টেলিগ্রাফের

১। শরীর হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছে। ২। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক।

তার কাটার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছে। জনপ্রবাহ চলিয়াছে ; আমাদের আদিম পুরুষেরা পেটের দায়ে, হতাশ হৃদয়ে অনিশ্চিত লক্ষ্য লইয়া যেরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ সেরূপ নয়। ইহা নূতন জগতের আশায়, উদ্‌ভ্রান্ত জনতার অবধারিত লক্ষ্যের দিকে চলা। কেবল Homo Sapiens বলিলে কবৈয়ার মাস্টারটির সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না, আর কেবল Biological necessity (জৈব আবশ্যকতা) বলিলে তাহার অফুরন্ত উৎসাহের পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না।...রেললাইন। দূরে কৃত্যানন্দনগর গ্রামটি দেখা যাইতেছে।...আধঘন্টার মধ্যে প্রায় সিকি মাইল রেললাইন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। রেলগুলি ও কাঠের শ্লিপারগুলি, সকলে কাঁধে করিয়া ভুট্টার ক্ষেতে বা রেললাইনের ধারে ধারে জলের মধ্যে ফিলিয়া দিতেছে। কৃত্যানন্দনগরের দুইজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়াছিল—এই দলকে এমন ভয়ানক কাজ হইতে বিরত করিতে। জনতা হাসি টিটকারি দিয়া তাঁহাদের বিদায় করিয়া দিল। একজন কাশের গুচ্ছ দিয়া দুইটি ছোট বালার মতো তৈয়ারী করিতেছে। কয়েকজন দৌড়াইয়া গিয়া সেই দুইজন ভদ্রলোককে ধরিল। হরিশ্চন্দর তাঁহাদের হাতে ঐ বালা দুইটি পরাইয়া দিল—বলিল, 'চুড়ি পহন্‌কর ভান্‌সা ঘরমে যাকর বৈঠো।'[১] আর একজন বলিয়া উঠিল 'আয়! হায়! কেয়া নাজুক কলই।' অর্থাৎ আহা! কী নরম হাতখানি রে! 'এই আর এক জোড়া চুড়ি দিলাম, তোমার নীলুবাবুকে পরাইয়া দিও। আর বলিয়া দিও, কালেক্টর-সাহেবের পয়সায় এ এলাকায় ফুটানি ছাঁটিতে যেন না আসে। কবৈয়া রহুয়া জানে 'খুফীয়া'র (গোয়েন্দার) সহিত কেমন 'বর্তাব' (ব্যবহার) করিতে হয়। মনে না থাকিলে উইলসন নীলকরসাহেবের কী হইয়াছিল তাহা মনে করাইয়া দিও।' জনতার সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে। আর উহারা নীলুর সম্বন্ধে আমার সম্মুখে কোনো মন্তব্য করিতে কুণ্ঠিত নয়—রেললাইনের কাঠের পুলটিতে আগুন লাগিয়ে উঠিয়াছে। কী করিয়া এত তাড়াতাড়ি এত মোটা গুঁড়িতে আগুন ধরাইল? মা তো দেখি উনান ধরাইতে হিমসিম খাইয়া যান। রহুয়ার সেই লাল গেঞ্জিপরা ছোকরাটি পাদরিসাহেবের নকল করিতেছে। কাল উহারা সাহেবের বাড়ি 'ঘেরাও' করিয়াছিল। পাদরিসাহেব কিরূপ স্বরে 'গান্ধীজীকা জয়' বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া আকুল। রেলগাড়ির শব্দ হঠাৎ শোনা যায়। সত্যই তো এঞ্জিন দেখা যাইতেছে। এই আসিয়া পড়িল। মিলিটারিভরা গাড়ি ; সঙ্গে থাকেন রেলের এঞ্জিনিয়ার। পালা! পালা! যে যে দিকে পারে—খানা ডোবার ভিতর দিয়া, আলের উপর দিয়া!...এক নিমেষের মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। টমিগানের কর্কশ শব্দ কানে আসিতেছে। কৃত্যানন্দনগরের দিকে একটি ভুট্টার ক্ষেতে আমি ঢুকিয়াছি। কৃত্যানন্দনগরের মধ্যে ইচ্ছা করিয়াই যাই নাই। গ্রামবাসীদের সহানুভূতি যখন নাই, তখন যাইব কেন। সাইকেলটি তাড়াতাড়িতে লাইনের উপর ফেলিয়া আসিয়াছি। ভুট্টার ক্ষেত,—পাদরিসাহেবটির দাড়ি ঠিক ভুট্টার শনগুলির মতো। গাছগুলি ভুট্টায় ভরিয়া আছে। ক্ষেতের সোঁদা মিষ্ট গন্ধের মধ্যে বারুদের গন্ধ পৌঁছায় না।

...সেই মোকদ্দমা চলিবার সময় সরকারী উকিল ঠাট্টা করিয়া ভুট্টা ক্ষেতের বিবরণ দিতে দিতে বলিতেছেন—গোরার দল ঐ ভুট্টার ক্ষেত দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিল যে 'মকাই' ইন্ডিয়ান কর্ন (Indian corn) নয়, নাজী কর্ন (Naizi corn)। জজসাহেব গাম্ভীর্য ত্যাগ করিয়া হাসিতেছেন ; পেস্কারসাহেব হাসিতেছেন ; আমার উকিল

---

১। 'চুড়ি পরে রান্নাঘরে গিয়ে বসো।'

হরেনবাবুও এই রসিকতায় না হাসিয়া থাকিতে পারেন নাই।...পেরু আর চিলির সূর্যমন্দিরে থাকিত কৃত্রিম ভুট্টার গাছ। গাছের ডাঁটা ও পাতাগুলি রুপার,—ভুট্টার দানাগুলি সোনার।...

চোখের পাতা তন্দ্রায় ভারী হইয়া আসিতেছে।- একটু হাত পা টান করিয়া লওয়া যাক। আঃ! গা হাত পা বসিয়া বসিয়া ব্যথা হইয়া গিয়াছিল। হাই উঠিতেছে, আজ কি ঘুম আসিবে নাকি? কত লোকের গল্প শুনিয়া আসিতেছি—ফাঁসির আগের দিন তাহাদের সব চুল পাকিয়া গিয়াছিল। আমার চুলও পাকিয়া যায় নাই তো? একখানি আয়না থাকিলে হইত। কমরেড চনরবল্লী ফাঁসির আগে পাগল হইয়া গিয়াছিল; আর আমার ঘুম আসিতেছে। আশ্চর্য!...

...আমার যদি অনেক টাকা থাকিত, তাহা হইলে আজ উইল করিয়া যাইতাম। অনেক কোটি টাকা। তাহা দিয়া মার্ক্সবাদের প্রচারকার্য চলিত। ভারতের প্রতি গ্রামে গ্রামে রুশের বালক ও কিশোরদের সংঘের ন্যায় দলের সংগঠন হইতে পারিত। কিন্তু টাকা আসিবে কোথা হইতে? যদি লটারির টিকিট না কিনিয়া লটারিতে টাকা পাইবার সুবিধা থাকিত? তাহা হইলেই একমাত্র টাকা পাইবার আশা ছিল। আর যদি রাষ্ট্র আমাদের হাতে আসিত তাহা হইলে কাজ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারিতাম, দশ বৎসরের মধ্যে দেশের কী করা যায়।...কংগেস-কর্মীরা আবার জেল হইতে বাহির হইলে, নিশ্চয়ই আমার নামে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে। 'বিলুবাবুকা সড়ক,' 'বিলু আশ্রম'; না, বোধহয় আমার ভাল নামই ব্যবহার করিবে, 'পূর্ণ আশ্রম'। কিন্তু আমার ভাল নাম যে 'পূর্ণ' তাহা তো কেহ জানেই না। সকলেই জানে 'বিলুবাবু'কে। আর তাহারও পর কত কী হইতে পারে। হয়তো পূর্ণিয়ার নাম হইয়া যাইবে পূর্ণনগর —স্টালিনগ্রাড বা গর্কি শহরের মতো। বাজারে বালমুকুন্দ সাউর ধর্মশালার মোড়ের উপর থাকিবে আমার মর্মরমূর্তি, বক্তৃতা দিবার ভঙ্গিতে। প্রতি বৎসর এই দিনে দলে দলে লোক জুটিবে ইহার বেদিতলে—আমার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে। ...বন্ধ চোখের পাতার উপর দেখিতেছি একটি সবুজ শিখা—ময়ূরের পাখার চোখের মতো, কিন্তু চঞ্চল ও কম্পমান। শিখাটি হইল লাল...হলদে—সবুজ...স-বু-জ...নীল ...কালো....শিখাটি...আছে কি নাই...আঁধার...

জ্যাঠাইমার রান্নাঘরের বারান্দায় জ্যাঠাইমা বঁটি লইয়া বসিয়াছেন আম কাটতে। একটি ঝুড়িভরা গোলাপখাস আম, সম্মুখে জামবাটি; আমগুলির বোঁটা কাটিয়া জামবাটির জলে রাখিতেছেন। আমি আর সরস্বতী তাঁহার সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়াছি। জ্যাঠাইমা বলিলেন, 'এক থালায় দি, তোরা দুজন খা।' আম কাটিয়া জ্যাঠাইমা থালায় দিলেন। সরস্বতী জ্যাঠাইমাকে বলিল, 'কাটা আম কি এঁর মুখে রুচবে,—ওঁকে আস্ত আম দেন।' জ্যাঠাইমা সরস্বতীকে ঠাট্টা করিয়া বলেন, 'ওমা, এরই মধ্যে এত।' বলিয়া আমার হাতে দেন একটি গোটা আম—সোনার মতো হলদে রং, মুখের কাছটি সিঁদুরে লাল। আমি আমটির নিচের দিকে একটি ছিদ্র করিয়া লই। টিপিয়া আমটিকে নরম করিয়া লই, তাহার পর চুষিয়া চুষিয়া খাই। মা রহিয়াছেন শোবার ঘরের বারান্দায়; হবিষ্যি ঘরে আসিবার ইচ্ছা কিন্তু আসিতে পারিতেছেন না। মধ্যে উঠানে একটি প্রকান্ড সাপ; মসৃণ কালো রং; ফণা তুলিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে; মা চিৎকার করিতেছেন, 'নীলু শিগ্‌গির এটাকে মার, এখুনি মেরে ফ্যাল!' বাবা বলিলেন, 'না মেরো না। হাততালি দাও, চলে যাবে।' নীলু কি বাবার কথা শোনে! একটি প্রকান্ড লাঠি লইয়া আসিয়াছে, সাপটিকে মারিবার

জন্য। সাপটি পলাইতেছে; অন্ধকার ইঁদারার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। আর সাপ নাই। সাপটি কুয়ার বালতির দড়ি হইয়া গিয়াছে; নীলু রাগে বালতির উপর এক লাঠির ঘা মারিল। খন্‌ন্‌ করিয়া শব্দ হইল।···

কিসের যেন শব্দে তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। বুটের শব্দ, মাথার কাছে। অ্যাঁ তবে কি আমাকে লইতে আসিয়াছে? এই দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল বুঝি! সর্বশরীর দিয়া ঘাম ঝরিতেছে। নিশ্চল ও স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া আছি। না, দরজা খুলিল না। তবে বোধহয় নূতন ওয়ার্ডার আসিল—স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। হ্যাঁ, তাই বটে। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি? ভোরের দল নাকি? এখনও তো পাখির ডাক শুনা যাইতেছে না। ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করিব নাকি কটা বাজিল? না দরকার কী? যখন সময় হইবে তখন জানিতেই পারিব। জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে দুর্বলচিত্ত মনে করিবে। একজন সামান্য ওয়ার্ডারের কাছে জীবনের এই শেষ মুহূর্তে ছোট হইতে পারি না। পাগলটিও তো ভোর রাত্রি হইতে চিৎকার আরম্ভ করে। তাহা হইলে এখনও সকাল হইবার দেরি আছে। এ জগতের সহিত আর দুই ঘণ্টার সম্বন্ধ। বাহিরে যখন সুযোগ ছিল তখন জীবনকে উপভোগ করি নাই। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কী করিয়া কাটাইলাম, ঠিক মনে পড়ে না। নিরর্থক জীবনের অন্তহীন বিস্মৃতির স্তরে স্তরে জমিয়া আছে, এক-আধটি স্মৃতির কঙ্কাল। ইহার পরিচয় আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। ইচ্ছা করে বাঁচিতে—ইচ্ছা করে বাকি দুই ঘন্টার স্বপ্ন-বিলাসের মধ্য দিয়া জগৎকে নিঙড়াইয়া, যাহা কিছু ভোগের জিনিস আছে, একত্র করিয়া লইতে। যদি শেষ মুহূর্তে আমার ফাঁসি রদ করিবার হুকুম আসে! এমনও তো হয়। কত লোতের এরূপ ঘটিয়াছে। ···জল্লাদ খড়্গ উঠাইয়াছে। অশ্বারোহী দূর হইতে নক্ষত্রবেগে আসিতেছে। ঘাতক বধ করিও না, বধ করিও না। কত কাহিনী পড়িয়াছি। পিথিয়াস ও ড্যামন।···

১৯৩৪-এর ভয়ংকর ভূমিকম্পের মতো ভূমিকম্প এখন যদি হয়, জেলের দেওয়াল যদি ভাঙিয়া পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও, আমার বাঁচিবার উপায় নাই। যে ফাঁসি দিবে তাহার যদি হঠাৎ অসুখ করে? তাহা হইলে অন্য লোক পাইতে দেরি হইবে না। যদি হাইকোর্ট হইতে অথবা প্রভিন্সিয়াল এড্‌ভাইসরের নিকট হইতে চিঠি আসিয়া থাকে, আমার ফাঁসি বন্ধ করিয়া দিতে, আর দৈবাৎ ভ্রমক্রমে তাহা যদি খোলা না হইয়া থাকে। আশ্চর্য কী! এরূপ তো কয়েক বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবে হইয়াছিল। বড়সাহেবের পকেটেই চিঠি থাকিয়া গিয়াছিল—লোকটির ফাঁসি হইবার পর সকলের খেয়াল হয়।···বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছে? কোনো অনির্দিষ্ট শক্তির অমোঘ নির্দেশ তো আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। সত্যই কি ইহা মৃত্যুভয়? ভয় নিশ্চয়ই। এই তো কিছুক্ষণ আগে ওয়ার্ডারের পদশব্দে মনের ভাব যাহা হইয়াছিল, তাহা ভয় ছাড়া আর কী? উৎকণ্ঠার চরম অনুভূতিতেই আসে নিরাশা। সেই নিরাশার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে আমার মনের উপর।···

মোটা শনের দড়ি। ছোটবেলায় আমরা ঐ দড়িকে 'লকলাইন' বলিতাম। তাহাতে একটি ফাঁস। ফাঁসের গোড়ায় একটি পিতলের গোলক ( knob )। দড়িটিতে আগাগোড়া বেশ করিয়া চর্বি মাখানো। নিচে অন্ধকার গর্ত—দেখিতে ঠিক কুয়ার মতো। গর্তটি কত নিচু—বোধহয় বেশি নয়। কাঠের তক্তাটি টানিয়া লইলে যখন সমস্ত শরীরটি ঝুলিয়া পড়িবে, তখন যাহাতে পা দুখানি মাটিতে না ঠেকিয়া যায়—সেই জন্যই গর্তটির দরকার। কাজেই কুয়াটি নিশ্চয়ই অগভীর। বেশি খুঁড়িলে তো জল উঠিবে। চার পাঁচ হাতের বেশি হইবে না। কিন্তু গর্তটি যত গভীর হইবে, আর দড়ি যত বড় হইবে,

তাতেই শরীরটি নিচে পড়িবার সময় ঝাঁকানি বেশি খাইবে ; আর ঐ ঝাঁকানিই তো আসল জিনিস। না হইলে ঘাড়ের কাছের হাড়টি ভাঙিবে কী করিয়া ? ফাঁসি মানে তো কেবল দম বন্ধ করিয়া মারা নয়। তা হইলে তো গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেই হইত ; এত যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের কী দরকার ছিল ? কম পরিশ্রমে, মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্যই ফাঁসির সৃষ্টি। পিতলের গোলকটি ঘাড়ের হাড়ের উপর সজোরে আঘাত করিল ; ফুট করিয়া একটু শব্দ হইল। তাহার পর ? তাহার পর সব শান্ত। না, একেবারে শান্ত হইবে কী করিয়া ? মানুষের বাঁচিবার এত আকাঙ্ক্ষা ! সেই জীবনবিলাসী ইচ্ছাশক্তির তাড়নায়, অসহায় শিথিল দেহটি কি একটুকুও সাড়া দিবে না। আর ইচ্ছাশক্তি যদি নাই থাকে, তাহা হইলেও তো reflex action-জনিত আক্ষেপ আছে। বলিদানের পর পাঁঠার ধড়টি ধড়ফড় করিতে দেখিয়াছি।—তাহার পর ফাঁসির আসামীর দেহটি শূন্যে ঝুলিতেছে—অন্ধকারে এদিক ওদিক দুলিতেছে। দড়িটিকে ঢিলা করিয়া দেওয়া হইল। মৃতদেহটির পা গর্তের মধ্যে মাটিতে ঠেকিয়াছে। ডাক্তার পায়ের শিরা কাটিবে নাকি ? গল্প শুনিতাম কে যেন বাঁচিয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্যই এতসাবধানতা। সব বাজে কথা। ডাক্তারের ওসব কোনো কাজই নাই। কেবল সরকারী নিয়মরক্ষার জন্য ডাক্তারের উপস্থিতি ফাঁসির সময় দরকার। কেবল তাঁহাকে বলিতে হইবে যে হ্যাঁ, আসামী সত্যসত্যই মরিয়াছে ; আইনের ভাষায়, যতক্ষণ না মরে ততক্ষণ পর্যন্ত ফাঁসি দিয়া ঝুলাইবার সাজা কিনা, সেইজন্য। তারপর দিল্লীর শা'য়ের বাউলীর ছোট সংস্করণের ন্যায়, গর্তটির ভিতর ধাপেধাপে যে সিঁড়ি গিয়াছে, তাহা দিয়া নিচে নামিবে সেই লোকটি। সে নেহাত কেউ-কেটা নয়। এক মুহূর্তের শারীরিক পরিশ্রমে কয়জন লোক পাঁচ টাকা রোজগার করিতে পারে ? তাহার উপর 'রেমিশন' তো আছেই। দস্তুরমতো piece work ( ঠিকা ) মজুরি। শবদেহটি,—না আর শবদেহ নয়,—লাসটি উপরে আনিয়া ফেলা হইল। বীভৎস মুখ ! চোখ দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কী ভীষণ যন্ত্রণা হইবে তক্তা সরাইয়া লওয়ার মুহূর্তে। অসম্ভব তীব্র যন্ত্রণা ! চোখে জল আসিতেছে ! ছি, কতটুকু সময়ের জন্য যন্ত্রণা। হয়তো ঐ সময় উহা অনুভব করিবার শক্তিও থাকিবে না। হয়তো অন্য সকল চিন্তায় মন এত অভিভূত থাকিবে যে, যন্ত্রণার কথা মনেও থাকিবে না। সাংঘাতিক জখমে আহত লোকও যুদ্ধক্ষেত্রে নেশাগ্রস্তের মতো নিজের কাজ করিয়া চলে। তাহার কি নিজের যন্ত্রণার কথা ভাবিবার সময় থাকে ? আর যদি যন্ত্রণা অসম্ভব তীব্রও হয়, তাহা হইলেই বা কী আসে যায় ? জীবনেরই যদি আশা না থাকে, তাহা হইলে এক মুহূর্তের যন্ত্রণার কথা ভাবা নিরর্থক। মরিবার পূর্বে মুহূর্তে শুনিয়াছি, সারাজীবন চলচ্চিত্রের ছবির মতো চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আমার বিশ্বাস হয় না…যে দেশে মৃত্যুদণ্ড নাই সে দেশে যদি আমার সাজা হইত তাহা হইলে আজীবন কারাবাসের দণ্ড হয়তো আমাকে বৈচিত্র্যের ধরণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত। কিন্তু জেলের মধ্যেও তো একখণ্ড জগৎ আছে। জেলের মধ্যেও তো শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার পরিবর্তন অনুভব করিতে পারা যায়। আকাশ, বাতাস, চন্দ্র-সূর্য-তারা সেখানেও মাধুর্য বিলাইতে কার্পণ্য করে না। কালবৈশাখীর মাতলামি, প্রথম বৃষ্টির পর ভিজা মাটির গন্ধ, নিশীথ রাতের বারিধারার মাদকতাভরা রিমিঝিমি, কত স্মৃতিভরা শরতের সোনালী তনকমোড়া রৌদ্র, রহস্যভরা শীতের কুয়াশা,—জেলের প্রাচীরের ভিতরেও ইহাদের নিরঙ্কুশ গতি। তাহার উপর মানুষের মুখ দেখা—হউক তাহারা চোর ডাকাত তবু মানুষ তো। তাহাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা কি একটি দড়িতে ঝুলিয়া

মরা অপেক্ষা অনেক ভাল না? আমেরিকায় কেমন ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিলাম, আর এক মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল। যন্ত্রণার লেশমাত্রও নাই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বের মানসিক যন্ত্রণা তো এখানেও যেরূপ, সেখানেও সেইরূপ—কেবল তাহাদের মারণ-যন্ত্রটি একটু মার্জিত। এই যা তফাত। কিন্তু যে দেশে বন্দুকের গুলি দিয়া মারা হয়, তলোয়ার দিয়া কাটা হয়, গিলোটিন করা হয়, তাহার অপেক্ষা তো আমাদের ব্যবস্থা ভাল। খাঁড়া দিয়া গলা কাটিবার কথা ভাবিতেও মন শিহরিয়া ওঠে। আচ্ছা যদি ফাঁসির আসামীকে মর্ফিয়া ইনজেকশন দিয়া বা ক্লোরোফর্ম করিয়া তাহার পর মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়, তাহাতে গভর্ণমেন্টের ক্ষতি কি? তাহাতে যে শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক দুশ্চিন্তা হইতে লোকটি বাঁচিয়া যাইবে। লোকটিকে সমাজ হইতে সরাইয়া ফেলাই যদি রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান করাইবার পর ফাঁসির ব্যবস্থাই হইত। সব চাইতে ভাল পটাশিয়াম সায়ানাইড—ক্ষণিকের ভিতর সব শেষ।...

নীলু কলেজ ল্যাবরেটরি হইতে খানিকটা লইয়া আসিয়াছিল। ঐ জিনিস লইয়া কতরকম আলোচনা জল্পনা-কল্পনা। রবারের ছোট ক্যাপসুলের মধ্যে ভরিয়া মুখে রাখা সব চাইতে ভাল, তাহাই ঠিক হইল। গ্রেপ্তার হইলেও ভয় নাই; যখন ইচ্ছা মুখের মধ্যে ক্যাপসুলটিতে দাঁত দিয়া একটি ছিদ্র করিয়া দাও। তখন যাহা ভাবিয়াছিলাম, যাহা ঠিক করিয়াছিলাম তাহা যদি রাখিতাম তাহা হইলে আজ মানসিক দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তখন তো ভাবি নাই যে সত্যই আমার এ জিনিসের দরকার হইবে। যদি থাকিত তাহা হইলে যেই ভোররাত্রে বুটের শব্দ শুনিতাম, তখনই ক্যাপসুলটি চিবাইয়া ফেলিতাম। দরজা খুলিয়া উহারা আশ্চর্য হইয়া যাইত। ঘাতক কয়েদীটি হতাশ হইত। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ভাবিতেন এ আবার কি ঝঞ্ঝাট আসিয়া জুটিল,—এখন আবার হাজার রকম ডিপার্টমেণ্টাল লেখাপড়ার মধ্যে পড়িতে হইল। সকলে ভাবিবে যে ভয়ে হার্টফেল করিয়া মরিয়া গিয়াছে। না, পোস্টমর্টেম নিশ্চয়ই হইবে। তাহা হইলেই পটাশিয়াম সায়ানাইডের কথা বাহির হইয়া পড়িবে।...

কিন্তু পটাসিয়াম সায়ানাইট খাওয়াও অত সহজ নয়। সেবার তো পারি নাই। সেবার যখন ডিসপেপসিয়ায় ভুগিতেছিলাম, বিকেলে প্রত্যহ ফুটবল ম্যাচ দেখিতে যাইতাম। একদিন দেখিলাম জিতেনদা এস. ডি. ও. সাহেবকে ডাকিতেছে 'Come up ইসমাইল।' দুইজনে মোটরের ভিতর দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে লাগিল। একজন আর একজনের কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে। হঠাৎ মনটা কেমন যেন হতাশায় ভরিয়া গেল —নিজের দুর্বলতা, নিজের নগণ্যতা, নিজের সপ্রতিভতার অভাবের কথা মনের মধ্যে কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, জিতেনদার সপ্রতিভতা কেন আমার হইল না। জিতেনদার উপর ঈর্ষা হয় নাই। এস. ডি. ও. সাহেবের সহিত বন্ধুত্বের জন্যও আমি লালায়িত ছিলাম না; তথাপি কেন যেন মন অবসাদে ভরিয়া গেল। ক্ষণেকের মধ্যে জীবনে বীতরাগ আসিয়া গেল। কেবলই মনে হইলে লাগিল, বাঁচিয়া থাকিয়া কী হইবে, যে হীন অবস্থায় আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা মরণ অনেক ভাল। সব ঠিক—সেদিন রাত্রেই পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইব। এইরূপই জাগিয়া কত রাত পর্যন্ত জেলা কংগ্রেস অফিস-ঘরের বড় ঘড়িটির ঘন্টা বাজা শুনিয়াছি। পরে ঠিক চরম মুহূর্তে মনে হইয়াছিল যে আজ থাক। 'লেডিজ আফটারনুন টি, বিস্কুট খুব খাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কাল এই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাহার পর আত্মহত্যার কথা ভাবা যাইবে। পরের দিনে মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর যখনই ভাবিয়াছি সমস্ত ঘটনাটি হাস্যকর

গল্পের মতো মনে হইয়াছে।...কিন্তু আজ সায়ানাইড থাকিলে নিশ্চয়ই খাইতাম। ইহা তো স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা নয়; আর এক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় মাত্র। সায়ানাইডের শিশিটা লেবু গাছের তলায় পুঁতিয়া ফেলিয়াছিলাম। কী মনে হইয়াছিল জানি না—শিশিটি মাটিতে পুঁতিবার পূর্বে বাদামী রংএর একটি পুরানো মোজার মধ্যে ভরিয়া তাহার পর পুঁতিয়াছিলাম। এখনও নিশ্চয়ই সেইখানে পোঁতা আছে।

লেবু গাছটির কয়েকটি করিয়া নিচের ডাল, সর্বদাই মাটি চাপা দেওয়া থাকে,—কলম তৈয়ারী করিবার জন্য। জেলার যত কংগ্রেসকর্মী কার্যোপলক্ষে জেলা অফিসে আসে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই লইয়া যায় এই গাছের কলম।...নীলুর প্রত্যহ খাওয়ার সময় লেবু চাই। ডালের মধ্যে দু'চার ফোঁটা লেবুর রস না দিলে তাহার ভাল লাগে না। আশ্রমে মাছ রান্না হয় না। সেই জন্য বড় মাছ আসিলেই, জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে আমাদের খাওয়ার ডাক আসে। ও বাড়িতে খাওয়ার সময়ও নীলুর একটি লেবু পকেটে করিয়া যাওয়া চাই—কী জানি ও বাড়িতে লেবু আছে কি নাই। ও বাড়ির ছোট ছেলেটি পর্যন্ত একথা জানে; কেহ নীলুকাকার পকেট দেখিতেছে; কেহ দৌড়াইয়া দিদিমাকে খবর দিতে গেল যে নীলুমামার পকেটে লেবু আছে। জ্যাঠাইমা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। 'কিরে 'মাছ-পাতরি' তোরা এসেছিস।'—অনেকদিন আগের ঘটনা। জ্যাঠাইমার বাড়ির বারান্দায় সারি সারি পিঁড়ি পাতা হইয়াছে। সম্মুখে ভাতের থালা। আমি, নীলু, জিতেনদা, ঘ্যান্টা সকলে খাইতে বসিব। 'আরে মাছপাতরি যে!' বলিয়া নীলু দৌড়াইতে গিয়া পিঁড়িতে যেমন বসিতে যাইবে, পিঁড়ি পিছলাইয়া পড়িয়া গেল! ভাতের থালা ছিটকাইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে; একেবারে তছনছ কান্ড! সেই হইতে জ্যাঠাইমা নীলুকে 'মাছপাতরি, বলেন। কথাগুলির মধ্যে উপহাসের ইঙ্গিত যাহা ছিল, তাহা আর এখন নাই কিন্তু কথার কাঠামোটি রহিয়া গিয়াছে। তাহার পর জ্যাঠাইমা বলেন, 'দেখি বারিন্দিরের ব্যাটা, পকেটে করে লেবু এনেছিস তো? দে, কেটে রাখি।'

সেই নীলু, সেই একরত্তি হাফপ্যান্ট পরা ক্যাপ্টেন নীলু, সেই 'মাছপাতরি'র নীলু, সেই দাদা বলিতে অজ্ঞান নীলু—সে কিনা আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করিল। তাহার নিকট হইতে এই ব্যবহার আমি তো কোনো দিন আশা করি নাই! এত ঘৃণ্য পরিবর্তন হইয়াছে তাহার মনের। ছি!—একী? আমি একী ভাবিতেছি? পায়ের যে ক্ষতটির উপর আঘাত লাগিবে বলিয়া হাত দিই না, হাটে ঘাটে পথে, ভিড়ের মধ্যে যে ক্ষতটিকে অতি সন্তর্পণে আঘাত হইতে বাঁচাইয়া আসিয়াছি, বাড়িতে আসিয়া টেবিলে পা তুলিয়া আরাম করিয়া বসিবার সময় কি উহার উপর আঘাত লাগিল? মনের গভীর ক্ষতটিকে আর বুঝি বিস্মৃতির মলমে ও যুক্তির প্রলেপে ঢাকিয়া রাখা যায় না। না, আমিই যদি নীলুকে ঠিক না বুঝি, তাহা হইলে বাহিরের লোকে বুঝিবে কেমন করিয়া। সেকালে অনেক স্থানে, শিয়াল গ্রামে উপদ্রব করিল, তাহাকে ধরিয়া গ্রামের মধ্যে চৌমাথার উপর ফাঁসি দিবার ব্যবস্থা ছিল। লোকে কেবল নিজের ক্ষতির দিক দিয়াই জিনিসটিকে ভাবিতে, এবং সেই দৃষ্টিকোণ দিয়াই অনিষ্টকারীর উপর প্রতিশোধ লইত। কিন্তু আমাকে নীলুর দৃষ্টি দিয়াই সমস্ত ঘটনাবলী দেখিতে হইবে। সেদিন যখন নীলু দেখা করিতে আসিয়াছিল, এই কম্বলের উপরেই তো বসিয়াছিল! আমার মুখের দিকে প্রাণখোলা স্বাধীনভাবে তাকাইতে পারিতেছিল না। তাহার চোখে মুখে ছিল অপরাধীর সংকুচিত ভাব। কেন? কোথাও গলদ নিশ্চয়ই আছে। নাহইলে তাহার কুণ্ঠার

কারণ কী? বিবেকের দংশন, না কেবল অনুতাপ? নীলু আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছিল। কী বলিতে চাহিতেছিল তাহাও জানি। কিন্তু আমি সে কথা উঠাইবার সুবিধা দিই নাই, দিলে হয়তো আমারও সংযমের বাঁধাভাঙিয়া যাইত। নীলু আসিয়াছে তাহার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক পার্টির স্থানীয় নেতা বিলুবাবুর সহিত নয়। কী ভাগ্য যে সেদিন তাহার সম্মুখে আমার মানসিক দ্বন্দ্বের আভাস ফুটিয়া উঠে নাই। আমার আবার একটুতেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। তাহাই ছিল আমার ভয়। কিন্তু যাহা হউক কোনো রকমে ভালয় ভালয় ইমটারভিউ কাটিয়া গিয়াছিল। সে চলিয়া যাইবার পূর্বে আমি ভাঙিয়া পড়ি নাই। আর তাহার দিক হইতে আবেগের আতিশয্য দেখিয়াছিলাম। চলিয়া যাইবার সময় দুই হাত দিয়া আমার ডান হাতটি চাপিয়া ধরিয়াছিল—মুহূর্তের জন্য। মৃদু কম্পমান হাতের সেই হিমশীতল স্পর্শ এখনও অনুভব করিতেছিল। বলিয়াছিলাম মা'র সহিত দেখা করিতে। করিল কিনা কে জানে। মাকে লইয়াই ভয়। মা'র এক ছেলে তো তবু থাকিল। চোখ বুঁজিয়া মা'র মুখটি মনে করিবার চেষ্টা করি।...

মা ভাতের সহিত জলপাইয়ের আচার খাইতেছেন। সম্মুখের চুল সাদাতে কালোতে মিশানো—কালোই বেশি, সিঁথির চুল কতকগুলি উঠিয়া সিঁথিটি চওড়া হইয়া গিয়াছে; তাহার উপর চওড়া করিয়া সিঁদুর। তাহার পিছনে দেখা যাইতেছে খদ্দরের শাড়ির লাল পাড়। কান, গলা, সম্পূর্ণ নিরাভরণ। অর্ধনিমীলিত চোখের কোণে কতকগুলি বলিরেখা, একটি করিয়া মোটা, বাকিগুলির চুলের মতো সরু। নাকের নিচের দিক হইতে দুইটি চর্মরেখা, ঠোঁটের দুই কোণ পর্যন্ত পোঁছিয়াছে। ধবধবে রংএর উপর রেখাদুইটি বেশ গভীর দেখাইতেছে। মা ঠোঁট দুইটি ছুঁচালো করিলেন—জিবটি চুষিতেছেন, গলনলীর মৃদু কম্পন উপর হইতেই বুঝা যাইতেছে। জিবটি টাকরায় ঠেকাইয়া টক্ করিয়া একটি শব্দ করিলেন। ঠোঁট দুইটি খুলিলে দেখা গেল, নিচের দন্তপংক্তির মধ্যে একটি দাঁত নাই। তাহার মধ্য দিয়া লালাসিক্ত জিহবা দেখা যাইতেছে। 'তোরা ওঠ না, তোরা ওঠ!' আমরা কিন্তু বসিয়া থাকি।

জ্যাঠাইমারও কয়েকটি নিচের পাটির দাঁত নাই। থাকিবে কোথা হইতে? চব্বিশ ঘন্টা দাঁতের নিচে ঠোঁটের মধ্যে একরাশ চুনের সহিত ডলা জর্দা গোঁজা থাকে। লোকে পানের সহিত জর্দা খায়; কিন্তু শুধু জর্দা এতখানি করিয়া নিয়মিত খাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। জ্যাঠাইমা এখন কী করিতেছেন? আজ রাতে কি জ্যাঠাইমার ঘুম হইবে? কী শীত, কী গ্রীষ্ম চিরকাল রাত তিনটার সময় উঠিয়া, বিছানার উপর বসিয়াই মালা জপ করেন। ঘুম হইতে উঠিয়াই লন্ঠনের শিখাটি বাড়াইয়া পাশের জানলার উপর রাখিলেন। আলো গিয়ে পড়ে দেওয়ালে টাঙানো একটি রাধাকৃষ্ণের ছবির উপর। তাহার পর চশমাটি চোখে লাগাইয়া ঐদিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া বসেন। ঐরূপই নাকি গুরুদেবের নির্দেশ। গোল মুখটি—মা একদিন বলিয়াছিলেন ডিবের বাটির মতো। মুখে গুটিকয়েক বসন্তের দাগ। কপালে একটি নীল উল্কির ফোঁটা; গলায় কন্ঠি। জপ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে জানলা দিয়া জর্দার থুতু ফেলিতেছেন। আর সেই অবকাশে, আকাশের দিকে তাকিয়ে লইতেছেন, সকাল হইতে আর কত দেরি। এইবার বাইরের ইঁদারায় বালতি ফেলিবার শব্দ হইতেছে। পাড়ার মুদী রামদেব সাও প্রত্যহ ভোর না হইতে ইঁদারায় জল লইতে আসে। ইহাই জ্যাঠাইমার ঘড়ি। 'বেলী, ওরে বেলী, আজ কি উঠিব না?' ন'দি ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া ওঠে।...

নীলুকে ছোটবেলায় সকালে ঠেলিয়া তুলিয়া দিতে গেলে, প্রথমে বলিত, 'ভাল হবে

না তা বলছি, দাদা।' বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইত। আবার ঠেলা দিতে গেলে বলিত 'ফের'। তাহার পর বলিত 'আবার'। আর একবার ঠেলিলে বলিবে 'তবুও'। এবার গলার জোর কিছু বেশি। তারপর আপন মনে বকিতে বকিতে উঠিয়া বসিত। মা বলিতেন 'এই ভোরে উঠেই সাপের মন্তর ঝাড়া আরম্ভ হল।' নীলুর মুখটি মনে করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই মনে আসিতেছে না। যখন-তখন নীলুর মুখটি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু এখন মনে করিতে চাহিতেছি, শেষ মুহূর্তের একটু তৃপ্তির জন্য। কিন্তু এখন কি আর আসিবে? মনে করিতে চাহিতেছি নীলুর মুখ—আর মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে, গণৌরী মাহাতোর মুখ—ন্যাড়া মাথা, খ্যাঁদা নাক, বুলডগের মতো মুখ, এক কানের উপরিভাগে ছিদ্র করিয়া একটি সোনার আংটা পরানো…

গা শিরশির করিতেছে। ভোর রাত্রের হাওয়া বেশ ঠান্ডা। এখন এই দুই ঘন্টা মাত্র সেলটি ঠান্ডা লাগিবে। পাগলটি চিৎকার আরম্ভ করিয়াছে। তিন নম্বর আবার কখন ভজন আরম্ভ করিল, পূর্বে খেয়াল করি নাই।

অশ্বত্থ গাছের কাকগুলি একবার কা-কা করিয়া ডাকিয়া চুপ করিয়া গেল। বোধ হয় বুঝিতে পারিল যে সকাল এখনও হয় নাই, সময় গণনায় একটু ভুল হওয়ায়, কিছুক্ষণ আগেই ডাকিয়া ফেলিয়াছে। কতটুকুই বা আমার মেয়াদ! এখন এক মুহূর্তের মূল্য আমার কাছে কত! সিনেমার ছবি হইলে হয়তো দেখাইত—একটি বালুর ঘড়ি, ডমরুর মতো। উপরের বাটির বালু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু টিপ্ টিপ্ করিয়া অনবরত বালুকণা নিচে পড়িতেছে। এক পলকেরও বিরাম নাই!…কিংবা হয়তো দেখাইত প্রদীপের তেল শেষ হইয়া আসিল।…হয়তো বা ঘড়ির কাঁটা চলিতেছে। আমার ঘড়িও তাহার নিজের ধরনে, সেই বাঁধা নিয়মে চলিতেছে—ঠান্ডা হওয়া, পাগলের চিৎকার, তিন নম্বরের ভজনম;—বাকি কেবল আকাশ একটু পরিষ্কার হওয়া। শুক তারাটি চিনিতে পারিতেছি। আর সর্বাপেক্ষা রূঢ় বাস্তব, আমার ওয়ার্ডার সাহেব সেলের আঙিনায় চৌবাচ্চার উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে।…

এখন বিলু আছে, আর কিছুক্ষণ পরে থাকিবে না। রক্তমাংসে গড়া সুখদুঃখে ভরা বিলু বলিয়া কিছু নাই; আমি সরকারী স্ট্যাটিস্টিকসের একটি সংখ্যা মাত্র। অজস্র সংখ্যার মধ্যে একটি হ্রাস বৃদ্ধিতে কী আসে যায়? বৈজ্ঞানিক, 'প্যারালাক্স বা ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর'-এর (দৃষ্টিবিভ্রম বা যন্ত্রজনিত ভুলের) জন্য শতকরা কিছু সংখ্যা তো ছাড়িয়াই দেন। ব্যবসায়ে 'ঝড়তি পড়তি' বলিয়াও তো একটি জিনিস আছে। আমি হয়তো ইহাদের মধ্যে পড়িব। হয়তো বা ভারত সরকারের হিসাবের সময়, আমি—পূর্ণিয়া জেলের ১১০৯ নম্বর ফাঁসির আসামী—ফাঁসির শতকরা হার একটি দশমিক ভগ্নাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিব। সরকারী রিপোর্টের এতটুকু ছাপার কালির খরচ! ইহাই আমার জীবনের মূল্য—জাতীয় ইতিহাসে বিলুবাবুর দান।

গরুর গাড়ির চাকার যেরূপ ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ হয়, সেইরূপ একটি শব্দ হইল। বোধহয় ওয়ার্ডের দরজা খোলার শব্দ। তবে কি?…ঠিকই তাই। যাহা ভাবিয়াছি তাহাই। সিমেন্ট বাঁধান সেলের আঙিনার উপর একসঙ্গে অসংখ্য জুতার শব্দ হইতেছে! কত লোক আসিতেছে! শুনিয়াছিলাম একদল সৈনিকের পদধ্বনির প্রতিশব্দে একটি পুল ভাঙিয়া পড়িতে পারে। সত্যই তো কত জোরে শব্দ হয়! ঐ পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করিতেছে। বুকের স্পন্দনের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। রাসমোহন ঢাকী কোনো নবমী পূজার রাত্রেও বোধহয় এরূপ শব্দের স্পন্দন তরঙ্গায়িত

করিতে পারে নাই। সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছে। চোখের সম্মুখে যেন কিসের একটা পর্দা পড়িয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন যেন ঠাণ্ডা আর খালি লাগিতেছে।—একবার আমার ডান হাতের আঙুলটি সাইকেলের স্পোকের মধ্যে পড়িয়া কাটিয়া গিয়াছিল। রক্ত আর বন্ধ হয় না। সেই সময় রক্ত দেখিয়া মাথার মধ্যে এইরূপ ঝিমঝিম করিয়া উঠিয়াছিল।—কপালে ও নাকের নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। কেন জানি না দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিল। গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলাম। হাত পা অসম্ভব কাঁপিতেছে, দাঁড়াইতে পারিলাম না ; পায়ের দিকটা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সেবার টাইফয়েডের পর প্রথম খাট হইতে নামিতে গিয়া এইরূপ বোধ হইয়াছিল। ওয়ার্ডার দাঁড়াইয়া নিজের পাগড়ি ঠিক করিয়া লইল। পাগলটি চিৎকার করিতেছে। তিন নম্বর ভজন গান বন্ধ করে নাই। জুতার শব্দ নিকটে আসিতেছে—আরও আরও। তলপেটের মধ্যটা যেন খালি হইয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে পেটের ভিতরটি বরফের মতো ঠান্ডা। একবার কারনিভালে নাগরদোলায় দোল খাইবার সময় চাকাটি যখন উপর হইতে নিচে নামিতেছিল, তখন তলপেটে এইরূপ অনুভব করিয়াছিলাম। জিভটি শুকাইয়া উখার মতো খরখরে হইয়া গিয়াছে, আর যেন গলার মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে।

সরস্বতী! মা! জ্যাঠাইমা! নীলু! নীলু তুই একী করলি? একটি লোহার horizontal bar-এ, আমার অসাড় মৃতদেহটি ঝুলিতেছে। পা দুইটি শূন্যে দুলিতেছে উত্তর, উত্তরপূর্ব, পূর্ব, পূর্বদক্ষিণ, দক্ষিণ।

একী? বুটের শব্দ আর আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে না। আমার ওয়ার্ডারটি উঁকি মারিয়া ওয়ার্ডের আঙিনার দিকে দেখিতেছে। হঠাৎ তিন নম্বরের ভজন গান বন্ধ হইয়া গেল। আমার শ্রবণশক্তিও মানসিক উদ্বেগে হঠাৎ লুপ্ত হইল নাকি! না। গোঙার কথা বলিবার চেষ্টা করার মতো একটি শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছাইল। অতি করুণ, কাতর, অসহায় আর্তনাদ।

কে? কেন?…

এইবার! এইবার—কেবল অগণিত জুতার শব্দ মাত্র নয়—গৌরীশৃঙ্গের চূড়া ভাঙিয়া পড়িতেছে—কালবৈশাখীর উগ্র মাতন—আবার আর্তনাদ—ঘটঘটাচ্ছন্ন আকাশের বুকচেরা আর্তনাদ—'হুসিয়ারিসে'—পায়ের নিচের পৃথিবী ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল—নিচে—নিচে—অতল অন্ধকারের মধ্যে।

—'সামনে বাত্তি[১] দেখাও'—কতকগুলি বিকৃতাঙ্গ প্রেতের ছায়া ক্রমে ছোট হইয়া লণ্ঠনের আলোকে মিলাইয়া যায়। লণ্ঠনগুলি এইদিকে আগাইয়া আসিতেছে—সহস্র গ্রহ-উপগ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রতি লোমকূপে প্রত্যাশিত আতঙ্কের সাড়া—প্রতি স্নায়ুতে টাইফুনের বিক্ষোভ—এই আলোড়ন অক্ষিগোলকের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চায়।—তুমুল বাত্যাবিক্ষোভে আর বুঝি দাঁড়াইতে পারা যায় না।…দৃঢ় মুষ্টিতে গরাদ চাপিয়া ধরিয়াছি।

---

[১] আলো।

'রাষ্ট্রগগন্ কী দিব্বিয় জিয়োতি রাষ্ট্রীয় পতাকা নমোনমো'[১]···সন্ধ্যার কীর্তন ও গান শেষ হইল। ওয়ার্ডার দরজা বন্ধ করিতেছে আর আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে। শ্রোতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আর একজন ওয়ার্ডার।

'এক বাবু এখানে তো আর এক বাবু ওখানে। একজনকে ডাকিয়া ঘরে ঢুকাই তো আর একজন দেখি বাহির হইয়া গিয়াছে। কেহ পায়খানায় গিয়া বসিয়া আছেন ; কেহ পুজায় বসিয়াছেন ; কেহ বলিলেন, এক মিনিট সিপাহীজী ; কেহ বলিলেন, তাসের এ হাতটি শেষ হউক সিপাহী সাহেব। ফুদনবাবুর পায়চারি তো শেষই হয় না ; দেখিতেছেন দরজা বন্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি, তবুও ভিতরে ঢুকিবার নাম নাই। হজম করিবার জন্য যদি এত পায়চারির দরকার হয়, তাহা হইলে আর একটু কম খাইলেই তো হয়। বাড়িতে কী খাইতেন তাহা জানি। এখানে আপার ডিভিসন পাইয়াছে বলিয়া কি পেটে 'হওয়া পানি'র জন্যও একটু জায়গা রাখিতে নাই?'

মেহেরচন্দজীই 'রাষ্ট্রগগন্ কী' গানটির সুর জানেন। আমরা উঁহার সহিত সুর মিলাই মাত্র। এখানে এই গানের নাম 'প্রারথানা' (প্রার্থনা)। প্রার্থনার পূর্বে লণ্ঠন-গুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যহ উনি গানটির একটি লাইন ভুলিয়া যান। সেই সময় লণ্ঠনের শিখা একটু বাড়াইয়া দিয়া পকেট হইতে বাহির করেন, 'আশ্রম ভজনাবলী'। এতদিন হইতে গাহিতেছেন। তাঁহার ছাড়া পাইবার সময় হইয়া আসিল, কিন্তু এখনও উঁহার ঐ লাইনটি মুখস্থ হইল না। অন্য অনেকের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে কিন্তু সকলেই মজা দেখিতে চায়। মেহেরচন্দজী বোঝেন না যে, যখনই ঐ গানের মধ্যে ঐ লাইনটি আসে, আর উনি লণ্ঠন লইবার জন্য হাত বাড়ান, একটি চাপা হাসির শব্দে ঘর ভরিয়া যায়। আমি সেদিন লাইনটি মনে করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। দেখিলাম যে উনি তাহা পছন্দ করেন না। সেইজন্য আর কিছু বলি না।···

···এ ব্যবস্থা বেশ হইয়াছে। 'লকআপ'-এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা ও ভজন শেষ হয়। আগে দরজা বন্ধ হইবার পর 'প্রার্থনা' আরম্ভ হইত। কিন্তু দেখিলাম সোস্যালিস্ট পার্টির অনেকেই ইহা ভালবাসে না। ঐ দলের বরহম্‌দেও ও শিউপুজন একদিন প্রার্থনার সময় পাল্লা দিয়া বেসুরো স্বরে অন্য গান আরম্ভ করিয়াছিল। উহারা যে আমাদের গানে এতদূর বিরক্ত হয়, তাহা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। সেইদিন হইতে বলিয়া কহিয়া প্রার্থনার সময় আগাইয়া দিয়াছি, যাহাতে 'লকআপ'-এর পূর্বেই গান শেষ হইয়া যায়। মেহেরচন্দ, সদাশিউ, ইহারা কিছুতেই রাজী হইবে না। তাহারা বলে, 'আমরা ছোট হইব কেন? উহারা যে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত নাকের সম্মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে, লছমীকান্তের মার্ক্সক্লাসের লেকচারের ঠেলায় যে আমাদের ঘুমাইবার উপায় নাই—আমরা কি কিছু বলি? আপনি মাষ্টারসাহেব আমাদের অনুরোধ করিবেন না। উহাদের ঠাণ্ডা করিতে বেশি 'তকলিফ উঠাইবার' দরকার হইবে না।' কত বুঝাই। 'যাহা করিলে উহাদের সত্য সত্যই অসুবিধা হয়, তাহা আমরা করিব কেন? উহারা যাহা ইচ্ছা করুক, আমাদের দিক হইতে কর্তব্যের ত্রুটি হইতে দিব কেন? উহারা ছেলেমানুষ। তোমাদের আদর্শ মহাত্মাজীর দেখানো পথ। তাহা কত উচ্চে। তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে কেন? এইরূপ কত বুঝাইবার পর মনে মনে সন্তুষ্ট না হইলেও আমর কথা মানিয়া লইয়াছে। সেইদিন হইতে দরজা বন্ধ হইবার পূর্বেই আমরা সন্ধার প্রার্থনা সারিয়া লই। এখনও উহারা নেহাত ছেলেমানুষ। স্কুল কলেজের

১ 'জাতীয় গগনের দিব্যজ্যোতি জাতীয় পতাকাকে নমস্কার'।

ছাত্র। ভলিবল খেলার সময় সেদিন দেখি কমরেড মাধোরাম কমরেড মুরলী মিশিরের বুকের উপর বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। খাবার লইয়া এখনও তাহারা কিচেন ম্যানেজারের সহিত ঝগড়া করে! আজ এর সঙ্গে ওর কথা বন্ধ, কাল ওর সঙ্গে ঝগড়া, এসব তো নিত্য লাগিয়াই আছে। ঐ সব একরত্তি ছেলে। ওদের আবার দোষগুণের বিচার করিতে যাব আমরা! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকিয়াছে...এখনও আমরা আমাদের মনের বৃত্তিগুলি সংযত করিতে পারি নাই। আর উহারা তো ছেলে-মানুষ। উহাদের ত্রুটি বিচ্যুতি যদি গায়ে মাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের এপথে আসা বৃথা! বিলুও তো ঐ দলের মেম্বার—ওদের প্রত্যেকটি ছেলে যে আমার কাছে বিলুর মতো।...

আজ রাত্রিটা অন্তত যদি বিলুর কাছে থাকিতে পারিতাম। না, একসঙ্গে না থাকায় ভালই হইয়াছে। তাহা হইলে হয়তো দুজনেই ভাঙিয়া পড়িতাম—তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথা তো বলিয়া লইতে পারিতাম। হয়তো কথাই খুঁজিয়া পাইতাম না। ছেলেরা তো কোনো কালেই আমার সঙ্গে নেহাত কাজের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলে না। আমার সম্মুখে আসিলেই বিলু দেখি সংকুচিত হইয়া যায়,—কেমন যেন জড়সড় ভাব। সপ্রতিভতা উহার চিরকালই একটু কম। ও চিরকালই কুনো। কিন্তু সে দোষ তো আমার শিক্ষা দেওয়ার। উহাদের যেমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি, উহারা তেমনি গড়িয়া উঠিয়াছে। যদি শিক্ষার ত্রুটির জন্যই উহার স্বভাব এমন হইবে তাহা হইলে নীলুর স্বভাব এরূপ হইল না কেন? হইতে পারে যে বিলুকে ইংরাজি পড়াই নাই বলিয়া উহার মধ্যে একটি inferiority complex আছে। নীলু কলেজে পড়িয়াছে, সেই জন্যই বোধ হয়, নীলুর মনের মধ্যে এ ভাব নাই। ছেলেদের বাহিরের ব্যবহারের কথা বলিতে পারি না; তবে আমার ও উহাদের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহার জন্য দায়ী আমি। কোনো দিন উহাদের সহিত প্রাণখোলা ভাবে মিশি নাই। কোলে পিঠে করিয়া আদর করি নাই। আমার ধারণা ছিল ছেলেদের সহিত বন্ধুভাব স্থাপন করিলে উহাদের শাসন করা শক্ত। উহাদের সহিত কম কথা বলো, উহারা ভয় ও সমীহ করিয়া চলিবে; উহাদের নাই দাও, মাথায় চড়িয়া বসিবে। এ-বিষয়ে আমি আর কাহারও কথা কোনোদিন মানি নাই। ছিলাম স্কুলমাষ্টার। অভ্যাসদোষেই হউক বা অন্য কোনো কারণেই হউক, পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই এই শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছি। সেইজন্য রাজনীতিক্ষেত্রেও বড়কে গুরু বলিয়া মনে করি; ছোটকে শিষ্যের দৃষ্টিতে দেখি; কমরেড কোনো দিন হইতে পারিলাম না।...জিতেন যখন ছোট ছিল, চব্বিশ ঘণ্টা যদুদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। বাবার মোটা লাঠিটি হাতে করিয়া নাদুস-নুদুস ছেলেটি তাঁহার আগে আগে চলিত—হাটে বাজারে, ভোজে সর্বত্র। তখন বাবার সঙ্গে আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় আসিয়া, আমার সহিতও দিব্যি আলাপ জমাইয়া লইয়াছিল। পরের ছেলেকে আদর করা, তাহার জন্য লজেন্স আনিয়া পকেটে রাখা, নিজের ছেলেদের সহিত ব্যবহারের এই পার্থক্য বিলুর মা'র চোখেও অসংগত লাগিয়াছিল। বিলুর মা কম কথার মানুষ। তাহাকে একদিন সে সময় মুখ ফুটিয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'নিজের ছেলের দিকেও একটু ফিরে তাকিও।' একটু হাসিয়া সেদিন মনের অস্বস্তি দূর করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তখন হইতে যদি ছেলেদের সহিত একটু মেলামেশার সম্পর্ক রাখিতাম, তাহা হইলে আজ তাহাদের সহিত সম্বন্ধ হইত স্নেহ ভালবাসার, ভয় ও সমীহের নয়। নীলু বিলুর আদর আবদার যা কিছু সব মায়ের সঙ্গে। একসঙ্গে খাওয়া বসা, মনের কথাটি বলা, ছেলেবেলার মতো এখনও সব সেই রকমের বজায় আছে।

...ছেলেদের নাম মনে করিতে গেলে মনে আসে নীলু বিলু—আগে নীলু, তাহর পার বিলু। বিলু বয়সে বড়, কিন্তু আগে বিলুর নাম মনে আসে না। কার্তিক গণেশই যেন ঠিক! সব কার্যারম্ভেই গণেশের নাম। কিন্তু আগে গণেশ, তাহার পর কার্তিক বলো তো,— গণেশ কার্তিক, নাম দুইটি যেন আর এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করাই যায় না।

সদাশিউ আমার মশারি ফেলিয়া দিতে আসিয়াছে। হয়তো ভাবিতেছে আমি জপে বসিব। মশার জ্বালায় কি মশারির বাহিরে পূজায় বসিবার জো আছে। মশার কামড়ে মনের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়। রাত্রে শোবার সময় মশারি ব্যবহার করি না। শরীরকে যত সওয়াও তত সয়। মশার কামড় সহ্য করিবার মতো সহিষ্ণুতা যদি না থাকে, এতটুকু কৃচ্ছ্রসাধন করিবার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহা হইলে বড় কাজ আমাদের দ্বারা কী করিয়া হইবে? বিলুর তো মশারি না থাকায় কত অসুবিধা হয়। ইশারা করিয়া তাহাকে মশারি ফেলিতে বারণ করি। আজ সোমবার। আমার মৌন-ব্রত। মহাত্মাজী করেন 'আত্মশুদ্ধির' জন্য। তিনি যে কাজ করা ভাল মনে করেন তাহা কি আমরা না করিয়া পারি। অন্য অন্য সোমবারে সন্ধ্যার পূর্বে পূজা করিয়া তাহার পর উপবাস ভঙ্গ করি। খাইবার পর কথা বলি। তাহা লক্ষ্য করিয়াই সদাসিউ আমার পূজার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে। ভারি ভাল ছেলে সদাশিউ—সত্য সত্যই সদাশিব। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বস্ত্র-স্বাবলম্বী' প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম লেখায় ও সেই হইতেই প্রত্যহ অন্তত এক হাজার গজ সুতা কাটে।...

আপার ডিভিসন ওয়ার্ড। প্রকাণ্ড বড় হল ঘর। এখন চৌত্রিশ জন বন্দী এই ঘরে থাকে, উনিশ জন নিরাপত্তা বন্দী ও পনেরো জন রাজবন্দী—যাহাদের সাজা হইয়াছে, কিংবা যাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতেছে। মধ্যের দরজার পাশে আমার সিট। ঘরের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা, আর তাহাদের দুইপাশে দেওয়াল ঘেঁষিয়া সারি সারি চৌকি। তাহাতে নেটের মশারি টাঙানো। প্রতি তক্তাপোশের পাশে একটি টেবিল, একখানি চেয়ার ও একটি করিয়া বইয়ের শেল্‌ফ। অধিকাংশ চৌকির পাশে মেঝের উপর কম্বল বিছানো। টেবিলের উপর একখানি করিয়া টেবিল-ক্লথ। তাহার উপর আছে আয়না চিরুনি, আরও কত কী। লোহার গরাদ, তালা চাবি, আর ওয়ার্ডারের চেহারা না দেখা গেলে ইহাকে জেল বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই, ঠিক যেন কলেজের ছাত্রদের থাকিবার হোস্টেল। গত আগস্ট মাসে হরিহরজী আর তাহার থুনথুনে বুড়ো বাবাকে আণ্ডার-ট্রায়ালরূপে এখানে ধরিয়া আনে। তখন হরিহরের বাবা মনে করিয়াছিলেন যে পুলিস তাঁহাকে একটি ধর্মশালায় আনিয়াছে। পরে জেলে লইয়া যাইবে। বৃদ্ধ একবার তাঁহার ছেলেকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে কখন জেলে লইয়া যাওয়া হইবে। তাঁহাকে পুলিস দিন কয়েক পরে ছাড়িয়া দেয়। ১৯২১-১৯২২-এ যখন জেলে আসি, তখনকার জেল আর এখনকার জেল, আকাশ পাতাল তফাৎ। সেবার ছিলাম সাধারণ কয়েদীর শ্রেণীতে। প্রত্যেক কয়েদীকে কাজ করিতে হইত। 'সরকার সেলাম' লইয়া কত গোলমাল। কোথাও যাইতেছে—হঠাৎ মেটের কর্কশ স্বর কানে আসিত, জোড়া ফাইল বাহন্‌কর চলো।' পায়খানায় যাইবার সময় পর্যন্ত ঐরূপ লাইন বাঁধিয়া যাইতে হইবে। সকলের হাতে একটি করিয়া লোহার পাত্র। খাওয়া-দাওয়া সব কাজই ঐ পাত্রটি দিয়াই সারিতে হইবে। কথায় কথায় 'ডান্ডাবেড়ী' (Bar fetters), 'খাড়া হাতকড়া', 'চট্টি পেন্‌হাও' (Sackcloth) প্রভৃতি সাজা। তাহার সহিত আজকের অবস্থার তুলনা হয়? চলা-ফেরা খাওয়া-দাওয়া,

থাকা সম্বন্ধে প্রত্যেকটি সামান্য অধিকার পাইবার পিছনে আছে কত ত্যাগ, কত বিস্মৃত শহীদের আত্মবিলোপন। কিন্তু আশ্চর্য ইহাদের বিচার! আমাকে দিল আপার ডিভিসন, আমার স্ত্রীকে দিল আপার ডিভিসন। আমাদের ছেলে বিলুকে ডিভিসন থ্রি।…

চরখাটি লইয়া বসা যাক। মনের উদ্‌বেগ শান্ত করিতে এমন জিনিস আর নাই। কিছুক্ষণ একাগ্র মনে চরখা কাটিলে দেখিয়াছি স্নায়ুর উত্তেজনা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে। ডাক্তাররা হাসুক, সোস্যালিস্টরা অবিশ্বাস করুক, আমার যে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। চরখাটি লইয়া খুলিয়া বসিলাম। সদাশিউ কী যেন বলিতে চায়। না হইলে দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন? চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করি 'কী'? সে আমতা আমতা করিয়া বলে, 'আমরা কয়েকজন এখন 'সূত্রযজ্ঞে' বসিতে চাই। আপনার তাহাতে কিছু অসুবিধা হইবে না তো?' ইঙ্গিতে তাহাকে বলি 'বসো।' আজকালকার ছেলেরা এত ফর্ম্যালিটি মানিয়া চলে! আশ্চর্য! একসঙ্গে বসিয়া চরখা কাটিবে সে তো আনন্দের কথা। তোমাদের এরূপ সুমতী হইলে তো বাঁচিয়া যাই। ইহাতে আবার আমার মত লইবার কী আছে? আমি তো ইহাই চাই। ভয় তোমাদের লইয়া সোস্যালিস্টরা তোমাদের দলের সদস্য করিবার জন্য সর্বক্ষণই দেখি ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। তোমাদের উপর ভরসা আর পাই কই?… সন্ধ্যাবেলার ন্যায় প্রাতঃকালেও প্রার্থনা করার প্রস্তাব ইহাদের কাছে তুলিয়া সেদিন কী অপ্রস্তুতই হইতে হইল! মেহেরচন্দকে পর্যন্ত আমার আড়ালে ঠাট্টা করিয়া বলিতে শুনিলাম, দশ আনার খোরাকিতে আর দুইবেলা প্রার্থনা করা পোষায় না। রেশন পাঁচসিকা করিয়া দিক, তাহার পর দুই বেলা 'সামূহিক' প্রার্থনা করিব। জিনিসপত্র দুর্মূল্য হওয়ার জন্য শীঘ্রই শুনিতেছি বারো আনা করিয়া 'খোরাকি' হইবে। বাড়িবার পর সপ্তাহে একদিন করিয়া ভোরবেলা প্রার্থনা করিতে পারি! বলে, আর হি-হি করিয়া হাসে। প্রার্থনা না করিতে চাও করিও না। কিন্তু প্রার্থনার কথা লইয়া ঠাট্টা তামাশা করিতে লজ্জাও করে না! তোমরা হইলে গান্ধীজীর শিষ্য, সত্যাগ্রহী; তোমরা তো আর নাস্তিক নও। তোমরাও যদি এই সকল বিষয় লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করো তাহা হইলে সোস্যালিস্টদের যাহা মনে আসে তাহা বলিলে দোষ দিব কী করিয়া?

সদাশিউ ও মেহেরচন্দ সারি সারি কম্বল বিছাইয়া দিল। আমার সিট ঠিক ওয়ার্ডের মধ্যখানটিতে। ঘরে ঢুকিতে বাঁ দিকে থাকে মহাত্মাজীর ভক্তের দল অর্থাৎ কংগ্রেসের মেজরিটিপন্থীরা। ইহাদের ছাড়া সেদিকে আছে একজন কম্যুনিস্ট, একজন কিষাণসভার সদস্য। এই দুই জনকে গভর্ণমেন্ট কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে ইহারাই তাহা জানে না। ইহারা তো অন্তরের সহিত বর্তমান যুদ্ধে গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতে চায়। ঘরের ডান দিকটিতে থাকে সোস্যালিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা। মধ্যে আমি বাফার—(buffer)। জেল হইতে এইরূপ ভাবে সিটের বন্দোবস্ত করিয়া দেয় নাই। নিজের সুবিধামতো অনেক দিনের সিট অদলবদলের ফলে, এইরূপ স্থিতি দাঁড়াইয়াছে। আমার সিটের কাছেই ওয়ার্ডে ঢুকিবার দরজা। দরজার সম্মুখে অনেকখানি স্থান একেবারে খালি। এই স্থানটি একে রাস্তার উপর পড়ে, তাহাতে আবার ইহার ঠিক উপরে পায়রার বাসা। সেইজন্য, এখানে কোনো সিট নাই। এখানেই কম্বল পাতিয়া সকলে চরখা আনিয়া বসিল;

রামচন্দ্র, কিষণদেও, হরিহর, রামদেনী, সদাশিউ, রামশরণ, ভূষণপ্রসাদ, রামলোচন, মেহেরচন্দ্র। অধিকাংশ নামের প্রথমেই দেখি রাম কথাটি। রামদেনী ছাড়া আর সকলেরই সম্মুখে যারবেদা 'চক্র'। আর রামদেনী জেলে আসিয়া চরখা কাটা শিখিয়াছে, রেমিসনের লোভে। থানা রেড, আর খাসমহল কাছারি জ্বালানো, এই দুই অপরাধে বেচারার বারো বৎসর সাজা হইয়াছে। জেল হইতে সে চরখা কাটার কাজ পাইয়াছে। সেইজন্য তাহার সম্মুখে জেলের দেওয়া প্রকান্ড 'বিবার চরখা' দুইজন লোকের জায়গা জুড়িয়া আছে। রামদেনী যেদিন প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলে যে, সে জেলের কাজ করিতে রাজী আছে তাহাকে কাজ দেওয়া হউক, সেদিন সকলে উহাকে একঘরে করিবার কথা তুলিয়াছিল। রাজবন্দী আবার কাজ করিবে কী? কিছু দিন হইতে দেখিতেছি যে আবার সকলে উহার সহিত কথাবার্তা বলা আরম্ভ করিয়াছে। উহারা চরখা আনিয়া বসিতেই, ডান দিকের একটি সিট হইতে চরখার শব্দের নকল করিয়া একজন মুখ দিয়া শব্দ আরম্ভ করিল—আর দুই তিন জন হাসিয়া উঠিল। সুখলাল না হইলে আর কে হইবে? না সুখলাল নয়, কমরেড সুখলাল ; ছাই মনেও থাকে না। বেশ নকল করিতে ও ক্যারিকেচার দেখাইতে পারে ছোকরাটি।

দুটি লন্ঠনে এতগুলি লোকের সুতা কাটার মতো আলো কি হয়? কিন্তু আর আলো পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? যুদ্ধের জন্য কেরোসিন তেলের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে। মাথাপিছু তেল দেয় বোধহয় সিকি ছটাক। সেইজন্য কয়েকজন মিলিয়া একটি লন্ঠন জ্বালাইতে হয়। ওয়ার্ডের বাহিরে ইলেট্রিক আলো জ্বলিতেছে। ওয়ার্ডের ভিতরে কয়েকটি আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিলে কী হয়? গভর্ণমেন্ট কী ভাবে বুঝি না। উহাদের ভয় যে, ইলেকট্রিক আলো দিলেই কয়েদীদের আত্মহত্যা করার সুবিধা হইবে। সকলেই যেন আত্মহত্যা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে! সেইজন্যই জেলের যত পুরাতন ইঁদারা আছে সবগুলি কাঠের তক্তা দিয়া মজবুত করিয়া ছাওয়া রহিয়াছে। নজিরের অভাব নাই, কবে কোন আসামী ইঁদারার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এইতো সেদিন কয়েকজনের ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি হইবার পর, আমি ডাক্তারকে বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ওয়ার্ডে এক বোতল ইলেক্ট্রোলিটিক ক্লোরিন দিলে, পানীয় জলে সকলে যাহাতে উহা নিয়মিত ব্যবহার করে, তাহার ব্যবস্থা আমি করিতে পারি। ডাক্তারবাবু হাতজোড় করিয়া আমাকে বলিলেন, 'মাফ করবেন মশাই, অমন অনুরোধ করবেন না। আর পেন্সন নেওয়ার মাত্র তিন বৎসর দেরি আছে। এরই মধ্যে দুইবার ডিপার্টমেন্টাল এক্‌শন্‌ হয়েছে। একবায় একজন এক শিশি মালিশের ঔষধ খেয়েছিল ; আর একজন ফিনাইল খেয়েছিল। আমার উপর এক্‌সপ্লেনেশন চাওয়া হল কিনা, এতটা ফিনাইল একসঙ্গে কোনো কয়েদী পায় কী করে। যেন 'সাফাইয়া' (মেথর) কয়েদীর কাছ থেকে আর কেউ ফিনাইল নিতে পারে না। এ ডিপার্টমেন্টের কি আর কিছু মা বাপ আছে মশাই?'

একসঙ্গে অনেকগুলি চরখার নানারকম শব্দ শুনিতে ভারি ভাল লাগে। অনেক উঁচু দিয়া যেন এরোপ্লেন উড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। মনে পড়াইয়া দেয় যে সোনার ভারত গড়িয়া তুলিবার পথে আমি একলা পথিক নই। ইহা তো কেবল এত গজ এত হাত সুতা কাটা মাত্র নয়। এখন যে চরখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহা যে রামরাজ্য ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র অস্ত্র। রামরাজ্য হইবে প্রেমের রাজ্য, গৌরাঙ্গের

রাজা ; লোকে হিংসা দ্বেষ ভুলিবে। পরিশ্রম করো ; সুখে খাও দাও থাকো, কাহারো অভাব নাই। প্রত্যেকের গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান। যত গজ সুতো কাটিবে, ততটা লক্ষ্যের নিকটে পৌঁছিবে। একজন আর একজনকে সাহায্য করিতেছে, ধনী দরিদ্রকে নিজের বিত্ত বিলাইয়া দিতেছে। গ্রামগুলি আর নিজের প্রয়োজনের জন্য বাহিরের দিকে তাকাইয়া নাই। দরিদ্রের শোষণের সব পথ বন্ধ। কাহারও মুখাপেক্ষী নয় তো শোষণ করিবে কেমন করিয়া। ··'সূত্রযজ্ঞ' মনে করাইয়া দেয় যে আমার ধরনে তাহা হইলে আরও অনেক ভাবে। দলে দলে রাজনৈতিক কর্মীরা আমাদের মত ছাড়িয়া চলিয়াযাইতেছে। বোঝোনা-বোঝো, মানোনা-মানো, সোস্যালিস্ট হওয়া তো একটি ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নীলু বিলুর কথাই ধরো না। এই তো ১৯৩০—৩২-এ কত চরখা কাটা, কত রকমের কথা! এমনভাবে উহারা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে আমি কোনদিন ভাবি নাই, যে ঐ উচ্চ আদর্শ উহারা কোনোদিন ছাড়িতে পারিবে। যাহারা এখনও আমার মতাবলম্বী, তাহারা চলিয়া গেলে হয়তো আমারই মনে সন্দেহ হইবে যে আমার পথ ঠিক তো? নিজের দেশের বেদ পুরাণ, মুনি ঋষি, ইতিহাস সব গেল—সকলেয় নজর রুশের উপর। আরে, রুশ কি নিজের দেশের চাইতেও উঁচুতেও? দেশ বিদেশের ইতিহাসের কথা আমরাও পড়িয়াছিলাম। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, ওয়াশিংটন, কোসুথের অমর কাহিনী আমাদেরও রোমঞ্চ আনিয়া দিত। তাঁহাদের কীর্তির প্রেরণাই তো আমাদের ছাত্রাবস্থায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরবকথা ভুলিয়া যাই নাই। বিবেকানন্দের বাণী ছাড়িয়া মার্কসের বুলির ফাঁদে পড়ি নাই। মহাত্মজী অপেক্ষা স্ট্যালিনকে বড় বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। বিদেশী মনীষীদের লেখা পড়িবে না কেন, পড়ো। আমরাও কি বেনহাম, স্পেন্সার, মিল পড়ি নাই? কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে? বিলু যখন প্রথম কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করে, তখনও যদি উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে হয়তো আজও তার এরূপ ঘটিত না। আর বিলুকে শাসন করিতে পারিলে নীলুও হাত হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারিত না। কান টানিলে মাথা আসে। দাদা যাহা করিবে তাহার তো সকল জিনিস নকল করা চাই, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক—সে বুঝুক আর নাই বুঝুক। কিন্তু গায়ের জোরে কি কাহাকেও কোনো মতের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়—আর বিশেষ করিয়া যাহরা নেহাৎ বুদ্ধিহীন নয়। বিলু হইল বয়স্ক ছেলে—আর তাহাকে করিতে যাইব শাসন? আর কী জন্য?—না, আমার মতের সহিত মত মেলে নাই বলিয়া? তাহার ব্যক্তিত্বের এতটুকু সম্মান যদি আমি না রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পথের সংযম ওসহনশীলতা থাকিল কোথায়? উহারা তো নির্বোধ নয়। আমি যে সকল কথা উহাদের বুঝাইতে পারিতাম, তাহা কি উহারা নিজেরাই বিচার করিয়া দেখে নাই? উহারা যে আমার মতেরই আবহাওয়ায় রাজনৈতিক আশ্রমে মানুষ। উহারা যে এবিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদাভেদও জানে। এসব বিষয়ে কত আলোচনা, কত সময় কত স্থানে শুনিয়াছি। বিলু তো তিনমাস সবরমতী আশ্রমেও ছিল। মহাত্মাজীর পায়ের ধুলা লইবার সুযোগ নীলু বিলু দুই জনেরই হইয়াছে। উহারা পুণিয়া আশ্রমে মহাত্মাজীর সহিত ফটোও তোলাইয়াছিল। হউক অল্পদিনের, তবুও এমন মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহার প্রভাব যাহাদের উপর খাটিল না—সেখানে আমার কিছু করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আর আমি যখন সরকারী স্কুলের হেমডাস্টারির চাকরি ছাড়িয়া রাজনীতি

ক্ষেত্রে আসি তখন কি কাহারও কথা শুনিয়াছিলাম! পৃথিবীসুদ্ধ লোক বারণ করিয়াছিল। ডি-পি-আই আমার পদত্যাগের দরখাস্ত চাপিয়া রাখিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বুঝাইবার জন্য। পাটনার সেই সাহেবের কুঠিতে সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি; দেখিলাম সাহেবের বেহারাটি পর্যন্ত আমার পদত্যাগের কথা জানে। অন্যবার দেখা করিবার কার্ড দিবার সময় বেহারাটিকে খোসামোদ করিতে হইত। বকশিশ দিতে হইত। আরদালিটি দেখাইত কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব। আর এখন দেখিলাম গড় হইয়া পায়ের ধুলা লইল। 'মাস্টারসাহাব শুনতে হেঁ স্বরাজীমে শরীক হুয়ে হেঁ'।[১] আমাকে প্রণাম করিতে পারিয়া, আমার কোনো কাজ করিয়া দিতে পারিতেছে বলিয়া, কৃতজ্ঞতায় তাহার মুখ গদ্‌গদ্ হইয়া উঠিয়াছে। বলিয়াই ফেলিল, 'আমারও মনের ইচ্ছা স্বরাজীমে যাইয়া আপনাদের কুছ সেবা করি। ছেলেটা আগামী বৎসর 'মিডিল ইমতিহান'[২] দিবে। তাহার পর সাহেবকে বলিয়া উহার একটি চাকরি করিয়া দিব। তারপর আমিও 'স্বরাজীমে' যাইব।' ডি-পি-আই-এর নেকনজরে আমি ছিলাম। বি-টি পড়িবার সময় তিনি ছিলেন আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল। সাহেব হাত ধরিয়া বসাইলেন, গুরু শিষ্যের সুরেই কথাবার্তা হইল,—উপরওয়ালা, আর অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নয়। আসিবার সময়ও সাহেব বলিলেন, 'সান্যাল ভুল করিতেছ। আবার ভাবিয়া দেখিও!' তখন বলিয়া আসিয়াছিলাম, 'এতকাল ভুল করিয়া আসিতেছিলাম, আর করিব না।'…পাড়ার বৃদ্ধ মিত্তির মশাই, কালীবাড়ির পিছনের ইটের পাঁজার কাছে লইয়া গিয়া, খুব দরদের সহিত আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, 'কেন এসব ব্যাপারে পড়িতেছ। বিয়ে-থা করিয়াছ। স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে। একেবারে আগে পিছে না ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া কি ভালো? ভারতবর্ষের অন্য সব জায়গায় যদি স্বরাজ হয়, তাহা হইলে পূর্ণিয়াতেও হইবে। এ জায়গাটুকু বাদ দিয়া তো আর স্বরাজ হইবে না। কত লোক কত রকম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। কাহারও কথায় কি আমি কান দিয়াছিলাম? এপথে আসিবার পূর্বে কি কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়াছিলাম? জিজ্ঞাসা করিবার মধ্যে একমাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বিলুর মাকে। তাও ঠিক জিজ্ঞাসা নয়। নিজের সংকল্প স্থির করিবার পর, এরকম জানানো। সে কী ভাবিয়াছিল তাহা জানি না; কেবল বলিয়াছিল, 'তুমি যা ভাল বোঝো তাই করো। মেয়ে মানুষের আবার মতামত।' আমি কাহারও মত লইয়া চলি নাই। যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি। আর বিলুই বা আমার মতামত লইয়া চলিবে কেন?…

একটি চরখা হইতে গরুর গাড়ির চাকার শব্দের মতো ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হইতেছে। এই শব্দের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি, কানে বড়ই কর্কশ লাগিতেছে। সিমেণ্টের মেঝের উপর দিয়া একটি ধাতুনির্মিত বাসন টানিয়া লইয়া গেলে, এইরূপ অসহ্য মনে হয়। নরম ঘা'র ওপর দিয়া কেহ যেন শিরীষ কাগজ ঘষিতেছে। জেলে আসিবার পূর্বে আমার এই স্নায়বিক দৌর্বল্য লক্ষ্য করি নাই। আমার সুস্থ স্নায়ুমণ্ডলী অল্পতে বিচলিত হয় না, ইহাই ছিল আমার গর্ব। এবার জেলে আসিয়া একী হইল! নিশ্চয়ই রামদেনীর চরখা হইতে এই শব্দ আসিতেছে। আম্যর হাতের সুতা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া রামদেনীর চরখার দিকে তাকাই। রামদেনীর সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। রামদেনী চরখা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। নিজের সিটের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেছে। সকলেই উহার দিকে তাকাইয়া আছে, বোধ হয় ভাবিতেছে, এ কি

১ 'মাষ্টারসাহেব শুনলাম স্বদেশীর দলে যোগ দিয়েছেন।' ২ মধ্য ইংরাজি পরীক্ষা।

শিষ্টাচারের অভাব! 'সামূহিক চরখা'[১] ভিতর হইতে উঠিয়া যাওয়া! রামদেনী ফিরিল, হাতে তেলের শিশি। চরখায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তেল ঢালিয়া দিল। তাহার পর আবার সূতা কাটা আরম্ভ করিল। সকলেই দেখিতেছি সূতা কাটিতেছে আর আমার দিকে তাকাইয়া মধ্যে মধ্যে কি দেখিতেছে; আমার চেহারায় কিছু পরিবর্তন দেখিতেছে কি? আজ কিছুদিন হইতে আমার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব—যে সংশয় চলিতেছে, তাহার ছাপ কি ইহারা আমার চোখে মুখে দেখিতে পাইয়াছে? মনের ভাব কি চাপা যায়? গরমের মধ্যে উপোস করিয়া হয়তো আমাকে শুকনো-শুকনো দেখাইতেছে। না, উপোস তো কতদিন হইতে প্রতি সোমবারে করিয়া আসিতেছি, উপোসের জন্য কিছু হয় নাই। ইহাদের সমবেদনার মূল্য কী দিতে পারি? আমি যাহাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও মনের অশান্তি ভুলতে পারি, সেইজন্যই ইহারা একসঙ্গে চরখা কাটিতে বসিয়াছে। সকলে মিলিয়া আমার বোঝার ভার লইয়া আমার মন হালকা করিতে চায়।···

···মাথাভরা কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে রং, একটু মেয়েলি লম্বা ধরনের মুখ, চিবুকটি সরু, কালো চোখের গভীর দৃষ্টি ভাবুকতায় ভরা। আমি বিলুর দিকে তাকাইলেই সে চোখ নামাইয়া লয়।···কিন্তু ঐ চোখ হইতেও বজ্রের বহ্নিশিখা বাহির হইতে দেখিয়াছি।...আমার চাকরি ছাড়িবার কিছুদিন আগের কথা। হাইস্কুলের পাশে 'প্লান্টারস্ ক্লাব'। দুই কম্পাউন্ডের মধ্যে তারের বেড়া। ক্লাবে একটি চ্যারিটি মেলা না কী হইতেছে। মেমেরা নানাপ্রকার শৌখিন জিনিসের দোকান খুলিয়াছে। নীলু, আর বিলু ঐ তারের উপর চড়িয়া, সাহেব মেমেদের উৎসব দেখিতেছে। নীলু তখন খুব ছোট; বিলু মধ্যের তারটির উপর নীলুকে দাঁড় করাইয়া ধরিয়া আছে। কাঝাকুঠির পেরিন সাহেব হঠাৎ দেখি আমার কোয়ার্টারের গেটের ভিতর আসিয়া ঢুকিল; হাতে ছড়ি, উদ্ধত দৃষ্টি। আমাকে বলিল—'লেডিজ' স্টল খুলিয়াছে। কম্পাউন্ডের তারের উপর দিয়া ছেলেরা চব্বিশ ঘন্টা হাঁ করিয়া কী দেখে? 'ইউ সি হেডমাস্টার' এ যদি তুমি বন্ধ না করিতে পার, তাহা হইলে আমরা নিজেরাই দেখিব কী করিয়া এই অসভ্যতা বন্ধ করিতে হয়। তারের বেড়ার উপর উপবিষ্ট, নীলুর দিকে সাহেব ছড়ি দিয়া দেখাইয়া,—যেমন অশিষ্ট বলদৃপ্ত ভঙ্গিতে আসিয়াছিল, তেমনি ভাবেই চলিয়া গেল। আমি বিলুকে ডাকিয়া বলিলাম—খবরদার, ওদিকে যেও না। যে বিলু আমার মুখের দিকে তাকাইতে পারে না, তাহার চোখে দেখিয়াছিলাম সুপ্ত পৌরুষের ব্যঞ্জনা।··· আমার দিকে তাকাইল, যেন চোখ দুইটি হইতে আগুনের ফুলকি ছিটকাইয়া পড়িল। 'কেন, ওখানে গেলে কী হয়েছে?' আমাকে জিজ্ঞাসা করা 'কেন'? আমার কথার উপরে কথা? কান ধরিয়া টানিতে টানিতে উহাকে বাড়ির ভিতর লইয়া গেলাম। উহার মা তখন রান্নাঘরে। 'দ্যাখো তোমার গুণধর ছেলের কান্ড! সাহেবসুবোর সঙ্গে ঝগড়া করে কি চাকরি থাকে?' পরে আমি আমার ঘরের বারান্দা হইতে শুনিলাম, মা'র সহিত বিলু তর্ক করিতেছে, 'কেন? আমাদের জমি থেকে সাহেব মেমের মেলা দেখছিলাম, তাতে হয়েছে কি?'···সে রাত্রে বিলু খায় নাই, রাগে কি অভিমানে জানি না। অর্ধেক রাত্রে বিলুর মা আমাকে ডাকিয়া জাগাইল। বিলু তো বিছানায় নাই। বিলু কোথায় গেল? খোঁজ খোঁজ! চাকর-বাকর, স্কুলের দরয়ান, আমি, সকলে লাঠি লন্ঠন লইয়া বাহির হইলাম। বিলুর মা হাউমাউ করিয়া কাঁদিতেছে, আর আমাকে দোষ দিতেছে যে ঐ একরত্তি

১ অনেক লোক একত্রে বসিয়া চরখা কাটা।

ছেলে মেমদের খেলা দেখিয়াছে, ইহার মধ্যে মেমদের অপমান হইল কোথা হইতে? কোথাও বিলুকে পাওয়া যায় না। শেষকালে একজন বোর্ডিং-এর ছেলে বিলুকে খুঁজিয়া বাহির করিল।—দিনের বেলা যেখান হইতে নীলু আর বিলু মেম দের খেলা দেখিতেছিল, ঠিক সেইখানে তারের বেড়ার উপর বিলু বসিয়া আছে। মেলার আলো কখন নিবিয়া গিয়াছে। বিলু কিন্তু আমার ভর্ৎসনার অন্যায্যতা প্রমাণ করিবার জন্য, তাহার নিজের অকাট্য যুক্তির সহিত কাজের সংগতি রাখিবার জন্য, এই অন্ধকার শীতের রাত্রে একলা এখানে আসিয়া বসিয়া আছে। গায়ে একখানি কচিকলাপাতা রং-এর আলোয়ান ছাড়া আর কিছু নাই। খালি পা। হাত পা বরফের মতো ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে।

জোর করিয়া বিলুকে দিয়া কেহ কিছু করাইয়া লইবে তাহা হইতে পারে না। উহাকে ঠকাইয়া, খোসামোদ করিয়া বা উহার কোমল হৃদয়ের সুবিধা লইয়া, উহাকে দিয়া লোকে যে-কোনো কাজ করাইয়া লইতে পরে। কিন্তু গায়ের জোর দেখাও, বিলু রুখিয়া দাঁড়াইবে। মুহূর্তের মধ্যে স্বাভাবিক নমনীয়তা কোথায় চলিয়া যায়। উহার বাল্যকাল হইতেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। বছর কুড়িক আগের কথা হইবে। বিলুর মা'র চিৎকার শুনিয়া, জেলা কংগ্রেস অফিসের ঘর হইতে উঠিয়া, আমার কুটিরের দিকে চলিলাম। শুনিলাম বিলুর মা চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'বল্ শীগ্গির—এখনও বল্। তুই নিশ্চয়ই মুসলমানের থুতু খেয়েছিস্। আবার না বলছিস্?' বাড়ি ঢুকিয়া দেখি বিলুর মা খুন্তি দিয়া নীলুকে মারিবার ভয় দেখাইতেছেন। আর এক হাতে একটি নলভাঙা চুনারের টিপট্—তাহার ভিতর সুজি থাকে। রাগের জ্বালায় টিপট্‌টি নিচে রাখিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি শুনিলাম। নীলু বিলু গিয়াছিল বেহবুদ মোক্তারের বাগানে কুল খাইতে। সেখানে বেহবুদ মোক্তারের জামাই উহাদের ধরে। দুইজনকে এক একখানি কুলের পাতার উপর থুতু ফেলিতে বলে, আর হুকুম দেয় যে উহা চাটিয়া ফেলিয়া বলিতে হইবে যে আর কখনও কুল পাড়িতে আসিবে না। ইহা না করিলে মারিবার ও মাস্টারসাহেবকে বলিয়া দিবার ভয় দেখায়! নীলু ভয়ে ভয়ে থুতু খাইয়াছে—বিলু রাজী হয় নাই। কী সব যেন বলিয়াছে তাহার পর—বেহবুদ মোক্তারেয় জামাই উহাদের ছাড়িয়া দেয়। এখন বেহবুদ মিয়ার মেয়ে আসিয়া বিলুর মা'র কাছে নালিশ করিয়াছে যে, বিলুরা তাহার স্বামীকে অপমান করিয়াছে। ইহাতেই সব কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে। বিলুর মা এখনও আসল প্রশ্নে অর্থাৎ কুলচুরি ও অপমান করার প্রশ্নে হাত দেন নাই। এখন তাঁহার নিকট যেটি মুখ্য বিষয় তাহারই উপর জেরা চলিতেছে—নীলু যে থুতুটুকু খাইয়াছে, তাহা সত্যই নীলুর, না বেহবুদ মোক্তারের জামাইয়ের।···

চমকিয়া উঠিয়াছি। হো! হো! হো!—সমস্ত ঘরটি কম্পিত করিয়া এতগুলি চরখার সম্মিলিত ঘর্ঘরধ্বনি ডুবাইয়া দিয়া, হাসির রোল উঠিল। আমার ডান দিকে দুইটি সিটের পরে, জানালার পর্দা ও বিছানার চাদর দিয়া ঘিরিয়া একটি ঘরের মতো খাড়া করা হইয়াছে। ইহারই ভিতর হয় সোস্যালিস্টপার্টির 'ক্যাপিটাল' ক্লাস। ফরওয়ার্ড ব্লকের চারজন ও ক্লাসে যোগদান করে না; তাহারা দিনের বেলায় একত্র বসিয়া কী কতকগুলি মার্ক্সিস্ট বই পড়ে। 'ক্যাপিটাল' পড়িতেছে, তাহার মধ্যে আবার এত হাসি কিসের? এই গরমের মধ্যে আবার চারিদিকে পর্দা টাঙাইয়া বসিবার দরকার কী? আজকালকার ছেলেদের সবই অদ্ভুত। পর্দাগুলির উপর দিয়া রাশি রাশি

কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠিতেছে। উহারা সিগারেট খাইবার সুবিধার জন্য ঐরূপে পর্দা ফেলে না তো? না, সে দিন-কাল কি আর আছে? সিগারেট চুরুট খাইবার জন্য ইহাদের আর কোন আড়াল দরকার হয় না। ওদের দলের কমরেড বাণারসী—বিলুর চাইতে কত ছোট, বিলুর ছাত্র—আমারই সঙ্গে বিলুর সম্বন্ধে আসিয়া গল্প করে,—মুখের কোণে একটি সিগারেট। সকলে জেল-অফিসের পার্সনাল একাউন্ট হইতে টাকা ধার করে, আবার ওদিকে…

'কিৎনে আদমী হ্যাঁয় আপলোগ?'

তাহা হইলে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। নূতন ওয়ার্ডার আসিয়াছে। ঘেরা পর্দার মধ্য হইতে একজন ওয়ার্ডারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'যাও, চিল্লাও মৎ'। আর একজন বলিয়া উঠিল, এ ওয়ার্ডে আসামী সাড়ে সাতজন। ওয়ার্ডার রাগে গজগজ করিতে করিতে চলিয়া যায়। বলিতে বলিতে যায় 'পাউরুটি আর মুরগীর আন্ডা খায়—এরা আবার 'মহাত্মাজী'র কাজ করতে জেলে এসেছেন!'

পর্দার ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠে, 'বৈজনাথ, শীগ্‌গির ওঠ্‌। দে তো রাস্কেলটার গায়ে কুঁজোর জল ঢেলে।'

সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠে। কমরেড বৈদ্যনাথ একটি গ্লাস লইয়া পর্দার বাহিরে আসে। রোগা, শুকনো দড়ি পাকানো পাকানো শরীর। পায়জামা পরিহিত। গায়ে পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির কলার উঁচু। সোস্যালিস্টদের সকলের দেখি, 'কাপড়া গুদাম'-এর কয়েদী-দরজীকে বিড়ি দিয়া, এইরূপ জামা তৈয়ারী করাইয়াছে। এত গরমেও ইহারা খালি গা করিবে না। এঁরাই আবার পৃথিবীতে সর্বহারার রাজ্য আনিবেন!

এগারোটা বাজিয়াছে। সকলে চরখা কাটা শেষ করিল। টেকো পাঁজ, সব ঠিকঠাক করিয়া উঠিবার জন্য তৈয়ারি হইতেছে। একসঙ্গে দুই ঘন্টার বেশি চরখা কাটিতে কি সকলে পারে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় হাজারীবাগ জেলে, গান্ধী-জয়ন্তীর দিন, একসঙ্গে আটঘন্টা সুতা কাটিবার পর আমার কিডনির গোলমাল হয়। সেই হইতে আর একবারে বেশি সুতা কাটি না। হয়তো অসুখ করিয়াছিল অন্য কারণে, কিন্তু জেল ডাক্তারে মত হইল যে একসঙ্গে অতক্ষণ এক অবস্থায় বসিয়া, কিডনির গোলমাল হইয়াছে! ডাক্তারের মতের উপর তো আর কথা বলা চলে না। সকলে নিজের নিজের সিটে চলিয়া গেল। সদাশিউ ও মেহেরচন্দ দাঁড়াইয়া আছে।

মেহেরচন্দ বলে, 'মাস্টারসাহেব, একটু কিছু খান। সারাদিন পিত্ত পড়িয়াছে। আপনার খাবার ঐ টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছে। দুখানি রুটি খান।'

একটি কাগজে লিখিয়া দিলাম যে, এই গরমে আর খাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।

মেহেরচন্দ বলে, 'একটু দই এনে দিই। আমার বাড়ি থেকে আজ দই দিয়া গিয়াছে। নিজের বাড়ির গরুর দুধের দই। তাহা না হইলে আপনাকে বলিতাম না। আপনি গান্ধীসেবাসঙ্ঘের মেম্বার ছিলেন। মোষের দুধ ঘি খান না, তাহা আর কে না জানে। জেলে তো এই-জন্যই দুধ ঘি আপনার খাওয়াই হয় না। যদি বা দৈবক্রমে আমার বাড়ি হইতে আসিয়া গিয়াছে, তাহাও যদি আপনি না খান, তাহা হইলে বড়ই দুঃখিত হইব।'

মেহেরচন্দ নাটকীয় ভঙ্গিতে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে—'এ অনুরোধটা আমার রাখতেই হবে মাস্টারসাহেব! আমার 'ফাদার' সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন দইটুকু'…আবার ফাদার বলিয়াছে! বিহারে যে অল্প ইংরাজিও শিখিয়াছে, সেও মা,

বাবা, বোন এই শব্দগুলি নিজের ভাষায় বলিবে না। কাহারও শুনিবে সিস্টার কী ব্যাধি হইবে। কেহ মাথা নেড়া করিয়াছে কারণ জিজ্ঞাসা করো, বলিবে, মাদার কী জেল হো গয়ী। কথার মধ্যে ইহারা যে বেশি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করে তাহা নয়। তবে বাপুজী, মা, বহীন এই শব্দগুলি নিজের ভাষায় বলিতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করে।…

'ফাদার বার বার আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে মাস্টারসাহেব যেন দই খাইয়া দেখেন। একেবারে ঘুঁটের আগুনে জ্বাল দেওয়া দুধের ফার্স্টকিলাস দই।' এমন করিয়া অনুরোধ করিতেছে; না বলিবারও উপায় নাই। একটু না খাইলে ইহারা বড়ই দুঃখিত হইবে। ইঙ্গিতে উহাদের স্বীকৃতি জানাই, এমন নাছোড়বান্দা ইহারা। সম্মতি না দিলে একঘণ্টা ধরিয়া আমার কান ঝালাপালা করিত। উহাকে তো আমি জানি। মেহেরচন্দ ও সদাশিউ, দুই জনের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। ও, তাহা হইলে সদাশিউ মেহেরচন্দকে আমার পিছনে লাগাইয়াছিল। নিজে সাহস পায় নাই। বোধহয় বলিয়া গিয়াছিল যে যতক্ষণ না রাজী হন ছাড়িবে না। মেহেরচন্দ গুছাইয়া লেখার বাক্সটি বন্ধ করিল ও উঠাইয়া রাখিল। তাহার পর কম্বলগুলি এককোণে জড় করিয়া রাখিয়া দিল। ঘরের মধ্যে যেখানে জলের ড্রামটি থাকে সেখানে আমার গামছা ও মগ রাখিযা আসিল এবং খাটের তলা হইতে খড়মজোড়া বাহির করিয়া সম্মুখে দিল। আমার নিজের ছেলেদের নিকট হইতে এত সেবা ও যত্ন কোনো দিন পাই নাই। কোনো দিন চাহিয়াছি বলিয়াও মনে পড়ে না। চাকরি ছাড়িবার আগে ছুটিছাটার দিন নীলু বিলুকে রোদ্রে খেলা না করিতে দিবার উদ্দেশ্যে, হয়তো পাকা চুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছি।

আর ১৯২১-এর পর হইতে তো ইচ্ছা করিয়াই কাহারও নিকট হইতে কোনো প্রকার সেবা লই নাই। বিলুর মা'র ইহা লইয়া কত কান্নাকাটি, কত অভিযোগ! নূতন খড়মজোড়া চার পাঁচ মাস আগে রামচরিত্তরজী আমাকে প্রেজেণ্ট করেন। তাঁহাকে 'না' বলিতে পারি নাই। বেশ পছন্দও হইয়াছিল। পরে শুনিলাম বিষুণদেওজী রামচরিত্তরজীকে বলিতেছেন, 'বলল্‌টিংকা চামড়া কিৎনেমে যোগাড় কিয়া।' রামচরিত্তরজী উত্তর দেন, 'চামড়া চার বিড়িমে; আওর লকড়ী ছে বিড়িমে।' বিষুণদেওজী অবাক হইয়া বলে, 'এত আক্রা! দশ বিড়িতে তো জেলে 'বিটি' কম্বল পাওয়া যায়। আপনারা বাজার খারাপ করিয়া দিতেছেন।'—তাই বলি! অমন চওড়া, সুন্দর নূতন ধরনের ব্যাণ্ড,—উহা জেল ফ্যাক্টরির কম্বলের কলের বেলটিং! অভদ্রতা হইবে বলিয়া খড়মজোড়া ফেরত দিই নাই। কিন্তু খড়মজোড়া আজ পর্যন্ত ব্যবহারও করি নাই। রাখিয়া দিয়াছিলাম খাটের তলায়। সদাশিউ আবার টানিয়া বাহির করিল। এমন সংসর্গে আসিয়াছি যে ইহার মধ্যে নিজের নীতি ও সিদ্ধান্ত বজায় রাখিয়া চলাও শক্ত। খড়মজোড়াকে ঠেলিয়া আবার খাটের নিচে রাখিয়া দিই। ড্রামের নিকট গিয়া মুখ হাত ধুই, সদাশিউ হাতে গামছা দেয়। ড্রামের পাশের সীট দাসজীর। তাঁহার নাক ডাকিতেছে। প্রতিবার নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় মুখের ভিতর দিয়া হাওয়াটি বাহির হইতেছে। ইহাতে ঠোঁট দুইটি কম্পিত হইয়া একটি শব্দ উঠিতেছে ফর্‌-র্‌-র্‌-র্‌র্‌—ঘোড়া ঘাস খাইবার সময় মধ্যে মধ্যে এরূপ শব্দ করে। ভদ্রলোকটি ঠিক সন্ধ্যা বেলায় শোন—আর শোওয়া মাত্র ঘুমাইয়া পড়েন। আর ওঠেন রাত দুইটার সময়। এই গরমের মধ্যেও সন্ধ্যা আটটায় ঘুমান কী

করিয়া ? রামায়ণ মহাভারতে ইচ্ছামৃত্যুর কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু ইচ্ছানিদ্রা—ইহাও কম সাধনার ফল নয়। সন্ধ্যার পর ঘরে প্রার্থনা হয়, কত চ্যাঁচামেচি হট্টগোল হয়, তাহাতে তাঁহার নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না।

আমার চৌকির পাশে মেহেরচন্দ দই দিয়া শরবত তৈয়ারি করিতেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'গুড় দিব, না ভুরা দিব ? আমার কাছে একটু ভুরা আছে।' তাহাকে ইশারা করিয়া গুড়ই দিতে বলি। একঘটি শরবত তৈয়ারি হইল। সদাশিউ কম্বল পাতিয়া দিল। তাহার সম্মুখের জায়গাটিতে জলের ছিটা দিয়া, সেখানে ঘটি গ্লাস রাখিয়া দিল। আমি এলুমিনিয়মের গ্লাসে এক গ্লাস শরবত ঢালিয়া লইলাম। দই দিয়াছে ; শরবত তো নয়—পাতলা দই। জেলের গ্লাসগুলিও অদ্ভুত ; জল খাইবার সময় গায়ে আর কাপড়ে নিশ্চয়ই জল পড়িবে। মিষ্টিও দিয়াছে খুব।

মেহেরচন্দ গল্প করিয়া চলে—'সকালে ইন্টারভিউ ছিল। দুই হাঁড়ি দই আসিয়াছিল, আর এক হাঁড়ি 'গঁদুকা-লাড্ডু'[১]। অফিসের লোকদের খাইতে ইচ্ছা না কে জানে! জেলর প্রথমে জমাদারকে বলিলেন, কাঠি গুঁজিয়া হাঁড়ির নিচ পর্যন্ত দেখ, দই ছাড়া আর কিছু আছে কিনা। তাহার পর রাখিয়া দিও, ডাক্তারসাহেব আসিলে পাশ হইবে। জেলর আমার উপর এরূপ চটিল কেন কে জানে। আর কাহারও বেলায় তো এমন করে না। জমাদারসাহেবকে চারিটি গঁদের লাড্ডু দিয়া চুপচাপ হাঁড়িটি লইয়া চলিয়া আসিলাম।'

তাহার পর কী মনে হয়। আমাকে বলে—'চিনি দিয়া তৈয়ারি লাড্ডু কিনা, সেইজন্য আপনাকে দিই নাই। আর এক গ্লাস দিই মাস্টারসাহেব ?' তাহাকে বারণ করি। এক গ্লাস খাওয়াই শক্ত, তাহার উপর আবার আর এক গ্লাস! মুখ হাত ধুইয়া আবার কম্বলের উপর আসিয়া বসি। মেহেরচন্দ গ্লাস দিয়া ঘটি বাজাইতেছে, আর চ্যাঁচাইতেছে 'চলো, চলো-ও শরবত পিনেবালোঁ'। বিষ্ণুদেওজী ছাড়া আর কেহই লইল না—চিনির শরবত হইলে হয়তো কেহ কেহ লইত। বিষ্ণুদেওজী আধসের আটার রুটি খায়। বয়স কম ; স্বাস্থ্য বেশ ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া রাত দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, এক ঘটি দই খাইবে নাকি ? এই ওয়ার্ডে গুড়ের শরবত কেহ খাইতে চাহে না। আর বিলু ? তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরা একটু গুড়, একটি লঙ্কা বা একটা পেঁয়াজ পাইলে কৃতার্থ হইয়া যায়। স্কার্ভির প্রতিষেধক হিসাবে তাহারা সপ্তাহে দুই দিন একটু একটু আচার খাইতে পায়। এই শৌখিন খাদ্যদ্রব্যটি যে দিন থাকে, সেদিন যেন ভাত খাইয়া তাহাদের পেটই ভরে না! কেবল আচার দিয়াই সমস্ত ভাত খাওয়া হইয়া যায়। ডাল দিয়া খাইবার ভাত কোথায় ? বহু কষ্টার্জিত ডালের লঙ্কাটি বৃথায় নষ্ট হইয়া গেল বলিয়া মনে হয়। বিলুর দুই বেলায় ভাত খাওয়া অভ্যাস—এখানে তাহাও পায় কিনা কে জানে ? জেলকোড অনুসারে দুইবেলা ভাতের নাম 'বেঙ্গল ডায়েট'। যে ইহা না পায়, তাহাকে সন্ধ্যার সময় দেয় দুই হস্ত পরিধির—রুটি নামক পদার্থ—দুইখানি করিয়া। এই অর্ধসিদ্ধ, দুষ্পাচ্য খাদ্যদ্রব্যটিকে আয়ত্তাধীন করা ভীমভবানী বা গোবরের পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে,—কিন্তু সাধারণ বাঙালীর পক্ষে, অসম্ভব।... মনে ইচ্ছা হয়, বিলু জানুক, যে তাহারই কথা মনে করিয়া, এইবার জেলে ফলমূল দুধ এ সকল জিনিস খাই না, মশারি ফেলিয়া শুই না। হয়তো, বিলু এ খবর জানিতে পারিলে, তাহার

১. গঁদের আঠা ঘিতে ভাজিয়া আটা ও চিনির সহিত মিশাইয়া এক প্রকার মিঠাই করা হয়।

মনে একটু তৃপ্তি হইত। তাহার বাবা যে তাহার জন্য একটুও ভাবে একথা সে বুঝিতে পারিত। বিলুর যদি ফাঁসির সাজা না হইত, তাহা হইলে হয়তো এতক্ষণ, এইরূপ একটি পর্দা ঘেরা ঘরের মধ্যে বসিয়া, দলের লোকদের 'ক্যাপিটাল' পড়াইত। বিলু এখানে থাকিলে, আর কমরেড লছমী চতুর্বেদীকে এখন গুরুগিরি করিতে হইত না। মনিহারীঘাটে, সেবার উহাদের দলের যে সামার-ট্রেনিং ক্যাম্প খুলিয়াছিল, বিলুই তো তাহার অধ্যক্ষ ছিল। কমরেড বাণারসীও সেদিন চুরুট টানিতে টানিতে আমার নিকট বলিতেছিল, 'বিলুবাবুর মতো আমাদের দলে আর কেহ পড়াইতে পারে না। সেইজন্যই সেবার যখন শোনপুরে আমাদের প্রাদেশিক সামার-ক্যাম্প খোলে—সেখানে বিলুবাবুর উপর 'ডায়ালেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম' পড়াইবার ভার পড়িয়াছিল। 'অপরচুনিস্ট'দের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল যথার্থ কর্মীদের কথা ধরা যায়, তবে আমাদের দলের 'ইনটেলেক্‌চুয়াল্‌স্‌'-এর মধ্যে বিলবাবুর স্থান খুব উচ্চে। অবশ্য বিলুবাবু মিলিট্যান্ট একটু কম। এইজন্য পার্টির সর্বাপেক্ষা উচ্চ শিখরে উঠিতে পারেন নাই।' কমরেড বাণারসী আরও কত কী বলিয়াছিল সব মনে রাখাও শক্ত, কথা বলিবার সময় উহাদের এমন এমন শব্দ ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, যেগুলির আসল অর্থ আমাদের কাছে একরূপ অজ্ঞাত। উহাদের সহিত গল্পের সময় ঠিক থই পাই না। সাধারণ চলিত ভাষায় কি কথাবার্তা বলা যায় না? উহারা বাড়িতেও কি এই ভাষায় কথা বলে? আমরাই উহাদের কথা অর্ধেক বুঝি না—উহাদের মা-বোনেরা এসব কথার কী বুঝিবে? সেই যে গল্প আছে না—একজন ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিয়া ঠিক করিয়াছিল যে তাহার মা'র সঙ্গে ইংরাজিছাড়া আর কিছুতে কথা বলিবে না। তারপর বেচারা অসুখে পড়িয়া জলতেষ্টায় মারা যায়—'ওয়াটার' কথাটি তাহার মা বুঝিতে পারেন নাই। সেই রকমই হবে আর কি। বিলুও তো তাহাদের দলের একজন নেতা। তাহার এরূপ ধরনের কথাবার্তা তো কোনো দিন আমার কানে পৌঁছায় নাই। দলের মধ্যে কী সব বলিত তাহা জানি না; কিন্তু বাড়িতে তো তাহাকে অস্বাভাবিক সাম্যবাদী অভিধানের কোনো শব্দ ব্যবহার করিতে শুনি নাই। উহাদের পায়জামা আর কলার উঁচু পাঞ্জাবি পরিতেও কোনোদিন দেখি নাই। তামাকের গন্ধ উহার গা হইতে কোনো দিন পাই নাই। তোমাদের ভাষায় 'মিলিট্যান্ট' কথার মানে হয়তো আমি ঠিক বুঝি না—যে দেশের জন্য আজ রাত্রে ফাঁসি যাইবে তাহাকে তোমরা বলো মিলিট্যান্ট নয়। সে কেন মিলিট্যান্ট হইবে—মিলিট্যান্ট ঐ শুঁটকো বৈজনাথ—যে খানিক আগে গ্লাস লইয়া বাহির হইয়াছিল, ওয়ার্ডারের গায়ে জল দিবার জন্য। ছি, আমি একী ভাবিতেছি! বিলু মিলিট্যান্ট হইলেই যেন আমার গর্বের বিষয়। মহাত্মাজী, আমার প্রণাম গ্রহণ করো। হয়তো বাণারসী ঠিকই বলিয়াছে। বিলু আমার পক্ষপুটে, আশ্রমের আবহাওয়ার মানুষ। উহার পক্ষে 'মিলিট্যান্ট' না হওয়াই স্বাভাবিক…সদাশিউ আমার টেবিলের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে আমার মুখের দিকে তাকাইতেছে। নিশ্চয়ই ভাবিতেছে যে হঠাৎ আমি প্রণাম করিলাম কেন। ইহার একটি মনগড়া অর্থ নিশ্চয়ই করিয়া লইল।

'বিষুণদেও বাবু! বিষুণদেও বাবু!'

বাঁ দিকে দু তিনটি সিট পরে বিষুণদেওজীর সিট। একটি ওয়ার্ডার তাঁহার সিটের সম্মুখের জানালার বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে। বিষুণদেওজীর বাহিরে বেশ বড় কারবার আছে—ব্যবসাদার লোক। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

বিষ্ণুদেওজী জেলের মধ্যেও বেশ বড় কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছেন! উনি আমাদের কিচেন ম্যানেজার। জেলের কণ্ট্রাক্টরের সহিত উঁহার আলাপ আছে। এই ওয়ার্ডারটি উঁহার ও জেল-কণ্ট্রাক্টরের মধ্যে খবরাখবর ও জিনিসপত্র আদান-প্রদানের কাজ করে। প্রত্যহ জেল-কণ্ট্রাক্টর রেশন'-এর যে রিকুইজিশন্ থাকে তাহা অপেক্ষা কম জিনিস দেয় ও কাগজের উপর ম্যানেজারের দস্তখত করাইয়া লইয়া যায়, যে সে সব জিনিসই দিয়াছে। তাহার পর রাত্রে এই ওয়ার্ডার আসিয়া অন্যান্য জিনিস দিয়া যায়—যে সব জিনিস রেশনের মধ্যে পড়ে না। জেলের কর্তৃপক্ষও মোটামুটি ব্যাপারটা জানেন এবং ইহা বন্ধ করিবার জন্য জেলের রসদ গুদাম হইতে শিডিউল অনুযায়ী জিনিস দিবার চেষ্টাও কয়েকবার করিয়াছেন। কিন্তু এই যুদ্ধের বাজারে শিডিউল অনুযায়ী সব জিনিস প্রত্যহ দেওয়া শক্ত। আর না দিলেই ফ্যাসাদ। হয়তো আপার ডিভিশন রাজবন্দীরা অনশনই আরম্ভ করিয়া দিবে। হয়তো লক-আপ হইতে অস্বীকার করিয়া দিবে। গায়ের জোরে এবং লাঠি চার্জের বলে অবশ্য ইহাদের সাময়িক বাগ মানানো যায়। কিন্তু দুই চারিবার এইরূপ ঝগড়া হইলে, ট্যাক্টফুল নয় বলিয়া ডিপার্টমেন্টে জেলর, সুপারিন্টেন্ডেন্টের বদনাম হইয়া যায়। কিছুদিনের মধ্যে বদলির হুকুম আসে। তাহার উপর মারধোর করিয়া জিনিসটি চাপিয়া দিব, নিরাপত্তা বন্দীরা থাকিতে সে উপায়ও নাই। জেলা ম্যাজিস্ট্রের হুকুম না হইলে উঁহাদের উপর লাঠিচার্জ করা যায় না। আর এখন জেলে স্থানাভাব এত বেশি যে নিরাপত্তা বন্দীদের আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা করাও শক্ত। এই সাত-পাঁচ ভাবিয়া, জেল কর্তৃপক্ষ চাহেন যাহাতে রাজবন্দীরা গোলমাল না করে। একটু-আধটু দেখিয়াও দেখিতেছে না, এইভাব দেখাইলেই যদি চলে তবে ইহাদের ঘাঁটাইবার দরকার কী? তাঁহাদের কণ্ট্রাক্টরের নিকট হইতে প্রাপ্তির তো ইহাতে হ্রাস বৃদ্ধি নাই। কাজেই সুবিধা হইয়াছে বিষ্ণুদেওজীর। বিষ্ণুদেওজী ও ওয়ার্ডার আস্তে আস্তে কী সব কথা বলিতেছে, ঠিক বুঝা যাইতেছে না। হঠাৎ বিষ্ণুদেওজী জোরে জোরে বলিলেন, 'সিপাহিজী, একটু দহির শরবত খাইবে নাকি?' সিপাহিজী বলিল, 'লাইয়ে'। গ্লাসটি গরাদের মধ্য দিয়া বাহির হইল না। 'ঠাহরিয়ে, মৈ পিয়ালী লাতা হুঁ।'[১] বিষ্ণুদেও চায়ের কাপে করিয়া, ওয়ার্ডারকে ঘোলের শরবত খাওয়াইতেছে। ও—এইজন্যই সে শরবত লইয়াছিল! তাই তো বলি—হঠাৎ উহার গুড় দেওয়া ঘোলের শরবত খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল কেন। সিপাহিজী চলিয়া গেল। বোধহয় উহার ডিউটি অন্য ওয়ার্ডে। ভূষণজী তাহার বিছানায় মশারি ফেলিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক বিষ্ণুদেওজীর পাশেই তাহার সিট। সে মশারির ভিতর হইতে বলিল, 'কেয়া তিক্রম্ কর্ রহেথে ইয়ার?' নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে যোগাড়যাগাড় করার নাম ইহারা দিয়াছে 'তিক্রম'। আসলে শব্দটির কোনো অর্থই নাই—ওই জেলেরই মধ্যে কথাটির সৃষ্টি। বিষ্ণুদেও প্রত্যহ বিড়ি আনায়, আর দিনের বেলায় মেটের হাত দিয়া এই বিড়িগুলি বিক্রি করিতে পাঠায় জেল ফ্যাক্টরিতে। সেখানে সাধারণ কয়েদীরা এই বিড়ি কেনে—দশ পয়সা প্যাকেট। বিষ্ণুদেওজীর ইহাতে বেশ লাভ থাকিয়া যায়। মেসের মেম্বারদের মধ্যে যাহারা হয়তো একটু গোলমাল করিতে পারে, তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গন্ধ-তেল ও অন্যান্য টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস আনাইয়া দেয়। তাহা ছাড়া জেল-গুদামের কয়েদীর সহিতও বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে—দুই বাণ্ডিল বিড়িতে একগ্লাস ঘি, এক প্যাকেট বিড়িতে আধসের

১ 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি চায়ের পেয়ালা আনিতেছি।'

চিনি। বিড়িই জেলের লিগাল টেণ্ডার মুদ্রা। ভূষণজী বিষ্ণুদেওজীকে বলে, 'আমাকে এক বাণ্ডিল বিড়ি দাও তো—গরম জামাটা শীতের পর কাচানো হয় নাই। কাল ওটাকে ধোবিকম্যাণ্ডে পাঠাইতেই হইবে; ইস্ত্রি করিবার জন্য। আর কাল আমার জন্য একটা ফাউণ্টেন পেনের কালি আনিতে বলিয়া দিও তো ভাই, কণ্ট্রাক্টরকে।' তাহার পর হাসিয়া উঠিয়া বলে, 'আমি হচ্ছি ভাই, ঝপট্টানন্দের দলে।' ঝপট্টানন্দ কথাটির একটি ইতিহাস আছে। বিষ্ণুদেওজী একটি ছড়া তৈয়ারি করিয়াছিল। ছড়াটি ঠিক মনে আসিতেছে না। তবে তাহার ভাবার্থ এই যে—জেলে রাজবন্দীরা সকলেই সিদ্ধপুরুষ। তাহাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর নাম 'যোগাড়ানন্দ'। ইঁহারা বিড়ি ও পয়সা ঘুষ দিয়া, মিষ্টিকথা বলিয়া জেল-ডাক্তারকে খোসামোদ করিয়া ও মধ্যে মধ্যে জেল-কর্মচারীদের সহিত ঝগড়া করিয়া, নানাপ্রকার জিনিসপত্র যোগাড় করেন। ইঁহাদের নেশার জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া কোনো জিনিসের অভাব হয় না। যোগাড়ের ফন্দি-ফিকিরেই থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন 'ঝপট্টানন্দের' দল। 'ঝাপট্টা মারনা' কথাটার মানে ছোঁ মারা। এই ধরনের বন্দীরা সাধারণত থাকে চুপচাপ নিষ্ক্রিয় ভাবে। মুখেচোখে নিস্পৃহতার চিহ্ন পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু চিল যেমন উঁচু গাছের উপর সমাধিস্থের ন্যায় বসিয়া থাকিলেও, শিকারের উপর ঠিক নজর রাখে, ইঁহারাও সেইরূপ সব সময় নজর রাখেন—যোগাড়ানন্দরা কে কী করিতেছে তাহার উপর। ঠিক যে সময় কোনো জিনিস যোগাড়ানন্দের হাতে পেঁছায়, সে সময় ঝপট্টানন্দরা, সম্মুখে গিয়া হাজির হন—উহার একটি অংশ দাবি করিতে। 'তিক্রম' করিতে গিয়া ধরা পড়িলে বিপদ আছে—কিন্তু ঝপট্টানন্দদের কোনো বিপদের ভয় নাই। তবে যোগাড়ানন্দদের তুলনায় ইঁহারা জিনিসপত্র পান কম পরিমাণে। যোগাড়ানন্দরা অল্প অল্প জিনিস অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইঁহাদের দিতে বাধ্য হন—গোলমেলে লোকদিগকে ঠাণ্ডা তো রাখিতে হইবে। তাহার পর বাকি থাকে আর একশ্রেণীর রাজবন্দী; ছড়াতে ইঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে 'বেকুফানন্দ'। ইঁহাদের সংখ্যাই বেশি। যোগাড় করিবার বা যোগাড়ের জিনিসের অংশ লইবার ইচ্ছা ইঁহাদের ষোল আনার। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কী হইবে—সামর্থ্যে কুলায় না। ইঁহাদের ভয় যে ধরা না পড়িলেও, অপর সকলে ইঁহাদের নামে কানাঘুসা করিতে ছাড়িবে না। আর হাতেনাতে ধরা পড়িয়া গেলে তো বদনামের একশেষ। কাজেই এই সব গোলমেলে জিনিস হইতে আলাদা থাকিয়া, সমালোচনার অধিকার রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।...

হট্টগোল করিতে করিতে সকলে ডান দিকের পর্দাঘেরা স্থানটি হইতে বাহির হইল। উহাদের ক্লাস তাহা হইলে শেষ হইল। সারাদিন সময় পায়, তাহা হইলেও ইহারা রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা করিবেই। সকালে তো আটটার আগে ইহাদের কাহারও উঠিবার নাম নাই। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়াও যে ইহারা পড়াশুনা ভুলে নাই, ইহা দেখিয়া সত্যই আনন্দ হয়। করিতাম মাস্টারি; ছেলেদের পড়িতে দেখিলে সেইজন্য এখনও মনের আনন্দ চাপিতে পারি না। সোস্যালিস্টরা, ফরওয়ার্ড ব্লকের ছেলেরা, কম্যুনিস্ট ও কিষাণসভার ছেলে দুইটি, সকলেরই পড়ার উৎসাহ দেখি, আর অবাক হইয়া আমাদের পন্থার কর্মীদের সহিত তুলনা করি। ফরওয়ার্ড ব্লকের তিন জন মাত্র তো থাকে এখানে, কিন্তু তাহারাও দেখি কত খরচ করিয়া সেন্সর না-করা মার্ক্সিস্ট বই সব আনাইয়াছে। কম্যুনিস্ট ছেলেটিরও টুকিটাকি বই আনা লাগিয়াই আছে। ইহাদের মতো ঘড়ি ধরিয়া পড়াশুনার ক্লাস করিতে যাও আমাদের মধ্যে,

নিশ্চয়ই ছেলে জুটিবে না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো হইয়াই গিয়াছে। সদাশিউ-এর উৎসাহ ও অনুরোধে,আমি শীতকালে বেলগাছটির তলায় 'রচনাত্মক কার্যক্রম'[১]-এর উপর ক্লাস লওয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। প্রথম সপ্তাহে কিছু ছেলে হইয়াছিল। পরে দেখিলাম থাকিয়া গেল কেবল সদাশিউ, দাসজী, আর রামশরণজী। আর—সি. এস. পি.র রুশবিপ্লবের ইতিহাসের ক্লাসে দেখি লোক ধরে না—আমাদের ছেলেরাও দেখি সেই ক্লাসে বসিয়া আছে।—অবশ্য ইহা অস্বাভাবিক নয়। নীলু বিলুদের দলের প্রোগ্রামের ভিত্তি, মানুষের মন আজ যেমন আছে তাহারই উপর; আর আমাদের কার্যক্রমের ভিত্তি, হিংসালোভহীন আদর্শ মানবমনের উপর। সেইজন্য সাধারণ লোককে উহাদের পথই আকর্ষণ করে বেশি।...

নীলু বিলুর কী পড়ার ঝোঁক! আর আমাদের পন্থার লোকদের? তাহাদের কথা আর বলিয়া কী হইবে? আমি একখানি বই নিয়া বসিলেই বলে—'মাস্টারসাহেব আবার 'ইস্তিহান' দিবেন নাকি?' আমাদের রামচন্দরজী আর হরিহরজী এই দুই জনের একটু পড়াশুনার বাতিক আছে। তাহার মধ্যে রামচন্দরজী পড়েন জলচিকিৎসার বই, আর হরিহরজী পড়েন আসন আর প্রাণায়ামের বই। ইঁহাদের ধারণা যে গান্ধীজীর মতের উপর যাহাদের আস্থা আছে, তাহাদের আবার পড়াশুনা করিয়া নূতন জানিবার কী থাকিতে পারে? সাধে কি আর নীলু আমাদের ঠাট্টা করে? আমি টুরে বাহির হইবার সময়, বিলুর মা যখন আমার লোহার সুটকেস্‌টা গুছাইয়া দেন, তখন কতবার শুনিয়াছি নীলু তাহার মাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, 'মা, পুরনো 'সর্বোদয়'[২]-এর ফাইলটি দিয়েছ তো?' লঘুগুরুর জ্ঞান নীলুর ছোটবেলা হইতেই কম। এ বিষয়ে বিলুর সহিত তাহার আকাশপাতাল তফাত। নীলু চিরকালই একটু উদ্ধত স্বভাবের, রাগিলে উহার জ্ঞান থাকে না।

...বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখি, রান্নাঘরের বারান্দায় বিলুর মা; নীলু ও বিলু অল্প দূরে দূরে বসিয়া রহিয়াছে—যেন একজনের সহিত আর একজনের কোনোই সম্বন্ধ নাই। বিলুর মা ও বিলু কাঁদিতেছে। আর নীলু একটি ঝাঁটার কাঠি দিয়া, নিকানো মাটির মেঝের উপর, বোধহয় কিছু লিখিতেছে কিংবা আঁকিতেছে। পাশে একটি বঁটি পড়িয়া আছে। কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই লক্ষ্য করিলাম, বিলুর মা কাপড় দিয়া কী একটা যেন ঢাকিবার চেষ্টা করিল। আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ব্যাপারটি বাহির হইয়া পড়িল। বিলুর হাত হইতে দোয়াত উল্টাইয়া পড়িয়া নীলুর 'ক্ষীরের পুতুল' বইটির মলাট খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাই নীলু রাগ করিয়া বিলুর মার্সডেনের ইতিহাস বঁটি দিয়া কাটিয়াছে। সত্যসত্যই দুই টুকরা করিয়া কাটিয়াছে—একেবারে দুইটি ছোট ছোট নোটবুকের মতো দেখিতে হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য ছেলে! উহাদের মা-ও আদর দিয়া দিয়া ছেলেদের মাথা খাইয়াছেন! ছেলে অন্যায় করিয়াছিল; কোথায় আমার কাছে আসিয়া বলিয়া দিবে, তাহা নয়, আমার কাছ হইতে ব্যাপারটি লুকাইবার চেষ্টা হইতেছিল।

'কেয়া সদাশিউ, ভূমিহার-রাজপুত-জাতীয় মহাসভা কী বৈটক খতম হুই'—কমরেড বৈজনাথ সদাশিউকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল। লক্ষ্য 'সূত্রযজ্ঞের'র উপর। বিহারের গরমপন্থীরা, অর্থাৎ সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণসভার সদস্যরা, দক্ষিণপন্থীদিগকে এই বলিয়া ঠাট্টা করে যে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কেবল

১ গঠনমূলক কার্যক্রম—Constructive Programme.

২ কাগজবিশেষ—গান্ধীবাদের মুখপত্র।

স্থানীয় ভূমিহার ও রাজপুত জাতের পারস্পরিক দলাদলির মুখপাত্র। প্রাদেশিক কংগ্রেসে নাকি রাজনৈতিক দলাদলি নাই, দলাদলি আছে জাত লইয়া, আর ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া। কথাটা কতকাংশে সত্য। জেলের মধ্যেও দেখি রামশরণজী আর হরিহরজী জাতের ভিত্তিতে ছোট ছোট উপদল গড়িবার চেষ্টা করেন—বাহিরে গিয়াও যাহাতে তাঁহাদের লীডারগিরি বজায় থাকে। আমাদের দেশে স্বরাজ কি কখনও হইবে? এক এক সময় ঘৃণা ধরিয়া যায়। নীলুর বিলুর দলগুলি যাহা বলে তাহার সবই ভুল নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা কিছুক্ষণ পূর্বে যে সূত্রযজ্ঞে বসিয়াছিল তাহার সহিত জাতীয় দলাদলির কী সম্বন্ধ? আর সদাশিউ না হয়ে তোমার সমবয়সী; কিন্তু সে যখন আমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে, তখন ইহার অর্থ আমাকেও আঘাত দেওয়া। বয়োজ্যেষ্ঠকে একটু সমীহ করিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত নাকি?

সদাশিউ জবাব দেয়, 'চুপ কর্ লালদাসিয়া'। কথায় বলে বামুনকে খাওয়াইয়া, রাজপুতকে বাবুসাহেব বলিয়া, কায়স্থকে টাকা দিয়া, আর বাকি সব জাতকে প্রহার দিয়া, যে কোনো কাজ করাইয়া লওয়া যায়। কয়টি টাকা পাইলে তো এখনই পার্টি ছাড়িয়া দিতে ইতস্তত করিবে না। তোমাদের কায়স্থদের আর জানি না!'

বৈজনাথ কায়স্থ। মিথিলার কায়স্থদের প্রায়ই পদবী হয় লাল, না হয় দাস। এইজন্য কায়স্থদের সাধারণ লোক অনেক সময় বলে 'লালদাসিয়া'। জমিদারের নায়েব, গোমস্তা, পাটোয়ারি প্রভৃতি কাজ ইহাদেরই একচেটিয়া। সেইজন্য গরিব কিষাণদের নিকট ইহাদের জনপ্রিয়তা কম। ইহা হইতেই 'লালদাসিয়া' কথাটির মানে আর কেবল স্থানীয় কায়স্থ নয়—উহার যোগরূঢ় অর্থ দাঁড়াইয়াছে, একটি অর্থলোলুপ পাটোয়ারী মনোবৃত্তিযুক্ত জীব।

বৈজনাথ বলে, 'হাঁ, আর একটা প্রবাদ মনে আছে তো? গয়লার দেখা ঘাস, আর বামুনের দেখা দই—দুটি জিনিসের বরাত একই রকমের।'

সদাশিউ ভূমিহার ব্রাহ্মণ। সে জবাব দেয়—

'সে তো আমি স্বীকারই করি। দেখলে না আমার দেওয়া দই মাস্টারসাহেব খেলেন। কায়স্থরা 'কহাবতের সচ্চাই' (প্রবাদের সত্যতা) মানিতে রাজি নয় বলিয়াই তো কথা বাড়িয়া যায়।' তাহার পর সদাশিউ টেবিল হইতে নামিয়া বৈজনাথের নিকট গেল। দুজনেই ফিসফিস করিয়া কী সব কথা বলিতেছে। উহাদের আবার হঠাৎ গোপনীয় কথা কী মনে পড়িয়া গেল? আজ বৈজনাথদের দলের একজন নেতৃস্থানীয় কমরেডের ফাঁসি, কিন্তু ইহাদের কার্যকলাপে অন্য দিন হইতে বৈলক্ষণ্য তো কিছু দেখি নাই। সেই পর্দা ঘেরা ক্লাস, সেই হাস্যধ্বনি, মধ্যে মধ্যে ভ্যালু, লেবার পাওয়ার, সারপ্লাস ভ্যালু শব্দগুলি অন্যদিনের মতো আজও কানে আসিয়াছে। আমার বাঁদিকে যারা থাকে, তাহাদের জীবনও তো প্রায় অন্যদিনের মতোই দেখিতেছি! কোথাও একটি আঁচড়ও পড়ে নাই। না, হয়তো সকলেই অনুভব করিতেছে—না হইলে, দাসজী ছাড়া আর প্রত্যেকে এখনও জাগিয়া থাকিবে কেন? ভুষণজী, বিষ্ণুদেওজী মশারি ফেলিয়া শুইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের কথাবার্তা তো কিছুক্ষণ আগেই শুনিলাম। উহারা ঘুমায় নাই! অনেক সিটেই মশারি ফেলা, বেশী দূর পর্যন্ত দেখা যায় না—তবে কানে কথাবার্তার গুঞ্জনধ্বনি আসিয়া পৌঁছাইতেছে। অস্কার ওয়াইল্ড-এর সেই Ballad of Reading Gaol-এ ফাঁসির রজনীর লাইন কয়টি মনে পড়িতেছে।

But there is no sleep, when men must weep
Who never yet have wept;
So we the fool, the fraud, the knave—
That endless vigil kept,
And through each brain, on hands of pain
Another's terror crept···

আর মনে পড়িতেছে না। কবে মাস্টারি ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি আজকের কথা? এই কয়টা লাইনও যে মনে আছে তাহাই আশ্চর্য! এখন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছি। এখন আর মনে পড়িবে না। পরে হঠাৎ কোনো এক অপ্রয়োজনীয় মুহূর্তে, অপ্রত্যাশিতরূপে মনে পড়িয়া যাইবে। ইহারা সকলে কি ভয়ে জাগিয়া আছে? হয়তো সহানুভূতিতে। না, এ জাগিয়া থাকা ইচ্ছাকৃত নয়। চেষ্টা করিয়াও ইহাদের ঘুম আসিতেছে না। গল্প করিয়া ইহারা মনের গুরুভাব লাঘব করিতে চায়। আমার নিজের মনও তো বেশ শান্ত আছে। বোধহয় আমি আমার ছেলেদের যতটা গভীরভাবে ভালবাসা উচিত, ততটা গভীরভাবে স্নেহ করি না। না হইলে এখনও আমার মনে সেরকম চাঞ্চল্য নাই কেন? বৈজনাথের সিটের পাশে সদাশিউ আর বৈজনাথ খানকয়েক চেয়ার আনিয়া রাখিল। এত রাত্রে আবার চেয়ার দিয়া কী হইবে? সদাশিউ তাহার পর আসিয়া আমার খাটের উপর বসিল। আমি নিচে কম্বলে বসিয়া আছি। বৈজনাথ, লছমী চতুর্বেদী, রামপ্রকাশ, গিরধর চেয়ারগুলিতে বসিল। ইহারা সারারাত জাগিবে নাকি? বিলুরও রাত জাগিয়া পড়া অভ্যাস। কতদিন বারণ করিয়াছি। এখন বিলু কী করিতেছে? হয়তো পাগলের মতো সেলের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কি একবার বাবার কথা মনে পড়িবে না? ভয় পাইবার ছেলে সে নয়; কিন্তু না কাটে চরখা, না আছে ভগবানের বিশ্বাস। আজকের রাত্রে, এই দুইটির মধ্যে একটিও থাকিলে মনে কত বল পাইত। স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত জেলের রিলিজিয়াস্ ইনস্ট্রাক্টর। রবিবারে জেলে হিন্দু কয়েদীদের ধর্মোপদেশ দিতে আসেন। আমি হেডমাস্টার থাকার সময়েই পণ্ডিতজী চাকরিতে ঢুকিয়াছিলেন। সেই সূত্রে সেদিন দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বিলু তাঁহার ছাত্র। তিনি দুঃখ করিয়া গেলেন যে, তিনি বিলুর সেলে গিয়েছিলেন। বিলু বলিয়াছে ধর্মোপদেশের কোনো দরকার নাই। পণ্ডিতজী আরও বলিয়াছিলেন যে বিলু অবশ্য তাঁহাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে ভোলে নাই। বিলু সে ছেলেই নয়। আচ্ছা ভগবানে বিশ্বাস করিলে কি সত্যিই সাম্যবাদী হওয়া যায় না? কত গেরুয়াপরা স্বামীজী যে দেখি, ওদের সব দলের কর্মী। তাঁহারাও কি ভগবানে বিশ্বাস করে না? সেদিন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলরের হাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম একখানি পকেট গীতা, বিলুকে দিবার জন্য। অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলর পরের দিন বইখানি ফেরত দিয়া যাইবার সময় বলিলেন, 'আপনার ছেলে বলিয়াছেন যে ঐ বইয়ের দরকার নাই, অন্য ভাল বই-টই দেন তো পড়িতে পারি।' আমার কাছে খানকয়েক অন্য বই ছিল। তাঁহাকে সেই বইগুলি বিলুর কাছে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'ধর্মপুস্তক দিবার আমার অধিকার আছে। ডিভিশন থ্রি কন্ডেমড প্রিজনারকে অন্য বই দিতে হইলে সুপারিন্টেন্ডেন্টের হুকুম লইতে হয়। সাহেব ভারি লিনিয়েন্ট আর ভালমানুষ। তিনি আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, কোনো জিনিসের

দরকার আছে কিনা। কিন্তু প্রিজনার নিজেই তো সাহেবের সম্মুখে বলিলেন, 'তাহার কোনো জিনিসের প্রয়োজন নাই।'

ঠিক বলিয়াছে। এইরূপ কথাই বিলুর নিকট হইতে আশা করিতে পারা যায়। শেষ মুহূর্তে শির উন্নত রাখিয়া চলিয়া যাইবে। আমার নাম উজ্জ্বল করিয়া, সকল প্রকার হীনতায় পদাঘাত করিয়া, গৌরবোজ্জ্বল মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি লইয়া নন-মিলিট্যাণ্ট বিলু চলিয়া যাইবে।…

গত মহাযুদ্ধের পরে একটি ব্যঙ্গচিত্রের কথা মনে পড়িতেছে। 'পাঞ্চ'-এ বাহির হইয়াছিল। দুই জন বৃদ্ধ লর্ড তাঁহাদের মেদবহুল সযত্নলালিত শরীর এক অতি এরিস্ট্রক্রেটিক ক্লাবের পুরু কুশনযুক্ত সোফায় এলায়িত করিয়া বসিয়া আছেন। মুখে চুরুট, টেবিলের উপর বোতল গ্লাস। দুইজন পাল্লা দিয়া গল্প করিয়া চলিয়াছেন—কাহার কয় ছেলে যুদ্ধে মারা গিয়াছে। ছেলের মৃত্যুর জন্য কেহ দুঃখিত নহেন—অপরকে পরাজিত করিতে পারিবার গর্বের কাছে, ছেলের মর্মন্তুদ মৃত্যু একটি অতি গৌণ ঘটনা। অথচ তাঁহাদের গর্বের ভিত্তি ঐ ঘটনার উপর। সে কথা কে ভাবে? আমার গর্বও এইরূপই হাস্যাস্পদ। যাহার উপর পিতার কর্তব্য করি নাই, সেই পুত্রের কৃতকর্মের গৌরবের অংশ লইতে আমার মন কুণ্ঠিত নয়।…আমি যদি এ পথে না আসিতাম তাহা হইলে আজ বিলুর কি এ দশা হইত? আমার বাবা সরকারী চাকরি করিতেন; আমি সরকারী চাকরি করিতাম, আমার ছেলেও অন্যান্য গৃহস্থের ছেলের মতো, পড়াশুনা শেষ করিবার পর অর্থোপার্জন করিত, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া ঘর-সংসার করিত। পাড়ার বৃদ্ধ মিত্তিরমশাই ঠিকই বলিয়াছিলেন। বিবাহ করিবার পর, বিশেষ করিয়া যদি সন্তানাদি থাকে, তাহা হইলে, কাহারও নিজের ইচ্ছামত জীবনের গতি চালিত করিবার অধিকার থাকে না। তখন তাহার জীবনটি কেবল তাহার নিজের নয়, তাহার উপর আরও অনেকের দাবি জন্মিয়া গিয়াছে। আমার তো পয়সাও ছিল না, তার কথাও নাই। যাহাদের পয়সা থাকে, তাহারা হয়তো এইরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীপুত্র-পরিবারের জন্য কিছু ব্যবস্থা পূর্ব হইতে করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেই কি কর্তব্য সম্পন্ন হইল? তাহা হইলে ছেলেপিলেরা হয়তো একটু আরামে থাকিতে পারিবে, কিন্তু আরামে থাকাই কি পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য! গার্হস্থ্য জীবনে যে মধুর সম্বন্ধগুলি পরস্পরের মধ্যে গড়িয়া ওঠে, তাহার কি কোনো মূল্য নাই? রাজঐশ্বর্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, সিদ্ধার্থ কি সন্তান ও স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করিয়াছিলেন।

বিলুকে ইংরাজি কলেজে পড়াই নাই। তাহার মা'র একান্ত অনুরোধে ইংরাজি হাই স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াইয়াছিলাম। যদি আমার ইচ্ছায় কাজ হইত তাহা হইলে হয়তো ইংরাজী স্কুলে এতদূর পড়া হইত না। আমার ইচ্ছা ছিল উহাকে বিহার বিদ্যাপীঠে পাঠাই। বিলু ইংরাজি স্কুলে পড়িত বলিয়া, আমাকে নানা-প্রকার কথা, সহকর্মীদের নিকট হইতে শুনিতে হইয়াছে। মাহাত্মাজী যখন আমাদের আশ্রমে পায়ের ধুলা দিয়াছিলেন, তখন জয়সোয়ালজীর ভগ্নী, একথা তাঁহার কানেও তুলিয়াছিলেন। ভদ্রমহিলার একটু পাগলামির ছিট আছে। কিন্তু আমি জানি যে তিনি আপনা হইতেই এই সকল কথা মহাত্মাজীকে বলেন নাই। আমারই কোনো শুভানুধ্যায়ী সহকর্মীর প্ররোচনায় তিনি এই কাজ করেন। মহাত্মাজী এ বিষয়ে আমাকে সে সময় কিছু বলেন নাই। 'সবরকমের ছেলেই তো এত বড় দেশে থাকিবে। আমার ছেলেরাও তো তোমাকে দোষ দেয়'—কেবল এই কথা বলিয়া হাসিয়া কথাটি

উড়াইয়া দেন। আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া যায়। আর এই মন্তব্যের তীব্রতা বিলু ও বিলুর মা বেশ অনুভব করিয়াছিল। সেই জন্য বিলুর ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর তাহার মা ও সে ঠিক করে যে, তাহার কাশী বিদ্যাপীঠে পড়াই উচিত। ইংরাজি কলেজে যাহা পড়িতে পাইত, তাহা অপেক্ষা কি সেখানে কম শিখিয়াছে? নীলু তো বি. এ. পাশ। সে কি কোনো বিষয়ে বিলু অপেক্ষা ভালো জানে? বিলুর দলের অধিকাংশই কলেজে-পড়া, বি এ., এম. এ. পাশ-করা ছেলে। তবে তাহারা সকলে বিলুর কাছে পড়িতে যাইত কেন? কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায় যে লোকে বিদ্যাপীঠের 'শাস্ত্রী' উপাধিকে তাচ্ছিল্য করে।—যেদিন বিলুর পাশের খবর আসে, আমি চিঠিখানা হাতে করিয়া বিলুর মাকে বাড়ির ভিতর খবর দিতে গিয়াছিলাম। বলিলাম, 'আজ হইতে বিলুর নাম পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী।' আমি ভাবিয়াছিলাম, বিলুর মা'র কত উৎসাহ দেখিব। কিন্তু দেখিলাম আমার কথার একটুও উত্তর দিল না,—মাথা নিচু করিয়া একমনে বড়ি দিতে লাগিল। তাহার পরও অনেক সময় দেখিয়াছি, পড়াশুনার কথা উঠিলে বিলুর মা সে কথা চাপা দিবার চেষ্টা করে। এই সব নানা কারণে বিলুর মধ্যে inferiority complex আসিয়া পড়িয়াছে। বিলুর মা-ও মনে মনে ভাবে যে তাহার ছেলের উচ্চশিক্ষা হয় নাই—ছেলের দোষে নয়, দশচক্রে পড়িয়া; আর মুখ্যত আমারই দোষে। সত্যিই বিলুর মতো বুদ্ধিমান ছেলে যদি সুযোগ সুবিধা পাইত, তাহা হইলে হয়তো বড় প্রোফেসার বা বৈজ্ঞানিক হইত। নূতন নূতন গবেষণায় তাহার জগৎ-জোড়া নাম হইত। আর আমি তাহাকে এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি, সেখান হইতে জেলে আসিলেও বিশ্রাম, আরাম ও শান্তি পাওয়া যায়। এমন পরিবেষ্টনীতে সে মানুষ হইয়াছে, যেখানে ফাঁসির হুকুম সামান্য দুর্ঘটনার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। কিন্তু বিলু মূর্খ নয়, তাহার ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে। বড় হইয়া সে নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইয়াছে। এ ছাড়া আর কী-ই বা করিত।

চমকিয়া উঠিয়াছে। এমন করিয়া দরজা ধাক্কা দিতে হয়? দরজা বন্ধ আছে কিনা দেখা—এই তো তোমার কাজ। ইহার জন্য এত জোর দেখানোর প্রয়োজন কী? পাশেই সিট হইতে একজন বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ, তোড়ো, তোড় দেও।' আর একটি মশারির ভিতর হইতে কে একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'তাহা হইলে তো বাঁচা যায়।'

রাত একটায় ওয়ার্ডার তাহা হইলে নামিয়া গেল। ওয়ার্ডার আমাকে দেখিতেছে। বড় বড় পাকা গোঁফ—বেশ সুন্দর চেহারা। চোখাচোখি হইতেই আমাকে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল। তাহার পর বৈজনাথরা চার জন যেখানে চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল, সেই দিকে ফিরিয়া বলিল, 'নমস্তে! বাবু সাহেবলোগ মজেমে হৈঁ ন?'

লছমী চতুর্বেদী বলে, 'আরে সিংজী যে! অনেক দিন পরে তোমাকে এখানে ডিউটিতে দেখিতেছি। ব্যাপার কী?'

'এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বাড়ি গিয়াছিলাম। কাল জয়েন করিয়াছি। যুদ্ধের খবর-টবর বলুন।'

'আমরা খবর দেব তোমাকে? আমরা থাকি জেলে। কোথায় তুমি আমাদের বাইরের খবর দেবে, তা'নয় আমাদের কাছ থেকেই খবর শুনতে চাও।'

'হুজুররা 'অংরেজী অখবার'[1] পড়েন। সেইজন্য জিজ্ঞাসা করছিলাম।' তাহার

১। ইংরাজি খবরের কাগজ।

পর ওয়ার্ডার সাহেব আরম্ভ করে যুদ্ধের, শহরের, নিজের দেশের, মহাত্মাজীর যতসব আজগুবি খবর।—মালগাড়ি বোঝাই করিয়া কত শিয়াল আর শকুন যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইতেছে। মহাত্মাজী যেদিন অনশন আরম্ভ করিয়াছেন সেদিন কী জানি কেন হঠাৎ ফট করিয়া লাট-সাহেবের বাড়ির ছাত ফাটিয়া গিয়াছিল। মহাত্মাজীর সঙ্গে লাগিতে গিয়া সেবার রাজকোটের দেওয়ানের কী হইয়াছিল; আরও কত খবর! এই খবরগুলি বলিবার জন্যই সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রথম দিককার প্রশ্নগুলিই ইহারই অবতরণিকা মাত্র। তাহার পর সে বৈজনাথের জানালার বাহিরে বারান্দার উপর বসিয়া পড়ে, বেশ ভাল ভাবে গল্প জমাইবার জন্য। অন্য দিন নাইট ডিউটির সময় কেহ জাগিয়া থাকে না। তখন বড়ই একলা একলা লাগে। ঢুলিয়া, খয়নি খাইয়া, পাহারাদের জাগাইয়া, আর পায়চারি করিয়াও দুই ঘন্টা সময় যেন কাটিতে চায় না। তাহাদের গল্পর মধ্যে ওয়ার্ডারটি বসিয়া থাকিবে, একথা বোধহয় বৈজনাথের দলের ভাল লাগে না।

বৈজনাথ বলে, 'সিংজী, তোমরা দ্বাপরে কিষুণজীর মাকে আর কিষুণজীকে বন্ধ করেছিলে জেলের মধ্যে। আর এ যুগে মহাত্মাজীকে আর তাঁর শিষ্যদের বন্ধ করেছ।' 'কর্মের খেলা কি খন্ডাবার উপায় আছে? কিন্তু কিষুণজীকে আর কদিন আটকে রেখেছিলাম। আপনাদের যে বাবু কতদিন থাকতে হবে, তার কি ঠিক আছে? এ ছাই যুদ্ধও কোনো দিন শেষ হবে বলে তো মনে হয় না।'

বৈজনাথের দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। সিংজীকে তাহারা ফাঁদে ফেলিয়াছে। 'রাধাকিষুণ' বলিলেই সিংজী চটিয়া যায়। সে বলে, 'বোলো সীতারাম।' আজ নিজেই নিজের অজ্ঞাতসারে কিষুণজীর নাম লইয়াছে। লজ্জায় হাসিতে হাসিতে, দুই হাতে একবার তালি দিয়া সিপাহীজী দৌড়াইয়া এখান হইতে চলিয়া যায়। বৈজনাথরা ডাকে 'শোনো শোনো সিংজী, আমাদের ছাড়া পাবার খবর।' কে উহাদের কথা শোনে—সিংজী ততক্ষণে ওয়ার্ডের অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে। ওয়ার্ডারদের হাতে থাকে একটি করিয়া লন্ঠন। সিংজী তাহার লন্ঠনটি জানালার সম্মুখে ফেলিয়া গিয়াছে। কমরেড গিরধর, গরাদের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়াইয়া তাহার লন্ঠনের তেলটি একটি চায়ের কাপে ঢালিয়া লইল। তাহার পর কাপটি ভিতরে আনিয়া, তেল নিজেদের লন্ঠনে ঢালিল। আজকালকার যুদ্ধের বাজারে কেরোসিন তেলের বড়ই অভাব... উহারা সকলে ছাড়া পাইবার গল্প করিতেছে! হোমমেম্বারের স্টেট্‌মেন্টের সুর, আমেরীসাহেব পার্লামেন্টে কী বলিয়াছেন, কোন্ কোন্ কংগ্রেসকর্মীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এই সকলের ভিত্তিতে তাহারা জল্পনা-কল্পনা, বাদানুবাদ করিতেছে যে, গভর্ণমেন্টের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কি না। জেলে আসিয়া প্রথমটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা যায়—কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জেলজীবন বড়ই একঘেয়ে লাগে। তারপর আরম্ভ হয়—দিনরাত্রি কেবল ছাড়া পাইবার কথা—খবরের কাগজ হইতে তাহার সমর্থনে ও বিপক্ষে প্রমাণ একত্র করা। ফুদনবাবু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ছাড়া পাইবার সমর্থনের প্রমাণ জড়ো করিবার ঠিকা লইয়াছেন। খবরের কাগজ পড়া হইয়া যাইবার পর তাঁহার চারিদিকে কী ভিড় হয়। বিষুণদেওজী এই বিষয়ের উপর তুলসীদাসের অনুকরণে একটি দোঁহাও তৈয়ারি করিয়াছে। প্রত্যহ যেই মেট খবরের কাগজের বোঝা লইয়া ঢুকে, অমনি কেহ না কেহ এই দোঁহাটি আবৃত্তি করে—

'তুলসী ঢুঁরত জেলমে বহু বড়াহিঁয়া অখবার,
জিস্‌মে চর্‌চা সুলহ কী করতি হো সরকার'

অর্থাৎ তুলসীদাস জেলে সেই সুন্দর খবরের কাগজখানি খুঁজিতেছেন, যাহাতে লেখা আছে যে গভর্ণমেণ্ট আমাদের সহিত সন্ধির আলোচনা চালাইতেছে।

আজ ছাড়া না পাক, কোনো না কোনো সময়ে তো সকলেই ছাড়া পাইবে। কিন্তু বিলু? বিলুকে তো সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। আমি বুড়ো হইয়াছি—আমার মধ্যে এখনও বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা কত। আর বিলুর কীই বা বয়স? সারাজীবনই তো এখনও উহার সম্মুখে পড়িয়াছিল। আর, আমিই ফিরিয়া যাইব—বিলু নয়। বিলুর বিবাহ দিয়া দিলে হয়তো তাহার গান্ধীজীর মতে বিশ্বাস থাকিত। বিবাহের পর জীবনের উদ্দামতা কমিয়া যায়—দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে। তাহা হইলে বোধ হয় বিলু সাম্যবাদের বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াইত না। 'সর্বোদয়ে' কাকা কালেলকার সেই প্রবন্ধটিতে হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়া মোটামুটি ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যাঁহাদের স্ত্রী আছে, তাহাদের স্বভাব বেশ নরম; আর যাহাদের অবিবাহিত বা বিপত্নীক তাঁহারা একটু মারমুখি গোছের। জহরলাল, সুভাষ বোস, বল্লভভাই প্যাটেল কেহই ঠান্ডা মেজাজে কোনো জিনিস বিচার করিতে পারেন না। না, সাম্যবাদী দলে যোগদান না করিলেও হয়তো বিলুকে বাঁচাইতে পারিতাম না। এ আন্দোলনে কত লোক মারা গিয়াছে, দৈনন্দিন জীবনে যাহাদের রাজনীতির সহিত কোনো সম্বন্ধই ছিল না। মহাত্মাজীর শিষ্যের মধ্যেও তো কত লোক হিংসাত্মক কার্য করিয়াছে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? জন্ম আর মৃত্যু কাহারও হাতের মুঠার মধ্যের জিনিস নয়।...

...সরস্বতীর সহিত বিলুর বিবাহ দিলে বেশ হইত। দুই জনেই সুখী হইতে পারিত। বেশ মেয়ে সরস্বতী। আগস্ট মাসে পুলিশ তাহাকে ধরে। মাস তিনেক পরে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেয়। আবার ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে জেলে আসিয়াছে। উহার সহিত বিবাহ হইলে দুইজনেই রাজনীতি ক্ষেত্রের কাজের সহিত ঘরসংসারও করিতে পারিত। লেনিনও তো বিবাহ করিয়াছিলেন।...

কপিলদেও ও তাহার মা আমার নিকট প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। উহাদের নিজেদের বংশে একটু গোলমাল আছে। তাহা না হইলে কি আর ঐ অল্পশিক্ষিত ভূমিহারব্রাহ্মণ-পরিবার বাঙালীর ঘরে মেয়ে দিতে রাজী হইত। আমার অবশ্য ইহার জন্য কোনো আপত্তি ছিল না। বিলুর মা'র মত হইল না। আর বিলুর মত জিজ্ঞাসাই করা হয় নাই। আজকালকার ছেলে,—উহার মত আমার আগেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কিন্তু বিলুর মা'রই যখন মত হইল না, তখন আর জিজ্ঞাসা করিয়া কথা বাড়াই কেন? বিলুর মা-ই আমাকে অনেকদিন পূর্বে বলিয়াছিল যে, বিলুর মত রাজনৈতিক কর্মীর বিবাহের শখ রাখা উচিত নয়। কিন্তু সরস্বতীর সহিত খাসা মানাইত। আজকালকার মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী মেয়ে অপেক্ষা সরস্বতী অনেক বেশি কাজের। স্বাস্থ্যও তাহার অনেক ভালো; দেখিতে শুনিতেও বেশ। এই তো দেখিতে দেখিতে এতবড় হইয়া উঠিয়াছে। কপিলদেও-এর মামলা-মোকদ্দমা সদরে লাগিয়াই আছে। আর এই কোর্টের কাজে আসিয়া সে আশ্রমে ওঠে। প্রায় প্রতিবারেই সে আসিবার সময় সরস্বতীকে লইয়া আসিত। এই সেদিনও গোলাপী রং-এর শাড়িপরা ফুটফুটে মেয়েটি, গুলাববাগের মেলা দেখিতে যাইবে বলিয়া, গরুর গাড়িতে চাপিয়া কপিলদেওয়ের সঙ্গে আশ্রমে আসিয়াছে। আমাদের বাড়ির মেয়েরা হইলে ঐ বয়সে ফ্রক পরিত। রান্নাঘরের দাওয়ায় বিলুর মা উহাকে খাইতে দিয়াছেন। দুধের বাটিতে চুমুক দিয়া মেয়ে কাঁদিয়া আকুল। কিছুতেই বলিবে না কেন কাঁদিতেছে। পরে সহদেও আসিয়া বকিয়া-ঝকিয়া

খোসামোদ করিয়া, আদর করিয়া, কান্নার কারণ বাহির করিল— 'দুধঅ ফিকঅ লগইছে,' অর্থাৎ তাহার মোষের দুধ খাওয়া অভ্যাস ; গরুর দুধ পানসে লাগিতেছে বলিয়া খাইতে পারিতেছে না।…বিয়ে না হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। হইলে তো কেবল আর একটি অভাগিনীর সংখ্যা বাড়িত মাত্র! আমারই বোঝা বাড়িত। আরও জড়াইয়া পড়িতাম। তা ছাড়া আমিই আর কতদিন বাঁচিব। তাহার পর নীলু তো আছে। নীলুর আবার থাকা আর না থাকা! সে থাকিয়াও নাই। তাহার উপর নির্ভর করিতে হইলেও হইয়াছে। যা খামখেয়ালী আর দায়িত্বজ্ঞানহীন! এক বিলুর কাছেই সে একটু ঠান্ডা হইয়া থাকে। সে কি আর কাহাকেও মানুষ বলিয়া মনে করে, না আর কাহারও কথায় কান দেয়? ছোটবেলা হইতেই সে শাসনের বাইরে। বড় হইয়া বরঞ্চ শান্ত ও গম্ভীর হইয়াছে। ছোটবেলায় কী ডানপিটেই না ছিল! প্রত্যহ একটা না একটা দুষ্কর্ম লাগিয়াই আছে।…

…সেবার দুর্গাবাবুর একটি পাতিহাঁস কাটিয়া রাঁধিতেছিল, আশ্রমের পশ্চিমের বাঁশ-ঝাড়ে। দুর্গাবাবু হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া নালিশ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া নীলুর খোঁজে বাহির হইলাম। দুর্গাবাবুর বড় ছেলে সঙ্গেই ছিল। সে-ই বাড়িতে খবর দিয়াছিল। বাঁশঝাড়ের মধ্যে আসামী বামাল গ্রেফতার হইল। সঙ্গে পাড়ার আর কয়েকটি ছেলে— আর সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে দুর্গাবাবুর ছোট ছেলে নরুও তাহাদের মধ্যে। নীলুকে হাঁস কাটিবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল, 'হ্যাঁ, আমরা সকলে মিলিয়া হাঁস মারিয়াছি।'—সে যেন এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। পরে জেরায় বাহির হইল যে, ছুরি আনিয়াছিল নরু—কাটিয়াছে নীলু। কাটিবার পূর্বে নীলু সকলের নিকট হইতে শর্ত আদায় করিয়া লয় যে, কাটিবার সময় বাকি সকলে তাহাকে ছুঁইয়া থাকিবে। সে কাটিয়াছিল ও তাহার পিছনে নরুরা একের পর এক, ছেলেদের রেলগাড়ি খেলার ন্যায় পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।…এত ফন্দিও উহার মাথায় খেলে।

নীলুর বলিষ্ঠ ঋজুদেহ, ভাবুকতাহীন মুখ, বিলুর পাশে যেন মানায় না। আজকাল নীলুকেই দেখিতে বিলু অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়। সে যাহা মনে করিবে, তাহা সে করিবেই। তাহার অদম্য সাহসের সম্মুখে সকল বাধাবিপত্তিই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। নীলুকে কিছু বলিতে ভয় ভয় করে! উহার মুখে তো কিছু আটকায় না। কিন্তু বিলুকে কিছু বলিবার পূর্বে নিজেই ভাবিয়া লই যে আমার কথা ঐ ভাবপ্রবণ মনে কিছু আঘাত তো দিবে না। বিলু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবে না—কিন্তু হয়তো উহার চোখে জল আসিয়া যাইবে। আর নীলু—নীলু তো আমার প্রাণে আঘাত দিবার সুযোগ পাইলে ছাড়ে না! নীলুর যখন কলেজে পড়ার কথা প্রথম উঠিল, আমি বারণ করি নাই। কারণ আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে নীলুর তো ইচ্ছা আছেই ; তাহার উপর বিলুর ও বিলুর মা'রও ইচ্ছা সে ইংরাজী কলেজে পড়ুক। সে কাশী বিদ্যাপীঠে পড়িয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, আর উহার মা বিদ্যাপীঠে পড়াকে পড়া বলিয়াই মনে করে না। …সব ঠিকঠাক। ইহার মধ্যে নীলু বলিয়া বসিল যে, সে গান্ধী-সেবাসঙ্ঘের পয়সায় কলেজে পড়িবে না। এত কথাও উহার মাথায় খেলে। চাকরি করিবার সময় যে সামান্য টাকাপয়সা জমাইয়াছিলাম তাহা হইতে পুঁজি ভাঙিয়া খাইতে খাইতে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। নিজের টাকা দিয়া আশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়াছিলাম ; ইহাতেও অনেক টাকা খরচ হইয়া যায়। তিনবার জরিমানাতেও প্রায় নয় শত টাকা গিয়াছে। অনেক লোকে কংগ্রেসের নাম করিয়া আমাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলে, তাহাও আমি লইতে অস্বীকার করি! অন্যান্য আশ্রমে যেরূপ চাঁদা প্রভৃতি তোলা

হয়, আমার আশ্রমে প্রথম হইতেই সে সব নিষিদ্ধ। চাঁদা লইলে আত্মসম্মান রাখাও যেমন শক্ত, নিষ্পক্ষ ও নির্ভীকভাবে কাজ করাও সেইরূপই অসম্ভব। অর্থাভাবে যখন আমার সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় খবর পাইলাম যে গান্ধীসেবাসংঘ হইতে আমাকে পঁচাত্তর টাকা করিয়া মাসহারা দেওয়া হইবে। মহাত্মাজী বোধহয় সবই জানিতে পারেন এ টাকা না পাইলে আমাকে হয়তো আশ্রমের আয়ের উপরেই নির্ভর করিতে হইত। আশ্রমের আয়ই বা কী? দুইখানি গরুর গাড়ি ভাড়া খাটে; দুইটি তেলের ঘানি, একটি 'গ্রামোদ্যোগ'[১] ভাণ্ডার, কাপড়কাচা সাবান তৈয়ারি করা, আর কয়েকখানি দৈনিকপত্রের এজেন্সি, ইহাই আয়ের সূত্র। মৌমাছি পোষা ও গুটিপোকা চাষের কাজে কখনও বিশেষ আর্থিক লাভ আমাদের আশ্রমের হয় না। তবে তরকারির বাগান হইতে আশ্রমের লোকের খাওয়ার মতো শাকসব্জি পাওয়া যায়। কিন্তু এত করিয়াও, আশ্রমের যে আয় হয়, তাহা হইতে আশ্রমের ভলান্টিয়ারগুলিরই খাওয়া-পরা চলা শক্ত। তাহার উপর যদি আমার সংসারের খরচ, আশ্রমের উপার্জন হইতে চালাইতে হইত তাহা হইলে কোথায় থাকিত আশ্রমের পাঠাগার, আর কী করিয়া চলিত জেলা কংগ্রেসের সাপ্তাহিক পত্রিকা? 'জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য খরচের সহিত অবশ্য আশ্রমের কোনো সম্বন্ধই নাই। এত সব দুশ্চিন্তা হইতে আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল, ঐ গান্ধী-সঙ্ঘের দেওয়া মাসহারা। এই টাকা লওয়ার মধ্যে যে কিছু অপমানজনক থাকিতে পারে তাহা আমার মনে হয় নাই। এ টাকা আমাকে যে প্রতিষ্ঠান হইতেই দিক, ইহা যে কোনো ক্রোড়পতির দান হউক না কেন, আমি তো জানি যে ইহা মহাত্মাজীর আশীর্বাদ —তাঁহার সেবকের অসুবিধা হইতেছে ভাবিয়া তিনি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আর নীলু কিনা বলিয়া বসিল যে সে কলেজে পড়িবে না—কারণ তাহা হইলে তাহাকে গান্ধী-সেবাসঙ্ঘের টাকা লইতে হইবে! বাপুজীর সেবারকার জয়সোয়ালজীর ভগ্নীর সহিত কথাবার্তা, সকলেরই মনে ছিল। কেহ জোরও করিতে পারে না। বিলু ও বিলুর মা-ও দেখি, নীলুর মতেরই সমর্থন করেন। আমার দৃষ্টিকোণ দিয়া কেহই দেখি জিনিসটিকে দেখে না। আমার ও আমার পরিবারের মধ্যেই ব্যবধান একস্থানে এত গভীর, তাহা আমি পূর্বে ভাবিতেও পারি নাই। বিলুর মা'র সহ্য করিবার শক্তিকেই আমি উৎসাহ-পূর্ণ সম্মতি বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। ছেলেদের অন্য রাজনৈতিক পথ গ্রহণ করার মূলেও হয়তো রহিয়াছে—এই আন্তরিক দ্বন্দ্ব। তাহার পর দেখিলাম নীলু কলেজেও পড়িল – আমার এক পয়সা নেয়ও নাই। কলেজের খরচ যোগাইয়াছিল বিলু। বিহার আর্থকোয়েক রিলিফের কাজ কংগ্রেস-কর্মীদের উপর পড়িয়াছিল। এই কাজের পূর্ণিয়া জেলার একাউন্টেন্ট ছিল বিলু। তাহাতে সে তিরিশ টাকা করিয়া মাসহারা পায়। এই টাকা সে নীলুর পড়ার খরচ করে। দাদার নিকট হইতে টাকা লইতে নীলুর আপত্তি হইল না– যত সংকোচ আমার টাকা লইতে। এত বড় নির্মম আঘাত আমার জীবনে আর কাহারও নিকট হইতে পাইয়াছি কিনা সন্দেহ।…অথচ একথা আমি মনে মনে ঠিক জানি যে পড়াশুনার দিক ছাড়া নীলুকে যে কোন ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া যাক না কেন, সে সেই ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ স্থানে উঠিবেই। আর বিলু শিক্ষকতার লাইন ছাড়া অন্য কোনো দিকে থাকিলে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারিত না। কত ছাত্র এই হাত দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, আর এটুকু বুঝি না? কিন্তু নীলু, তোমার নিজের দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার মর্ম আমি বুঝিতে পারি নাই। তোমার পার্টি আদেশ করিয়া থাকিলে আমার বলিবার কিছু নাই। মহাত্মাজীর আদেশ হইলে আমিও

১ গ্রাম বা কুটীর শিল্প।

আমার সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক পার্টি কি এরূপ আদেশ দিতে পারে ? নীলুর ও বিলুর উভয় দলেরই লক্ষ্য এক—কার্যক্রমে হয়তো একটু পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। ইহার ফল কি এতদূর গড়াইতে পারে ! তাহার তো একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত জনতাকে অন্য দলের ভুলের কথা বুঝানো আর বুঝাইয়া ভ্রান্তপথে চালিত জনতাকে নিজের দিকে করা। নীলু, নিশ্চয়ই আদেশ বুঝিতে তোমার ভুল হইয়াছে ; আর এই ভুলের ফল ভোগ করিতেই হইবে। আমি তোমাদের ফর্মুলায় ফেলা যুক্তি বুঝি না সত্য ; কিন্তু সাদা বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝি, তাহা ঠিক কি না, সেকথা তোমাদের দলের নেতৃস্থানীয়দের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইও। আর এখন তাহা ঠিক হউক বা বেঠিক হউক তাহাতে কী আসে যায় ? অন্যায় বা ক্ষতি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। সারাজীবন উঠিতে বসিতে একথা তোমাকে খোঁচা দিবে। তিলে তিলে অনুতাপের জ্বালা তোমাকে দগ্ধাইবে—তবুও তোমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। একী, নিজের ছেলেকে অভিসম্পাত দিতেছি নাকি ? না নীলু, ভগবান করুন তুমি কোনদিন যেন তোমার ভুল না বোঝ। তুমি তোমার পার্টির আদেশ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছ তাহাই যেন ঠিক হয় ; কেন না উহার উপর ভর দিয়াই তুমি এখনও দাঁড়াইয়া আছ। তোমার মনের জোর যত অধিকই হউক না কেন, তোমার যুক্তির ন্যায্যতা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আসিলেই তুমি ভাঙিয়া পড়িবে। আমি তো জানি, তোমার কাছে তোমার দাদা কী ছিল।

'মহাশয়জী !'

চোখ তুলিয়া দেখি খেদনলালজী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

'ঘুম আসিতেছে নাকি ?'

না বসিলেই ভাল। বসিলেই এখন অনর্গল কথা বলিয়া চলিবে। এত বাজে কথা বলিতে পারে ভদ্রলোকে ! ভদ্রলোকের তিন ছেলে—স্বরাজপ্রসাদ, স্বতন্ত্রপ্রসাদ, আর সংগঠনপ্রসাদ। আশ্চর্য নামগুলি ! নীলু আর বিলু। আমার ছেলের নাম অতি সাধারণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া নামকরণ করা হয় নাই। বাবা বিলুকে ডাকিতেন বলাই—তাহা হইতেই ক্রমে বিলুতে দাঁড়ায়। নীলুকে বোধ হয় বাবা দেখেন নাই। না, যেবার নীলু হয়, সেই বারই তো বাবা মারা যান। ভাবিয়া চিন্তিয়া নাম রাখাও এক ফ্যাসাদ। খেদনলালজী তাঁহার মেজ ছেলে স্বতন্ত্রপ্রসাদকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠিতে অন্যান্য ছেলেদের নামেরও উল্লেখ ছিল। জেল সি. আই. ডি. সে চিঠি কিছুতেই পাশ করিবেন না। তাহার বিশ্বাস কোডে কোনো খবর পাঠানো হইতেছে। তাহার পর হইতেই সি. আই. ডি-র সহিত ইঁহার ঝগড়া চলিতেছে। ভাল কথায় বুঝাইয়া দিলেই হইত। তাহা নয়, দুই জনেই নিজের জিদ বজায় রাখিবে। ভদ্রলোক ছোট ছেলেকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। জিদাজিদির ফলে পরশু সে চিঠি ফেরত আসিয়াছে। চিঠির এক লাইন ছিল—'তোমরা যে এতদিন আমার চিঠি পাও নাই, তাহার উপর আমার কোনো হাত ছিল না। এ চিঠিখানি কিন্তু কোনো উল্লুর (পেঁচার) বাবাও আটকাইতে পারিবে না।' সে চিঠিও ফেরত আসিল—সঙ্গে একটুকরা কাগজে লেখা সি. আই. ডি-র নোট 'এই কয়েদী চিঠিতে নিজের বাবার সম্বন্ধে কী সব লিখিয়াছে, সেগুলি সন্দেহাস্পদ বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য এই চিঠি পাশ করা হইল না।'

একী, খেদনলালজী উঠিয়া যাইতেছেন যে ! এখনি আমার অনুরোধে কম্বলের উপর বসিলেন, আবার এখনি চলিয়া যাইতেছেন। বোধহয় আমি কথা বলিলাম না বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কী মনে করিলেন ভদ্রলোক ? ভদ্রলোক গিয়া বৈজনাথের

কয়েকমাস পরে জেল হইতে ফিরিবার সময় বাক্সে করিয়া জিনিস আনিয়াছিলেন। সাবান, পেন্সিল, রুলটানা খাতা। জেলের দাড়ি কামানোর 'বিলেড' দিয়া সে ছুরি তৈরি করিয়াছিল। সেই বাক্সের ভিতর সে 'বিলাতী দাঁতোয়ান'[1] দেখিয়াছে। নানা[2] মাথা নেড়া করিবার দশ বারো দিন পরে তাঁহার চুলগুলি যে রকম হয়, বিলাতী দাঁতোয়ানের সাদা রোঁয়াগুলিও ঠিক সেইরূপ দেখিতে। উহার উপর ক্ষীরের মতো দাওয়াই রাখিয়া দাঁতোয়ান করিতে হয়। ছোট বোন ধনখনিয়া এত বোকা যে তাহার গালে ঐ দাঁতোয়ান একটু ঘসিয়া দিলেই সে কাঁদিয়া ওঠে। ছোটবেলায় নানাও তাহাকে ঐ রকম করিয়া দাড়ি ঘসিয়া দিবার ভয় দেখাইতেন...থানার তারের বেড়ার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। থানার ছাদ দেখাই শক্ত তো বাবাকে দেখা যাইবে! বেড়া ভাঙিয়া জনসমুদ্র থানার 'হাতা'[3] তে ঢুকিল। ভিড়ের চাপে সে ক্রমেই আগাইয়া যাইতেছে। সুরজবল্লী জী কী জয়! সকলে থানার দিকে দৌড়াইতেছে কেন? তাহার পর।...

তাহার পরের দিন রাত্রে সুরজবল্লীবাবুকে 'লক-আপ'-এর পর দরজা খুলিয়া জেলের বাহিরে লইয়া গেল। শুনিলাম সদর হাসপাতালে লইয়া যাইতেছে। উহাদের অসীম করুণা, শেষ মুহূর্তে দেখা করাইয়া দিয়াছিল। কয়েক ঘন্টার জন্য শ্মশানঘাটেও থাকিতে দিয়াছিল। ছেলেটির বাঁ পাখানা হাঁটুর উপর হইতে কাটিয়া ফেলিতে হয়, আর তাহার পরই সিভিলসার্জন বুঝিতে পারেন যে সে বাঁচিবে না! পরের দিন সন্ধ্যায় যখন আবার সুরজবল্লীবাবু আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে যাইতেই সংকোচ হইতেছিল। সেই নির্বাক গম্ভীর ভদ্রলোককে কী বলিয়া প্রবোধ দিব? সেদিন আমিও এইরূপ তাঁহার পাশে গিয়া বসিয়াছিলাম। 'বসুন'। অনেকক্ষণ পর কেবল একটি কথা বলিয়াছিলাম—'অলপক্ষণের জন্য জ্ঞান হয়। তখন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমাকে বলিয়াছিল, উঃ, কী গরম জোরে আসে, না বাবুজী'? তাহার পর দুই ঘণ্টার মধ্যেই তো সব শেষ। একী! আমার চোখের কোণে জল আসিয়া গেল দেখিতেছি। না, জল আসিয়াছে সুরজবল্লীবাবুর প্রতি সহানুভূতিতে; বিলুর কথা ভাবিয়া নয়। সুরজবল্লীবাবুর চোখের জল দেখিতেছি। একজনকে কাঁদিতে দেখিলে নিকটস্থ লোকের পক্ষে চোখের জল চাপা বড় শক্ত। ছি ছি, আমার এতটুকু নিজেকে সংযত করিবার ক্ষমতা নাই! এতটুকু সহ্য করিবার শক্তি নাই। মহাত্মাজী, আমার মনে বল দাও। একমাত্র সুরজবল্লীবাবুই আমার মনের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন! তাঁহার সহানুভূতি...

বারান্দার উপর দিয়া দৌড়াইয়া কে এই দিকে আসিতেছে? ওয়ার্ডার সিংজী হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া জানালার সম্মুখ হইতে লণ্ঠনটি উঠাইয়া লইল। তাহার পর ধীর পদক্ষেপে গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চলিয়া গেল। দুই এক মিনিট পরে গরাদের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জাফর সাহেব—অ্যাসিস্টেণ্ট-জেলর। আমাদের সকলকে হাসিয়া আদাব করিলেন; তাহার পর আর অন্য কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইনি আসিয়াছিলেন রাত্রের রাউণ্ডে। এক একদিন এক একজন অ্যাসিস্টেণ্ট জেলরের ডিউটি থাকে। এইজন্য ওয়ার্ডার আসিয়া লণ্ঠন লইয়া গেল....

আচ্ছা, সুরজবল্লীবাবুকে দাহকার্যের জন্য যেরূপ শ্মশানে যাইতে দিয়াছিল আমাকেও কি সেইরূপ যাইতে দিবে? বোধ হয় দিবে না। দিলে আমাকে নিশ্চয়ই

১। Tooth brush, ২। দাদামশায় ৩। Compound.

বাথ লওয়া শেষ হইলে, তাহার পর করিবে শীর্ষাসন। আধ ঘন্টার উপর মাথা নিচের দিকে, পা উপর দিকে করিয়া, নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া থাকিবে; আমার ভয়ই করে, কোনদিন আবার নাক মুখ দিয়া রক্ত না বাহির হইয়া যায়।

নিজের সিটে ফিরিয়া আসিলাম, সুরজবল্লীবাবু বসিয়া আছেন। বিলু এখন কী করিতেছে? বোধহয় ভয়ে চিন্তায় জর্জরিত হইয়া সেলের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। আমার কথা কি উহার একবার মনে পড়িবে? আমার সম্বন্ধে বিলু শেষ মুহূর্তে কী ভাবিয়া গেল, তাহা যদি জানিতে পারিতাম! নীলুকে সে দোষ দিবে না; তাহাকে সে ক্ষমা করিবে, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। এখন তাহার মনের অবস্থা যে কী হইতেছে তাহা ভগবানই জানেন। হয়তো পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে। উস্কোখুস্কো চুলগুলি হয়তো দুই হাত দিয়া ছিঁড়িতেছে। হয়তো গরাদের উপর মাথা ঠুকিতেছে। হয়তো ছেলেমানুষের মতো ওয়ার্ডারকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। না না, বিলু কি কখনও এমন করিতে পারে? দুঃসহ মর্মবেদনায় তাহার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও তাহার মুখে সে ভাব প্রকাশ পাইবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহার আদর্শের যোগ্য সম্মান যাহাতে বজায় রাখিতে পারে, তাহার চেষ্টা সে করিবে। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দেখাইবার জন্য, সে জোর করিয়া শেষ মুহূর্তে মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিবে; জেলরকে হয়তো কৌতুক করিয়া কিছু বলিবে; সিঁড়ি দিয়া মঞ্চে চড়িবার সময়, হয়তো অফিসারদিগকে ধন্যবাদ দিয়া যাইবে, এমন সুন্দর প্রত্যূষে শুকতারাটিকে সাক্ষী রাখিয়া তাহাকে ফাঁসি দিবার জন্য; কিন্তু সে কিছুতেই দুর্বলতা দেখাইয়া তাহার পার্টির নাম কলঙ্কিত হইতে দিবে না। আমার ছেলে, আমার বড় ছেলে, তাহাকে আর আমি চিনি না! সাধে কি আর সবাই বিলুকে ভালবাসে? হরদার দুবে দুবেইন 'বিলু' বলিতে অজ্ঞান, সহদেও-এর মা 'বিলু' বলিতে পাগল, আর জিতেনের মা বৌঠাকরুনের তো কথাই নাই; বিলুও স্নেহের কাঙাল কম নয়। জিতেনের মা বৌঠাকরুন তো বাড়ির লোকের মতো। অন্য অল্প পরিচিত স্থানেও যেখানেই স্নেহবর্ষণের ইঙ্গিত পাইয়াছে, সেখানেই বিলু সেই ধারাকে স্থায়ী করিতে ও বজায় রাখিতে সচেষ্ট। কোথাও হোলির পর প্রণাম করিতে যাইবে। কোথাও আশ্রম হইতে লেবু পাঠাইয়া দিবে। কাহারও বা ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এ ধরণের কাজের তাহার অন্ত নাই। এসব স্নেহের দায়িত্ব নাই, কোনো দাবি নাই, বন্ধনও সর্বত্র সেরূপ দৃঢ় নয়। ইহা কেবল স্নেহ আদায় করিবার নেশা। বাড়িতে মায়ের স্নেহের উপর এগুলি উপরি পাওনা—সেইজন্য ইহার আমেজ এত মধুর। নীলুর কিন্তু এসবের বালাই নাই। স্নেহের দাবি জন্মাইবার মতো, মিষ্টি করিয়া কি সে কথা বলিতে জানে? নিজের খেয়ালেই সে উন্মত্ত। নিজের মত ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করিয়া, তাহা জোরের সহিত ব্যক্ত করিতেই সে ব্যস্ত। স্নেহের ঋণ শোধ দিবার জন্য, যে সকল ছোট ছোট কর্তব্যগুলি সর্বদাই করিতে হয়, তাহাতে সময় নষ্ট কি নীলু করিতে পারে? ততক্ষণ তাহাদের সমালোচনা করিতে পারিলে, তাহার আনন্দ বেশি হইবে। আর বিলু যেন লোককে জাদু করিতে পারে। বাবাকেও করিয়াছিল। বলিতে নাই, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, বাবার চিরকালই রাগটা একটু বেশি। কতদিন দেখিয়াছি,—খাইতে বসিয়াছেন; রান্না পছন্দ হইতেছে না; প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করিলেন, তাহার পর 'রেচেড ডায়েট' এই কথাটি বলিয়া ঠক্ করিয়া জলের গ্লাসটি ঠুকিয়া উঠিয়া পড়িলেন। না খাইয়া অফিসে চলিয়া গেলেন। এদিকে বাড়িতে মাকেও সারাদিন না খাইয়া থাকিতে হইল।

…চা খারাপ হইয়াছে, আর বাবা 'যত সব !' এই কথাটি বলিয়া, কাপ সসার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। এরূপ কত দিনের কথা মনে আছে। বৃদ্ধ বয়সে রাগ আরও বাড়িয়াছিল। শেষকালে অল্প অল্প পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। পা দুইখানি ধীরে ধীরে অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছিল। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কাশী ছাড়িয়া পুণিয়া আসিয়া থাকিতে হয়। দেহ যতই অপটু হইতেছিল, ক্রোধও ততই বাড়িতেছিল। এই সময় আসে বিলু। দিনরাত ঐ একরত্তি ছেলেকে লইয়াই আছেন। চলাফেরা করিতে পারেন না, ইজিচেয়ারে শুইয়া থাকেন, কিন্তু বলাই'কে ( বিলুকে ) চোখের আড়াল করিবেন না। অন্য কোনো বাড়ির মেয়েরা বেড়াইতে আসিলেই বলিতেন, উহারা ডাইনী—বলাইকে যাদু করিবার জন্য আসিয়াছে। বিলুর মাকে ইহার জন্য কত গালাগালি দিতেন। শেষকালে যখন শয্যা লইলেন তখন মাথা বেশ খারাপ হইয়া গিয়াছে। খাটের চারিদিকে কাঠের ফ্রেম করিয়া দিলাম, যাহাতে গড়াইয়া নিচে না পড়িয়া যান। কথা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। চোখ বুজিয়া থাকেন। বোধশক্তিও বেশ কম হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও রাগ কমে নাই। বিলুর মাকেও আমাকে আঁচড়াইয়া খামচাইয়া অস্থির করিয়া দিতেন। ভাত খাওয়াইয়া দিবার সময় আঙুল কামড়াইয়া ধরিতেন। কিন্তু তখনও বিলুকে তাঁহার কাছে বসাইয়া দিলেই সব ক্রোধ নিমিষে কোথায় চলিয়া যাইত ! খুব রাগে বিছানায় ছেলেমানুষের মতো গড়াগড়ি দিতেছেন, বিলুর কচি হাত দুখানি যেই তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া দিতাম, অমনি মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো ঠান্ডা হইয়া যাইতেন। হয়তো চোখ বুঁজিয়া আছেন ; আমরা কত ডাকাডাকি করিতেছি ; কিছুতেই চোখ খুলিবেন না। যত বলিতেছি, ততই যেন দুষ্টু ছেলের মতো তাঁহার জিদ বাড়িতেছে। আমরা বিলুকে বলিয়া দিতাম, 'বিলু, দাদুকে ডাক তো'। আশ্চর্য, এই অর্ধচৈতন্য অবস্থার মধ্যেও ঠিক বুঝিয়াছেন যে বিলু ডাকিতেছে। অমনি হাত দিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন, বিলু কোথায়। তাহার পর চোখ খুলিয়া তাকাইলেন। যেদিন বাবার সব শেষ হইয়া গেল, সেদিন শেষ মুহূর্তেও বাবার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিয়াছি, 'বাবা ! বলাই ডাকছে বলাই, বলাই !' তখন মনে ক্ষীণ আশা যে যদি বিলুর নাম শুনিলে সাড়া দেন। কিন্তু তখন তিনি কোনো ডাক কানে পৌঁছবার বাহিরে। আশ্চর্য বুদ্ধি ছিল বিলুর। কতই বা তখন বয়স। সে ছাড়া আর কেহ যে দাদুকে বশ করিতে পারে না, একথা অতটুকু ছেলে ঠিক বুঝিয়াছিল। তাহার দাদুকে ঠান্ডা করিবার জন্য বা খাওয়াইবার জন্য যে তাহার উপস্থিতের প্রয়োজন, একথা সে তাহাকে ডাকিবার স্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিত। তখন যেন একটু ঔদাসীন্য ও নকল গাম্ভীর্য দেখাইত। বোধ হইত যেন সে চায় যে তাহার মা একটু তাহার খোসামোদ করুক।…বিলু কি তাহার দাদুকে আবার দেখিতে পাইবে ? বাবা, আদরের বলাইকে কি শেষকালে এমনি করিয়াই নিজের কাছে টানিয়া লইলেন ?

মন বড়ই অস্থির লাগিতেছে। ঘরের মধ্যে এত লোক। সকলে জাগিয়া রহিয়াছে। ঘরের বাহিরে ওয়ার্ডার। ঘরের গল্পগুজবের শব্দ ক্ষীণ হইয়া আসিলেও একেবারে বন্ধ হয় নাই। দাসজীর স্নানের সময়ের শব্দ কানে আসিতেছে। ঘর একটু ঠান্ডা হইয়াছে। বাহিরে কুকুরের ডাক শুনা যাইতেছে। তবুও কেন যেন থমথমে ভাব আকাশে বাতাসে চারিদিকে।

গরাদের ভিতর দিয়া আলো বাহিরের বারান্দায় গিয়া পড়িয়াছে। শাড়িপরা—ও কে ? না, ও কতকগুলি জ্বালানী কাঠ জড়ো করা রহিয়াছে ; তাহার উপর আলো

পাড়িয়া ঐরূপ দেখাইতেছিল। বিষ্ণুদেওজী মেসের জ্বালানী কাঠ পর্যন্ত করিয়া রাখিবে। জেলের সকলেরই দেখি এই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। ছেঁড়া জামা, পুরনো খড়ম, সব জমানো চাই। জেলে থাকিলেই এইরূপ মনোবৃত্তি হয়। কাঠের বোঝা দেখিয়া হঠাৎ এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রম হইল কেন ?…আশ্রমের রান্নাঘরের বারান্দায় চেলা কাঠ আর ঘুঁটের স্তূপ। ঘরের ভিতর বিলুর মা রাঁধিতেছে। বিলু কোথায় যেন যাইবে। তাই সে খাইতে বসিয়াছে। এত তাড়াতাড়ি খায়, কিছুতেই চিবাইবে না।…উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুল। জেলের আধময়লা নীল ডোরাকাটা গেঞ্জি ও জাঙিয়া পরা। রোগা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে…

ভগবান! গান্ধীজী! তোমাদের নাম লইয়াও তো মনে বল পাইতেছি না। আবার চরকাটি লইয়া বসি। ইহাই আমার শেষ সম্বল, অন্ধের যষ্টি, আমার জপের মালা।…তিব্বতে 'যারবেদা চক্রের'[১] ন্যায় একটি জিনিস ঘুরাইয়া লোকে নাম জপ করে। সুরজবল্লীবাবুর দিকে হঠাৎ চোখ পড়িল। ভদ্রলোক চিন্তান্বিতভাবে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। আমার মুখে ব্যবহারে নিশ্চয়ই কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। এত খারাপ পাঁজগুলি—সুতা কেবল কাটিয়া যাইতেছে। বিদেশে একটু অসুখে পড়িলে লোক ব্যস্ত হইয়া উঠে; আত্মীয় পরিজনকে দেখিতে ইচ্ছা করে; বাড়ির লোকের দরদভরা সেবার জন্য মন ব্যাকুল হয়। আর আজকের মতো দিনে বিলু বাড়ির লোককে কাছে পাইল না। হয়তো কত কিছু তাহার বলিবার ছিল। ছেলেদের সামান্য অসুখে, বিলুর মার স্নানাহার বন্ধ হইয়া যায়। সারা দিনরাত রোগীর বিছানার পাশেই কাটে। পাখা করিবার বিরাম নাই। আরোগ্যের পথে আসিলে, পথ্যাপথ্যের কত বিচার! জ্বর ছাড়িবার পরের দিন কেবল একটু শুক্‌তো; তাহার পরের দিন দুধ পাঁউরুটি; তাহার পরের দিন আটার রুটি; তাহার পরের দিন ভাত। নীলু বিলু জানে যে জ্বর হইলে ইহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। কিন্তু আজ আমি ইহাদের এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি যে অন্তিম মুহূর্তে বিলুর মা বিলুকে নিজের কাছে পাইবে না।…অনেক জানোয়ার নিজের সন্তান খাইয়া ফেলে। আমি কি তাহাদেরই দলে? আবার সুতা কাটিয়া গেল। বোধ হয় খুব মিহি সুতা কাটিতেছি বলিয়া বার-বার ছিঁড়িয়া যাইতেছে। না, ইহা অপেক্ষা মোটা সুতা কাটিলে তো প্রায় সতরঞ্জি বোনার সুতা হইয়া যাইবে।…

নেপালে শুনিয়াছি, একজনের বদলে আর একজন রাজদন্ড ভোগ করিতে পারে। সত্য কিনা জানি না, তবে শুনিয়াছি বড় লোকেরা চাকর-বাকরদের নিজেদের পরিবর্তে জেলে পাঠাইয়া দেন। এখানে যদি এমন একটি নিয়ম থাকিত, যাহাতে বিলুর বদলে আমার গেলেও তো…।

কত গল্প শুনিয়াছি যে একজন আর একজনের রোগ নিজের উপর লইয়াছে। হুমায়ুনের মৃত্যুশয্যায় বাবর এইরূপ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় যে হোস্টেজ রাখে, তাহা একটি প্রাণের পরিবর্তে আর একটি প্রাণ দাবি করা ব্যতীত আর কী?

আবার সুতা ছিঁড়িল। তুলাটাই বোধ হয় পুরনো। এতবার সুতা ছিঁড়িলে কি চরখাকাটা যায়? এই পাঁজ দিয়া পূর্বেও সুতা কাটিয়াছি, তখন তো ছেঁড়ে নাই। না, আমার হাত-পা কাঁপিতেছে। পাঁজটি ঠিক ধরিতে ও ইচ্ছামতো টানিতে পারিতেছি না। চোখের মণিও নাচিতেছে। সুতা ঝাপ্‌সা হইয়া যাইতেছে, লন্ঠনটার তেল বোধ

---

১ এক প্রকারের চরখা, সুটকেসের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়।

হয় ফুরাইয়া আসিতেছে। চোখের দৃষ্টিই বা আর কতকাল থাকিবে, বয়সের কি আর গাছ-পালা আছে? না, বৃথাই নিজেকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমার এখনকার মানসিক অবস্থায়, চরখা কাটা অসম্ভব।...সোরাব রুস্তমের কাহিনীর মূলে কোনো ঐতিহাসিক সত্যই নাই—উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পিতা-পুত্র কি কখনও ঐরূপ হইতে পারে? হইবে না কেন, পৃথিবীতে সবই সম্ভব। সিংহাসন লইয়া পিতা-পুত্রের যুদ্ধ ইহাই তো ইতিহাসের সাধারণ ধারা! কিন্তু আমার আর কী শাস্তি হইতেছে। শাস্তি হইয়াছিল, শিখগুরু বান্দার। নিজের হাতে বুকের দুলালকে হত্যা করিতে হইয়াছিল। 'উঃ, কী রক্ত! ফিনকি দিয়ে রক্ত! ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়েছিল বুকের ভেতর থেকে।'

সুরজবল্লীবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'কিছু বললেন নাকি?'

অপ্রস্তুত হইয়া বলি, 'না, কিছু বলিনি তো।' বুঝি যে শেষের কথাগুলি অন্যমনস্কভাবে জোরে বলিয়া ফেলিয়াছি। সুরজবল্লীবাবু আমতা আমতা করিয়া বলেন, 'চরখা কাটতে একটু-উ—একটু যদি-ই ইয়ে হয়, তাহলে এখন থাক না কেন।'

বলি, 'না না বেশ তো হচ্ছে।'

মনে হইতেছে যেন অন্যায় কাজ করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছি। কথার উত্তর দিতে গিয়া কথা জড়াইয়া আসিতেছিল, কোনো রকমে ঐ ছোট কথাটা শেষ করিয়া, সুতার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে পারিলে যেন বাঁচি। পাঁজের যেখান হইতে সুতা বাহির হইতেছে, জোর করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া আছি—যাহাতে কাহারও সহিত চোখাচোখি না হইয়া যায়। চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে। নিশ্চয়ই রাত্রি জাগিয়াছি বলিয়া; আর অন্য কোনো কারণে নয়। রাত জাগিলেই চোখ জ্বালা করে। মহাত্মাজী, আমার মনে বল দাও। সংযমের বাঁধ আর বুঝি থাকে না। আর তো নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিতেছি না।...

সুরজবল্লীবাবু বলেন, 'মাস্টার সাহাব! মাস্টার সাহাব! ও মাস্টার সাহাব।'

যেন বহু দূর হইতে শব্দ কানে ভাসিয়া আসিতেছে। তন্দ্রার ঘোরে দূর হইতে রেলগাড়ির শব্দ যেমন লাগে সেইরূপ। বুঝিতেছি, সুরজবল্লীবাবু ডাকিতেছেন। কিন্তু সাড়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে না। সুরজবল্লীবাবু পিঠে হাত দিয়াছেন—দরদী হাতের স্পর্শ লাগিতেই আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারি না—'বিলু! বিলু!' চরখা পাঁজ ফেলিয়া সুরজবল্লীবাবুর হাত চাপিয়া ধরি। দুইজনেই নির্বাক। ভদ্রলোকের চক্ষু হইতেও অশ্রুর ধারা বহিতেছে। চেয়ার ছাড়িয়া ওরা চারজনও আসিয়া পড়িল। ছি, একী করিলাম! লোক জড়ো হইয়া গেল যে! তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিই। আবার চরখায় বসিবার চেষ্টা করি। বৃথা চেষ্টা। সদাশিউ আবার দেখি পাখা করিতে আরম্ভ করিল। ও তো বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আবার উঠিল কখন? সুস্থ লোককে আবার পাখা করিবার কী দরকার? উহারা কি ভাবিতেছে যে আমি এখনই অজ্ঞান হইয়া যাইব?

সদাশিউকে বলি, 'বেশ ঠান্ডা হাওয়া হচ্ছে। আর পাখা করবার দরকার নেই।'

কে কাহার কথা শোনে।

কিছুক্ষণ পর সুরজবল্লীবাবু খুব আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একটু গীতা পড়ব, শুনবেন।'

এমন দরদভরা মিষ্টি কথা; অনুরোধ এড়াইবার জো নাই। বলি, 'পড়ুন।'

আবার চরখা কাটিতে বসি। উনি গীতা পাঠ আরম্ভ করেন। আমি বুঝিয়াছি

কেন উনি আমার সম্মুখে গীতা পাঠ করিতে চান। আমার মনে বল আনিবার জন্য নয়, সহানুভূতিতে নয়, নিজেদের দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য নয়—শবদেহবাহী মিলিটারি লরির শব্দ আর ম্যাজিস্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের মোটরকারের শব্দ যাহাতে আমার কানে না পৌঁছায় সেইজন্য। ইহার পূর্বে যতগুলি ফাঁসি হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির বেলাই আমরা ভীতিমিশ্রিত উৎকণ্ঠার সহিত এই শব্দের জন্য অপেক্ষা করিয়াছি। মোটর হর্নের তীব্র-ধ্বনি তখন আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে যেন হঠাৎ আলোড়িত করিয়া দিয়াছে। তাহার পর আসিয়াছে ওয়ার্ড জুড়িয়া এমন নিস্তব্ধতার রাজ্য যে নিজের বুকের ধড়ফড়ানির শব্দও যেন শোনা যায়। তখন সময় যেন কাটিতেই চায় না—সকাল যেন আর হয় না। আবার মোটর লরির শব্দ হইতে লোক বুঝিতে পারে লাশ বাহিরে গিয়াছে। তাহার পর নয়টা ঘণ্টা পড়ে, কয়েদিদের জাগাইবার জন্য। ফাঁসির দিন সকলে জাগিয়াই থাকে—তথাপি নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। ইহার পর শোনা যায় দুইটি ঘণ্টা—সকালের 'গিনতী মিলানের'। সে ধ্বনি সকলকে জানাইয়া দেয় যে রাত্রে যতগুলি কয়েদী বন্ধ করা হইয়াছিল, প্রাতঃকালেও ঠিক ততগুলিই আছে—একটিও বাড়ে নাই, একটিও কমে নাই। সব ওয়ার্ডের ওয়ার্ডাররা নিজের নিজের ওয়ার্ডের কয়েদীর সংখ্যা জানাইয়া দেয় গুমটিতে। এগুলি 'টোটাল' রাত্রির সংখ্যার সহিত মিলিয়া গেলেই, এই অভাবনীয় সংবাদ চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দেওয়া হয়, দুই ঘণ্টার শব্দে। জেলর সাহেব চাবি দিয়া দেন জমাদারের কাছে, আর সব ওয়ার্ডের দরজা খোলা হয়। পিঁপড়ের সারির ন্যায় লাইন বাঁধিয়া বাহির হয় কয়েদীরা। 'জোড়া ফাইল'। 'জোড়া ফাইল!' মেয়াদের একটি দিন তাহার কমিয়া গিয়াছে। নূতন উদ্যমে, দুর্বহ, দুরতিক্রম্য আর এক দিন মুছিয়া ফেলিবার জন্য সে সচেষ্ট হয়। প্রতিটি ঘণ্টা তাহাকে মনে করাইয়া দেয় যে চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন হয়—এক দিন কাটিয়া গেল—আর এখনও এতদিন বাকি থাকিল।…

আমাকে ইহারা ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এখন কি বিলুর কথা ভুলিতে পারা যায়? এখন কি চেষ্টা করিলে অন্যমনস্ক হওয়া যায়? হইতে পারিলে তো বাঁচিয়া যাইতাম।…ভগবানের অশেষ করুণা যে এক সঙ্গে একই মুহূর্তে একটির বেশি বিষয় ভাবা যায় না। বিলু যদি শেষের কিছুক্ষণ, নিজের মৃত্যুর কথা ব্যতীত অন্য কোনো কথা ভাবিতে পারে, তাহা হইলে সে মানসিক অশান্তি ও আতঙ্ক হইতে বাঁচিতে পারে। হয়তো ব্যথা বুঝিতেও পারিবে না। ভগবান, তোমার নিকট হইতে কখনও কোনো জিনিস চাহি নাই। আজ এই কঠিন বিপদের সময় আমার সকল সিদ্ধান্ত জলাঞ্জলি দিয়া, তোমাকে আমার ইচ্ছা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ভগবান, বিলুকে শেষ মুহূর্তে অন্য কথা মনে পড়াইয়া দিও, অন্য কথা ভাবিবার ক্ষমতা দিও।—অন্তিম মুহূর্তের পূর্ব হইতেই, মৃত্যুভয়ে তিলে তিলে যেন তাহাকে না মরিতে হয়। টেলিপ্যাথি কি সত্য? আমার মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কি বিলুর কাছে পৌঁছিতেছে? বিলু দেখো, তোমার বাবা তোমার জন্য নিজের কাছে, ভগবানের কাছে আজ ছোট হইয়া গেল!

সুরজবল্লীবাবু গীতা পাঠ করিতেছেন। অতি পরিচিত গীতার শ্লোকগুলি যেন শুনিয়াও শুনিতে পাইতেছি না, শুনিতে পাইয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। শব্দতরঙ্গ কানে পৌঁছিতেছে, কিন্তু মনে ও মস্তিষ্কে সাড়া জাগাইতে পারিতেছে না—বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গীতার বাণী শোনা দ্বাপর যুগেই সম্ভব হইয়াছিল; আমি তো আর অর্জুন নই। আমরা আর গীতার মর্ম কী বুঝিয়াছি? যে নাস্তিক

বিলু গীতা ফেরত দিয়াছিল, সেই কিন্তু কর্মযোগের মূলমন্ত্র বুঝিয়াছে, কাজের মধ্যে নিজেকে লীন করিয়া দিয়াছে। আর নীলু, সেই বা কম কিসে? তাহার কঠোর কর্তব্যজ্ঞানের সম্মুখে স্নেহ, ভালবাসা, আত্মীয়তার দাবি, জনমত, অত আদরের দাদা সব তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ইহাদেরই আবার আমি ভাবি নাস্তিক! ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের মনে বল আনে; আর ঈশ্বরে অবিশ্বাস ইহাদের মনে দুর্বলতা আনে নাই। যে জিনিসে অপরের পতন, তান্ত্রিক সাধকের হয় তাহাতেই সিদ্ধি।...

'আঁ।' চমকিয়া উঠিয়াছি। হাত হইতে পাঁজি পড়িয়া গেল। চরখার ঘর্ঘর আর গীতা পাঠের একঘেয়ে সুর ভেদ করিয়া, অন্য সকল শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, শোনা গেল মোটর লরির হর্ন—তাহার পর মোটর থামিবার শব্দ। আমার বুকের উপর দিয়াই যেন লরিখানা চলিয়া গেল—টানিয়া যদি ধরিয়া রাখিতে পারিতাম—গায়ের জোরে, যত শক্তি আছে আমার শরীরে—কাঁকরভরা রাস্তার উপর দিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—লরির চাকা থামাই, এত জোর কি আমার আছে—লরি থামিল—আমার হৃৎস্পন্দের সহিত সুর মিলাইয়া মোটর ইঞ্জিনের শব্দ হইতেছে—ক্রুদ্ধ হিংস্র জন্তুর নির্ঘোষের মতো। সদাশিউ পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে। চারিদিকে সকলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ গাড়ি চাপা পড়িলে সেই স্থানে যেইরূপ ভিড় হয় সেইরূপ।...

সদাশিউ বলে, 'আসুন সকলে মিলে একটু 'প্রার্থনা' করা যাক।' সকলে সেইখানে বসিল। বৈজনাথের দল, ফরওয়ার্ড ব্লকের দল, কিষাণ সভার ছেলেটি, কম্যুনিষ্ট পার্টির ছেলেটি আর বাকি সকলে তো আছেই। মেহেরচন্দজী 'রাষ্ট্রগগনকী দিব্বির জিয়োতি'...আরম্ভ করিলেন। আজ কাহারও প্রার্থনায় আপত্তি নেই; ইহাকে ব্যঙ্গ করিয়া চুটকি গান গাই। মেহেরচন্দজীর যে কলিটি মনে থাকে না, সেটি আগে হইতেই সকলে গাহিয়া দিল। পকেট হইতে কাগজখানি আর তাঁহাকে বাহির করিতে হইল না। সকলেই প্রাণপণে চিৎকার করিতেছে। এত চিৎকারের মধ্যে আর ম্যাজিস্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের মোটরকারের শব্দ শোনা যাইবে না। সেই মতলবেই ইহারা প্রার্থনায় বসিয়াছে। যেই মেহেরচন্দজীর শেষ হইল, অমনি সদাশিউ আরম্ভ করিল, 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম...'

মহাত্মাজীর প্রিয় ভজনটি। কী মধুর চির নূতন সুর ভজনটির। বিলুর দলের আজ ভজন গানেও আপত্তি নাই। আগের গানটি না হয় ছিল 'জাতীয় পতাকা'র বিষয় লইয়া, কিন্তু এ ভজনটি তো আর তা নয়। বিলুর অন্তিম মুহূর্তে তাহার আত্মার শুভ কামনায়, আর বিলুর বাবাকে একটু অন্যমনস্ক রাখিবার প্রয়াসে, উহারা নিজেদের মতবাদ একটু নমনীয় করিয়া লইয়াছে। বিলুর দল—ইহারা একটুও কি করিবে না? হইত নীলু—তাহা হইলে সে কি ভজনে যোগদান করিত? কখনই নয়। সে ভাঙিবে কিন্তু মচকাইবে না। নীলু বিলু আগে আশ্রমে এই ভজনটি কেমন সুন্দর গাহিত। মহাত্মাজীর সম্মুখেও গাহিয়াছিল। মানসিক উদ্‌বেগ চাপিবার জন্য ইহারা অস্বাভাবিক জোরে গাহিতেছে। ঠিক করিয়াছে যে এখন আর শেষ করিবে না—যতক্ষণ পারে প্রাণপণে গাহিয়া চলিবে...মঞ্চের সিঁড়ির উপর দিয়া বিলু উঠিতেছে—আহা, খালি পায়ে ঠোকর খাইল—কী রোগা হইয়া গিয়াছে—গলাটি পাখির গলার মতো সরু—নাকটি খাঁড়ার মতো হইয়া উঠিয়াছে; নিচে অন্ধকার—দড়িতে হেঁচকা টান পড়িল—বিলু—বিলু যাইলে কী হইবে? আমার এতগুলি বিলুকে সে রাখিয়া গিয়াছে। ভগবান! মহাত্মাজী! বিলুর মাকে আঘাত সহ্য করিবার শক্তি দাও, নীলুর মনে বল দাও, বিলুর আত্মাকে শান্তি দাও। ভজন চলিয়াছে—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম।
জয় রঘুনন্দন জয় ঘনশ্যাম, জানকীবল্লভ সীতারাম।

জোরে, আরও জোরে!

## আওরৎ কিতাঃ মা

সরস্বতী চলে গেল। তাহলে দরজা বন্ধ হওয়ার সময় বুঝি হল। হ্যাঁ,তাইতো—ঐ তো কথা শোনা যাচ্ছে লুসী জমাদারনীর[১]। সরস্বতী একটু মাথা টিপে দিচ্ছিল, বেশ লাগছিল। ভারি নরম ওর আঙুলগুলো। দুই রগের উপর চেপে ধরে, তারপর আস্তে আস্তে আঙুলগুলো নিয়ে আসে, ভুরুর উপর দিয়ে নাকের ডগায়। রগের দবদবানি সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। আর মাথার মধ্যে কী যেন জমে আছে, চাপ বেঁধে,—সেটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় গলে হালকা হয়ে গেল। জমাদারনী কি ওকে এক মিনিটও বেশি বসতে দেবে। আমাদের তো তবু একটু সমীহ করে কথা বলে—কিন্তু সরস্বতী যে 'সি' কেলাসী। ওদের ওয়ার্ড যে আলাদা। ওকে এতক্ষণ এই ওয়ার্ডে থাকতে দিয়েছে সেই যথেষ্ট। আহা-রে, ও যে আবার জেলে ফিরে এল কেন, সে তো আমি বুঝি। আমার কাছ থেকে কি তা লুকোতে পারে? আগে যদি এটা বুঝতাম, তাহলে সহদেও-এর মা যখন আমার কাছে কথাটা পেড়েছিল, তখনই রাজী হয়েযেতাম। তাহলে হয়তো বিলুর আমার এদশা হতো না। তা রাজী হব কেন? ভগবান আমায় এমনি করেই সৃষ্টি করেছেন! তাহলে রাজ্যসুদ্ধ সবাইকে নিজের পেটে পুরে বসে থাকব কী করে? 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।' আমার হয়েছে তাই। সরস্বতীর কপাল এমনিও পুড়েছে, আর বিয়ে হলেও হয়তো পুড়ত। আমি বিলুর মত পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিনি। মেয়ে মোটে ছাত্রবৃত্তি পড়া। আজকালের ছেলেরা কখনও তা পছন্দ করে? একথা সহদেও-এর মাকে একটু আভাসও দিয়েছিলাম। সহদেও-এর মা তো আমার কাছে কোনো জবাব দেয়নি। কেবল সে সময় অবাক হয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। কিন্তু এর জবাব পরে সহদেও আমাকে শুনিয়ে দিতে ছাড়েনি। সহদেও বলেছিল, 'আমরা চাষাভুষো মানুষ। আমাদের বোন মিডিল্ পাশ করা হবে না তো কি সরোজিনীনাইডু আর বিজয়লাক্সমী পন্ডিতের মতো বিদুষী হবে? তাছাড়া বিলুবাবুই এমন কী একটা লেখা-পড়া করেছে? বিদ্যাপীঠের শাস্ত্রী বইতো নয়।' সহদেও মিটমিটে দেখতে; থাকে চুপচাপ গরুচোরের মতো। কিন্তু কথা যখন শোনায় তখন একেবারে বেঁধিয়ে বলে। আমার ছেলের বিয়ে—আমি যেখানে ইচ্ছে দেব, যেখানে ইচ্ছে দেব না; এ নিয়েআবার সাতমুখ করা কী? আমি রাজী হইনি, দুজনকে মানায় না ভাল বলে। হিন্দুস্থানী আর বাঙালীতে কি মানায়? যেখানকার যা সেখানকার তা। একগাছের বাকল আর একগাছে এঁটে দিলে তা কি কখনও জোড়া লাগে। আমি বলব সরস্বতী, তো ওরা বলবে সরসোয়াতী। সরস্বতী কি শুকতো রাঁধতে জানে? গোকুলপিঠের নাম শুনেছে? বিলু অড়রের ডাল পছন্দ করে না, আর ওরা অড়রের ডাল ছাড়া আর অন্য কোনো ডাল ভালবাসে না। ওরা মুসুরির ডাল খায় কেবল যখন ছেলেপিলে হওয়ার পর মেয়েরা আঁতুড়ে থাকে তখন।...একদিন বহুরিয়াজীকে ডাঁটা-চচ্চরি রেঁধে দিয়েছিলাম। সে বললো, 'হামি ড্যাটা খেতে খুব পসন করে।' ডাঁটাগুলো মুখে দেয় আর চুষে

---

১। Female warder.

চুষে ফেলে দেয়, চিবোতে হয় তা জানে না। আবার বাংলা বলার শখ কত। এরা কি একটা ভালো মিষ্টি তোয়ের করতে জানে? জেলে দেখেছি তো। আর ওদের দেশেই তো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম—কিছু জানতে তো আর বাকি নেই। মিষ্টির মধ্যে ঐ এক 'পুয়া'—সব পুজায়-আচ্চায়, ঝোলে-ঝালে, অম্বলে সর্বঘটে আছে। জলে একটু আটা গুলে নিয়ে, তাতে একটু গুড় দিয়ে কোনোরকমে ভেজে ফেলতে পারলেই হয়ে গেল 'পুয়া'। না আছে রসে ফেলা, না আছে কিছু। দুটো জিনিস মিলিয়ে তরকারি রাঁধো, ওরা আঁতকে উঠবে। আর তারই সঙ্গে আমি আমার বিলুর বিয়ে দিতাম। এ তো আর একদিন দুদিনের কথা নয়। সারা জীবন রসুন আর গোলমরিচ খেয়ে কি আর বাঙালীর ছেলে বাঁচতে পারে? তাহলেও ভারি ভাল লাগে আমার সরস্বতীকে। নিজের ছেলের বৌ করতে চাইনি বলে যে ওকে দুচক্ষে দেখতে পারি না, তা তো আর নয়। ওকে বলে ছোটবেলা থেকে দেখছি। কপিলদেও-এর সঙ্গে এসে, কতবার কতদিন থেকে গিয়েছে আশ্রমে। বিলু নীলুর মতো সহদেও আর সরস্বতী তো আমার নিজের হাতে করে গড়ে তোলা বললেও হয়। কী-ই বা বয়স? সেদিনও তো ও মেয়ে একরত্তি ছিল।

…আমার রান্নাঘরের বারান্দায় শিউলি ফুলের বোঁটা দিয়ে রাঙানো খদ্দরের বৃন্দাবনী শাড়ি পরে, দুষ্ট মেয়েটি, বাঁশ ধরে ঘুরপাক খাচ্চে। কোথায় চুল, কোথায় খোঁপা, কোথায় আঁচল,—বাঁই বাঁই করে ঘুরেই চলেছে। আমি বলি থাম, আবার মাথাটাথা ঘুরে পড়ে যাবি, গা বমি বমি করবে—কে কার কথা শোনে। 'সরসোয়াতী কি ইস্কুল; ভেরি ব্যাড ভেরি ব্যাড টিচার কুল'[1] এই পদ্য বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বিলু এসে রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়াল। তবু কি মেয়ের ঘুরুনি থামে। ঐ ঘুরতে ঘুরতেই বিলুর কথার পাল্টা জবাব দেওয়া হল—

'ম্যাও ম্যাও ম্যাও কু;[2]
বিল্লি ভাইয়া থ্যাঙ্কু।'

বিলু তার সঙ্গে সুর মিলিয়া বলে—'মুরগী ভাইয়া কী ঠ্যাং খাও?'

তখন মেয়ের ঘুরপাক খাওয়া থামে। মেয়ে হেসে তখন বারান্দার উপর লুটোপুটি লুটোপুটি।…

খাসা গড়নপিটন মেয়েটার। কাজ চালিয়ে নিতে পারতো কিন্তু। বাঙালী গেরস্থ বাড়ির মেয়ে এসে কি আর কংগ্রেস আশ্রমের সংসার চালাতে পারে? আশ্রম তো নয়—একটা হোটেল। মামলাবাজ লোকেরা সদরে মোকদ্দমার তদ্বিরে আসবে, আর এসে উঠবে আশ্রমে। মিটিং তো লেগেই আছে। সময় নেই অসময় নেই, রাত নেই, বিরাত নেই, লোক আসার কি বিরাম আছে? আমি বলেই সামলাতে পেরেছি,—অন্য কেউ হলে কেঁদে মরত।—সরস্বতীর হাতে খেয়ে কিন্তু বিলুর একদিনও পেট ভরত না। বিলু আমার তরকারি খেতে ভারি ভালবাসে। বসে বসে টুকটুক করে খাবে, যতটা ভাত প্রায় ততটা তরকারি। তাই খেয়েই তো কোনো রকমে হাড় কখানি টিকে আছে—তা না হলে ভাত খাওয়ার যা ছিরি। পাখির মতো ঠোকর মেরে এই তো চারটি ভাত খাওয়া। আর ঐ সরস্বতীদের—ওদের আবার তরকারি খাওয়ার অভ্যেস আছে নাকি?

---

১। কুল—সকলে, সমূহ।

২। গ্রাম্য বালকবালিকারা কানামাছি খেলার মতো একটি খেলা করে। তাহাতে ছেলে-মেয়েরা এই কথাটি বলিয়া চোখ-বাঁধা লোকটিকে সাড়া দেয়।

ওদের মধ্যে যে লাখপতি তার গর্ব যে, সে ভাতের সঙ্গে দু-তিন রকমের তরকারি খায়। পাড়ার সবাই সে কথা নিয়ে আলোচনা করে। আর সাধারণ গেরস্থ বাড়িতে কাঁধা-উঁচু পেতলের থালায়, লাল চালের ভাতের মধ্যে গর্ত করে এক নাদ অড়রের ডাল, আর থালার কোণের দিকে নম' নম' করে চন্দনের ফোঁটার মতো এতটুকু তরকারী। সোনামুখ করে তাই খেয়ে উঠে, কপিলদেও আর সহদেও এক এক ঘটি জল খায়।...

এ কে? আমার পা নিয়ে আবার টানাটানি কেন? কে রে? মন্‌চনিয়া? পায়ে তেল লাগাতে কে বলেছে? নিশ্চয়ই বহুরিয়াজী।[১] নিজেরা গিয়ে রামায়ণে বসেছেন, আর একে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে বিরক্ত করতে। রামায়ণ পাঠ তো বেশ জমে এসেছে দেখছি। বহুরিয়াজী পড়ে, আর বাকি সতেরো জন তার সঙ্গে সুর মেলায়। একেবারে কান ঝালাপালা। আমাদের কেমন একজন রামায়ণ কী মহাভারত পড়ে, আর বাকি সকলে বসে শোনে। বড় জোর একটু আধটু আহা উহু করে। এদের সবই অদ্ভুত।... 'হ্যাঁ রে মন্‌চনিয়া, আমার পায়ে তেল দিয়ে দিতে কে বল্‌লে রে?'

'সরসোয়াতীজী যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল যে কদিন থেকে পিত্তি পড়ে পড়ে মাইজীর হাত পা জ্বালা করছে। হাতের তেলোয়া আর পায়ে একটু তেলজল লাগিয়ে দিস। আপনি মাইজী, বিরক্ত হবেন মনে করে আমি তো এতক্ষণ দিইনি। আমি বসেছিলাম দোরগোড়ায়। এখন জমাদারনী এসে আবার শাসিয়ে গেল। বলে যে 'এখন থেকেই ঘুমোনোর ব্যবস্থা হচ্ছে। মাইজীর সেবার জন্য তোমার আর গলকটির ডিউটি পড়েছে,—এখনই এসে দোরগোড়ায় বসলে কী? অর্ধেক রাত তুমি জাগবে, আর বাকি অর্ধেক জাগবে গলকটি।' এই বলে সে তো ফড়্‌ফড়িয়ে চলে গেল। সরকার জেলে পুরেছে, এখানে তোমার যা বল তাই করব। অনেক পাপ করেছি, না হলে কি আর বামুনের মেয়ে হয়ে অন্য লোকের পা টেপার কাজ করতে হয়? আবার ওদের হুকুম-মতো তোমার পা টিপতে এলাম—তো আবার তুমি মাইজী, নারাজ।...'

বছর তিরিশেক বয়স হবে মন্‌চনিয়ার। সে 'সি' ক্লাস সাধারণ কয়েদী। বেশ সুশ্রী চেহারা। ব্রাহ্মণের ঘরের বাল-বিধবা। কিছু দিন আগে একটি ছেলে হয়। সদ্যজন্মানো ছেলেটির মৃতদেহ পাওয়া যায়, বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটি হাঁড়িতে। ছেলেটির গলায় আঙুলের দাগ। আহা, ননীর মতো নরম গলায় রক্ত জমে নীল হয়ে গিয়েছে। ঐ তো একরত্তি রক্তের দলা। তাইতেই মন্‌চনিয়ার সাজা হয়েছে দশ বছর, আর ঐ তো একরত্তি রক্তের দলা। দলা। তাইতেই মন্‌চনিয়ার সাজা হয়েছে দশ বছর, আর মন্‌চনিয়ার মার দু-বছর। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। তুই হলি মা। নিজের পেটে ধরেছিস্‌ ছেলে। ও ছেলে তখনও ভাল করে কাঁদতে পর্যন্ত শেখেনি। সেই ছেলেকে কি না মা হয়ে এমনি করলি! তোর মতো মাকে তো হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটা দিয়ে, তুষের আগুনে দগ্ধে মারতে হয়। না, ও কখনই নিজে একাজ করেনি! ও হয়তো তখন অজ্ঞান অচৈতন্য। করেছে ওর মা। সে মাগী ভারি দজ্জাল। আর তারই সাজা হল কিনা দু-বছর। এদের আইন এজলাসের কি আর কিছু ঠিকঠিকানা আছে। তা থাকলে কি আর বিলুর আমার এমন সাজা হয়? না ও কাউকে খুন করেছে, না ও কাউকে মারতে গিয়েছে। কংগ্রেসের কাজ করেছে। তার জন্যে জেল দাও জরিমানা করো। তার জন্যে ফাঁসি! ভগবান, এত অবিচার কি সইবে?...

'মাইজী হাতের তেলোয় তাহলে একটু তেলজল লাগিয়ে দি!' আহা আর জ্বালাস না তো। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। আমি বলে মরি নিজের জ্বালায়। আর এরা

১। বৌ।

সবাই মিলে আমার রাশে লেগেছে। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি করিস না, একটু শান্তিতে নিরিবিলি থাকতে দে। চব্বিশ ঘন্টা ছত্রিশ জন লোক, আমাকে ঘিরে মেলা করে বসে আছে, যেন আমাকে তুলসীতলায় নামানো হয়েছে। রামায়ণপাঠ আরম্ভ হতে দেখে, কোথায় ভাবলাম যে যাক, খানিকক্ষণের জন্য নিশ্চিন্দি,—তা নয় এ আবার এসে আরম্ভ করল ভ্যাজর্ ভ্যাজর্। মন্‌চনিয়া বলে চলে, 'মাইজী, আজ সকালে আপনি যখন বেহুঁস হয়ে গিয়েছিলেন না, তখন ডাক্তারসাহেব এসেছিল। বলে গিয়েছে যে তিন দিন আপনার উপোস হয়ে গেল ; কালকে যদি কিছু না খান, তাহলে জোর করে খাওয়াবে। 'সুই' ( ইনজেকশন ) দেবে আর নাকের মধ্যে দিয়ে নল চালিয়ে মুরগীর ডিম খাইয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমার এখন খাওয়াই বড় হল। আরে আমি না খেলে কার সাধ্যি আমাকে খাওয়ায় ?'

'আপনি জানেন না বুড়ি মাইজী এদের। নর্মদাবেনের বিছানা বাঁধবার থলি আছে না ? খাটিয়ার সঙ্গে ঐরকম চামড়া দিয়ে বাঁধবার ব্যবস্থা এদের আছে। জোর করে ক'জন জমাদারনী মিলে আপনাকে ঐ খাটিয়ায় শুইয়ে দেবে ! তারপর বিছানা বাঁধবার মতো করে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধবে, ঐ 'গন্দিদাদার' খাটিয়ার সঙ্গে।'

'আরে আমি না গিললে তো আর গিলিয়ে দিতে পারবে না। আর বেশি বকিস না তো।'

ভবী ভোলবার নয়। মন্‌চনিয়া আপন মনে বকে যায়—'ঐ যে হারীন মঘাইয়া[১] ডোমিন আছে,—তার নাকের মধ্যে ঘা আছে, জানেন মাইজী। যখন-তখন রক্ত পড়ে। ও গত বৎসর, আপনারা আসবার অগে 'অন্‌সন্' করেছিল' ওতে পায়খানার 'সাফাইয়া' কমান্ডে কাজ দেওয়া হয়েছিল বলে। ও বলে যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশের লোক ওরা ; নিজের জাতের মধ্যে ওদের কত 'বোলবলা' ( খ্যাতি ), ওকি কখনও ময়লা সাফ করতে পারে ? ওতের জাত 'মুর্দা' ছোঁয় না, আর যারা নালী সাফ করে, তাদের সঙ্গে বসে তো ওরা খায় না। ও একথাও বলেছিল যে এ জেলে চিরকাল 'সাফাইয়া'র কাজ করে 'সান্তানীন'রা।[২] তারপর কতদিন ধরে ওকে মুরগীর আন্ডার শরবত খাইয়ে দেওয়া হয় ! কিন্তু দিলে কী হবে—ওর সংস্কার ভাল। মুরগীর আন্ডার কথা ডাক্তাররা না বলে দিলেও ওর বমি হয়ে যেতে আরম্ভ করল। তারপর সরকারকে হার মানতে হল। সাহেব হুকুম দিল ওকে পায়খানা কমান্ড থেকে সরিয়ে নেওয়ার। মহাৎমাজী সরকারের সঙ্গে পারেন না। ও কিন্তু সরকারকে কদিনের মধ্যে একেবারে ঠান্ডা করে দিল। 'কলস্টর' সাহেব এসে 'সুপারিটন সাহেবকে কী বকুনি ! চমাইন[৩] জমাদারনী একদিন আমার কাছে গল্প করেছিল। এক বালাই তো গেল, কিন্তু সেই থেকে ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।'

ফাঁসিতে ঝুলবার সময় নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয় নাকি ? মন্‌চনিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে হয় ; সে গলাটা যখন টিপে ধরেছিল, তখন কচি ছেলেটার নাম মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল নাকি ? না, মা হয়ে মা'র কাছে এসব কথা কি জিজ্ঞাসা করা যায় ?

---

১। মঘাইয়া ডোমের স্ত্রী। ডোমেরা বেদেদের মতো একটি যাযাবর জাতি ; বিহারে ইহারা Criminal tribes-এর অন্তর্ভুক্ত।

২। সাঁওতালনীরা।

৩। চামারের স্ত্রী।

—ও যদি নিজের হাতে এ পাপ কাজ করে থাকে, তা হলে কি সেই সময় সেই কাঁচ মুখটির দিকে তাকাতে পেরেছে ?

…দুর্গার সেই ছোট ছেলেটার কী হল। আমারই কোলের মধ্যে তার সব শেষ হয়ে গেল। জ্বরে ভুগে ভুগে তার চেহারা হয়ে গিয়েছিল হাড় জিল্‌জিলে, পেট ডিগ্‌ ডিগে।…হঠাৎ দুর্গার মা ডেকে পাঠালে, আমি তরকারির কড়া নামিয়ে রেখে ছুটলাম তাদের বাড়ি। দুর্গার মা আবার যা আটাশে, সব তাতে ভয়েই মরে ; চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কেঁদেকেটে পাড়াসুদ্ধ সরগরম করে তুলেছে। কিন্তু যে খুদে ছেলেটার তখন ভগবানের ডাক পড়েছে, তার কাছে দুদন্ড নিশ্চিন্দি হয়ে বোস্‌।—তা না—বলে, সে আমি পারি না দিদি, আমার বড্ডো ভয় করে। গিয়ে দেখি, দুর্গা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পাশে বসে রয়েছে ছেলেটার। সেটার তখন, এখন-তখন অবস্থা। গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বসলাম। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। চোখের মণির সাদাটা দেখা যাচ্ছে। প্রাণপণে বাছা নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। কষ্টে মুখ, হাতপা নীল হয়ে গিয়েছে। অতটুকু ছেলেটার বাঁচবার কী চেষ্টা ! তারপর আমার কোলের মধ্যেই তার সব চেষ্টা শেষ হয়ে গেল। ওষুধ তো দূরের কথা, এক ফোঁটা জলও তার গলা দিয়ে নামল না। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য যে শেষকালটায় নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়ে আমার কাপড়-চোপড় একেবারে ভেসে গেল। অমন আর কখনও দেখিনি। দুর্গার মা তখন কেঁদেকেটে বাড়ি মাথায় করেছে। দুর্গা কাঠ হয়ে বসে আছে—আর তাকে টেপীর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, 'হ্যাঁরে দুর্গা, খোকা সকাল বেলা পেঁপে আর তালমিছরিটুকু খেয়েছিল তো ?'…

…বিলু যখন হয় তখন দিব্যি মোটাসোটা ছিল—এত বড় কোলজোড়া ছেলে। আঁতুড়ে হেডপন্ডিতজীর স্ত্রী দেখতে এসেছেন। রুক্‌মিনী দাই এক থাবড়া কাজল ছেলের গায়ে লাগিয়ে দিল। সে বলে যে তুমি জান না এই পন্ডিতাইনদের—এরা ডাইনীর বাড়া। এদের বিষের নজর যেদিকে পড়ে, একেবারে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। গালে কালি না লাগালে ছেলে দেখবে দিনে দিনে শুকিয়ে দড়ি হয়ে উঠবে। বুড়ি দাই আমাকে তখন চব্বিশ ঘন্টা শাসনে রাখে—এটা করো তো ওটা করো না ; উঠতে বসতে আমাকে সাবধান করে। আচ্ছা বাবা যা বল তাই। বিলু হয়েছিল ৺বিজয়া দশমীর দিন। হেডপন্ডিতজীর স্ত্রীর এলেন পুজোর ছুটির পর। তিনি আগে দেশেই থাকতেন। সেবারেই হেডপন্ডিতজী প্রথম পরিবার নিয়ে এলেন। পন্ডিতজীর স্ত্রী বিশ্বাসই করবে না যে বিলুর বয়স তখন কুড়ি দিন। বিলুর কোঁদা কোঁদা হাত পা'র দিকে তাকায়, আর রুক্‌মিনী গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে কাঁথা দিয়ে ঢেকে দেয়।…

তারপর বিলুটার শরীর ভেঙে গেল সেবার ডবল নিমোনিয়া হওয়ার পর থেকে। তখন ওর বয়স হবে বছর আড়াই। 'ঠাকুর' তখন শয্যাগত, পায়ের দিকটা আস্তে আস্তে তাঁর অবশ হয়ে আসছে। তখনই বিলুরও অসুখ করল।…কার্তিকে কার্তিকে দু'বছর, অঘ্রান, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চোৎ—দুবছর পাঁচ মাস—বিলুর বয়স তখন দু'বছর পাঁচ মাস। অত ছাই মাস দিনের হিসেব আমার মনেও থাকে না, তার কথাও নেই। থাকত টেপীর মা, তাহলে আমার হিসেবে নিশ্চয়ই দিত ভুল বের করে। তার সামনে কি কোনো কথা বলার জো আছে—একটা কথাও পড়তে পায় না।…প্রথম দিন বিলুর কপালটা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করতে দেখেই, আমার মনটা অস্থির করতে লাগল। সারারাত ছেলের কী কান্না আর ছটফটানি ! আর 'ঠাকুরে'র পাশের ঘর থেকে কী রাগারাগি আর বকুনি। ছেলেকে কিছুতেই সামলানো যায় না। উনি বলেন কাল

সকালে হরিগোবিন্দ ডাক্তারকে দেখালেই হবে। বিলুর ঠাকুরদাদা চটেমটে অস্থির। তার বকুনির চোটে শেষকালে ডাক্তারকে খবর পাঠানো হল। ডাক্তারবাবু বলে পাঠালেন যে রাত্রে আসতে পারবেন না। 'ঠাকুরে'র তাই শুনে কী রাগ! বললেন যে গভর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করে ওর ডাক্তারি করা আমি খুচিয়ে দেব। রাত একটা পর্যন্ত সীতাপতির দোকানে পাশা খেলবে, আর রুগী মরলেও রাতে রুগী দেখতে আসবে না। এখন শীতও নয়—বর্ষাও নয়। এরা সব খুনে। ডাক্তার নয় ডাকাত, বাটপাড়। 'ঠাকুর' তো তখনো বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। তাঁর কাছে রিপোর্ট লিখবার জন্য লণ্ঠন, চশমা, কাগজ কলম রেখে, তাঁকে চুপ করিয়ে আসি। স্কুলের দরোয়ান ননকুকে আবার পাঠাই ডাক্তারের কাছে। আলিবকসের শ্যাম্পনি, ননকু ঐ রাতে নিজে চালিয়ে ডাক্তার-বাবুকে নিয়ে আসে।...এখনও লাঠির উপর ভর দিয়ে ননকু মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসে মাইজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।...হরিগোবিন্দ ডাক্তারের মুখ বাঁকানো দেখেই আমি বুঝেছি যেছেলের আমার অসুখ বেশ ব্যাঁকা।...তারপর ক'দিনধরে চলল যমে-মানুষে লড়াই। একদিন তো হয়েই গিয়েছিল। সেই প্রথম দেখলাম মৃগনাভির গুণ। হাত পা গিয়েছিল একেবারে হিম হয়ে। হরিগোবিন্দ ডাক্তার নাড়ি টিপে মুখ বেজার করে বসে রয়েছে। কী ধক ওষুধের! দেখতে দেখতে বিনকুরি বিনকুরি ঘামে হাত পা ভিজে গেল। বিছানা বালিশ ভিজে জবজবে। ঐ নেতিয়ে পড়া একরত্তি ছেলেকে কী মুছিয়ে ওঠা যায়! তার বুকে পিঠে পুলটিসের বোঝা। সকাল বেলা ডাক্তারবাবু আমাকে বলে গেলেন,—'আপনার ছেলেকে নূতন জীবন দিলাম'। কথাটার মধ্যে একটুও বাড়াবাড়ি নেই। ধন্যি ধন্বন্তরী ডাক্তার হরিগোবিন্দবাবু! কিন্তু ঐ কস্তুরী খাপয়ার পরে, একমাস ছেলের গায়ের জ্বলুনি যায় না—দিনরাত ছটফট করে। সারারাত টানাপাখা টানানোর ব্যবস্থা হল। তারপর আস্তে আস্তে ছেলে তো সেরে উঠল। কিন্তু সেই যে গেল শরীর পটকে, আর কী কখনও ঠিক করে সামলে উঠতে পারল? গায়ে আর মাংস লাগল না; নিত্য অসুখ লেগেই আছে। বড়লোকেরবাড়ি হত তো বাক্সের আঙুর রাখার মতো আদর-যত্নে মানুষ হতে পারত। কিন্তু যে কপাল করে এসেছিল, তেমনি আদর-যত্ন খাওয়া-পরা তো একদিনের জন্যও বাছার জুটল না! হরিগোবিন্দবাবু কেন তখন ওকে বাঁচিয়েছিলেন, কেনএত বড়টা হতেদিয়েছিলেন? ভগবান, যদি ওকে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল তা হলে তখন নিলে না কেন? কেন আমার লোভ বাড়িয়ে দিলে? এমন রাক্ষুসে নেওয়া ঠিক করলে কেন। কত পাপই না আমি করেছি! ভগবান, আমার পাপের জন্য আমাকে যে কোনো শাস্তি দিতে পারতে কিন্তু আমার পাপের জন্য তাকে শাস্তি দিলে কেন। তখন গেলে হয়তো, নীলুকে কোলে পেয়ে আমি এতদিনে ওকে ভুলতে পারতাম। এক এক ছেলে তো নয়, তার হাজার রকমের রূপ। তার লক্ষ রকমের হাবভাব কথাবার্তা মনের মধ্যে আসে! এক ছেলে হাজার ছেলের সমান। কত স্মৃতি, ছোটছাট কত ঘটনা, কত আদর আবদার হাসিকান্নার ছবি চোখের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা ভেসে বেড়াচ্ছে, তার কি হিসেব আছে। ইচ্ছে করে যে এই সব মনেপড়াগুলোকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকি। পারি তো বুকের মধ্যেই ঢুকিয়ে রেখে দি। মনে হয় বিলুকেই যেন আমি বুকের মধ্যে পেয়েছি, তাকে ছুঁয়ে আছি, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি —জড়িয়ে ধরে আছি—কিছুতেই ছাড়ব না, কার সাধ্যি মার বুক থেকে ছেলেকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।...

বিরাট চিৎকার করে এরা রামায়ণের আরতি আরম্ভ করল। এইবার তাহলে রামায়ণ পাঠ শেষ হবে। এরা আরতি বলবে না, বলবে আঁতি।...এ সময়টা কী

চিৎকারই করে ! জেলে আসার পর থেকে নিত্যি তিরিশ দিন শুনে একেবারে বিরক্ত হয়ে গিয়েছে মন ।....

আরতিগান চলছে, সব কথা বোঝা যায় না ।···

আরত শ্রীরামায়ণ-ত জী কি
কীরতি-কলিত-ললিত-অ সিয় পী কি ॥
গাওয়ত-অ-ব্রহ্ম দিক-অ মুনি নারদ-অ
বাল্মীক বিজ্ঞান বিসারদ-অ
শুকা সনকাদি শেষু অরু সারদ-অ
বরনি পবন-সুতা কীরতিনী-ই-ই কি ॥
কীরতিনীকি রামা কীরতিনী-ই-ই কি ॥
গাওয়ত-অ বেদ-অ পুরাণ-অ অষ্টাদশ-অ
ছয়ো শাস্ত্রে-অ সব-অ গ্রন্থ-অ নহকো রস-অ
মুনিজন-অ ধন-অ সন্তনহকো সরবস-অ
সার-অ অংস-অ সম্মতি সবহী-ই কী-ই ॥
সাম্মাতি সাবহী কী রামা, সাম্মাতি সাবহী-ই কী-ই ॥
আরত-অ শ্রীরামায়ণ-অ জী কি কীরতি কলিত-অ
ললিত-অ সিয় পী কী ॥
গাওয়ত-অ সন্তত-অ সম্ভু ভবা-আ-নী
অরুসহ-অ সম্ভ-অ-ব-মুনি বিজ্ঞা-নী-ই
ব্যা-য়া-স-অ-অ আ-আ-দি কবি বর্জ বখা-আঁনী
কাগা ভূখন্ডি গরুড়াকে হী-ইকী-ই ॥
আরত-অ শ্রীরামায়ণ অ জী-কি কীর-অ-তি
কলিত-অ ললিত-অ সিয় পী কী ।

তারপর নতুন করে সুর আরম্ভ হল—

আজ-অ কথা-অ ইৎনী ভই, সুনহু বীর-আ-হনুমান ।
রাম-আ লক্ষ্মণ-আ সিয়া জানকী—সদা-আ করহু কল্যাণ ॥

এইবার ঘর ফাটিয়া চিৎকার আরম্ভ হল বলে—

'অযোধিয়া রামালাল্লা কী জ্যা ! বৃন্দাবনবিহারীলাল কী জ্যা !
উমাপতি মহাদেব কী জ্যা ! রমাপতি রামাচন্দ্রা জী কী জ্যা ।
প্যাবানা সুতা হনুমান কী জ্যা ! মহাত্মা গান্ধী কী জ্যা !
সর্ব-অ সন্তান-কী জ্যা ! জ্যায় জ্যায় হো ও-ও-ও-ও ।'

সকলে একবার দু-হাতে তালির শব্দ করে প্রণাম করে । এইবার সবাই উঠে পড়ল । লুসী জমাদারনী, চইমন জমাদারনী সবাই যেখানে রামায়ণ পাঠ হয় তার বাইরে বারান্দায় জানালার কাছে হাত জোড় করে বসে থাকে ।

লুসী সাঁওতাল খ্রীষ্টান ; কিন্তু ভগবানের নামের আবার জাতবিচার আছে নাকি ? খুব ভক্তি তার । 'আরত শ্রীরামায়ণ জী কী, কীরতি কলিত ললিত সিয় পীকি,' এই ধুয়োটা তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে । 'জয়' দেওয়ার সময় আর ঐ ধুয়োটা যখন গাওয়া হয় তখন সেও বাইরে থেকে চিৎকার করতে ছাড়ে না ।···গলা হচ্ছে গরুড়জীর । তাঁর আসল নাম সন্ধ্যা দেবী । রামায়ণের সময় তাঁর গলা, আর সকলের স্বরকে ছাপিয়ে ওঠে । আরতির যেখানে 'গরুড়াকে হি কী' কথাগুলি আছে, সেই জায়গাটিতে এলেই

তাঁর স্বর সপ্তমে চড়ে। তার উপর তাঁর নাকটাও গরুড়ের ঠোঁটের মতো। সেইজন্য সকলে ঠাট্টা করে তাঁকে গরুড়জী বলে ডাকতে আরম্ভ করে এখন এমন হয়েছে যে, সকলে তাঁর আসল নাম ভুলে গিয়েছে। জমাদারনীরা পর্যন্ত তাঁকে গরুড়জী বলে ডাকে। প্রথম প্রথম তিনি রাগ করতেন, এখন সয়ে গিয়েছে।...সেই একদিন লুসী জমাদারনী 'কাপড় গুদাম' থেকে, গরুড়জীর নামে শাড়ি নিয়ে এসেছিল—সেদিন কী কান্ড! যে খাতায় জেলের জিনিসপত্তর পাওয়ার পর নাম দস্তখত করতে হয়, সে খাতা তুলেই দেখে, লেখা—গরুড়জী—একখানা শাড়ি। আর যাবে কোথায়! ভদ্রমহিলা কেঁদে-কেটে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে বসে থাকলেন। জমাদারনী তাঁকে অপমান করেছে এই বলে জেলর-সাহেবকে চিঠি লিখে পাঠালেন। আরও লিখেছিলেন যে লুসী অন্য মেয়ে কয়েদীদের কাছে বিড়ি আর খয়নি বেচে। লুসী তো অপ্রস্তুতের একশেষ। জেলরসাহেব এসে লুসীকে ক্ষমা চাওয়ালেন গরুড়জীর কাছে। তারপর তাঁর রাগ পড়ল। কিন্তু তাঁর নাম আর বদলাল না...

বিলু ছোটবেলায় আমাদের কত রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছে। মর্নিং স্কুলের সময়, আর গরমের ছুটির সময়, দুপুররোদে পুড়তে পুড়তে টেঁপীর মা, দুর্গার মা, আর জিতেনের মা—দিদি আসতেন আশ্রমে—বিলুর রামায়ণ মহাভারত শোনার জন্য—বিলুর রামায়ণ পড়তে ভাল লাগত না। ও চায় মহাভারত পড়তে। কিন্তু জিতেনের মা—দিদি, এসেই আরম্ভ করবে—'ওরে বারিন্দিরের ব্যাটা, তোকে বলেছি না যে আমরা পুণ্যবান না, আমরা কাশীরাম দাস শুনতে চাই না। নিয়ে আয় রামায়ণখানা। রামায়ণ হল এক জিনিস, আর এ হল এক জিনিস।' বিলু বলে, 'থাম না জ্যাঠাইমা' এইখানটা একটু শেষ করে নি।' মাথা আর শরীর দুলিয়ে বিলু পড়ে চলে—'কাঁদে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী, নয়নের-অ নীর-অ ঝরে...' বিলুর চোখে জল এসে গিয়েছে। যখনই এখানটা পড়বে তখনই ওর চোখে জল আসবে। আর অমনি টেঁপীর মা বলবে, 'আহা ৺বিজয়াদশমীতে জন্মেছিল কি না—তাই হয়েছে ওর বর্ষার ধাত!' সত্যিই পড়তে পড়তে কত জায়গায় যে ওর চোখে জল আসত তার ঠিক নেই। আমরা বুড়ো মাগী, ছেলের মা; ষষ্ঠী মঙ্গলবার করি; ধর্ম-কর্মের বই পড়ে কোথায় আমাদের চোখের জলে বুক ভেসে যাওয়ার কথা। তা না এ পোড়া চোখে কি জল আসত? বিলু লুকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, চোখের জল মুছে ফেলবার চেষ্টা করত! নীলু খানিক দূরে উবুড় হয়ে শুয়ে সব দেখত, আর চেঁচিয়া উঠত, 'মা দ্যাখো দাদা কী করেছে।' জিতেনের মা—দিদি তাকে তাড়া দিয়ে থামিয়ে দেন। বলেন, 'ঘরের কোণের ভাঙা হাঁড়ি, বলে আমি সব জানি। আপনি থামুন তো।' কিন্তু নীলুকে থামানো যায়? সে হেসে, চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে। মহাভারতখানা ননকু বাঁধিয়ে এনে দিয়েছিল স্কুলের দপ্তরির কাছ থেকে। তার প্রথম পাতার, বিলুর হাতের লেখা দু-লাইন 'খোদ-ই মালেক—মা।। বকলম বিলু!' যত মেলেচ্ছ পন্ডিতি ফলানো হয়েছিল মহাভারতখানার উপর। দুর্গার মা বলত, 'এবার বিলুর একটা টিকি রেখে দাও। মহাভারত পড়ার সময় বেশ টিকিটা নাচবে। ওরে সংক্রান্তি-বামুন, খুব দুলে দুলে পড়িস, বুঝলি।' লজ্জায় বিলু তাঁদের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। নীলু এদিকে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে—'টিকি ধরে মারব টান, উড়ে যাবে বর্ধমান'। জিতেনের মা দিদিও বলে, 'হ্যাঁ ভাই, এবার বিলুর পৈতেটা দিয়ে ফেল।'

হ্যাঁ, বিলুর এত ঠাকুর দেবতার ভক্তি, হঠাৎ যেন বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মতো উড়ে গেল। বিলু তাই, নীলুরও তাই। কিছুদিন এমন হল যে, পৈতে না

হলে জীবনটাই যেন বৃথা হয়ে যাচ্ছে। সময়ে অসময়ে বিলু সেই কথাটা পাড়ে, আর বলে—'তোমাদের পৈতে না দেওয়ার মতলব। পৈতে তো ন' বছর বয়সেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এ বছরে একটি মাত্র তো দিন আছে।' পৈতের পরেও দেখেছি, নিয়মিত সন্ধ্যা, গায়ত্রী, পুজো একাদশী। কতদিন পর্যন্ত খাওয়ার সময় কথা বলত না, বাজারের খাবার খেত না, কোথাও ভোজেভাজে খেতে যেত না। কত নিষ্ঠা! কত বিচার-আচার! ছোটবেলা থেকেই ওর পুজোআচ্চার ঝোঁক। কত শ্লোক, স্তোত্তর ওর মুখস্থ ছিল। চার বছর বয়সের সময়, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আর 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী সঙ্গে' গড়গড় করে বলে যেতে পারত। এইতো বড় হয়েও—পৈতের আগের বছর—আমি রয়েছি রান্নাঘরে, ওরা দুভাই শোবার ঘরে বিছানা চটকাচ্ছে, আর পাশবালিশ নিয়ে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করছে। এরই মধ্যে হঠাৎ বিলুর চিৎকার শুনলাম। 'মা, মা, শীগ্গির এসো।' কী আবার হল? হাত-পা ভাঙল নাকি? সাপ বিছে নয়তো? ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করে মরি। উনুনের তরকারি উনুনেই থাকল। পড়ি কি মরি, গিয়ে দেখি—নীলু স্থির হয়ে বিছানার উপর বসে রয়েছে—নাপিতের সামনে মাথা ন্যাড়া করার সময় লোকে যেমন করে বসে থাকে তেমনি করে। বিলু নীলুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। দুজনেই ভয়ে আড়ষ্ট। বিলু এক হাত মুঠো করে কনুই-এর উপর কী যেন চেপে ধরে রয়েছে। আমি যেতেই দেখলাম নীলুর হাতে বাঁধা ছিল মা পূর্ণেশ্বরীর মাদুলি একটা রুদ্রাক্ষ, আর চাকা করে কাটা একটুকরো হরতুকি। সুতোটা ছিঁড়ে গিয়েছে। ওরা জানত মাদুলি হাতে বাঁধা না থাকলে, আর এক পাও চলতে নেই, চললেই নীলুর অমঙ্গল হবে। বলল, 'মা শীগ্গির একটা সুতো ঠিক করে নিয়ে এসো।' মাদুলি আবার হাতে বাঁধা হল। তারপর দুই মহারথী বিছানা থেকে নামলেন।

সেবার মহাত্মাজীর টুরের সময়, ঠিক মানসাহী পুলের উপর যেই আমদের মোটর-খানা ওঠেছে, সম্মুখেই দেখি ধুলো-কাদা মাখা ল্যাংটা ছেলে। হঠাৎ মোটরকার দেখে ভয় পেয়েছে। কী করবে ঠিক না করতে পেরে, এদিক-ওদিক একটু দৌড়বার চেষ্টা করল। তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে রাস্তার মধ্যিখানে শুয়ে পড়ল। ভগবানের দয়ায় তারা রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু যখন মোটর থেকে নেমে তাদের ওঠাতে গেলাম, দেখি তারা ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই চোখ খুলে চাইবে না। বিলু নীলু দুটি ভাইয়ের কথা মনে করে, তখন আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মনটা একটু শান্ত হল। কী কান্ডই আর একটু হলেই হয়ে যেত! এরপর যখনই বিলু আর নীলুর কথা এক সঙ্গে মনে পড়েছে, তখনই চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে, ঐ অসহায় ধুলোমাখা ছেলেদুটোর সেই রূপ।...

ভগবান তোমার উপর বিলু নীলুর এত বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস কেন কেড়ে নিলে?...বিলু যেদিন প্রথম আশ্রমে সন্ধ্যায় কীর্তনে গেল না, আমি ভাবলাম বুঝি মাথা-টাথা ধরেছে। জিজ্ঞাসা করি, তো বলে, যে শরীর ভালো আছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বর-জারিও না—তবে হল কী? পরে যখন বুঝলাম তখন বুক চাপড়ে মরি। বিলুর যখন এমন হল, তখন পৃথিবীতে সবই সম্ভব। এ তো আর নীলুর পৈতে ফেলার মতো উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। নীলু হল গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে—ও নিজের খেয়ালেই থাকে। ওর মাথা গরম দেখলে, আমি মনে মনে হাসি, উনি এসেছেন তম্বি দেখাতে। আরে আমি তো আর তোর পেটে জন্মাইনি, তুই আমার পেটে জন্মেছিস। তোর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানব না তো কে জানবে? আজকে

চটেছিস কাল সকালেই তোর রাগ পড়ে যাবে। ছোটবেলা থেকে তোর গোঁয়ারতুমি দেখে আসছি। সেই ছোটবেলায় মুদিখানার ফেলে দেওয়া কাগজের ঠোঙাতে পা লাগলেও নীলু প্রণাম করত। ভুলে পঞ্জিকা ডিঙিয়ে ফেলে, মুখ কাঁচুমাচু করে, আমার কাছে এসে তার পাপের কথা বলত—আমার কাছ থেকে বলিয়ে নিতে চাইত যে অজ্ঞান্তে করলে পাপ হয় না। একদিন আমি রান্নাবাড়ির কাজ শেষ করে রাত্রে সোডা দিয়ে এণ্ডির কোকুন সেদ্ধ করছি, এমন সময় বিলু ডাকল,—'মা দেখো নীলুর কান্ড। ছেলেদের পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গিয়েছে, পড়াশুনোর বালাই নেই। ভাবলাম একটা নতুন কোন ফন্দি আবার হয়তো নীলুর মাথায় ঢুকেছে। গিয়ে দেখি ফ্রেমে বাঁধানো মা সরস্বতীর ছবিখানাকে নীচে রেখে তার উপর নীলু চাপা দিয়েছে বাড়ির সব কখানা জুতো। আমি তো অবাক! নীলু কখনও একাজ করতে পারে? ও যে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় প্রত্যহ আমাকে প্রণাম করার আগে সরস্বতীর ছবিখানাকে প্রণাম করে। এই পটখানায় যে প্রতি বছর সরস্বতীপুজোর দিন পুজো হয়। এখনও চন্দনের দাগ লেগে রয়েছে। ওরে ডাকাত পিচেশ, তোর এ দুর্মতি হল কেন? বিলু বলল যে অঙ্কে ফেল করেছে বলে, রাগে নীলু এই কান্ড করেছে। কী বদরাগী ছেলে বাবা! অঙ্কে ফেল করেছিস, তা এ কান্ড করার দরকার কী? পড়িসনি-শুনিসনি, সারা বছর খেলে বেড়িয়েছিস, তা অঙ্কে ফেল করবি না? কতদিন বলেছি না যে, ও'র কাছে বসে একটু অঙ্ক-টঙ্ক দেখিয়ে নিস। জবাবে ছেলে বলে কিনা, 'যদি পড়েই পাশ করব, তবে মা সরস্বতীর খোশামোদ করতে যাব কেন? না পড়া ছেলেকেই যদি পাস করাতে না পারে তবে আবার ঠাকুর কিসের? বলে, ছেলে গোঁজ হয়ে কোণের দিকে বসে থাকল। বিলু তখন জুতো-টুতো সরিয়ে গঙ্গাজল ছুঁয়েই পটখানিকে আবার দেওয়ালে টাঙিয়ে দিল। আমি পাঁচটা পয়সা মা সরস্বতীর ছবিখানায় ঠেকিয়ে তুলে রেখে দিলাম, যে ঐ গোঁয়ার গোবিন্দর রাগ পড়লে, তাকে দিয়ে পুজো দেওয়াব বলে। নীলুর এসব খামখেয়ালী কান্ড ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু বিলুর কীর্তনে না যাওয়া, দেবে দ্বিজে ভক্তি মন থেকে মুছে ফেলা, আমাকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছিল। বিলুর আমার ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস ছিল। ছোটবেলায় লক্ষ্মীপুজোর দিন, তার লাটিম আর মার্বেলের উপর আমাকে দিয়ে লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা আঁকিয়ে নিত। না হলে অনেক লাটিম আর অনেক মার্বেল হবে কী করে? সেই বিলু এমন হয়ে গেল —আর আমারই চোখের সম্মুখে! আমি চব্বিশ ঘন্টা ভগবানের কাছে বলি, বিলুর তুমি এ কী করলে? ওদের বাবার কানে যাতে এ কথা না পৌঁছয় তার জন্য কত চেষ্টা করি। কিন্তু ও ছেলে কীর্তনে যাবে না—এ কথা আর কদিন চেপে রাখা যায়? আমি লুকিয়ে বিলুর খাওয়ার জলের সঙ্গে পুর্ণেশ্বরীর খাঁড়াধোয়া জল আর চরণামৃত মিশিয়ে দিই, আর বলি, মা পুর্ণেশ্বরী, আমার ছেলের দোষ নিও না।...আর সে মানুষই বা কী? তুমি হলে ওদের বাবা। ওদের ভুল ভ্রান্তি হয়, ওদের একটু বুঝিয়ে দিলেই পারো। তোমার বোঝানোর কাছে তো ওদের জারিজুরি চলবে না। কিন্তু উনি মুখ খুলে কিছু বলবেন না। ছেলেদের ভালমন্দ ঠিকে যেন আমারই একার। ঐ এক ধরণের মানুষ!...

...এইরে, আবার সব এল জ্বালাতন করতে। এখন লোক দেখলে আমার গা জ্বালা করে, একথা এদের বলিই বা কী করে, বোঝাই-ই বা কী করে

কামলা দেবী এসে আমার নাড়ীটা টিপে ধরলেন। কতই না নাড়ী দেখতে জানো! সে তো আর আমার জানতে বাকি নেই। স্বামী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তার, কাজেকাজেই

উনি ভাব দেখান যে উনিও ডাক্তারি জানেন। মিছে এ গুমোর কেন? উনিও তো মাস্টার ছিলেন। আমি তো একদিনের জন্যও মনে করিনি যে তাঁর পরিবার বলে, আমিও পন্ডিত হয়ে গিয়েছি। উনি কংগ্রেসের কত বোঝেন—তাই বলে কি আমিও বলব যে আমিও বুঝি।

কামলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছেন?' রাগে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে যায়। আমার জন্যে তোমরা যা ব্যস্ত তা তো বুঝি—তবে আবার ঢং কেন? রাগের জ্বালায় জবাব দিই, 'যা ভাবছেন, তার এখনও অনেক দেরি আছে। তেমন বরাত করে কি আর পৃথিবীতে এসেছি, যে সবাইকে ফেলে থুয়ে, ড্যাংড্যাংড্যাং করতে করতে স্বর্গে চলে যাব। তাহলে তো হয়েই ছিল! গুষ্টিসুদ্ধ না খেয়ে তো আর আমি পৃথিবী থেকে নড়ছি না।

কামলা দেবীর নাড়ী টেপা মাথায় চড়ে গেল। তার হাত আলগা হয়ে এল। টপ করে আমার হাতখান বিছানায় পড়ল। হাতে ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছে। উঃ গেছি গেছি। কী ব্যথা লাগে হাতে! মাথার বাঁ দিকটা কী রকম ভারী মনে হয়। বাঁ কানের পিছনে, মাথার ভেতরটা মনে হয় যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। বালিশ থেকে মাথা তুললে বাঁ দিকটা যেন টাল খেয়ে ধপ করে আবার বালিশের উপর পড়ে যায়! কানের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মতো শব্দ অষ্টপ্রহর চলেছে।·· আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি কমলা দেবীকে। ওসব মোড়লি ফলিও ঐ রামায়ণের দলের মধ্যে যারা তোমার সব কথা শোনে না, হাঁ করে গেলে। ওদের মধ্যে গোটা কয়েক তো না কিছু বোঝে, না কিছু জানে। অনসূয়াজীকে সেদিন দিয়েছিলাম চা করে। বলল, 'সর্দি হয়েছে; একটু আদা নুন দিয়ে 'চাহা' করে দেবেন?' নিল তো নিজেরই ঘটিতে করে চা-টুকু। তারপর যেমন করে ঘটি থেকে আলগোছে জল খায়, অমনি করে হড় হড় করে মুখে আলগোছে ঢেলে দিয়েছে চা-টুকু। আর যাবে কোথায়? মুখ জিভ পুড়ে-টুড়ে একাক্কার। তৈরি করা চা-টুকু ঠিক করে খেতে জানে না, তার আবার বিদ্যের বড়াই। ও দলের সব সমান। আর একজন ঐ যে সরলা দেবী, সেটাও যদি একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে। তার বাপের বাড়ি রুপোলী থানার বুড়হিয়াধনকট্টা গ্রামে! গ্রামটি নাকি খুব বড়। কত বড় তাই বোঝাতে গিয়ে সেদিন বলল কি না—'গ্রামে হাকিম-হুকুম, দারোগা পুলিশ, হৈজার ডাক্তার[১] (কলেরার), এরা অহরহ যাতায়াত করে। এত বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে গাঁয়ের কুকুরগুলো পর্যন্ত এসব দেখে সয়ে গিয়েছে—হাফপ্যান্টপরা লোক দেখলে তারা আর ডাকে না পর্যন্ত।' ধন্যি দেশ তোমাদের, আর ধন্যি তোমাদের বুদ্ধি। এইগুলো নিয়ে আবার কামলা দেবী মোড়লি করে, দল পাকায়। কমলা দেবী এসেম্বলির মেম্বার কিনা। ইংরেজি জানে না। কী করে যে হাততোলা ছাড়া সেখানকার অন্য কাজ চালায়, তা তো বুঝি না। নর্মদাবেন সেদিন আমায় বলেছিলেন যে কামলা দেবী চায় না যে বিহারে কোনো লেখাপড়া-জানা মেয়েকংগ্রেসে আসুক। তাহলে ওর কদর কমে যাবে কিনা। সেইজন্য ও এই বোকাসোকাগুলোকে নিয়ে জটলা করে। কথাটা হয়তো ঠিকই। ও টিনের বিলিতী দুধকে বলে 'মেমিয়াকে দুধ' (মেমের দুধ)। টিনের মাখন এখানে কাউকে খেতে দেবে না। বলে যে ওতে ডিম মেশানো আছে; তা না হলে মাখন কখনো হলদে রং-এর হয়! কে ওর সঙ্গে বাজে তর্ক করবে···

---

১। Sanitary Inspector.

...একি কাম্‌লা দেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছি ছি আমি কী কান্ডই করলাম। উঠে বসে কাম্‌লা দেবীর হাত চেপে ধরি।...

'কাম্‌লা, আমি তোমার মার বয়সী। দোষ হয়ে গিয়েছে, কিছু মনে করো না, আমি কি আর এখন আমি আছি? এখন আমার মাথার ঠিক নেই, কী বলে ফেলেছি।' তার মাথায় হাত বুলিয়ে দি। সে চোখের জল মুছে, মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করে। জিজ্ঞাসা করি আমায় ক্ষমা করেছ তো?'

'কী যে বলেন। এখন শুয়ে পড়ুন।'

বলে জোর করে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আমার উপর সহানুভূতি আর দরদ তার মুখে-চোখে ফুটে বেরুচ্ছে। ঠিক যেন মেয়ে মায়ের সেবা করছে। আমার তো আর মেয়ে নেই—আমার যা কিছু বিলু আর নীলু। একটি যদি মেয়ে থাকত! মেয়ের সাধ কি আর ছেলেতে মিটোতে পারে? যখনই মেয়ের কথা মনে হয়, তখনই মনে হয় বিলু আমার মেয়ে, নীলু আমার ছেলে। বিলুর স্বভাব মেয়েরই মতো নরম; ওর ব্যবহার সেই রকমই দরদভরা; মেয়ের মতো ওর সহ্য করবার ক্ষমতা, আর সেই রকমই ওর চোখে একটুতে জল আসে। এই দেখ না কেন, কাম্‌লা দেবীকে এতকড়া কথা বললাম; তা কি সে একটুও রাগ করল? ও তো আমাকে পাল্‌টা শুনিয়েও দিতে পারত। মুখ তো ওর কম নয়। সেদিন রসদ গুদামের অ্যাসিস্টান্ট জেলরকে তো কাঁদিয়ে ছেড়েছিল।...এ ঘরের সবাই আমাকে কত ভালোবাসে, আমার জন্য কত ভাবে কত সেবা করে। আর আমি কি না ওদের মুখনাড়া দিই, ভালমন্দ কথা শোনাই। এমন তো আমি ছিলাম না। আমার সঙ্গে জীবন কখনও কারও ঝগড়া হয়নি। জেলের মধ্যে যেন আমার স্বভাব বদলে গিয়েছে। এখন আর আমার মুখের আর মনের উপর একটুও বাঁধন নেই।...কাম্‌লা আমাকে পাখা করছে।

সে বলে, 'মিছরির শরবত একটু খান না কেন—অল্প একটু দিই।' 'না'—একটু মিষ্ট কথা বলেছি কিনা, আবার মাথায় চড়ে বসেছে। এদের নিয়ে কী করি ভেবেও তো পাই না। আর খিদে পেলে নিজেই গিলব; তখন আর কারও খোশামোদের দরকার হবে না। লুসী জমাদারনী বলছিল যে পরশু ডাক্তার বলে গিয়েছে যে চব্বিশ ঘন্টা যেন আমার বিছানার পাশে, কিছু না কিছু খাবার জিনিস রেখে দেওয়া হয়; কখন খেতে ইচ্ছে হয় বলা তো যায় না। এদের হাবভাব দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। এ যেন হারিন মঘইয়া-ডোমনি-এর 'অন্‌সন্‌' কি না। আমরা বামুনের ঘরের বারব্রত করা মেয়ে। দু-এক দিনের উপোস তো আমাদের গা-সওয়া।

ঢং ঢং ঢং করে ওয়ার্ডের ঘন্টা বাজছে। এত রাত্রে আবার কে এল? ঘরের তালা বন্ধ করে, জমাদারনী দেওয়াল টপকে চাবিটা জমা দেয় জেলরসাহেবের কাছে। আর আমাদের ওয়ার্ডের বাইরের ফটক চব্বিশ ঘন্টা বন্ধ থাকে, ভিতর থেকে। কারও কিছু বলার হলে, বাইরে থেকে দড়ি টানে, আর ভেতরে ঘন্টা বাজে। ঐ তো লুসী কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। আবার কিছু কান্ড-টান্ড হল নাকি? লুসীটা নিজেও কি কম নাকি? সারাদিন টো-টো করে বাইরে বাইরে ঘুরবে, রাজ্যের ওয়ার্ডারদের সঙ্গে আলাপ করবে; আর যেই আমি বললাম যে তোকে একটু তরকারি রেঁধে দি, বিলুকে দিয়ে আসতে পারবি সেলে? অমনি চোখ মুখ বড় করে বলবে, এ'মা, সে কী করে হবে? সেলে কি কোনো জিনিস পোঁছুনোর জো আছে নাকি? সেখানে যে চব্বিশ ঘন্টা কড়া পাহারার ব্যবস্থা। সেখানে গেলে কি আর আমার চাকরি থাকবে! ওরে আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! সাতকাল গেল ছেলে খেয়ে এখন বলে ডান! তুমি

তো ওয়ার্ডারের ভয়ে একেবারের জড়সড় কি না! দিনরাত ওদের সঙ্গে হাসি মস্করা চলছে। যেই একটা কাজের কথা বললাম, অমনি আশিটা ছুতো। আরে তুইও তো ছেলের মা। তুই-ই যদি আমার কথা না বুঝলি, তবে অন্য কেউ না বুঝলে তাকে দোষ দিই কেমন করে! ভগবান করুন, তোর যেন আমার বরাত কোনো দিন না হয়— কিন্তু হত যদি, তো বুঝতিস। পরশু আবার বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে আমার কাছে এসে বলা হল, আপনার ছেলেকে আজ আলাদা করে রেঁধে, আলুর তরকারি খেতে দিয়েছে। একটা খবরের মতো খবর বটে। কী মহামূল্য জিনিসই দিয়েছে! সরকার একেবারে ভান্ডার উজাড় করে দানছত্তর খুলে দিয়েছে! সে খবর দিতে এসে আবার উনি আনন্দে গলে পড়লেন।

দরজার বইরে থেকে লুসী চেঁচাচ্ছে—'কাম্‌লা দেবী'। 'কীরে, কে এসেছিল রে?'

'রাতের ডাক্তারবাবু। জিজ্ঞাসা করে গেল যে বাঙালী মাইজী কেমন আছে। বেশি বাড়াবাড়ি-টাড়াবাড়ি হলে হাসপাতালে তার কাছে খবর দিতে। আর বেহুঁশ হয়ে গেলে সবুজ শিশিটা শুঁকোতে। মনচনিয়া আর গলকট্রি শুনে রাখ্। দুটোতে মিলে পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে বুঝি?'

দরদ তো কত! যেমন ডাক্তারবাবু, তেমনি লুসী জমাদারনীর। তোমাদের আর আমি চিনি না। তোমাদের সকলকে আমি এক এক করে হাড়ে হাড়ে চিনি। তোমাদের মুখে এক, আর মনে এক। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সব সমান। দারোগা সাহেবকেই দ্যাখো না। যেদিন বিলুর বাবাকে গ্রেফতার করল, সেদিন জেলা কংগ্রেস অফিসেও তালা লাগিয়ে দিয়ে গেল। আর আমাকে বলে গেল, 'মা, আপনি আপনাদের বাড়িতে থাকতে পারেন। ওটা গভর্ণমেণ্ট দখল করেনি, 'জপতো' হয়েছে কেবল জেলা কংগ্রেস অফিস।' ওমা, তিন চার দিন পরে এসে, আমাকে গ্রেফতার করে তোথানায় নিয়ে এল। বলল যে মাস্টার সাহেবের মতো আপনাকেও আটকবন্দী রাখা হবে। থানায় এনে কত খাতির। দারোগাবাবুর কোয়ার্টারে দারোগাবাবুর স্ত্রী আমার জপ ও সন্ধ্যার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই 'মা, মা' করে অস্থির। খাসা বৌটি; খোকাটাকে কোলে দিয়ে বললে—'আপনারা আশীর্বাদ করুন আমার এই খোকা যেন বেঁচে-বর্তে থাকে! যেমন চাকরি, রাজ্যের লোকের শাপমুন্যি কুড়ানো! আপনি মা প্রাণ খুলে একটু আশীর্বাদ করুন। পর পর দুটো খালি করে চলে গিয়েছে।' আমি বলি, 'ষাট্ ষাট্ বালাই আমার! আমার কি ছেলেপিলে নেই। ভাল মানুষে কি শাপমুন্যি করে। এ ছেলে তোমার বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। এখানকার বরহমথান জানো তো,—পূর্ণেশ্বরীর মন্দিরের কাছে—ভারি জাগ্রত। সেই গাছে তোমার নাম করে একখানা ইঁট বেঁধে দিও।'—যাক্ সে পর্বতো শেষ হল। জেলে আসবার পর শুনি যে দারোগা রিপোর্ট করেছে যে, সরকারের 'জপতী' জেলা কংগ্রেস অফিস থেকে গভর্ণমেণ্টকে বেদখল করে, আমি সেখানে অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম। সেইজন্য আমার উপর নাকি মোকদ্দমা চালানো হবে। আচ্ছা দ্যাখো! কী কান্ড বলোতো। আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকতে এত বড় মিছে কথা? দারোগাবাবু নিজেই আমাকে বলল যে, আমাদের নিজেদের ঘরে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই—ওদিকটা গভর্ণমেন্ট দখল করেনি! আবার দেখ নিজেই সাতখান করে লাগিয়েছে।···

জেলের ডাক্তারও ঐ দারোগারই মতো। কয়েদীকে লাল নীল জল দিয়ে ভাল করা, পরে তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলোনোর জন্য। ঠিক যেন মিয়ার মুরগী পোষা। আবার মা বলে ডাকতে আসে! কেউ মা বলে ডাকলে তখন এমন মনটা গলে যায়, যে দুটো

হক্‌ কথা শুনিয়ে যে গায়ের ঝাল মেটাব, তার পর্যন্ত উপায় থাকে না। আমি রাজ্যসুদ্ধ লোকের মা; জেলার সব কংগ্রেসকর্মীর মা; আমার তো বিশ্বজোড়া ছেলে। কিন্তু মন যে বিলু নীলুর উপর পড়ে থাকে। এদের ছাড়া অন্য কোনো ছেলের মা হতে আমি চাইনি। এদের দুজনকেই বলে আমি প্রাণভরে ভালবাসতে পারিনি—তা না হলে কি আমার বিলু এত ভালবাসার কাঙাল! না হলে কি সে, জিতেনের মা দিদিকে 'মা' বলে? না হলে কি নীলুরা জ্যাঠাইমা বলতে অজ্ঞান। আমি চাই বিলু নীলুকে একেবারে আমার নিজের করে রাখতে, যাতে ওদের উপর আর কারও দাবি-দাওয়া না থাকে। কিন্তু আমি ওদের আঁকড়ে ধরে থাকলে কী হবে, রাজ্যের লোকে যে ওদের চায়। সকলেরই টান যে ওদের ওপর। আমি কি ওদের ধরে রাখতে পারি? এমনিই তো বিলু যা অভিমানী ছেলে। 'তুই' না বলে 'তুমি' বললেই অভিমানে তার চোখ দিয়ে জল আসে। সে উনি একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় বলেছিলেন—'বড়বাবুকে বাড়িতে দেখছি না। এখনও ফেরেননি বুঝি?' বিলু ছিল ঘরের মধ্যে। একথা শুনে সে কেঁদে-কেটে অস্থির। নীলু হলে তো হৈ-চৈ করে বাড়ি ফাটাত। দিদি, তোমার তো জিতেন, ধীরেন, হেবলু, বেলা, বৌ'রা, নাতি, নাতনী সবাই রয়েছে। তোমার বাড়-বাড়ন্ত লক্ষ্মীর সংসার! কোনো কিছুর অভাব নেই। কেন তুমি বিলুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে? কেন পর করে দেবে। আমার ছেলের একটুও ভাগ আমি কাউকে দেব না। আমার তো সংসারে নীলু বিলু ছাড়া আর কিছুই নেই। চাল নেই, চুলো নেই, মাথা গুঁজবার একটু জায়গা নেই। না আছে টাকাকড়ি, না আছে ধনদৌলত। আমি তো ছেলেদের মুখের দিকে চেয়েই সব দুঃখ-কষ্ট ভুলেছি! তাও ভগবান তোমার সইল না। ছেলে ভুলানো মন্তর দিয়ে সবাই আমার ছেলেকে পর করে দিল।…জিতেনের মা দিদিকে ঐ দেখতে ভালমানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু মনটা যেন একেবারে জিলিপির প্যাঁচ। অন্য বাড়ির কেউ একটা নতুন গয়না গড়াক না—সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তার সাত রকমের বিন্যাস করবে। সব খবরের তার দরকার,—সোনাটা মরা সোনার মতো লাগছে—কত পান দিয়েছ—কাকে দিয়ে গড়ালে—কত ভরি ওজন—বানি কম দিয়েছ তো গড়ন ভাল হবে কী করে? বিলু নীলুর কাছ থেকে আমার সংসারের সব খবর জেনে নেওয়া চাই; তোর মা তেল দিয়ে ফোড়ন দেয় না ঘি দিয়ে—তোর মা ছাঁকা তেলে বেগুন ভাজে না অল্প একটু তেল দিয়ে বেগুন সাঁতলে নেয়, এ সব কথা জিজ্ঞাসা করত ছোটবেলায় নীলুদের। আচ্ছা বলো! এসব খবরে দরকার কী? বিলু তো যা চাপা, কোনোদিন কিছু বলে না; কিন্তু নীলু আবার আমার কাছে এসে ঐসব কথা নকল করে বলে। একেবারে হুবহু দিদির মতো সুর, দিদির মতো হাবভাব। শুনে হেসে বাঁচি না। কিন্তু দিদির কি এটা উচিত? আমার হল অভাবের সংসার। তোমরা আপনার জন। এ নিয়ে আলাপ আলোচনার করার দরকার কী? এদিকে দিদি আমাদের করেও খুব, সেকথা আমি অস্বীকার করি না। অসুখে-বিসুখে দেখাশুনা করা, ছুতোয় নাতায় খাওয়ানো-দাওয়ানো, এসবের তো কথাই নেই। নীলু তো এখনও সেইখানেই থাকে। প্রাণ দিয়ে করবে—কিন্তু খুব করছি একথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়বে না—দিদির স্বভাবই ঐরকম। আর একটু গম্ভীর না—না বড় হলহল গলগল ভাব। বিলুকে বলবে 'বারিন্দিরের ব্যাটা', নীলুকে বলবে 'মাছপাতরি,' আর ওদের বাবার নাম দিয়েছে 'দাড়ি'। এনব ফষ্টিনষ্টি না করে সাদা ভাষায় নামটা ধরে ডাকলে কী হয়?…মানুষের মুখওয়ালা একরকম ডিবের বাটি আমাদের সময় ছিল—অবিকল সেইরকম মুখ। ঝিঙের বিচির মতো কালো দাঁত। এক গাদা জর্দা মুখে দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা প্যাচ প্যাচ করে

থ্যুতু ফেলা হচ্ছে। ছিলেন তো বামুন পুরুতের মেয়ে। নৈবিদ্যির চাল আর কাঁচকলা খেয়ে তো মানুষ হয়েছিলে ছেলেবেলায়। পুরুতের পাওয়া লালাপেড়ে কাপড় ছাড়া, অন্য কোনো কাপড় পরোনি বার বছর বয়স পর্যন্ত। বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল বলে তরে গেলে। তা না, এখন আর ঠেকারে মাটিতে পা পড়ে না—একেবারে যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছেন। তোমায় ভগবান দিয়েছেন, তোমার আছে। তাই বলে যাদের নেই তাদেরও একটু মানুষ বলে ভেবো। আমিও এমন হাভাতের ঘরের মেয়ে ছিলাম না—আর হাভাতের হাতে পড়িও নি। কিন্তু আমার কর্মফল—সোনামুঠো নিলে ধুলোমুঠো হয়ে যায়।…আচ্ছা, দিদি, বিলু তোমাকে জ্যাঠাইমা বলত তাতে তোমার মন ভরে নি কেন? না দিদি সত্যি কথা বলি, তোমার উপর আমার একটুও রাগ নেই। তোমরা ছিলে বলে নীলু বিলু তাদের জীবনের একটু আধটু শখ-আহ্লাদ মেটাতে পেরেছে। যখন উনি জেলে, ওদের দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না, তখন তো তুমিই ওদের থাকবার জায়গা দিয়েছ। বিলু গেলে, তোমার দুঃখ কি আমার থেকে কম হবে। তা কি আর আমি জানি না। অন্তরের থেকে যদি বিলুকে তোমায় দিয়ে দিতে পারতাম তাহলে কি দিদি বিলুকে তুমি বাঁচাতে পারতে? বিলু আমার বাঁচুক দিদি, আর তাকে তোমার হাতে দিতে আমি কিপ্টেপানা করব না। এখন তোমারও সম্বল থাকল কতকগুলো বিলুর স্মৃতি আর আমারও তাই! তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করেই এখন জীবনভোর কাটাতে হবে। না দিদি, তোমার দয়া তোমার টান আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না। আমার ছেলেরা মাছ খেতে এত ভালবাসে, কিন্তু আশ্রমে তো আর মাছ রান্নার উপায় নেই। আমরা বুড়ো মানুষ—গান্ধীজীর কথামতো বিশ বছর থেকে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু ছেলেপিলেদের উপর জোর করি কী করে? তুমি তো দিদি আমার মনের কথা বুঝেছিলে নিত্যি। বিলু নীলুকে ডেকে মাছ খাওয়ানো; আমাকে তোমাদের বাড়িতে মাছ খাওয়ার জন্য কত জোর করে ধরা;—দিদি তোমার প্রাণের টান আমি ঠিক বুঝি। তোমার কাছে আমি জন্মে জন্মে ঋণী। তোমার নিন্দে করলে আমার জিভ খসে পড়ে যাবে না? তোমার নিন্দের কথা ভাবলেও আমার পাপ। আজ আমার মনের ঠিক নেই দিদি। বিশ্বসংসার তেতো বিষ হয়ে গিয়েছে আমার কাছে। ভাল কথা মনে আসবে কী করে? তুমিও তো বিলুর মা—তোমাকে তো নতুন করে আমার মনের অবস্থা বুঝিয়ে দিতে হবে না। বিলু তোমাকে কত ভালবাসে, কত ভক্তি করে। বিলু যাকে একবার মা বলেছে আজকের দিনে আমি কি তার উপর রাগ করতে পারি? বিলুর মা বলে ডাকার মর্ম আমি তো বুঝি। ডাক তো নয়, ডাক শুনে সমস্ত মন ছুটে চলে যায় তার দিকে। ছেলে তো নয়, একটা শত্রু। ছেলেদের কথা যত ভেবেছি, তার অর্ধেকও যদি ভগবানের কথা ভাবতাম তা হলে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাওয়া যেত। কিন্তু যতই আঁকড়ে ধর, পিছলে বেরিয়ে যাবে। বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো। না হলে—ঐ ছেলে বিলু বারান্দায় পাটি পেতে বসে পড়ছে, আমি যদি ওর পিছন দিয়েও পা টিপে টিপে নিঃশব্দে চলে যাই, তা হলেও ও বুঝতে পারে। বলবে 'মা মা গন্ধ পাচ্ছি'। আর সত্যি করেই গন্ধ পায়। যখন ছোট্ট ছিল—আমি স্নান করে এলেই আমাকে জড়িয়ে ধরত। বলত, 'তুমি স্নান করে এলেই তোমার গায়ে মা'র গন্ধ পাই।' আমি বলি, 'ওরে দুষ্টু ছেলে, তোর বাস্‌টে জামা-কাপড় পরে আমায় ছুঁস না, ঠাকুর ঘরে হেঁসেলে আমার ছিষ্টি কাজ পড়ে রয়েছে।' তা কি ছেলে শুনবে—বললে, 'মট্‌কার কাপড় কি ছুঁলে নষ্ট হয় নাকি? আর নীলুটা এত বড় শয়তান; ও কত দিনের কত কথা জমিয়ে জমিয়ে রেখেছে, সেই সব কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমার

পিছনে লাগবে, আর বলবে, মা তুমি দাদাকে আমার চাইতে বেশি ভালবাস। আরে পাগল তা কি হয়? মা কি কখনো এক ছেলেকে বেশি এক ছেলেকে কম ভালবাসে। ভগবানের নিয়মই যে সে রকম না। অমনি নীলু বলবে—'আচ্ছা মা মনে করো পূর্ণিয়াতে বকরাক্ষস এসেছে। সে কেবল ছেলের মাংস খাবে। আর কোনো মাংস সে খায় না। প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটা করে ছেলে তাকে যোগান দিতে হবেই হবে। আজকে তোমার বাড়ির পালা। বলো এই রকম অবস্থায় তুমি রাক্ষসের কাছে কাকে পাঠাবে—দাদাকে না আমাকে?' 'যা যা, বকিস না তো। এতও বাজে কথা বলতে পারে। এত কথা তোর মাথায় আসে কোথা থেকে, আমি তো বুঝতে পারি না। কাকে আবার দেব, কাউকেই দেব না।' অমনি নীলু 'বুঝেছি' বলে বাড়ি মাৎ করবে।—বুঝেছ তো ছাই। তোমরা যদি মা'র মনের কথা বুঝতে তাহলে আর আমার দুঃখ কিসের? না হলে কি আর নীলু আমাকে একদিন বুঝিয়েছিল যে মা'র ভলেবাসা স্বার্থের খাতিরে। সে কথা বোঝাতে ও গল্প বলছিল, 'একটা বেড়াল আর তার বাচ্চাকে একটা কড়ার উপর বসিয়ে, নিচে থেকে উনুনে আঁচ দেওয়া হল। আর এমন ব্যবস্থা কর্য হল যাতে বেড়াল পালিয়ে যেতে না পারে। যখন কড়াইটা খুব গরম হয়ে উঠল, তখন বেড়ালটা, আস্তে আস্তে গিয়ে বাচ্চাটার পিঠের উপর বসল।' সব মা'ই নাকি এই ধরনের; যতক্ষণ নিজের গায়ে আঁচ না লাগে, ততক্ষণই মা ছেলে ছেলে করে মরে। কোথা থেকে আজকালকার ছেলেরা যে এসব শেখে তা বুঝিও না কিছুই। আজকালকার কলেজে এই সব পড়ায় নাকি? বিলু তো কখনো এমন কথা বলে না। এ কথা শোনবার পর নীলুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করতেও ঘেন্না লাগে—কিন্তু নীলুর এই কথাটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। আর একদিন ও আরও একটা কথা বলেছিল—সে কথাও কোনো দিন ভুলব না। সেও মা'র স্বার্থপরতা সম্বন্ধেরই কথা। বড় ভূমিকম্পের পর অনেকদিন একটু-আধটু ছোটখাট ভূমিকম্প হত। একদিন রাত্রে যেই একটা ঝাঁকি মেরেছে, জিতেনের বৌ ঘুমের ঘোরে, কোলের ছেলেটাকে ঘরে ফেলে, দৌড়ে বাইরে চলে এসেছে। আর যাবে কোথয়! তাই নিয়ে বাড়িসুদ্ধ লোক তো বেচারিকে ছিঁড়ে খায় আর কী! আর নীলুর পুঁজিতেও একটা গল্প জমা হল, আমাকে শোনানোর। হ্যাঁ বাপু, মায়েরাস্বার্থপর, হাজারবারস্বার্থপর আর ছেলেদের ভালবাসা একেবারে নিঃস্বার্থ—একটুও ভেজাল নেই। হল তো? এই শুনলেই যদি খুশী হও তো তাই। ছোটবেলা থেকে নীলুটা কম জ্বালাতন করেছে আমাকে? বিলু নীলু দুভাই একই সঙ্গে মানুষ, কিন্তু নীলুটা কোথা থেকে যে এত দুষ্টুমি শিখেছিল, তাই ভাবি। কত সময় একেবারে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। দুপুরে হয়তো আমার একটু তন্দ্রা এসেছে। কোথা থেকে লক্ষ্মী ছেলে, একরাশ দোপাটি ফুলের পাকা ফলগুলো এনে, আমার নাকের সম্মুখে ফাটাতে আরম্ভ করল। সব বীচিগুলো ছিটকে নাকে কানে ঢুকে যায়। হাঁই-মাই করে তো উঠি! আর বকলে তা গায়েও মাখে না; ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসে। লঘুগুরুর জ্ঞান ওর একটুও নেই। নিজের খেয়ালেই উন্মত্ত। একদিন করেছে কী, এই বড় হয়ে—ছারপোকা মেরে মেরে তার রক্ত দিয়ে, সাইনবোর্ডের মতো লিখেছে—'অহিংসা পরমোধর্ম''। আমি তো বুঝি কাকে ঠেস্ দিয়ে এ লেখা। আবার তাঁর কানে যাবে, এই মনে করে আমিভাব দেখালাম যেন লেখাটা দেখিনি। ওরে নীলু, একদিন যখন মা বাবা থাকবে না, তখন বুঝবি যে মা বাবা কী জিনিস। দাঁত থাকতে কি দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায়? ওর বাবার মনে দুঃখ দেওয়ার জন্য নীলু করবে কী, ঠিক আশ্রমের জমির সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে, ইঞ্চি মেপে সেখানটায়, মাংস

রে'ধে খাবে। আর বলবে, 'আশ্রমের জমিতে ছাগল খাওয়া বারণ, এখানে তো আর নয়। ওরে নীলু, মহাত্মাজী ছাগলের দুধ খান বলেই কি আশ্রমে মাংস খাওয়া নিষেধ? আশ্রমে কেন আমিষ খাওয়া বারণ তা তুইও জানিস, আমিও জানি, তবে কেন ও'কে খোঁচা দিয়ে এমন কথা বলবি? তুই মাংস খেতে ভালবাসিস, আর তোদের রে'ধে খাওয়াতে পারি না, একি আমার কম দুঃখের কথা নাকি? কিন্তু আশ্রমের নিয়ম যে, কী করি? কতদিন দিদির বাড়ি গিয়ে বসে বসে বিলু নীলুর মাছ খাওয়া দেখেছি। নীলু মাছ যে কী ভালবাসে—'রেওয়া' মাছের কাঁটাখানি পর্যন্ত চিবিয়ে খায়। বিলু কিন্তু কতদিন বলেছে যে এবার মাছ ছেড়ে দেব; আমি আর দিদিই বলে বলে ওকে ছাড়তে দিইনি। এমনিই তো যা চেহারা।…দিদির বাড়িতে তাও তো দু-চার দিন একটু-আধটু মাছ পেটে পড়ে। ছেলেবেলায় আমাদের দেশে, আমরা ভাবতেও পারতাম না, বিনা মাছে লোকে কী করে একবেলাও ভাত খেতে পারে। আমার ছেলেদের এ অবস্থায় তো আমরাই নিয়ে গিয়েছি। তারা বাংলাদেশে থাকলও না, সেখানকার কথা, আচার-ব্যাভার কিছু জানলও না। এরা সাঁতার কাটতে জানে না; বন্যা, হিজল, গাব এসব গাছের নাম শোনেনি। একদিন ছেলেদের কাছে দেশের 'ঢপ-কীর্তনের' কথা বলেছিলাম। নীলু তো 'ঢপ' নাম শুনে হেসেই আকুল। বলে এমন বেঢপ নামও তো কখনও শুনিনি! বিলুকে একদিন বলেছিলাম, 'তিজেল'টা ওঘর থেকে এনে দিতে। জিজ্ঞাসা করল, 'তিজেল' কী, মা? আমাদের দেশে কচি ছেলেটা পর্যন্ত যে কথাটা জানে, এরা কখনও সেকথা জানে না। বারো মাসে তেরো পার্বণ কী এরা জানে? বিলু আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসব জিজ্ঞাসা করে। ওর সব জিনিস জেনে নেওয়া চাই। মা, 'দোল' কোন পুজোকে বলে? চড়কের দিন ছোটবেলায় তোমরা কী করতে? গাজন গানের সুর কেমন? তোমাদের গাঁয়ে বৈরাগী ছিল? রাজ্যের খবর তার দরকার। কবে মনেও নেই, বিলু তখন ছোট, ওর কাছে গল্প করেছিলাম যে আমাদের গাঁয়ের নিখিল চৌধুরী পিশাচসিদ্ধ হতে গিয়ে শ্মশানে মারা গিয়েছিল। সেদিনও দেখি ও সেই কথা গল্প করল। বিলুকে যদি জিজ্ঞাসা করি, ওরে কী করবি এত সব গল্প শুনে, তো বলবে—'তোমার ছোটবেলা মুখস্থ করব।' আমার ছোটবেলা মুখস্থ করবি কিরে? এমন মিষ্টি করে ছেলে কথা বলতে পারে। শুনলেই মনটা আনন্দে ভরে যায়। নীলুর কিন্তু এসবের বালাই নেই। তার এত সব খবর শুনবার আর ধৈর্য কোথায়? দিনরাত টো-টো করে বেড়াবে; মধ্যে এক একবার হুড়মুড় করে ঢুকবে বাড়িতে। টান মেরে ফেললে জামাটাকে। হুকুম হল, মা গেঞ্জিটায় সাবান দিয়ে দিও। মাথায় এক খাবলা তেল দিয়ে, দুঘটি জল গায়ে পড়ল কি না পড়ল, এলেন রান্নাঘরে। 'এখনও ভাত বাড়োনি।' কখন থেকে রে'ধেবেড়ে আমি আর বিলু ভাত আগলে ওর জন্যে বসে রয়েছি, সেকথা ছেলের খেয়ালই নেই। আর বিলু নিজের কাপড় জামা তো কাচেই, কতদিন ওরও কাপড় জামা সাবান দিয়ে কেচে দেয়। কার সঙ্গে কার তুলনা।

'এখন কেমন আছেন?' আঙুল দিয়ে এক ঠেলা দিয়ে নৈনা দেবী আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

এরা কি আমাকে নিশ্বাস ফেলার ছুটি দেবে না? দুদন্ড নিরিবিলিতে বিলুর কথা ভেবে তাকে একটু কাছে পাওয়ার চেষ্টা করব, তার কি উপায় আছে? কী আমার হিতৈষী রে! এখনই পর পর সাতটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে—কলের গানের রেকর্ডের

মতো। একটা প্রশ্ন শেষ হবে আবার তৈরী হতে হবে পরের প্রশ্নটার জন্যে। সে সময় যদি ঘরটাতে আগুন পর্যন্ত লেগে যায়, তাহলেও নৈনা দেবী ওর সেই বাঁধা প্রশ্নগুলো করতে ছাড়বে না; দরদ দেখে মরে যাই! জবাব দিই, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। খুব ভাল আছি, গা-বমি-বমিটা নেই, মাথাধরা কমে গিয়েছে, গরম লাগছে না, পেটের মধ্যে জ্বালা করছে না, মুখের তেতো ভাবটা কমে গিয়েছে। কম্বল বিছানা ঝেড়ে দেওয়ার দরকার নেই। হয়েছে তো? আর আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। এখন গুটিগুটি গিয়ে নিজের বিছানায় ঠান্ডা হয়ে শোও।' নৈনা দেবী আমার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় ভাবছে যে মাথা খারাপ হল নাকি? একটাও কথা না বলে ও নিজের বিছানার দিকে চলে গেল। ও কারও মুখঝামটা চুপ করে সইবার পাত্তর নয়। ও আমার কথা নিয়ে একটা জটলা করবেই করবে— তা সে আজই হোক আর কালই হোক। এইতো দিন কয়েক আগে ওর মা 'ইনটারভিউ'-এ এসেছিল। ও করেছে কী—সাবান, পেন্সিল, খাতা, মাখন, কিসমিস, আরও কত জেল থেকে পাওয়া টুকিটাকি জিনিস সব সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে জেলগেটে —মা'-র সঙ্গে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে বলে। সেখানে সি. আই. ডি. আর জমাদার চেপে ধরেছে—প্রথমটা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। বলেছে যে এসব আমার নিজের জিনিস। কেন বাইরে পাঠাতে দেবে না? তখন সি. আই. ডি. বলেছে যে আমার সঙ্গে আইন ফলাতে আসেন তো এসব জিনিস নিয়ে যেতে দেব না। আর যদি নরম হয়ে আমাকে অনুরোধ করেন, আর বলেন এসব জিনিস আপনার বাড়ির জন্যে দরকার, তাহলে আপনার মাকে এগুলো নিয়ে যেতে দিতে পারি। তখন নৈন দেবী তাতেই রাজী। গেটের জমাদারকে কিসমিসও খাওয়ানো হল। দ্যাখো দেখি কী অপমানটা হতে হল। আর অপমানটা কি ওর একার? এতে তা আমাদের সকলকার মুখেই চুনকালি পড়ল। জমাদারনী এসে সব কথা আমাদের ওয়ার্ডে বলে দিল। বহুরিয়াজী একটু মুখফোঁড় গোছের লোক। তিনি যেই না একটু নৈনা দেবীকে বলতে গিয়েছেন, আর যাবে কোথায়! একেবারে আগুন লেগে গেল। সে কী হৈ-হৈ রৈ-রৈ কান্ড! বহুরিয়াজীকে এই মারে তো এই মারে। এখানে নরম মাটি পেয়েছে কিনা। সি. আই. ডি-র সম্মুখে এসব তেজ ছিল কোথায়? তারপর দিন পনেরো ধরে চলল, ওতে আর বহুরিয়াজীর দলে কুকুরুন্ডলী। ও তো একাই একশো। কথায় কী বিষ, কী ঝাঁঝ্। সেই বলে না—'মোষের সিং ব্যাঁকা; বোঝার সময় একা'। ও একাই সকলকে ঝগড়া করে ঠান্ডা করে দিয়েছিল! কী জানি আবার আমার পিছনে লেগে কী করবে। করবে তো করবে। যা মনে হয় করুক গিয়ে, মরার বাড়া আবার গাল আছে নাকি? ভগবান আমাকে যে দুঃখ দিলেন, তার চেয়ে বেশি ও আমার কী করবে। সব জিনিসের সীমা আছে, আর লোকের দুঃখের কি আর সীমা নেই?·· এমনি তো বিলুর কথা ভেবে আমার রক্ত জল হয়ে আসে,—তার উপর চমইন জমাদারনী একদিন আমাকে বলল, 'বাঙ্গালী মাইজী, তোমার ছেলের সাজা নাকি সরকারবাহাদুর নিজে ইচ্ছে করে দেয়নি। তোমারই আর এক ছেলে নাকি সাক্ষী দিয়ে এই সাজা করিয়েছে।' বলে কী এ? আমি শুনে ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে মরি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে বলল তোকে?' সে জবাব দিল, 'নৈনা দেবী একদিন আমাকে বলেছিল যে, এই রকম একটা কথা শুনেছি! বাইরের ওয়ার্ডারদের কাছে জিজ্ঞাসা করে ঠিক ব্যাপারটা কী জেনে নিস

তো। বাইরে জিজ্ঞাসা করে আমি জানতে পারলাম নৈনা দেবী যা বলেছিলেন তা সত্যি। নৈনা দেবীরা তোমার কাছে বলতে বারণ করেছিল, মাইজী। কিন্তু আমি ভাবলাম যে তোমার বাড়ি কথা। সকলে জানবে, সকলে বলাবলি করবে, আর তুমি জানবে না। তা কি হয়? আমারও তো ধরম আছে। আচ্ছা মাইজী তোমার ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া আছে নাকি? আমার দু'ভাইও একবার কাঁঠাল গাছ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করেছিল। তাই নিয়ে কত থানা পুলিশ। মুঠো মুঠো টাকা খরচ হয়েছিল। সতেরো টাকা নিয়ে তারপর দারোগাসাহেব মোকদ্দমা তুলে নেন। তোমাদের কি মাইজী অনেক জোতজমি মবেশী[1] আছে নাকি? সে ছেলে গান্ধীজীতে নাম লেখায়নি বুঝি? কার পেটে যে ভগবান কী সন্তান দেন…কেউ বলতে পারে না।'—শুনে তো আমার বুক শুকিয়ে গেল। বললাম, 'যত সব মিথ্যা রটাচ্ছিস। তোর নামে আমি রিপোর্ট করব।' সে বলে 'মাইজী' আমি তো ভাল ভেবেই তোমাকে বলেছিলাম। হতেও পারে মিথ্যে। আমি তো যা শুনেছি, তাই বলছি—একটা কথাও আমার মনগড়া নয়। রিপোর্ট কোরো না মাইজী তুমি। আমার পুরুখ[2] তিন বছর থেকে পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে আছে—আমার রোজগার থেকেই ছেলেপিলেরা দু'মুঠো খেতে পায়।' আমি তাকে বলি, 'আচ্ছা হয়েছে, যা, যা আর খবরদার এমন কথা আমার কাছে বলিস না।' সে তো চলে গেল। কিন্তু তারপর থেকে আমার মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে। এত মিথ্যেও লোকে বলতে পারে।…

ইজের পরা দাদা বিলু, ছোট্টো নীলুকে গাল টিপে টিপে আদর করছে, নীলু নিল্লু—পিলু-পিল্লু।…

সেই নীলু দেবে বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষী। এ তো আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারি না। নীলু গোঁয়ার, নীলু অবুঝ, নীলু খামখেয়ালী সব ঠিক,… কিন্তু সে যে দাদা-অন্ত প্রাণ। নীলু কি কখনো এমন করতে পারে? সেইদিন থেকে যখনই কথাটা ভাবি আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। যদি খবরটা সত্যি হয়? জেলগেটে সেদিন ওঁর সঙ্গে ইনটারভিউ ছিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট মধ্যে মধ্যে খাতির করে আমাদের দেখাশুনো করতে দেয়। সেদিন ভাবলাম যে তাঁর কাছে একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করে দেখি তিনি কিছু জানেন কি না। তারপর মনে হল থাক—এ কথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? তিনি যদি বলেন, 'নীলুর বিরুদ্ধে এমন কথা তুমিও বিশ্বাস কর?' আর ধরো যদি কথাটা সত্যি হয়। এমনিই তো তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম যে তাঁর মনের মধ্যে দিয়ে কী ঝড় বয়ে চলেছে। আমার মনে কী চলেছে, তা তো আমি জানি। তাই দিয়ে তো তাঁর মনের অবস্থাটা কিছু আঁচ করতে পারি। তার ওপর লক্ষ্য করলাম যে উনি আমার মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। শেষকালে সাত-পাঁচ ভেবে আর কথাটা জিজ্ঞাসা করা হল না। মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। সি. আই. ডি. বলল, 'এবার তাহলে উঠুন, সময় হয়ে গিয়েছে।'…ঘুরেফিরে কেবল এই কথাটা মনে পড়ে। নীলু কি কখনো এমন কাজ করতে পারে? ও যে দাদা বলতে অজ্ঞান। ছোটবেলা থেকেই দাদা যা করবে তা ওরও করা চাই। নীলুকে যে আমি বিলু থেকে আলাদা করে ভাবতেই পারি না। নীলু বদরাগী। কখন বাইরে কী কান্ড করে বসে তাই ভেবে

---

১ গরু মহিষ প্রভৃতি। ২ স্বামী।

তো আমি তটস্থ হয়ে থাকি। কিন্তু সব সময় মনের মধ্যে ভরসা থাকে যে, ওর দাদা আছে ওকে সামলে নেবে।...ও যখন জেলে গিয়েছিল, তখনও মনের মধ্যে ঐ ভরসাই ছিল। ছোটবেলায় কেউ নীলুকে কিছু বললেই, ও দাদার কাছে নালিশ করত, 'ও জাজা, দ্যাখো না'।...

সেই ছোটবেলায় নীলু আর বিলু হেডমাস্টারের কোয়ার্টারের আমগাছটার নিচে খেলা করছে—হামদি দফ্‌তরি গেটের মধ্যে ঢুকল। ঢুকেই দূর থেকে কুর্নিশ করার মতো করে আদাব করল, আর বলল, 'আদাব নিল্লুবাবু, একটা বুড়হিয়া মেমের সঙ্গে তোমার সাদি দেব। কাল আমাকে একটা বুড়হিয়া মেম বলছিল যে সে নিল্লুবাবুকে ছাড়া আর কারও সঙ্গে সাদি করবে না।'

'দাদা দ্যাখো না আমাকে কী সব বলছে।'

বিলু নীলুকে বোঝাল, 'সত্যি তো আর নয়, ও তো ক্ষ্যাপাচ্ছে। বুড়ি মেম আবার বিয়ে করে নাকি?'

নীলু বলে, 'না। ও বলবে কেন?'

দফ্‌তরি বলে চলে—'বুড়হিয়া মেমটার অল্প অল্প গোঁফ আছে। আমাকেই বলেছিল প্রথমে সাদি করবে। তা আমি বললাম, যার দাড়ি নেই তাকে আমি বিয়ে করি না। তখন সে বলল যে, তাহলে আমাকে নিল্লুবাবুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও।'

'দাদা! দ্যাখো না।'

নীলু কান্নাকাটি আরম্ভ করল। বিলু তাকে বোঝাতে বোঝাতে আমার কাছে নিয়ে এল। 'বোকা ছেলে কোথাকার, ক্ষ্যাপালে বুঝি কাঁদতে হয়। তাহলে যত কাঁদবে তত ও ক্ষ্যাপাবে।' তারপর বিলু আমার কাছে গল্প করে—'নীলুটা একটুও বোঝে না। আমি যত বোঝাই তত কাঁদতে আরম্ভ করে।' যেই বিলুকে বলি, 'তুমি হলে ওর দাদা, তুমি না বোঝালে ওকে আর কে বোঝাবে বল', অমনি বিলু ভারি খুশী। দাদাগিরির দায়িত্ব তো কম নয়!

বিলু নীলুকে চোখে চোখে রাখত। দিন কতক নীলুর শখ হল কল্কেফুলের বীচি নিয়ে খেলার; তাকে এদেশে 'কনৈল' না কী খেলা যেন বলে। বিলুকে বলি—'বিলু দেখিস তো বাবা, নীলুর উপর নজর রাখিস। আমার বড় ভয় করে, নীলু আবার কোনদিন কল্কেফুলের বীচি-টিচি না খেয়ে ফেলে। ও বীচি বিষ জানিস তো?' বিলু পন্ডিতের মতো বলে—'সে আর বলতে হবে না আমাকে। এই তো সেদিন নীলুরা ভেরেন্ডার বীচি জড়ো করেছিল খাবে বলে। ওরা বলছিল যে ঐ বীচিগুলোর নাম হিন্দুস্থানী বাদাম। আমিই তো ওদের খেতে দিইনি।'... সত্যিই ছোটবেলায় বিলু নিলুকে একদন্ড চোখের আড়াল করত না। ও তখন কত ছোট—নীলুর জামায় বোতাম লাগিয়ে দেওয়া, জুতোর ফিতে বেঁধে দেওয়া, সব নিজের হাতে করেছে। সেই নীলু কখনও বিলুর বিরুদ্ধে যেতে পারে! আর যদি গিয়েও থাকে তাহলে স্বেচ্ছায় কখনই যায়নি। পুলিশের জুলুমে হয়তো গিয়েছে। ও দারোগা সব করতে পারে। হয়তো কত অত্যাচার করেছে নীলুর উপর; হয়তো জজসাহেবের সম্মুখে বিলুর বিরুদ্দে বলার সময় ওর বুক ফেটে গিয়েছে। কিন্তু বোধ হয় না বলে উপায় ছিল না। না, নীলুর সাক্ষী দেওয়া, একি একটা বিশ্বাসের মতো কথা! কিসের থেকে কী শুনেছে চমইন জমাদারনী,—আর তাই সাতখান করে এসে লাগিয়েছে। নীলু যদি তাই করে থাকে তাহলে ও ছেলের আর আমি মুখ

দেখব? যেখানে দু'চোখ যায় সেখানে চলে যাব। আমার মন বলছে যে এমন হতেই পারে না। আর মায়ের মন কি কখনও ভুল বলে?...

সেই কপিলদেও-এর বিয়ের সময় বিলু নীলু গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। আমার ইচ্ছে নয় যে ওরা যায় সেখানে। তখন তো ওরা ছোট। আবার গিয়ে অসুখ-বিসুখে পড়বে; ওদের বাড়ির আচার-ব্যাভার জানা নেই, কী করতে কী করে বসবে; কিন্তু যেদিন থেকে দাহিভাত গ্রামের নাপিত, হলুদমাখানো সুপারি ওদের হাতে দিয়ে গিয়েছে, সেদিন থেকেই ওরা বায়না ধরল যে ওরা বিয়েতে যাবে। কপিলদেও-এর বাবা তখন বেঁচে। তিনি একদিন এসে গরুর গাড়ি করে ছেলেদের নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে আট দশ দিনের বেশি ছিল না। কিন্তু কী যে শিক্ষা সে দেশের, ঐ কদিনের মধ্যে যা-তা সব গান শিখে এসেছিল।...উঠোনের একদিকে বসেছে নীলু—আর একদিকে বিলু। দুজনেরই সম্মুখে একটা করে পুরনো বিস্কুটের টিন,—আর হাতে একটা করে কাঠি। তাই দিয়ে টিনটা বাজাচ্ছে। নীলু বলল, 'এবার কিন্তু দাদা, 'বকড়ীকে পাঁচ টেংটা' আর বাজবে না। 'তকই-কে তাকা-দুম মকই-কে লাওয়া'[১]-টাও না। এবার বিয়ের সময়ের গানটা হবে।' দুজনে বাজাতে লাগল। বিলু গাইছে 'কপিলদেওকে পাঁচ বিয়া, ছঠমা[২] চুমৌনা[৩]।' বিলু বরপক্ষ। আর উঠোনের অন্য কোণ থেকে কন্যাপক্ষ নীলু পাল্‌টা জবাব দিচ্ছে, 'বাজাতে যাও ধাঁই ধাঁই—কপিলদেওকে বহুকে ছঠ্‌মা সাঁই[৪]।' খুব বকলাম ওদের। এই সব ছাইভস্ম ছোটলোকদের গান ভদ্দরলোকের ছেলেরা গায় নাকি? বিলু একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। নীলু বলে, 'দাহিভাতে তো সহদেওদের বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা গায় এই গান। তারা ভদ্দলোক না বুঝি?' আমি জানি যে, নীলুকে যে কাজ যত বারণ করবে, ও ছেলে সে কাজ তত বেশি করে করবে। বিলু তো আমার কথা বুঝেছে। এখন ও থেমে গেলে একা নীলু আর কতক্ষণ চালাবে? ওর তো আছে কেবল নকলনবিশি! বিলু থামবার পর নীলু খানিকটা বাড়াবাড়ি করে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গাইতে লাগল, 'তকইকে তাকাদুম্ মকইকে লাওয়া'; তারপর আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে গেল। পরে ঘর থেকে শুনছি যে সে দাদার কাছে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করছে, 'দাদা, গানটা সত্যিই খারাপ নাকি?' দাদা বলে দেবে খারাপ, তবে খারাপ হবে! দাদার কথাই বেদবাক্য, আর আমি যে এতক্ষণ বোঝালাম, মানা করলাম, চিৎকার করে মরলাম—সে কথাই না...

...আজকাল বড় হওয়ার পর কতদিন দেখেছি—দু'ভাই ঘরে বসে গল্প করছে। আমি হয়তো একটা কিছু বলবার জন্য কিংবা গল্প করবার জন্য গিয়েছি। অমনি নীলু ক্যাট-ল্যাট করে ইংরেজিতে দাদার কাছে কী যেন সব বলবে। বলে হো-হো করে হেসে উঠবে! আমি বুঝি যে আমার সম্মুখে একটা কী যেন বলা হল—কিছু ঠাট্টা-টাট্টা হবে বোধহয়। আর ইংরেজি করে গুরুজনের নামে কিছু বললে তো দোষ হয় না! কী শিক্ষাই সব হয়েছে! বিলু বলে, 'মা' রাগ কোরো না। নীলু রাগের কথা কিছু বলেনি। কেন নীলু মিছিমিছি মাকে চটাস?'

---

১ ভুট্টার খই। ২ ষষ্ঠ। ৩ এই অঞ্চলে প্রচলিত নিকার মতো একপ্রকার বিবাহপ্রথা, ইহাতে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর ভিতরে বিধবাদের এই প্রথায় বিবাহ হয়। উচ্চতর সমাজে এই বিবাহ ভাল বলিয়া গণ্য হয় না। ৪ স্বামী।

আমি আর তোদের কাছে কী চাই? দুটো মিষ্টি কথা বলেও উপকার করতে পারিস না? দিনের মধ্যে কত গল্পইবা নীলু তুই আমার সঙ্গে করিস? তাও কি ঐ ঠ্যাঙা-মারা ঠ্যাঙ-মারা কথা না বললেই নয়? আবার হাসছিস, লজ্জা করে না! ছোটবেলা থেকেই একই রকম থেকে গেলি। 'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনশ্চ ন মুঞ্চতি।' নীলু আবার হেসে ওঠে। ভুল বলেছি বুঝি!

'জমাদারনী! জমাদারনী! এ মনচনিয়া! বাঙালী মাইজী ঘুমুচ্চে নাকি?'

কোথায় জমাদারনী, কোথায় মনচনিয়া। জমাদারনী বারান্ডার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, আর মনচনিয়া আমার পাশে বসে ঢুলছে। নর্মদাবেনের কথায় কে জবাব দেবে? আর জবাব না দিলেই ভাল। না হলে আবার খানিকক্ষণ মনচনিয়া হয়তো আমাকে জ্বালাবে। নর্মদাবেনের বাড়ি আহমদাবাদে। খুব বড়লোকের মেয়ে। বিলেতফেরত; হাবভাব ও পোশাকটি ছাড়া বাকি সব মেমসাহেবদেব মতো। মহাত্মাজীর আদরের শিষ্যাদের মধ্যে তিনি একজন। গায়ের রং ফুটফুটে ফর্সা, পরনে খদ্দরের শাড়ি। জামসেদপুরের মজুরদের সেবার জন্য বিহারে এসেছিলেন। সেখানে থেকে গ্রেফ্তার হন। আমাদের ওয়ার্ডের সম্মুখেই আছে একটি ছোট ঘর। আগে ঘরখানি আঁতুড় ঘরের জন্য কিংবা কারও ছোঁয়াচে রোগ হলে, তাকে আলাদা রাখবার জন্য ব্যবহার করা হত। নর্মদাবেন ইংরাজিতে কথা বলে; কাজেই সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে ওর খুব আলাপ। তাঁকে বলে ও ঐ ঘরটায় চলে গিয়েছে। সেখানে একলাই থাকে। বড়লোকের মেয়ে; এখানে আমাদের সকলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে ওর একটু অসুবিধা হচ্ছিল! ঘরখানাকে খুব সাজিয়েছে! কত পর্দা, কত টেবিলক্লথ। চারদিকে ফুলেরবাগান করেছে। দিনরাত্তির সেই বাগানে টুকটাক কাজ করছে। প্রত্যহ কত ফুল আমাকে দিয়ে যায়। এখনও মাথার কাছে রয়েছে ওরই দেওয়া একটা কাঁচের ঘটির মধ্যে কত ফুল। ফুলগুলো যেন কাগজের ফুলের মতো দেখতে। একটুও গন্ধ নেই। বিলু থাকলে নিশ্চয়ই নাম বলে দিত। আশ্রমে বিলু কত যে ফুলের গাছ পুঁতেছিল তার কি ঠিক আছে? যে কোনো নতুন মরসুমী ফুল ফুটবে, আমাকে সে ফুলের নাম শোনানো, ওর চাই-ই চাই। আমার কি ছাই অত ইংরিজি নাম মনে থাকে? নর্মদাবেনের বিলুরই মতো ফুলের শখ বলে তাকে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু সে আমাকে এত ফুল দেয়—আমি ফুলের মর্ম কী বুঝি? এ তো কেবল 'বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো।' বিলুকে যদি রোজ সেলে কিছু ফুল পাঠাতে পারত, তবে তো বুঝতাম তোমার ইংরিজির জোর। নর্মদাবেন সাহেবকে বললে, সাহেব নিশ্চয়ই প্রত্যহ সেলে ফুল পাঠাবার অনুমতি দিত। সেই মনে করেই নর্মদাবেনকে একদিন বিলুর ফুলের শখের কথা গল্প করেছিলাম। সেকথা ওর মাথায় ঢুকবে কেন? বিলেতে গিয়ে কি ধানচাল দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিল? বিদ্যে হল এক জিনিস, আর বুদ্ধি হল আর এক জিনিস। সেইদিন থেকে একরাশ করে ফুল, আমার এখানে দিয়ে যায়। আর সাহেবের কাছে অনুরোধ করার সময়, করা হল কিনা নিজের 'ইউরোপীয়ান' ডায়েটের জন্যে। সাহেব প্রত্যহ নর্মদাবেনের জন্যে নিজের বাড়ি থেকে, একখানা করে চোকলভরা আটার পুঁউরুটি পাঠিয়ে দেয়। আর আমার মনের কথা ওকে পরিষ্কার করে বলতেও কেমন বাধবাধ লাগে। ও মেয়ে কিন্তু বড় লেকচার দেয়। কথকঠাকুরের মতো যখন-তখন দিনের বেলায় এসে আমাদের বোঝাবে সত্য আর অহিংসার কথা। হিন্দী তো বলেন আমারই মতো! ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কী সব বলে, তার অর্ধেক

কথা ছাই বোঝাও যায় না। কেবল মধ্যে মধ্যে কানে আসে সত্য, অহিংসা আর বাপুজী। যদি এসব লেকচারই দিতে হয়, তাহলে কথকঠাকুরের মতো মিষ্টি করে এসব বলতেও শিখতে হয়। গান্ধীজীর আশ্রমে এসব লেকচার শেখায় নাকি? না—বিলু তো একবার গিয়েছিল সবরমতীতে—সে তো সেকথা কখনও বলেনি। আচ্ছা এত লোক থাকতে নর্মদাবেন আমাকেই কেন এসব কথা বেশি করে শোনাতে আসে? ওকি ভাবে যে আমি সত্যি কথা বলি না; না অন্যের গয়নাগাটি দেখে হিংসায় ফেটে মরি? আর ওসব কথা আমাকে কী শোনাবে! আজ বিশ বচ্ছর ধরে ওসব শুনতে শুনতে কানে পোকা পড়ে গিয়েছে। কত বক্তৃতা বলে শুনলাম—আর নর্মদাবেন ভাবছেন আমাকে নতুন কথা শোনাচ্ছেন···সেই প্রথম প্রথম যখন নতুন আশ্রম হল উনি আমাকে এসব কথা কত বোঝানোর চেষ্টা করতেন। আমার মন তখন নীলু বিলু আর সংসারের উপর পড়ে রয়েছে। ওসব কথা জানবার আমার ইচ্ছেও নেই, বুঝতেও পারি না। এ কান দিয়ে শুনি, ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমার লাভের মধ্যে একটু কেবল মনে হত যে এর মধ্যে দিয়ে তাঁর একটু কাছে আসতে পারছি। উনি চিরকালই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ওঁর সঙ্গে কি কোনোদিন প্রাণ খুলে কথা বলতে পেরেছি। মন খুলে কথা বলব কী—ভয়েই মরি। আমাদের তো ঠিক অন্য সবার মতো নয়। স্বামীর সঙ্গে মনে যে কথা আসবে সে কথা না বলা,—হাসি এলে হাসি চাপা, সব সময় এই কী করে ফেললাম এই কী করে ফেললাম ভাব, এর দুঃখ ভুক্তভোগীই জানে।···তিনিই আমাকে শেখাতে আরম্ভ করলেন—চরখার কথা উঠলে, মহাত্মাজীর কথা উঠলে, দেশের কথা উঠলে হিন্দুস্থানীদের সম্মুখে কী বলতে হবে। এদেশে তো আর কেউ 'চরখা আমার ভাতার পুত, চরখা আমার নাতি' এ কথা বুঝবে না—এখানে তো অন্যরকম কথা বলতে হবে। তাই উনি হিন্দীতে কত ছড়া শিখিয়েছিল। ওঁরা কত জায়গায় নিত্যি লেকচার দেন,—ওঁদের ঐ সব ছড়া-পাঁচালির দরকার হয়।—কবেকার কথা হল ভুলেও গিয়েছি ছাই! একটা কী যেন ছিল; স্বামীর আবার দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে। বৌ তা বুঝতে পেরেছে। পেয়ে বলেছে, 'ইচ্ছে যখন তোমার হয়েছে তখন বিয়ে করো। আমার জন্যে ভাববার দরকার নেই, আমার তো চরখা সম্বল থাকল।' এরকম আরও কত গল্প উনি শিখিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যে আমিও হয়তো তাঁর মতো লেকচার দিয়ে বেড়াতে পারব। পরে যখন উনি বুঝলেন যে আমার দ্বারা এ সব কিছু হবে না, এ সকল ভস্মে ঘি ঢালা, তখন উনি হাল ছেড়ে দিলেন। আমিও হাল ছেড়ে দিয়ে বাঁচলাম। তুমি সব ছেড়েছুড়ে এদিকে এসেছ, বেশ করেছ, আমি তো তাতে বারণ করিনি। আমাকে সারা-জীবন কষ্ট সইতে হবে, তার জন্যও আমি তৈরি। জেলে আসতে বলেছ, জেলেও এসেছি। তাই বলে এক হাট লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'পেয়ারে ভাইয়ো' সে আমার দ্বারা হবে না। তোমার আশ্রমের সংসার চালানো, ছেলে মানুষ করা, সেও তো একটা কাজ।

রামগড় কংগ্রেসের আগে, তোমার কথা শুনে বাভনগামায় গিয়ে কী অপ্রস্তুত! —পাটনা থেকে চিঠি এসেছে যে শীগ্‌গির জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবিকা পাঠাও। জোর তাগিদ। এখনই তাদের ট্রেনিং দিতে হবে, নইলে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তারা তৈরি হতে পারবে না। মহারাষ্ট্র থেকে একজন ভদ্রমহিলা এসে রামগড়ে বসে রয়েছেন, স্বেচ্ছাসেবিকাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে। গেল রাজ্য, গেল মান! জেলার ইজ্জত আর বুঝি বাঁচে না। জেলে যাবার মতো মেয়েছেলে তো বলতে গেলে জেলায় পাঁচটি—আমি, হরদার দুবেইন, বহুরিয়াজী, বুড়হিয়াধানকাট্টার সারলা দেবী, আর চোপড়ার

খাদিজন্নিসা ; তাঁরও আবার চোখে ছানি পড়ায়, কয়েক বছর থেকে আর বাড়ি থেকে বেরুতে পারেন না ! সরস্বতী তো এবারে এসেছে।...তখন আমার উপর হুকুম হল যে কোড়হা থানার সব কংগ্রেসকর্মীর বাড়ি বাড়ি যাও। জোর করে তাদের বাড়ির মেয়েদের দস্তখত 'স্বয়ং-সেবিকা-প্রতিজ্ঞাপত্রে' করিয়ে আনতে হবে। ব্যাটাছেলেরা গেলে হবে না, তোমাকেই যেতে হবে।...যারা যাবে তারা কেমন ফাঁকি দিয়ে বিনা পয়সায় কংগ্রেস দেখে নেবে ; কোনো রকম বয়সের বন্ধন নেই ; বেশি বয়সী ভদ্রমহিলা হলে তাঁকে খুব হালকা কাজ দেওয়া হবে, যেমন অন্য স্বেচ্ছাসেবকদের ছেলেপিলে সামলানো, ভাড়ারের চাবি রাখা, কিংবা ঐ গোছের কিছু ; এই রকম কত টুকিটাকি উপদেশ উনি যাবার সময় আমাকে দিয়ে দিলেন। ভলান্টিয়ার মিশ্র, আমায় গরুর গাড়ি হাঁকিয়ে তো বাভনগামায় নিয়ে এল। দুপুরবেলায় পাড়ায় সব মেয়েছেলেরা ঝা-জীর বাড়ির উঠোনে জড়ো হয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে গল্প করছি—কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবিকা হওয়ার কথা। কতরকম কথা সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করছে—জুতো না পারলে চলবে কিনা ; ঘোড়ায় চড়তে হবে কিনা ; সিঁদুর লাগানো, আর 'এতোয়ার'[১] করা বারণ কিনা ; আরও কত অবান্তর প্রশ্ন। তারপর জনকয়েক রাজী হল—অবশ্যি যদি তাদের ব্যাটাছেলেদের আপত্তি না থাকে সেই শর্তে। আবার ছুটলাম বাড়ির কর্তাদের কাছে। সকলের সঙ্গে মোটামুটি জানাশোনা আগে থেকেই ছিল—কত দিন তারা সব আশ্রমে গিয়ে থেকেছে। তারাও প্রথমটা আমতা আমতা করে ; পরে যেই একজন রাজী হয়ে গেল, অমনি সকলেই রাজী। আমি তখন প্রতিজ্ঞাপত্রগুলো নিয়ে আবার গেলাম বাড়ির ভিতর, সেগুলোতে দস্তখত করানোর জন্যে। কালি এল, কলম এল, কয়েকজনের দস্তখত, টিপসই হল। ঝা-জীর মেয়ে শকুন্তলা ফর্মে দস্তখত করবার আগে কাগজখানা জোরে জোরে পড়ল—'মৈঁ দেশকে বাস্তে হর তরহকী কুর্বানীকে লিয়ে তৈয়ার হুঁ'।[২] 'অ্যাঁ, কুর্বানী কি ? এটা তো ঠিক বুঝলাম না। হ্যাঁ বাঙ্গালী মাই, দেশের জন্য সব কুর্বানী করব, এ কথাটা লিখিয়ে নেওয়া কি তোমার ঠিক হল ?' প্রথমে সবাই ছিল নরম। বেলগরামিয়ার নানী প্রথমটা একটু চটে আমাকে বলল, 'আমরা অতশত মহাৎমাজী-ফাহৎমাজী বুঝি না ; এ তোমার কেমন ব্যবহার ? তোমরা মুসলমান হতে চাও হওগে না, আমাদের জাত নিয়ে টানাটানি কেন ? এই কম্মর জন্য তুমি আশ্রম থেকে এত দূরে উজিয়ে এসেছ ? ছি ! লজ্জাও করে না। গরু হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবতী...।আমাদের জাত মারবার দস্তখত করা প্রমাণ নিয়ে যেতে এসেছে'—সবাই মিলে আমার উপর পড়ল ! আমারও এ কথার কোনো উত্তর যোগাল না। সত্যিই তো কুর্বানীর কথা এতে লেখা থাববে কেন ? উনি আসবার আগে এত কথা বুঝিয়ে দিলেন আর এ কথাটা বুঝিয়ে দিলেন না ? বোধ হয় হিঁদুদের প্রতিজ্ঞাপত্রের বদলে মুসলমানদের প্রতিজ্ঞাপত্র এসে গিয়েছে। আমার তখন ভয়ে গা দিয়ে ঘাম বেরুতে আরম্ভ হয়েছে। ওদের বোঝালাম যে আমি তো হিন্দী জানি না, বোধ হয় কাগজ বদল হয়ে গিয়ে থাকবে। তাদের রাগ কি তবু পড়ে ? তারপর বাইরে ঝা-জীর কাছে গিয়ে বললাম, 'আর একদিন আসতে হবে, অন্য প্রতিজ্ঞাপত্র সঙ্গে করে।' ঝা-জী প্রতিজ্ঞাপত্র পড়ে হেসেই খুন। বলে, 'এ তো ঠিকই লিখেছে। হিন্দীতে কুর্বানী মানে ত্যাগ।' দ্যাখো দেখি কী কান্ড ! কোথায় কুর্বানী আর কোথায় ত্যাগ ! আমি কি ছাই অত জানি ! আমি না হয় না জানতে পারি, উঠোনে মেয়েছেদের মধ্যে কেউ

১ রবিবার। ২ 'আমি দেশের জন্য সকলপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।'

ও কথার মানে জানে না? তবে অমন কথা লেখার দরকার কী? যাদের জন্য লেখা তারাই বোঝে না, তবুও লেখা চাই। নম নম করে তো সেদিনকার কাজ শেষ হল। আমি আশ্রমে ফিরে এসে বললাম, 'এই রইল তোমাদের কাগজ। এ কাজের পায়ে শতকোটি দণ্ডবৎ! আর যদি আমি কোনো কংগ্রেসের কাজে বাইরে গিয়েছি।' নীলু এ নিয়ে আমাকে কত ঠাট্টা করে।…

সখাবতীজীর ছেলেটা চ্যাঁচাচ্ছে, 'বাঙ্গাজী, বাঙ্গাজী'। আমাকে বলে বাঙ্গাজী। আমার ভারি ন্যাওটা। দিনরাত্তির আমার কাছে ঘুরঘুর করবে—মতলব কোলে চড়ে বসে থাকা। খুব যখন দুষ্টুমি করে, আর কথা শোনে না, তখন ওর মা ওকে আমার কাছে দিয়ে যায়। আমার কোলে চড়ে শান্ত। ছেলেটাকে নিয়ে এলে হত। মনচনিয়া তো কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন তো ওর জাগবার কথা না। এখন ডিউটি গলকাট্টির। সেটাও তো দেখছি পাখা হাতে করে পাশে বসে ঢুলছে। সারাদিন 'ডালের খুদ বাছা'র কম্যান্ডে কাজ করেছে। এখন সারারাত কি জেগে থাকতে পারে? জেলে এসেছে বলে তো ঘুম-টুমগুলো বাড়িতে থুয়ে আসেনি। কীই বা দোষ করেছিল? এক লক্ষ্মীছাড়া স্বামীর অত্যাচারে জ্বলেপুড়ে ও গিয়েছিল আত্মহত্যা করতে। ক্ষুর দিয়ে নিজের গলাটা নিজে কী করেই কেটেছিল! ভাবলেও গা-টা শিউরে ওঠে। এখনও গলার দিকে তাকানো যায় না। ঘাটা নেই। কিন্তু গলার নলী কেটে এতখানি হাঁ হয়ে রয়েছে। নলীর ভিতরটা দেখা যায়। ঐ কাটাটার উপর চব্বিশ ঘন্টা একখানা গামছা দিয়ে চেপে বেঁধে রাখে। বলে যে, না হলে কথা বলবার সময় ফ্যাস্‌ফ্যাস্‌ করে তার মধ্যে দিয়ে হাওয়াটা বেরিয়ে যায়, আর খাওয়ার সময় তার মধ্যে দিয়ে খাওয়ার জিনিস বেরিয়ে আসে। এমনি গামছা জড়ানো থাকলেও জল খাবার সময় গামছাটি অল্প ভিজে যায়। দ্যাখো দেখি একবার পড়াকপালীর বরাতখানা। মরলে নিজেও বাঁচত, স্বামীটারও হাড় জুড়োত। তা মরলও না কিছুই না। মাঝ থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করার জন্যে এক বছরের জেল হয়ে গেল। কী যে এদের আইন! নিজের প্রাণটার উপরও অধিকার নেই। যে মরতে চায় না তাকে দেয় ফাঁসি; আর যে মরতে যায়, তাকে নিয়ে আসে ধরে জেলে।

ছেলেটা পরিত্রাহি চিৎকার করছে। ওটা গলা ফেটে মরল—ওর মায়ের কী আক্কেল বলো তো! আহা! ছেলেটা আজকে সারাদিন আমার কাছে আসতে পায়নি! সখাবতীজী ছেলেকে বলছে—'লাড্‌লী-ই বাঙ্গাজীকে পাস জ্যাভ্‌নকী'—বাঙ্গাজীর কাছে যাবে নাকি লাড্‌লী। 'বাঙ্গাজীর যে আজকে অসুখ করেছে। কাল সকালে যেও। অসুখ করলে তার কাছে যেতে হয় নাকি?' ছেলেটা খানিকক্ষণ চুপ করে বোধ হয় কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করছে। তারপর আবার আরম্ভ হয় তার কান্না। 'বাঙ্গাজী…'। সখাবতীজী চটে গিয়েছে ছেলের উপর। 'ঐ দ্যাখো ওখানে গলকাট্টি আছে ধরে নেবে।' ছেলেটা চুপ করে; বোধ হয় ভয়ে। আবার আরম্ভ হয় তার একটানা চিৎকার 'বাঙ্গাজী-ই…'। আবদার। কী জেদ বাবা ছেলের। এতটুকু ছেলের এত জেদ।…ঠাস ঠাস করে ছেলেটাকে মারছে রে। মা'টার কী একটুও দয়ামায়া নেই। গলকাট্টি, এই গলকাট্টি শীগ্‌গির লাড্‌লীকে এখানে নিয়ে আয় তো। গলকাট্টি ভাঙা ভাঙা গলায় জবাব দেয়, 'ও ছেলে কি আমার কোলে আসবে নাকি!' গলকাট্টিটা কী কুঁড়ে! ঘুম আসছে, উঠতে ইচ্ছে করছে না—একটা ছুতো দেখানো হল। আমায় গলকাট্টিকে ডাকতে শুনে, বহুরিয়াজী, কামল, সবাই এসে জিজ্ঞাসা

করে, 'কী বলছেন, একটু জল খাবেন নাকি?' এইরে! কেন মরতে গলকাট্টিকে ডাকতে গেলাম! এরা সব এখানেই চুপটি করে বসে আছে তা কি আমি জানি। সত্যিই তো গলকাট্টিকে দেখে তা ছেলেটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। লুসী জমাদারনীর কাছ থেকে কাপড়কাচা সাবানের বদলে আমাদের ওয়ার্ডের সকলে মধ্যে মধ্যে বিড়ি নেয়। আর গলকাট্টিকে সেই বিড়ি দিয়ে সবাই মিলে মজা দ্যাখে—কাটাটার মধ্যে দিয়ে কী করে ধোঁয়া বেরোয়। গলকাট্টিকে চারটে বিড়ি দিলে, সে একবার গলার গামছা খুলে ধোঁয়া বের করে দেখাবে; লাড্‌লী কিন্তু এইসব দেখে ভয়ে নীল হয়ে যায়, আর আমাকে আঁকড়ে ধরে। ও তো ছেলেমানুষ, অনেক বয়স্থ লোকেও সে দৃশ্য দেখলে ভির্মি খেয়ে পড়ে যায়।…

আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বহুরিয়াজী, ঢুলন্ত গলকাট্টিকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'বাঙ্গালী মাইজী কি বলছিল রে?'

'মাইজী বলছিল লাড্‌লীকে নিয়ে আসতে।'

'তা বলতে হয়। আমিই নিয়ে আসছি তাকে। গলকাট্টি, তাহলে তুই ঐ দরজার উপর গিয়ে খানিকটা বোস। তুই থাকলে তো ছেলে এখানেও চেঁচাবে। লাড্‌লী ঘুমিয়ে পড়লে, আবার এখানে এসে বসিস'খন।

গলকাট্টি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বহুরিয়াজী ছেলেটাকে এনে আমাকে দিল। লাড্‌লী একেবারে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে। শুবি নাকি, শুয়ে পড়, আমি একটু পাখা করি। রাতদুপুরে লক্ষ্মী ছেলেরা জেগে থাকে নাকি? কী কথা শোনে আমার লাড্‌লী! কোথায় গেল কান্না, কোথায় গেল আবদার; লাড্‌লী আমার বুক ঘেঁসে শুয়ে পড়েছে। আমি ওর হাতে, শোয়া অবস্থাতেই নর্মদাবেনের দেওয়া একটি ফুল গুঁজে দিই। আর বলি, কাল সকালে সব ফুলগুলো দেব। ও হাতের ফুলটা ফেলে দেয়। ওর এখন ফুলেরও দরকার নেই, কিছুরই দরকার নেই। ও যা চাচ্ছিল, তা পেয়েছে। একটু পাখা না করলে আবার মশায় খেয়ে ফেলবে। পাখা খুঁজছি দেখে বহুরিয়াজী একটু কাছে এসে বসল—পাখা করতে। এতক্ষণ সাহস পাচ্ছিল না—পাছে আবার আমি চটে যাই। আচ্ছা এ ছেলেটা আমাকে ভালবাসে বলে সখাবতীজী কি আমার উপর বিরক্ত হয়? মনে তো হয় না। তবে আমি কেন জিতেনের মা-দিদির উপর বিরক্ত হই? আমার চাইতে তো সখাবতীজীর মন অনেক ভাল বলতে হবে। সাধে কি আর নর্মদাবেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অহিংসার বুকনি ঝাড়ে। বহুরিয়াজীও লাড্‌লীটাকে ভারি ভালবাসে। ওর ছোট মেয়ে লজ্জার সঙ্গে লাড্‌লীর খুব ভাব ছিল কিনা। লজ্জার বয়স ছিল বছর পাঁচেক। কিন্তু সে মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। গ্রেফ্‌তারের পর বহুরিয়াজী চেয়েছিল যে লজ্জা যেন তার চাচীর কাছে থাকে। ও মেয়ে কিছুতেই মায়ের আঁচল ছাড়বে না। মহা মুশকিল। এদিকে তিন বছরের ওপরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জেলে আসবার নিয়ম নেই। দারোগাও বলে যে রেখে আসুন। তখন বহুরিয়াজী বাধ্য হয়ে দারোগার সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে যে কে বলল যে এর বয়স তিন বছরের ওপর। মেপে দ্যাখো। দেড় হাত উঁচু মেয়ের কখনও পাঁচ বছর বয়স হতে পারে? ওকে সঙ্গে না যেতে দাও তো দেখি তুমি আমাকে কি করে ধরে নিয়ে যাও। এখনি স্বরাজী ভলান্টিয়ারদের দিয়ে তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিয়ে দেব। দারোগাসাহেব ভাবলেন, দরকার কী এসব ফ্যাসাদে। লজ্জাকে সুদ্ধু সঙ্গে করে এনে জেলে পুরলেন।… দিনরাত লাড্‌লী আর লজ্জা একসঙ্গে খেলা করত। খেলা আর কি—লজ্জাটা

লাড্‌লীকে কোলে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরত। এখানে তো আর বেশী সঙ্গীসাথী নেই! মিশতে হলে অন্য ওয়ার্ডের, ছোটলোকের বদ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে হবে। তাদের আবার নানারকমের খারাপ রোগ। চব্বিশ ঘণ্টা নিজেদের মধ্যে গালিগালাজ করছে। তাদের সঙ্গে কি আমাদের ছেলেমেয়েদের মিশতে দিতে পারি। তাই আমরা সবাই ওদের অষ্টপ্রহর চোখে চোখে রাখতাম। আহা রে, মেয়েটা কাঁদনের রক্ত আমাশায় মারা গেল। মায়ের প্রাণ তো—বহুরিয়াজীর তারপর কী দুঃখ কান্নাকাটি। কেবল নিজের বুক চাপড়ে মরে, বলে—যদি আমি ওকে সঙ্গে করে না আনতাম, তাহলে হয়তো লজ্জার আমার এ দশা হত না। লাড্‌লীটাও লজ্জা মারা যাবার পর থেকে, যেন দিন দিন শুখিয়ে উঠছে। জেল থেকে ছেলেটা আধসের করে তো দুধ পায়। তাও আবার জেলের দুধ। মাখনতোলা মোষের দুধ জল মিশিয়ে কণ্ট্রাকটর নিয়ে আসে। তারপর গেটে, গুদামে, ওয়ার্ডে যত জায়গা হয়ে দুধটা আসে, সব জায়গার ওয়ার্ডার, মেট্‌, পাহারা আর কয়েদীরা, সবাই তার থেকে এক এক গ্লাস করে দুধ নিয়ে, কাঁচাই ঢকঢক করে খায়। এ একেবারে বাঁধা নিয়ম। আর এর মধ্যে কিছু লুকোচুরি নেই। কেবল একটা বাধ্যবাধকতা আছে, যিনিই এক গ্লাস দুধ তুলে নেবেন, তাঁকে মেহনত করে দুধের ড্রামের মধ্যে ঠিক এক গ্লাস জল মিশিয়ে দিতে হবে। সেই দুধ যখন এখানে এসে পৌঁছোয়, তখন তা এমনি জিনিস হয়ে দাঁড়ায় যে তা খেয়ে আর ছেলেপিলে বাঁচতে পারে না। ছোট ছেলেপিলেদের না দেয় জেল থেকে কাপড়-জামা, না দেয় খাওয়ার জিনিস; বোধ হয় ভাবে যে যারা দুধ ছাড়া অন্য জিনিস খেতে শিখেছে, তদের আবার মার সঙ্গে আসবার দরকার কী? দিব্যি পরিষ্কার উত্তর!···

আহা ছেলেটার পেটটা একেবারে পড়ে রয়েছে। কেন, মা রাতে খাওয়ায়নি নাকি? আমার জন্যে খাবার তো মাথার কাছে রেখে দিয়েছে। দেব নাকি কিছু খেতে? না থাক, ওসব খেয়ে আবার অসুখ-বিসুখ করবে, তখন আবার ওর মা ঠেলা সামলাতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়বে। কী নরম গা-টা! বিলু যখন ছোট ছিল, এমনি করে কোল ঘেঁষে শুয়ে থাকত। ঠাকুরের কোলে ও বসে—সেই ফটোখানা যখন তোলা হয়, তখন ও এত বড়ই হবে। ও কিছুতেই চুপ করে বসবে না। দূর থেকে আমি এক টুকরো মিছরি দেখালাম। সেই কথা ভেবে যখন মনের আনন্দে মশগুল, তখন নিতাই-ঠাকুরপো ওর ফটো তুলে নিল। সে কি আজকের কথা! অসুখের পর কি রোগা হয়ে গিয়েছিল! চব্বিশ ঘণ্টা খাই খাই মন করে,—তা বলে মুখ ফুটে গাঁ-গাঁ করে কান্নার অভ্যাস তো ওর কোনো দিনই ছিল না। আমি হয়তো ওকে তক্তারোশের উপর বসিয়ে রেখে ভাঁড়ারে কি রান্নাঘরে গিয়েছি, আর সেখানে কোনো কাজে আটকে পড়েছি। খানিক পরে এসে দেখি, ছেলের দুচোখ দিয়ে জল পড়ে বুক ভেসে যাচ্ছে। নিচের ঠোঁটটা একটু যেন বাইরে এসেছে, আর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমাকে দেখে ছেলের কী অভিমান, কী অভিমান! 'আমার আসতে দেরি হয়েছে বলে কাঁদছিস। মরে যাই, মরে যাই—কী লক্ষ্মী ছেলে আমার বিলু' এই বলে ওর মাথাটা বুকের দিকে টেনে নিলাম। আর ছেলে আমার ঠাণ্ডা—মধ্যে মধ্যে খালি একটু ফোঁপানির শব্দ। এখনও যেন সেই ফোঁপানির গরম ভিজে নিঃশ্বাস, থেকে থেকে গলার কাছে লাগছে। লাড্‌লী, তুই আমার সেই ছোটবেলার বিলু নাকি! তোর নরম নরম গাটাকে দেব নাকি একবার সেই রকম করে চটকে। না, এরা সব দেখছে। আবার কী মনে করবে। বিলুকে

এখন যদি একবার পেতাম, তাহলে একবার নিতাম বুকের মধ্যে টেনে। যতটুকু সময়ের জন্যে হোক না কেন, বুকটা তো একটু জুড়োত। দুজনে একসঙ্গে কেঁদে মনে একটু শান্তিও তো পেতাম। শেষ সময়টায় কাছে থাকব, এ উপায়টুকুও ভগবান রাখলে না। চারিদিকে লোহার গরাদ আর তালা। যুদ্ধে শুনি এত লোহা লাগে। বিলু গল্প করেছিল যে যুদ্ধের সময় কোথায় যেন গির্জার ঘণ্টা গলিয়ে কামান তৈরি করা হয়। আর তাদের কি জেলের ওই রাশি রাশি লোহার ওপর নজর পড়ে না? এতগুলো পোড়া বুকের নিশ্বাস যে যমের সিংহাসনও টলিয়ে দিতে পারে!

'বহুরিয়াজী, আচ্ছা সত্যি করে বল তো—ভগবান কি আমার উপর অবিচার করেননি?'

বহুরিয়াজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এ প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিল না। সে আমার কথার উত্তর দিল না। একবার নৈনাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে, কী যেন ইশারা করল। তারপর আমার মাথার চুলগুলোর মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আঙুল চালিয়ে দিতে লাগল, আর জোরে জোরে পাখা করতে লাগল। তোমার কাছে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম বটে কথাটা, কিন্তু জবাব চাইওনি, আশাও করিনি!

লাড্‌লীটা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এতটুকু ছেলে, কিন্তু নাক-ডাকানি ঠিক বড় মানুষের মতো। আহা রে! একদিকে কাত হয়ে শুয়েছে, আর রুপোর চাকতিগুলো কেটে কেটে যেন পেটের চামড়ার মধ্যে বসে গিয়েছে। কোমরের ঘুন্‌সির সঙ্গে, একরাশ রুপোর চাকতি ঝুলিয়ে রাখবে! সখাবতীজী ভাবে যে এতে বড্ড বাহার হয়। কতদিন বলেছি যে এটা জেলখানা, এখানে হাজার রকম স্বভাবের লোক থাকে, রুপোর লোভে কোন দিন ছেলেটাকে কি করে-টরে বসবে, তখন আর কেঁদে কুল পাবে না। তা কি সখাবতীজী শুনবে। ঐ ঘুন্‌সির মধ্যে ওর কী তুকতাক আছে কে জানে!...

বিলু যখন ছোট ছিল ওর কপালের উপরের চুলগুলোকে ছোট্ট একটা বিনুনি বেঁধে দিতাম। রোগা ছিল কিনা,—খেলেই পেটটা গণেশ ঠাকুরের মতো উঁচু হয়ে উঠত। ওকে ভুলোবার জন্য খাওয়ার পর বলতাম, 'ব্যস্‌ এইবার হয়ে গেল—এইবার উঠতে হবে - বা-বা-রে!' অমনি নিজের পেটটা দেখিয়ে বলবে, 'বাতাবি বাতাবি করে দাও।' কবে একদিন ওর পেটে হাত বুলিয়ে বলেছিলাম, 'বাতাবি ভস্মরাশি! বাতাবি ভস্মরাশি! সব সহজ হয়ে যাবে—বিলুবাবুর আর অসুখ করবে না।' সেই কথা মনে করে রেখেছে। ভাত খাবার পর সেইজন্যে ওকে প্রত্যহ পেটে হাত বুলিয়ে 'বাতাবি' করে দিতে হবে। তারপর পিঁড়ি থেকে ওঠবার সময় হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বলবে, 'বাবারে।' একেবারে বুড়োমানুষের মতো ভাব—যেন ওর উঠতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।...

কতদিনের কত ছোট ঘটনা, একের পর এক মনের মধ্যে আসছে। বিলু এত কষ্ট করে তোকে মানুষ করে তুলেছিলাম—অমনি করে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবি? আমার দুঃখের কথা মনে করে তুই শেষ সময়টায় দুঃখ পাস্‌নে যেন। এমনিই তো তোর কষ্টের বোঝা, আমি কিছুতেই হালকা করতে পারলাম না। এখন তার মনের ওপর দিয়ে কী যাচ্ছে, তা কি আমি বুঝি না। তার ওপর আমার কথা মনে করে, তোর যদি বুকের বোঝা বাড়ে তাহলে আর আমার দুঃখের শেষ থাকবে না। তুই এখন মনে কর যে তোর মা তোকে একটুও ভালবাসত না।

নৈনাদেবী বহুরিয়জীর সঙ্গে গল্প করছে—স্বরটা একটু গরম গরম—'তাহলে বাপু ভগবানকে এর মধ্যে টানা কেন? সাজা দিলে সরকার, আর উনি দোষ দিচ্ছেন ভগবানের। সেই গল্প আছে না—এক বামুনের এক ঘোড়া ছিল। বামুনের প্রতিবেশী ছিল এক ধোপা। বামুনমশাই যেই পুজো করতে বসতেন অমনি ধোপার গাধাটা বিকট চিৎকার আরম্ভ করত—বামুনঠাকুর তাই চটে-মটে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন—'হে ভগবান, দ্যাখো, এই গাধাটা কিছুতেই তোমার পুজো করতে দেবে না। তোমাকে ডাকতে গেলেই ওটা বাধা দেয়। ওকে তুমি মেরে ফ্যালো।' দিন কয়েক পর বামুনঠাকুরের ঘোড়াটা অসুখ করে মরে গেল। তখন বামুনঠাকুর ভগবানকে বললেন—'ভগবান, এতদিন ধরে ভগবানগিরি করলে, কিন্তু এখনও কোনটা ঘোড়া কোনটা গাধা চেনো না?'—এ হয়েছে তাই। ভগবানের এর সঙ্গে কী সম্বন্ধ?'

নাক না টিপেও নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করা যায়, কিন্তু কানে আঙুল না দিয়ে শোনা বন্ধ করা যায় না কেন? এখন কানে আঙুল দেওয়াও ভাল দেখায় না। সবাই দেখছে।…ও বিষমুখীকে আমি চিনি না! ও বহুরিয়াজীর সঙ্গে গল্প করছে না আরও কত। খানিক আগে ওর সঙ্গে একটু রুখে কথা বলেছিলাক কি না, তারই বিষ এখন ঝাড়া হল। তখনই আমি জানি, ওকি ছেড়ে কথা বলার মেয়ে। একটা রাতেরও সবুর সইল না। আজকে রাতটার জন্যেও আমাকে মাফ করতে পারলে না। তুমিও তো ছেলের মা! যে না পদের গল্প; না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। কোথাকার শোনা গল্প; মনে করল যে খুব পাণ্ডিত্য ফলালাম। একি, নৈনাদেবী এরই মধ্যে চুপ করে গেল যে। বোধ হয় বহুরিয়াজীর কাছে আমল পেল না।…

বিলু নীলুর কেবল ছোটবেলার কথাই মনে পড়ে কেন? বোধ হয় ওরা আমার কাছে সেই ছোট্টটি থেকে গিয়েছে।…

…দুজনে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আমি কাজকর্ম সেরে ঘরে ঢুকে বললাম, 'কেয়া বচকন আওর ছুট্‌কন ঘুমতে হো?' বিলু বচকন আর নীলু ছুট্‌কন। অমনি দুজনে হো-হো করে হেসে উঠবে। আর নীলু বলবে, 'কতদিন মাকে বলে দিয়েছি, হিন্দীতে ঘুমতে হো মানে ঘুমোচ্ছে হয় না, ওর মানে হচ্ছে ঘুরছে, তাও মা'র মনে থাকবে না।' বিলু বলবে, 'বোকা কোথাকার। ও তো মা জেনে-শুনে ইচ্ছে করে বলেছেন—আমাদের হাসানোর জন্যে।'…এত টুকু টুকু ছেলে; দুজনে কী গম্ভীর হয়ে পণ্ডিতের মতো আলোচনা করে। সেই সময় যদি ওরা এই গান্ধীজীর রাস্তায় না আসত! আসা না আসার ভার কি ওদের ওপর? সে তো কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। এখন যদি একবার বিলুর বাবাকে কাছে পাই তাহলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিই যে, দ্যাখো, বাপ হয়ে ছেলেদের কী পথে এনেছ? সারাটা জীবন আমার একই রকম গেল। নিজে একদিন শান্তি পেলাম না। ছেলেদের একদিন হাসিখুশি ফুর্তিতে থাকতে দিতে পারলাম না। সারাজীবন ধরে যে উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এসেছি, সে কি এরই জন্যে? ছেলেরা যখন ছোট ছিল, তখন ইচ্ছে হয়েছে যে এদের টেনে বড় করে দি। বড় হলে ওরা নিজের রাস্তা বেছে নেবে—ব্যাটাছেলের আবার ভাবনা কী? তারপর ওরা ঘরসংসার করবে। সে কথা ভাবলেও শান্তি! কিন্তু হল কী? বড় ছেলেটাকে তো পড়ালেই না! আর যেটা পড়লো সেটারও

এই দিকেই মন ! এবার জেল থেকে বেরোতে দাও—আর আমি নীলুকে এই রাস্তায় থাকতে দি ! ছোট ভাই-এর কাছে লাথি-ঝাঁটা খেতে হয় সেও স্বীকার, তবু নীলুকে সেইখানে পাঠিয়ে দেব। একটা কিছু রোজগারের ব্যবস্থা সে নিশ্চয়ই করে দেবে। আমাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিলে ; আমি তোমার আশ্রমের হোটেলে দাসীবাঁদীরও অধম হয়ে চালিয়ে যাব চিরকাল—তাই বলে আমার ছেলেকে আর আমি এর মধ্যে রাখি ! অনেক মুখ বুঁজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয় ! আমার সহ্য করার দাম কড়ায় ক্রান্তিতে চুকিয়ে দিয়েছ। তোমার হুজুগ, তোমার শখ গান্ধীজীর সেবা করা ; আমার কথা, ছেলেদের কথা একবার ভেবেছ ? এক একদিন এক এক হুজুগ তোমার। দিনকতক ছোলা খেয়েই থাকলে। দিনকতক রোজ বেথুয়ার শাক চাই। দিনকতক খালি বিলিতি বেগুনের শরবত। কাঁচা পটল খেয়ে সেবারে কী অসুখ হল। একবার হুকুম হল বিলিতি বেগুন খাওয়ার সময় আস্ত দেবে ; কামড়ে কামড়ে খাওয়াই নাকি গান্ধীজী বলেছেন ভাল। কাটতে গেলে মিছেমিছি সময় নষ্ট। গান্ধীজীর আশ্রমে নাকি এই নিয়ম জারি করা হয়েছে। চলল আমাদের আশ্রমেও সেই নিয়ম। ওমা, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, একদিন হুকুম হল যে ও নিয়ম আর চলবে না। সেবাগ্রাম আশ্রমে বিলিতি বেগুন খাওয়ার নিয়ম বদলে গিয়েছে। মহাদেব দেশাই কাগজে লিখেছেন যে গান্ধীজীর মতে গোটা বিলিতি বেগুন কামড়ে খাওয়া ঠিক না। যেই কামড় দেওয়া যায়, আর অমনি কাপড়-চোপড়ে ছিটকে বিলিতি বেগুনের রস পড়ে। —আর কী কথা আছে ! সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও তাই করতে হবে। এতদিন কি কামড় দেওয়ার সময় চোখ বুঁজে থাকতে নাকি ? আদিখ্যেতা না ? দিনের মধ্যে ভাত ছাড়া আর পাঁচটি জিনিস খাব, গোনা পাঁচটা। ছ'টা খেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সারা জীবন কি এত গুনে হিসাব করে চলা যায় ? গাওয়া ঘি না হলে খাব না ;—এদেশে কি গাওয়া ঘি পাওয়া যায় ? পদে পদে জ্বালাতন। আর সেকি কেবল এই গান্ধীজীর রাস্তায় এসেই নাকি ? তার আগেই বা কী ? চাবিটা থাকবে নিজের কাছে—ইস্কুলে যাবার সময় একটা টাকা আমাকে দেওয়া হল বাজার খরচের। আমার কাছে চাবি রাখলে কি আমি সব টাকাকড়ি নিজের পেটে পুরতাম নাকি ? না তোমার ভাণ্ডার উজাড় করে আমার বাপের বাড়ি পাঠাতাম ? কী ভাবতেন, কে জানে। সে কথা কোনো দিন জিজ্ঞাসাও করিনি, তা জানবার প্রবৃত্তিও ছিল না।...ছোটলোকদের সম্মুখে একদিন কী অপমানই না হতে হয়েছিল !—তেলী-বৌ সকালে স্কুলের কোয়ার্টারে তেল নিয়ে এসেছে। দোকানের তেল ভাল না। তাই তেলী-বৌকে উঠানে ডাকিয়ে তার কাছ থেকে এক টাকার তেল নিলাম, আর বলে দিলাম যে বাইরের ঘরে বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নে। ওমা খানিক পরে তেলী-বৌ এসে আমার উপর কী তম্বিগম্বি—দাও এখনি তেল ফেরত দিয়ে, মিছেমিছি আমার এ সময় নষ্ট করলে। বাবু বলল যে তেল কে নিতে বলেছে ?—অপমানে আমার মাথা কাটা গেল। সে সব কথা একটা একটা করে মনে গাঁথা আছে। তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছ সত্যি—কিন্তু আমাকে তো একটুও স্বাধীনতা দাওনি। কতদিন ভেবেছি যে ছেলেরা বড় হলে এ কথা একদিন ছেলেদের বলব। কিন্তু বলি বলি করে বলা হয় নি। ছেলেদের কাছে কি এ কথা বলা যায় ? তোমার কথার ওপর কোনো দিন একটি টু শব্দ করিনি। কেবল ছেলেদের মুখ চেয়েই রয়েছি এতদিন। আমার নিজের যা হয়েছে তা হয়েছে। তার জন্য একটুও ভাবি না। কিন্তু তোমার জন্যে, আমার ছেলের এই হল। আমার সংসার

ছারখার হয়ে গেল। তোমার জন্যে, আমার নিজের পেটের ভাই, যার বাড়িতে থেকে কত বাইরের ছেলেরা পড়ে, সে তার ভাগ্নেদের খোঁজ নেয় না। বীরেনের মা, যে বীরেনের মা, সে সুদ্ধ এসে একদিন কত কথা শুনিয়ে গেল ; কত মুখ ঝামটা দিয়ে গেল। বাঙালী বলে তার ছেলের ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের চাকরিটা নাকি কংগ্রেস খেয়েছে। আমাদেরই মুখের উপর বলে গেল—মাস্টার মশাই না ছাই ; এম. এ. গাধা ; মোড়লি করার জন্যে কংগ্রেসে আছে, বাঙালীদের মুখে চুনকালি দিয়ে। এখন আমার এমন হয়েছে যে, যে দিকে তাকাই—অন্ধকার !···

গান্ধীজী, তুমি আমার এ কী করলে ? তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছ ; সত্যিকারের ভিখিরি। তুমি মাসের শেষে হাতে তুলে কিছু দেবে, তবে আমরা চারটি খেতে পাব। নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে তোমার পুজো করেছি ; তোমার জন্যে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়েছি ; হাসতে ভুলেছি। তার প্রতিদান তুমি খুব দিলে। তোমার দেখানো রাস্তায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না, বাপ-ছেলেতে ভালবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়। নিজের ইষ্টমন্ত্র ছেড়ে দিয়ে সন্ধ্যায় তোমার নাম জপ করেছি ; কত বছর আগে আমাদের আশ্রমে যে জায়গাটায় তুমি বসেছিলে, সেখানটায় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালিয়েছি; একদিনের জন্য চরখা কাটা ছাড়িনি, সে এরই জন্যে ? মেথরকে হরিজন বলেছি, তার ল্যাংটা ছেলেটাকে নীলু-বিলুর সঙ্গে রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়ে খাইয়েছি ;—পাড়ার লোকে হেসেছে। কিন্তু তার ফল কী হল ? দুর্গার মা'রা তো ঠিকই বলেছিল যে স্বদেশীর কাজ করতে চাও করো, কিন্তু এসব কোরো না—ঠাকুর দেবতাদের ঘাঁটাতে যাওয়া ভাল না ; তখন তোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের কথা কানে তুলিনি। আজ মর্মে মর্মে বুঝছি। আজ দুর্গার মা, খেঁদীর মা, কি জিতেনের মা-দিদি থাকলে,তাদের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেও একটু মনটা হালকা করতে পারতাম। মহাত্মাজী না ছাই। ঐ কি সন্ন্যাসীর মতো চেহারা নাকি ? উঃ, কী করেছি এতদিন ! পৃথিবীসুদ্ধ লোক মিলে আমার কী করেছে। গায়ের জ্বালায় নিজের মাংস ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে। আর না—দেব চরখাটাকে এখনি টান মেরে ফেলে—আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলব ওটাকে। টেবিলের উপর রেখেছিলাম না ?

চরখাটা নেওয়ার জন্য জোর করে উঠে বসি। উঠতে কি পারি ? মাথার বাঁ দিকটায় যেন একমণ লোহা ভরা। মাথাটাকে কে যেন বালিশের উপর ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। বহুরিয়াজী, কামলাদেবী হাঁ-হাঁ করে উঠেছে !

'উঠলে কেন বাঙালী মাই ? কী খুঁজছ ? চারিদিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন ? শুয়ে পড়। মাথায় একটু জল দিয়ে দেব ?'

সকলে মিলে জোর করে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কোন জিনিসটা খুঁজছিলাম, সেটা আর ওদের কাছে বলা হচ্ছে না। ওরা তাহলে মনে করবে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এখনই কী মনে করছে কে জানে ! মাথায় অডিকোলন দিচ্ছে। ঘরসুদ্ধু লোক এক এক করে এসে জুটল দেখছি আমার বিছানার ধারে। গলকাট্টিটা হাপরের মতো গলায়, লুসী জমাদারনীকে ডেকে কী সব বলছে। বোধ হয় আমারই কথা। সেটা আবার এখন চ্যাঁচামেচি করে হাসপাতালে খবর দিয়ে অনর্থ না করে। সখাবতীজী আস্তে আস্তে আমার পাশ থেকে ঘুমন্ত লাড্‌লীকে তুলে

নিল। ও কি ভাবল ওর ছেলেটাকে আমি কিছু করে-টরে ফেলব নাকি? নে বাপু নে, যা ভাল বুঝিস কর্। তুই হলি ওর মা। ওর ভাল তুই যত বুঝবি, তত কি আর আমি বুঝব? সকলে চুপ করে আমার চারিদিকে ঘিরে বসেছে—এখন সূচটি পড়লে তার শব্দ শোনা যায়। খালি হাতপাখাটা থেকে একটা একটানা শব্দ হচ্ছে।...একটা গুবরে পোকা উড়ছে। শব্দ হচ্ছে ভোঁ-ও···। ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। আবার উড়ছে, আবার কিসে যেন ঠোকর খেয়ে পড়ল। এখনও ওড়েনি—এখনও না—এখনও না। এইবার যেই উড়বে, অমনি এক দুই তিন করে দশ গুনতে হবে। দশ গোনার আগেই যদি পড়ে যায়, তাহলে বিলু কিছুতেই বাঁচবে না। আর যদি পোকাটা পড়বার আগে দশ গুনে ফেলতে পারি, তাহলে ভগবান যেমন করে হোক বিলুকে বাঁচাবেনই বাঁচাবেন। খুব তাড়াতাড়ি গুনতে হবে; যত তাড়াতাড়ি পারি। ঐ উড়ল—এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত—ঐ যাঃ! পোকাটা পড়ে গেল। এ কী করলে ভগবান! যা'ও একটু আশা ছিল তাতেও তুমি বাদ সাধলে? যাঃ, এসব মনগড়া খেয়ালের কিছু মাথামুণ্ডু আছে? নিজেই ভাঙি, নিজেই গড়ি। পোকাটার সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছিলাম তা কখনই ঠিক নয়। সবই ভগবানের হাত! সেই ভগবানকে আমি এতদিন কী হেনস্তাই করেছি! মা পূর্ণেশ্বরী, আমার সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করো। তোমারই দয়াতে তো বিলুকে কোলে পেয়েছিলাম। তোমার নামেই তো বিলুর নাম রেখেছিলাম পূর্ণ। বাড়িসুদ্ধ সবাই তোমার মন্দিরের মহাপ্রসাদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলেই কি তুমি আমার উপর বিরূপ? বিলুর অসুখের সময় যে মানত করেছিলাম, সে পুজো পূর্ণেশ্বরীর ওখানে দিয়েছিলাম তো? মনে তো পড়ছে না। ভুলে গিয়েছিলাম নাকি? দেখছ? দ্যাখ দেখি, একটা সামান্য ভুল থেকে কী কান্ড হল! মা পূর্ণেশ্বরী, কেন তুমি একথা আগে আমায় মনে পড়িয়ে দাওনি? না নিশ্চয়ই দেওয়া হয়েছিল। তবে কেন এমন হল? মা, তুমি তো জাগ্রতা দেবী, বিলু তো একরকম তোমারই ছেলে, ওকে এবার বাঁচিয়ে দাও। আর আমি তোমার কাছে কোনো দোষ করব না। আর আমি গান্ধীজীকে তোমার চাইতে বড় মনে করব না।···

বরহমথানে বিলু হওয়ার সময় যে ইটটা বেঁধেছিলাম, তা খোলা হয়েছিল তো? হ্যাঁ, সেই যে আমি আর জিতেনেরমা-দিদি গিয়েছিলাম! সেই যেবার আমার পায়ের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে গিয়েছিল, ঘটি পড়ে! সেই সময়ই ভুল করেছি। কোন ইটটা খুলতে কোন ইটটা খুলেছি। ঠিক ঠিক—অত ইটের মধ্যে চিনবার কি জো আছে?

সেই সরস্বতীদের বাড়ির কাছেই, অশথতলায় মাটির ওপর সিঁদুর মাখানো, তিনি হচ্ছেন 'ডিহ্ওয়ার'—দহিভাত গ্রামের গাম্য দেবতা তিনি 'ডিহি' (গ্রামের সীমানা) পাহারা দেন—সেখানে সকলে মাটির ঘোড়া পুজো দেয়। সরস্বতীর মা আমাকে বলেছিলেন যে যখন মায়ের দয়া, কলেরা কি অনাবৃষ্টি হয়, তখন ঘোড়ায় চড়ে ষাট হাত লম্বা ডিহ্ওয়ার ঠাকুর গ্রাম পাহারা দেন। গ্রামের চৌকিদার রাতদুপুরে কতদিন দেখেছে। সরস্বতীর মা'র মুখের উপর কিছু বলিনি, কিন্তু মনে মনে হেসেছিলাম। ষাট হাত লম্বা ঠাকুর বিশ্বাস করিনি। ষাট হাত লম্বা ঠাকুরের এক বিঘৎ উঁচু ঘোড়া। তা কি হয়? ডিহ্ওয়ার ঠাকুর নিশ্চয়ই আমার সেই সময়ের মনের কথা বুঝেছিলেন! তাই তিনি রাগ করে আমার এই কপাল করলেন। কিংবা হয়তো তাঁর গ্রামের মেয়ে সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে দিইনি বলে, তিনি আমার এই দশা করেছেন। ডিহ্ওয়ার

ঠাকুর, আজ আমার বিলুকে বাঁচিয়ে দাও। তারপর যাতে তুমি খুশী হও তাই করব। ...তোমরা বিরক্ত হলে আমার মতো সামান্য মানুষের দিন কী করে কাটে বলো।...

ঐ! ঐ! মোটরের হর্নের শব্দ হল—অ্যাঁ!—তাহলে আমার বিলু...

সেই সবুজ ঝাঁঝওয়ালা শিশিটা ধরেছে বুঝি নাকে।

## জেলগেট: নীলু

জেলগেটের সম্মুখের গাড়িবারান্দার নিচে, ওয়ার্ডার নেহাত সিং-এর সহিত আসিয়া দাঁড়াইলাম। গেটের বাহিরে সহস্র প্রহরী। গেটের ভিতরটি উজ্জ্বল আলোকিত। ভিতরে আলোর নিচে, সুবাদারসাহেব ডেস্কের পাশে একটি উঁচু টুলের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। নেহাল সিং-এর কথা মতো গাড়িবারান্দার সম্মুখের অনুচ্চ প্রাচীরের উপর বসি।

'বাবু, কম্বল-উম্বল সাথ নহী লায়ে, না?'[১]

বলিলাম, 'না।'

সে নিজেই গেটের ভিতরের সুবাদারের নিকট হইতে, গরাদের ভিতর দিয়া তিন চারখানি কম্বল যোগাড় করিয়া আনিল। সেগুলি ঐ প্রাচীরের উপর পুরু করিয়া পাতিয়া, দায়সারা ভাবে একবার তাহার ধুলো ঝাড়িবার চেষ্টা করিল।

আমাকে বলিল, 'বাবু, বৈঠল যায়।'[২]

তাহার পর গেটের সান্ত্রী ও সুবাদারসাহেবকে অনুচ্চস্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল যে, ভোররাত্রে যাঁহার ফাঁসি হইবে, ইনি তাঁহারই ছোট ভাই। এইখানেই সারারাত্রি বসিয়া থাকিবেন বলিতেছেন। ইঁহাকে যেন জ্বালাতন না করা হয়। সুবাদার দেখিলাম কথাগুলি ভালভাবে লইল না। জেলের ভিতরের মালিক হেডওয়ার্ডার, আর গেটের বাইরের দন্ডমুন্ডের কর্তা সুবেদারসাহেব। আসলে তাহার পদের নাম গেটওয়ার্ডার। যুদ্ধফেরত বলিয়া তাঁহার নাম সুবাদার সাহেব হইয়াছে। জেলের ভিতর কে আসিতেছে, জেল হইতে কে গেল,—ইহাদের টাকাকড়ি জিনিসপত্র, সার্চ, বাজারের সওদা, ঠিকেদার এ সকল জিনিসের সর্বময় কর্তা সুবেদার সাহেব। এই মহামান্য সুবেদারসাহেবের নিকট একজন সামান্য ওয়ার্ডার কেন এই যুক্তিহীন প্রার্থনা করিতেছে? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কিছু তথ্য আছে।

কাজেই সুবেদার জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাকে কত দিয়েছে?' নেহাল সিং কিছুদিন যাবৎ আমার টাকা খাইতেছিল। প্রত্যহই আমার কাছে আসিয়া ফর্দ দেয়—'আজ এই জিনিস আপনার ভাইয়াজিকে খাবার জন্য দিয়েছি। বাজার থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। জেলের ভিতর লুকিয়ে আবার নিয়ে যাওয়া কি সোজা ব্যাপার?' সুবেদারটা যেন একটা বাঘ। প্রত্যেকটি জিনিস নিয়ে যেতে ওকে একটা করে টাকা দিতে হয়। সে বাহান্ন টাকা মাইনে পায়, কিন্তু তার চারগুণ সে উপরি রোজগার করে। একেবারে মিলিটারি মেজাজ—যুদ্ধে গিয়েছিল কিনা! এইরূপ নানা প্রকার অবান্তর কথা বলিবার পর, অল্প অল্প হাসে আর বলে, 'হুজুররাই তো মা-বাবা। আপনাদের ভরসাতেই তো 'বালবাচ্চা' ছেড়ে এই দূরদেশে পেটের 'ধান্ধায়' এসেছি।' এমনি করিয়াই সে আমার নিকট হইতে টাকা লয়।

---

১। 'বাবু কম্বল টম্বল সঙ্গে আনেননি, না?' 'বাবু, বসুন'।

সুবেদার ও নেহাল সিং দুজনেরই ইচ্ছা ছিল, যাহাতে আমি বুঝি যে এখানে থাকিতে হইলে, সামান্য কিছু খরচ করা দরকার। তাহা না হইলে, তাহারা এত জোরে জোরে কথা বলিবে কেন? তাহারা ইচ্ছা করিয়াই আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কথা বলিতেছে।

সুবাদারের কথায় নেহাল সিং উত্তর দেয়, 'দেবে আবার কী? এখনও ধরম আছে;—'বেটা কিরিয়া'[1] বলছি কিছু দেয়নি। সাহেব এঁকে লাশ নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছেন।'

'লাশ নেবার হুকুম দিয়েছে তো দিয়েছে। এখানে থাকবার হুকুম তো দেয়নি। এখানে বাইরের লোককে থাকতে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিতে পারি না।'

সুবেদার গড়গড় করিয়া আরও অনেক কিছু বলিয়া যাইতেছিল। আমি নেহাল সিংকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিলাম। সুবেদার সাহেব দেখিল। আর এ সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য হইল না; ভাগ-বাটোয়ারা পরে হইবে।

সুবেদার সান্ত্রীকে বলিয়া দিল—'এই বাবুকে কেউ যেন বিরক্ত না করে। দফা বদলির[2] সময় প্রত্যেক দফা যেন পরের দফাকে এই কথা বলে দেয়।'

নেহাল সিং যাইবার সময় নমস্কার করিয়া বলিয়া গেল, 'পরণাম।' এদেশে নমস্কার কথাটির চলন নাই। তাহার পরিবর্তে পাত্রাপাত্র নির্বিচারে ব্যবহৃত হয় 'প্রণাম' কথাটি; আমাদেরও এদেশে থাকিতে থাকিতে এই কথাটি এবং এইরূপ কত কথা বলাই অভ্যাস হইয়াছে।...

...শিশিরের সেই চিঠিখানার ভাষা এখনও মনে আছে। শিশির জেল হইতে আমাদের পূর্বেই ছাড়া পায়। আমার জেলের মধ্যে সব সময়ই বলাবলি করিতাম যে, যে জেল হইতে বাহির হয়, সে আর জেলের ভিতরের লোকের কোনো খবরাখবর নেয় না। বাস্তবিক প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাহাই দেখা যাইত। যাহাদের জীবন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর জেলের ভিতর ভাপসাইয়া পচিয়া ওঠে, যাহাদের উদ্দাম জীবনশক্তিকে নিয়মের বন্ধনে অসাড় করিয়া দেওয়া হয়, চীনা রমণীর পায়ের মতো যাহাদের জীবন স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ পায় না, তাহাদের বাইরে খবরাখবর পাঠাইবার কত দরকার নিয়মিত জমা হয়। এরূপ ধরনের প্রয়োজন সরকারী নিয়মের মধ্যে দিয়া মিটাইবার সুবিধা নাই। তাই অন্ধকার যক্ষপুরীতে ক্ষীণ আলোক আসিবার গবাক্ষ, নূতন রাজবন্দীর জেলে আসা। আর বাহিরের যে কর্মবহুল সংসারের শত মধুর সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বন্দীকে লইয়া আসা হইয়াছে, তাহার সহিত সাময়িক সম্বন্ধ স্থাপনের বিফল চেষ্টা করা হয়, যে বন্দী মুক্তিলাভ করিতেছে তাহাকে দিয়া। জেলযন্ত্রের 'সেফটী ভাল্ব' সদ্যোমুক্ত রাজবন্দী। সে জেলের ভিতরের শত ব্যর্থতার অপার নিষ্ফল আক্রোশের, অপরিমিত অশ্রুবেদনা ও দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সাময়িক নির্গম পথ।...জেল হইতে বাহির হইবার সময় কত লিখিবার কথা, কত ইন্টারভিউ করিবার কথা, কত কাজ করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা, এক প্রকার যাচিয়া গছিয়া লওয়া কত প্রকার ফরমাশ;—যাওয়ার দিনের ফুলের মালা, বিদায়ের ঘটা, প্রণাম নমস্কার, আদাব আলিঙ্গন, অযাচিত আলাপের ছড়াছড়ি, দরজা পর্যন্ত প্রায় মিছিলের মতো ঘটা করিয়া পেঁছাইয়া দেওয়া;—ইহার প্রত্যেকটি কাজ জেলের গতানুগতিকতার অঙ্গ

১। 'ছেলের নামে শপথ করে'।
২। ওয়ার্ডারদের একদলের চলিয়া যাওয়া ও আর একদলের আসা।

হইলেও, কাহারও আন্তরিকতার অভাব নাই। কী, তাহার পর? তাহার পর কী হইবে তাহাও চোখ বুঁজিয়া বলিয়া দেওয়া যায়! ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ বলিয়া দিতে পারেন, দেশের কত লোক আন্দাজ, আগামী বৎসর ঠিকানা না লিখিয়াই ডাকবাক্সে চিঠি ফেলিবে। আর রাজবন্দীরাও বলিয়া দিতে পারে যে, মুক্ত বন্দী গেটের বাহিরে যাইবার পরই জেলের ভিতরের লোকদের কথা ভুলিয়া যাইবে।...আমাদের গণনা ভুল প্রমাণ করিবার জন্য শিশির জেলের বাহির হইতে দাদাকে চিঠি লিখিয়াছে। দাদা চিঠিখানির কয়েক লাইন 'আন্ডার লাইন' করিয়া দিল—এখনও মনে আছে। 'বেশির ভাগ লোক যেমন হচ্চে আমাকে ঠিক তাদের দরজায় ফেলো না। জেল থেকে ছুটবার সাতদিনের মধ্যে চিঠি দিচ্চি। অমুক অমুক অমুককে প্রণাম জানাবে।...

...হরদার দুবেজীর স্ত্রী, বুড়ি; সেও আমাকে প্রণাম করে। অথচ দাদাকে বলে 'ধরমবেটা'। গরিবমানুষ; কিন্তু সেদিন যখন দেখা হইল 'বেটার' মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য আঁচলের খুঁট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া দিল;—তাহার দুই চোখে জল আসিয়া গিয়াছে। মনে হইল দুবেজীকে লুকাইয়া টাকা দিতেছে। কেন জানি না...

দুবেজী নিজেই মোকদ্দমা চলিবার সময় ভয় ও কুন্ঠার সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, টাকাকড়ির যদি দরকার হয় তাহা হইলে সে কিছু যোগাড় করিয়া দিতে পারে। দুবেজী বলিয়াছিল, 'ভগবান 'নারাজ' বলেই তো আমাকে আর আমার স্ত্রীকে পুলিশ ধরেনি। না হলে আমি তো 'জুলুসে শরীক'[১] হয়েছিলাম। আমার হাতে সব চাইতে বড় 'তিরঙ্গাটি'[২] ছিল; যখন জেলের বাইরে আমাকে রাখাই ভগবানের ইচ্ছে, তখন 'কংগ্রেসীকে নাতে'[৩] বিলুবাবুর মোকদ্দমার তদ্বির করে আমাকে নিজের 'ফর্জ অদা'[৪] করা উচিত।' তখন আমি টাকা লইতে অস্বীকার করি। দুবেজী আমার ব্যবহারের অর্থ করিল যে আমি দাদার মোকদ্দমা ডিফেন্ড করাইতে চাই না। অথচ আমি অস্বীকার করিয়াছিলাম, কারণ জ্যাঠাইমা কোথা হইতে জানি না মোকদ্দমার খরচের জন্য আমাকে শ তিনেক টাকা দিয়াছিলেন। জ্যাঠাইমা কেবল বলিয়াছিলেন, 'হরেনবাবু উকিলকে দিয়ে দিস।' টাকা দিবার সময় জ্যাঠাইমার মুখের ভাব, ঠিক দুবেজীর স্ত্রীর মতো। তাহার পর হইতে দুবেজী নিজেই উকিলের বাড়ি যাতায়াত করিত।...

...ঘোড়ার পিঠে দুবেজী। লালা ঘোড়াটি একটু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে। ঘোড়া হইতে নামিয়ে দুবেজী ঘোড়ার পিঠে একটি চাপড় মারিল। পিঠের চটগুলি সরাইয়া ঘোড়াটিকে হরেনবাবুর গেটের ধারের ইউকালিপ্টাস গাছটায় বাঁধিতেছে।... দুবেজী বোধ হয় অনেক টাকাও খরচও করিয়াছিল। আমি অবশ্য জ্যাঠাইমার দেওয়া টাকাও হরেনবাবুকে দিয়াছিলাম। তিনি বাবার বন্ধু; কিন্তু জ্যাঠাইমার টাকা পাওয়া সত্ত্বেও, আবার দুবেজীর দেওয়া টাকা লইতে ইতস্তত করেন নাই।

তাহার পর দুবেজীর স্ত্রী নিজের কথা বলিয়াই ফেলিল। 'আমার স্বামী তো 'বেটার' মোকদ্দমার যথেষ্ট 'পৈরবী'[৫] করেছে। খোলমকুচির মতো পয়সা খরচ হয়েছে। কিন্তু ফল কী হল? আসলে পুলিশ যার দিকে, মোকদ্দমায় তারই জিৎ।

---

১। মিছিলে ভাগ নেওয়া। ২। ত্রিবর্ণরঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা।
৩। কংগ্রেসের সদস্য বলিয়া। ৪। কর্তব্য সম্পাদন করা।
৫। তদ্বির।

তোমার কথা তো পুলিশ শোনে। কালেক্টর সাহেব শুনি তোমাদের সঙ্গে 'সলাহ'[১] না করে কিছু করে না। তোমাদেরই দলের নোখেলাল দ্যাখো না, হরদাবাজারের সব দোকানদারদের জ্বালাতন করে মারছে; কিন্তু দারোগাবাবু তার হাতের মুঠোয়। সরকার শুনি তোমাদের দলের লোককে মাইনে দেয়।' তখন দুবেজীকে লুকাইয়া টাকা দিবার অর্থ বুঝিলাম। বিলুবাবু তাহার 'ধরমবেটা'। তাহার জন্য, সে নিজের সরল বুদ্ধিতে যাহা করা দরকার মনে করিয়াছে, তাহা করিতে ইতস্তত করে নাই। আমাকে উহারা পুলিশের লোক মনে করে। উহাদের দোষই বা কী? উহারা অন্য কীই বা ভাবিতে পারে? দেশসুদ্ধ লোক তো তাহাই ভাবিতেছে। সরলমনা দুবেইন তো কেবল পূর্বপরিচয়ের দাবিতে, আমার মুখের উপর কথাটি পরিষ্কার বলিয়া ফেলিল। ইচ্ছা হইল টাকা তিনটি ছুঁড়িয়া তাহার মুখে মারি; কিন্তু মুখে বলিলাম, 'মোকদ্দমার রায় তো হইয়া গিয়াছে। আর টাকা কী হইবে?'—দেখিলাম সে বিশ্বাস করিতেছে না যে, এখন আর কলেক্টর বা লাটসাহেব কিছু করিতে পারে না। তাহার পর হতাশাব্যঞ্জক মুখের দিকে তাকাইয়া মনে হইল যে, টাকাটা আমার লওয়া উচিত। বলিলাম, 'আচ্ছা দাও টাকটা।' এক সন্তানহীনা রমণীর পরসন্তান বাৎসল্যের আবেগের কাছে আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত মাথা নত করিল। কিন্তু মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় নিজের রাজনীতিক principle একটু নমনীয় করিয়া লইলে কী লোকসান হইত? তখন যেন আমি সাধারণ মানুষ ছিলাম না। তখন যে জনমতের বিরুদ্ধে পরিচিত অপরিচিত সকলের বিরুদ্ধে আমার একাকী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার কথা; নিন্দুক ও বিরোধীদের আমার principle-এর দৃঢ়তা দেখানোর কথা। রাজনীতিক মতবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বোধ হয় সেখানে আমার ব্যক্তিগত জিদের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল। আমার উপর চাপ দিয়া আমার মত বদলাইয়া লইবে, এত নমনীয় রাজনীতিক মত আমি রাখি না। লোকে কি আমার মনের গভীরে যে কথা ছিল সে কথা বুঝিয়াছে? দুবেজীর স্ত্রী আমার সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছে, সাধারণ লোকেতাহা অপেক্ষাও খারাপ ধারণা পোষণ করে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই করে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নিত্যই দেখিতেছি। সেদিন ফুটবল মাঠের ধারে বসিয়া যে ছাত্রের দল সিগারেট খাইতেছিল, আমি পাশ দিয়া সাইকেল চলিয়া যাইবার সময় তাহাদের সুউচ্চ গলা খাঁকারির শব্দ শুনিয়াছি। পাড়ার ছেলেমেয়েদের বিস্মিত ও অনুসন্ধিৎসু চক্ষে আমার দিকে তাকাইতে দেখিয়াছি। বাল্যবন্ধু সৌরীন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে কুন্ঠিত হয় নাই। মারিবার ভয় দেখানো বেনামী চিঠি পাইয়াছি। কী যুক্তিহীন চিঠি। প্রথমেই কিরূপ উচ্চমনা পিতার পুত্র তাহা মনে করাইয়া দিয়া, শেষের লাইনে আমার পিতৃত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। জ্যাঠাইমা ও ন'দি পর্যন্ত নেহাত কাজের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন না। একজন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মেম্বারকে, অপর একজন মেম্বারের নিকট বলিতে শুনিয়াছি যে, দুই ভাই-ই সহদেও-এর বোনের সহিত প্রেমে পড়িয়াছিল। সেইজন্য হিংসায় আমি নাকি দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছি; না হইলে কেহ ফাঁসির মোকদ্দমায় নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে? সরস্বতীর সম্বন্ধে এইরূপ ধরনে আমি কখনও ভাবি নাই। আর দাদার দিক হইতেও কখনো এমন কিছু দেখি নাই যাহাতে বুঝা যায় যে দাদা তাহাকে ভালবাসে; কিন্তু লোকের মুখ কে বন্ধ করিবে?

---

১ পরামর্শ।

…জেলে দাদার মোকদ্দমা চলিবার সময়, আমার সাক্ষ্যের দিনে জেলের বাহিরে কী ভিড়। জেলের ভিতর মোকদ্দমা চলিতেছে। ঐরূপ মারাত্মক আসামীকে কী করিয়া খোলা এজলাসে বিচার করা যাইতে পারে? কয়জন চৌকিদার, দফাদার, কনেস্টবল ও দারোগা সাক্ষীর সহিত গেটে পুলিশের ভ্যান হইতে নামিলাম। জনতার দিকে তাকাতেই পারিতেছি না, কিন্তু অনুযোগ ও ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি অনুভব করিতেছি। আমি জনতার ক্ষোভকে তাচ্ছিল্য করি, এই ভাব দেখাইবার জন্য একবার জোর করিয়া ঐ দিকে মাথা উঁচু করিয়া তাকাইলাম। বোধ হয় মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মুখের দিকে মনোবিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। 'জু'তে বন্য জন্তুকে যে দৃষ্টিতে দেখে, সেদিন জেল ওয়ার্ডাররা সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়াছে; জজসাহেব প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। জেলের পুরাতন কয়েদীদের চক্ষেই একমাত্র দেখিয়াছি উদাসীনতার ভাব; আর কাহারও চক্ষে সেরূপ নাই। জেলের রাজবন্দীদের সহিত সে সময় সাক্ষাৎ হয় নাই। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি কিরূপ হিংস্র হইত তাহা অনুভব করিতে পারি। এ মোকদ্দমায় দাদার সহিত আর দুই জন আসামী ছিল,—সুরজদেও আর হরিশচন্দ্র! আমি এজাহার দিতে উঠিলে, হরিশচন্দ্র চিৎকার করিয়া আসামীর কঠগড়া হইতে বলিয়া উঠিয়াছিল—'ছি! ছি! ছি! ছি!' তাহাতে আমি ফিরিয়া সেই দিকে তাকাইয়াছিলাম। তাহার চোখ দিয়া ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহার তীক্ষ্ম স্বরের মধ্যে যতটা তীব্র ব্যঙ্গ ছিল, নিষ্ফল আক্রোশ ছিল তাহা অপেক্ষাও বেশি।…একবার আশ্রমে একটি হেলে সাপ চিমটা দিয়া ধরিয়া দাদার কাছে লইয়া গিয়াছিলাম। দাদা বাগানে কাজ করিতেছিল। সাপের সাদা পেটের দিকটা হঠাৎ দেখিয়া দাদার চোখ-মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেই ভাব দেখিলাম সুরজদেও-এর মুখে। তীব্র ঘৃণায় সে আমার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে চায়। আর দাদা—কাঠগড়ার মধ্যে একখানি কম্বলের উপর বসিয়া; একখানি লালচে মলাটের বই-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ, মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনাহীন। আমার মনে হইল যে উহা সত্যকারের অভিনিবেশ নয়; ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিসংযোগ মাত্র। কেননা তাহা হইলে দাদা হরিশচন্দরকে নিশ্চয়ই কোনো কথা বলিতে বারণ করিত। তাহার পর সরকারী উকিলের জজসাহেবের নিকট হরিশচন্দরের সম্বন্ধে নালিশ—হাকিমের উষ্মা ও হরেনবাবুর দিকে তাকাইয়া বিরক্তি প্রকাশ—হরেনবাবুর উদ্‌বেগ ও একবার কাশিয়া উদ্‌বেগ দমন করিবার প্রয়াস—অ্যাসিস্টেন্ট-জেলর-'অন ডিউটি' ও দারোগার চাঞ্চল্য; কোর্টরুম না হইলে তাহারা এখনই আসামীকে মজা টের পাওয়াইয়া দিত—দুজনের মধ্যে এইরূপ অর্থসূচক দৃষ্টি বিনিময়—সব ছবিই চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। হরিশচন্দর মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—বলিতেছে 'কেয়া করোগে? ফাঁসিসে ভী কুছ বেশি দেওগে কেয়া?' ওয়ার্ডার ও পুলিশে আসামীর কাঠগড়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। হরিশচন্দর তাহার মধ্য হইতেই আমাকে তীব্র স্বরে বলিল 'কুত্তা কাঁহাকা।' জজসাহেব চশমা মুছিতেছেন। পেস্কার দৌড়াইয়া হরিশচন্দরকে কী বলিতে গেল। দাদার সহিত হরিশচন্দরের চোখাচোখি হইয়া গেল। দাদার মিনতিভরা দৃষ্টি—বলিতে চায়, হরিশচন্দর এবার থামো, একটা scene হইয়া গেল যে। হরিশচন্দর থামিয়া যায়। আবার এজলাসের কাজ আরম্ভ হয়।…

কাঁকরভরা রাস্তায় একসঙ্গে অনেকগুলি জুতার শব্দ আসিতেছে; অন্ধকারে রাস্তার দিকের কিছুই দেখা যায় না। কেবল দূরে দেখা যাইতেছে ওয়ার্ডারদের লম্বা

ব্যারাকের বারান্দায় কালো শেড দেওয়া আলো। ব্যারাকে ওয়ার্ডারদের ঢোলক খঞ্জনী সংবলিত কীর্তন চলিতেছে, তাহার উগ্রস্বর কানে আসিতেছে; ভাসিয়া আসিতেছে বলা চলে না, কর্ণপটাহে দস্তুরমতো আঘাত করিতেছে। কিন্তু সে শব্দকেও ছাড়াইয়া উঠিয়া ক্রমনিকটায়মান জুতোর শব্দ জেলগেটের নিকট পেঁৗছিল। দেখিলাম একদল ওয়ার্ডার আসিয়াছে। অধিকাংশের পায়ে হলদে রং-এর কাবুলী স্যাণ্ডাল। দুইজনের পায়ে অতি পুরাতন বুট। যুদ্ধের জন্য বুট জুতো পাওয়া যায় না বোধ হয়।

জেলগেটের দোতলায় একজন ওয়ার্ডার এগারোটা বাজিবার ঘণ্টা দিল। একসঙ্গে ঢং ঢং করিয়া দুইটি করিয়া পাঁচবার, তাহার পর আর একবার। এরই মধ্যে দুই ঘণ্টা হইয়া গেল। দশটা কখন বাজিল জানিতেও পারি নাই। গেটের সম্মুখে ওয়ার্ডারের দল অনুসন্ধিৎসু চক্ষে আমাকে দেখিতেছে...এ আবার-কে-আসিয়া জুটিল এই ভঙ্গিতে একজন আমার কাছে দেশলাই আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, 'নাই'। ইতিমধ্যে ভিতরেব ওয়ার্ডার গেটের তালা খুলিয়াছে। ওয়ার্ডাররা কোলাহল করিতে করিতে ভিতরে ঢুকল। খাতায় নাম লেখা হইল।

গেটওয়ার্ডার হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করে, 'কিছু 'নাজায়েজ'[১] ভিতরে নিয়ে যাচ্ছ না তো?'

একজন বলিল, 'হুজুর সারিচ কিয়া যায়।'

সুবেদার উত্তর দেয়, 'তারপর আমার বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হোক আর কি। তোমাদের তো আমার জানা আছে। তোমরা তো আর উঁদির পকেটেজিনিস রাখ না।'

রেজিস্টারে নাম লেখা হইল। জেলের ভিতরের লৌহদ্বার খুলিল। অবশ্য সম্পূর্ণ নয়; দ্বারের একদিককার কপাটের মধ্যস্থ ছোট দরজাটি খুলিল। জেলের ভিতরে জমাট অন্ধকার! এক এক করিয়া, একটি ব্যতীত অপর সকল নূতন ওয়ার্ডার প্যাসেজের উজ্জ্বল আলোক হইতে, জেলের ভিতরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। গেটের জমাদার কপাট বন্ধ করিয়া তালা লাগাইল—প্রকাণ্ড একটি রিংএ শতাধিক বড় বড় চাবি। তালা বন্ধ করিবার পর একবার অন্যমনস্কভাবে তালাতে হ্যাঁচকা টান মারিয়া দেখিল; ঠিক বন্ধ হইয়াছে তো। টানমারাটা যেন reflex action-এর মতো বোধ হইল। তাহার পর আমার দিকে ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গেটের বাহিরে বন্দুকধারী সান্ত্রী বদল হইল। আগেরটি ছিল গম্ভীর প্রকৃতির, এটি অন্যরূপ। ভিতরের জমাদার বাহিরের সান্ত্রীর নিকট খয়নি চাহিল, ও গুজ্‌গুজ্‌ করিয়া গল্প করিতে লাগিল। বোধ হয় আমারই কথা। গেটের ভিতর নূতন দলের যে ওয়ার্ডারটি রহিয়া গিয়াছে সে সুবেদার সাহেবের সঙ্গে গল্প করিতেছে। সুবেদার উঁচু টুলের উপর বসিয়া, একখানি খাতা নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছে। বোধ হয় লেন-দেনের ব্যাপার কিছু হইবে, কিংবা কোনো জিনিস হয়তো জেলগুদাম হইতে চুরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে। কোনো জিনিস চুরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। জেলের আভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্র এমন যে যতক্ষণ শৃঙ্খলের সকল বলয়গুলি সংযুক্ত না হইতেছে, ততক্ষণ, চুরির যোজনা সফল হইতে পারে না। খাও, কিন্তু মিলিয়া-মিশিয়া খাও! ছোটকেও তাচ্ছিল্য করিবার উপায় নাই।...

ঢং ঢং করিয়া কালেক্টরির টাওয়ার ক্লকে এগারোটা বাজিল। সকলস্থানের জেলের ঘড়িই দেখি মিনিট পনের ফাস্ট থাকে।—জেলের সম্মুখে রাস্তা। তাহার ধারে ধারে

১। আইনবিরুদ্ধ জিনিস।

জেলকর্মচারীদের কোয়ার্টার। পর্দা দেওয়া জানলাগুলির ভিতর দিয়া কোথাও অস্পষ্ট আলোক দেখা যাইতেছে। উহাদের মধ্যে একস্থানের অন্ধকারের ভিতর চতুষ্কোণ আলোকের ঝলক হঠাৎ দেখা যায়,—একটি কোয়ার্টারের দরজা খুলিয়াছে। আলোর রশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, সরলরেখায়; একটি আলোকময় ট্রাপিজিয়ম, চৌকাঠের দিকের বাহুটি ছোট। রেললাইনের সমান্তরাল রেখা দুইটি দিগন্তের দিকে যেরূপ নিকটে আসিবার চেষ্টা করে সেইরূপ। একটি মূর্তি দরজা দিয়া বাহিরে আসিল আর একটি 'সিলহুট' দরজা পর্যন্ত আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। দ্বিতীয় মূর্তিটি দরজা বন্ধ করিল।...তাহাদের গৃহস্থালির আলোক কেন জেল এলাকার নিবিড় অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিবে? দরজা যেন জোর করিয়া, সেই আলোককে নিজের সীমাবন্ধ ক্ষেত্রে রাখিবার যন্ত্রমাত্র।...লুঙ্গিপরিহিত ডাক্তারবাবু গেটের কাছে পৌঁছিলেন। তাঁহার গায়ে গেঞ্জি। পান চিবাইতেছেন। গালে পান রাখিলে সত্যিই কি ক্যান্সার হয়? কাঁধের উপর শার্ট, খাকির হাফপ্যান্ট, আরও বোধ হয় দুটি একটি জামা। চলিবার সময় পা দুইটি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সম্মুখের দিকে ফেলেন। সান্ত্রী খট করিয়া 'এটেনশন' হইয়া দাঁড়াইল।...ইহাদের কাবুলী শ্লিপার কয়দিনই বা টিকিবে। সান্ত্রী সেলাম করিল। ভিতরের ওয়ার্ডার আদাব করিয়া গেটের তালা খুলিল। ডাক্তারবাবু, সেলাম প্রত্যর্পণের ইঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া, ভিতরে ঢুকিলেন। গেটের তালা বন্ধ হইল। সুবেদার সাহেব টুলের উপর বসিয়াই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল; 'কাঁধের উপরের ও পোশাকগুলো কিসের জন্যে?'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'ডিউটি তো হাসপাতালে। কিন্তু কী জানি; ভোররাত্রে ডাক্তার সাহেব, হাকিম, সকলে আসবে, তখন যদি কোনো দরকার পড়ে যায়। তখন তো আর লুঙ্গি পরে সাহেবের সম্মুখে যেতে পারব না। অবিশ্যি ফাঁসির সময়ের ডিউটি বড় ডাক্তারবাবুর; আমার নয়। কিন্তু কী জানি দরকারের কথা বলা তো যায় না—আর যা গরম পড়েছে।'

ডাক্তারবাবুর কথাবার্তায় একটু আবদারে দুলাল দুলাল ভাব। দেখিলাম ডাক্তারবাবু সুবেদারের সহিত বেশ সমীহ করিয়া কথা বলেন। তাহার কারণ সুবেদার নারাজ হইলে, জেলের খাঁটি গরুর দুধ না পাইয়া ছেলেপিলেরা রোগা হইয়া যাইবে, হাসপাতালের বরাদ্দ মাংসের সামান্য অংশও ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পৌঁছিবে না, কেরোসিন তেল হয়তো গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া বাজার হইতে কিনতে হইবে। ইহা ছাড়া আরো কত রকমের জিনিস যেগুলিকে তাঁহারা বেতনের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন, হয়তো কাল হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। হাসপাতালের নেটের মশারি, বিছানার চাদর, শিমুল তুলা, চিনি, পুরাতন চাউল প্রভৃতি কত জিনিস ইঁহাদের দরকার। ভোরবেলায় যে গ্যাং বাহিরের কম্যান্ডে কাজ করে, তাহাদেরই মধ্যে একজন হয়তো, প্রত্যহ গেট হইতে বাহির হইবার সময় ফুলের সাজিতে করিয়া ডাক্তারগৃহিণীর জন্য পূজার ফুল লইয়া যায়। ফুলের সহিত থাকে একটি কাঁচা বেল ও কয়েকটি কাগজী লেবু—ছেলেপিলেরা প্রত্যহ বেলপোড়া খায় কি না।...তিনি তো বোধ হয় জেলে চাকরি করিতে করিতে চিকিৎসাশাস্ত্র ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ সেই গতানুগতিক কাজ—হিসাব, নাম, ফাইল, দপ্তর, ওজন নেওয়া, রিটার্ণ পাঠানো, সাহেবের সহিত ফাইলে ঘোরা, হাসপাতালে মেট হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের মন যুগাইয়া চলা—ইহারা মধ্যে ডাক্তারি করিবার অবকাশ কোথায়? সেবার জেলে ডাক্তারবাবু আমাকে দিয়া একটি রিটার্ণ লিখাইয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুর নাম ছিল বুঝি নরেনবাবু। রিটার্ণের অনেক বিষয়ের

ভিতর একটি ছিল spleenic index। উহা কী করিয়া হিসাব করিতে হয় আমি জানিতাম না। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও দেখিলাম জানেন না,—বলিলেন, 'এখন থাক, আমি গত বৎসরের রিটার্ণ দেখিয়া আন্দাজে বসাইয়া দিব।'

জেলগেটের ভিতর ঢুকিয়াই, ডানদিকের দেওয়ালে দেখা যায় একটি ব্ল্যাকবোর্ড—স্টেশনে যেরূপ চতুষ্কোণ ফলকগুলির উপর টাইমটেবল আঁটা থাকে, সেগুলির মতো। তাহার উপর লেখা আছে,—এই জেলে কত কয়েদীর স্থান হইতে পারে, আজ কত কয়েদী আছে, তাহার মধ্যে আন্ডারট্রায়াল কত। সর্বাপেক্ষা নিচে লেখা থাকে যে ডাক্তার এখন ডিউটিতে আছেন তাঁহার নাম।

ডাক্তারবাবু খড়ির টুকরাটি লইয়া বোর্ডের উপর নিজের নাম লিখিলেন। আর পাশেই লিখিলেন যে, রাত্রি নয়টা হইতে ডিউটি করিতেছেন। তাহার পর ডাক্তারবাবু অল্প হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'অফিস ঘরে ফ্যান্ আছে, আপনাদের এখানে ফ্যান্ নাই?'

সুবেদার সাহেব বলিলেন, 'তক্‌দীর![1] বলিয়া নিজের কপালটি দেখাইয়া দিলেন। কপালের মধ্য দিয়া বেশ একটি উঁচু শিরা; এতদূর হইতেও দেখা যায়।···

জিতেনদার পৈতার সময় জ্যাঠাইমার বিছানায় শুইয়া এক গরিব তাঁতির গল্প শুনিয়া ছিলাম। তাঁতির কপালে ছিল রাজটীকার সুলক্ষণ। তাহার পর কিছুদিন যাহাকে দেখি তাহারই কপালটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করি। আমি আর দাদা একদিন আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া চামড়া প্রায় তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। কপালে ঠিক তিলক কাটার মতো দাগ হইয়া গিয়াছিল। মা'র বকুনি আর পাড়ার লোকের ঠাট্টায় কয়েকদিন আমার বাড়ির বাহির হইতে পারি নাই।···

দরজা খুলিল। ডাক্তারবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরের খোলা দরজা দিয়া অনেকগুলি জুতার শব্দ শোনা যায়। জেলের ভিতর হইতে অনেকে বোধ হয় মার্চ করিয়া গেটের দিকে আসিতেছে। আবার দরজা বন্ধ হইল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দরজার মধ্যের ছয় ইঞ্চি পরিমাণ গবাক্ষ খুলিয়া গেল, একজন ভিতর হইতে ভোজপুরী ভাষায় দরজা খুলিতে বলিল। আবার দরজার তালা খুলিল। ওয়ার্ডারদের তালা খুলিবার ও বন্ধ করিবার বিরাম নাই। ইহাতে উহারা ক্লান্তও হয় না। এই তো ডাক্তারবাবু ভিতরে যাইবার সময় দরজা খুলিয়াছিল। সেই সময়েই তো পদশব্দে বুঝিয়াছিল কাহারা আসিতেছে। সেই সময় কয়েক মুহূর্ত দরজা খুলিয়া রাখিলেই তো হইত। তাহা হইলেই আর দুইবার করিয়া পরিশ্রম করিতে হইত না। ইহারা যে যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করে তাহা কি জেলের নিয়মের জন্য, না নিজেদের অভ্যাস বলিয়া? দরজা খুলিবার নিয়মগুলিও অদ্ভুত।—জেলগেটের মাঝে দুইটি ফটক। একটি আমি যেখানে বসিয়াছি তাহারই সম্মুখে, আর একটি এই গেট হইতে দশ পনের হাত ভিতরে। দুইটি ফটকের মধ্যের প্যাসেজটি একটি বড় হলঘরের মতো। জেলের ভিতরের কর্মকেন্দ্র 'গুমটি' আর জেলের বাইরের কর্মকেন্দ্র এই প্যাসেজটি। হয়তো চারখানি গরুর গাড়ি জেলের ভিতর ইট লইয়া যাইবে। ওয়ার্ডার সম্মুখের দরজাটি খুলিয়া প্রথমে দুইখানি গাড়ি ঐ হলঘরে যাইতে দিবে। তাহার পর বন্ধ করিবে। ইহার পর ভিতরের দরজা খুলিবে, গাড়ি দুইখানিকে যাইতে দিবে, ভিতরের দরজা বন্ধ করিবে, আবার আসিবে সম্মুখের দরজা খুলিয়া বাকি দুইখানিকে যাইতে দিবে। একসঙ্গে দুইটি ফটক খুলিয়া চারখানি গরুর গাড়িকে যাইতে দিলে যেন

[1] ভাগ্য।

মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত!

ভিতরের ওয়ার্ডারের দল কোলাহল করিতেছে! একজন ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করিব নাকি, ফাঁসি সেলে কাহার ডিউটি ছিল। তাহার নিকট হইতে জানা যাইতে পারে দাদা এখন কী করিতেছে! না থাক, আবার কী মনে করিবে। হয়তো টিট্‌কারি দিয়া কথা বলিবে! হয়তো সে আমার সাক্ষ্য দিবার কথা জানে।…

সকলেই ব্যারাকে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত; অনেক রাত হইয়াছে। একটি রেজিস্টারে নাম লেখা হইল। একজন ওয়ার্ডার উঁচু ডেস্কের নিচে দিয়া হাত চালাইয়া, সুবেদারকে কী যেন দিল,—ইচ্ছা অপর কেহ যেন দেখিতে না পায়! এক এক করিয়া সকলে বাহিরে আসিতেছে। উহাদের মধ্যে ফর্সা গোছের অল্পবয়স্ক একজন ওয়ার্ডারকে সুবেদার নিকটে ডাকিয়া, তাহার পাগড়িটি খুলিতে বলিল। সুবেদার উহার কোমর, হাফপ্যাণ্ট প্রভৃতি সার্চ করিতেছে। সার্চ করিয়া কিছু পাওয়া গেল না। ওয়ার্ডার বাহির হইবার সময় রাগে গজ্‌ গজ্‌ করিতেছে—'আমারই উপর যত আক্রোশ। সুবেদারের বিশ্বাস আমি হেড ওয়ার্ডারের দলের লোক। নিজেদের মধ্যে 'মোচকা লড়াই' আর আমাদের লইয়া টানাটানি; থামো, জেলর সাহেবকে বলে এর বিহিত যদি আমি না করি…'তাতে আমার চাকরি যায় আর থাক, তার পরোয়া আমি করি না।'

তাহার পর একটি অশ্লীল গালাগালি দিয়া বলিল—'নোকরি নিয়ে না কিছু বলেছে।…'

…কীর্তনের গানের একটানা চিৎকার শোনা যাইতেছে। একটি কথাও বুঝা যাইতেছে না। কেবল মধ্যে মধ্যে 'রামা হো রামা।' সেই ছেলেবেলায় একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটি লাইন ছিল 'দারোয়ান—রামা হৈ।' কবিতাটি মনে পড়িতেছে না—তাহার প্রথম লাইন ছিল 'ভোর হলো, খুকুমণি জাগো'—এই ধরনের কিছু।

…জিতেনদা—জ্যাঠাইমার বড় ছেলে—জ্যাঠাইমার বাক্স হইতে টাকা চুরি করিয়া অনেকগুলি গল্পের বই আনাইয়াছিল! কলিকাতা হইতে পার্সেল আসিলে পর বাড়িতে জানাজানি হইয়া যায়। জিতেনদা বাড়ি হইতে পলাইয়া আমাদের আশ্রমে দুই দিন ছিল। জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন, আর উহাকে বাড়িতে ঢুকিতে দিবেন না। সেই পার্সেল হইতে দুইখানি বই জ্যাঠাইমা আমাদের দুই ভাইকে দিয়াছিলেন, তারই মধ্যে একখানিতে ঐ কবিতা ছিল। জিতেনদা কতবার পয়সা চুরি করিয়া এই পার্সেল আনাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যাডমিণ্টন সেট, ক্যারামবোর্ড, ফুটবলের পাম্প, কত পার্সেল যে উনি আনাইতেন তাহার কি হিসাব আছে? এক এক খেলায় উৎসাহ কিছুদিন থাকিত। কোনো খেলাই চলনসই ধরনেরও খেলিতে পারিতেন না।…সেই জিতেনদাই আজ কী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ঠিকাদারিতে কত অর্থ উপার্জন করেন। আমাদের অর্থাৎ যে সকল গরিব কর্মী রাজনীতিক্ষেত্রে আছে তাহাদের বেশ কৃপা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন। কে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে যে আমরা চেষ্টা করিলেও হয়তো তাঁহার অপেক্ষা অধিক অর্থোপার্জন করিতে পারিতাম।…Nothing succeeds like success…

ভিতরের দরজায় ছোট গবাক্ষের কপাটটি সরিয়া গেল। কেহ যেন ওয়ার্ডারকে কিছু বলিল; অন্ধকারে লোকটির মুখ কিছুতেই দেখা গেল না। আলিবাবার গুহা চিচিং ফাঁক।…আলিবাবার গুহা রাশি রাশি ধনরত্ন ব্যতীত আর কী দিতে পারিত? কিন্তু এই ফটক খুলিলে কত জীবন্মৃত লোক আবার সত্য সত্যই বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

…জেলের সবটাই প্রাচীর নয়। উহার ভিতরেও প্রচুর খালি জায়গা আছে, সেখানে খোলা হাওয়া বাতাস পাওয়া যাইতে পারে। অন্তত সাধারণ গৃহস্থবাড়ির আঙিনা অপেক্ষা জেলের আঙিনা অনেক বড়। কিন্তু তাহা হইলে কী হইবে? জেলের ভিতর ফুলের বাগান, নিমের এভিনিউ, ছায়াযুক্ত বেল অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ থাকিলে কী হইবে? সারা বাতাবরণ[১] বিষাদে ভরা, প্রাণহীন, কাঠোর ও ক্লেদময়। আবহাওয়া কেমন যেন ভারী ভারী।…অলিভার লজ, লেডবেটার, কোনান ডয়েল ইঁহারা কি psychical phenomena সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন? গভীর চিন্তন ও মানসিক আলোড়নের সময় আমরা কি চিন্তামূর্তিগুলিকে ঐ স্থানে ছাড়িয়া দিই? আমাদের চিন্তাসমষ্টি কি পেঁয়াজের মতো যে, উহা হইতে এক একটি খোলা ও কোয়া আমরা ছাড়াইয়া ফেলিতে পারি,—কোনোটি মোটা, কোনোটি মিহি। সত্যই কি কোনও পুরনো বাড়ির ভিতর যাইতে এইজন্যই আমাদের গা ছম্‌ছম্‌ করে?…

যিনি ভিতর হইতে আসিলেন, তিনি হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। ভদ্রলোকটি বেশ শৌখীন। হাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন।—সাপের ভয় নাকি—আসলে তিনি জেলে প্রবেশ করিবার সময় লণ্ঠনটি খালি অবস্থায় লইয়া আসেন; বাড়িফিরিবার সময় এটিতে কেরোসিন তেল ভরিয়া লইয়া যান। ইহা সকলেই জানে, সকলেই বোঝে, কিন্তু কেহ কিছু বলে না। এরূপ ধরনের ছোট ছোট প্রাপ্যগুলিকে উহারা উপরি পাওনা বলিয়া মনে করে না,—ইহা যে তাহাদের চাকরির বেতনের অঙ্গীভূত। হয়তো বেতন পঁচিশ টাকা। কিন্তু কাপড়-চোপড় জুতা-জামায় কী করিয়া এত পয়সা খরচ করে!—ডাক্তারের সঙ্গে নিশ্চয়ই পাওনার ভাগাভাগি আছে।…

'কী, কম্পাউণ্ডার সাহেবের আজ বড় দেরি হয়ে গেল দেখছি'—সুবেদার সহানুভূতির স্বরে বলে।

'হ্যাঁ, সুবেদার সাহেব, এই জেলে চাকরি নিয়ে কি গুখোরী কাজই না করেছি। এক মিনিট ছুটি নেই। সেই ভোরে এসেছি, এখন রাত বারোটা হল। দুপুরে কেবল বাড়ি গিয়ে খেয়ে এসেছি। সিন্‌হেসরবাবুর নটার সময় হাসপাতালে ডিউটিতে আসবার কথা; এলেন এখন। রাত বারোটায়, খেয়ে দেয়ে, পান চিবোতে চিবোতে।'

তাহার পর একটি অশ্লীল গালি দিল। নিজের ভাগ্যকে, সিন্‌হেসরবাবুরকে, না জামার মধ্যে যে পোকাটি ঢুকিয়াছে তাহাকে, কাহাকে গালি দিল ঠিক বোঝা গেল না। এইটুকু কেবল বুঝিলাম যে খানিক আগে যে ডাক্তারবাবুটি জেলের ভিতর গেলেন, তাঁহার নাম সিংহেশ্বরবাবু…। জামার ভিতর হইতে পোকাটি বাহির করিতেছে। এখনকার মুখভঙ্গি দেখিলে হাসি পায়!

কম্পাউণ্ডার সাহেব নিজের সুখদুঃখের কথা বলিয়াছে। 'মিত্তির সাহেবের নাইট ডিউটি থাকিলে, তবুও একরকম ভাল। তিনি যেদিন আসেন নটার সময়ই আসেন, না হলে একেবারেই আসেন না।'

দুইজনেই চোখে চোখে কী যেন ইঙ্গিত করিয়া হাসিয়া উঠে। আবার গল্প চলে।

'ওসব জেলর সাহেবও জানে। কতদিন জেলর সাহেব রাত্রে রাউণ্ড দেবার সময় হাসপাতালে গিয়ে দেখেছে যে ডাক্তারের ঘর খালি। আর নিজে চোখে না দেখলেও, জেলে কোনো খবর পেতে তো বাকি থাকে না। আগেকার সাহেব থাকতে, একদিন ধরা পড়ে জবাব দিয়েছিল, 'কী করা যায়। হাসপাতাল ও ওয়ার্ডে যে ঘরে ডিউটির ডাক্তার শোয়, তার দরজা নেই। রাত্রে কেউ যদি এসে মারপিট করে সেই ভয়ে ওখানে

[১] Atmosphere.

শুই না।' সে সাহেবও ছিল ঘুঘু। সে বলেছিল যে রাতে তো কয়েদীরা বন্ধ থাকে। মারপিট কে করবে? ডাক্তার জবাব দিয়েছিল যে, যেসব মেট্দের রাত্রেওয়ার্ডারেরডিউটি দেওয়া হয়, তারা তো আর বন্ধ হয় না। এই ব্যাপারের ঠিক আগেই জেলে মিউটিনি হয়ে গিয়েছে। কাজেই সাহেব আর বেশি কিছু বলতে পারেননি।—কিন্তু এখন? মজঃফরপুর জেলের জনকয়েক পলিটিকাল প্রিজনার পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে তো মেট্দের রাতের ডিউটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুনি যে মেট্রাই নাকি তাদের পালাতে সাহায্য করে। এখন তো আগের অজুহাতে চলবে না। এখন আবার বোধ হয় নতুন কোনো ছুতো দেখাবে। আচ্ছা 'ইয়ার', একটা সিগারেট খাওয়াও তো দেখি। একেবারে 'থকে' গিয়েছি। হাড়গোড় যেন ভেঙে যাচ্ছে।'

সুবেদারসাহেব সিগারেট বাহির করিল; কম্পাউন্ডার সাহেব ধরাইলেন। তাহার পর অপেক্ষাকৃত সুউচ্চ স্বরে কী সব কথাবার্তা হইল। কম্পাউণ্ডার সাহেব লন্ঠনের পলিতাটি একটু উস্কাইয়া লন্ঠনটি তুলিয়া ধরেন। আধখাওয়া সিগারেটটিতে একটি জোর টান মারিয়া, সুবেদারের হাতে দেন। গেট হইতে বাহির হইবার সময় বলেন, 'সেজন্যে ভেবো না। আমিই দিয়ে দেব।'—কিসের কথা হইতেছিল এতক্ষণ? কী দিয়া দিবেন? ইনজেকশন না তো? সুবেদারসাহেব ও কম্পাউন্ডারবাবু দুইজনের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা আছে দেখিতেছি। গেটের বাহিরে আসিয়া কম্পাউন্ডারবাবু সুবেদারকে জিজ্ঞাসা করেন—

'তুমি তো আজ এখানেই শোবে?'

'হ্যাঁ, অফিসঘরে বিছানা পেতে রেখেছি। এইবার শুতে যাব।' কম্পাউন্ডার সাহেবের মাথার পিছনের চুলগুলি কী বড় বড়। অধিকাংশই সাদা হইয়া গিয়াছে। তিনি কত কয়েদীর ফাঁসি দেখিয়াছেন। ভোররাত্রের ফাঁসির সম্বন্ধে কোনো কথা তাহার মনে আসে না। যত কম্পাউণ্ডার সকলেই কি পেছনের চুল বড় রাখে?···

···সেই হরিশ কম্পাউন্ডার। মাথায় আধবাবড়ি চুল। সে মাধববাবুর বাড়ির জন্য ওষুধ তৈয়ারি করিতেছে। সন্দেহবাতিক ছিটগ্রস্থ মাধববাবু ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন।—মাপ ঠিক হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত অধৈর্য হইয়া হরিশের মাথার চুলগুলি খপ করিয়া মুঠোর মধ্যে ধরিয়া, মাথাটি নাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, 'চুল ছোট করে কাটতে পার না? পিছন থেকে তোমার ওষুধ তৈয়ারির কিছুই দেখা যায় না।'...আমি গিয়া দাদা আর মা'র কাছে এই গল্প করিয়াছিলাম। সকলে মিলিয়া কী হাসি। মা হাসি চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিতেছেন, 'মা গো মা, সবই কি তোর চোখেই পড়ে?···মা হাসিলেই তাঁহার চোখে জল আসিয়া যায়। আর দাদা যখনই হাসে, কোনো শব্দ হয় না; বাঁ গালে একটু টোল খাইয়া যায়। আশ্চর্য! দুই গালে নয়, একই গালে গর্তটি দেখা যায়। হাসিবার সময় চোখ দুইটি অর্ধনিমীলিত হইয়া পড়ে। দাদার হাসিমুখ চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।···

আলোকশিখাটি ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেছে। এদিক-ওদিক দুলিতেছে কম্পাউন্ডারবাবুর লন্ঠন। কম্পাউন্ডারবাবু কি এত হেলিয়া দুলিয়া চলেন! গরিলারা এমন করিয়াই চলে। নিকটে থাকিবার সময় এতটা লক্ষ্য করি নাই। অত দূরে যাইতেছেন কেন? বোধ হয় সরকারী কোয়ার্টার পান নাই। দূর হইতে হারিকেন লন্ঠনের শিখায় ও প্রদীপের শিখায় কোনো তফাত বোঝা যায় না।....

···রানীপাত্রায় একটি 'কিসান' কেস তদারকে করিয়া ফিরিবার সময় আমি দাদা আর সহদেও খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অন্ধকার রাত্রে মিটমিট আলো দেখিয়া, রাত্রি

কাটাইবার জন্য সেখানেই যাওয়া স্থির করিলাম। জোনাকির ন্যায় মৃদু অলোক—ক্রমে কাছে গিয়া দেখিলাম একটি ডিজ্‌লন্ঠনের শিখা। লন্ঠনটি পুরানো মরিচা ধরা।...

...'মহাত্মা'দের জন্য খাটিয়া, কম্বল, বালিশ আসিল। 'বলন্টিয়র' [1] সহদেও-এর জন্য একখানি মাদুর দাওয়ায় বিছানো হইল। খাটিয়া দেওয়া হইল বাড়ির বাহিরের একটি দোচালা ঘরে। দেওয়াল বা বেড়া নাই। এদেশে উহাকে 'হাওয়াটুঙ্গি' বলে। কম্বলের উপর ময়লা চাদর ও তৈলাক্ত বালিশ দেখিয়া আমার গা ঘিনঘিন করিতেছিল—না-জানি কত রোগের জীবাণু উহাতে আছে। আমি খাটিয়া হইতে সেগুলি সরাইয়া খালি কম্বলে বসিলাম,—কম্বালের উপরের ময়লা চোখে দেখা যায় না বলিয়া একটু মনের তৃপ্তি। যে লোকটি চিঁড়ে দই পরিবেশন করিল তাহার চোখ উঠিয়াছে। দাদা চিঁড়ে দই খাইয়া দিব্যি নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ বালিশে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইল।...ভাগ্যবাদিতার আমেজ, দাদার মধ্যে চিরকাল লক্ষ্য করিয়াছি। পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজের খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা তাহার অদ্ভুত। এ বিষয়ে কথা তুলিলেই বলিবে যে যদি কোনো মূল সিদ্ধান্তে আঘাত না লাগে, তাহা হইলে নিজের সৌজন্যকে বলি দিবার প্রয়োজন কী? উহার আত্মকেন্দ্রিক মন চিন্তার মধ্যে নিজেকেই ডুবাইয়া রাখিতে চায়। সব প্রশ্ন সে নিজের ধরনে ভাবে, মনে মনে সব জিনিসের চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে, যে কোনো সূক্ষ্ম বিষয় আমার অপেক্ষা ভাল বোঝে; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনে, তাহার আচরণ যুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখে না। যে কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, হয়তো মৃদু হাসির সহিত ছোটটো একটি উত্তর দিয়া, উহা সহ্য করিয়া গেল। একেবারে নীলকন্ঠ। সাহসের অভাবে তাহার নাই, ভয় পাইয়া কোনো উচিত কাজ ছাড়িয়া দিতে আজ পর্যন্ত তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু তাহার রক্ত যেন গরমই হয় না। বুদ্ধিশক্তির তীক্ষ্ণতা ও অনুভূতির তীব্রতা থাকা সত্ত্বেও, উগ্রতা ও প্রাণশক্তির প্রচন্ডতা উহাদের মধ্যে নাই। প্রতি পদক্ষেপ তাহার মাপা। যেন পিছল পথের উপর দিয়া অতি সাবধানতার সহিত পা টিপিয়া চলে।...

...থি্রলেগেড্‌ রেসের সময় দাদা কী আড়ষ্টভাবে পা ফেলে!...সেই একবার কুমার সাহেবের মেলায় ছেলেদের স্পোর্টস-এ আমি আর দাদা থি্রলেগেড্‌ রেস দিয়াছিলাম। আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছিলাম, সফল হইতে পারি নাই। ঐ 'আইটেম্‌' শেষ হইয়া গেলে রাগে দুঃখে দাদাকে বলিয়াছিলাম, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ানো, আর গলায় একটা বিরাট ঢাক বেঁধে দৌড়ানো একই কথা।' দাদা বলিয়াছিল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম। তুই তো স্পোর্টসে সব তাতেই ফার্স্ট হস। আমাকে নিয়ে মিছামিছি টানাটানি করলি। পান্নার সঙ্গে জুড়ি বাঁধলেই পারতিস।' এত লজ্জিত, এত অপ্রতিভ হইতে দাদাকে কোনো দিন দেখি নাই। ১৯৪৩ আর ১৯২২—একুশ বৎসর আগেকার ঘটনা।....দাদার স্বেবদসিক্ত শ্রমক্লান্ত মুখখানি ইতস্ততবিস্রস্ত চুলগুলি ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। হাঁফাইতে হাঁফাইতে কোঁচার খুঁট দিয়া পায়ের ধুলো ঝাড়িতে লাগিল। আমার মন খারাপ হইয়া গেল। অন্যান্য প্রতিযোগিতায় পাওয়া প্রাইজগুলি মাকে দেখাইয়া আনন্দ পাইলাম না। দাদা নিজেই সেগুলি মাকে দেখাইল। পরের দিন আবার সেগুলি বন্ধুবান্ধবদের দেখাইল। মাকে বলিল, 'শোন নীলুর কাছে, রোজারিও সাহেবের কান্ড—আমি তো ভাল বলতে পারব না।' বুঝিলাম দাদা

১। ভল্যান্টিয়ার।

আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার তীক্ষ্ন অথচ দরদী দৃষ্টি মনের অন্তস্তল পর্যন্ত বুঝিয়া লয়। দাদা আমার মন হালকা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার দিক হইতে নিজের রূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত ছিল।...রোজারিও সাহেবের কাণ্ডের কথা বলিতে হইল। রোজারিও সাহেব কুমারসাহেবের ম্যানেজার। খেলার স্পোর্টস্ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হয়। একশত গজ দৌড়ে খোকনদার সহিত কেহ পারে না। তাহার ভাল নাম ক্রীঙ্কারীরঞ্জন দত্ত। সে হইয়াছিল ফাস্ট, আমি সেকেন্ড। ছেলেদের স্টোর্টস্-এ জামায় নম্বর দেওয়া হয় না, গন্তব্যস্থানে পেঁছিবার পর রোজারিও সাহেব সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া একটি কাগজে নাম লেখে। খোকনদাকে নাম জিজ্ঞাসা করিল।—চারিদিকে ভিড় কোলাহল—প্রত্যেক প্রতিযোগিতা শেষ হইলেই এইরূপ হয়। খোকনদা নাম বলিল। সাহেব দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও, বোধ হয় তাহার নামটি বুঝিতে পারিল না। তাহার পর আমার নাম লিখিল, আমার পরে দুইজনের নাম লিখিল। প্রাইজ দিবার সময় দেখি আমাকে ফার্স্ট প্রাইজ দিল। খোকনদার চোখ ছলছল করিতেছে, তাহার নাম নাই। জিতেনদা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলে, 'ক্রীঙ্কারীরঞ্জন দত্ত কি সাহেব লিখতে পারে? বাপ-মায়ের দেওয়া নামের জন্যে তোর প্রাইজটা নষ্ট হল। এখন কাল সকালে কুমারসাহেবের কাছে যা।' ভাবিয়াছিলাম মা গল্প শুনিয়া হাসিবেন—কিন্তু ফল হইল উল্‌টা। আমার প্রাইজের টিপট্‌টি পরের দিন খোকনদাকে দিয়া আসিতে হইল। আমার প্রাইজটি কিন্তু মাঠে মারা গেল। রোজারিও সাহেবকে দেখলে এখনও আমার এই দুঃখের কথা মনে পড়ে।

দাদা কিন্তু আর কোনো দিন আমার পার্টনার হইয়া খেলিতে রাজী হয় নাই; কোনো না কোনো ছুতায় avoid করিবার চেষ্টা করিয়াছে। দাদার খেলাধুলার বিশেষ শখ কোনো দিনই ছিল না। এক ব্যাডমিন্টন ছাড়া কোনো খেলাই ভাল খেলিতে পারিত না; কিন্তু ইহাতেও কোনো ম্যাচ, আমার পার্টনার হইয়া খেলে নাই। প্রীতি, সৌজন্য ও নমনীয়তার মধ্যে তাহার দৃঢ়তা অসীম। এক জায়গায় গিয়া তাহার আর নাগাল পাওয়া যায় না,—এত নিকট, তথাপি যেন একটু বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র। তাহার সেই অভিমান আমি একুশ বৎসরের মধ্যে শত চেষ্টাতেও ভাঙাইতে পারি নাই।...

ব্যারাকের কীর্তন এখনও চলিতেছে। কোলাহলে মনে হইতেছে যে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এখন আর 'সীয়ারামা'র নাম কীর্তন হইতেছে না। এখন একটি মাত্র একটানা সুর শোনা যাইতেছে 'নারায়ণা না রা—অ—য়ণ আ...'। এইরূপ নাম কীর্তনের পরই সাধারণত ইহাদের কীর্তন শেষ হয়!—সাহেব সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাহার কোয়ার্টারের নিকট এই বিকট চিৎকার কী করিয়া সহ্য করে? বোধ হয় ওয়ার্ডারদের চটাইতে চায় না। তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত জেলের শাসন যে একদন্ডও চলিতে পারে না।

কত দিনের কথা হইল! রোগা খিটখিটে জজ, স্পিলার সাহেব ছিলেন আধপাগলা গোছের লোক। প্রত্যহ ব্যায়ামের জন্য কুড়ুল দিয়া কাঠ চিরিতেন—জার্মান সম্রাট কাইজারেরও এই বাতিক ছিল। ফজলেমিয়া নাজির জজসাহেবের কাঠের গুঁড়ি যোগাইতে অস্থির। বজরং প্রসাদ উকিলের মেয়ের বিয়ের সময় কী কান্ডই স্পিলার সাহেব করিয়াছিলেন! রাতে বিয়ের বাজনা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে উহাতে তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই একখানি লাঠি ও একটি 'বুল্‌স্‌আই' লন্ঠন লইয়া বজরংবাবুর বাড়িতে গিয়া হাজির। সেখানে

আর কথা না বলিয়া লাঠিখানি দিয়া ঢোলের চামড়ায় ছিদ্র করিয়া দেন। পরের দিন বজরংবাবু জজসাহেবের নামে মোকদ্দমার দায়ের করেন। কিছুদিন পরে মোকদ্দমা আপোসে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। মাথা একটু ঠান্ডা হইলে উকিলসাহেব বুঝিতে পারেন যে, ওকালতি করিয়াই যখন খাইতে হইবে তখন আর জজসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া লাভ কী? আত্মীয় কুটুম্বদের সম্মুখে অপমান যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে। কথা যত বাড়াইবে তত বাড়ে।...

আমাদের দেশের লোকের কী দোষ দিব। সব দেশের লোকই সমান। সাহেবরাও আমাদের মতো time server। এই কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভার্নন সাহেব যাচিয়া আসিয়া আমাদের আশ্রমে ভাত খাইয়া গিয়াছেন। মিসেস ভার্নন হাত দিয়া ভাত খাইবার সময়, ভাতের দলাটিকে ঠিক মুখে পেঁছাইতে পারিতেছিলেন না। হাতের উপর ভাত রাখিতেছিলেন, ঠিক যেমন করিয়া চামচে ভাত লয় সেইরূপ করিয়া; আর ঠিক চামচের মতো করিয়াই হাতটি ঢুকাইতেছিলেন। সমস্ত মুখে ভাত ডাল লাগিয়া গিয়াছিল।...ছুতায়নাতায় ভার্নন সাহেব যখন-তখন দেখা করিতে আসিতেন। খদ্দর ও গান্ধীটুপির সে কী খাতির! সাহেবের মেয়ে একটি বেজী পুষিয়াছিল। 'বাড়িতে বেজীটি বড় জ্বালাতন করিতেছে; তোমরা যদি আশ্রমে রাখ তাহা হইলে দিই' এই বলিয়া দাদাকে বেজীটি দিয়াছিলেন। পরে এই বেজীটিকে দেখিবার ছুতা ধরিয়া স্ত্রী কন্যা লইয়া কালেক্টর সাহেব, সময় নাই অসময় নাই, যখন-তখন আসিয়া ছেলেমানুষের মতো কত আদর, কত চেঁচামেচি...

চিণ্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া, অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া বাতাবরণ[১] কম্পিত করিয়া বারোটার ঘন্টা পড়িল। ডাক্তারের কোয়ার্টারের একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল—তাহার সুখতন্দ্রা বোধ হয় ভাঙিয়া গিয়াছে। 'হো-ও হৈ!' এই বিবট চিৎকারের সহিত, খঞ্জনী ঝাঁঝ, ঢোলক সংবলিত, ওয়ার্ডারদের কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা কি ঘড়ি ধরিয়া বারোটা পর্যন্ত কীর্তন করে নাকি? কী করিয়া পূর্ব হইতে সময়ের ঠিক পায়?...খাকির আধহাতার নিচের একজোড়া হাত এক আধহাত ব্যাসের ঝাঁঝ বাজাইয়া চলিয়াছে। বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটি সস্তা রিস্টওয়াচ ও তাহার উপরের অংশে নীল লাল উল্কিতে অঙ্কিত একটি নারীর মূর্তি।...

বাবার কীর্তন ঠিক আটটায় শেষ হইত। 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিতপাবন সীতারাম'—মহাত্মাজীর প্রিয় ভজনটি সব চাইতে শেষে গাওয়া হইত। আশ্রমে যে কোনো কংগ্রেসকর্মী থাকে, সকলেই কীর্তনে যোগদান করে। সকলে মনে করে বাবা ইহাতে খুশী হইবেন। সত্যই বাবার কীর্তনের বাতিকের কথা জেলসুদ্ধ লোক জানে। মিটিং ঘরেই কীর্তন বসে। সিমেন্টের মেঝে, মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, দেওয়াল মা'র নিজ হাতে ঝকঝকে নিকানো, মধ্যে মধ্যে ছোট জানালা, উহাতে কপাট নাই। দেওয়াল ভরিয়া মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের ছবি। একদিকে দুইটি কংগ্রেস পতাকা ক্রসের আকারে দেওয়ালে আঁটা। তাহার উপরের দিকে লাল শালুর উপর সাদা তুলা দিয়া নাগরীতে লেখা 'স্বাগতম্'। নিচে গান্ধীজীর একখানি বড় ছবি। ঘরের পূর্ব ও উত্তর কোণ একটু অপরিষ্কার। কস্টিক সোডা, লোহার কড়া, আর কাপড়কাচা সাবান তৈয়ারির অন্যান্য সরঞ্জাম ভরা কাঠের চাকাওয়ালা একটি প্রকান্ড সিন্দুক থাকে ঐ দিকে। সিন্দুকটি ফুলকাহার নন্দলাল তেওয়ারী কংগ্রেস কমিটিকে দিয়াছিল; কোণে

১। Atmosphere.

দাঁড় করাইয়া রাখা থাকে একটি ধুনকি ; আর আড়কাঠ হইতে ঝুলানো থাকে একটি ধনুক। দিনের বেলায় পাঁজ তৈয়ারি করিবার তুলা ধুনিবার সময়, ইহার সহিত ধুনকিটি বাঁধিয়া লওয়া হয়।...আশ্রমের কীর্তন আরম্ভ হইল। 'দেশের ছেলে গান্ধীজীকে চিনলি নারে জানলি না'...বাবার নিজের লেখা গান। মা ধূপদানি লইয়া মিটিং ঘরে ঢুকিলেন। গান্ধীজীর ছবির সম্মুখে ধূপদানিটি রাখিলেন ও তাহার পর এক কোণে আলাদা হাত জোড় করিয়া বসিলেন। বাবা লন্ঠনটি কম করিয়া দিয়া, সুর ধরিলেন। সহদেও প্রভৃতি সকলেই বিকৃত উচ্চারণে ঐ বাংলা কীর্তন করিতেছে। প্রথম গান শেষ হইল। মা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিলেন। এতগুলি লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে—কীর্তনে বসিয়া থাকিলে রাঁধিবে কে? আমি আর দাদা দুজনেই ছোটবেলায় কীর্তনে বসিতাম। পৈতা হইবার পরও কয় বৎসর বসিয়াছিলাম।...দাদা কীর্তন বন্ধ করিবার দিনকয়েক পর হইতেই আমিও কীর্তনে যাওয়া বন্ধ করি। তাহা লইয়া মা'র কী কান্না! 'তোরা না এলে উনি দুঃখিত হন। তোর মন না চায়, তবু ওঁর কথা ভেবে বসিস না কেন?' দাদা কোনো উত্তর দেয় না...দাদা বাড়িতে কীর্তন করিত না ; কিন্তু কংগ্রেসের কার্যসূত্রে যখন গ্রামে যাইতাম, তখন বড় বড় গ্রামে গ্রামবাসীরা আমাদের মনোবিনোদনের জন্য কীর্তনের বন্দোবস্ত করিত। বাবার জন্য তাহারা এইরূপ করিতে অভ্যস্ত, সেইজন্য মাস্টার-সাহেবের ছেলেদের জন্যও তাহারা এই 'খাতিরদারি' করে। এ কীর্তনে কিন্তু দাদা কখনও বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। আমি অস্বস্তি প্রকাশ করিলে ইঙ্গিতে আমাকে ধৈর্য ধরিতে বলিয়াছে।...

বাইসী থানার খাগুড়া হাটে মিটিং হইবে। এখনও লোক আসে নাই। সহদেও কংগ্রেস পতাকাটি মাটিতে 'পুঁতিয়া 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' 'গান্ধীজীকা জয়' কতবার বলিয়াছে। ঢেড়া পিটানো ঘন্টা বাজানো প্রভৃতি গ্রামের হাটের লোক জড়ো করিবার যত কৌশল আছে, সবই করা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লোক আর হয় না। তখন স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী রামদত্ত মন্ডল, গয়লাদের কীর্তনের দল ডাকিয়া আনিল। সঙ্গে একটি সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম। দশ মিনিটের মধ্যে হাটসুদ্ধ লোক ঐ স্থানে ভাঙিয়া পড়িল। তাহার পর আমরা তাড়াতাড়ি বক্তৃতা সারিয়া লইলাম। লোকে হাটের কাজে ব্যস্ত। দাদের ওষুধের ক্যানভ্যাসারের বক্তৃতায় আর মহাত্মাজীর চেলার বক্তৃতায় তাহারা কোনো তফাত বুঝিতে পারে না। হাটে আসিয়াছে, সবরকম তামাসার মধ্যে মহাত্মাজীর তামাসাও তাহার দুই মিনিট দেখিয়া লইবে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো মহাত্মাজীর 'দর্শন' 'নিমক সত্যাগ্রহে'র পূর্বে করিয়াছে,—তাহার আবার এই সব অর্বাচীন 'চেলার' মুখ হইতে নূতন কথা শুনিবে—কী সব বলে পনের আনা কথা তো বোঝাই যায় না। আমাদের 'মবেশীর চরীর'[১] ব্যবস্থা করুক, খাজনা কমাইয়া দিক, তহশীলদার পঞ্চের মহিষ যে সকলের ক্ষেত 'উজার'[২] করিতেছে—তাহা বন্ধ করুক, তবে তো বুঝি। তা নয়, কেবল মেম্বরী চাঁদা লওয়ার ফন্দি। মিনিস্ট্রি 'গদ্দীপর' বসিয়া খাজনা বাকির আইন করিয়াছে। হাটে ভাষণ দিয়া গেল, কাহারও চার আনার বেশি দরখাস্তে খরচ পড়িবে না। খরচ পড়িল তাহার বিশগুণ। অর্ধেক লোকের দরখাস্ত তো খারিজই হইয়া গেল। মহাত্মাজীর চেলা পুণ্যদেওজীর কাছে দরখাস্তগুলি দিয়াছিলাম, তদ্‌বির বারবার জন্য। তিনিও দরখাস্ত পিছু আট আনা

১। গরু মহিষ প্রভৃতি মাঠে চরানো। ২। ফসল খাইয়া যাওয়া।

'মহনতানা'[১] লইয়াছিলেন। এক মাস্টারসাহেব আছেন বলিয়া এ জেলায় মহাত্মাজীর কাজ কিছু হয়। না হইলে ইহদের অর্ধেক লোক তো 'ঠগ'।...সত্যই তো কংগ্রেস সংগঠন, সম্পূর্ণ ধনী কিষাণদের হাতে। জমিদারের শোষণ হইতে তাহারা মুক্তি চায়; কিন্তু নিজেরা তাহাদের সীমিত ক্ষেত্রে আধিয়াদার, বাটাইদার বা নিঃসম্বল ক্ষেত-মজুরদের উপর শোষণ বন্ধ করিতে চায় না; কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় নিঃস্ব রায়তদের জন্য যতগুলি আইন তৈয়ারি হইয়াছিল, সবগুলিই ইহারা কূটকৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সহদেও-এর মতো কংগ্রেসকর্মীও আধিয়াদারের কায়েমী স্বত্ব বন্ধ করিবার জন্য 'বন্দোবস্তী'র মিথ্যা দলিল তৈয়ারি করিয়াছে।...

...দহিভাত গ্রামের সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি, যে কংগ্রেস অফিসে প্রায়ই আসিত,—গলায় প্রকান্ড গলগন্ড—আসিয়াই কাঁদিতে বসিল; দাদাকে বলিত, 'তুমি ছাড়া এর বিহিত আর কেউ করতে পারবে না। আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকতে আমার উপর এই জুলুম। সহদেও-এর দাদা কপিলদেও আমার সব জমিজমা নিয়ে নিতে চায়। জমি প্রায় পঞ্চাশ বিঘা। তার বাড়ির কাছে জমি কিনা; 'মান্ধাতা'[২] তামাকের ক্ষেত চমৎকার হবে। তাই এই জমির উপর নজর। 'পুরুখ'[৩] ছিল তেলী। জোয়ান-ছেলে 'পুরুখ' থাকতেই মরে যায়। 'পুতহু'র[৪] তখন ছেলে পেটে। এক বছরের মধ্যে আমার 'পুরুখ' মরল; তারপর গেল 'পুতহু'। বছর না ঘুরতেই একরত্তি নাতিটিরও 'বাই উখর গিয়া'[৫]। যে চব্বিশ ঘন্টা দাদীর কোলেই থাকত। কত ওষুধ কত চিকিৎসা হল। ব্যথা লাগবে বলে বাছাকে 'সুই'[৬] দিতে দিইনি। দিলে হয়তো বাঁচত। তাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। পাড়ার গোরে গোপের ছেলে তার কিছুদিন পরে মারা যায়। তখন কপিলদেও পঞ্চায়িত করে আমার উপর 'ইলজাম'[৭] লাগল যে আমি ডাইনী; আগের নিজের বাড়ি শেষ করেছে, এখন গোরেলালের ছেলেকে 'বাণ' মেরে তাকে শেষ করল। আরে বেকুফ, এটুকু বুঝলি না, আমি যে স্বামী, পুত্তুর, নাতিপুতি সব খেয়ে বসে আছি; আমার পেটে আর জায়গা কোথায়? তারপর আমাকে গ্রামছাড়া করবার জন্যে সেদিন রাত্রে রাহো, শনিচরা, ছেদী এরা সব কপিলদেও-এর কথাতে, আমার বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। একমুঠো ধান পর্যন্ত বাঁচাতে পারিনি। আমি কিন্তু আমার ভিটে ছাড়ছি না। শুনেছি নাকি আবার কপিলদেও আমার উপর সদরে 'ডিক্রী' করিয়েছে জমিটা নেওয়ার জন্য। আমি কি কচি খুকি যে এই কথা বিশ্বাস করব? জমি থাকল দহিভাত গ্রামে, আর ডিক্রী করবে পূর্ণিয়ায়। তা কি কখনও হয়?'—এইরূপ কথা কত বলিয়া চলে; মধ্যে মধ্যে ঠক্ ঠক্ করিয়া মাথা কুটে এবং ডুকরাইয়া কাঁদিতে থাকে। সে বলে যে, মাস্টারসাহেবের সময় কোথায়? তাহা না হইলে তাঁহাকেই দহিভাতে একবার লইয়া যাইতাম। কাজেই বিলুবাবু ছাড়া তাহার আর নাকি গতি নাই। দাদা আর আমি কত চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কপিলদেও-এর এই অন্যায়ের বিহিত করিতে পারি নাই। আমরা দহিভাতে গেলে কপিলদেও পুরী তরকারি খাওয়াইয়া দেয়; কিন্তু কাজের কথায় আমল দেয় না।

---

১। পারিশ্রমিক। ২। এক প্রকার তামাকের স্থানীয় নাম। স্বামী।

৪। পুত্রবধূর।

৫। এ দেশে অশিক্ষিত লোককে কী অসুখ করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেই বলিবে 'বায়ু ছিঁড়ে গিয়েছে'। যে কোনো অনির্দিষ্ট অসুখকে ইহারা এই নাম দেয়।

৬। ইন্‌জেকশন। ৭। অভিযোগ।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলে যে তাহারাও তো মহাত্মাজীর ভক্ত, সে তো জেলা কংগ্রেস কমিটির মেম্বার, আশ্রমের চাল ছাইবার 'খড়' তো সেই প্রতি বৎসর দেয়, একভাইকেতো সে কংগ্রেসে দান করিয়াছে। আসল কথা বড় একান্নভুক্ত পরিবারের সকল লোকের কাজ, জমিজমা দেখিতে দরকার হয় না। বাড়ির অন্ন ধ্বংস করিয়া গ্রামে জটলা করা অপেক্ষা এক আধজনের কংগ্রেসে যোগদান করা ভাল। ইহাই বড় কৃষাণদের মনোবৃত্তি। কংগ্রেস সংগঠন হইতে যতটুকু সুবিধা পাওয়া সম্ভব, তাহা এই 'দানের' দ্বারা নিশ্চিত হইয়া যায়। চাই কী, ভাই যদি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মন জুগাইয়া চলে তাহা হইলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার পর্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। আর নেহাত যদি কংগ্রেস কোনো বিষয়ে ধনী কৃষাণের উপর চাপ দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা গায়ে না মাখিলেই হইল। শেষ পর্যন্ত নৈতিক প্রভাব ব্যতীত আর কোনো শক্তিই তো কংগ্রেসের নাই।...

পরে একদিন ঐ তেলীবৌ দাদাকে রাগে দুঃখে বলিয়াছিল, 'দারোগাসাহেবকে কপিলদেব কিনে নিয়েছে জানি। তোমাকেও কি কিনে নিয়েছে?' তাহার পর আরওকত কী বলিতে যাইতেছিল। হঠাৎ সহদেও আসিয়া পড়ায় থামিয়া যায়। যত শত্রুতাই থাকুক, সহদেও ভুঁইয়ার ব্রাহ্মণ—উঁচু জাত। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি। উহার সম্মুখে সামান্য তেলীবৌ জোরে কথা বলিতে পারে না। আর সহদেওকেও এ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিলে বলে, 'কপিলদেও ভাইয়া মালিক। আমি ইহার কী জানি?'

আমার ইচ্ছা করিতেছিল সহদেওকে ঘাড় ধরিয়া কংগ্রেস আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিই। ইহার পর অনেকদিন উহার সহিত কথা বলি নাই। দাদা কেবল আমাকে বলিয়াছিল, 'ওর ওপর রাগ করে কী হবে—গলদ যে সংগঠনের গোড়ায়।'

১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের আন্দোলনে ক্যাম্পজেলে থাকিবার সময় আমাদের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতার কথা আমরা অনুভব করি। জেলে এ সম্বন্ধে কত আলোচনা, বাদানুবাদ, মনোমালিন্য হইয়া গিয়াছে। যাহারা এই ব্যর্থতার কথা প্রকাশ্যে না বলিত, তাহাদের মুখে হতাশার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। সেই বীজ এতদিনে অঙ্কুরিত হইল। দাদা ও আমি কংগ্রেসসোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করিলাম। তেলীবৌয়ের ঘটনা, সুপ্ত বীজকে তাপ ও জল সিঞ্চন করে। ঐ স্ত্রীলোকটি এখনও তাহার স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে কিনা জানি না; কিন্তু তাহার চোখের জল আমাদের হৃদয়ের সকল দ্বিধা, সন্দেহ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল হৃদয়কন্দরের অর্ধজাগরিত আকাঙ্ক্ষা, গবাক্ষপথে ঊষার আলোক দেখিতে পাইল। তাহার পর আমি আর দাদা একই পার্টির মধ্যে থাকিয়া কী উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছি। ও যে কেবল সহকর্মী নয়, কেবল কমরেড নয়—ও যে আমার দাদা। কত সুখদুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত একসূত্রে গাঁথা আমাদের জীবন। কিসে আমার ভাল হইবে, কিসে আমার একটু আনন্দ হইবে, এই চিন্তা সর্বদা তাহার মনে...। নিজে কলেজে পড়ে নাই। তাহার জন্য দাদার মনে দুঃখ কম ছিল না। 'আর্থকোয়েক রিলিফে'র কাজের 'এলাওএন্স,-এর টাকা দাদা আমার কলেজের পড়ায় খরচ করিয়াছে। তাহার মনের সাধ আমারই উপর দিয়া মিটাইয়াছে। 'রিলিফে'র কাজ শেষ হইবার পর, জিনিসপত্র যখন নিলাম হয় তখন দাদা একখানি সাইকেল কিনিয়া আমাদের দেয়। এসব তো তুচ্ছ জিনিস। দাদায় ভালবাসার প্রসঙ্গে এইসব জিনিসের কথা উঠানো, দাদার ভালবাসাকে ছোট করিয়া দেওয়া মাত্র। আমার মাথা ধরিলে দাদা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। জেলের মধ্যে 'এতোয়ার'[১] করিয়া যে গুড় পাইত, লক্ষ্য করিতাম যে, সে নিজে তাহা খায় না।

১। রবিবার।

কেননা দাদা জানে যে আমার ভাত খাওয়া পর একটু মিষ্ট না খাইলে, মনে হয় খাওয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। জেলে নিয়মিত আমার জামা ও জাঙ্গিয়া কাচিয়া দিয়াছে; বাধা দিলে বলিয়াছে, 'থাক, তোর অভ্যাস নেই।' আমিও আর জোর করি নাই। মনে হইয়াছে দাদা আমার জন্য এসব করিয়া দিবে ইহা তো আমার ন্যায্য দাবি—ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই।

কিন্তু···কিন্তু দাদার কি আমার উপর কিছুই দাবি নাই? থাকিতে পারে। থাকিতে পারে কেন, আছে। তাহার স্থান রাজনীতি ক্ষেত্রের বাহিরে। রাজনীতিক্ষেত্রে, আমি নীলু, আর সে দাদা নয়। এখানে যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়িয়া, যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রত্যেক কার্যপদ্ধতি যাচাই করিতে হইবে; আমার পার্টির দৃষ্টিকোণ দিয়া সকল ধর্ম বিচার করিতে হইবে,···পৃথিবী আমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা ভাবুক, দাদা আমার মনোভাব ঠিক বুঝিবে; সেখানে যে সংকীর্ণতার লেশমাত্র নাই।···

—১৯৪০ সালে আমি আর দাদা যখন গ্রেফ্‌তার হই তখনও আমরা দুইজনেই সি. এস. পি. র মেম্বার। কিন্তু জেলের ভিতর কয়েক মাসের মধ্যে কী পরিবর্তন হইয়া গেল! সেই ওয়ার্ডের কাঁঠাল গাছের তলায়, চন্দ্রদেও-এর সহিত প্রথম আলাপ—তাহার নিকট হইতে বই লওয়া—তাহার লেকচার ক্লাসে যাওয়া—কাঁঠাল গাছের নীচে কম্বল বিছানো লেকচার ক্লাস—সব চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।—তাহার অকাট্য যুক্তির নিকট মাথা নত করিতে হইল। মনে হইল ধীরে ধীরে দৃষ্টির সম্মুখের বধির যবনিকা সরিয়া যাইতেছে,—দাদার পক্ষপুটে থাকিয়া যে ভঙ্গিতে রাজনীতিক্ষেত্র দেখিতাম, তাহা রুগ্ন, jaundiced; ভ্রান্ত; উহা সুবিধাবাদী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাব প্রবণতার উচ্ছ্বাস মাত্র। যথার্থ সর্বহারার সাবলীল উদ্দামতার স্থান সেখানে নাই; জাতীয়তার বাহিরে দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। চন্দ্রদেওদের দলে প্রবেশ করিবার পূর্বে মনে করিয়াছিলাম, দাদার সহিত আলোচনা করিব। বলি বলি করিয়াও কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই; মুখ্যত সংকোচের জন্য, আর গৌণত ভয় ছিল যে তাহার যুক্তির উত্তর দিতে পারিব না। অথচ মনে মনে অনুভব করিতেছিলাম, দাদার যুক্তি ভুল। প্রতি যুক্তির উত্তর যদি চন্দ্রদেও-এর নিকট হইতে শুনিয়া পুনরায় দাদার কাছে বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে হইত। শেষ পর্যন্ত দাদাকে না বলিয়াই নূতন দলে যোগদান করিয়াছিলাম। আর জিজ্ঞাসাই-বা করিব কেন? রাজনীতিক্ষেত্রে নাবালকত্ব কি চিরকালই থাকিয়া যাইবে? সেই সময় হইতে আমাদের দুইজনের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়িয়া উঠিল,—তাহা আজ পর্যন্ত রহিয়া গিয়াছে।—রাজনীতিক কর্মীর জীবন তাহার পার্টির ভিতর—পার্টির বাহিরের অস্তিত্ব তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর হইতে আমি দাদাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছি। নেহাত ব্যক্তিগত কাজের কথা ব্যতীত আর অন্য কোনো কথা হয় নাই। আমার সর্বদা ভয় যে, আমার পার্টির লোকেরা আবার কী মনে করিবে। দাদা যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নামজাদা কর্মী! উহার সহিত অন্তরঙ্গতা আমার পার্টির লোকেরা নিশ্চয়ই পছন্দ করিবে না। আমাকে হয়তো কিছু বলিবে না; কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা করিবে। এই দুই দল ছাড়াও আরও কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলের কর্মীরাও সেখানে ছিল। প্রত্যেক দলের বিশ্বাস যে তাহাদের দলের মধ্যে অপর দলের চর আছে। আর সত্যই; যতই গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা কর, এক দলের কথা অপর দলের লোকেরা নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে। জেলে দেওয়ালেও শুনিতে পায়।

দাদাও আমার সংকোচ দেখিয়া, আমাকে এড়াইয়া চলে। পার্টিক্লাস হইতে আসিয়া

নিয়মিত দেখি আমার বিছানা ঝাড়া হইয়াছে, ঐ পরিচ্ছন্ন বিছানায় দাদার দরদী হাতের স্পর্শ অনুভব করি। যেদিন মা'র কিংবা বাবার চিঠি আসে, সেইদিন কেবল দাদার সহিত কথা বলিবার সুযোগ পাই। মা'র পোস্টকার্ড আসিয়াছে—আমি পড়িয়া দাদার বিছানার উপর রাখিলাম। 'কার চিঠি; মা'র নাকি?' বলিলাম, 'হ্যাঁ'। দাদা চিঠি পড়িতেছে—'সকালে খালি পেটে চা খেয়ো না। মধ্যে মধ্যে ত্রিফলা আর ইসবগুল খাবে। বেলপোড়ার বন্দোবস্ত করতে পারলে সব চাইতে ভাল। আমার বড় ভয়—জেলে তোমাদের প্রত্যেকবারেই আমাশা হয়। সিকিউরিটি বন্দীদের তো এ-সব জিনিস যোগাড় করা শক্ত নয়। যদি টাকার দরকার হয় লিখতে লজ্জা করো না! যেমন করে হোক পাঠিয়ে দেব।'—'মা'র কান্ড'— বলিয়া দাদা অল্প অল্প হাসিতেছে। বাঁ গালে টোল পড়িয়াছে।…কত কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা করে। আগে হইলে মা'র সম্বন্ধে কত গল্প হইত।—এখন খালি বলিলাম, 'হ্যাঁ'। বুক ভরা কত কথা; কিন্তু সংকোচের শৈত্যে জমিয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে।…ছোটবেলায় একখানি লেপের মধ্যে আমি আর দাদা শুইয়া আছি। রাত্রি চারিটা হইতে গল্প আরম্ভ হইয়াছে—গল্পের আর শেষ নাই।…এখন ছোট একটি 'হ্যাঁ' বলিবার পর মনে হইল যে, আর কথা যোগাইতেছে না। কথা ফুরাইয়া যাইবার অস্বস্তি চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে! তাহা ঢাকিবার জন্য একটি কাজের অছিলা লইয়া ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হয়…

…তাহার পর সেই দেউলীতে ট্রান্স্ফারের দিন। আমাদের কয়েকজনকে মাত্র দেউলীতে পাঠানো হইতেছিল। দাদা ঐ দলের মধ্যে ছিল না। যাইবার দিন দাদা আমার বাক্স গুছাইয়া দিল। বাক্সের নিচে একখানি তাল-পাতার পাখা রাখিয়া দিল। …পাখাখানিতে মা'র হাতের ঝালর দেওয়া। তাহার এক জায়গায় লেখা, 'নীলু বিলু পিলুপিলু'। কোন অসংবৃত মুহূর্তে মা'র কী মনে হইয়াছিল, কী ভাবিয়া 'পিলু-পিলু' লিখিয়াছিলেন জানি না। …তাহার ফাউন্টেনপেনটি দাদা আমার পকেটে গুঁজিয়া দিল। এখনও আমার পকেটে সেই কলমটি রহিয়াছে।

'বাবুসাহেব সো গয়ে কেয়া?' (ঘুমিয়ে পড়েছেন না কি?)

দেখিলাম সুবেদার সাহেব পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'না, কেন?'

…সে ডিউটি ছাড়িয়া গেটের বাইরে আসিল কেন?

'আপনার ডিউটি শেষ হল বুঝি?'

'হ্যাঁ,—না আমার তো রাত্রে ডিউটি থাকে না। ভোররাত্রে অফিসার-টফিসারের আসবার কথা। সেই জন্য ভাবলাম, আজ এখানেই শুই। এর আগের ফাঁসির দিন সাহেব রাউন্ডে এসেছিল। ফাঁসিমঞ্চে চারিদিকে বড় বড় আলো দিয়ে সেই জায়গাটা দিনের মতো করে রাখা হয়, আর চারজন ওয়ার্ডার সেইখানে পাহারা দেয়; শালা জেলখানার ব্যাপার; কত রকম কয়েদী, কত রকম ওয়ার্ডার আছে। কেউ পয়সা-টয়সা খেয়ে যদি ফাঁসির মঞ্চে কিছু গোলমাল করে দেয় তাহলে হয় তো কাজের সময়ের আগে সেটা ধরা পড়বে না! তাই এত এত সাবধান হওয়া। একটা ফাঁসিতে গোলমাল হলে সাহেব থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ডার পর্যন্ত সকলের চাকরিতে 'নুক্স্'[১] পড়ে যাবে। আর এসব বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হওয়া উচিত ভিতরের হেড জমাদারের উপর। কিন্তু সে নবাবের পুত্তুর সাহেবকে কী বুঝিয়ে দিয়েছিল জানি না, সাহেব দেখি আমার

১। দাগ, কলঙ্ক।

উপর ভীষণ খাপ্পা। সাহেব নতুন এই 'ডিপার্টমে' এসেছে। জেলের নিয়ম কানুনের না কিছু জানে, না কিছু বোঝে। অমন কত সাহেব লড়ায়ের সময় দেখেছি। কত মেমসাহেবদের হাতের দেওয়া 'সন্তরা'[1] খেয়েছি। এখন কিনা পেটের দায়ে বিনা দোষে গালমন্দ সহ্য করতে হয়।'

দেখিলাম, সুবেদার সাহেব আমাকে কিছু বলিবে, তাহারই ভূমিকা বাঁধিতেছে; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহলে এখন আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'যা মশা, শোবার কি জো আছে? বিছানাও অফিসঘরে পেতে রেখেছি; কিন্তু বড় গরম। আপনারও তো নিশ্চয়ই মশা লাগছে। তাই ভাবলাম বাড়ি গিয়ে চা খেয়ে আসি। যুদ্ধে গিয়ে এই বদভ্যাসটা হয়েছে। তা আপনিও চলুন না কেন? এই মশার কামড়ে সারারাত পড়ে থাকার কী দরকার? নোখে সিং পরিবার নিয়ে থাকে না। তার কোয়ার্টারে রাতটা কাটিয়ে দেবেন'খন। আপনার মানসিক কষ্ট তো আমরা কমাতে পারি না, কিন্তু তাই বলে যতটুকু আপনাদের সেবা করতে পারি, তা কেন করব না? আমাদেরও বালবাচ্চা আছে। আমরাও 'বিলায়েৎ'-এর মানুষ না।'

আমি বলি, 'থাক থাক—বেশ তো আছি। মশা বেশি নেই তো। আবার এখন এই রাতে কোথায় দৌড়াদৌড়ি করব?'

তাহার ভদ্র ব্যবহার আমাকে অভিভূত করে। আমার মৃদু আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া একরকম জোর করিয়া আমাকে টানিয়া উঠাইল। আমি কম্বলগুলি তুলিতেছিলাম। সুবেদার বলিল, 'থাক থাক—আমাকেও কিছু বিছানা দিন। দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে নিয়ে যাওয়া যাক।'

আমি বলি—'কি আর ভারি!'

চারখানি কম্বলের মধ্যে তিনখানি সে নিজেই লয়, আর আমি একখানি।

বলে—'এই তো কাছেই কোয়ার্টার।'

রাস্তা পার হইয়া, ডাক্তারদের কোয়ার্টারগুলি ছাড়াইয়া গিয়া ওয়ার্ডারদের কোয়ার্টারগুলির সম্মুখে দাঁড়াই। কোয়ার্টার বেশি নাই। কেবল সিনিয়র ওয়ার্ডাররা বাড়ি পায়। বাকি সকলে বড় ব্যারাকে থাকে। একটি দরজার সম্মুখে গিয়া দরজা ধাক্কা দিয়া, সুবেদার সাহেব বলে—

'আরে, এ যে দেখি তালা বন্ধ! বাবু, আমি এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। নোখেলাল এখন ডিউটিতে। আপনাকে মিছামিছি কষ্ট দিলাম।'

আমি বলি, 'তাতে কী হয়েছে। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি! কতটুকুই বা দূরে?'

'দাঁড়ান আলো নিয়ে আসি।'

'না না, থাক থাক। আর আলোর দরকার নেই' নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করিয়া, একটি ভাঙা ভাঙা কর্কশ স্বর উঠিল 'লেফট টার্ন্'। দূরত্ব কর্কশতাকে কিছু কমাইয়া স্বরটাকে কিছু মধুর করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। আওয়াজ জেলের ভিতরের। বোধ হয় ওয়ার্ডারের দল বদল হইতেছে। ঠিক গেটের সম্মুখে বসিয়া, দুই ঘণ্টা পূর্বের 'দফাবদলের' সময় ইহা শুনিতে পাই নাই। এখন গেট হইতে কিছু দূরে রহিয়াছি বলিয়া এই শব্দ শুনিতে পাইলাম। গেটটি কী soundproof?

পুনরায় জেলগেটে ফিরিয়া আসিয়া পূর্বের জায়গায় কম্বল পাতি। একখানি মাত্র কম্বল। বাকি তিনখানি সুবেদার সাহেবের কাছে রহিয়া গিয়াছে। এইজন্যই

---

১। কমলালেবু।

কি সুবেদার সাহেবের এত সহৃদয়তা? এইজন্যই কি রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বাড়ি যাইবার কথা মনে হইয়াছে? একখানি কম্বল যদি কেহ জেল হইতে বাহিরে 'চালান' করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে আর তিনখানি কম্বল, অপর তিনজন সহকর্মীকে দিতে হইবে। ইহাই জেলের জিনিস বাইরে 'চালান' দিবার প্রচলিত নিয়ম; তাহা না হইলে ধরা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপে অনায়াসে তিনখানি কম্বল বাড়ি লইয়া যাইবার লোভ সংবরণ করা সুবেদারসাহেবের পক্ষে অসম্ভব। তাহার উপর আবার এখন যুদ্ধের বাজার।...

আবার পূর্বের স্থানে আসিয়া বসি। রাষ্ট্রের বিরাট পেষণ-যন্ত্রগুলির মধ্যে জেলের স্থান নগণ্য নয়। চক্রের মধ্যে চক্র,—ইহারই একটির সম্মুখে বসিয়া আছি। জেলগেট —বড়ই কঠোর ও প্রাণহীন; সবই নিয়মিত রুটিনে হইয়া চলিয়াছে, ঘড়ির কাঁটার মতো। আর ঘড়ির যন্ত্রে প্রধান প্রধান স্থানে যেরূপ জুয়েল বসানো থাকে, সেইরূপ এই পেষণচক্রের দুইটি হীরকখন্ড, গেটের সুবাদার ও ভিতরের সেন্ট্রাল টাওয়ারের হেডওয়ার্ডার।

এই চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যেই জেলগেটের একঘেয়েমি অসহ্য লাগিতেছে! অন্ধকারে ওয়ার্ডারিদের কোয়ার্টার পর্যন্ত ঘুরিয়া আসাতে যেন এই একঘেয়েমি হইতে একটু বাঁচিলাম।...আবার সেই ওয়ার্ডারের দল,—ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া দরজা খোলা ও দরজা বন্ধ করা।...গেটে ওয়ার্ডার না রাখিয়া, যন্ত্রে এই সকল কাজ করিলে কী হয়? একই কাজের পুনরাবৃত্তি যেখানে, সেখানে যন্ত্রের সাহায্য লওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব ও সমীচীন।

গেটের উপরতলা হইতে একটি ওয়ার্ডার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। গেটের দোতলায় জেলরসাহেবের কোয়ার্টার; তাহারই সম্মুখে খোলা বারান্দায়, বন্দুকধারী ওয়ার্ডার ঘন্টা বাজায়—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, রৌদ্রে-হিমে-দিনে-রাত্রে; প্রতি ঘন্টায় ঘন্টি বাজানো তো আছেই, তাহা ছাড়া সাহেব ঢুকিলে দেয় একটি ঘন্টা; গণ্যমান্য অতিথি জেলে ঢুকিবার সময় দেয় দুটি ঘন্টা। বোধ হয় ভিতরের সকলকে সাবধান করিয়া দিবার অন্য ও গলদ ঢাকিবার পর্যাপ্ত সময় দিবার জন্য। ইহার উপর আছে মধ্যে মধ্যে 'পাগলী'র ঘন্টা। সে সময় তো ঘন্টা বাজাবার বিরাম থাকে না। সে সময় দূর হইতে ঠিক রবিবারের গীর্জার ঘন্টাধ্বনির ন্যায় শোনায়।...গীর্জা নিজের দল সামলাইতে ব্যস্ত এবং 'পাগলী'ও একটি শ্রেণীর স্বর্থ রক্ষা করিতে নিয়োজিত।...

...ঘন্টা বাজাইবার ওয়ার্ডার দুই ঘন্টা এত বড় দায়িত্বের কাজ করিয়া সগর্বে গেটের সম্মুখে দিয়া চলিয়া যায়। গেটের বাইরের সান্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার ভাই এত দেরী কেন? নূতন 'দফা'র ওয়ার্ডার তো অনেকক্ষণ উপরে গিয়েছে।'

'আর 'ইয়ার' বল কেন? ডিউটি আরম্ভ করবার সময় আগেকার ওয়ার্ডার বলে যায়, একটার সময় জেলরসাহেবকে ডেকে দিতে। ভাবলাম জেলর সাহেব বুঝি রাউন্ডে বেরুবেন। এখন দোরগোড়ায় ডাকাডাকি করতে গিয়ে দেখি, একেবারে খাপ্পা! এখন বলে কিনা,—কেন চিৎকার করছ? বড় অফিসার,—যা কর শোভা পায়। প্রথমে গরম হয়ে উঠে, পরে আবার হুকুম দিলেন, যে নূতন ওয়ার্ডারকে বলে দিতে তাঁকে যেন তিনটের সময় ডেকে দেয়। এ ওয়ার্ডারটি যদি না ডাকে তেু বেশ হয়; সাহেব নিজেই এসে ডাকবে। তাহলে মজা বেরোয়।....'

গেটের সান্ত্রী বলে, 'দাঁড়াও, যাও কোথায়?—একটু খয়নি-টয়নি খেয়ে যাও।'

'না ভাই, এবার গিয়ে শোয়া যাক। এই রাতে আবার খয়নি খেয়ে কী হবে?'

এ কথা বলা সত্ত্বেও সে খয়নির প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। সে মাথার পাগড়ি খুলিয়া ফেলে– বোধ হয় গরমে। মাথায় বেশ টাক।

গেটের সান্ত্রী বলে, 'একটু ঠান্ডা তেল লাগাবে মাথায়। মাথাটা ঠান্ডা হবে। জমাদার সাহেব তেলটা ফেলে গিয়েছে। বোধ হয় বি-ডিভিশন কয়েদীর হবে। নিশ্চয়ই ঠিকেদার সাহেবের 'নজরানা'। টাকের উপর লাগিয়ে নাও। চুল গজালে আর টাকের উপর মশা কামড়াতে পারবে না।'

ইহার মাথায় টাক যেন আশাই করি নাই।...মেরী স্টুয়ার্টের কুঞ্চিত কেশদামের খ্যাতি ছিল দেশবিদেশে। বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার পর লোকে জানিতে পারে ঐ কেশদাম তাঁহার নিজের নয়; তিনি পরচুলা ব্যবহার করিতেন।...পুলিশ কনস্টেবলের মাথায় টাক কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। উহাদের মাথায় থাকিবে পাগড়ি, সন্ন্যাসীর মাথায় থাকিবে জটা...

—আমি আর দাদা, সেই জমিদার অখোরী সিং-এর বৈঠকখানায় গিয়াছি; তাঁহার ম্যানেজার চিঠি দিয়াছিলেন দেখা করিবার জন্য।...ধূর্ত সাঁওতাল 'মাঝি' নিজের জমি জমিদারের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য উহা মহাত্মাজীকে দান করিয়াছিল। জমিটি জমিদারের মেলার কাছে পড়ে। মেলায় নারীদেহের রূপলাবণ্য যে সকল তাঁবুর পণ্য —সেই তাঁবুগুলি, এই ভূখন্ডের নিকটেই খাড়া করা হয়—সারির পর সারি। এই বর্ধিষ্ণু মেলার এই দিকটাতেও স্থান সংকুলান হইতেছিল না। তাই জমিদারের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ইহার উপর। 'মাঝি' ভাবিয়াছিল—মহাত্মাজীর লোকেরা জমিদারের সহিত লড়ুক, তাহার পর তাহাদের জমির দখল না দিলেই হইবে। প্রথমে আমরা তাহার এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারি নাই। বাবাও বলিয়াছিলেন—কী দরকার ওখানে জমি নিয়ে। আমি চিঠি লিখিয়াছিলান ম্যানেজারের নামে। তাহার উপরেই এই ডাক পড়িয়াছে। বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিয়া অখোরী সিংকে চিনিতেই পারি না। তাঁহার মাথায় টুপি নাই—মাথা ভরা চক্‌চকে টাক। কেবল পিছন দিকের টিকির নিকট একগুচ্ছ কেশ—লম্বা করিয়া রাখা। উহাই spiral-এর মতো ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, 'ব্রিলানটাইন' দিয়া মাথার সম্মুখের দিকে বসানো।... টেকোদের কী সত্যিই অনেক টাকা হয়? ...ম্যাথামেটিক্‌স্‌ টিচার রামেশ্বরবাবু জ্যামিতি পড়াইতেছেন। ঠিক মাথার মধ্যখানে একটি টাক! ব্ল্যাক-বোর্ডে লিখিলেন, 'টেক্‌ ও দি মিড্‌ল পয়েন্ট।' ক্লাসসুদ্ধ সকলে হাসিতেছে।... এইজন্যই কি আগেকার কালে পরচুলা ব্যবহার করিবার প্রথা ছিল? অখোরী সিং ম্যানেজারকে ইংরাজীতে কী যেন বলিলেন। ম্যানেজার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কি মাস্টারসাহেবের ছেলে? কংগ্রেস ভলান্টিয়াররা মাঝির ঐ জমির উপর চালা তুলেছে। শুনেছি যে ঐ দিককার তাঁবুগুলো বয়কটের জন্যে পিকেটিং করবে। কাল রাতে জানেন তো দুজন ভলান্টিয়ারকে পুলিশে ধরেছে, ঐ তাঁবু থেকে অর্ধেক রাতে বেরোবার জন্যে। বোধ হয় মেলার পুলিশের নিয়ম জানেন। রাত বারোটার পর আর কেউ পাড়ার তাঁবু থেকে বেরোতে পারে না। বারোটার আগে চলে এসো, না হলে ভোর বেলায় বেরোও। কাদের পাল্লায় পড়েছেন আপনারা? তার ওপর কার দিক নিয়ে লড়ছেন? এই 'মাঝি'কে দুচার বিঘে জমি অন্য জায়গায় দিলেই তো ও আমাদের দিকে হয়ে যাবে। কংগ্রেসের জন্য মোটা চাঁদা চান, দিতে পারি; কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি এসব গোলমাল মাথায় নেন তাহলে...'

'আদাব বাবুসাহেব'।

ঘন্টার সিপাহী যাইবার সময় আবার আমাকে আদাব করে কেন?

সে বলে, 'পরশু দুপুরে ফাঁসিসেলে আমার ডিউটি ছিল—দেখলাম বাবু খবরের কাগজ পড়ছেন।' লোকটি নিজে হইতেই দাদার খবর দিতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ হইতেই ইচ্ছা করিতেছিল যে এই সব ওয়ার্ডারদের দাদার কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রতি দল ওয়ার্ডার যখনই ডিউটি শেষ করিয়া বাহির হইতেছিল, তখনই ইচ্ছা করিতেছিল যে তাহাদের জিজ্ঞাসা করি, তাহাদের মধ্যে কাহার ফাঁসিসেলে ডিউটি ছিল। কেমন বাধ-বাধ লাগায়, জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। ইহারা সকলেই হয়তো আমার সাক্ষ্য দিবার কথা জানে,—জেলেই তো বিচার হইয়াছিল। কী জানি ইহারা আমার সম্বন্ধে কী মনে করিতেছে…

দাদার সম্বন্ধে খবরের এই অপ্রত্যাশিত সুবিধায় খুব কম আনন্দ হইল। ওয়ার্ডারকে কত কথা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। নেহাল সিং-এর মারফত যে সমস্ত খবর পাইয়াছিলাম, সেগুলি একে একে মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। খাওয়ার কিছু আলাদা ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা বুঝা গেল না। নেহাল সিং কি তাহা হইলে টাকাগুলি সবই নিজেই খাইয়াছে? দাদার জন্য কি কিছুরই বন্দোবস্ত করে নাই? দাদাকে পেন্সিল, কলম, কিছুই কি কিনিয়া দেয় নাই? বাবুজী কতক্ষণ সেলের মধ্যে পায়চারি করে, কখন ওঠে, কখন স্নান করে, কখন ঘুমায়, সব কথার উত্তর ওয়ার্ডারটি দিল। অধিকাংশ মনে হইল আন্দাজে বলিতেছে। আসলে সে নিজে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করে নাই। একদিন নাকি সে দেখিয়াছিল যে বাবুজী বিড়ালকে দই খাওয়াইতেছেন। হইতেও পারে। সত্যমিথ্যা মিলানো, তাহার গল্প শুনিতে বেশ ভাল লাগে। অন্তত এটুকু সত্য যে, সে দাদাকে দেখিয়াছে।…ওয়ার্ডারটি চলিয়া গেল। পায়ে পট্টি বা মোজা নাই—যা গরম। খাকির হ্যাফপ্যান্টের নিচে পা দুইটি ধনুকের ন্যায় বাঁকা মনে হয়।

…চীনেম্যানের পা।…দৈত্যের ছায়া যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে দুইখানি চলমান পা—অন্ধকার—গেটের এক ঝলক আলোকে আলোকিত পিচের রাস্তার এক টুকরা—আঁধার ভরা দেওয়াল—গেটের গরাদ—আবার গেটের ভিতর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া এই আলোকিত অংশই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার বাইরে ইহা অপেক্ষা কতগুণ বিস্তৃত অন্ধকার ও যোজনব্যাপী তারকা খচিত আকাশ রহিয়াছে। তাহা আমার মন ও দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না।…গেটের ভিতর প্রবেশ করিতে মধ্যে হলঘর, দক্ষিণে জেল অফিস, বামে জেলর ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট দুই জনের বসিবার ঘর। অফিসের বাহিরের দিকের গরাদগুলির উপর লোহার জাল দেওয়া। কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজন আসিলে, এই জালঘেরা গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে। আশ্চর্য এ জেলের ব্যবস্থা! সাক্ষাৎকারীদের রৌদ্র ও জল হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহার উপর একটি আচ্ছাদন পর্যন্ত নাই—জাল দেওয়া, পাছে কোনো জিনিস আদান-প্রদানের চেষ্টা করা হয়। অনভিজ্ঞ সাক্ষাৎকারী একে তো বিস্তর খরচ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জেলগেটে আসিয়া পৌঁছায়; তাহার পর দরখাস্ত করার হাঙ্গামায় ও দরখাস্ত মঞ্জুরির অর্থব্যয়ে প্রায় দিশাহারা হইয়া পড়ে। এই সকল দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া, যখন কয়েক মিনিটের জন্য গরাদের ব্যবধানে কয়েদীর পোশাক পরিহিত একটি রুক্ষকেশ শীর্ণমূর্তি দেখিতে পায়, তখন ইহা যে তাহার অতি পরিচিত প্রিয়জনের মূর্তি এই কথাটি ভাবিয়া লইতেও সময় লাগে। সাধারণ মেট ও ওয়ার্ডারদের অপমানসূচক কথাবার্তা ইহাদের ওপর অকাতরে বর্ষিত হইতেছে। কয়েদীর পোশাক, খাকির উর্দি ও পাগড়ি, গরাদ, তালা, সি. আই. ডি. সব মিলিয়া আবহাওয়া এমন করিয়া তোলে যে, এখানে দিশাহারা না হইয়া পড়াই আশ্চর্য। অবান্তর দুই চারটি কথার

পর শোনা যায় যে সময় হইয়া গিয়াছে। সাক্ষাৎকারীর চোখের সম্মুখে কিছুক্ষণ পরে ভাসিয়া উঠে, প্রিয় পরিজনের দুইটি মূর্তি ; একটি যখন গরাদের সম্মুখে আসে তখনকার,—উদ্‌গ্রীব, সলজ্জ, অপ্রতিভ মুখখানি ! আর একটি চলিয়া যাইবার সময়ের—করুণ, অসহায়, আশাহীন। তখনকার জোর করিয়া মুখে হাসি আনিবার ব্যর্থ প্রয়াস, মুখফাটা ক্রন্দন অপেক্ষাও মর্মন্তুদ মনে হয়।

…১৯৩৪-এ বাবার সহিত দেখা করিতে হাজারীবাগ জেলে গিয়াছি। জ্যাঠাইমা সঙ্গে এক টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্তি করিয়া বাবার জন্য খাবার তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন ; গিয়া শুনিলাম সেদিন আপার ডিভিশন কয়েদীদের সাক্ষাতের দিন নয়, 'সি' ক্লাস কয়েদীদের সাক্ষাতের দিন। কয়েকজন সাক্ষাৎকারী স্টেশনে টিকিট ঘরের সম্মুখে যেমন হয়, ঠিক সেইরূপ ঠেলাঠেলি করিতেছে। গরাদের ভিতরেও অনেকগুলি কয়েদী —জানালার গরাদের নিকটে আসিবার জন্য ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। হট্টগোলের ভিতর কে কী বলিতেছে, কাহাকে বলিতেছে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে ও কান্নার সহিত গ্রাম্য ভাষায় কী সব বলিয়া যাইতেছে, তাহার ছেলে বুঝিতে পারিতেছে কিনা সন্দেহ। একটি বৃদ্ধ মুণ্ডা কয়েকটি পেয়ারা ও এক ঠোঙা ফুলরি লইয়া আসিয়াছে ! সে তাহার ছেলেকে উহা খাইতে দিবার জন্য ওয়ার্ডারের খোশামোদ করিতেছে ! ওয়ার্ডার দর বাড়াইতেছে 'ডাক্তার সাহেব মঞ্জুর না করলে কী করে দেব ? 'সি' ক্লাসীদের বাইরের জিনিস নেবার হুকুম নেই। 'সি' ক্লাস কয়েদীকে খাবার দেবার জন্য আমাকে এক টাকা দিতে হবে। ডাক্তার সাহেবের মঞ্জুরির জন্যে আর এক টাকা। আমার চাকরির গোলমাল হতে পারে—এসব কাজ আমি বিনা পয়সায় করব কেন ?' অনেক কাকুতি-মিনতির পর এক টাকায় রফা হয়। ইহা বোধ হয় দরিদ্র মুন্ডাটির এক বৎসরের সঞ্চয়। টাকাটি সিপাহীজী পাগড়ির ভিতর গুঁজিয়া রাখিল। এই ফুলুরির ঠোঙা কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছিল কিনা কে জানে।

গেটের বাঁদিকের দেওয়ালে একটি কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে নোটিস বোর্ড। উহার ভিতরে কাল রং-এর পটভূমিতে অনেকগুলি সাদা কাগজ আঁটা রহিয়াছে। কিসের নোটিস জানি না। অন্য জেলে তো দেখি কেবল জেল কমিটির মেম্বারদের নাম লেখা থাকে। এত সব নোটিস ! বোধ হয় আই. জি. শীঘ্রই জেল ভিজিটে আসিবেন। নোটিস বোর্ডের নিচে টেলিফোন রিসিভার। ইহার পশ্চিম দিক ঘেঁষিয়া একটি ওজন করিবার যন্ত্র—রেল স্টেশনে যেমন থাকে। আর ঠিক গেটের মধ্যে দিয়া গিয়াছে এক রেললাইন—ন্যারো গেজের লাইনের সমান চওড়া ডি. এইচ. আর.-এর কিষাণগঞ্জ লাইনে সেই একবার ছোট্ট এন্‌জিনটির সহিত একটি গরুর ধাক্কা লাগে। চুঙ্গীপাড়ার কাছে গাড়ি ডিরেল্‌ড হইয়া গিয়াছিল। জেল ফ্যাক্টরির জিনিসপত্র বোঝাই করা ট্রলি, এই গেটের লাইনের উপর দিয়া চলে। লোহার লাইনের পাশে স্থানে স্থানে গোবর পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয় গরুর গাড়ি গিয়াছে। সাহেব ও হাকিম আসিবে বলিয়া দেখিতেছি সকলেই সন্ত্রস্ত, কিন্তু গোবরটি পরিষ্কার করার কথা কাহারও মনে নাই। হয়তো মনে আছে, কিন্তু সকালে কয়েদীরা না আসা পর্যন্ত পরিষ্কার করিবে কে ? মহামান্য ওয়ার্ডার সাহেবেরা এই হেয় কাজ করিতে যাইবে কেন ? রেল লাইন, নোটিস বোর্ড, ওজনের যন্ত্র, টেলিফোন, পাথরে বাঁধানো মেঝে, সব মিলাইয়া স্থানটিতে একটি রেল স্টেশনের ভাব আনিয়া দিয়াছে। মনে হইতেছে গাড়ির প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফর্মের উপর কম্বল পাতিয়া বসিয়া আছি।…

…সৌরীনকে বলিয়াছি রামকৃষ্ণ মিশনের সৎকার কমিটিকে খবর দিতে—সকলে যেন খাড়িয়াবাগ ঘাটে উপস্থিত হয়। ছোট শহর; অধিকাংশ লোকই কোনো না কোনো রকমে গভর্ণমেন্টের সহিত সংশ্লিষ্ট—উকিল, মোক্তার, কেরানী। তাহাদের সকলকেই গভর্ণমেন্টের বর্তমান মনোভাবের হিসাব রাখিয়া চলিতে হয়। যদি তাহারা না আসে? পুলিশের ভয়ে নাও আসিতে পারে। তাহা হইলে? তাহা হইলে জেলের লোকই দাহ করিবে। ইহারা পাঁচটি টাকা ও মোটর-লরি তো সকলকেই দেয়। সৌরীনের আবার মতলব দেখিলাম প্রোসেশন করিবার। বৃহস্পতিবারে কালেক্টরসাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কালেক্টর সাহেব এই সর্তে মৃতদেহ আমাকে দিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, কোনো প্রোসেশন যেন না হয়। লোকে বোধ হয় শুনিবে না। শ্মশান ঘাটে গিয়ে যদি সকলে জড়ো হয়,—সে যত বড় ভিড়ই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না—তাহা হইলে আমার কথা থাকে। কিন্তু বারণ করিব কাহাকে? পাটকল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট দাদা—ঐ সকল ইউনিয়নের সদস্যদের বাধা দিবে কে? আর কালেক্টর সাহেবের কাছে কী কথা দিয়াছি তাহাই বড় হইল? না; হউক প্রোসেশন! দাদার মৃতদেহ, বিলুবাবুর মৃতদেহ, শহীদের মৃতদেহ, 'মাস্টারসাহেবের বেটার' মৃতদেহ, ইহাতেও লোকে প্রোসেশন করিবে না তো কিসে করিবে?…গাড়ি মোটর, বিপুল জনতা—ফুলের মালা—দেবদারু পাতা—বাড়িবাড়ি হইতে গঙ্গাজল বর্ষিত হইতেছে—দোতলা হইতে কয়েকখানি তালপাতার পাখা পড়িল, তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি—ভিড় – ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি—তাহার পর অন্তহীন নরপ্রবাহের সর্পিল গতি।…নীরব—'গান্ধীজীকা জয়' নাই—'বিলুবাবুর জয়' নাই—শোকের 'মর্সিয়া' গীত নাই—বিশৃঙ্খলা জনসমুদ্রের উদ্দণ্ডতা নাই। আছে মুহ্যমান শোকের নিষ্ক্রিয়তা—আছে একটি 'রাষ্ট্রীয় পরিবারের' একজন ছাড়া অপর সকলের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি—আছে সুপ্ত দেশাত্মবোধের ধিক্কার—আছে ভস্মের দৃশ্যমান শীতলতার মধ্যে ব্যর্থ আক্রোশের জাগরূক বহ্নি। এক ইশারায় এই অসহায় শান্ত জনতা হিংস্র ও উন্মাদ হইয়া আমাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে।…সম্পূর্ণ হরতাল। জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সম্মুখে প্রোসেশন এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়াছে। জ্যাঠাইমা কি একবার ঐ মৃতদেহের মুখের উপরের ফুলগুলি সরাইয়া, উহার দিকে তাকাইতে পারিবেন? কেবল মুখটি খোলা হইবে। গলা আমি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিব—ফুলচন্দনে মুখের বীভৎসতা ঢাকা পড়িয়াছে। মুখের কোণ হইতে কখন আসিয়া পড়িয়াছে কয়েক বিন্দু লোহিতাভ লালা—এখন শুকাইয়া রক্তচন্দনের ছাপের মতো দেখাইতেছে। না জ্যাঠাইমার বাড়ির সম্মুখ দিয়া কিছুতেই মিছিল যাইতে দেওয়া হইবে না… শ্মশানঘাটে বিস্তীর্ণ জনসমুদ্র—লাল পাগড়িতে চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে—বন্দুকধারী দেহরক্ষীর সহিত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশসাহেব মোটরকার হইতে নামিলেন। দাহকার্যে বিশেষজ্ঞ মনতীদা চিতা সাজাইতেছে। সে সকল প্রকার উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতার বাহিরে। জিজ্ঞাসা করিল, 'মুন্যিসিপালিটির কাঠ বুঝি? মড়া পোড়ানোর জন্যে যবে থেকে কাঠ স্টক করা আরম্ভ করেছে, তবে থেকে এই কাঠগুলোই দেখছি। একেবারে ঘুণ ধরে গিয়েছে। হবে না? থার্ডক্লাস মুন্যিসিপালিটি—কাঠের খরচ কোথায় এদের?' মড়া পোড়াইবার দিন মনতীদাকে এক বোতল করিয়া দেশী মদ দিতে হয়। সকলেই একথা জানে। আজও কি মনতীদা, আমার নিকট মদ চাহিবে নাকি? ছাই লইয়া কী কাড়াকাড়ি। মহিলারা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইতেছেন—কেহ কেহ ছেলেদের কপালে লাগাইয়া দিতেছেন।…এই সময় কি কোনো মা ছেলেকে প্রাণে ধরিয়া মনে মনে

বলিতে পারিয়াছে, 'বিলুবাবুর মতো হও' ।...কখনই পারে নাই...সেবার পানবসন্ত লইয়া আমি আর দাদা একসঙ্গে গরুর গাড়িতে আশ্রমে ঢুকিলাম। মা'র হাতে পাখা—দুই বিছানায় দুইজন শুইয়া আছি। মনে উৎকণ্ঠা ও গভীর বেদনা চাপিবার চেষ্টা করিয়া মা শুধু বলিলেন, 'তোরা আমায় পাগল করবি ?' মা ঠিকই বলিয়াছিলেন।... মুহূর্তের মধ্যে জনতার সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে—'জয়'! 'গান্ধীজীকা জয়!'—'জয় বিলুবাবুকা জয়!' 'নৌকরসাহি নাশ হো!' জয়ধ্বনির নির্ঘোষে আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত। মিলের সেই কুলিটি ঠিক যথাসময়ে 'নারা লাগাইবার' নেতৃত্ব লইয়াছে। শীর্ণকায় লোকের এত দরাজ গলা কী করিয়া সম্ভব হয়? সে বলিতেছে 'বন্দে', জনতা বলিতেছে 'মাতরম্'; সে বলিতেছে 'বিলুবাবুকা', জনতা বলিতেছে 'জয়'। প্রতিবার বলিবার সময় সে ডানহাতখানি ঊর্ধ্বে উঠাইতেছে, মনে হইতেছে তর্জনী দিয়া আকাশের কোনো অজ্ঞাত লোকের দিশা দেখাইতেছে। পুলিশ ভিড় সরাইয়া দিল। মৃদু লাঠি 'চার্জে'র প্রয়োজন হইল না। কুলিদের নেতাটির গলা ভাঙিয়া গিয়াছে। হাত উঁচু করিয়া মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনি দিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহাতে হাওয়াভরা রবার টায়ার হঠাৎ ছিদ্র হইয়া গেল যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ একটি আওয়াজ বাহির হইতেছে।

যেদিকে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘর, জেলগেটের সেই কোণে, দেওয়াল ভরিয়া নানা প্রকার শাস্তি দিবার যন্ত্রাদি টাঙানো—নানারকমের হাতকড়ি, বেড়ি, 'ডান্ডাবেড়ি', 'শিকলী বেড়ি'। কেহ জেলের ভিতর ওয়ার্ডারের সহিত রুখিয়া কথা বলিয়াছে; কেহ হয়তো জেলরসাহেবকে দেখাইয়া দিয়াছে যে 'ফৈল'-এ (পরিবেশন করিবার হাতা) সাড়ে পাঁচ ছটাক চাউলের স্থানে মাত্র সাড়ে তিন ছটাক চাউল আঁটে; কেহ হয়তো ঝগড়া করিয়াছে যে তিন মাস হইতে কুমড়ার তরকারি ব্যতীত আর অন্য কোনো তরকারি কেন তাহাদের দেওয়া হয় না; কেহ হয়তো একটি বেল পাড়িয়াছে—এইরূপ অসংখ্য মারাত্মক 'জেল অফেন্স'-এর সাজা দিবার জন্য এই সকল সাজ সরঞ্জাম। কয়েকটি বড় বড় পিপের মধ্যে দাঁড় করানো রহিয়াছে, শতাধিক পাকা বাঁশের লাঠি। তাহার পাশে একটি স্ট্যান্ড-এর ছিদ্রের মধ্যে বসানো অনেকগুলি মোটা বেতের লাঠি। হাতে ঝুলাইয়া লইবার জন্য লাঠিগুলির উপরের দিকেতে একটি করিয়া নেয়ারের বেড় আছে। উপরের দিকের দেওয়ালে টাঙানো আছে অনেকগুলি পুলিশের বেটন আর ডান দিকের কোণে দেওয়ালে হুকের সহিত টাঙানো কয়েকটি লাল বালতি—তাহার উপর লেখা আছে FIRE। একদিকে গাদা করা আছে, বাঁশের ডগায় ন্যাকড়া জড়ানো কয়েক ডজন মশাল। রাত্রে 'গিন্‌তী মিলান্' কিছুতেই যখন আর হয় না, তখন এই মশালগুলি কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া ওয়ার্ডাররা কয়েদী খুঁজিবার প্রয়াস পায়। লন্ঠন কিংবা টর্চ তাহাদের হাতে দিয়া দিলেই তো হয়, তা নয় যত সব...

সেই একবার কয়েদী পালানোর রিহার্সাল হইতেছে। 'পাগলা' ঘন্টা বাজিতেছে। সাহেব সেন্‌ট্রাল টাওয়ারের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। ওয়ার্ডাররা সাহেবকে নিজের নিজের কর্মকুশলতা দেখাইবার জন্য মশাল লইয়া এদিকে ওদিকে দৌড়াইতেছে—গাছতলা ও পায়খানাগুলির উপরই তাহাদের দৃষ্টি বেশি। যোগীলাল ওয়ার্ডের মধ্য হইতে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহাব, হৈ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহাব, কয়েদী সচ্ ভাগা হ্যায় ন পেরক্‌টিস পাগলী হ্যায় ?' খোঁজা শেষ হইলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাদের ওয়ার্ড-এ আসিলেন। আমরা সকলে তখন লক্ষ্মী ছেলের মতো নিজের নিজের বিছানায়। ব্যাপার আর বেশি দূর গড়াইল না।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।

আর মাত্র তিন ঘণ্টা। আজকাল নূতন টাইমে সাড়ে পাঁচটার পূর্বে সূর্যোদয় বোধহয় হয় না। তাহার পর? সূর্যোদয়ের পূর্বেই ইহাদের সব কাজ শেষ হইয়া যাওয়া চাই। কেননা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জেলের প্রাত্যহিক জীবন আরম্ভ হইয়া যাইবে। সাতটার পূর্বেই প্রাতঃকালীন লপ্‌সী পর্ব শেষ করিয়া দিতে হইবে, কারণ সাতটা হইতে ফ্যাক্টরি খুলিবে। সাড়ে পাঁচটার সময় উনানে আগুন না দিলে, সাতটার পূর্বে প্রাতরাশ শেষ হইবে কীরূপে? যে সকল কয়েদী 'ভাঠ্‌ঠহা' (রান্নাঘরে) কম্যান্ডে কাজ করে, তাহাদের প্রাতঃকৃত্যাদির জন্যও তো সময় দিতে হইবে। না, পাঁচটার মধ্যেই বোধ হয় কাজ শেষ হইবে—

—দাদা এখন কী করিতেছে? হয়তো গরাদ ধরিয়া অন্ধকার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিয়া চলিতেছে। আমার কথাও কি একবারও ভাবিবে? দাদা কখনই আমাকে ভুল বুঝিতে পারে না। এ সম্বন্ধে দাদার সহিত পরিষ্কার কথাবার্তা যদি বলিতে পারিতাম। বুঝি যে, দাদার কাছে আমার আচরণ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার দরকার হইবে না; কিন্তু বোধ হয় ইহাতে মনের ভার কিছু লাঘব হইত। তাহার পার্টির প্রোগ্রামে কার্যকরী করার অর্থই পরোক্ষে ফ্যাসিস্ত্ শক্তিকে দৃঢ় করা—ইহা কি দাদা বুঝে নাই? কিন্তু সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর কোথায় যেন খচ্‌খচ্ করিয়া কী একটা বিঁধিতেছে। বোধ হয় যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতার অহেতুক অনুতাপ। আমার নিজের পার্টির স্থানীয় শাখার মেম্বরদের মত যে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া আমার ঠিক হয় নাই; দাদার বিরুদ্ধে বলিয়া নয়; —তাহাদের মত যে আমাদের কর্তব্য দেশের লোককে তাহাদের ভ্রম চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া, তাহাদের বুঝানো। তাহাদের পুলিশে ধরাইয়া দেওয়া নাকি আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নয়। পৃথিবীর আর সকলে যে যাহা ইচ্ছা মনে করুক; কিন্তু আমার পার্টির লোকের আমার কার্য সম্বন্ধে এই মত—ইহাই unkindest out of all। মার্ক্সবাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়তো আমি ঠিক বুঝি না। যতদিন দাদাদের দলে ছিলাম দাদারই হুকুম তামিল করিয়া আসিয়াছি। উহার কথাই বেদবাক্য বলিয়া মনে করিয়াছি। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে দাদা হাজারীবাগ জেল হইতে ছাড়া পায়। সিকিউরিটি বন্দীদের কেস-এর scrutiny হইতেছিল। একজন হাইকোর্ট জজের উপর ছিল এই কার্যের ভার; কী যেন নাম—মারাহাট্টী—জাস্টিস্ ভাটে। দাদা ছাড়া পাইবার পর, এপ্রিলে আমাদের দেউলী হইতে হাজারীবাগ জেলে লইয়া আসে। শুনিলাম সকলকে নিজের প্রদেশে লইয়া যাওয়া হইবে। তাহার পর আমাকে ছাড়িয়া দেয় ১৮ই জুন। ফ্যাসিস্ত্ বিরোধী দলদের আর জেলে রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই তখন ছিল সরকারের মনোভাব।—জেল হইতে বাহির হইবার সময় অত আনন্দ আর কোনোবার হয় নাই। সর্বহারা জাতশত্রু ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারিব, প্রয়োজন হইলে, ইহার জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিব—এই সুযোগ দানের জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। স্পেনের কর্মীদের কাহিনী, লালচীনের মরণজয়ী বীরদের কাহিনী, মাওসেটুং-এর শৌর্য ও একনিষ্ঠতা, চন্দ্রদেও-এর ক্লাসের প্রতিদিনের ভাষণ, শরীরের সকল স্নায়ুতে উৎসাহের আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। আমার জেলার কত কাজ আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে; সেখানে লোকে মাহাত্মাজী আর মাস্টারসাহেব ছাড়া আর কাহাকেও জানে না। অন্ধ বিশ্বাসের এই অকর্ষিত ভূমিতে আমাকে যে যুক্তির ফসল

ফলাইতে হইবে। আশ্রমে ফিরিয়া একবার মা'র সহিত সাক্ষাৎ না করিলেও নয়—আমার অপারেশনের জন্য নিশ্চয়ই খুব চিন্তিত ছিলেন। একবার সেখানে সকলের সহিত দেখাশুনা করিয়া লইয়া তাহার পর কাজ আরম্ভ করা যাইবে। মোটর-বাস, কোডার্মা স্টেশন, গয়া ওয়েটিংরুম-এ কী মশা!—কিউল—সাহেবগঞ্জ, মণিহারীঘাট, কাটিহার—পথের আর শেষ নাই।—

সেই ব্যাকুলতা আজ আমাকে বর্তমান স্থিতিতে আনিয়াছে!—দাদা—জনমত আর সর্বাপেক্ষা দুঃসহ, আমার পার্টির স্থানীয় কমরেডদের মত। ভুল! পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ভুল হইতে পারে, আমার ভুল হয় নাই। সেই ১৯৪২-এর আগস্টের ঘটনাসমূহের পরিবেশে আমার কার্যের বিচার করিতে হইবে।—এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশসুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে। যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মাইলের পর মাইল রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়াছে—লোহার রেল লাইন, ভারী ভারী রেলওয়ে স্লিপার, আর কত জিনিস; দূরের নদীতে গিয়া ফেলিয়া আসিতেছে। টেলিগ্রাফের তার কাটা, পোস্ট অফিস ও মদের দোকান জ্বালানোর ভার গ্রামের বালকদের উপর। বয়স্ক লোকে ঐ সব তুচ্ছ কাজ করিয়া নিজেদের হাত গন্ধ করতে চায় না। তার কাটা এত সহজ, টেলিগ্রাফের তার এত ভঙ্গপ্রবণ তাহা জানা ছিল না। প্লায়ার্স, যন্ত্রপাতি, কাঁচি, কাটারি, কোনো জিনিসের দরকার নাই। দড়ি ঝুলাইয়া ছেলেরা ঝুলিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা মুচড়াইয়া ভাঙিয়া দিতেছে। বড়রা চায় নূতন কার্যক্রম। আর কী করিতে হইবে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। রেলস্টেশন, খাসমহল কাছারি, সবরেজিস্ট্রি অফিস ও থানার পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। হাতে কিছুই কাজ নাই। যেখানেই তাহারা দল বাঁধিয়া যাইতেছে সেখানেই তাহাদের সম্মুখে শক্তির স্তম্ভগুলি ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে ও অত্যাচারের প্রতীকগুলি মাথা নত করিয়া লইতেছে। সরকারী কর্মচারীরা জনতার খোশামোদ করে, মাড়োয়ারী অকাতরে চাঁদা দেয়, জমিদার কাছারির নায়েব তাহাদের এক বছর খাজনা মাফ করিয়া দিবার আশ্বাস দেয়, খাসমহল কাছারির ম্যানেজার তাহাদের ভোজের আয়োজন করিয়া দেন, দারোগা সাহেব গান্ধীটুপী মাথায় দিয়া, ত্রিবর্ণ পতকা হাতে লইয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন, চৌকিদার তাহার উর্দি জ্বালাইয়া কাজে ইস্তফা দেয়। গরীব কিষাণের আনন্দ, আর তাহাকে জমিদারের খাজনা দিতে হইবে না, চৌকিদারি ট্যাক্‌স্ দিতে হইবে না। নূতন কিছু করিবার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে না।...ফরবিশগঞ্জ লাইনের যে অংশের লাইন ঠিক ছিল, সেই অংশের উপর এন্‌জিন ড্রাইভার ও গার্ড জনতার হুকুম মতো গাড়ি চালাইতেছে। প্রতি স্টেসনে টিকিটঘরের সম্মুখে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, টিকিট করিয়া ভ্রমণ নিষিদ্ধ। গড়বনেলী স্কুলের কয়েকটি ছাত্র অনবরত চিৎকার করিতেছে 'গাড়ি কিসকী?—হমারী।' 'স্টেশন কিসকী?—হমারী।' 'এঞ্জিন কিসকী?—হমারী।' আর একদল লোক ট্রেনে টিকিট চেকারের কাজ করিতেছে—যাহার কাছে টিকিট থাকিবে তাহাকে গাড়ি হইতে নামাইয়া দেওয়া হইবে। একজন যাত্রীর নিকট হইতে উইক এন্ড রিটার্নের অর্ধেক টিকিট বাহির হইল। 'উতর যাও, আভি উৎরো। তুম স্বরাজ নহী চাহতে হো।' সে কাকুতি-মিনতি করে। বলে এটি পুরনো টিকিট। কে তাহার কথা শোনে। চেন্ টানিয়া গাড়ি থামাইয়া তাহাকে নামানো হইল। খানিক দূরে গিয়া মাঝ রাস্তায় আবার ট্রেন থামে। তেওয়ারীজী ঐ দিকে মিটিং করিতে কোথায় যেন গিয়াছিলেন।

ঘন্টা দুই ঐ স্থানে অপেক্ষা করিবার পর, দূরে কংগ্রেস পতাকা সংবলিত তেওয়ারীজীর গরুর গাড়ি দেখা গেল। তেওয়ারীজী আসিয়া গাড়িতে চড়িলেন। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল। গাড়ি ছাড়িল।—স্টেশনে স্টেশনে চেয়ার, টেবিল, ঘড়ি, Station Master's Office লেখা সাইনবোর্ড, বড় বড় খাতা বই, একত্রে জড়ো করিয়া জ্বালানো হইতেছে। রেলকর্মচারীগণেরও ইহাদের সহিত সহানুভূতি লক্ষ্য করিতেছি। কোথাও বাধা দিবার চেষ্টা নাই, অনেক স্থানে স্বেচ্ছায় সাহায্য করিতেছে। একজন ছাত্র প্ল্যাটফর্মের একটি আলো লইয়া 'রায়বেশে' নৃত্যের ভঙ্গিতে সকলের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে! কসবা স্টেশনে স্কুল কলেজের ছাত্ররা টিকিট-চেকার বাচ্চী সিংকে চাঁদা করিয়া প্রহার দিয়া বহুদিন বঞ্চিত আক্রোশ মিটাইয়াছে।···

···চুকরী থানায় 'মহাত্মাজীকা ইজলাস' বসিয়াছে। আর কেহ সরকারী এজলাসে যাইবে না। দারোগাবাবুকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাঁহাকে 'কৌমী (জাতীয়) জেল'-এ লইয়া যাওয়া যাইবে! দারোগাবাবুকে 'দ্বিতীয় ডিভিশন' কয়েদী করা হইল। 'পুরী খিলানা রোজ; আরও দেখনা উনকী স্ত্রী যাঁহা যানে চাহেঁ ওঁহাঁ পঁহুচা দেনা, বহুত হিফাজৎসে।' জেল খুলিয়া কয়েদী পলাইতেছে। জেলখানার উপর কংগ্রেস পতাকা। সরকারী ট্রেজারির নোটগুলি জ্বালানো হইতেছে। পশ্চিমে গোরখপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে পূর্ণিয়া পর্যন্ত সর্বত্রই দেশের এই অবস্থা! সম্পূর্ণ অরাজকতা—ফ্যাসিস্তদের রাজত্ব—জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয়—অসংহত, বিশৃঙ্খল, অদূরদর্শী—অথচ দুর্লভ নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমায় মহীয়ান। লাল পাগড়ি কালো মুখ, হেলমেট পরা লাল মুখ, বন্দুক, টমিগান, কিছুই জনতাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। দূরে বীরগাঁও স্টেশনের হাটে টমিগানের শব্দ হইতেছে—এদিকে ভুট্টার ক্ষেতে তাহার নকল করিয়া ছেলেরা স্টেশনের 'ফগ সিগনাল'গুলি ফুটাইতেছে। কেন করিতেছে তাহারা জানে না। হোলির দিন গ্রামসুদ্ধ লোক নেশা করিয়া যেইরূপ হইয়া যায় ইহারাও ঠিক সেইরূপ। এই অধীর উত্তেজনাকেই দাদার দল বলে বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সাল,—ইহাই নাকি 'ক্রান্তির প্রচেষ্টা'। বীরগাঁওয়ের ক্রান্তিপ্রচেষ্টার নেতা কে? বিনায়ক মিসির। সে সর্বঘটে আছে। আশেপাশের গ্রামে 'সত্যদেবকে কথা' শোনায়, 'ছট পরবের' পৌরোহিত্য করে, হিন্দু মিশনে লেকচার দেয়, খ্রীষ্টান সাঁওতালদের 'শুদ্ধি' করে, কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় মন্ত্রীর টুর-এ মোটরে তাঁহার গা ঘেঁসিয়ে বসে। সে হাত গুনিয়া বিবাহের দিন দেখিবা, ঠিকুজি তৈয়ারী করিয়া, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী ও টোটকা ঔষধ দিয়া বেশ পয়সা রোজগার করে। একখানি মোটা হিন্দী বই তাহার পুঁজি। ইহাতে ধাঁধার উত্তর হইতে টোটকা ঔষধ পর্যন্ত সব আছে। ধাঙ্গড় বস্তিতে কালীপূজার মন্ত্র পড়িবার সময়, এই পুস্তক হইতে হিন্দীতে রামায়ণ গল্প পড়িয়া দেয়। এইরূপ ধরনের নেতৃত্বে, এইরূপ সংগঠনে, এইরূপ সময়ে, হইবে 'ক্রান্তি'। কে একথা দাদাদের বুঝাইত? আমি কিছুতেই অন্যায় করি নাই। আমার কর্তব্য করিয়াছি মাত্র। আর আমি সাক্ষ্য না দিলেও, অন্য লোক দিত। গভর্মেন্টের লোকের অভাব নাই। তফাতের মধ্যে আমি দিয়াছি নিজের রাজনীতিক সিদ্ধান্তের জন্য ও কর্তব্যের খাতিরে; আর অন্য লোক দিত, লোভে পড়িয়া। দাদার সহিত যদি এ বিষয়ে প্রাণখোলা আলোচনা করিতে পারিতাম! না, উহা নিরর্থক হইত। আমি কত কিছু বলিয়া যাইতাম; আর দাদা নীরবে ধৈর্যের সহিত তাহা শুনিয়া মধ্যে মধ্যে হাসিত। হয়তো বা একটি আধটি এমন কথা বলিত, যাহাতে আমার যুক্তিস্রোত ঘোলাটে হইয়া যাইত। ঐ মৃদু হাসিতে বাঁ গালে টোল

পড়িলেই, আমি বুঝিতে পারি যে আমার আপাততীক্ষ্ম যুক্তি, উহার দৃঢ় বিচারশক্তির উপর সামান্য দাগও কাটিতে পারে নাই। হাসিটি আমাকে পরাস্ত করিবার জন্য নয়; উহা কেবল আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য! দুই একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আমার যুক্তির সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

গত সপ্তাহে যখন দাদার সহিত দেখা করিতে আসি তখন এ প্রশ্ন দাদাকে জিজ্ঞাসা করি নাই;—যুক্তিতে পরাজিত হইবার ভয়ে নয়, সংকোচে। উহা কি অপরাধীর মনের সংকোচ? না, আমি কোনো অপরাধই করি নাই। তবে অপরাধজনিত সংকোচ আমার মনে আসিবে কেমন করিয়া? ঐ সকল কথা উত্থাপন করা সুশোভন হইত না—সংকোচ তাহারই জন্য। অন্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় যাহাকে আঙিনায় তুলসী-তলায় লইয়া আনা হইয়াছে তাহার কাছে কি জিজ্ঞাসা করা যায় যে উইলখানি কোথায় রাখিয়া গিয়াছেন। না, দাদাকে বুঝাইবার দরকার নাই। সে আমার স্থিতি ঠিকই বুঝিয়াছে।

একজন খাকির হাফপ্যান্ট পরিহিত অল্পবয়সী অফিসার গেটের ভিতর ঢুকিলেন। বোধহয় অ্যাসিস্টেন্ট জেলর রাত্রের রাউন্ডে যাইতেছেন!

…গত সপ্তাহে দাদার সহিত দেখা করিতে হইয়াছিল তাহার সেলে—সঙ্গে সি. আই. ডি. ভদ্রলোক। একজন ওয়ার্ডার পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। উহাদের সম্মুখে আর কি বেশি কথা হইবে? আমার হাতে রুমালে বাঁধা কিছু ফল ছিল। ভিতরে যাইবার সময় সি. আই. ডি. ঠাট্টা করিয়া বলে, 'দেখবেন মশাই, ওর মধ্যে কোনো গোলমেলে জিনিস নেই তো? শেষে মশাই চাকরিটা খাবেন না যেন। এদেশে বাঙালীর চাকরি, আজকাল কী ব্যাপার জানেনই তো? সাধে কি এ ডিপার্টমেন্টে এসেছি!' তাহাকে রুমালটি খুলিয়া দেখাইতে গেলে বলে, 'থাক থাক, ও আমি এমনিই বললাম। আপনিও যেমন। আমরা লোক চিনি মশাই।' সি. আই. ডি-ও আমাকে বিশ্বাস করে। এত বড় সার্টিফিকেট একজন রাজনীতিক কর্মীর আর কী হইতে পারে! এতটার জন্য তৈয়ারি ছিলাম না। দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার পর হইতেই ইহাদের আমার উপর সন্দেহ চলিয়া গিয়াছে।…দাদা সেলে গরাদের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। রুক্ষ কেশ; বেশ রোগা হইয়া গিয়াছে; নাকটি খাঁড়ার মতো উঁচু হইয়া আছে; গায়ের রং যেন পূর্বাপেক্ষা ফর্সা লাগিতেছে; হাতে পায়ে খোস পাঁচড়ার দাগ। তাহার হাসি হাসি মুখ, ঔৎসুক্যভরা কোমল দৃষ্টি, আমাকে কুন্ঠা করিবার অবকাশ দেয় না। প্রথমেই নিজেই বলে, 'রুমালে কিরে?' প্রথম আরম্ভ করার সংকোচন কাটিয়া যায়।… 'জ্যাঠাইমা পাঠিয়ে দিয়েছেন।' 'তাই নাকি? জ্যাঠাইমারা কেমন আছেন? কিছু বলে দিয়েছেন নাকি?' প্রথমে ভাবিলাম সত্যি কথা বলি যে জ্যাঠাইমা তো নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। না, আবার এখন কেন দাদার স্নেহাতুর মনকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলি। বলিলাম, 'আছেন একরকম, তোমার কথা প্রায়ই বলেন।' মুখ দেখিয়া মনে হয়, দাদার আমার সত্য চাপা দিবার চেষ্টা ধরিয়া ফেলিয়াছে। সি. আই. ডি. বলে 'দরজা খুলে দিক। ভিতরে গিয়ে বসুন না কেন?' বলি, 'থাক্, থাক্' কিন্তু ওয়ার্ডার দরজা খুলিয়া দেয়। ভিতরে গিয়া দাদার কম্বলের উপর বসিলাম।—সেদিন কোনো প্রশ্ন নিজে করিতে পারি নাই। কেমন যেন কথা হারাইয়া যাইতেছিল! দাদা বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝিয়াছিল। সে নিজেই কত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল। আমি উত্তর দিয়া গেলাম। আসিবার সময় দাদা বলিয়াছিল 'মা'র সঙ্গে দেখা করিস।' আমার সহিত দাদার ইহাই শেষ কথা। তাহার এই শেষ কথা,

তাহার এই শেষ অনুরোধও আমি রাখিতে পারি নাই। মা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে কী বলিবেন, এ কথা ভাবিয়াই শিহরিয়া উঠিয়াছি। দাদা আমার মনের কথা এত বোঝে আর এটা বুঝিতে পারিল না যে এখন মা'র সহিত দেখা করা কী করিরা আমার পক্ষে সম্ভব! সে জানে আমার কী ভাল লাগে না লাগে। দাদাকে আমি একবার একটি মনের মতো কবিতা লিখিয়া দিতে বলেছিলাম। আমি বড় বড় কবির উচ্ছ্বাসের কাঁদুনী সুর বুঝিতে পারি না। তাই দাদা আমার বুঝার মতো করিয়া কবিতা লিখিয়া দিয়াছিল।

চাই আমি সকলের পূর্ণ অধিকার,
তাহার অল্পেতে তুচ্ছ কখনো হব না,
পরপুষ্ট ধনিকের উপেক্ষা স'ব না ;
শ্রমিকের পেষণের কবে প্রতিকার
হবে, আছি সেই দিন পানে চাহি।
আছে মোর নিশ্চয় বিশ্বাস,
যন্ত্রপিষ্ট শ্রমিকের হতাশ নিঃশ্বাস
আনিবে প্রলয়ঃ আর অন্য পথ নাহি।
উদিবে নূতন সূর্য ; ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখে দেখা দিবে
হাসিরেখা। না থাকুক বিত্ত কারও অতুল অগাধ,
সাম্যরাজ্যে কর্ম চিন্তা স্বাধীন অবাধ।

আর মনে পড়িতেছে না। সমগ্র কবিতাটিই আমার মুখস্থ ছিল। দুই বৎসরের মধ্যে আমার কত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমি দাদার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য আমার অচেতন মনও বোধ হয়, আমার স্মৃতিপট হইতে এই কবিতাটি মুছিয়া ফেলিতে সাহায্য করিয়াছে। কবিতাটি আশ্রমে মা'র ঘরের বারান্দায় টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম। এখনও আছে কিনা কে জানে? এতদিন সেকথা একবারও মনে পড়ে নাই। এবার গিয়া নিশ্চয়ই খুঁজিয়া দেখিব।

'জগে হুয়ে হ্যাঁয় কেয়া, বাবুজী?'

দেখি সুবেদারসাহেব কোয়ার্টার হইতে ফিরিতেছে। মুখ চোখ দেখিয়া মনে হয় কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া লইয়াছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসি।

'বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে, আরাম কিজিয়ে, বাবুজী।' কাহারও সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সুবেদারসাহেব গেটের ভিতর ঢুকিল। অফিসঘরের দিকে যাইতেছে। বোধ হয় সন্ধ্যার সময়ের পাতা বিছানাটি উঠাইতেছে।—দাদা এখন কী করিতেছে? বোধ হয় চিঠি লিখিতেছে। দাদা নিশ্চয়ই খানকয়েক চিঠি লিখিয়া যাইবে। নেহাল সিংকে খাতা পেন্সিলের জন্য যে পয়সা দিয়াছিলাম, তাহা দিয়া দাদাকে ঐ সকল জিনিস কিনিয়া দিয়াছিল কিনা কে জানে। দিলেও ওগুলি সেলের মধ্যে রাখা শক্ত—নিশ্চয়ই প্রত্যহ সার্চ হয়। লিখিবার সুবিধা থাকিলেও, দাদা আর সকলের ন্যায় হয়তো চিঠি লিখিয়া যাইবে না। আশ্চর্য উহার মন! ও যে কোন্ কাজকে অশোভন ও দৃষ্টিকটু মনে করে, আমি তাহার ধারণাও করিতে পারি না।—মেরী আন্টয়নেটের শুনিয়াছি, মৃত্যুদন্ডের পূর্বরাত্রে সব চুল পাকিয়া গিয়াছিল। দাদার পাকা চুল কল্পনাও করিতে পারি না। সে হয়তো দিব্যি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে! সার ওয়াল্টার র‍্যালে যূপকাষ্ঠে মাথা নত করিবার পূর্বে জল্লাদকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখো ভাই, আমার বড় সখের দাড়িটিকে কেটে

ফেলো না যেন।' পূর্বে ইহাকে অতিরঞ্জন মনে হইত। দাদায় সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, ইহাকে আর অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। কত রাজবন্দীর ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিবার পূর্বে কত রকম আচরণের কথা শুনিয়াছি। কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কেহ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে গালি দিয়াছে, কেহ ভগবানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে, কেহ ভগবানের নাম লইয়াছে, কেহ ভাষণ দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছে; কেহবা 'শির ফরোশী কা তমন্না' (মস্তকদানের আবেদন) গান গাহিতে গাহিতে নির্বিকারভাবে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া কাষ্ঠ পাটাতনটির উপর দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দাদা নিশ্চয়ই বলিবে যে, এ সবগুলিই অল্পবিস্তর নাটকীয়। দাদা এসব কিছু করিবে না। উহার ওষ্ঠকোণে লাগিয়া থাকিবে অবজ্ঞাভরা হাসি। সে তাচ্ছিল্যের সম্মুখে সুপারিন্টেন্ডেন্টের চক্ষু নত হইয়া যাইবে, ম্যাজিস্ট্রেট অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবেন, জেলর সাহেব অকারণে টর্চ জ্বালিয়া মণিবন্ধের ঘড়িটি দেখিবেন; যে নির্বিকার কয়েদী কিছু 'রেমিশন' ও পাঁচটি টাকার জন্য ঘাতকের ঘৃণ্য কাজ করিতেছে, তাহারও হৃদ্‌স্পন্দন কিছু দ্রুত হইয়া যাইবে। দাদার অন্যরূপ আচরণই আমার নিকট অপ্রত্যাশিত।···

খুট খুট্ খুট্। গেটের দোতলা হইতে কে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছে—বলদৃপ্ত গর্বান্ধ ব্যক্তির পৌরুষব্যঞ্জক পদধ্বনি—ধরণী তুমি বুঝিয়া লও, এই স্থানটুকুর মধ্যে আর কাহারও ক্ষমতা বা আদেশ চলিবে না, এখানে আমিই সর্বেসর্বা—এই ভাব।···বহুক্ষণ হইতেই এই ধ্বনিটিরই অপেক্ষা করিতেছিলাম। খাকির জেলপোষাক পরিহিত একজন বলিষ্ঠ ভদ্রলোক নামিয়া আসিলেন। গেটের সান্ত্রী মেঝেতে জুতা ঠুকিয়া স্যালুট করিল, তাহার পর সোজা হইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইল। ভিতরের ওয়ার্ডার সেলাম করিয়া গেটের দরজা খুলিল। সুবেদারসাহেব গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। কালোতে-সাদাতে মেশানো সম্মুখের দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হাসিতে জ্ঞাতসারে খোশামোদের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস বেশ বুঝা যাইতেছে। সুবেদার সেলাম করিলে, জেলরসাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'সব ঠিক তো?'

সুবেদারসাহেব বলে, 'হ্যাঁ—হুজুর'— যেন সারারাত্রি এই সকল ব্যবস্থা করিতে করিতে সে হিমশিম খাইয়া গিয়াছে।

জেলর সাহেবের দৃষ্টি পড়ে ট্রলি লাইনের পাশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গোবরের উপর। পা ঘুরাইয়া নিজের জুতার তলা দেখেন—মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। সুবেদারও ভয়মিশ্রিত চক্ষে ঐ জুতার দিকেই দেখিতেছে। যাক্, জুতার তলায় গোবর লাগে নাই,—সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

জেলরসাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'এ গোবর পরিষ্কার করাননি কেন?'

'হুজুর কোনো কয়েদী পাওয়া গেল না।'

'কেন, গরু তো লকআপ-এর পর গেট দিয়ে পাস করেনি!'

আর বেশি কিছু বলিতে হয় না। ভিতরের ওয়ার্ডার নিজেই এই কাজে লাগিয়া যায়। সুবেদার সাহেবের দিন আজ ভাল যাইবে না,—ভোর না হইতেই এক কাণ্ড। জেলরসাহেব ভিতরের দরজা খুলাইয়া জেলের ভিতর প্রবেশ করেন।

বলিয়া গেলেন—'দেখি, আবার ভিতরের ব্যবস্থা কেমন। আপনাদের উপর কোনো দায়িত্ব দিয়ে তো নিশ্চিন্দি হওয়ার উপায় নেই। সাহেবের ঘর, আর আমার অফিসঘর ঠিক থাকে যেন।'

'হ্যাঁ হুজুর, সে আর বলতে হবে না। সব ঠিক করে রেখেছি।'

সুবেদার সাহেব ওয়ার্ডারকে বলে, 'পেঁচার মতো মুখ করে কী দেখছ? যাও, দেখ,

সাহেবের কামরা পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা। এই সব নতুন নতুন 'বাহালী'[1]দের নিয়ে কাজ চালানো শক্ত। কংগ্রেস আন্দোলনের জন্যে যত সব গাড়োয়ান আর 'হরবাহা'[2] 'চরবাহা'[3] সব ভর্তি হয়েছে। না বোঝে একটা কথা, না বোঝে নিজের কাজ। একেবারে দিকদারি ধরে গেল।'

ছোট হইতে বড় পর্যন্ত সকলেই অধস্তন কর্মচারীর সহিত একই রূপ ব্যবহার করে।...

চারিটার ঘণ্টা পড়ে। আবার ওয়ার্ডারদের নূতন দল আসে। এক দলে থাকে বাইশ জন। একই দৃশ্যের পুনরভিনয়—সব যেন এক রাত্রের মধ্যে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। যেন রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম—কতলোক গাড়ি হইতে নামিল—কিছু লোক উঠিল—কোলাহল, বিশৃঙ্খলা—আবার যেমন-কে-তেমন।...দাদা কি সেলের গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া চরমক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে? এখন যে চারিটার ঘন্টা পড়িল তাহা কি দাদা শুনিতে পাইয়াছে? গেটের উপরের শব্দতরঙ্গ বায়ুমন্ডলের ভিতর কম্পন সৃষ্টি করিয়া কনডেম্‌ড সেল্‌স-এ পেঁছিতেছে, আমার চিন্তাতরঙ্গ কি পেঁছিতে পারে না? দাদা শেষ মুহূর্তে কাহার কথা ভাবিবে—মা'র, জ্যাঠাইমার, না আমার? আমার কথা ভাবিবে কেন? নিশ্চয় ভাবিবে। চিন্তা ভরা থাকিবে গ্লানিতে, বিষাদে, আমার উপর অভিমানে। উহা যুক্তিতর্কের বহু উপরের জিনিস।...ইহার পর আমার আর পূর্ণিয়ায় থাকা অসম্ভব। জ্যাঠাইমাকে মুখ দেখাইব কী করিয়া? পাড়ার লোকদের সম্মুখে যাইব কী করিয়া? সাক্ষ্য দিবার পর হইতে এতদিন এ অবস্থা কতকটা সহিয়া গিয়াছে; কিন্তু মা'র সম্মুখে যাওয়া—সে তো অসম্ভব। দাদার অন্তিম দিনের এই ছবি অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক নয়। গত কয়মাস হইতেই এই দিনের জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়াছি। সময়ে অসময়ে এই চিত্র মনকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে?...'পাকুড় মার্ডার কেস্'-খবর প্রত্যহ কাগজে পড়িয়া আমি আর দাদা মাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। মা বলেন, 'মাগো, ভায়ে ভায়ে এম হয় নাকি?'—আর আজ! এতদিন জনমতকে উপেক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এখন মন ভাঙিয়া পড়িতেছে কেন?

জনমতকে তাচ্ছিল্য করা চলে, কিন্তু মা'র অব্যক্তবেদনাভরা দৃষ্টিকে, জ্যাঠাইমার নীরব ভর্ৎসনাকে উপেক্ষা করা চলে না। কেন চলিবে না? Sentimental nonsense! আমার সম্মুখে বেদনাজর্জর সমাজের অগণিত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সমাজের যুগযুগসঞ্চিত অশ্রু মুছানোর ভার যাহার উপর ন্যস্ত, তাহার কি সংকীর্ণ গৃহকোণের দু-চার বিন্দু তপ্ত অশ্রুর কথা মনে করিলে চলে! খদ্দরের শাড়ির অঞ্চল দিয়াই ও কয়েক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া যাইবে। জীর্ণ কন্থা ও মলিন উপাধান ঐ সামান্য কয়েক বিন্দু অশ্রুকে তপ্তবালুর ন্যায় শুষিয়া লইবে। আমার কি ইহার জন্য পড়িয়া থাকিলে চলে? এখনও আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎ লইয়াই চিন্তিত। আমার কী হইবে, তাহারই গুরুত্ব আমার কাছে বেশি, দাদার কী হইতেছে তাহার নয়।

...কানাইলালের মৃতদেহের ফটোর মুখটি মনে পড়িতেছে। দাদাকেও কি ঐরূপ লোহার স্ট্রেচারে শোয়াইয়া দিবে? চোখ দুইটি অর্ধনিমীলিত—অন্তিম শ্বাসগ্রহণের প্রাণপণ চেষ্টায় মুখটি বীভৎস হইয়া উঠে নাই—অক্ষিগোলক দুইটি কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে নাই—শান্ত নিদ্রার ভাব—কেবল গলাটি ফোলা—রক্ত জমিয়া নীল দাগ হইয়া গিয়াছে।...

জেলডাক্তার অঘোরবাবু জেলগেটে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক দ্রুত আসিবার

১ নিযুক্ত লোক। ২ চাষা (হলবাহক)। ৩ রাখাল।

চেষ্টায় পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। কোনো দিকে তাকাইবার অবকাশ তাঁহার নাই। জেলে বোধ হয় পাঁচ ছয়জন ডাক্তার আছেন—কিন্তু জেলের বড় ডাক্তার সিভিল সার্জন থাকেন শহরে। তাঁহার এখানে কোয়ার্টার নাই, যদিও যুদ্ধের পূর্বে সিভিল সার্জনই জেলসুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইতেন। অঘোরবাবু আবার কেন আসিলেন? সুবেদার জিজ্ঞাসা করে, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি আবার কেন?'

'এই এমনিই এলাম।'

সুবেদারসাহেব নিজেও ব্যাপারটা বোঝে। আজ সকলেরই ইচ্ছা সাহেবের কাছে নিজের কর্তব্যপরায়ণতা দেখানো। অঘোরবাবুর সহিত আমার পরিচয় আছে। ভাগ্যে আমার দিকে তাঁহার নজর পড়ে নাই—আবার কী না কী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতেন।··· তিনি অফিসঘরে ঢুকিলেন। জেলরসাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘরের আলো জ্বলিল—ফ্যান ঘুরিতেছে। হাফপ্যান্ট ও সাদা হাফশার্ট পরিহিত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব আসিয়া পেঁৗছিলেন,—সঙ্গে সাদা সাদা ও খয়েরী রং মিশ্রিত একটি বুলটেরিয়র। ওয়ার্ডারের মুখে সন্ত্রস্তভাব—স্যালুট—এটেনশন—কুকুরটি ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্বে একবার কী মনে করিয়া আমার কাছে ঘুরিয়া গেল। ভিতরের ওরার্ডার কুকুরের জন্য দরজাটি অর্ধোন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সাহেবের অপেক্ষা তাঁহার কুকুরের উপর জেলকর্মচারীদের আনুগত্য কম নয়—ইহা দেখাইতে সকলেই সচেষ্ট। জেলরসাহেব ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। অঘোরবাবুও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুবেদার জেলরসাহেবের সম্মান রক্ষার জন্য একেবারে উহার গা ঘেঁসিয়া না দাঁড়াইয়া, একটু দূরে দাঁড়াইয়াছে। সাহেব হাসিয়া কী যেন গল্প করিতেছেন, আর অন্যমনস্ক ভাবে হাতের টর্চটি একবার জ্বালাইতেছেন, একবার নিভাইতেছেন। কুকুরটি একবার অফিসঘরে, একবার প্যাসেজে আসা যাওয়া করিতেছে —মশালগুলি শুঁকিতেছে—সাহেবের কাছে আসিয়া যেন একটা কী খবর জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেল।···নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া মোটর লরির শব্দ হইল—নিকটে আসিতেছে—ভোঁ ভোঁ—এত জোরেও মোটরহর্নের শব্দ হয়—দাদা, মা, বাবা, সকলেরই কানে হয়তো এই শব্দ পেঁৗছিল। একখানি মোটর ভ্যান গেটের কিছু দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। এই বুঝি উহার দরজা খুলিয়া লাফাইয়া পড়ে, একের পর এক আর্মড্ পুলিশ—এবাউট টার্ন—রাইট-হুইল। না, কেহ তো নামিল না! সকলে বোধ হয় গাড়ির মধ্যেই থাকিয়া গেল! ড্রাইভার গাড়ির আলো নিভাইল—রাস্তা ও কোয়ার্টার গুলি আবার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সাহেবের কুকুরটি ডাকিতেছে—কুকুরটি গেটের গরাদের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিল—দেখিতেছে তাহার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ ঘটাইল কিসে। আলোর ঝলক হঠাৎ ফুটিলই বা কেন, আবার নিভিয়াই বা গেল কেন, তাহারই অনুসন্ধানে সে বাহির হইয়াছে।···

রাষ্ট্রের সঞ্চালনচক্র চলিয়াছে, মন্থর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে—রাত্রিদিন। কবে, কত দিন পূর্বে কোন হতভাগ্য মূর্খ ইহার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার ব্যর্থ দুঃসাহস করিয়াছিল। যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে দেশব্যাপী ছোট বড় অসংখ্য চক্র। এই ঘটনাকে ও উহার নায়ককে নিশ্চিহ্ন করিয়াই রাষ্ট্রের শান্তি বা স্বস্তি নাই। যে স্বপ্নবিলাস কতকগুলি অর্বাচীন হৃদয়কে উদ্‌বেলিত করিয়াছিল ভবিষ্যতে যেন তাহা ভয়ে আড়ষ্ট ও পঙ্গু হইয়া যায়—ইহাই তাহার কাম্য। কোরহা থানা, বেঙ্কটেশ্বর দারোগা, ফৌজদার, সেশন্‌স কোর্ট, সরকারী উকীল, জজসাহেব, সরকারী সাক্ষী নীলু, জেলকর্মচারীগণ,—মালায় একের পর এক

নানা রঙের পুঁথি গাঁথা হইয়া চলিয়াছে এক স্থির উদ্দেশ্য লইয়া। যে উদ্দেশ্যে ইহারা নিয়োজিত সেই চরম মুহূর্তের আর কতটুকুই বা দেরি?…কেবল ঘাতককে দায়ী করিলেই চলিবে কেন? এই বর্বরতার নৈতিক দায়িত্ব জজ হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়ার্ডার পর্যন্ত সকলেরই সমান। এই বিশেষজ্ঞের যুগে, কেহই নিজের সীমিত ক্ষেত্রের বাহিরে তাকায় না। সে নিজে যন্ত্রের যে অংশের জন্য দায়ী, তাহা ভালয় ভালয় চলিয়া গেলেই হইল। বিরাট সঞ্চালন শক্তির উৎস কোথায় তাহাতে তাহার প্রয়োজন কী? এন্‌জিন্‌ হইতে বেল্টিং দিয়া এই শক্তি অংশত তাহারা কাছে পেঁাছিলেই হইল। তাহার পর সে তাহার অর্ধপ্রস্তুত কাঁচামাল, তাহার পরের স্থানে পেঁাছাইয়া দিবে। এতদূর পর্যন্ত যত হাত ঘুরিয়ে ব্যাপারটি আসিয়াছে, উহার সর্বত্রই রাষ্ট্রদানবের নগ্নতা ও বর্বরতা ঢাকিবার একটি প্রয়াস ছিল। কিন্তু এখন এমন স্থানে পেঁাছিয়াছে, যেখানে আর চক্ষুলজ্জার অবকাশ নাই। Crush or be crushed ;—জগন্নাথের রথ, নিজ-গতির গর্বে চলিতেই থাকিবে। চাকার নিচে নিশির ডাকে আবিষ্ট কোনো হতভাগা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল কিনা তাহা জানিবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। শ্রেণীস্বার্থের স্টীমরোলার পথের উপর দিয়া অনবরত চালাইতে হইবে। বিরাম দিলেই আগাছা মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। আশ্রমে ঢুকিবার রাস্তাটি দাদার নিজের হাতে তৈয়ারি করা। দুই পাশে রজনীগন্ধার কেয়ারি। সময় পাইলেই নিড়ানি লইয়া দাদা রাস্তার উপরের ঘাস ও আগাছা তুলিতে বসিয়া যায়। একটি সাদা খদ্দরের গেঞ্জি।…

আর একখানা মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল। উর্দি পরা চাপরাসি দরজা খুলিয়া দেয়। হ্যাটকোট পরিহিত ভদ্রলোক—মুখে চুরুট—সিভিল সার্জন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের দল তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে।

সিভিল সার্জন বলেন, 'আমার দেরি হয়ে গেল নাকি? আমার জন্য অপেক্ষা করছেন না তো?'

'না না, এখনও ম্যাজিস্ট্রেট এসে পেঁাছাননি।' সুপারিন্টেন্ডেন্ট রিস্টওয়াচ দেখেন। মুখে বিরক্তির ভাব। 'আসুন, ঘরে বসা যাক।' চেয়ার টানিয়া লইবার শব্দ হইল। ঘরের ভিতর হইতে গল্পের মৃদু গুঞ্জন ভাসিয়া আসিতেছে। আবার মোটরহর্নের শব্দ হইল। একখানি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াই। হ্যাফপ্যান্ট পরিহিত একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক গাড়ি হইতে লাফাইয়া নামিলেন। তিনি দৌড়াইয়া জেলগেটে প্রবেশ করিতেছেন। জেলরসাহেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

'না না, আপনার দেরি হয়নি। আমরাই তাড়াতাড়ি এসেছি। ডাক্তার ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও-ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। চলুন, ঘরে বসবেন।'

ঘরে আর যাইতে হল না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সিভিল সার্জন সকলেই জেলের ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘরের বাইরে আসেন। একে একে সকলে ভিতরে প্রবেশ করেন। দরজাটি অনুচ্চ—সকলেরই মাথা মত করিতে হইতেছে।… দিল্লী দরবারে এইরূপ একটি গেটের কথা শুনিয়াছিলাম। কোথাকার রাজা যেন ইহাকে অপমান মনে করিয়া আসেন নাই। যক্ষপুরীর অন্ধকার একে একে সুপারিন্টেন্ডেণ্টর দলের সকলকে গ্রাস করে।…এখন এখান হইতে পলাইয়া গেলে কেমন হয়! শবদেহের দিকে আমি তাকাইতে পারিব না। এখান হইতে পলাইয়া গেলে কেহ লক্ষ্যও করিবে না।…ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমটি জেলের লোকেদের দেখাইতে হইবে। তাহা না হইলে তাহারা আমাকে শবদেহ দিবে কেন?…কোথায় গেল কাগজখানি। কোনো পকেটে তো নাই দেখিতেছি। কী হইল? বাড়িতে ফেলিয়া আসিলাম নাকি? তাহা হইলে

তো এখনই যাইতে হয়। যাক ভালই হইল। না পাইলে ভাল হয়।...পরের ট্রেনে পাটনায় কিংবা বোম্বাইয়ে চলিয়া গেলে কেমন হয়? আমার দলের intellectual কমরেডদের সহিত সাক্ষাৎ করা বড়ই প্রয়োজন—না, এই তো কাগজখানি পকেটে আছে ...কাল নিজে হাতে এই পকেটে রাখিয়াছি, যাইবে কোথায়? অথচ এখনই সব পকেট খুঁজিয়া দেখিয়াছিলাম—কোথাও পাই নাই।

সুবেদারসাহেবের মুখের দিকে দৃষ্টি যায়। সেও আমার দিকে তাকাইয়াছিল। সে চোখ ফিরাইয়া লয়। আর সে আমার দিকে তাকাইতে পারিতেছে না।

দূরে মনে হইতেছে দুই একজন করিয়া লোক জড়ো হইতেছে! আর্মড্ পুলিশের ভয়ে বোধ হয় বেশি লোক আসে নাই। না হইলে এই স্থান এতক্ষণে লোকে-লোকারণ্য হইয়া যাওয়া উচিত ছিল! একটি কোয়ার্টারের দরজা খুলিল। সকলেই বোধ হয় শবদেহ দেখিতে উৎসুক।—দাদার গলায় একটি কালো তিল আছে।—শীতকালে গেরুয়াধারী, পাঞ্জাবী জ্যোতিষীর দল প্রতিবৎসর পূর্ণিয়াতে আসে, তাহাদেরই একজন সেবার আমাদের আশ্রমে আসিয়াছিল।—আসিয়া বিকৃত উচ্চারণে ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল—আমি 'ফারচুন টাইলর'। সে দাদার আপত্তি সত্ত্বেও তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিল যে আশি বছর দাদার পরমায়ু। সব ভণ্ড মিথ্যাবাদীর দল! দাদা তাহার কথা শুনিয়া হাসিতেছে, আর বলিতেছে, 'এটা কংগ্রেস অফিস। আমরা কিন্তু তোমার এই কষ্টস্বীকার করার জন্য পয়সা দিতে পারব না।'

আচ্ছা, দাদা যদি ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলেও কি ইহারা সেইঅবস্থাতেই ফাঁসিকাঠে ঝুলাইবে নাকি। তা কি হয়?

ফাঁসির রজ্জুটি লইয়া 'মেট্' ও পাহারাদাররা কাড়াকাড়ি করিতেছে। সেবারের জেলের কথা মনে পড়িতেছে—দড়িটাকে উহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার চেষ্টা করিতেছে। মসৃণ চর্বিমাখানো দড়ির উপর ভোঁতা লোহার পাতটি পিছলাইয়া যাইতেছে।—ভাগ্যবানেরা এক এক টুকরা পাইল।—উহা দিয়া নাকি আশুফলপ্রদ বশীকরণ কবচ হয়।

এইবার ভিতরের ফটক খুলিল। সুপারিন্টেন্ডেন্টে, ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন জেলের অঘোরবাবু, অ্যাসিস্টেন্ট জেলের;—ওয়ার্ডার, ওয়ার্ডার, ওয়ার্ডার, কুকুর, ওয়ার্ডার ওয়ার্ডার—

সকলেই যেন জোর করিয়া মুখে হাসির ভাব আনিতে সচেষ্ট। দেখাতেই চায় যে এই সামান্য ঘটনায় সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাতে তাহাদের চা খাইবার অল্প দেরি হইয়া গেল মাত্র। সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সিভিল সার্জন আর ম্যাজিস্ট্রেটকে, নিজের বাংলোয় চা খাইতে অনুরোধ করেন। গেট খোলা হয়। কুকুরটি আগে আগে পথ দেখাইয়া চলে। মোটরকার দুইখানি তাঁহাদের পিছনে পিছনে বাংলোর ধারে গিয়া দাঁড়ায়। লরির ড্রাইভার তৈয়ারি হইয়া স্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসে। ওয়ার্ডার ভিতরের দরজা এখনও একটু ফাঁক করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।—এই বুঝি আসিয়া পড়ে —এই মুহূর্তে'—

'আরে, নীলুবাবু যে, নমস্কার! এত ভোরে এদিকে কোথায়? ইনটারভিউ-এর তদ্বিরে বুঝি? সি. আই. ডি. তো আটটার আগে আসে না। আসুন আমার বাড়িতে। ততক্ষণ চা-টা একটু খেয়ে নেওয়া যাক, কী বলেন?'

অঘোরবাবু আমাকে উত্তর দিবার সুযোগ দেন না। অতি কষ্টে কোনো রকমে বলি, 'না ইনটারভিউ-এ আসিনি।—এসেছিলাম—আজ দাদার—ইয়ে—' আর কথা বাহির

হয় না। ঠোঁট কাঁপিতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না; কে যেন দৃঢ় হস্তে গলাটি চাপিয়া ধরিয়াছে। আমার চোখে জল আসিয়া গেল। অন্য দিকে তাকাইয়া কোনো রকমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চিঠিখানি তাঁহাকে দিই। অঘোরবাবু চিঠি পড়িতেছেন। চোখের জল মুছিয়া ফেলি।

'আরে, তাই বলুন! কেন, আপনারা শোনেননি?' তিনি আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছেন।'

'গভর্ণমেন্টের চিঠি এসেছে যে; ফাঁসির অর্ডার তো এখন মুলতুবি থাকবে।' অ্যাঁ, কী বলে! অঘোরবাবু পাগল হইয়া গিয়াছেন নাকি! তাঁহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরি। তিনি বলিয়া চলিয়াছেন—

'মিলিটারি এলাকা ছাড়া ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আগস্ট আন্দোলনের সময় 'স্যাবটেজ'-এর জন্য যাদের উপর ফাঁসির হুকুম হয়েছে, তাদের ফাঁসি অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ফাঁসি এই অর্ডারের আগেই অন্য জায়গায় হয়ে গিয়েছে! যাদের উপর মার্ডার চার্জ ছিল তারা অবিশ্যি অর্ডারের মধ্যে পড়ে না। —আজ ফাঁসি ছিল একজন সাধারণ কয়েদীর। সে থাকত তিন নম্বর সেলে। পরশু অর্ডার এসেছে। আপনার দাদাকে আর এক নম্বর সেল থেকে সরানো হয়নি। সাহেব বললে, কী দরকার মিছে হাঙ্গামা বাড়িয়ে। সেই জন্যই misunderstanding হয়েছে। আর ফাঁসির তারিখ তো আগে থেকে জেলের কয়েদীদের বলার নিয়ম না। আন্দাজেই জেলের লোকে সেটুকু ঠিক করে নিতে পারে। সেইজন্যই আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।'

আমার কথা বলিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। সব শান্ত। ধমনীতে রক্তপ্রবাহও বোধ হয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।—গাছের পাতার স্পন্দনটি পর্যন্ত নাই; গ্রহগুলি গতি ভুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বীরভোগ্য বসুন্ধরার অপর্ণা মূর্তি।—নিঃশ্বাস লইতে ভয় হয়, উমার তপস্যা বুঝিবা ভাঙিয়া যায়—

—ধমনীর স্পন্দন আবার আরম্ভ হয়। গাছে গাছে পাখির কাকলি—পাতায় পাতায় প্রভাত সমীরের দোলা—লাস্যময়ী পৃথিবী আবার নানা ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে।—পাথরের জেলগেটের উপরতলায় হঠাৎ উষার আরক্তিম আলোর মধুর ঝলক লাগে।

**শেষ**

# আদিকাণ্ড

## জিরানিয়ার বিবরণ

অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে[১] এর নাম লেখা আছে 'জীর্ণারণ্য'। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেলগাড়ি ইস্টিশানে পৌঁছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।

তাৎমাটুলির লোকেরা এরেই বলে 'টৌন' (টাউন)। যেমন তেমন হেঁজিপেঁজি শহর নয়—'ভারী সাহার',[২] পরিগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড়। পীরিগঞ্জে কলস্টর (কালেক্টর) সাহেবের কাছারি আছে? বিসারিয়ায় ধরমশালা আছে? পাদ্রী সাহেবের গীর্জা আছে? ভা-আ-রী সহোর জিরানিয়া। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাস্তা দিয়ে টমটম যায়; পাকা রাস্তা দিয়ে। দোতলা বাড়িও আছে, পাকা দোতলা। চেরমেন (চেয়ারম্যান) সাহেবের।

শহরের 'বাবুভাইয়ারা' সব ছিলেন 'বাংগালী'; 'ওকিল, মুখ্তার, ডকটর, আমলা' সব। তাঁদের ছেলেপিলেদেরও এ শহরের গর্ব ছিল তাৎমাদেরই মতো। না হলে সেকালের যুগে কালীবাড়ি কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পড়ার সময় বিরাটবপু রায়সাহেব জিরানিয়াকে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, 'এটা একটা সামান্য পণ্ডগ্রাম'। ছেলের দল চিৎকার করে তাঁকে আর 'গণ্ডশ্রম' না করে বসে পড়তে বলে। তাদের নাগরিক গর্বে আঘাত লেগেছিল।

## তাৎমাটুলির কাহিনী

এ হেন শহরের শহরতলি, তাৎমাটুলি; শহর যখন, তার শহরতলি থাকবে না কেন? জিরানিয়া আর তাৎমাটুলির মধ্যে আর কোনো গাঁ নেই। সেই জন্যই তাৎমাটুলিকে বলছি শহরতলি। শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হবে; তাৎমারা বলে 'কোশভর'[৩]। তাৎমাটুলির পশ্চিমে শিমুলগাছ-ভরা বকরহাট্টার মাঠ, তারপর ধাঙড়টুলি। দক্ষিণ ঘেঁষে গিয়েছে মজা নদী 'কারীকোশী'—লোকে বলে 'মরণাধার'। মাঠের বুক চিরে গিয়েছে কোশী শিলিগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির লোকেরা এই রাস্তাকে বলে 'পাকী'[৪]।

---

১ তুলসীদাসজীর লেখা রামায়ণের নাম 'রামচরিতমানস'। ভারতবর্ষের মধ্যে রামচরিতমানসই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় বই। রামচরিত্র মানসসরোবরের ন্যায় বিশাল। এর ভিতর রামকথারূপ হাঁস ঘুরে বেড়ায়।

২ প্রকাণ্ড শহর।

৩ মাত্র এক ক্রোশ।

৪ পাকা রাস্তা।

বোধ হয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেকদিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে—পেটের ধান্ধায়। না এদের কেউ কোনোদিন কাপড় বুনতে দেখেছে, না এরা স্বীকার করত যে, এরা তাঁতি। এরা চাষবাস করে না, বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না। আর বাড়িতে একবেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না। সেটুকুও বোধ হয় জুটছিল না দ্বারভাঙ্গা জেলায়। তাই এসে তারা 'ধন্না' দিয়েছিল ফুকন মণ্ডলের কাছে। তিনি তখনকার একজন বড় 'কিসান'১ (জোতদার)। তাঁর আবার জমিদার হওয়ার ভারি শখ। নামমাত্র খাজনায় একরকম জোর করে তিনি এদের এই জমিতে রেখেছিলেন। নিজেই এদের বাড়ি করবার জন্য বাঁশ খড় দিয়েছিলেন। চিঠির কাগজে মনোগ্রাম ছাপিয়েছিলেন—বকরহট্টা এস্টেট, দেউড়ি ফুকননগর। তাঁর দেওয়া ফুকননগর ধোপে টেঁকেনি। নাম হয়ে গেল তাৎমাটুলি। যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনি রোজ এখানে আসতেন। তাঁর পাড়ার বখা ছেলেরা তাঁর আসার পথ ছেড়ে দিত—'সরে যা, সরে যা—জমিদার সাহেব ক্যাম্প ট্যাটমাঠোলিতে যাচ্ছেন, নিমাস্তিনের পকেটে এস্টেটের কাছারি নিয়ে।' মোটা লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে তিনি রোজ ধাঙড়টোলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন।—সবুজ বাঁশবনের পিছনে পরিষ্কার করে নিকানো ধাঙড়দের খড়ের ঘরগুলো, এখান থেকেই যেন দেখতে পেতেন! অঙ্গনে, মেঠোপথে, আমগাছের তলায় খড়ের কুটোটি পর্যন্ত নেই। সব ঝকঝকে তকতকে। লোকেরা চকচকে কালো; সুন্দর স্বাস্থ্য। সেখানকার ছাগল, কুকুর, গাছ, ল্যাংটো শিশু, সবই যেন তাজা নধর। এতদূরে থেকেও যেন দেখা যায়, তাদের কাপড় চোপড়, বাঁদরার২ ছাইয়ের ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার ধবধবে করে কাচা। মাদলের শব্দ যেন কানে আসছে. পিড়িং পিড়িং।···

বকরহাট্টা এস্টেটের জমিদারবাবু ভাবেন কেন তাঁর প্রজা তাৎমারা এরকম হল না, কেন তারা ধাঙড়দের মতো ঠিক সময়ে খাজনা দিয়ে দেয় না। জমিদারি থেকে রোজগার না হয় নাই হল, কিন্তু প্রজারা একটু পরিষ্কার-টরিষ্কার থাকলে, একটু পাড়াটা দেখতে ভাল হলে, জমিদারের ইজ্জৎ বাড়ে। বাংগালী উকিল হরগোপালবাবু কতদিনই বা জিরানিয়ায় এসেছেন। এখনও ত্রিশ বছর হয়নি। যেবার রেললাইন হল বাংগালী বাবুভাইরা পিঁপড়ের মতো দলে দলে এসে শহরের এদিকে বাড়ি করলেন। ওদিকে সাহেদের মহল্লা, সাহেবরাই রেললাইন আনিয়েছে নিজেদের পাড়ার কাছ দিয়ে। ওদিকে তো বাংগালী বাবুদের 'দাল গলল না'।৩ ওঁরা এলেন এদিকে। তখন ধাঙড়রা থাকত ঐখানেই। লোক দেখলেই তারা পালায় দূরে। তাই তারা এসে বাসা বাঁধল আজকালকার ধাঙড়টোলায়। ভারি বুদ্ধিমান লোক হরগোপালবাবু; পয়সা কামাতে জানেন। কাছারির নিলামে কেনা 'পড়তী' জমি, গরুচরার জন্য লোকে নিত কিনা সন্দেহ, তাই দিলেন ধাঙড়দের মধ্যে বিলি করে।

১ জিরানিয়া জেলায় 'কিসান' বলতে ঠিক যারা নিজের জমি চাষ করে তাদের বোঝায় না। দশ পনের হাজার বিঘা জমি যার সেও কিসান। কেবল গভর্ণমেণ্ট রেভেনিউ দিলেই তবে তাকে বলে জমিদার।

২ একরকম পরগাছা।

৩ মুরদে কুলোল না; টুঁ ফঁ্যা চলবে না ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।

সেই জিনিসই এখন দেখ কেমন ফেঁপে ফুলে উঠেছে। ঐ কিরিস্তান বাংগালীদের সঙ্গেই খাপ খায়। যাকগে মরুকগে! রামচন্দ্রজী! 'কৃপা তুমহারি সকল ভগবানা'।১

এ অনেক দিনের কথা হল।

এর পর বহুবার বকরহাট্টার মাঠ সবুজ হয়ে গেলে 'মরণাধারে' জল এসেছে, বহুবার কুল পাকার সময় শিমুল বনে ফুলের আগুন লেগেছে, লু বাতাসে শিমুল তুলো উড়ে যাওয়ার সময় 'পাক্কীর' ধারের নেড়া অশথ গাছগুলো তাৎমাদের আচার খাওয়ার জন্য কচি কচি ডগা ছেড়েছে। তাৎমাদের মধ্যে কেউ হিসাব জানলে বলত —এ 'ঢের সালের'২ কথা—দশ সাল, বিশ সাল, এককুড়ি, দোকুড়ি, তিনকুড়ি সালের কথা। মনে মনে গুনবার মিছা চেষ্টা করত—এর মধ্যে 'ঝোটাহারা'৩ ক'বার 'স্নান করেছে'৪।

## তাৎমাটুলির মাহাত্ম্য বর্ণন

তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পালতেমাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়—শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে—দেশলাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার পর ফের সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য। মেয়েরা কিন্তু একটু অন্য রকম। এর বাড়ির উঠোনে আর ওর বাড়ির পিছন দিয়ে তো যাওয়ার পথ। ধোঁদলের হলদে ফুলেভরা একচালাটার নিচে যে মেয়েটা তামাক খাচ্ছে, সে না হুঁকোটা নামায়, না চিরকুট কাপড়খানা সামলে গায়ে দেবার চেষ্টা করে। ইঁদারাতলার ঝগড়া সেই-রকমই চলতে থাকে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না; তেলের বোতল হাতে কুঁজো বুড়িটা ফিক্ করে হেসে হয়তো জিজ্ঞাসাও করে ফেলতে পারে যে বাবু কোন দিকে যাবেন।

এই হল বাইরের রূপ; কিন্তু বাইরের রূপটাই সব নয়,—

তাৎমাটোলার লোকেরা বলে—রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোন রকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজির এদের পুরুষের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।

---

১ সবই তোমার কৃপা—তুলসীদাস থেকে।

২ অনেক বছর।

৩ ঝুঁটিওয়ালী; তাৎমারা মেয়েদের এই নামেই ডাকে।

৪ তাৎমা মেয়েরা সাধারণত বছরে একবার 'ছট' পরবের সময় স্নান করত। যে মেয়েরা একটু বেশি ছিমছাম, তারা স্নান করে মাসে একবার।

মেয়েদের না জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলে—গাঁয়ে আছে কেবল 'পঞ্চায়তি' আর 'পঞ্চায়তি' আর 'পঞ্চায়তি'১।

## ধাঙড়টুলির বৃত্তান্ত

ধাঙড়টুলির সঙ্গে তাৎমাটুলির ঝগড়া, রেষারেষি চিরকাল চলে আসছে। ধাঙড়দের পূর্বপুরুষরা আসলে ওরাওঁ। কবে তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে গঙ্গার এপারে আসে কেউ জানে না। তবে সাঁওতাল পরগণার ওরাওঁদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল আছে। ধাঙড় ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় তারা হিন্দীতে কথা বলে।

ধাঙড়দের মধ্যে কয়েক ঘর খৃষ্টান। অধিকাংশ ধাঙড়ই সাহেবদের বাড়ি মালীর কাজ করে, যারা মালীর কাজ না পায় বা পছন্দ না করে তারা অন্য অন্য কাজকর্ম করে। কুলের ডাল কাটা থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটা পর্যন্ত কোন কাজেই তাদের আপত্তি নেই। সকলেরই গায়ে অসীম ক্ষমতা, আর কাজে ফাঁকি দেয় না বলে, সকলেই তাদের মজুর রাখতে চায়।

ধাঙড়রা তাৎমাদের বলে নোংরা জানোয়ার। তাৎমারা ধাঙড়দের বলে 'বুড়বক কিরিস্তান' (বোকা খৃষ্টান)।

ধাঙড়টুলি পরগণা ধরমপুরে, আর তাৎমাটুলি হাভেলী২ পরগণাতে। রাজা তোডরমল্লের যুগে যখন এই দুই পরগণার সৃষ্টি হয়, তখনও পরগণা দুইটির মধ্যের সীমারেখা ছিল একটি উঁচু রাস্তা। সেইটাকেই এযুগে পাকা করে নাম হয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড। কিন্তু এখন ঐ রাস্তা কেবল ধরমপুর আর হাভেলী পরগণার সীমারেখা মাত্র নয়, তাৎমা ও ধাঙড় এই দুটি হৃদয়েরও বিচ্ছেদরেখা।

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাৎমা আর ধাঙড়দের মধ্যে নিত্য ঝগড়া লেগেই আছে। গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভ করে তাৎমারাই। ঝগড়াটা বেশ বেধে যাওয়ার পর পালানোর পথ পায় না। তবু অভ্যাস যাবে কোথায়।

## বৌকা বাওয়ার আদিকথা

তাৎমাটুলির বড় রাস্তার ধারে আছে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ। তার নিচে একটি উঁচু মাটির ঢিবি বেশ করে সিঁদুর মাখানো। ইনি হচ্ছেন তাৎমাদের 'গোঁসাই'৩। এই গোঁসায়ের ; সম্মুখে পোঁতা আছে একটা প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ। এই জায়গাটার নাম গোঁসাইথান ; লোকে ছোট করে বলে 'থান'। প্রতি বছর ভাইদ্বিতীয়া না তার পরের দিন এই হাড়িকাঠে তেল সিঁদুর পড়ে, একটা নিশান পোঁতা হয়, আর চাঁদা করে কেনা একটা ভেড়া বলি দেওয়া হয়।

---

১ পঞ্চায়তদের মোড়লকে বলে 'মহতো'। চারজন মাতব্বরকে এরা বলে 'নায়েব'। আর যে 'নুটিস্' তামিল করে, আ রলোকজনকে ডেকেডুকে নিয়ে আসে তার নাম 'ছড়িদার'। মহতো আর চারজন নায়েব পঞ্চায়েতে থাকে পাঁচজন, 'পঞ্চ'।

২ অন্দরমহল।

৩ তাৎমারা সর্বদেবকেও 'গোঁসাই' বলে; আবার ঐ অশথতলায় সিঁদুরমাখানো যিনি আছেন তাঁকেও গোঁসাই বলে।

এই 'থানে'ই 'বোকা বাওয়ার'১ আস্তানা। বোকা বাওয়ার আগে কিংবা পরে তাৎমাদের মধ্যে আর কেউ সাধু সন্ন্যাসী হয়নি।

ছোটবেলায় বোকে তার মার সঙ্গে ভিক্ষা করতে বেরুত। শহরের গেরস্তদের দোরগোড়ায় 'খোখা আ নুনু-উউ'২ এই ডাক শুনলেই বাড়ির লোকে বলত, 'এইরে বোকামাই৩ এসেছে, এখন দুটি ঘন্টা চলবে একটানা চিৎকার। দিদিরা ছোট ভাইকে ভয় দেখাত—কাঁদলেই দেব বোকামাইয়ের কাছে ধরিয়ে।

সেই বোকা বড় হয়ে তার দাঁড়ি-গোঁফ গজালে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, একটা চিমটে আর একটা ছোট ত্রিশূল নিয়ে সেই গোঁসাইথানে বসে আছে। পাড়ার লোকে দেখতে এলে, বোকা ত্রিশূলটা ইট দিয়ে ঠুকে মাটিতে গেঁথে দিল। সেই দিন থেকে ঐ 'থানে'ই তার আস্তানা। এতদিনকার বোকা ঐদিন থেকেই বোকা বাওয়া হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরের কথা। গোঁসাইথানের পাশেই পথের ধারে একটা ঝড়ে-পড়া পাকুড়গাছ বহুদিন থেকে পড়ে ছিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের জিনিস; কিন্তু তাৎমারা নিয়মিত শুকনো গাছটার থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে নিচ্ছিল। শিকড়ের মোটা কাঠগুলিকে পর্যন্ত তারা গর্ত করে বের করে নিতে ছাড়েনি। পড়ে ছিল কেবল মোটা গুঁড়িটা। এই কাত হয়ে পড়া গুঁড়িটা একদিন সকালে খাড়া দাঁড় করানো অবস্থায় দেখা যায়। আরও দেখা যায় যে, বোকা বাওয়া হাত জোড় করে গাছের চারিদিকে ঘুরছে আর প্রত্যেক পরিক্রমার পর একবার করে সূর্যদেবকে প্রণাম করছে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। রেবণ গুণী বলে, জিনের কান্ড। চশমা-পরা সর্বজ্ঞ পেশকার সাহেব রায় দিলেন—'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পথের ধারে ডাল পুঁতে গাছ লাগায়। সেই জন্য এসব গাছে ট্যাপরুট নেই—তা না হলে কি এরকম হয়।' বিজনবাবু উকিলের কলেজে-পড়া ছেলে ফরিদপুরের সূর্যোপাসক খেজুরগাছের কথা তোলে। স্কুলের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে,—'নন্তুদা পন্ডিত হবে না? ও যে কলেজে ভুটানি'৪ পড়ে'। এসব ব্যাখ্যা তাৎমাধাঙড়দের মনে ধরেনি। এই দিন থেকে বোকা বাওয়ার পসার-প্রতিপত্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। তার নামডাক তাৎমাটোলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। গোসাইথানের বেদীর উপরের তেল-সিঁদুরের প্রলেপ আরও পুরু হয়ে উঠতে থাকে। বাওয়ার আস্তানার জন্য লোকে নিজে থেকে খড় বাঁশ দড়ি পেঁছে দেয়।

তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে। তাৎমাটুলির বুড়িরা বলে, 'আহা টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বোকাটা সন্ন্যাসী হয়ে গেল।'

তাৎমাদের ছেলের বিয়ে হলেই সাহেবদের মতো মা-বাপের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভয়ে বোকার মা ভিক্ষায় জামানো আধলাগুলো একদিনও ছেলের হাতে দেয়নি।

বোকামাই মারা যাওয়ার দিন বোকা যখন নারকেলের মালায় করে তার মুখে

১ বোবা সন্ন্যাসী।

২ খোকা, ছোট ছেলে।

৩ বোকার মা; কারও নামের সঙ্গে মাই শব্দটি যোগ করলে অর্থ হয় অমুকের মা।

৪ Botany।

জল দিচ্ছিল, তখন সে ছেলের হাতটা বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল—'অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস—সেখানে খুব ভিক্ষে পাওয়া যায়। পীপড় (অশথ) গাছ কোনোদিন কাটিস না। ধাঙড়টোলার 'কর্মাধর্মার'১ নাচ দেখতে যাস না, ওদের মেয়েরা বড় খারাপ। অদৌড়ি২ খেতে বড় ইচ্ছে করছে। নারকেলের মালা যেখানেই দেখবি তুলে নিস, ও এ'টো হয় না'

—এর পরের কথাগুলো বোকা মায়ের মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়েও বুঝতে পারেনি। কেবল শুকনো ঠোঁট দুখানা নাড়তে দেখেছিল। মায়ের আধবোঁজা চোখের কোণ থেকে যে জলের ধারা গড়িয়ে পড়েছিল, সেটাকে মুছিয়ে দিয়েছিল লেঙটের খুঁট খুলে নিয়ে। ঠোঁটের কোণের ছোট্ট লাল পিঁপড়েটাকে দু আঙুল দিয়ে খুঁটে তুলে দূরে ফেলে দিয়েছিল—মেরে ফেলতে মন সরেনি।

## বাল্যকাণ্ড

### ঢোঁড়াইয়ের জন্ম

বুধনীর মনে আছে যে, ঢোঁড়াই যেদিন পাঁচদিনের সেদিন 'টৌনে'৩ ছিল একটা 'ভারী তামাসা'। আর একদিন আগেই যদি ঢোঁড়াই জন্মায়, তাহলেই বুধনী ছদিনের দিন স্নান করে তামাসা দেখতে যেতে পারে; কিন্তু তা ওর বরাতে থাকবে কেন! কেবল খাও, রসুন গুড় আদবাটা একসঙ্গে সেদ্ধ করে সেইটা তেলে ভেজে! মরণ! বুধনী কাঁদতে বসে।

ওর স্বামীটা ভারি ভালমানুষ। অন্য তাৎমারা বলে হাবাগোবা, তাই রোজগার কম। বুধনীর নিজের রোজগার আছে বলেই, চলে যায় কোনোরকমে। তার স্বামীকে দিয়ে তাৎমার দল চাল ছাইবার সময় খাপরা বওয়ায়, খাপারার ঝুড়ি নিয়ে মইয়ে চড়ায়; পোষে মাঘে কুয়ো পরিষ্কার করতে হলে, তাকেই জলের ভিতরে বেশিক্ষণ কাজ করায়।

বুধনীকে কাঁদতে দেখে বলে, 'তা এখন কাঁদতে বসলি কেন? ছেলেটার দিকেও দ্যাখ্—ঘাড় কাত করে রয়েছে কেন। তোর জন্যে আবার দুপয়সার মসুরির ডাল কিনে আনতে হবে। কি গরম মসুর ডাল—না?'

তার স্বামী কোনোদিন মসুর ডাল খায়নি। সে কেন, কোনো তাৎমাই খায় না। অত গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে সেই ভয়ে। খালি খাবে মেয়েরা, ছেলে-পিলে হওয়ার পর কয়েকদিন, তখনি ওদের শরীরের রস শুকোনোর দরকার সেইজন্য।

বুধনী বলে, 'হ্যাঁ, খেলেই যে গরম আগুন জ্বলে গায়ে।'

'আমি তামাসা দেখে এসে তোকে সব বলব, বুঝলি? কাঁদিস না।'

সেদিন 'টৌন' থেকে বাড়ি ফিরবার সময় ঢোঁড়াইয়ের বাপের বুক দুরু দুরু করে ভয়ে। দুটো পয়সা ছিল তার কাছে। তামাসায় গিয়ে সে তাই দিয়ে এক পয়সার এক 'প্যাকিট বাত্তিমার'৪ কিনেছে, আর এক পয়সার খয়নি। বাড়ি গিয়ে এখন কি বলবে

---

১ ধাঙড়দেব ভাদ্রপূর্ণিমার দিনের উৎসব আর পুজো।

২ আদা দেওয়া একরকম বড়ি। ৩ জিরানিয়া।

৪ এক প্যাকেট লণ্ঠন মার্কা সিগারেট। সিগারেটটির নাম ছিল রেড ল্যাম্প।

বুধনীর কাছে মসুর ডালের সম্বন্ধে কি বলবে, সেই কথাই সে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে ; যত বোকা তাকে সকলে ভাবে সে তত বোকা নয়।

'কে আর দোকান খোলা রাখবে, ঐ রাজার দরবারের ১ 'জুলুস' ( মিছিল ) দেখা ছেড়ে দিয়ে।' এই কথা বলতে বলতে সে বাড়ি ঢোকে।

বুধনী অনেকক্ষণ থেকে তারই অপেক্ষা করছিল, তামাসার খবর শোনবার জন্য।

'কার ? কপিল রাজার নাকি ?'

কপিল রেজা কুলের জঙ্গলের ঠিকাদার, লা-র ব্যবসা করে। তাকেই সকলে বলে কপিল রাজা।

'না রে না ওলায়তের ( বিলাতের ) রাজার। তার কাছে কলস্টর সাহেব, দারোগা পর্যন্ত 'থর থর থর থর'২।

দরবার কথাটার ঠিক মানে, ঢোঁড়াইয়ের বাপ নিজেই বুঝতে পারেনি। মনে মনে আন্দাজ করেছে যে বোধ হয় এই মিছিলেরই নাম দরবার। পাছে বুধনী ঐ কথাটার মানে জিজ্ঞাসা করে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি 'জুলুসে'র হাতি ঘোড়া উটের কথা বলতে আরম্ভ করে।

সে কী বড় বড় হাতি! সোনার কুর্তা পরানো, ইয়াঃ বড় বড় দাঁত, চাঁদি দিয়ে ঢাকা। সে যে কত চাঁদি, তা দিয়ে যে কত ঘুনসি হতে পারে, তার ঠিকানা নাই। একটা হাতি ছিল, সেটার আবার একটা দাঁত এই ছোট্ট কদুর মতো। উটগুলো চলেছে টিম-টাম্ টিম-টাম্, সামনে পিছনে—ঠিক খোঁড়া চথুরীটার মতো চলার ধরণ। হাতির পিঠে চাঁদির হাওদায় 'কলস্টর সাহাব' ( কালেক্টর সাহেব ), আর একটায় বুধনগরের কুমাররা, আরও কত সাহেব, কত হাকিম কে কে, সব কি অত চিনি ছাই! সাদা ঘোড়ার পিঠে ভাইচেরমেন সাহাব। কী তেজী ঘোড়া! টকস-টকস-টকস-টকস কি চাল ঘোড়ার! তার কাছে যায় কার সাধ্যি। ছতিসবাবুর৩ দোকানের বারান্দার বাঙালী মাইজীদের মিছিল দেখবার জন্য চিক টাঙিয়ে দিয়েছিল—ঘোড়াটা তার চার পা তুলে দিতে চায় সেই চিকের উপর। ইয়াঃ তালের মতো বড় বড় খুর!

বুধনী আঁতকে ওঠে ভয়ে 'গে মাইয়া! তাই নাকি।'

আরও কত তামাসার খবর বুধনী শোনে। তার দুঃখের সীমা নেই। উট আর কলস্টর সাহাব দেখা তার পোড়া কপালে রামজী দেন নাই, সে আর কার দোষ দেবে।···

ছেলেটা কেঁদে ওঠে।

ঢোঁড়াইয়ের বাপ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।—নে, নে দুধ দে। অমন করে তুলিস না—ঘাড় মটকে যাবে 'বিলি বাচ্চাটার'৪।' তারপর ঐ 'বিলি বাচ্চা' ঢোঁড়াইয়ের দিকে মাথা নেড়ে, হাততালি দেয়।

এ নুনু! ( ও খোকন ) এত্তা ভাত খাওগে ? ( এতগুলো ভাত খাবে ) বকড়ি চরাওগে ? ( ছাগল চরাবে )।

এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে। এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে।

ছেলেকে দুধ দিতে দিতে গর্বে বুধনীর বুক ভরে ওঠে। ছেলেপাগল লোকটার

---

১ দিল্লী দরবার ( ১৯১২ )।

২ তাৎমারা কথা বলবার সময় ধ্বনিপ্রধান শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করে।

৩ সতীশবাবু। ৪। বিড়ালের বাচ্চাটার ( আদরে )।

আদর করা দেখে হাসি আসে। তোমার বিলি বাচ্চা কি এখন শুনতে শিখেছে, এখনও আলোর দিকে তাকায় না, ওকে হাততালি দিয়ে আদর হচ্ছে! পাগল নাকি!

ঢোঁড়াইয়ের বাপ বেঁচে গিয়েছে আজ খুব; তামাসা'র গল্প আর ছেলে সামলানোর তালে মসুর ডাল না আনার কথা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে—ছেলের তাকৎ মায়ের দুধে আর মায়ের দুধ হয় মসুর ডালে।

খানিক পরেই মহতোগিন্নী আসেন, প্রসূতির তদারক করতে। হাজার হোক ছেলে মানুষ তো বুধনী। মা হলে কি হয় পেটে থেকে পড়েই কি লোক আঁতুরঘরের বিধি বিধান শিখে যাবে। কাল স্নান করার দিন। মহতোগিন্নী না দেখাশুনো করলে, পাড়ার আর কার গরজ পড়েছে বলো। মহতোগিন্নী হওয়ার ঝক্কি তো কম নয়। এসেই প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন বুধনীকে মসুর ডালে রসুন ফোড়ন দিয়েছিলে না আদা ফোড়ন? দোকান বন্ধ ছিল। কে বলল! তোমার 'পুরুখ'১? আমি নিজের চোখে দেখে এলাম খোলা রয়েছে। দেখে আসা কেন আমি নুন কিনে এনেছি।...

তারপর চলে মহতোগিন্নীর গালাগালি ঢোঁড়াইয়ের বাপকে। বুধনীও সঙ্গে সঙ্গে রসান দেয়। পাড়ার অন্য কোনো বয়স্থ পুরুষকে এরকম ভাবে বকতে মহতোগিন্নী নিশ্চয়ই পারতেন না। কিন্তু এ মানুষটিকে সবাই বকতে পারে।

তারপর মহতোগিন্নী চলে গেলে ঐ 'পুরুখ' বুধনীর কাছে সব কথা খুলে বলে নিজের দোষ স্বীকার করে।

বুধনী মনে মনে হাসে। এমন 'পুরুখে'র উপর কি রাগ করে থাকা যায়। লোকের ঠাট্টাটা পর্যন্ত বোঝে না এ মানুষ; না হলে কাল হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে আমাকে খবর দেওয়া হল যে, রতিয়া 'ছড়িদার' রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করেছে ওকে যে—ছেলের রঙ মকসুদনবাবুর গায়ের রঙের মতো হয়েছে নাকি।

## বুধনীর বৈধব্য ও পুনর্বিবাহ

ঢোঁড়াই হয়েছিল বেশ মোটাসোটা। রংটাও কালো না—মাজা মাজা গোছের—তাৎমারা বলে গরমের রং। তার বাপ সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে এসেই ছেলে কোলে নিয়ে বসত। ছেলে হওয়ার পর থেকে সে রাতে পাড়ার ভজনের দলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই নিয়ে পাড়ার লোকের কত ঠাট্টা। বুধনী উনুনের ধারে উঠনে বসে। আর সে বসে দরজার ঝাঁপের পাশে ছেলে কোলে নিয়ে বুধনীর সঙ্গে গল্প করতে।

'বকড়—হাট্টা—আ—আ
বড়দ বাট্টা—আ—আ
সো জা পাঠ্‌ঠা—আ—আ'

(ছাগলের হাট, বলদের চলার পথ, শুয়ে পড় জোয়ান), ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে ছোট্ট ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে বাপের কোলে।

'বুঝলি বুধনী এ ছোঁড়া বড় হয়ে আমার বংশের নাম রাখবে। একে লেখাপড়া শেখাব চিমনী বাজারের বুড়হা গুরুজীর কাছে। রামায়ণ পড়তে শিখবে, পাড়ার দশ জনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে; ধাঙরটুলি, মরগামা, কত দূর দূর থেকে লোক

১ স্বামী।

আসবে ওর কাছে, খাজনার রসিদ পড়াতে। ভারি 'তেজ'১ ছোঁড়াটার ; দেখিস না এই বয়সেই কোলে নিলেই ছোট ছোট আঙুল দিয়ে খাবলে ধরতে চায় আমার কান আর নাক।' ঘুমন্ত ছেলের গাল দুটো টিপে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'ওনামাসি ধং গুরুজী পড়হং ;—কিরে পড়বি ?'২

'পড়ে টড়ে খোকন আমার, ভিরগু তশীলদারের মতো জজ সাহেবের পাশে কুর্শীতে বসে 'সেসরী' (দায়রা কোর্টের এসেসর্) করবে। আমার সেসর সাহেব ঘুমুলো ; আমার সেসর সাহেব ঘুমিয়েছে। নে বুধনী, চাটাইটা ঝেড়ে একে শুইয়ে দে।'

কিন্তু এত সুখ বুধনীর সইল না।

সেই যেবার কলস্টর সাহাব জিরানিয়ায় হাওয়া গাড়ি আনলেন, প্রথম; ৩ সেই-বারই ঢোঁড়াইয়ের বাপ মারা যায়। ঢোঁড়াই তখন বছর দেড়েকের হবে।

শহরে, দেহাতে, তাৎমাটুলিতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 'তামাম হল্লা'—কলস্টার সাহেব হাওয়া গাড়ি এনেছেন অনেক টাকা দিয়ে। আপনা থেকে চলবে,—'বিনা ঘোড়েকা' —পানিতে আর হাওয়ায় চলবে। আজ প্রথম চলবে হাওয়া গাড়ি। কলস্টার সাহেব যাবেন চাঁদমারির মাঠে—যেখানে সাহেবরা ফৌজের উর্দী পরে বন্দুক চালানো শেখে —দমাদ্দম্, দমাদ্দম্। 'বড়া' নিশানা ঠিক কলস্টরের হাতের ; তাঁর ধাঙড় মালী বড়কাবুদ্ধু বলে যে, মেমসাহেবের হাতে পেয়ালা রেখে নাকি গুলি মেরে চুরচুর করে দেয়। চাঁদমারীর মাঠে কাউকে যেতে দেয় না—ওটা পড়ে সাহেব পাড়ায়। কেউ গেলেই আর দেখতে হচ্ছে না ; সোজা হিসাব ; নও দো, এগারহ (নয় আর দুয়ে এগারো) একেবারে সিধা ফাটক।

তাই লোকে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়েছিল কামদাহা রোডের দুপাশে—হাওয়া-গাড়ি দেখবার জন্য। ঢোঁড়াইয়ের বাপের হয়েছিল জ্বর ক'দিন থেকে। নিশ্চয় পেয়ারা খেয়ে, কেননা সেটা বাতাবি লেবুর সময় নয়। জ্বর কী জন্যে হয় তা আর তাৎমা-দের বলে দিতে হবে না—সবাই জানে, আশ্বিনের পর জ্বর হয় বাতাবিলেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে।

কলস্টর কখন যাবেন চাঁদমারীর মাঠে তা কেউ জানে না। সেইজন্য সকাল থেকে ঢোঁড়াইয়ের বাপ দাঁড়িয়েছিল রোদ্দুরে হাওয়া গাড়ি দেখবার জন্যে। ভয় ভয়ও করছিল —'জিনে' (ভূত) কলের ভিতর থেকে গাড়ি চালাচ্ছে সে ভেবে নয়,—এত বোকা সে নয়,—ওসব ছেলেপিলেরা ভাবুক, না হয় দেহাতী ভূতরা ভাবুক—সে ঠিকই জানে যে, হাওয়া গাড়ি চলে পানি আর হাওয়াতে। তবে তার ভয় করছিল যে, গাড়িটা আবার তার গায়ের উপর এসে না পড়ে,—কলকব্জার কম্ম, বলা তো যায় না।

ঐ আসছে! আসছে!

শব্দ হচ্ছে রেলগাড়ির মতো। কেমন দেখতে কিছুই বোঝা যায় না, কেবল ধুলো! না ধুলো কেন হবে, ধোঁয়া। ধোঁয়ায় ধোয়াক্কার! আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ

১ বুদ্ধিমান।

২ পড়া আরম্ভ করার সময়, এদেশের ছেলেদের 'ওম্ নমস্ সিদ্ধং' বলে আরম্ভ করতে হয়। ছেলেরা তার মানে বোঝে না। তারা বিকৃতভাবে কথাটা উচ্চারণ করে : 'ওনামাসি ধং, গুরুজী পড়হং' বলে পণ্ডিতমশায়কে চটায়।

৩ কালেক্টরের নাম ছিল কিলবি সাহেব—১৯১৩ সালের কথা।

হাওয়াগাড়ির। দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে—প্রথমে অল্প, তারপরে হঠাৎ দাউ দাউ করে। কী হয়ে গেল হাওয়া গাড়ির! হাওয়া আর পানির গাড়ি আগুন হয়ে গেল। অধিকাংশ লোকই যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। কেউ কেউ আগুনের দিকে এগিয়ে যায়।

জ্বর গায়ে ঢোঁড়াইয়ের বাপ পালাতে আর পারে না।

ধুঁকতে ধুঁকতে আর হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি যখন পেঁছায় তখন ঢোঁড়াই ঘুমুচ্ছে। বুধনী আসছে জল নিয়ে 'ফৌজি ইঁদারা থেকে'। ফৌজের লোকদের কোশী-শিলিগুড়ি রোড দিয়ে মার্চ করে যাওয়ার সময় দরকার লাগবে বলে, এই ইঁদারাগুলো পথের ধারে ধারে বানানো হয়েছিল একসময়ে। আগেই ইঁদারাতলায় হল্লা হয়ে গিয়েছে যে পানি ছিল না বলে হাওয়া-গাড়ি জ্বলেছে। তাই বুধনী হাঁকু পাঁকু করতে করতে এসেছে, খুঁটিয়ে আসল খবর নেওয়ার জন্য 'পুরুখের' (স্বামীর) কাছ থেকে। মাই গে! এ আবার কী! এসে দেখে 'পুরুখ' চাটাইয়ের উপর শুয়ে কাতরাচ্ছে। চোখ দুটো লাল শিমুল ফুলের মতো। গা পুড়ে যাচ্ছে। কলসী ভরা জল খেতে চায়! খাও আরও পেয়ারা! বাপের কাতরানির চোটে ঢোঁড়াই ওঠে। এদিকে বাপ চেঁচায়, ওদিকে ঢোঁড়াই চেঁচায়। বাপে বেটায় চমৎকার! তারপর ক'দিন জ্বরে বেহুঁস। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, 'জড়ীবুটি', টোটকা টাটকী অনেক হল। কিছুতেই কিছু নয়। জ্বরের ঘোরে 'গজর গজর গজর গজর' কী সব বলে, কখনও বোঝা যায় কখনো বা যায় না। কখনও ঢোঁড়াই, কখনও সেসর সাহেব, কখনও হাওয়াগাড়ি। কদিন কী টানাপোড়েনই না গিয়েছে বুধনীর। তারপর তো শেষই হয়ে গেল সব।

একটা পয়সা নেই ঘরে। কিছুদিন আগে থেকেই রোজগার বন্ধ ছিল জ্বরের জন্য। বুড়ো নুনুলাল তখন 'মহতো'। সে ছিল মহতোর মতো মহতো। পুলিশের হাত থেকে আসামী ছিনিয়ে নেবার তার নাকি 'একতিয়ার' ছিল। সে পঞ্চায়তির জমা টাকা থেকে এক টাকা দশ আনা খরচ করে নাপিত, ঘাট, 'কিরিয়াকরম' (ক্রিয়াকর্ম) সব করিয়ে দেয়। দেড় বছরের ঢোঁড়াই মাথা নেড়া হাসে, আর গাঁসুদ্ধ লোকের নেড়া মাথা দেখে চেনা মুখকেও চিনতে পারে না। বুধনী কপালের মেটে সিঁদুর দিয়ে আঁকা চাঁদটা মুছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

অভ্যাস মতো মহতো বলে—

ছিতি জল পাবক গগন সমীরা
পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা ॥১

ওঠ্ বুধনী। এখানে বসে বসে কাঁদলেই কি চলবে। কোলের ছেলেটার কথাও তো ভাববি?

বুধনী বিধবা ছিল প্রায় বছর দেড়েক। বর্ষা নামলেই শুকনো বকরহাটটার মাঠ নতুন ঘাসে সবুজ হয়ে যায়। এর পর মাস কয়েক বুধনী ঘাস বিক্রি করে টৌনে। অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে পুবে। মাঘ মাসে বুনো কুল, ফাগুন চোতে শিমুল তুলো- আর কাঁচ আম, বাবু ভাইয়াদের বাড়ি বিক্রি করে। এ দিয়ে পেট চালানো বড় শক্ত। অন্য কোনো রকম মজুরি করা তাৎমা মেয়েদের বারণ। তার উপর ঢোঁড়াইটাও আবার ভাত খেতে শিখল, আস্তে আস্তে। দু দুটো পেট চালাতে বড় মেহনত করতে

১ মাটি জল আগুন আকাশ বাতাস—এই দিয়েই নশ্বর দেহ রচিত।

হয়। তাও চলে না।

বাবুভাইয়ারা আনাগোনা আরম্ভ করেন; বাবুলাল ঘোরাঘুরি করে তার বাড়িতে। পাড়াপড়শী, 'নায়েব', 'মহতো' সবাই খোঁটা দেয়—মেয়েমানুষ আবার বিধবা থাকবে কি!

বুধনীও ভাবে, যদি অন্যের পয়সাই নিতে হয়, তবে বয়স থাকতে তাকে বিয়ে করাই ভাল। তার বয়সও ছিল, 'আর সিঁদুর লাগানোর'১ শখ যে ছিল না তা নয়। বাবুলালটা আবার এরই মধ্যে ডিস্টিবোর্ডে ভাইচেরমেন সাহেবের চাপরাসীর কাজ পেয়ে গেল। লোকটা বড় হিসেবী। সে নিজের বিড়িতে একসঙ্গে দুটোর বেশি টান দেয় না। তারপর নিবিয়ে কানে গুঁজে রাখে। বুধনীকে সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তিন বছরের ঢোঁড়াইয়ের ভার নিতে চায় না। 'চুমৌনা'২ করতে ইচ্ছে হয় কর, না করতে ইচ্ছে হয় কোরো না; তা বলে পরের ছেলের ভার নিচ্ছি না।

অনেক গাঁড়িমসি করবার পর বুধনী মন ঠিক করে ফেলে।

একদিন সকালবেলায় গোঁসাইথানে বৌকাবাওয়ার পায়ের কাছে ছেলেটাকে ধপ্ করে নামায়। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে নিজের দুঃখের কথা বলে। তারপর ঢোঁড়াই-কে ঐখানে রেখেই বাবুলালের বাড়ি চলে যায়। ঢোঁড়াই তখন আঙুল চোষা ভুলে বাওয়ার ত্রিশূলটা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুন্ডের উপর তিনটে রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল৩।

## বজ্রলাভের উপাখ্যান

বুধনীকে বৌকা বাওয়া দোষ দেয় নি, পাড়ার লোকেও দেয়নি। করতই বা কী বেচারি। বিয়ে বিধবাকে করতেই হবে—যদি ছেলেপিলে হবার বয়স না গিয়ে থাকে। রইল—ছেলের কথা। এখন বাবুলাল খাওয়াতে রাজী না, তা বুধনী কী করবে।

মাকে ছেড়ে ছেলেটা কান্নাকাটি বিশেষ করেনি। প্রথম প্রথম যখন তখন মার কাছে পালিয়ে যেত। বাবুলাল বাড়িতে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন বুধনী কোলে করে ঢোঁড়াইকে 'থানে' পেঁছে দিয়ে যায়। দিনকয়েকের মধ্যে ছেলেটা বুঝে গেল যে, দুপুরবেলায় বাবুলাল থাকে না বাড়িতে। কিন্তু এই দুপুরবেলায় বুধনীর কাছে যাওয়ার অভ্যাসও দু-তিন মাসের মধ্যে আস্তে আস্তে কেটে যায়। ও যে ওখানে অবাঞ্ছিত, সেটা বুঝে না বন্ধুদের সঙ্গে খেলার টানে, বলা শক্ত।

ছেলেটা কান্নাকাটি করে না, তবে দিন দিন রোগা হয়ে যায়। বাওয়া ব্যস্ত হয়ে ওঠে—দিব্যি দামাল ছেলে ছিল।

একজন পশ্চিমা ফৌজের লোক বহুদিন আগে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে না পেন্সন নিয়ে জিরানিয়ার বাজারে একটা রামজীর মন্দির বানিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁকে লোকে বলত 'মিলিট্রি বাওয়া'। তাঁর একটা পোষা চিতাবাঘ ছিল। তারই হাতে নাকি 'মিলিট্রি বাওয়া'র প্রাণ যায়। মন্দিরের উঠোনে তাঁর বাঁধানো সমাধিস্থান আছে। আর এই মন্দিরের নাম হয়ে যায় 'মিলট্রি ঠাকুরবাড়ি'।

---

১ বিয়ে করবার।

২ সাঙ্গা।

৩ কটি কিঙ্কিনী উদর ত্রয় রেখা।
নাভি গম্ভীর জান জিনহ দেখা॥ তুলসীদাসঃ বালকান্ড।

বৌকা বাওয়া রোজ যেত 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে'— নামে নারায়ণ শুনতে, আসলে গাঁজা খেতে।

বাওয়া দেখে যে, ঢোঁড়াই রোগা হয়ে যাচ্ছে; পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যাচ্ছে, এই মায়ে-খেদানো বাপ মরা ছেলেটির। রামজীই পাঠিয়ে দিয়েছেন তার কাছে— এখন তাঁর মনে কী আছে, কে জানে। রোগটা জানা রোগ; সবাই জানে যে ছেলে-টার হয়েছে 'বাই-উখড়ানোর'১ রোগ। এ রোগে পাতা, শিকড়ে কিছু উপকার হয় না, তবে দুধে হয়। দুধ তো বাবু-ভাইয়াদের জন্য। তারা 'রাজা লোগ'। 'পরমাৎমা' তাদের দুধ খাবার সামর্থ্য দিয়েছেন। তবে 'বাই-উখড়োলে' শুষনির শাকটাও বেশ উপকার করে—ভাত আর শুষনির শাক দুবেলা; না হয় শুষনির শাক, আর কাঁচা চিঁড়ে না ভিজিয়ে। মুড়ি খবদ্দার না—পেট খারাপ করে মুড়ি, আর ঘর খারাপ করে বুড়ি······

ভাবতে ভাবতে বাওয়ার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে; ঢোঁড়াইটাকে একটু দুধ-টুধ খাওয়াবার এক উপায় করে দেখলে হয়।

সে ঢোঁড়াইকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি'তে। এক মিনিটের মধ্যে ঢোঁড়াই মোহন্তজীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। ল্যাংটা ঢোঁড়াইকে চিমটেটা দেখিয়ে মোহন্তজী বলেন, খবদ্দার 'পিসাব'২ করো না এখানে। ওই হাড়-জিলজিলে ছোঁড়া কোথায় একটু ভয় পাবে, তা না খলখল করে হাসে। সেই দিন থেকেই রামায়ণ শুনলেই ঢোঁড়াইয়ের 'পাকা প্রসাদী' (ভোগের প্রসাদ) মঞ্জুর হয়ে যায়। এইতেই 'বাই-উখড়োনোর' অসুখের হাত থেকে ছোঁড়াটার জান বেঁচে যায়।

না, না, এতে বাওয়ার কিছু কৃতিত্ব নেই। যিনি পাঠিয়েছিলেন ঢোঁড়াইকে তার কাছে, তিনিই ছেলেটাকে প্রসাদ দিচ্ছেন। তাঁরই কৃপাতে এ ছেলে বেঁচে বর্তে থাকলে সে বাওয়ার উপযুক্ত চেলা হবে। আবছা স্বপ্নরাজ্য বাওয়ার চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে···গোঁসাইথানে প্রকান্ড মন্দির হয়েছে···মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির চাইতেও বড় বড় নৈবেদ্যর থালায় মন্দিরের মতো করে চিনি আর স্তূপাকার করে পেঁড়া সাজানো। ঢোঁড়াইকে ঐ থানের 'পূজারী' করে, না পূজারী কেন হবে, মোহন্তের 'চাদর'৩ দিয়ে, সে চলে গিয়েছে অযোধ্যাজী······

'করউঁ কাহ মুখ এক প্রশংসা'৪ ···মাত্র একটা মুখ, তাও কথা বলতে পারি না। ···তা দিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করতে পারি রামজী!

তোমার কৃপা না হলে যেদিন মোহন্তজী সরকারকে লড়ায়ে জেতাবার জন্য যজ্ঞ করলেন মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে, সেদিন ঢোঁড়াইকে নিজে সামনে বসে পুরী হালুয়া খাওয়ালেন—যত খেতে পারে। সে কী হালুয়া! ঘিয়ে জবজব জবজব। যত না ঘি আগুনে ঢালা হয়েছিল তার চাইতেও বোধ হয় বেশি ঢালা হয়েছিল হালুয়ার প্রসাদে। চারিদিক থেকে সকলে ঢোঁড়াইয়ের খাওয়া দেখছে; ঢোঁড়াইয়ের কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। মোহন্তজী ঢোঁড়াইয়ের পাতের একখানা পুরী দেখিয়ে বৌকা

---

১ বায়ু উপড়োবার রোগ। যে কোন অনিশ্চিত রোগকে এখানকার অশিক্ষিত লোকেরা বলে, 'বাই উখড়োনো'র ব্যারাম।

২ প্রস্রাব।

৩ মহন্ত পদের নিদর্শন।

৪ 'একটিমাত্র মুখ দিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করিতে পারি'?—তুলসীদাস থেকে।

বাওয়াকে বুঝোন যে, পুরীর মোটা দিকটা এমন কড়া করে কোথাও ভাজে না, কোনো ভোজে না। এ হচ্ছে সীতারামের খাওয়ার জন্যে, এতে কি ফাঁকি দেওয়া চলে।

তারপর মোহন্তজী বাওয়াকে কড়া পুরীর প্রসাদ চাখানোর জন্যে, বড় চেলাকে হুকুম দেন।

ঢোঁড়াই আর বাওয়ার চোখাচোখি হয়। বাওয়ার মনে হয় যে, ঐ একরত্তি ছোঁড়াটা যেন বুঝেছে যে, বাওয়া যে পুরী পেল খেতে, সেটা মোহন্তজীর সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের এত আলাপ সেই জন্যে।···

হয়তো এটা বাওয়ার ভুল; কিন্তু সেদিন বাড়ি ফিরবার সময়, মোহন্তজী যখন বাওয়াকে একখানা কাপড় দিলেন, ছিঁড়ে লেঙট আর গামছা করবার জন্য, তখন ঢোঁড়াইয়ের কী কান্না! কাপড়খানা যেন তারই পাওয়ার কথা ছিল।

এস, ডি, ও, সাহেব এসেছিলেন যজ্ঞ দেখতে সকালবেলায়। তিনিই খুশি হয়ে মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে যজ্ঞের জন্য তিনজোড়া 'লাট্টুমার রৈলী' অর্থাৎ লাট্টু মার্কা র‍্যালি ব্রাদার্সের কাপড় 'সরকারী খাজনা'১ থেকে দেন। তারই একখানা মোহন্তজী বাওয়াকে দিয়েছিল।

ঢোঁড়াইয়ের কান্না আর থামে না। বাওয়া বুঝোয় তোর জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি, তোকেই তো দিয়েছেন মোহন্তজী।

না, আমি আর কোনো দিন যাব না রামায়ণ শুনতে। আমাকে দিলে বড় কাপড় দেবে কেন?

বাবুলাল ঐ কাপড় দেখে বলে, বাওয়া তুমি পরতে লেঙট। তুমি এ পাড়-ওয়ালা কাপড় নিয়ে করবে কী। সরকারি 'গিরানির'২ দোকান আছে না, সেখান থেকে হাকিম, বাঙালীবাবু আর চাপরাসীদের শস্তায় কাপড় চাল দেয়, সেখান থেকে আমি পেয়েছি খুব ভাল মার্কিন, 'জাপেনী' (জাপানী) আট আনা করে, পাঁচ-শ পঞ্চান্ন নম্বর থেকেও ভাল জিনিস। পাঁচ গজ তাই দিচ্ছি তোমাকে—এ ধুতি আমাকে দাও।

বাওয়া খুশি। তা না হলে অতবড় কাপড় কি ঢোঁড়াই পরতে পারে।

এই মার্কিন ছিঁড়ে ঢোঁড়াইয়ের প্রথম কাপড় হল। লেঙট ছাড়া চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সে এই কাপড়খানাই দেখেছে।

বাওয়া আবার কাপড়খানা নিয়ে যায় পাক্কীর ধারের কপিল রাজার বাড়িতে। কুলের ডালের পোকা থেকে গালার ঘুঁটে তোয়ের করে চালান দিত কপিল রাজা। তার উঠোনের গামলায় থাকে লাল রং গোলা। তাই দিয়ে বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের ধুতি রং করে দেয়।

এই ধুতি কোনো রকমে কোমরে বেঁধে ঢোঁড়াই পাড়াসুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে আসে —মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির মোহন্তজী দিয়েছে তাকে। কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, সে সকলকে বোঝাতে চায় যে, মোহন্তজী এ কাপড় বাওয়াকে দেয়নি। পাঁচ বছর তো বয়েস হবে, কিন্তু তখনই সে কারও কাছে ছোট হতে চায় না—বাওয়ার কাছে পর্যন্ত

১ গভর্ণমেণ্ট ফাণ্ড।

২ গিরানির অর্থ আক্রা। গভমেণ্ট-স্টোর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শস্তায় কাপড় দেওয়া হত সেখান থেকে, সকলে পেত না এ কাপড়।

না। তবে বাবুভাইয়ারা 'বড় আদমী', তাদের দেখলেই আদাব করতে হবে; আর সাহেব দেখলে কাছাকাছি থাকতে নেই, এ তাৎমাটুলির সব ছেলেই জানে। ওর মধ্যে ছোট হওয়ার প্রশ্ন নেই।

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছে যে কাপড়খানা পরে থাকে,—তার কোনো বন্ধুর কাপড় নেই, ঐ কাপড়খানা দেখিয়ে তাদের চেয়ে একটু বড় হয়, কিন্তু বাওয়া কিছুতেই তাকে কাপড়খানা পরতে দেবে না; তুলে রেখে দেবে। লাল কাপড় পরে ভিক্ষে চাইতে গেলে লোকে এক মুঠিও চাল দেবে না। ও কাপড় পরে দেখতে যেতে হয় তামাসা, মেলা, মোহরমের দুলদুল ঘোড়া। তবুও হারামজাদা ছেলেটা মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে। ঢোঁড়াইকে ভয় দেখানোর জন্য বাওয়া চিমটে ওঠায়।

## ঢোঁড়াইয়ের মায়ের সন্তানবাৎসল্যের বিবরণ

ছোঁড়াটা বুধনীর কাছে যেতে চায় না, এর জন্য বাওয়া বুধনীকে দোষ দেয় না। বাওয়া যতদূর জানে বুধনী কোনো দিন ঢোঁড়াইকে হতশ্রদ্ধা করেনি। করবে কী করে, নিজে পেটে ধরেছে যে। আর একটা 'চুমৌনা' করেছে বলে কি নিজের নাড়ীর সম্বন্ধটা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে পারে। তা হয় না, তা হয় না। রামজী তেমন করে মানুষ গড়েননি। সময়ে অসময়ে বুধনী ঢোঁড়াইয়ের জন্য করেছে বইকি।

—ঐ যখন 'জার্মানিবালা' রথ তারা হয়ে আকাশে ছুটে যেত;—সে রথ কোথায় নামে, কী করে, কেউ বলতে পারে না; বাওয়া অবশ্য সে রথ দেখেনি তবে তার চাকার কালো দাগ কচুর পাতার উপর তাৎমাটুলির সবাই দেখেছে; সেই সময় বুধনী কতদিন বাবুলালকে লুকিয়ে ঢোঁড়াইকে ভাত খাইয়েছে। তখন চালের দাম উঠেছে দু আনায় আধ সের। ঐ আক্রাগণ্ডার দিনে ভিক্ষে আর দিত কজন,—সে সাধুকেই হোক আর সন্তকেই হোক। তখন 'অফসর আদমী'দের সরকারী দোকান থেকে শস্তায় চাল দিত। বাবুলালের বাড়িতে সেই জন্যে চালের অভাব ছিল না। তখন যদি বুধনী ঢোঁড়াইকে লুকিয়ে চুরিয়ে না খেতে দিত তা হলে সাধ্যি কি বাওয়ার, সে সময় ঐ ছেলে মানুষ করা। সে সময় অতটুকু ছেলে রামায়ণের চৌপই গেয়ে 'ভিখ মাঙলেও' টৌনের কোনো গেরস্থ উপুড়হস্ত করত না।

আর কেবল খাওয়ানো কেন, ঢোঁড়াইয়ের উপর বুধনীর প্রাণের টান বাওয়া আরও একদিন দেখেছে। মিছে বলবে না। পাড়ার মেয়েরা যে যা বলুক। বাওয়া নিজের চোখে সাক্ষী, আর সাক্ষী ভুপলাল 'সোনার'১। ভুপলাল সোনারের নাও মনে থাকতে পারে, সে রাজা আদমী, তার 'গাহকীর ভরমার'২। ঢোঁড়াই তখন পাঁচ ছ সালের (বছরের) হবে। বাবুলাল গিয়েছে ভাইচেরমেন সাহেবের সঙ্গে দেহাতে, দিন কয়েকের জন্যে। বুধনীর তখন দুখিয়া পেটে। এমনি তো বাবুলাল বৌকে বাড়ির কাজ করতে দেয় না; 'ইজ্জৎবালা আদমী'৩ সে। তাই বুধনী সেই ফাঁকে সাত আনা পয়সা রোজগার করেছিল। লগা দিয়ে শিমুল ফল পেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়ে, সেই ভিজে শিমুল তুলো বেচেছিল কিরানীবাবুর জানানার'৪ কাছে। 'কিরানীবাবু'

---

১ সেকরা।
২ দোকান খদ্দেরে ভরা।
৩ সম্মানিত লোক।
৪ কেরানীবাবুর স্ত্রী।

বাবুলালের অফিসের মালিক। বুধনীর ভারি ইচ্ছে ঢোঁড়াইকে 'চাঁদির জেবর'১ দেয়—কোনো দিন তো কিছু দেয়নি। বুধনী বাওয়াকে বলে, দাও বাওয়া একটা চাঁদির সিকি কিনে ভূপলাল সেকরার দোকান থেকে ঢোঁড়াইয়ের ঘুনসিতে দেবার জন্য। বাওয়ার ভারি আনন্দ হয় কথাটা শুনে। একটু ভয় ভয়ও করে, চাঁদির ঘুনসিটা লেঙটের তলায় ঢেকে রাখতে হবে ঢোঁড়াইয়ের, না হলে ভিক্ষে জুটবে না। বাওয়ার সেদিনকার কথা সব মনে আছে,—তার ঢোঁড়াই গয়না পাবে, আর তার মনে থাকবে না সেদিনকার কথা। সেদিন বাওয়া আর ঢোঁড়াই মিসিরজি ঠাকুরবাড়ি থেকে রামায়ণ সেরে, যখন ভূপলাল সোনারের দোকানে আসে, তখন বুধনী সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অত লোকের মধ্যে ঢোঁড়াইকে কোলে টেনে নিয়েছিল, সেদিন সেকরার সঙ্গে কথা বলার সময়। সেকরার দোকানের সিঁড়ির উপর বুধনী ওকে একটা বিড়িও ধরিয়ে দিয়েছিল। ও ছোঁড়া তখনও কাশে। ভূপলাল সোনার তো শুনেই আগুন। ভারি আদমি (বড়লোক)—তার কথার ঝাঁঝ থাকবে না? সে বলে সিকির দামই তো হল আনা—তার উপর শালা পুলিশদের নজর বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুধনী ভয় পেয়ে বলে যে ঘুনসি করলে যদি পুলিশে ধরে, তবে অন্য কিছু করে দাও সিকি দিয়ে। ভূপলাল হুংকার দিয়ে ওঠে—'জাহিল আওরৎ,'২ কিছু বুঝবে না কথাটা, আরে করে দাও করে দাও। আমার কাছে সোজা কথা, সাত আনায় হবে না। সিকির উপর আবার ছেঁদা করার মেহনতানা আছে।

সে অন্য খদ্দেরের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে। তখন আর কী করা যায়। বাওয়া বুধনীকে নিয়ে যায় 'ছত্তিস' বাবুর দোকানে সওদা করাতে। ঐ পুরো সাত আনা খরচ করে বুধনী সেখান থেকে কেনে 'কজরৌটি'৩—পেটের ছেলের জন্য। এর দেড়-দুমাস পরে দুখিয়া আসে ওর কোলে। বাওয়ার সেদিন কী দুঃখই হয়েছিল। অমন একটা গয়না ছেলেটা পেতে পেতে পেল না। রাগ করবে সে কার উপর। ভূপলাল সোনারও অন্যায় কিছু বলেনি। বুধনীকেই বা কী বলা যায়। দেড় মাস পরই কাজললতাটার দরকার; ওর নিজের কামানো পয়সা; আর মায়ের মনের শখ। ভূপলাল দিলে কি আর ও ঘুনসির চাঁদি কিনত না।

ঢোঁড়াইটারও সেই সময় যেন একটু চোখ ছলছল ছলছল করেছিল;—ও ছোঁড়া কাঁদতে তো জানে না।

বুধনী লোভে পড়ে আর ঝোঁকের মাথায় কাজললতাটা কিনবার পর নিজেকে একটু দোষী দোষী মনে করে। ভাবে ঢোঁড়াই আর বাওয়ার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে সে। তার পেটের ছেলের জন্য কাজললতা, বাবুলাল নিশ্চয়ই কিনে দিত। তবে নিজের রোজগার করা পয়সা ও-কাজে খরচ করবার দরকার কী ছিল।

আসলে ঢোঁড়াইয়ের উপর টান তার একটু কমেছে। ঢোঁড়াই ঠিকই ধরেছে—ছোট ছিলেপিলের মতো এ জিনিস বুঝতে আর কেউ পারে না।

তাই মধ্যে মধ্যে বুধনী ঢোঁড়াইকে আর বিশেষ করে বাওয়াকে জানিয়ে দিতে চায় যে, তার ছেলের উপর ভালবাসা একটুও কমেনি—যেটুকু কম লোকে দেখে তা বাবু-লালের ভয়ে। এইটা জানানোর জন্যই বুধনী বাওয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ভূপলাল সোনারের দোকানে।

---

১ রুপার গহনা। ২ নিরক্ষর স্ত্রীলোক।
৩ কাজললতা।

নিজের দোষ কাটানোর জন্যেই না কি সে দিনকয়েকের মধ্যেই ঢোঁড়াইকে ডেকে পেট ভরে মিঠাই খাওয়ায়—একেবারে হঠাৎ। ভাইচেরমেন সাহেব ডিস্টীবোর্ডে লড়াই থামবার জন্য ভোজ আর দেওয়ালী করেছিলেন। সেদিন মশার ছবির তামাসা দেখিয়েছিল সেখানে। সারা দেওয়াল জোড়া অত বড় কখনও মশা হয়? 'ভাগ!' ওসব দেহাতীদের বোঝাস! কিরানীবাবু মোচ মুড়িয়ে 'কিষণজী-ভগবান'১ সেজেছিলেন। সে দেখলে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়। কলস্টর সাহেব—তাকে ওখানে বলে চেরমেন সাহেব২—তিনি পর্যন্ত দেখেছিলেন। ভাইচেরমেন সাহেব তাঁকে 'নাটক' বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সেইদিন বাবুলাল বাড়ি আসবার সময় ভাইচেরমেন সাহেবের চিঠি রাখবার যে বেতের ঝুড়ি ভরে কত রঙবেরঙের মেঠাই এনেছিল, বুধনী সে সবের নামও জানে না। জানতে চায়ও না। তার বরাতই অমনি। সেবার 'দরবারের' তামাসার সময় ও ছিল আঁতুড়ে; আবার, এবার যুদ্ধ থামবার সময়ও আঁতুড়ে। আঁতুড়ে তো মেয়েছেলেদের মিষ্টি খেতে নেই, তা এত মিষ্টি কী হবে। তাই ও নিজেই বাবুলালকে বলে, ঢোঁড়াইকে ডেকে নিয়ে আসতে। বাবুলালেরও মনটা খুশি ছিল—ছেলে হয়েছে নতুন। একটা দমকা উদারতার ঝোঁকে সে একখানা প্রকান্ড কচুরপাতা ভরে ঢোঁড়াইকে খাবার সাজিয়ে দেয়। বলে—'বাওয়া যে গলায় তুলসীর মালা দেওয়া 'ভকত'। না হলে তো তাকেও খাওয়াতাম।'

বুধনী নতুন খোকাকে কোলে নিয়ে মাচার উপর বসে ছিল। সে বাবুলালকে বলে—তুমি একটু বাইরে বেরিয়ে এসো, তোমার সামনে ঢোঁড়াই খেতে পাচ্ছে না।

'লজ্জা আবার কিসের' বলে একটু বিরক্ত হয়ে বাবুলাল চলে যায়।

ঢোঁড়াইয়ের খাওয়া হলে বুধনী ঢোঁড়াইকে কাছে ডাকে, একটু আদর করবার জন্য। অতটুকু কচি ছেলে কোলে নিয়ে উঠে তো আসতে পারে না।

ঢোঁড়াই গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্য দিকে তাকিয়ে। তার একটুও ভাল লাগে না এই লাল খোকাটাকে, আর তার মা'টাকে; বাওয়ার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে। তার চোখ ফেটে কান্না আসবে বোধ হয়। রাম্ রাম্! সে কোনো কথা না বলে দৌড়ে পালিয়ে যায় 'থানের' দিকে।

## রেবণগুণীর কৃপায় ঢোঁড়াইয়ের পুনর্জীবন লাভ

দুখিয়া হওয়ার পর থেকে বুধনী হয়ে যায় দুখিয়ার মা। পাড়ার সবাই তাকে ঐ নামেই ডাকতে আরম্ভ করে। আর সত্যি সত্যিই এর পর থেকে, ঢোঁড়াইয়ের কথা তার খুব কম সময়েই মনে পড়ে। একে ঢোঁড়াই মা'র কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চায়, আর এদিকে দুখিয়ার মা'রও সংসারের নানান লেঠা। দুখিয়ার মা'র ছোট্ট মনের প্রায় সমস্ত জায়গাটুকুই জুড়ে থাকে দুখিয়া। এ সোজা কথাটা বাওয়াও মর্মে মর্মে বোঝে, আর সেই জন্যই আজ দরকারে পড়েও তাকে ডাকতে ইতস্তত করছিল।

সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলিতে চড়াইপাখি দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শিগগিরই আসছে। তার উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে

---

১ কেষ্ট ঠাকুর।

২ তখন বেসরকারী লোক জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হতে পারতেন না।

লোক গুণে গিয়েছে১। সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ায়, তাৎমাটুলিতে, ধাঙড়টুলিতে, কি অসুখ! কী অসুখ! 'বাই উখড়োনোর' ব্যারাম—বেহুঁশ জ্বর—'ঝট্‌দে বিমার পট্‌দে খতম'২।

কপিল রাজার বাড়িসুদ্ধ সবাই উজাড় হয়ে যায় এই রোগে সেইবার। হবে না! বকরহাট্টার মাঠের সব শিমুল গাছ সে কাটিয়েছিল, চা চালান দেওয়ার বাক্স তৈরী করার জন্য। শিমুল তুলো যে তাৎমানীদের রুজী সে কথা একবার ভাবল না। কাটাচ্ছিলেন ওই নিরেট ধাঙড়গুলোকে দিয়ে। আহাম্মকগুলো বোঝে না যে ধাঙড়ানীদেরও শিমুল তুলো বেচে রোজগার হয়। সেই তো নির্ব্বংশ হয়ে গেলি কপিল রাজা, কিন্তু যাওয়ার আগে 'ঝোটাহারদের' রোজগার মেরে রেখে গেলি। থাকগে, সে যাদের স্ত্রী মেয়ে আছে তারা ভাবুগগে। কিন্তু তার তো সম্বল ঐ এক-মাত্র ঢোঁড়াই।

সকালে ঢোঁড়াই ঘুম থেকে ওঠেনি। মিসিট্রি ঠাকুরবাড়িতে রামায়ণ শুনতে যাওয়ার সময় হল, তবুও ওঠে না। বাওয়া ত্রিশূল দিয়ে খোঁচা মারে। হল কী ছোঁড়ার। বাওয়ার মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কপিল রাজার বাড়ি থেকে একটার পর একটা 'মুর্দা' বের করেছে—পর পর চারটে। নুনুলাল মহতো খতম হয়ে গিয়েছে গত সপ্তাহে···

গায়ে হাত দিয়ে দেখতে ভয় ভয় করে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে যা ভেবেছে তাই। ও ঢোঁড়াই কথা বল্‌—চুপ করে কেন? ভিক্ষেয় বেরুনো, রামায়ণ শুনতে যাওয়া মাথায় চড়ে। এ কী করলে রামজী, আমার! এ রোগে তে ভাববার পর্য্যন্ত সময় দেয় না। দুখিয়ার মাকে খবর দেব কিনা, ডাকা উচিত হবে কিনা সেই কথাই বাওয়া ভাবছে। দুখিয়ার মা তো মনে হয় একেবারে ধুয়ে-মুছে ফেলে দিয়েছে ঢোঁড়াইকে মন থেকে। এক বছরের মধ্যে একটি দিন খোঁজ করেনি। বাওয়া ভেবে কুল-কিনারা পায় না।

শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে খবরই দেয়। তার পেটের ছেলে, কিছু একটা ঘটে গেলে, হয়তো সারাজীবন দুঃখ থেকে যাবে। আসতে ইচ্ছে হয় আসবে, মন না চায় আসবে না। বাওয়া নিজের কর্ত্তব্য করবে না কেন।

খবর দিতেই দুখিয়ার মা আঁতকে ওঠে। দুখিয়াকে বাবুলালের কোলে ফেলে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে আসে। আর যেন সে-মানুষই না। পুরনো বুধনী ফিরে এসেছে যেন। বাবুলাল পিছন থেকে হাঁ হাঁ করে। কে কার কথা শোনে। গোঁসাই নেমে এলেও তার পথ আটকাতে পারতেন না তখন। এসেই ওই নেতিয়ে পড়া ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। ঢোঁড়াই তখন বেশ বড়—বছর আষ্টেক বয়স হবে। ওই বুড়ো-ধাড়ী ছেলেকে, কোলে নিয়ে ছোটে রেবণগুণীর বাড়ির দিকে। ওর গায়ে মহাবীরজী তাকৎ জুটোচ্ছেন। বাওয়া তো গুণীর বাড়ি যেতে পারে না; গেলে লোকে সে সন্ন্যাসীকে মানে না। তাই সে খানিক দূর সাথে সাথে গিয়ে পথের ধারে এক জায়গায় বসে পড়ে। সেখানে গিয়ে দুখিয়ার মা ঝাড়ফুঁকের কথা তুলতেই রেবণ-গুণী ফুঁ দিয়ে তামাক ধরাতে ধরাতে বলে,—তুই তো বাসি পেটে আসিস নি।

দুখিয়ার মা হকচকিয়ে যায়। সকালে কি খেয়েছে মনে করতে চেষ্টা করে। গুণী যখন বলেছে নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে থাকবে। ওমা, সত্যিই তো! খয়নি তো সে

১ আদম-শুমারি। ২। লোকে অসুখে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মরে।

খেয়েছে। ঐ যে তখন, বাবুলাল ডলে নিয়ে খাওয়ার সময় তাকেও একটু দিয়েছিল। উৎকণ্ঠার জায়গায়—ভয়ের ছাপ পড়ে তার মুখে। রেবণগুণী তো চটে লাল। এই মারে তো এই মারে! তুই বুড়ো মাগী, জিন্দিগি গেল ছেলে বিইয়ে। সাতকাল তাৎমাটুলিতে কাটিয়ে তুই জানিস ঝাড়ফুঁক করতে আসতে হলে খালি পেটে আসতে হয়, ভোরবেলাতে আসতে হয়।

রেবণগুণীর নামে পাড়ার লোকে কাঁপে। তাৎমাটুলির আইবুড়ো মেয়েরা তাকে দূর থেকে দেখলে পালায়। মায়েদেরও মেয়েদের উপর সেই রকমই হুকুম। এক তো তুকতাকের ভয়; তার উপর থাকে চব্বিশ ঘন্টা নেশা করে। পরপর ছটা বিয়ে করেছে, এখনও দুটোকে নিয়ে ঘর করে। গোঁসাই থানে যেদিন ভেড়া বলি হয়, সেদিন প্রতি বছর তার উপর গোঁসাই ভর করেন। সেই সময় সে ভেড়ার রক্ত কাঁচা খায়; মুখে গায়ে ভেড়ার রক্ত মেখে সে হুংকার ছাড়ে। সে কি আর করে? তার মধ্যে দিয়ে গোঁসাই কথা বলেন। তার হাতের বেতের ঘেরটা দিয়ে ছুঁয়ে সে যাকে যা বলবে, তা ফলবেই ফলবে। কুমারী মেয়েরা সে সময় পালায় সেখান থেকে। পাঁচবার সে একটা একটা মেয়েকে ছুঁয়ে, তার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছে। কোনও মা বাবার সাধ্যি নেই যে, সেই সময়কার গোঁসাইয়ের কথার নড়চড় হতে দেয়।

পথে আসবার সময়ই দুখিয়ার মা'র এসব কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ঢোঁড়াইটাকে বাঁচাতে হলে ঐ গুণী ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক নাই। টৌনের হাসপাতালে গেলে কোনো লোক আর বাড়ি ফিরেই আসে না। কপিলরাজা তো বাংগালী 'ডক্টর' দিয়েও দেখিয়েছিল। কিছু কি হল?

রেবণগুণী গালাগালি দিয়ে চলেছে দুখিয়ার মাকে। 'ভরা দুপুরে কি মন্তরের ধক থাকে নাকি? বেরো শিগগির এখান থেকে।' দুখিয়ার মা গুণীর পা জড়িয়ে ধরে, ডুকরে কাঁদে।—এটার বাবা নেই গুণী। তুমি একে পায়ে ঠেলো না।

গুণীর মেজাজ বোধ হয় গলে। বলে, কালই তো শনিবার। কাল আসিস। কাল তো আবার হাড়তাল না কী বলে, ওই কী একটা নতুন হয়েছে না আজকাল,—গত বছরেও হয়েছিল একবার—দিনের বেলা সওদা মিলবে না, সাঁঝের পরে দোকান খুলবে, কাল আবার তাই আছে। সাঁঝের পর দোকান খুললে পান সুপারি কিনে নিয়ে রাতে আসিস। 'সিনুর' তো তোর আছেই। 'ভানুমতীর'[১] দয়ায় সেরে যাবে এই বদমাসটা। বলে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়।

দুখিয়ার মা'র মনটা হাল্কা হয়ে ওঠে। রেবণগুণীর মন তা হলে গলেছে। সে বলেছে সেরে যাবে, তার দুশ্চিন্তা অর্ধেক দূর হয়ে যায়। কিন্তু কাল রাত্তির পর্যন্ত দেরি করা কি ঠিক হবে? চিকিৎসা আরম্ভ করতে তার সবুর সয় না। কালই কি আবার ঐ কী যে বলে ছাই, 'হাড়তাল' না কী না হলেই হত না। দুনিয়ার সকলের আক্রোশ কি তারই উপর? এখানে আসবার আগে রেবণগুণীকে যতটা ভয় ভয় করছিল, এখন কথাবার্তা বলার পর ততটা ভয় করে না।

সাহসে বুক বেঁধে গুণীকে জিজ্ঞাসা করে—'আচ্ছা আজকে পান সুপারি কিনে, কাল সকালে এলে হয় না—শনিবার আছে…'

'যা বললাম তাই কর'—চিৎকার করে ওঠে গুণী, 'তোর বুদ্ধিতে আমি চলব, না আমার বুদ্ধিতে তুই চলবি?'

---

১ ভানুমতী যাদুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

দুখিয়ার না ভয়ে কাঁপে—গুণীর মুখের উপর কথা বলা তার অন্যায়ই হয়েছে।

গুণী একটু নরম সুরে বলে, 'আজকের কেনা পান সুপুরিতে মন্তর ধরবে না। আর ছেলেকে আনবার দরকার নেই। এখান থেকেই কাজ হয়ে যাবে। তুই একা এলেই চলবে। আজকের রাতে শোবার সময় ছেলেটার চোখে ধোঁধলের ফুলের রস দিয়ে দিস। আর মরণধারের এই মন্তর দেওয়া মাটি নিয়ে যা ওর কপালে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে। ঢোঁড়াই তখন দুখিয়ার মা'র কোলে নেতিয়ে পড়েছে। ঢোঁড়াইকে নিয়ে ফিরে আসবার সময় দুখিয়ার মা'র কানে আসে—রেবণগুণী আপন মনে বলছে ...গত অমাবস্যাতে আদ্ধেক রাত্তিরে যখনই দেখেছি মুরবলিয়া১ ফৌজের দল পাক্কী দিয়ে গিয়েছে, তখনই বুঝেছি যে উজাড় হয়ে যাবে গাঁ। কাটা গলার উপর একটা করে আবার পিদীপ জ্বলছিল।...ভয়ে তার প্রাণ উড়ে যায়।...যাক্ সে যাত্রা রেবণ-গুণীর কৃপায় ঢোঁড়াই বেঁচে যায়। ঝাড়ফুঁকের জন্য দুখিয়ার মাকে যে দাম দিতে হয়েছিল, তার জন্য সে কোনোদিন দুঃখিত হয়নি। ঐ রোগে কত লোক মরেছিল গাঁয়ে, শুধু রেবণগুণীরই মন্ত্রের জোরে ঢোঁড়াই বেঁচেছে, এ উপকার দুখিয়ার মা ভুলতে পারবে না। এমন শনিবার রাত্রের মন্তরের ধক যে, জ্বর ছাড়বার পরও যত বিষ শরীরে ছিল, কালো কালো রক্তের ছাপের মতো হয়ে, নাকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে-ছিল কদিন ধরে।

অসুখ সারবার পরও এক হপ্তা দুখিয়ার মা ঢোঁড়াইকে রেখেছিল বাড়িতে। এ ঢোঁড়াইয়ের এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার শরীর তখনও দুর্বল। বাতায় গোঁজা কাজল-লতাটার দিকে শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ দেখলেই চোখ টন টন করে, হাঁড়ি ঝোলানোর শিকেগুলো বিনা হাওয়াতেও মনে হয় কাঁপে, ভাত আনতে দেরি হলে রাগে কান্না পায়। বাঁশের মাচার উপর একদিকে শোয় ঢোঁড়াই, একদিকে দুখিয়া, আর মধ্যেখানে দুখিয়ার মা। দুখিয়ার মা'র গায়ের গরমের মধ্যে মুখ গুঁজে গল্প শোনে ঢোঁড়াই... রাজপুত্তুর সদাবৃচ মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন রাজকন্যা সুরঙ্গার মহলে যাওয়ার জন্য ; অন্ধকার ঘুরঘুট্টি সুড়ঙ্গ, পিছল দেওয়াল, তার মধ্যে দিয়ে জল চুইয়ে টপ টপ করে।২...

ঢোঁড়াইয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে দুখিয়ার মা'র হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে। অন্ধকারে ভয় পাচ্ছে নাকিরে ঢোঁড়াই, এই তো আমি কাছে রয়েছি, কথা বলছি তবুও ভয় করছে। অসুখের পর এমনিই হয়।...

ওদিকে হিংসুটে দুখিয়াটা উঠে বসেছে হাতের মুঠো দিয়ে নাক রগড়াতে রগড়াতে। ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখান দিয়ে সে ঢোঁড়াইকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় আর ঢোঁড়াই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

'ছি দুখিয়া, ঢোঁড়াই ভাইয়ার যে অসুখ,' দুখিয়া কান্না জুড়ে দেয়। বাবুলাল অন্য মাচা থেকে চেঁচায়, 'ও কাঁদছে কেন ?'—শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে দুখিয়াকে নিয়ে যায় নিজের কাছে।

ঢোঁড়াই ছোট হলেও বোঝে যে, বাবুলাল রাগ করে দুখিয়াকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, আর রাগটা বোধ হয় তারই ওপর। দুখিয়ার মা-ও চুপ করে গিয়েছে। তার চুলের

১ কন্ধকাটা ভূত। ঐ সময় কন্ধকাটা মিলিটারী উর্দী পরা ভুতের দল গিয়েছিল কোশী-শিলিগুড়ি রোডের উপর দিয়ে।

২ সুরঙ্গা সদাবৃচের রূপকথা সবাই জানে এখানে। কিন্তু ওটা বলতে হয় গান করে, সেইটা সকলে পারে না।

গন্ধটা আসছে নাকে, বাওয়ার জটার গন্ধর মতো না, অন্য রকম। কোথায় ভেবেছিল যে, আজ বিজা সিং-এর গল্পটা শুনবে এর পর। বাবুলালটা সব মাটি করে দিল। ভারি ভাল লাগে বিজা সিং-এর গল্পটা। ঘোড়া ছুটিয়ে, তরোয়াল নিয়ে যাচ্ছেন বিজা সিং—কার সাধ্যি তার সম্মুখে দাঁড়ায়—হাওয়া গাড়ির চাইতেও কি বেশি জোরে তার ঘোড়া ছুটে। দুখিয়ার মাকে জিজ্ঞাসা করবে নাকি যে, এঞ্জিনের চাইতেও কি বিজা সিংয়ের গায়ে বেশি জোর। না দুখিয়ার মা টা এখন কথা বলবে না, তাই চুপচাপ শুয়ে রয়েছে।

'কিরে ঢোঁড়াই ঘুমোলি নাকি ?'

ঢোঁড়াই উত্তর দেয় না। চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে থাকে। এইবার দুখিয়ার মা ওঠে। ঢোঁড়াই জানে যে, তাৎমাটুলির প্রত্যেক মেয়েছেলেই রাত্রে পুরুষের পা টিপে দেয়—তেল থাকলে পায়ে তেল দিয়ে দেয়। তার বাওয়ার কথা মনে পড়ে। দুখিয়ার মা যদি বাওয়ার পায়ে তেল দিত, তাহলে বেশ ভাল হত। বাবুলালটাও ভাল না, দুখিয়ার মা-টাও ভাল না, আর দুখিয়াটাও ভাল না। বাওয়া এখন কী করছে, কে জানে। আজও তো নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল—দুখিয়ার মা যেতে দেয়নি। কালই সে চলে যাবে 'থানে', বাওয়ার কাছে···বিজা সিং-র ঘোড়ায় চড়ে। তরোয়াল হাতে নিয়ে রাজপুত্তুর সদাবৃচের মতো···

ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে।

## গুরু-শিষ্য সংবাদ

বোকাবাওয়া ঢোঁড়াইয়ের কদর বোঝে। ছোঁড়া বেশ বুদ্ধিমান। বাওয়া বোবা। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার একটুও অসুবিধে হয় না; চোখের ইশারাতেই সে সব মনের কথা বুঝে যায়। আর ওর জন্যে ভিক্ষেটাও পাওয়া যায় খুব, গলাটা ওর খুব ভাল কিনা। মাইজীরা ওকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'সীয়-রাম-পদ-অঙ্ক বরায়ে। লক্ষ্মণ চলাই মগু দাহিন বাঁয়ে॥'১ শোনেন। কিছুদিন থেকে বাওয়া দেখছে যে, ঐ গানটায় আর সেরকম ভিক্ষে পাওয়া যায় না। সে ও ছোঁড়াও বুঝেছে। এই যবে থেকে 'হাড়তাল' টাড়তাল আরম্ভ হয়েছে, তবে থেকে 'বটোহীর'২ গ্রাম্য গানের হাওয়া লেগেছে দেশে। কী যে গান বুঝি না—যে কোনো কথার শেষে রে বটোহিয়া জুড়ে দাও, আর অমনি গান হয়ে যাবে। যখন যে হাওয়া চলে আর কী!

বাওয়া ঢোঁড়াইকে ইশারায় বলে, 'এই পাশের বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চল্লি কোথায় ?

'ও বাড়িতে অসুখ।'

সব খবর ঢোঁড়াই রাখে। কোন বাড়িতে অসুখ, কোন বাসার মাইজীরা দেশে গিয়েছে দশহরার ছুটিতে, কোন কোন বাড়িতে দুপুর বেলায় যেতে হয় বাবুরা আপিস কাছারি গেলে, কোন বাড়িতে বিয়ে, পৈতে, পুজো সব ঢোঁড়াইয়ের নখদর্পণে। বাওয়াকে সে-ই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাওয়ার ভিক্ষের অভিজ্ঞতা দুপুরুষের। তবুও এসব এতসব খুঁটিনাটি মনে থাকে না। ঢোঁড়াই গান গাইছে···

---

১ রাম ও সীতার পায়ের দাগ এড়িয়ে লক্ষ্মণ একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরে রাস্তা চলছেন।

২ পথিক। এই নামের একটি গ্রাম্য সুর ১৯২০ সালের পর থেকে প্রচলিত হয়। এখন এ গান প্রায় লুপ্ত।

সুন্দরা আ সু। ভুমি ভাইয়া-আ।
। ভারাতা-আ কে। দেশা-বাসে।
মোরা প্রাণা-আ। বসে হিম-অ
! খোহরে বটোহিয়া-আ-আ…।১

বাওয়া বলে, 'চল এখান থেকে, কেউ সাড়া দেবে না কঞ্জুসের দল। এক দুয়োরে কতক্ষণ গলা ফাটাবি।

ঢোঁড়াই ভাবে, বাওয়া বোঝে না তো কিছুই, খালি চল্ চল্। হড়বড় করলে কি ভিক্ষে পাওয়া যায়। মাইজী এখন বসেছে পুজোয়। বাবু অপিসে গেলে, তারপর স্নান পুজোয় বসে। এখুনি উঠবে।

যা ভেবেছে ঠিক তাই।

বুড়ি মাইজী মটকার থান পরে ভিক্ষে দিয়ে গেলেন, সঙ্গে আবার একটা বেগুন।

বাওয়া অপ্রস্তুত হলেও মনে মনে খুশি হয়—এ ছোঁড়া উপযুক্ত চেলা হবে বড় হলে। একটু খালি শাসনে রাখতে হবে। বড় দুরন্ত ছেলে, দিনরাত খেলার দিকে মন। রোজগারের দিকে মন বসে না। সকালবেলা ধরতে পারলে তো সঙ্গে আসবে। একটু নজরের বার করেছ কি ফুট করে কখন যে থান থেকে সরে পড়বে, তা কেউ বুঝতেও পারবে না। তারপর কেবল সারাদিন টো টো, আজ এর সঙ্গে ঝগড়া, কাল ওর সঙ্গে মারামারি। ঠিক যে সব কাজ বাওয়া পছন্দ করে না সেই সব কাজ। একদিন বাওয়া দেখে একটা গাধা ধরে তার পিঠে চড়েছে। ঐ খৃষ্টান ধাঙড়গুলোর ছেলেদের সঙ্গে পর্যন্ত ওর আলাপ। 'মহতো' একদিন এ নিয়ে নালিশও করেছে তার কাছে। বুড়ো শুক্রা ধাঙড়, যে ওকিল সাহেবের বাগানে মালীর কাজ করে, সে আবার ঢোঁড়াইকে বলে 'সন্ বেটা' ( ধর্ম ছেলে )। রতিয়া ছড়িদার এই কদিন আগেও এসে বাওয়ার কাছে নালিশ করেছে ঢোঁড়াইয়ের নামে।

'গিয়েছিলাম চিমনি বাজারে রাঙা আলু কিনতে। দেখি তোমার গুণধর ছেলে ঢোঁড়াই, গলায় একটা দড়ি জড়িয়ে বোবা সেজে, গেরস্থ বাড়িতে, গরু মরেছে বলে ভিক্ষা করছে। তাৎমাদের নাম হাসাল। তোমার সঙ্গে ভিক্ষায় বেরুলেই হয়— তাতে তো বেইজ্জতি নেই। এর বিহিত একটা করতেই হয় বাওয়া তোমাকে।'

বাওয়া চটে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে আলাদা রোজগার করতে শিখেছে লুকিয়ে। কী করেচিস সে চাল আর পয়সা বল। কল্কের তামাকটা পর্যন্ত শেষ করে টানি না, পাছে ঐ ছোঁড়াটা ভাবে যে, ওর জন্যে রাখল না কিছু, আর এ তলে তলে রোজগার করে খরচ করে—নেমকহারাম হারামজাদা কোথাকার। আংটা পুরানো ত্রিশূলটা নিয়ে সে ঢোঁড়াইকে তাড়া করে যায় মারতে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন? অনেকদূর যাবার পর ঢোঁড়াই বাওয়ার নকল করে চলতে আরম্ভ করে —ঠিক যেন ত্রিশূল আর ঝোলা নিয়ে বাওয়া সকালে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। রতিয়া 'ছড়িদার', হেসে ফেলে। বাওয়া আরও চটে যায়—হাসছ কী, তোমাদের ছেলেরা যায় রোজগারে খুরপি নিয়ে ঘাস তুলতে, না হয় ঝুড়ি নিয়ে কুল কুড়োতে। এ ছোঁড়া যাবে তাদের সঙ্গে সমানে তাল দিতে, কিন্তু রোজগারের কথাও ওর কানে এনো না,

---

১ সুন্দর সুভূমি ভারত দেশটা,
আমার প্রাণ থেকে হিমালয়ের গুহায়,
রে পথিক।…

তবে থাকবেন খুশি। আমি এনে দেব তবে চারটি খেয়ে উপকার করবেন। না, ছোঁড়াটা দেখছি ধাঙড়টুলির পথ ধরেছে। যা তোর সাতজন্মের বাপদের কাছে !···তারপর রাগটা একটু কমে এলে, বাওয়ার উৎকন্ঠার সীমা থাকে না। বদরাগী পাগল ছেলেটা আবার কী না করে বসে। মরণাধারের ওপারে 'গোঁসাই' ( সূর্য ) ডুবে যায়। বকরহাট্টার মাঠের তালগাছ কটার উপরের আলোর রেশ মুছে যায়। গোঁসাই-থানের অশথ গাছটির উপরের পাখির কাকলী বন্ধ হয়ে যায়। তবুও ঢোঁড়াই আসে না। অনুতাপে বাওয়ার চোখ ছলছল করে ; তামাকে স্বাদ পায় না। সে কি গিয়েছে এখন। তখন 'গোঁসাই' ছিল মাথার উপর। সে তালপাতার চাটাইটা ঝেড়ে, অসময়ে শুয়ে পড়ে। খানিক পরে কাঠের বোঝা ফেলবার শব্দে বুঝতে পারে যে, ঢোঁড়াই জ্বালানী কাঠ কুড়িয়ে ফিরেছে। ঢোঁড়াই আগে কথা বলবে না, বাওয়াও ওর দিকে তাকাবে না। কোনোদিকে না তাকিয়ে ফুঁ দিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করে। বাওয়া শব্দ শুনে বোঝে যে এই মাটির মালসাতে জল চড়াল, এইবার ভিক্ষের ঝুলি থেকে চাল বের করছে। আর চুপ করে থাকা যায় না। বাওয়ার খাওয়ার জন্যে জিবছীর মা, গোটা কয়েক 'সুথনী'[১] দিয়ে গিয়েছে। এখনও মাথার কাছে রাখা রয়েছে। ঢোঁড়াইটা জানে না—এখন ভাতে না দিলে সিদ্ধ হবে কী করে। বাওয়া ত্রিশূলটি নেড়ে ঝম্ ঝম্ শব্দ করে। এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের অভিমান ভাঙে,—বাওয়া তাহলে তাকে ডেকেছে।

'এত সকাল সকাল শুয়ে পড়লে কেন বাওয়া ? খাবে না ?'

রাতে আবার ঢোঁড়াই বাওয়ার চাটাইয়ের উপর তার কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। বাওয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। এর মধ্যে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতে পারে না।

এই হচ্ছে আজকালকার নিত্য ঘটনা। বাওয়া মধ্যে মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার ভাবে যে অল্প বয়স। যে বয়সের যা। ওর সমবয়সীদের সঙ্গে না খেললে ধুললে কি ওর এখন ভাল লাগে। হ্যাঁ তবে খেলবি খেল। নিজের রোজগারের কাজটা করে তারপর খেলা ; আর ঐ দলের পান্ডামিটা ছেড়ে দে। এই এখনই থানে ফিরবে। আর কি ওর টিকি দেখবার জো থাকবে সেই গোঁসাই ডুববার আগে। আর কী জেদী, কী জেদী ! বকে ঝকে কি ওকে সামলানো যায়। ঝোঁক একবার উঠলে হল। এখন এই ঝোঁক থানের দিকে আর ভিক্ষের দিকে গেলে হয়, বড় হলে। তবে না আমার উপযুক্ত চেলা হতে পারবে। রামজীর মনে যা আছে তাই তো হবে। সিত্তারাম ! সিত্তারাম ! ঢোঁড়াই গেয়ে চলেছে সেই 'বটোহর' গান। বুকের জোর আছে ছোঁড়াটার। গানের শেষে বটোহিয়ার আ-টা যা ছেড়েছে একেবারে ভাইচেরমেন সাহেবের দরোয়ানের কুঠরির জানলা খুলিয়ে ছেড়েছে। ঐ যে তার বিজলী ঘরের মিস্ত্রীও জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে দেখছি। ঝুলিটা ভরে গিয়েছে রে ঢোঁড়াই। চল্, ফেরা যাক থানে। আবার সাওজীর দোকান থেকে একটু নুন নিতে হবে।

## গানহীবাওয়ার বার্তা

কপিল রাজার বাড়িটা ভুতের বাড়ির মতো পড়েছিল একবছর থেকে। বাড়ির লোকেরা মারা যাবার পর, তার জামাই এসেছিল, বাড়িটা বিক্রি করতে। খদ্দের

১ একপ্রকার কন্দ ; কেবল গরীবরাই এই কন্দ খায়।

জোটেনি। বাড়ি তো তেমনিই, তার উপর শহর থেকে এতদূরে। জমির দাম এখানে নামমাত্র বললেই হয়। ঐ ভূতুড়ে বাড়ির, খড়ের চালা কিনবার জন্য কে আর পয়সা খরচ করতে যাবে। কপিল রাজার জামাইটা আবার ফিরে এসেছে, দিনকয়েক হল। শোনা যাচ্ছে যে, চামড়ার ব্যবসা করবে। আজ বাদরা মুচির সঙ্গে নাকি সে অনেক-ক্ষণ কথাবার্তা বলেছে। কাল দুগাড়ি নুন এসেছে তার বাড়িতে।

এই কথাই উঠেছিল সাঁঝের ভজনের আখড়ায়। ধনুয়া 'মহতো' বলে তা কথাটা ভাববার বটে। তা বাবুলালকে আসতে দে। একে সে পাড়ার পঞ্চায়েতের একজন 'নায়েব', তার উপর 'অফসর আদমী'; হাকিম হুকুমের সঙ্গে কথা বলেছে। তার উর্দি পাগড়ির রং বদলেছে কিছুদিন আগে—কলস্টরের জায়গা নিয়েছে ওর ভাই-চেরমেন সাহেব সেইজন্য। বাবুলাল বলেছে যে, ওর ভাইসচেরমেন সাহেবকে এখন চেরমেন সাহেব না বললে চটে—আচ্ছা বাবা মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছে, যা বল তাই শুনতে রাজী আছি।

ঐ বাবুলালকে দিয়ে চেরমেন সাহেবকে বলাতে পারলে কপিল রাজার জামাইটার এ অনাছিষ্টি কাণ্ড বন্ধ করা যেতে পারে। বাদরা মুচিটাকেই যদি চেরমেন সাহেব একবার বকে দেয় তাহলেই এঁর চামড়ার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ছি ছি ছি ছি, জাত-ধর্ম আর থাকবে না। দুর্গন্ধে পাড়ার টেঁকা যাবে না, হাজারে হাজারে শকুন বসবে আমাদের ঘরের উপর। আর সেসব যা-তা চামড়া—নাম আনা যায় না মুখে। হ্যাক। থুঃ! থুঃ! সিত্তারাম!

কিন্তু বাবুলাল আজ আসেই না, আসেই না অফিস থেকে। চেরমেন সাহেবের বাড়িতে চিঠির ঝুড়ি পৌঁছে, তারপর হাট করে রোজ সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই ফিরে আসে। আজ রাত দশটা বাজল। আরে দুখিয়ার মা'র কাছ থেকে খবর নে তো ঢোঁড়াই যে, বাবুলাল কিছু বলে গিয়েছে নাকি বাড়িতে।

আমি যাই না ও-বাড়িতে।

মহতো বলে যে, বাওয়া ছেলেটার মাথা একেবারে খেল; নেমকহারাম কোথাকার; গত বছরও তো অসুখ হয়ে অতদিন পড়ে থাকলি দুখিয়ার মার কাছে। আচ্ছা গুদর তুই-ই যা বাবুলালের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আয়। তারপর বিকৃত উচ্চারণে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—'আমি যাব না ও-বাড়িতে। বদমাস কোথাকার।'

'কাহুহি বাদি ন দেইহয় দোষু'১—মিছে দোষ দিস না দুখিয়ার মায়ের আর বাবু-লালের।

এরই মধ্যে বাবুলাল এসে পড়ে। সে আর কাউকে প্রশ্ন করার অবকাশ দেয় না যে, আজ দেরি কেন হল।

ডিস্টিবোড আপিসে আজ ভারি হল্লা ছিল। মাস্টার সাহেব নৌকরিতে ইস্তফা দিয়ে সব ছেলেদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা ডিস্টিবোডের ঘড়িঘরের২ সম্মুখে 'সাভা'৩ করতে এসেছিল। মুফীলদ্দীন সাহেব মোক্তার আছে না, ঐ যে সব সময়

১ 'কাহহি যদি ন দেইয় দোষু'
কাউকে মিছে দোষ দিও না—(তুলসীদাস)

২ ক্লক টাওয়ার।

৩ মিটিং, সভা।

আফিং খেয়ে ঢোলে, সে লাল কিতাব হাতে নিয়ে সদর১ হয়েছিল।

'লে হালুয়া!২ মাস্টার সাহেবের…'

'ছুট গয়ী নৌকরি, সটক গয়া পান৩'

'কেন? মাস্টার সাহেবকে আবার পাগলা কুকুরে কামড়াল কেন?'

'নৌকরি থেকে সরকার নিশ্চয়ই বরখাস্ত করেছে। টাকাপয়সার ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আছে?

বাবুলাল সকলকে বুঝিয়ে দেয়—না না ওসব কিছু নয়, মাস্টার সাব গানহী বাবার চেলা হয়েছে।

গানহী বাবা কে? গানহী বাবা?

'বড়া গুনী আদমী৪। বোকা বাওয়া আর রেবণগুণীর চাইতেও 'নামী'। সিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাস্টার সাব চেলা হয়েছে। গানহী বাওয়া মাস-মছলী, নেশা-ভাঙ থেকে 'পরহেজ'৫। সাদি বিয়া করে নি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল৬।'

বাঙ্গালী বাবু চংড়ী মছলী খাবু। এত তকলীফ কি সইতে পারবে?

জমি-জমা করে নিয়েছে বোধ হয়।

প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বাবুলাল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বহু রাত পর্যন্ত নানারকম কথা হয়। বাঙালীরা বুদ্ধিতে এক নম্বরের, কিন্তু একটু পাগলাটে গোছের। ঠিক সাহেবদেরই মতো। তবে তার চাইতে একটু কম বদরাগী। ভয় ভয়ই করে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। বিজনবাবু ওকিলের ঘরের খাপড়া উল্টোবার সময় সেদিনও দেখেছি - জয়শ্রী চৌধুরী, ব্রাহ্মণ, অত বড় কিষাণ, বিজনবাবু ওকিল ছুঁড়ে ফেলেছে তার কাগজ। একবার বসতে পর্যন্ত বলল না ওকে। কী রাগ! কী রাগ। চাক তো দেখি টিকিটবাবু রেলগাড়িতে বাঙালীবাবুর কাছে টিকিট। তবে বুঝব। আর 'বাজা ছাজা কেস, তিন বাঙ্গলা দেস।'৭

আজ সভায় সরকারকে, লাটসাহেবকে, বাদশাকে অনেক কথা শুনিয়েছে মাস্টার-সাব।

ও কেবল 'কথার তুলো ধোনা', বলত দারোগা সাহেবের খেলাপে, তবে না বুঝতাম হিম্মৎ। বলত টমাস সাহেবের খেলাপে, তা গুলী মেরে উড়িয়ে দিত। চাঁদমারীতে মক্স করা হাত ওর।

চেরমেন সাহেব কলস্টর সাহেবকে খবর দিতে গেলেন যে তার হাতায় 'সাভা' করছে লোকে, মানা করলেও শোনে না।

তবে যে তুই বলীল যে তোর চেরমেন সাহেব, কলস্টরের জায়গা নিয়েছে।

---

১ সভাপতি।  ২ আশ্চর্য।

৩ এটি একটি অতি চলিত কথা তাৎমাদের মধ্যে। 'চাকরিও গেল, পান খাওয়াও শেষ হয়ে গেল।'

৪ গুণীর মানে যাদুকর।

৫ সংযমী।

৬ উলঙ্গ থাকে একেবারে।

৭ বাজা ছাজা কেস, তিন বাংগালা দেশ—বাদ্য, ঘরছাউনি, মাথার চুল (মেয়ে মানুষের) এই তিনটি জিনিস বাংলাদেশের ভাল।

বাবুলাল এই বোকাগুলোর মূর্খতায় বিরক্ত হয়ে বলে—আরে সে তো কেবল ডিস্টি বোর্ডে। জেলার মালিক তো কলস্টর আছেই।

'তাই তো বলি, কলস্টরের জায়গা কী করে নেবে।'

'কিন্তু চেরমেন সাহেব সেই যে গেলেন, আজও গেলেন কালও গেলেন। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত এলেন না—না কলস্টর, না সেপাই, না কেউ, আপিসের বাবুরা তাদেরই এন্তেজারিতে এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে আলো জ্বালিয়ে বসে। তাইতেই তো এত দেরি।'

বাবুলালের খাওয়া হয়নি এখনও। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে গল্পে গল্পে। সকলে উঠে পড়ে, সে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে। ঢোঁড়াই বকুনি খাওয়ার পর থেকে এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। কেবল সেই লক্ষ্য করে যে, যে চামড়ার নাম করতে নেই, সেই চামড়ার গুদাম পাড়ার কাছে হওয়ার কথাটা, এই গোলমালে একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। ঐ বেড়ালের মতো গোঁফ বাবুলালটা কতকগুলো গল্প বলল তাতেই। গানহী বাওয়া রেবণগুণীর চাইতেও বড়, বোকা বাওয়ার চাইতেও বড়, গিলিট্টি ঠাকুরবাড়ির মোহন্তর চাইতেও বড়, এক নম্বরের গপবাজ বাবুলালটা! 'ঝুটফুস'১ বললেই হল।

## গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণন

'পাক্কীর'২ ধারের বটগাছে মৌমাছির চাক হয়তো কতকাল থেকে আছে, কেউ তাকিয়েও দেখেনি; কিন্তু একদিন যদি দেখে ফেলে সেটা, তাহলে তারপর ওখান দিয়ে যতবার যাবে, নজরে পড়বে। গানহী বাওয়ার খবরের বেলায়ও হল এই রকমই। এমনি কেউ নামই শোনেনি। ঐ যে সেদিন রাতে বাবুলালের কাছ থেকে শুনল, তারপর কিছু দিন চলল নিত্যি নূতন খবর। মাস্টার সাবকে মসজিদের 'সাভায়' গেপ্তার করেছে দারোগা সাব। গা ম্যাজ ম্যাজ করলেও গানহী বাওয়ার চেলাদের দৌরাত্ম্যে কালালীর৩ দিকে যাওয়ার উপায় নেই। চেলারা আজ কাছারীতে, কাল ছত্তিসবাবুর দোকানের সম্মুখে, কী বলে, কী করে, কী চেঁচায় কিছু বোঝাও যায় না। কত জায়গা থেকে কত রকম আজগুবি খবর আসে। এ কান দিয়ে শোনে, ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ব্যাপারটা মনের মতো ভাবে জমল একদিন হঠাৎ। ভোরে বৌকা বাওয়া সবে হাতের দাঁতনটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ঢোঁড়াইটার ঘুম ভাঙিয়েছে, এমন সময় শোনা গেল রবিয়ার গলা ফাটানো চিৎকার। কী বলছে ঠিক বোঝা যায় না। বাওয়া ঢোঁড়াই রবিয়ার বাড়ির দিকে দৌড়োয়। রবিয়া পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে, গানহী বাওয়া,—কুমড়োর উপর। পাগল হয়ে গেল নাকি, ভাঙের সঙ্গে ধুতরোর বীচি-টিচি খেয়ে। একদন্ড দাঁড়িয়ে যে রবিয়া ঠান্ডা হয়ে কথার জবাব দেবে, তার সময় নেই ওর। রবিয়ার বাড়িতে ঢুকে দেখে যে, তার উঠন ভরে গিয়েছে পাড়ার লোকে। নিচু চালের ছাঁচতলা থেকে একটা বিলিতি কুমড়ো ঝুলছে। সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই খানটায়।

১ বাজে মিথ্যে। ২ কোশী-শিলিগুড়ি রোড। ৩ মদের দোকান।

ঠিকই। যা বলেছে তাই। বিলিতি কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মূরত১ আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের। মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোনো ভুল নেই। এখন কী করা যায়? এরকম করে তো গানহী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। মহতো নায়েবরা বোকা বাওয়াকেই সালিশ মানে। ঢোঁড়াইয়ের ভারি আনন্দ হয় যে, মহতো এসব ব্যাপারে বাওয়ার চাইতে ছোট। কুমড়োটার বোঁটা কাটার অধিকার বাওয়াই পেল; বাবুলালও না, মহতোও না। বোঁটাটা কাটবার সময় উঠন ভরা লোকের ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বাওয়ার হাত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। ঢোঁড়াই ভাবে, সেদিন বাবুলাল মিথ্যে বলেনি, গানহী বাওয়া, বোকা বাওয়ার চাইতেও গুণী। না হলে কুমড়োতে আসে!

থানে কুমড়োটার পুজো হয়, পান সুপুরি গুড় দিয়ে। সেদিন ঢোঁড়াইয়ের কী খাতির! বাওয়া পুজো নিয়েই ব্যস্ত। ঢোঁড়াইকেই করতে হল দৌড়োদৌড়ি পাড়ায়, বাজারে। সেদিন এরকম একটা মস্ত সুযোগ পেয়ে, বাওয়া সকলের সম্মুখে ঢোঁড়াইয়ের গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দিল। মালা গলায় দিলেই সে হয়ে যাবে 'ভকত'। আর কেউ তাকে ঢোঁড়াই তাৎমা কিংবা ঢোঁড়াই দাস বলতে পারবে না। সে কেউকেটা এখন, তাঁকে বলতে হবে ঢোঁড়াই ভকত। বোকা বাওয়ার সমান বড় হয়ে গিয়েছে সে, গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের দিনেই। তাকে আজ থেকে প্রত্যহ স্নান করতে হবে। আর অন্য ছেলেদের মতো নয়, মাস মছলী থেকে পরহেজ২। গুদরকে দেখে ঢোঁড়াইয়ের মায়া হয় সেদিন; বেচারার গলায় কণ্ঠি নেই।

তারপর সেই গানহী বাওবার 'মূরত' বালাত কুমড়োটা মাথায় করে ঢোঁড়াই নিয়ে আসে মিলিট্রি ঠাকুর বাড়িতে। পরণে সেই লাল কাপড়খানা। আগে আগে আসে ঢোঁড়াই আর পিছনে সব তাৎমারা। মহতো পর্যন্ত পিছনে।

ঠাকুরবাড়িতে পেঁাছে তাদের সব উৎসাহ জল হয়ে যায়। মোহন্তজী বলেন, 'কী রে ঢোঁড়াই, তোর যে আর দেখাই নেই। যে ঠাকুরবাড়িতে রামসীতার 'মূরত' আছে সেখানে গানহী মহারাজের 'মূরত' রাখা ঠিক নয়। তুলসীদাসজী তাই বলে গিয়েছেন। চুথিয়া সরকার!…'

তুলসীদাসজীর নির্দেশ পর্যন্ত তাৎমারা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তার সঙ্গে চুথিয়া সরকারের কী সম্বন্ধ, তা তারা ঠিক ধরতে পারেনি।

'মূরতটাকে' নিয়ে মহাবিপদ। এখন কী করা যায়! কী করা যায় ওটাকে নিয়ে! এমন ভাবে মূরতের দর্শন পাওয়া গিয়েছে। রাম-সীতার পাশে যদি না রাখতে পারা যায়, তা হলে 'থানেই' বা 'গোঁসাইয়ের' পাশে কী করে রাখা যাবে? বাওয়া ঘাড় নাড়ে—সে তো হতেই পারে না। তবে উপায়? এ কী পরীক্ষায় ফেললে রামজী। এত কৃপা করে, আমাদের ঘরে এলে গানহী মহারাজ, আর আমরা তোমাকে রাখবার জায়গা দিতে পাচ্ছি না। থাকত টাকা সাহেবদের মতো, বাবু-ভাইয়াদের মতো, রাজ দ্বারভাঙ্গার মতো, দিতাম একটা ঠাকুরবাড়ি বানিয়ে, গানহী বাওয়ার জন্যে। ঠিকই বলে গিয়েছে তুলসীদাসজী—'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ'৪।

---

১ মূর্তি।

২ সংযমী: মাছ মাংস ছেড়ে দিতে হবে। ৩। মূর্তি আঁকা।

৪ পৃথিবীতে দারিদ্র্যের মতো দুঃখ আর নেই (তুলসীদাস)।

বাওয়ার চোখের কোণ জলে ভরে ওঠে। সারা জীবন তার ভিক্ষে করে কেটেছে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত, কখনও দুবেলা ভাত খেয়েছে বলে মনে পড়ে না। একবেলা 'জলপান', একবেলা ভাত—তাও জুটলে, এই তো সব তাৎমাই খায়। এ কেবল তার একার কথা নয়, তবুও 'নাহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহী' এই আবছা কথাগুলোর মানে এই বিপদের ঝলকে হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কপিলরাজার ঐ 'পাখণ্ডী, চামড়াবালা' জামাই১ গানহী বাওয়ার নামে সিন্নি দেওয়ার জন্য যে গুড়, আটা আর কাঁচকলা পাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তা অমনিই পড়ে থাকে।

এমন সময় রেবণগুণী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। আজকাল বিকালের দিকে গানহী বাওয়ার চেলারা 'কালালী'তে বড় জ্বালাতন করে। তাই সে দুপুরের দিকেই কাজটা সেরে আসে। সেখান থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ লোকমুখে গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের কথা শুনেছে সে। তাই সে হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে। টোপা কুলের মতো চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দৌড়ুবার মেহনতেও হতে পারে, আবার মদের জন্যও হতে পারে। সে এসে ঝুঁকে পড়ে কুমড়োটার উপর। অন্য কেউ হলে সকলে হাঁ হাঁ করে উঠে তাকে আটকাতে যেত; কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা যে রেবণগুণীর মুখের উপর কিছু বলে। ঢোঁড়াইয়ের বুক দুর দুর করে ভয়ে। এই বুঝি গুণী মুরতটাকে একটা কিছু করে বসে—যা মেজাজ। তাৎমা মেয়েরা রেবণগুণীকে দেখে মাথায় কাপড় টেনে দেয়।

'ঠিকই তো। টৌনে যা শুনেছিলাম বিলকুল ঠিক। ঠিক! ঠিক! ঠিক! গানহী বাবা ফুটে বেরুচ্ছেন কুমড়োটার গায়ে। কেবল হাত-পা-টা ওঠেনি—জগন্নাথজীর মতো।'

রেবণগুণী কুমড়োটাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, তারপর চিৎকার করে ওঠে, 'লোহা মেনেছি২; লোহা মেনেছি আমি গানহী বাওয়ার কাছে।'

অবাক হয়ে যায় সকলে। রেবণগুণী 'লোহা মেনেছে'! চাকের মৌমাছি নড়ে বসার মতো একটা উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায় দর্শকদের মধ্যে। রেবণগুণী যার 'লোহা মানে' সে তো প্রায় রামচন্দ্রজীর সমান। অত বড় না হোক, অন্ততঃ গোঁসাই কিংবা ভানমতীর মতো জাগ্রত দেবতা তো বটেই।

মৃদু গুঞ্জন উঠবার আগেই গুণী আবার বলে ওঠে, 'আজ থেকে কোন্ হারামীর বাচ্চা কালালীতে গিয়ে গানহী বাওয়ার কথার খেলাপ করে। আজকে যা করে ফেলেছি তার তো আর চারা নেই। কাল থেকে গানহী বাওয়া, পচই ছাড়া আর কিচ্ছু খাব না।' সে কেঁদে ফেলল বুঝি এইবার।

'দেখে নিও মহতো।'

এইবার মহতো বর্তমান সমস্যার কথাটা তোলে।

গুণী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়! গানহী বাওয়াকা জয় হো, বলে লাফিয়ে উঠে মাথার পাগড়িটা সামলে নেয়। বাওয়া ঢোঁড়াইকে বলে, যা তুই পৌঁছে দিয়ে আয় মুরতটা ওর বাড়িতে। সে ঠিক বিশ্বাস পাচ্ছে না গুণীটাকে। ঢোঁড়াইও সেই কথাই ভাবছিল। বাওয়া ঠিক তার মনের কথা বুঝতে পারে।

সে রাত্রে রেবণগুণীর বাড়িতে ভজনের আসর জমে—যা গ্রামের ইতিহাসে আর

১ পাষণ্ড চামড়াওয়ালা। ২ পরাজয় স্বীকার করা।

কখনও হয়নি। ঢোঁড়াই 'ভকত' গানহী বাওয়ার নাম দেওয়া বটোহীর গান গায়। গুণী তার সঙ্গে তান ধরে। সে রেবণগুণীর সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে গানহী বাওয়ার দৌলতে।

পরের দিন সকালে কুমড়োটাকে কাপড় ঢেকে গুণী চলে যায় মেলায়। অনেক দিনের মদের খরচ সে রোজগার করেছিল যাত্রীদের কাছ থেকে ঐ মুরতটা দেখিয়ে। একটা করে পয়সা দিলেই, কাপড়ের ঢাকা তুলে কুমড়োটাকে দেখাত।

## ঝোটাহা উদ্ধার

তাৎমাটুলির পঞ্চায়তিতে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, আলবৎ উঁচুদরের সন্ন্যাসী গানহী বাওয়া মুসলমানকেও পিঁয়াজ গোস্ত ছাড়িয়েছে। একবার কপিল রাজার জামাইটার সঙ্গে দেখা করাতে পারলে হয়, তাঁকে আনিয়ে। ওরে আসবে না রে আসবে না। মাস্টারসাবদের মতো বাবুভাইরা চেলা থাকতে, তোদের এখানে আসবে না, না হলে চালার উপর এসে রবিয়ার ঘরে ঢোকেনি। থানের মতো ঘর-দুয়োর-আঙ্গন 'সাফ-সুৎরা' রাখতে পারিস তবে না সাধুসন্ত এসে দাঁড়াতে পারে। এ একটা 'মার্কার১ কথা বলছিস বটে। সকলের কথাটা মনে ধরে। মরগামার গয়লারা রবিবারে গরু দোয় না। সেদিন তারা তাদের ঘর-বাড়ি সাফ করে, তারা সিরিদাস বাবাজীর চেলা কিনা। ধনুয়া মহতোর মাথায় ঢোকে যে আচ্ছা রবিবারে গানহী বাওয়ার নামে কাজে না গেলে বেশ হয়। রবিবার 'তৌহারের'২ দিন। সরকার বাহাদুর পর্যন্ত কাছারী বন্ধ রাখে, চেরমেনসাহেব ডিস্টিবোড বন্ধ রাখে, পাদ্রীসাহেব দুধ বিলোয়—খৃষ্টান ধাঙড়দের। সকলেরই এ বিষয়ে খুব উৎসাহ। রবিবারে কাছারী বন্ধ থাকায় বাবুভাইয়ারা বাড়িতে থাকে, আর যতক্ষণ তাৎমারা তাদের বাড়িতে কাজ করে, সঙ্গে সঙ্গে টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্ করে। অন্য কোনো কাজ নেই তো ঘরামির পিছনেই লাগো। ঢোঁড়াইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বাঁধা ঘরগুলোতে রবিবারের দিনই ভিক্ষে দেয় বিশেষ করে যারা আধলা দেয় তারা। বৌকা-বাওয়া যে পঞ্চায়তিতে আসে না। সে এলে এর প্রতিবাদ করতে পারত। ঢোঁড়াইয়ের কথা তো কারও মনেই পড়েনি। ছোকরা ঢোঁড়াই দূর থেকে বলে, আমাদের 'পেট কেটো' না মহতোও। রবিবারের রোজগারই আমাদের আসল রোজগার। অর্বাচীনের ধৃষ্টতায় নায়েব মহতোরা অবাক হয়। এতটুকু ছেলে পঞ্চায়তির মধ্যে কথা বলতে এসেছে।

তুই আবার কণ্ঠি নিয়ে 'ভকত' হয়েছিস না? গানহী বাওয়া বড় না তোর রোজগার বড়?

কোন্‌টা বড় ঢোঁড়াই সত্যিই এ প্রশ্নের জবাব ঠিক করতে পারে না। কাঁচুমাচু মুখ করে সে বসে পড়ে। তার আর বাওয়ার রোজগারের কথাটা 'মুখিয়ারা'৪ একবারও তো ভাবল না। গানহী বাওয়া তো তারই দলের লোক; কিন্তু নিজের 'পেট কেটে' গানহী বাওয়া করা, এটা সে বুঝতে পারে না। রোজগারের কথাটা ঢোঁড়াই এই বয়সেই ঠিক বুঝেছে। বৌকা বাওয়া যতই ভাবুক না কেন যে ছোঁড়ার সেদিকে খেয়াল নেই।

---

১ কথার মত কথা। ২ পর্বের দিন।

৩ রোজগার মেরো না। ৪ (মুখ্য শব্দ থেকে) মাতব্বর।

ঢোঁড়াইয়ের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে পঞ্চায়তির ধনুয়া মহতো, আর বাবুলাল-টার উপর। কিন্তু তার বিষয় ভেবে পঞ্চায়তি এক মিনিটও সময় বাজে খরচ করতে রাজী না। ততক্ষণে একটা অনেক বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে সেখানে 'ঝোটাহা'দের নিয়ে। খালি রবিবারে আঙ্গন সাফ করলেই হবে না। ঝোটাহাদেরও একটু 'পাক সাফ'১ থাকতে হবে। মেয়েমানুষের জাতটাই এমন। হাজার বলেও ওদের দিয়ে কিছু করাতে পারবে না।

কে কথা শুনবে না, কোন 'ঝোটাহা' শুনি! মাসে একদিন করে সব 'ঝোটাহা'-দের স্নান করে 'পাক সাফ' হতে হবে। গাঁটের পয়সা খরচ করে বিয়ে করেছি না, না মাঙনা?

খোঁড়া চথুরী বসে ছিল দূরে। তার বৌ তার সঙ্গে থাকতে চায় না বলে মহতো নায়েবরা তার 'সাগাই'২ করে দিয়েছে ইসরার সঙ্গে। সে বলে মহতো আর ছড়িদার ইসরার কাছ থেকে টাকা খেয়েছে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, ঝোটাহাদের মাথায় চড়াও তো তোমরাই। 'পঞ্চ'রা যদি কড়া হয় একটু, তাহলে ঝোটাহাদের সাধ্যি কী যে তারা চুলবুল করে। তার ভর দিয়ে চলার লাঠিটা মাথার উপর ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—'তাহলে একটু চালের থেকে বেচাল হয়েছে কি···।' আর একদিক থেকে চেঁচামেচি ওঠায় তার শেষের কথাগুলো, বোঝা যায় না, তবে খোঁড়া চথুরীর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো দেখে মনে হয় যে, সে একটা মারাত্মক রকমের ওষুধের কথা কিছু বলেছে। যেদিক থেকে গোলমালটা ওঠে, সেদিকে দেখা যায় কয়েকজন মিলে ইসরাকে ঠান্ডা করিয়ে বসাচ্ছে।

আরও কত রকমের প্রশ্ন ওঠে সেখানে। এত বড় একটা প্রশ্ন রেওয়াজের খেলাপ অমনি এক কথায় নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে না। সবচাইতে বড় প্রশ্ন ঝোটাহাদের কাপড় শুকোবার। একখান করে তো কাপড়; গরমের দিন না হয় গায়ে শুকোতে পারে। কিন্তু শীতকালে?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়—মাসে একদিন স্নান মেয়েদের করতেই হবে। কোনো ওজর শোনা হবে না। 'গোঁসাই' হু-উ উ, মাথার উপর আসবার পর, আর কোনো মরদ 'ফৌজ' ইঁদারার উত্তরে বাঁশঝাড়টার দিকে যেতে পারবে না—ওখানে 'ঝোটাহারা' কাপড় শুকোবে।

এরপর নিত্য নতুন কান্ড। আজব আজব খবর গানহী বাওয়ার। বোকা বাওয়ারা দেখতে গেল কাঝা গণেশপুরে। ঢোঁড়াইকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না—সে অনেক দূর, সাতকোশ—অতদূর যেতে পারবি না তুই। তারপর তারা যখন বনভাগের সাঁকো পার হয়েছে, তখন দেখে যে ঢোঁড়াই ভকত লাল কাপড়খান পরে ছুটতে ছুটতে আসছে পিছন থেকে। কী জেদী ছেলে রে বাবা! ঢোঁড়াইকে জিরোবার ফুরসত দেবার জন্য বাওয়াকে কুলগাছতলায় বসতে হয়। তারপর কাঝা গণেশপুরের বেলগাছটার তলায় পৌঁছে দেখে যে, যা শোনা গিয়েছিল ঠিক তাই। প্রকান্ড বেলগাছের মগডালের পাতা তিরতির তিরতির করে নড়ছে—তিনটে করে পাতা একসঙ্গে। পাতাগুলোয় কী যেন লেখা লেখার মতোই লাগে। ঠিকই গানহী বাওয়ার নাম। জয়, জয় হো! নয়ন সার্থক, জীবন সার্থক বাওয়ার আজ। ঢোঁড়াই-এর এত কষ্ট করে আসা সার্থক হয়েছে। জয় হো গানহী বাওয়া। তোমার নামের গুণেই না এত লোক বেলগাছ-

১ পরিষ্কার ঝরিষ্কার। ২ সাঙা।

টার ডালে ডালে হুঁকো বেঁধে দিয়ে গিয়েছে। ঐ বেলতলার ধুলো ঢোঁড়াই লাল কাপড়ের খুঁটে করে বেঁধে নিয়ে আসে।

পরদিন ভোরে 'থানে' পৌঁছেই, না মুখ ধোয়া না কিছু, বাওয়া তার নিজের কল্কেটা ঢোঁড়াইকে চাঁড়িয়ে দিল মহতোর বাড়ির পাশের 'বরহমভুতবালা'১ বেলগাছটায়। ঢোঁড়াই বেলগাছে বাওয়ার হুঁকোকল্কেটা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে এল।

তামাক না খেয়ে সেদিন বাওয়ার কী ছটফটানি। ঢোঁড়াই বুঝতে পেরে চুপটি করে বাওয়ার পাশে বসে থাকে। দুদিন রোজগার নেই, ঝুলি খালি। মেটে আলুর গাছের মতো এক রকম লতার, ওলের মতো কন্দ ধাঙড়রা খায়। ঢোঁড়াই তাদের কাছ থেকেই শিখেছে যে, ওই আলুগুলোকে চুন নিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তার তেতো কেটে যায়। এগুলো অজস্র পাওয়া যায় আলের আশেপাশে, অথচ তাৎমারা ওকে বলে বিষ। ঢোঁড়াই অনেকক্ষণ ধরে ঐ আলু সিদ্ধ করে। সময় আর কাটতেই চায় না। অথচ আজকের মতো দিনে বাওয়াকে ছেড়ে দূরে থাকতে ঢোঁড়াইয়ের মন সরে না। বাওয়া ঢোঁড়াইকে ইশারা করে বলে—তোর ভালই হল,—আর আমার জন্য তোর তামাক সাজতে হবে না। বাওয়া মড়ার মতো শুয়ে পড়ে থাকে। ঢোঁড়াইয়ের বড় মায়া হয় বাওয়ার উপর! নিশ্চয়ই গা হাত পা আনচান করছে। পা-টা একটু টিপে দি। বাওয়া আপত্তি করে না, বরঞ্চ বলে, গায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিতে।

বাওয়ার গা টিপে দিতে দিতে কেন যেন ঢোঁড়াইয়ের দুখিয়ার মা'র কথা মনে পড়ে। বেশ হত সে যদি বাওয়ার পা টিপে আরাম করে দিত। তার অসুখের সময়ের সেই রাত্রের কথা মনে আসে। দুখিয়ার মা, বাবুলালের মাচায়, ওই বিড়ালের মতো গোঁফওয়ালা বাবুলালের পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে—শালা নবাব···

'পরণাম বাওয়া!'

'মহতো যে! হঠাৎ রাতে যে! ছড়িদারকেও সঙ্গে দেখছি।

'এই সংগত করতে এলাম। খুব ছেলের সেবা খাচ্ছ।'

ঢোঁড়াই লজ্জিত হয়ে যায় বাওয়ার চাইতেও বেশি—বাওয়ার গায়ের উপর পা দিতে বাইরের লোকে দেখে ফেলেছে বলে। চেলাতে দেবে গুরুর গায়ে পা! কালই হয়তো মহতো এই নিয়ে দশ কথা বলবে লোকের কাছে।

বাওয়া লজ্জিত হয়ে উঠে বসে। ছড়িদার আর মহতো বিনা মতলবে থানে আসার লোক নয়।

ঢোঁড়াই লজ্জা কাটানোর জন্য বলে—আজ তামাক না খেয়ে বাওয়ার শরীরটা অস্থির করছে। মহতো রসিকতা করে বলে, 'আর তোর?'

'আমি পেলে একটান মারতাম। না পেলে পরোয়া নেই।'

মহতো দুঃখ করে বলে আমারই হয়েছে বিপদ। তামাক বিড়ি না খেলে এক ঘন্টাও চলে না। বুঝি অতি খারাপ জিনিস তামাক। তার উপর আজকাল আবার শুনছি অনেক জায়গায় গরুর রোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে তামাকে···বলেই সে বারকয়েক কেশে থুতু ফেলে—যেন তার গলায় একটা রোঁয়া তখনও লেগে রয়েছে···

'ছড়িদার' বলে 'বুঝি তো সব। রামজীর দেওয়া শরীর, তামাকের পাতা দিয়ে তৈরি কোনো রকম জিনিস, নিতে চায় না। খয়নি খাও—থুথুর সঙ্গে ফেলে দিতে হবে, নস্যি নাও, নাক ঝেড়ে ফেলতে হবে; জর্দা খাও, পানের পিচ ফেলতে হবে;

১ ব্রহ্মদৈত্য থাকেন যে গাছে।

তামাক সিগ্রেট খাও, ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে হবে। এ হারামজাদার নেশা কিন্তু—ছাড়তে—পারব না। বাওয়া, তোমারও আগে সাতদিন কার্ত্তিক তারপর বুঝব।'

'সুয়াজ (স্বরাজ) অত সোজা না' বলে মহতো তামাকের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে দেয়।

তারপর মহতো আসল কাজের কথাটা পাড়ে।—তাদের ইচ্ছে 'ভকত' হবার।

মহতো 'ভকত হওয়ার সুবিধে অসুবিধে বেশ ভাল করে খতিয়ে দেখেছে। প্রথম অসুবিধে মাছ মাংস খেতে পাবে না। মাংস তো এক ভেড়া বলির দিন খায়—মাছ ন'মাসে-ছ-মাসে মরণাধারে জল এলে হয়তো এক আধবার জুটে যায়। কাজেই ওটা বড় কথা নয়। প্রত্যহ স্নান করা—এটা একটু গোলমেলে ব্যাপার বটে, কিন্তু এ কষ্টটুকু সে স্বীকার করতে রাজী আছে। একমাত্র সত্যিকারের অসুবিধা যে, সে ভকত ছাড়া আর কারও বাড়ি ভোজে কাজে খেতে পারবে না। কিন্তু এর বদলে সে পাবে অনেক কিছু। লোকের চোখে সে বড় হয়ে যাবে। এমনিই মহতো, ছড়িদার, নায়েবদের সম্বন্ধে লোকে কিছুদিন থেকে অল্প অল্প স্পষ্ট কথা বলতে আরম্ভ করেছে। এ জিনিস আগে ছিল না। ঐ তো সেদিন খোঁড়া চথুরী পঞ্চায়তির মধ্যে চেঁচিয়ে কী সব বলে দিল। খারাপ হাওয়ার দিন আসছে। মহতো নিজের জায়গা আরও একটুও মজবুত করতে চায়। বছরে একদিন মাছ খাওয়া ছেড়ে যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যায়, তাহলে মহতোগিরি থেকে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে তার সমাজে পসার প্রতিপত্তি অনেক বাড়বে; চাইকি সে তার আগের মহতো নুনুলালের সমান হয়ে যেতে পারে খ্যাতিতে।

তাই তারা এসেছে বাওয়ার সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে।

ঢোঁড়াইয়ের কথাটা একটুও ভাল লাগে না। এ যেন তাদের ঘরের জিনিসে বাইরের লোক হাত দিচ্ছে। রবিবারে রোজগার বন্ধ করবার সময় বাওয়ার সলার দরকার ছিল না, আর এখন নিজের গরজ পড়েছে, আর দরকার হয়েছে বাওয়ার সলার। বাওয়া যদি না বলে দেয় তো বেশ হয়।

বাওয়া আবার অদ্ভুত ধরণের 'জীব'। সে খুব খুশি হয় ছড়িদার আর মহতোর প্রস্তাবে। তাদের পিঠ চাপড়ে হেসে অস্থির। আঙুলের কর গুনে, আকাশের দিকে দেখিয়ে, মাথার চুল দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেয়, রবিবারে সকালে স্নান করে এলেই, বাওয়া তাদের গলায় তুলসীর মালা দিয়ে দেবে।

ঢোঁড়াই বাওয়ার উপর রাগে গজরায়; ওঁর আবার পা টিপে দেবে! মহতোর মতো লোক ভকত হলে আর সে চায় না ভকত থাকতে।

## তাৎমা ধাঙড় সংবাদ

ঢোঁড়াই ঠিক বোঝে না গানহী বাওয়াকে। মহতো আর ছড়িদার ভকত হবার পরদিনই দেখা গেল, গানহী বাওয়া তাদেরই উপর সদয়, ঢোঁড়াইয়ের উপর নয়।

সকালে স্নান করেই মহতো আর ছড়িদার তাৎমাটুলির মোড়ের উপর খানিকটা জায়গা বেশ করে লেপতে বসে, গোবর দিয়ে। সেখানে রাখে একটা ঘটি। তারপর ঘটিতে খানিকটা জল ঢেলে দেয় মহতো। রতিয়া 'ছড়িদার' ঘটির উপর গামছা ঢাকা দিয়ে তিনটে তুলসীপাতা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মহাতো মনে মনে গানহী বাওয়ার মন্তর পড়তে থাকে।

প্রণাম করে গামছা সরানোর পর দেখা গেল যে, গানহী বাওয়া ঘটির জলে

এসেছেন ; জল বেড়ে গিয়েছে ; ঐ তো বেড়ে গিয়েছে, চোখে দেখছিস না। দু আঙুল তো জল ঢালা হয়েছিল মোটে। সত্যি তো! ছুঁস না ছুঁস না ঘটি ; ও জল আবার সৌরা নদীতে দিয়ে আসতে হবে।

ঢোঁড়াইয়ের হিংসে হয় মহতো আর ছড়িদারের উপর। তারা ভকত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গানহী বাওয়াকে আনছে। সে নিজেও চুপি চুপি থানে চেষ্টা করে দেখে। কিন্তু তার ঘটিতে গানহী বাওয়া আসেন না—জল সেই যেমন তেমনই আছে! গানহী বাওয়ার এই একচোখোমি তার মনে বড় আঘাত দেয়। কিন্তু সে একথা প্রকাশ করতে পারে না কারও কাছে ; তার 'ভকত'গিরির তাকৎ নেই, একথা লোকে জানলে, সে ছোট হয়ে যাবে পাড়ার লোকের কাছে।

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সেদিনকার প্রার্থনা বোধহয় গানহী বাওয়া শোনেন। মহতো আর ছড়িদারকে ধাঙড়রা 'আচ্ছা রকম' বেইজ্জত করে। রবিবারের দিন দপুরে মহতোর দল গিয়েছিল, নতুন তুলসীর মালা দেখাতে ধাঙড়টুলিতে! ধাঙড়দের সঙ্গে আসল ঝগড়া তাৎমাদের রোজগার নিয়ে। তারা সব কাজ করতে রাজী। তার উপর সাহেব পাদ্রী, বাবুভাইয়ারা, কপিল রাজা সকলেই ছিল তাদের দিকে। কপিল রাজার জন্যে বড় শিমুলগাছগুলো একেবারে নির্মূল করে দিয়েছিল তারা। লড়ায়ের আমলে লা-র জন্য কুলের ডাল কাটত কপিল রাজার জন্য তারাই। শুয়োর-খোর, মুর্গীখোর লোকগুলোকে গানহী বাওয়ার নামে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাতে গিয়েছিল দুই নতুন 'ভকত', গিয়েই তাদের বলে যে তোদের শুয়োর-মুর্গী ছাড়তে হবে গানহী বাওয়ার হুকুম মাস্টারসাবও সসুরার১ থেকে বেরিয়ে বলেছে। জয়সোয়াল সোডা কোম্পানিতে কাজ করে বুড়ো এতোয়ারী। সে ফোকলা দাঁতে হেসেই কুটি কুটি। আরে গানহী বাওয়া তোদের 'খত'২ দিয়েছে নাকিরে ? তাহলে ডাকপিয়ন এসেছে বল, তোদের পাড়ায়। শনিচরা ধাঙর বলে—'লে ডিগি ডিগি! তাই বল! মহতো 'ভকত' হয়েছিস। ছড়িদারও দেখছি তাই। 'বিলি ভকত আর বগুলা ভকত'!৩ তাই গানহী বাওয়ার হুকুম ফলাতে এসেছিস। পরশুও তো ছড়িদারকে 'কলালীতে'৪ দেখেছি সাঁঝের পর।'

'মিছে বলিস না খবরদার! জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

'আয় না মরদ দেখি।'

এতোয়ারী শনিচরাকে চুপ করতে বলে। তারপর মহতোকে পরিষ্কার বলে দেয় যে, সাহেব-মেমদের কাছে শুয়োরেরর মাংস, আর মুর্গীর ডিম বেচে তাদের পয়সা রোজগার হয়। গানহী বাওয়া যদি আমাদের 'পেট কাটেন', তাহলে তিনি তোমাদেরই থাকুন! আর 'পচই' আমাদের পুজোয় লাগে ; ও ছাড়তে পারব না। মাস্টারসাব 'বাবুভাইয়া' লোক। তাঁদের যা করা সাজে আমাদের তা করা সাজে না। ঐ যে সেবার 'টুরমন'-এর তামারা৫ হল ঝিকটিহার মাঠ ঘিরে, তাতে যে রংরেজ জার্মান লড়াই৬ হল ;—আমাদের ভিতরে যেতে দিয়েছিল ? তোদের যেতে দিয়েছিল ?

---

১ শ্বশুরবাড়ি ; এখানে জেলখানা। ২ চিঠি।

৩ বিড়াল তপস্বী আর বকধার্মিক। ৪ মদের দোকান।

৫ ১৯৪১ সালে কয়দিনব্যাপী একটি উৎসব হয় জিরানিয়াতে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রচারের জন্য। এর নাম ছিল ডিস্ট্রীক্ট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্ট থেকে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়।

৬ টুর্নামেন্টে ইংরাজ-জার্মানদের mock fight হয়েছিল।

'গিরানীর'র দোকানের১ শস্তা চাল, তোদের দিত সে সময়? এস ডি. ও. সাহেবের সরকারী কাছারির দোকানের 'নাট্টু মার', আর পেয়ারা মার্কা 'রৈলী'২ আমাদের দিয়েছে কোনো দিন? আর রোজ স্নান করা,—তোরা আজ 'ভকত' হয়ে করছিস। আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত চিরকাল প্রত্যহ স্নান করে এসেছে। মহতো আর তার দল চটে আগুন হয়ে যায়। আমাদের মেয়েছেলেদের উপর ঠেস দিয়ে কথা। ঐ মেম-সাহেব—ধাঙড়নীদের দিস পাঠিয়ে সাহেবটোলায়, আর ঐ মুসলমানদের বাড়িতে, যাদের সঙ্গে মিলে তোরা শিমুল গাছগুলো সাবড়ে দিয়েছিস। পাঠিয়ে দিগা শনিচার বৌটাকে, মলি সাহেবের পাকা চুল তুলে দিতে।

তুলমারী কান্ড আরম্ভ হয়ে যায়। কারও কথা বোঝা যায় না হট্টগোলের মধ্যে। তাৎমাদের সজীব গালির তোড়ে ধাঙড়রা থই পায় না। শেষকালে একরকম দিশাহারা হয়েই তারা তাৎমাদের তাড়া করে। চিরকালের অভ্যাস মতো আজও তাৎমার পালায়। সোজা 'পাক্কী'র দিকে, লাঠি ফেলে, টিকি উড়িয়ে, পাক্কীর হোঁচট খেয়ে; পালা পালা! তারপর রাস্তা পার হয়ে, তারা পাক্কীর তাৎমাটুলীর দিকের গাছের সারির নিচে,—রাস্তার মাটি কাটার গর্তর মধ্যে দাঁড়ায়। এখানে আবার নতুন 'মোর্চাবন্দী'৩ করে তারা গালাগালির লড়াই আরম্ভ করে। ধাঙড়রা হাসতে হাসতে ফিরে যায়। তাদের চিরকালের নিয়ম তারা পাক্কী পার হয়ে গিয়ে কখনও তাৎমাদের সঙ্গে মারপিট করে না। কেবল চিৎকার করে বলে যায় 'হাভেলী পরগণায়'৪ পেঁছে দিয়েছিল সঙ্গে করে। 'সিনুর' লাগাস, 'সিনুর'৫। দুই ভকতে। 'বিল্লি ভকত আর বগুলা ভকৎ'। দুজনের গলার হার দুটো দেখাতে ভুলিস না ঝোটাহাদের।' তারপর ধাঙড়রা ফিরবার সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, শালাদের রক্তের ঠিক আছে? সন্ধ্যার সময় দেখিস না কত বাবুভাইয়ারা, তাৎমাটুলির আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করে। সাহস আসবে কোথা থেকে? সব রক্ত পানি হয়ে যাচ্ছে। হত আমাদের টোলা, দিতাম বাবুদের মজা টের পাইয়ে। বাবুভাইয়ারা মিহি চালের ভাত খায়, গরু দেখলে ভয় পায়।

শনিচরা বলে, বিয়ের আগে আমিও তো কত বাবুভাইয়ার বাড়ি ভাত খেয়েছি। এত সাদা চাল! একদম মিঠা না। সেয়ভরের কম ও চালে পেটই ভরে না। তার-পর এক লোটা জল খাও। আধ ঘন্টার মধ্যে সব ফুস্-স্স্।' বলে সে একটি তুড়ি দেয়।

একমাত্র শুক্রা ধাঙড় এই অনধিকার চর্চার প্রতিবাদ করে। 'জানিস, মিহি চাল খেলে বুদ্ধি খোলে। ঐ মিহি চালের জোরেই বাবুভাইয়ারা গেলে হাকিম বসতে 'কর্সি' দেয়। তোকে আমাকে দেয়? তাৎমাদের দেয়? এইসব টোলায় ডাকপিয়ন আসে চিঠি নিয়ে? যা রয় সয় তাই বলিস।'

তাৎমা খেদানোর উল্লাসের মধ্যে শুক্রা কী সব বাবুভাইয়াদের কথা এনে সমস্ত

১ যুদ্ধের সময়ের গভর্ণমেন্ট স্টোরস: এখানে সস্তায় জিনিস পাওয়া যেত।

২ লাট্টু মার্কা আর পেয়ারা মার্কা র‍্যালি ব্রাদার্সের কাপড়।

৩ ব্যূহ রচনা করে।

৪ রাস্তার এ পারটা পড়ে হাভেলী পরগণাতে: আর হাভেলী কথাটার অর্থ অন্দর মহল; এই নিয়েই ধাঙড়রা বিদ্রূপ করে।

৫ সিঁদুর।

জিনিসটাকে তেতো করে তুলেছে।

বুড়ো এতোয়ারী লাল চাল খেলেও বেশ বুদ্ধিমান। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে বলে, 'চল চল। সিঙ্গাবাদ থেকে শনিচরা নতুন মাদল এনেছে। মুচিয়ার মাদল কোথায় লাগে এর কাছে। চল শীগ্‌গির খেয়ে দেয়ে বাঙ্গা গাছের তলায়। ঘুঁটে ধরিয়ে আনতে ভুলিস না শনিচরা। শীগ্‌গির।'

বিরৌলীকে হাটিয়া—আ—
দৌড়ে নোকানিয়া—আ—
ঠস ঠস রে বোলে বুনিয়া—আ-আ-আ-আ-১।
জলদিরে জলদি!

## সামুয়রের ভর্ৎসনা

ঢোঁড়াই বড় হয়ে উঠেছে। আর সে তাৎমাটুলির অলিতে গলিতে 'কনৈল' খেলার ঘুচ্‌চী২ কাটে না, বাঁশের চোঙের মধ্যে দরদময়দার ফল দিয়ে বন্দুক ফোটায় না, মোরব্বার৩ পাতা দিয়ে ঘর ছাইবার খেলা খেলে না। ও সব বাচ্চারা করুক। সে এখন মোহরমের সময় ফুদীসিংহের দলে 'মাতুম' যায়৪ দুল্ দুল ঘোড়ার মেলায়—

হিন্দু মুসলমান ভাইয়া, জোরহুঁ রে পীরিতিয়া রে ভাই,
হায় রে হায়!৫

বর্ষা শেষ হলেও যেমন মরণাধারে জল থেকে যায়, গানহী বাওয়ার হাওয়া পড়ে আসবার পরও সেই সময়ের রেশ রেখে যায় এই মাতুমগানে।

মরগামার তাৎমাদের 'ঝুগিরা'৬ নাচের দলে তাকে নিয়ে টানাটানি। মরগামার ওরা 'মুঙ্গেরিয়া তাৎমা', আর তাৎমাটুলির তাৎমারা, 'কনৌজিয়া তাৎমা'। মুঙ্গেরিয়া তাৎমারা জাতে ছোট বলে, তাদের সঙ্গে এত মাখামাখি—তাৎমাটুলির লোকেরা পছন্দ করে না।

কিন্তু, ও ছোঁড়া কি কারও কথা শুনবে। ধাঙড়টুলির 'কর্মাধর্মা' নাচের মধ্যে পর্যন্ত গিয়ে বসে আছে। ধাঙড়টুলিতে যাওয়াই ছাড়ল না—অন্য জায়গায় যাওয়া ছাড়ল কি না ছাড়ল—তাতে কী আসে যায়।

বাওয়া মনে মনে এক বিষয়ে খুশি যে, ধাঙড়টুলি থেকে আম, লিচু নানারকম ফল ঢোঁড়াই নিয়ে আসে—এমন জিনিস যা তাৎমারা কোনোদিন দেখেও নি। ধাঙড়রা সাহেবদের বাগান থেকে এই সব কলম চুরি করে এনে লাগিয়েছে। তারা তাদের সনবেটাকে৭ খাওয়ার জন্য দেয়। ঢোঁড়াই আবার সে সব, পাড়ার তার দলের ছেলেদের এনে দেয়, বাওয়ার জন্য রেখে দেয়। কার সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের আলাপ না। 'কালো ঘাগরাওয়ালী' পাদ্রী মেম যিনি ধাঙড়টুলিতে আসেন, তার সঙ্গে পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের

---

১ ধাঙড়দের দ্রুততালের গান। বিরৌলীর হাটে দৌড়ুচ্ছে দোকানদার, বোঁদে (মিষ্টান্ন) থেকে ঠস্‌ঠস্ হচ্ছে।

২ কল্কে ফুলের বীচি দিয়ে খেলার জন্য গর্ত।

৩ aloe—আনারসের মতো পাতা দেখতে।

৪ মহরমের শোকের গীত—এর প্রতি লাইনের শেষে, হায়রে হায়, কথা কয়টি থাকে। ৫ হিন্দু-মুসলমান ভাই, প্রীতির বন্ধনে বাঁধোরে ভাই, হায়রে হায়।

৬ এক প্রকার গ্রাম্য গীতিনৃত্য।

৭ ধর্ম-ছেলে।

আলাপ।

বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের সব দোষ সহ্য করে যায়, কিন্তু ঐ রোজগারে বার হওয়ার সময় যে অধিকাংশ দিনই তার টিকি দেখার জো নেই, এ জিনিসটা সে সহ্য করতে পারে না। ভিক্ষের রোজগারে ঢোঁড়াইয়ের কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত ভাব অন্যর কাছে, এটুকু বাওয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেইজন্যই বাওয়ার চিন্তা সবচাইতে বেশি! ভোরে উঠেই ছোঁড়া পালিয়েছে। তার বন্ধুরা তো সব রোজগারে বেরিয়েছে, ওটা কোথায় থাকে, কী করছে এখন, বাওয়া কিছুই ঠিক করতে পারে না। ঢোঁড়াই হয়তো তখন মরণাধারের কাঠের সাঁকোটির উপর পা ঝুলিয়ে বসে বকের পোকা খাওয়া দেখছে, মন উড়ে গিয়েছে কোথায় কোন স্বপ্নরাজ্যে···বিজা সিং চলেছেন···ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন কুয়াশার রাজ্যের মধ্যে দিয়ে···অসংখ্য জোনাকি মিট্ মিট্ করে জ্বলছে অন্ধকারে···সে তার চাইতেও জোর চালাবে রেলগাড়ি···কোথায় চলে যাবে এঞ্জিনের 'সিটি' দিতে দিতে। বাওয়ার দেখাশুনা করবে দুখিয়ার মা; -না ও মাগীর দায় পড়েছে।···বিজা সিং যদি তরোয়াল দিয়ে দুখিয়ার মা আর বাবুলালকে কেটে ফেলে।···

এমনভাবে বকগুলো পা ফেলে যে, দেখলেই হাসি আসে—'বগুলা চুনি চুনি খায়'১···মরগামার 'লম্বী গোয়ারিন'২ যাচ্ছে ঐ দূরে পাক্কীর উপর দিয়ে। শুঁটকো হাঁটুর উপর কাপড় তুলে দিয়েছে বোধ হয় রাস্তায় কাদা, ঠিক বকের চলার মতো করে চলেছে···'গে-এ এ...লম্বী গোয়ারিন্! বগুলা চুনি চুনি খায়।' বলে ঢোঁড়াই নিজেই হাসে। লম্বী গোয়ারিন এদিকে তাকায়—বোধ হয় কথাটা বুঝতে পারে না। হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে টৌনে···বকটা ঘাড় কাত করে অতি মনোযোগের সঙ্গে কী যেন একটা গর্ত না কী লক্ষ্য করছে। ভিক্ষা পাওয়ার পর চলে আসবার সময় বাওয়াও ঠিক অমনি করে, এক মুঠো চাল হাতে নিয়ে, ঘাড় কাত করে দেখে -চালটি ভাল না খারাপ। চাল খারাপ হলে বাওয়ার মুখ অমনি অন্ধকার হয়ে ওঠে। সে চাল কটিকে ঝুলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে, জোরে জোরে পা ফেলতে আরম্ভ করে। ত্রিশূলের সঙ্গে লাগানো পিতলের আংটাটা ঝমড় ঝমড় করে বাজে। ঢোঁড়াইয়ের মুখ দুষ্টুমির হাসিতে ভরে ওঠে।

ছাই রঙের ডানাওয়ালা বকগুলিকে সাদা বকরা নিশ্চয়ই দেখতে পারে না। বাবু-ভাইয়ারা কি তাৎমা ধাঙড়দের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু ছাই রঙের ডানা হয়েছে বলে কি তার 'হুক্কা পানি'৩ একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। 'বগুলা ভকত'৪ দেখতে ঐ ভাল মানুষ, কিন্তু তার পেটে পেটে শয়তানি।

'আরে বগুলা ভকৎ কী করছিস, বকের মতো ঠ্যাং ঝুলিয়ে?'—সামুয়র হাসতে হাসতে ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করে।

ঢোঁড়াই চমকে উঠেছে। সামুয়রটা কোন দিক থেকে এসে গেল, ঢোঁড়াই অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করেনি এতক্ষণ! এই খাঁকির হাফপ্যান্ট পরা কিরিস্তান ধাঙড় ছেলেটা কি 'গুণ'৫ জানে নাকি। না হলে হঠাৎ তাকে বগুলা ভকৎ বলে ডাকল

১ বক বেছে বেছে খায়। ২ লম্বা গয়লানী।

৩ হুঁকো জল। এর অর্থ একঘরে করা।

৪ বক ধার্মিক। ৫ ইন্দ্রজাল।

৬ আদুরে গোপাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থ টাট্টু ঘোড়া।

কেন ? সেও যে ঠিক ভকতের কথাটাই ভাবছিল। ঐ পাদ্রী 'সাহেবের টাট্টু'১ সামুয়রটা কি তাকে এক দন্ডও নিরিবিলিতে থাকতে দেবে না! তার আসল নাম স্যামুয়েল, বয়সে ঢোঁড়াইয়ের চেয়ে দু-এক বছরের বড় ; ফুটফুটে ফরসা, নীল চোখ, কটা চুল, মুখে বিড়ি, চোখেমুখে কথা, দরকারের চাইতে বেশি চটপটে ; শুয়রের কুঁচির মতো খাড়া অবাধ্য চুলগুলিতে জবজবে সরষের তেল মেখে টেড়ি কেটেছে। জেমসন সাহেব নীলকুঠিবহুল জিরানিয়াতে, নীলকুঠির পড়তি যুগে একটা পাঁউরুটির কারখানা খুলেছিল। পরে সে স্নানের ঘরে, ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করে। তার ভিটের মিষ্টি কুলের গাছটা তাৎমা আর ধাঙড় ছেলেদের লোভ আর ভয়ের জিনিস। মিষ্টি ফলের তুলনা দিতে গেলেই তারা বলে, 'গলাকাটা সাহেবের হাতার কুলের মতো মিষ্টি। দিনের বেলাতেও রাখাল ছেলেরা একলা সে গাছের তলায় বসতে ভয় পায়। সেই 'গলাকাটা' সাহেবের মেমকে পাউরুটি তৈরী করতে সাহায্য করত, সামুয়রের দিদিমা। 'গলাকাটা সায়েব' পান খেত, গড়গড়া টানত। সামুয়রের দিদিমার স্নানের জায়গার জন্য চুণার থেকে নৌকোয় করে পাথর এনে দিয়েছিল। সেটা এখনও পড়ে আছে সামুয়রদের বাড়ির উঠোনে। কালো ঘাগড়াওয়ালী পাদ্রী মেম, ধাঙড়টুলিতে এলে ঐ পাথরখানার উপরেই তাঁকে বসতে দেওয়া হয়।

আবলুসের মতো কালো সামুয়রের দিদিমার যখন ফুটফুটে মেমের মতো রঙের মেয়ে হয় তখন সেইজন্যে কেউ আশ্চর্য হয়নি।

সামুয়রও পেয়েছে মায়ের রঙ।

'কিরে বগুলা ভগৎ, আজকে রবিবার। আজ যে বড় বৌকা বাওয়ার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুসনি ?'

প্রশ্নটিতে ঢোঁড়াইয়ের যেন একটু অপমান অপমান বোধ হয়।

'কারও চাকরও না, কারও পয়সাও ধার করিনি! তোদের মতো তো নয় যে, আজকে গির্জায় যেতেই হবে, নইলে পাদ্রী সাহেব দুধ বন্ধ করে দেবে।'

আরে যা যা! 'লবড় লবড়'২ বলিস না। বাড়ি বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষে করার চেয়ে পাদ্রী সাহেবের দেওয়া দুধ নেওয়া ঢের ভাল।'

'মুখ সামলে কথা বলিস। চুকন্দর৩ কোথাকার। সাধু সন্তকে কি লোকে ভিক্ষে দেয় নাকি ? ও তো গেরস্তরা রামজীর হুকুম মতো সাধুদের কাছে নিজেদের ধার শোধ করে। না হলে বাওয়া কি 'বরমভূতকে' দিয়ে মরণাধারের নিচে থেকে আশরফির মড়া বার করতে পারে না'।

'থাক থাক, তোর বাওয়ার মুরোদ জানা আছে। সেবার যখন টোলায় পিশাচের উপদ্রব হল, কোথায় ছিল তোর বাওয়া। রেবণগুণী 'তুক' করে যেই না বালি ছুঁড়ে 'বাণ' মারা৪ অমনি সেটা একটা বিরাট বুনো মোষ হয়ে কাশবনের মধ্যে থেকে মরণাধারে ঝাঁপ দিল। তার চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করিস তোদের মহতোকে।'

এই অকাট্য যুক্তির সম্মুখে আর ঢোঁড়াইয়ের তর্ক চলে না, কিন্তু বাইরের লোকের মুখে বাওয়ার নিন্দা সে কখনই সহ্য করতে পারে না।

---

১ আদুরে গোপাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থ টাট্টু-ঘোড়া।
২ বাজে বকা। ৩ বীটপালং। ৪ যাদুবিদ্যার প্রক্রিয়া বিশেষ।

'থাম, থাম। ফের ছোট মুখে বড় কথা বলবি তো, পিটিয়ে তোর সাদা চামড়া আমি কালো করে দেব। গির্জেতে যে টুপিতে করে পয়সা নিস তার নাম কী? তুই নিজেই তো দেখিয়েছিস।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ জানা আছে শালা তাৎমাদের।'

'বিল্লীর মতো চোখ, কিরিস্তান, তুই জাত তুলে গালাগালি দিস।' ঢোঁড়াই সামুয়রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'আর বলবি? বলবি? বল।'

সামুয়রকে 'না' বলিয়ে তবে ঢোঁড়াই তাকে ছেড়ে দেয়। সামুয়র যেতে যেতে গায়ের ধুলো ঝাড়ে—আর যাওয়ার সময় বলে যায় যে আজ রবিবার না হলে দেখিয়ে দিতাম।

এ ঢোঁড়াইয়ের জীবনে প্রতিদিনের ঘটনা; কিন্তু অন্য তাৎমার মতো সে গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভ করে না, আর ঝগড়া একবার আরম্ভ হয়ে যাবার পর সে পালায়ও না।

## দুখিয়ার মায়ের খেদ

অনেকে দুখিয়ার মা না বলে, বলে 'বাবুলালকা-আদমী'১। কথাটা খুবই ভাল লাগে দুখিয়ার মা'র, বিশেষ করে যখনই আপিসের উর্দিপাগড়ি পরা বাবুলালের চেহারা তার মনে আসে। এমন মানায় এ পোশাকে বাবুলালকে। বুধনী ভাবে পাড়ার সকলে হিংসেয় ফেটে পড়ছে। দুখিয়ার মাকে রোজগার করতে হয় না বলে সত্যিই পাড়ার মেয়েরা তাকে হিংসে করে। এত লোকের বিষের নজর এড়িয়ে দুখিয়াটা বাঁচলে হয়। বড় হলে সেও আবার উর্দিপাগড়ি পরে, বাবার জায়গায় কাজ করবে। ও কাজ কি সোজা ইজ্জৎ! দুখিয়ার মা বাবুলালের কাছে শুনেছে যে চেরমেনসাহেবের ঘরে,—না না চেরমেনসাহেব বললে আবার আজকাল বাবুলাট চটে, আজকাল বলতে হবে রায়বাহাদুর, ঘন্টায় ঘন্টায় নাম বদলালে আর মনে না থাকার দোষ কী?—যে রায়বাহাদুরের ঘরে ঠিকেদার সাহেবরা, গুরুজীরা পর্যন্ত ঢুকতে পায় না, সেখানে বাবুলালের অবারিত দ্বার। গর্বে দুখিয়ার মা'র বুক ফুলে ওঠে। আজ সে আপিস ফেরত বাবুলালকে ভাল করে খাওয়াবে। তাই সে তাল গুলতে বসে। তার ভিতর গুড় আর নুনের জল দিয়ে সে বরফি করবে। রায়বাহাদুরের ডেরাইভারই কত বড় লোক, না হলে কি আর তার বৌয়ের ছেলে হওয়ার সময়, বাবুলাল চাপরাসী রাত-দুপুরে চামারনী ডাকতে ছোটে। ডেরাইভারসাহেবই তো ধনুয়া মহতোর সমান 'অকতিয়ারের'২ লোক। সেই ডেরাইভারসাহেবকেও চাকর রাখে রায়বাহাদুর। এত বড় লোকটিকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে একবার দুখিয়ার মা'র। কত কথা সে শুনেছে তাঁর সম্বন্ধে বাবুলালের কাছ থেকে। যেই ঘন্টিতে হাত দেবে অমনি বাবুলাল চাপরাসীকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে 'হজৌর'। আজব দুনিয়াটা। বড়র উপরও বড় আছে। রায় বাহাদুরের উপরেও আছে দারোগা, কলস্টর…ঢোঁড়াইয়ের বাপের কথা হঠাৎ বুধনীর মনে পড়ে—সেই ঢোঁড়াই যেবার হয়-হয় সেইবার কলস্টর দেখে এসেছিল। বাবুলালের মতো এত 'ইজ্জৎদার আদমী'৩ ছিল না বটে, কিন্তু ছিল বড় ভালমানুষ।…এক রত্তি ঢোঁড়াইকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সুর করে গাইত—

১ স্থানীয় ভাষায় 'আদমী' মানে স্ত্রী। মানুষ অর্থেও প্রচলিত।

২ অধিকার। ৩ সম্মানিত লোক।

'বকড়হাট্টা ; বরদ্ বাট্টা ; সো যা পাঠ্ঠা'··· । সে আর আজ ক'দিনের কথা। তবু সে সব ঝাপসা মনে পড়ার দাগগুলো পর্যন্ত একরকম মুছে গিয়াছে। অনুতাপ নয়, তবুও কোথায় যেন একটু কী খচ্ খচ্ করে বেঁধে···।

খাবারের লোভে দু-একজন করে দুখিয়ার বন্ধুরা এসে জড়ো হয়। সকলেই এক একটা তালের আঁটি চুষছে। কার তালের দাড়ি কত বড় তাই নিয়ে ঝগড়া জমে উঠেছে, কিন্তু নজর সকলেরই রয়েছে দুখিয়ার মা'র দিকে।

'নে দুখিয়া। নে নে তোরা সকলে আয় ; একটু একটু নে। যা, এখন ভাগ জলদি!'

এক দন্ড নিশ্চিন্দি নেই এদের জবালায়। পাড়াসুদ্ধ শুয়ারের পালের মতো ছেলে-পিলেকে দুখিয়ার মা তালের মিঠাই খাওয়াল। কিন্তু ঢোঁড়াই! ঢোঁড়াইয়ের কথা তার আজ বড্ড বেশি করে মনে পড়ছে অনেক দিনের পর। বহুদিন তার খোঁজখবরও করা হয়নি। পথে ঘাটে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়, ছোঁড়া পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। যাক ছোড়া ভাল থাকলেই হল। গোঁসাইথানের মাটির কল্যাণে আর বাওয়ার আশীর্বাদে ছেলেটা বেঁচে বর্তে থাকলেই হল। সে আর ও ছেলের কাছ থেকে কী চায়।

অনেকদিন ছেলেটাকে কিছু খাওয়ানো হয়নি। বাড়িতে ডেকে পাঠালেও আসবে কি না কে জানে। দুখিয়ার মা একখান কচুপাতায় করে খানকয়েক তালের বরফি নিয়ে গোঁসাইথানে যাবে বলে বেরোয়।···সে ছোঁড়া কি আর এখন গোঁসাইথানে আছে। হয়তো মুখপোড়া ধাঙড় ছেলেগুলোর সঙ্গে 'পাক্কীতে', বিসারিয়া থেকে যে নতুন 'লৌরী'১ খুলছে, তাই দেখতে গিয়েছে। 'লৌরী' আসবার সময় ওরা রাস্তার ধুলো উড়িয়ে, না হয় রাস্তার উপর গাছের ডাল ফেলে পালিয়ে আসে। একদিন ধরবে তালে মহলদার 'রোড সরকার' তো মজা টের পাইয়ে দেবে।···ঢোঁড়াই এখন কত বড় হয়ে উঠেছে। কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য।···ওই তাল মহলদার, ডিস্টিবোর্ডের রোড সরকার, যার নাম করে বাবুলাল 'পক্করী' পাকা অংশটির উপর দিয়ে গরুর গাড়ি যেতে দেখলে, গাড়োয়ানের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে ; তারপর দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেয়,—সেই তালে মহলদার একদিন ঢোঁড়াইকে দেখে ধাঙড়দের ছেলে বলে ভেবেছিল, ভুল ধরিয়ে দিলে বলেছিল যে, এমন 'পাঠ্ঠা যোয়ান' তো তাৎমার ছেলে হয় না। লোকটা অন্ধ না-কি! ঢোঁড়াইয়ের রঙ ধাঙড়দের মতো কালো নাকি? সামুয়রের মতো ফর্সা না হলেও আখার মতো কালোও তো না। মকসুদনবাবুর রঙের সঙ্গে ওর রঙের মিল থাকতেও পারে ; বলা যায় না···ঐ তো বাগভেরেন্ডা গাছের ফাঁক দিয়ে বৌকা বাওয়ার কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে গোঁসাইথানে।···আ মর, মহতোর ছাগল কিনা, তাই সাধারণ লোক দেখে আর পথ থেকে সরবার নাম নেই! হট্! হট্!···

'আরে কোথায় চললি দুখিয়ার মা?'

'এই একটু ঐদিক' কাজ আছে।'···এতদিনের অনভ্যাসের পর ঢোঁড়াইয়ের কাছে যাচ্ছি বলতে সংকোচ লাগে লোকের কাছে।···আজ আর কেউ তাকে ঢোঁড়াইয়ের মা বলে ডাকে না। অথচ ঢোঁড়াই হচ্ছে প্রথম ছেলে ;—তার দাবিই সবার উপর। সেই প্রথম ছেলে হওয়ার আগের ভয়, আনন্দ, বুড়ো নুনুলাল মহতোর বৌয়ের আদর যত্ন বকুনি, কত নতুন অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা মেশানো—ঢোঁড়াইয়ের পৃথিবীতে আসার সঙ্গে।

১ লরী—মোটরবাস।

সব সেই পুরনো অস্পষ্ট স্মৃতিগুলোর হালকা ছোঁয়াচ লাগছে মনে।…না ঐ তো দেখা যাচ্ছে ঢোঁড়াইকে, বাওয়ার লোটা মাজছে। আজ ভাগ্যি ভাল। বাওয়া আজ তাকে দুপুরে বেরুতে দেয়নি দেখছি।…

কিন্তু এ ভিক্ষে করে আর কতকাল চলবে?…

'এই বাওয়ার 'দর্শন' করতে এলাম'—বলে দুখিয়ার মা গোঁসাইথানের মাটির বেদীটিকে প্রণাম করে। তারপর বাওয়াকে বলে, 'পরণাম'। বাওয়া আগেই আড়-চোখে তার হাতের কচুপাতার মোড়কটা দেখে নিয়েছে। দুখিয়ার মা যে ঢোঁড়ইয়ের কাছে এসেছে সে কথা প্রকাশ করতে চায় না। ঢোঁড়ইও তার দিকে না তাকিয়ে এক-মনে নিজের কাজ করে যায়। লোটা মাজে, বাওয়ার ত্রিশূল, চিমটে ছাই দিয়ে ঘসে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখে। তার কাজের আর শেষ নেই। একবার যখন ধরা পড়েছে, এখন গাছতলাটা ঝাঁট দেওয়ার আগে আর বাওয়ার হাত থেকে নিস্তার নেই। তারপর আবার কোন কাজ বাওয়ার মনে পড়বে ঠিক নেই। দুখিয়ার মা-টা আবার এই অসময়ে কোথা থেকে এসে জমিয়ে বসল! কী গল্পই করতে পারে এই মেয়ে-জাতটা। ধনুয়া মহতোর একদিনের কথা ঢোঁড়াইয়ের বেশ মনে আছে। ধনুয়া তার স্ত্রীকে বকছিল, 'কাজের মধ্যে তো ঘাস ছেলা আর উনুনের পাশে বসে লবড় লুবড় বকা।১ চাবুকের উপর রাখতে পারলে তবে তোদের জাতের চাল বেগড়োয় না।' মহতোগিন্নি গিয়েছিল মহতোর দিকে এগিয়ে—'রামজী মোচটা দিয়েছেন বলে যা ইচ্ছে তাই বলে যাবে নাকি? চাবুক! মরদ চাবুক দেখাতে এসেছ!…এসো না দেখি!' …ধনুয়া মহতোর সেইদিনের কথা ঢোঁড়াইয়ের খুব মনে ধরেছিল। মেয়েজাতটাই এই রকম! কী রকম তা সে এখনও ঠিক বুঝতে পারে না, তবে খারাপ নিশ্চয়ই। আর বাবুলালের পরিবারের উপর সব তাৎমারাই বিরক্ত। দুখিয়ার মা'র নাকি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না—চাপরাসীর বৌ বলে। সে ঘাস বিক্রি করে না, কোনো রোজগার করে না, পারতপক্ষে বাবুলাল তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না; বাবু ভাইয়াদের বাড়ির মেয়েদের মতো সে তার নিজের স্ত্রীকে রাখতে চায়। যখন তখন দুখিয়ার মাকে চটে মারতে যায়—তোর তাৎমানী থাকাই ভাল—তোর আবার চাপ-রাসীর স্ত্রী হওয়ার শখ কেন। মাথা কাটা যায় নাকি তার, দুখিয়ার মা'র বেহায়াপনায়…

ঢোঁড়াই গাছতলা ঝাঁট দেওয়া আরম্ভ করে। রোজ ঝাঁট দেওয়া হয় তবু এত ময়লা কোথা থেকে যে আসে সে ভেবে পায় না। পাড়ার যত ছাগলের আড্ডা, বর্ষাকালে এই গাছতলায়!

চেরমেন সাহেবের ডেরাইভারের সামনে বাবুলাল চাপরাসী চুপচাপ চোরের মতো থাকে, আর বাবুলালের স্ত্রী, গোঁসাইথানে প্রণাম করতে এসেও চুপ করে থাকতে পারে না। গোঁসাই উপর থেকে সব দেখছেন।…হঠাৎ দুখিয়ার মা'র গলা কানে আসে…

…'আপনারা সাধুসন্ন্যাসী মানুষ; আপনারা ভিক্ষে করেন সে এক কথা; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও কি সারা জীবন ভিক্ষে করে জীবন কাটাবে? ও ছেলে কি কোনোদিন আপনার চেলা হতে পারবে? কিরিস্তান ধাঙড়দের সঙ্গে আলাপ, না আছে কথার 'ঢং'২, না আছে মনের ঠিকানা, উনি আবার হবেন সাধুবাবা। অন্য ঘরের ছেলে হলে এতদিন একটা রোজগারের 'ধান্ধা' দেখে নিত। বয়স তো কম হল

---

১ বাজে বকা।

২ শ্রী; আদবকায়দা।

মা। ওর বয়সী ঘোতাই, গুদর তো ঘরামির কাজে বেরুনো আরম্ভ করেছে। আপনি বাওয়া ছেলেটার মাথা খেলেন…'

ঢোঁড়াইয়ের কান খাড়া হয়ে উঠেছে। বাওয়ার মুখের উপর এতবড় কথা!…

'বলেন তো চাপরাসী সাহেবকে বলে ঢোঁড়াইকে ডিস্টিবোডের পাংখা টানার কাজে বহাল করিয়ে দিতে পারি! বছরে চারমাস কাজ। আট টাকা করে পাবে। তার মধ্যে থেকে দু টাকা করে বহালীর১ জন্য চাপরাসী সাহেবকে দিতে হবে; বাকি টাকা তোমার হাতে এনে দেবে। বছরের মধ্যে বাকি আট মাস, কেরানীবাবুর বাড়ি কাজ করবে। তাঁর ছেলেমেয়ে রাখবে। ওজর না থাকে তো বাওয়া বলুন! কত লোক এ নিয়ে চাপরাসী সাহেবের কাছে ঘোরাঘুরি করচে।'…

ঢোঁড়াই লক্ষ্য করে যে বাওয়ার মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই আর বাওয়ার চোখাচোখি হয়ে যায়। দুজনেরই স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। প্রস্তাবটি কারও মনঃপূত নয়। বাওয়া ভাবে ঢোঁড়াই করতে যাবে চাকরি! পরের ছেলেকে আপন করে নিলাম কিসের জন্য? ওর জন্য এত কষ্ট সইলাম কেন?

আর ঢোঁড়াই ভাবে শেষকালে বাবুলালের খোসামোদ করে দিন কাটাতে হবে; তার দয়ার রোজগার! এও রামজী কপালে লিখেছিলেন? বাওয়ার সেবা করে, বেশ তো তার দিন কেটে যাচ্ছে! দুখিয়রা মা'টার 'বুকের উপর মুগের দানা রগড়াচ্চে'২ কে এর জন্যে। সকলেই তাকে ভিক্ষের কথা নিয়ে খোঁচা দেয়। বাবুলালের পরিবারেরও এই কথা নিয়ে দুর্ভাবনার শেষ নেই। অন্তরের থেকে সকলেই তাদের ভিখিরি ছাড়া আর অন্য কিছু মনে করে না।

বাওয়া ভাবে, দরদ! এতদিনে মায়ের দরদ উছলে উঠল!

সে আংটা লাগানো ত্রিশূলটা দুখিয়ার মা'র সম্মুখে মাটিতে তিনবার ঠোকে; তারপর তিনবার মাথা নাড়ে—না, না, না।

অপমানে দুখিয়ার মা'র চোখে জল এসে যায়। সে কচুপাতায় মোড়া বরফি ফেলে উঠে পড়ে। কার জন্যে এত ভেবে মরি!

কার জন্য তালের বরফিগুলো এনেছিল, সে কথা আর বলা হয় না।

সে চলে গেলে বাওয়া একটু অপ্রস্তুত হয়ে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়। ঢোঁড়াই হঠাৎ কচুপাতার ঠোঙাটি তুলে নিয়ে দূরে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঝোপের নিচের ভাদ্রের ভরা নালায়, একটা ব্যাং লাফিয়ে পড়ে।

'ভিখ দিতে এসেছেন, ভিখ! তোর দেওয়া ভিখ যে খায়, তার বাপের ঠিক নেই। ডিস্টিবোডের পয়সা দেখাতে এসেছেন! অমন খাবারে আমি…'

তারপর ঢোঁড়াই আর বাওয়া চুপ করে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকে! একই বেদনায় দুটো মন মিলে এক হয়ে যায়।

## ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ-ঘোষণা

পরের দিন ভোরে উঠেই ঢোঁড়াই যায় ধাঙড়টুলিতে শনিচরার কাছে। এত ভোরে তাকে দেখে শনিচরা অবাক হয়ে যায়।

'কী রে? সব ভাল তো?'

---

১ নিবুক্তি।

২ 'পাকা ধানে মই দেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত।

'ভালও, আবার মন্দও। আমি 'পাকী' মেরামতির দলে কাজ করতে চাই। আমাকে ভর্তি করে নেবে?'

শনিচরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর হো হো করে হেসে ওঠে।

'এতদিনে তাহলে তাৎমাদের বুদ্ধি খুলেছে। গয়লার ষাট বছরে, আর তাৎমার সত্তর বছরে বুদ্ধি খোলে। আরে এতোয়ারী, শুক্রা, আকলু, বিরসা, বড়কাবুদ্ধু, শোন শোন, শুনে যা খুশখবরী১। মজার খবর। ময়নার বাচ্চার চোখ ফুটেছে।'

সকলে এসে জড়ো হয়। হাসি মস্করার মধ্যে মেয়েরাও এসে যোগ দেয়।

'এতদিনে তাৎমারা 'বেলদার'২ হয়ে গেল।'

'আরে বাবা' করবি তো মজুরি। যেখানে পয়সা পাবি সেখানে কাজ করবি। তার মধ্যে আবার বাছ বিচার।'

শুক্রা বাধা দিয়ে বলে, 'তাই বলে নিজের মান ইজ্জৎ নেই। পয়সা পেলেই মেথর ডোমের কাজও করতে হবে নাকি?'

এতোয়ারী শুক্রাকে ঠাণ্ডা করে—'কোথায় মেথরের কাজ, কোথায় মাটি কাটার কাজ।'

'কালে কালে কিন্তু সকলের ফুটানি ভাঙবে। দেখ অতবড় গেরস্থ জৈশ্রী চৌধুরী, বনেদী ব্রাহ্মণ পরিবার, পাড়াসুদ্ধ লোকের সম্মুখে হাল চালিয়েছে। জাতের মাথা দ্বারভাঙ্গারাজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করেননি। একে শখের হাল চালানো ভাবিস না। দিন আসছে; চনরচুড় ঝা, একতাল 'ফুটানি ছাঁটত'৩ যে সে গরুর গাড়িতে চড়ে না। সেদিন দেখি কামিখ্যাথানের মেলায় গরুর গাড়ি থেকে নামছে। লোটাতে করে জমানো পয়সা ঘরের মেঝেতে পোঁতা থাকলে তবেই 'বিবিকে' কাজ করতে বারণ করা যায়।'

'এসব তো অনেক হল। এখন 'বেটা'৪ তুই বল, তুই যে রাস্তা মেরামতির কাজ করবি, পাড়ার মহতো নায়েবদের জিজ্ঞাসা করেছিস?'

'তারা কি আমায় খেতে দেয়? জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন? আর জিজ্ঞাসা করলে জানাই আছে যে, তারা মাটি কাটার কাজ করতে দেবে না।'

'দেখিস না পঞ্চায়েত তোর কি করে! নোখে বেলদার কবে পচ্ছিম থেকে এসে এক কুড়ি বছরের উপর এই এলাকায় আছে। তাকে কি তোর জাতভাইরা মানুষ বলে ভাবে? সে বেচারা রোজ কাজ করার সময় এই নিয়ে দুঃখু করে।'

সেই দিন থেকেই ঢোঁড়াই কোশী-শিলিগুড়ি রোডের একুশ থেকে পঁচিশ মাইলের গ্যাং-এ বহাল হয়।

সব ধাঙড়রা তাকে ঠাট্টা করে বলে যে তোকে এবার থেকে 'বাচ্চা বেলদার' বলব। শুক্রা ধাঙড় তার বাড়ির মাইজীর কাছ থেকে, মাইনের থেকে এক টাকা আগাম নেয়; তার 'সনবেটার' কোদাল কিনবার জন্য। বড়ো এতোয়ারী ধাঙড়ের দল নিয়ে বেরোয়

---

১ সুখবর।

২ বেলদার আর নুনিয়া, এই দুটো জাতই কেবল এই অঞ্চলে মাটিকাটার কাজ করে।

৩ বড়াই করত।

৪ ঢোঁড়াই শুক্রার সনবেটা অর্থাৎ ধর্মছেলে; সেইজন্যই অন্য ধাঙড়রাও তাকে ছেলে বলে।

বকরহাটার মাঠের থেকে ময়নার ডাল বাছতে,—বাচ্চা বেলদারের কোদালের বাঁটের জন্য।

বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ফিরবার সময় ঢোঁড়াইয়ের দেখা হয় ধাঙড়টুলির ডাইনীবুড়ি আকলুর মা'র সঙ্গে। সে মাটি খুঁড়ে একটা কী বার করছিল, মাটির ভিতর থেকে। ঢোঁড়াইকে দেখে হেসেই আটখান। ছালটা পোকায় খাওয়া খাওয়া গোছের, একটা প্রকাণ্ড শাঁক আলু ঢোঁড়াইয়ের হাতে দেয়। 'নে নাতি, অসময়ের জিনিস।' সবাই একে ডাইনী বলে ভয় করে। কিন্তু এর চোখে একটা অনুভূত কোমলতার আভাস দেখে. ঢোঁড়াই ভয় করবার অবকাশও পায় না সেদিন।

**মহতো নায়েব আদির মন্ত্রণা**

সেই রাতেই ধনুয়া মহতোর বাড়িতে পঞ্চায়েত বসে। অন্য সময় হত তার বাড়ির সম্মুখের মাদার গাছটার নিচে, বাঁশের মাচার পাশে; দুই একজন বিশিষ্ট দর্শক বসত মাচার উপর। এখন ভাদ্রমাসের টিপটিপুনি বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বসা যায় না। তাই সবাই বসেছে একচালাটির ভিতর। ছড়িদার আর নায়েবরা বাঁশের চাটাইয়ের উপর, আর ধনুয়া মহতো বসেছে ঘরের জিয়লের খুঁটিটিতে হেলান দিয়ে। খুঁটিটা থেকে এক গোছা পাতা বের হয়েছে; বুড়ো তাৎমাদের মত জিয়লের ডালও মরতে জানে না। মহতোর সম্মুখে একখান ঘুঁটে থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে—বাবুলালের তামাকের খরচ আজ বাঁচবে। তেতর কাশছে, বোধ হয় এইবার কথা বলবে। ঠিকই সে কথা বলে—'চাটাইটার দেখছি আর কিছু নেই।'

জবাব দেয় রতিয়া ছড়িদার, বাবুদের বাড়ি থেকে যে বাঁশের টুকরোগুলো নিয়ে আসো, সেগুলো তো পঞ্চায়েতের পাওয়ার কথা। চিরকাল তাই হয়ে এসেছে, নুনুলাল মহতোর সময়ে। সেখান থেকে আনা 'ঔজার'১ আর ঘাস দড়ি হবে. যে আনবে তার; আর বাঁশ আনলে অর্ধেক হবে পঞ্চায়েতের, এই ছিল চিরকালের নিয়ম। কেউ দিয়েছে দুবছরের মধ্যে, যে চাটাই নতুন থাকবে?'

সকলেই দোষী; কেউ আর কথাটা বাড়াতে চায় না। লাল্লু বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করে, 'কেবল টিপটিপুনি বৃষ্টি এ বছর। আরে হবি তো জোরে হ। এ জলে আর কে চালের খাপড়া বদলাবে। অথচ ব্যাঙের ডাকের কামাই নেই।'

বাসুরা বলে 'হয় একদিন তিসুর সালের২ মতো জল। এক বৃষ্টিতে সেবার মরণাধারের কাঠের পুল ডুবে গিয়েছিল।'

'বাবুভাইয়াদের সে কী দৌড়োদৌড়ি তাৎমাটুলিতে সেদিন। অমন আর কখনও দেখিনি। মহতো সেবার খুব হিম্মৎ দেখিয়েছিল বাবুভাইয়াদের কাছে।

মহতো এই প্রশংসায় খুশি হয়ে সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলে—বৃষ্টিতে যে কতদিন বাড়িতে বসে থাকি, সেটা দেখবে না, এক আনা বেশি চাইলেই চালার মাপের হিসেব দেখাবে। মৌকা পেলে বাবুভাইয়াদের কাছ থেকে চুটিয়ে নেব; ছাড়াছাড়ি নেই আমার কাছে। 'খাইতো গেঁহু, নহিতো এহুঁ'৩।

---

১ যন্ত্র, হাতিয়ার।

২ গত বছরের আগের বছর।

৩ খাই তো গম, না হলে কিছুই খাই না। ' মারি তো গন্ডার লুটি তো ভান্ডার এই অর্থে।

মহতো হুঁকোটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসে। স্ত্রীকে বলে, 'গুদরমাই ( গুদরের মা )', বাইরের শুকনো ঘাসগুলো তুলিস নি তো ? কী যে তোদের আক্কেল তা বুঝি না, যেমন মা তার তেমনি ছেলে। আবার খাটাসের মতো তাকাচ্ছিস কি ? ওগুলো যে পচে গলে যাবে। হরনন্দন মোক্তারের বাড়িতে কাজ করার দিন এনেছিলাম, আজও সেই পড়ে রয়েছে। কত ধানে কত চাল তা তো আর বুঝিস না। আমাদের কাজ শেষ হওয়ার সময় তারা লোক রেখে দেয় পাহারায়। সেইগুলোকে ভিজাচ্ছিস। ও ঘাসে উই লাগতে কদিন। গতবার ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে কাজ করবার সময় এনেছিলাম 'উপর করে'১ এই এত বড় দা, তিনপোয়া ওজন হবে, সেটাকেও হারিয়েছে ওই মায়ে বেটায় মিলে। করে নে ফুটানি যে কটা দিন এই মহতো বেঁচে আছে। পরমাৎমা কী পদার্থ দিয়ে যে আজকালকার ছেলেদের গড়েছে। এই দ্যাখো না ঐ ঢোঁড়াইটার কাণ্ড!

পয়স পালি অহি অতি অনুরাগা।
হোহি' নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা ॥২

'উনি আবার গলায় তুলসীর মালা নিয়ে সাধুবাবাজী হবেন।'

সকলে এই বিষয়টারই প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ থেকে। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই।

'বাওয়ার ছেলে হয়েছেন তো মাথা কিনেছেন।'

'পঞ্চ-এর কথার খেলাপ গিয়েছে অতটুকুনি ছোঁড়া! হারামজাদা!'

আজকের 'পঞ্চায়তি' থেকে মহতো নায়েব ছড়িদার কারও এক পয়সা রোজগার নেই৩। কেবল জাতের ভালর জন্য, আর দেশের মঙ্গলের জন্য, আজকের পঞ্চায়েতের বৈঠক করা হচ্ছে। ঢোঁড়াইকে ডাকা হয়েছিল 'পঞ্চায়তিতে'। ঢোঁড়াই আসে নি এখনও।

তাৎমাটুলিতে 'পঞ্চায়তি' নিত্যি লেগেই আছে—এর বৌ ওকে দেওয়া, কোন পক্ষের কোন ছেলেটা মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখাগ্নি করে নিয়েছে, মৃতের বাড়ির বেড়া আর বাঁশগুলো পাবে বলে; কে জোর করে স্বামীর সাক্ষাতে তার স্ত্রীর কপালে সিঁদুর লাগিয়ে তাকে স্ত্রী বলে দাবি করছে। আরও কত রকমের দৈনন্দিন জীবনের খুচরো মামলা।

কিন্তু এতটা বয়স হল, 'পঞ্চ'রা কখনও দেখেনি যে, জাতের 'পঞ্চায়তি'তে কাউকে ডেকে পাঠিয়েছে, আর আসেনি। কথায় বলে 'পঞ্চ' যদি সাপকে ডাকে তো সাপ আসবে, বাঘকে ডাকে বাঘ আসবে, মানুষ তো কোন ছার। এত বুকের পাটা ঐ একরত্তি ছেলেটার। এ অপমান 'পঞ্চ'দের পক্ষে অসহ্য।

---

১ যোগাড় করে।

২ অতি আদরের সঙ্গে পায়স খাইয়ে পালন করলেও কাক কি কখনও নিরামিষ আহারী হয়। —তুলসীদাস।

৩ সাধারণত কেউ পঞ্চায়েতের কাছে নালিশ করলে তাকে দু টাকা ছ আনা জমা দিতে হয়। এর ছয় আনা ছড়িদারদের প্রাপ্য, এক টাকা মহতোর, আর এক টাকা বারোয়ারী ফাণ্ডের। এই ছিল নিয়ম। কিন্তু আজকাল এ নিয়ম চলে না। নায়েব মহতো ছড়িদার এরা মিলে সব টাকাই নিজেরা আত্মসাৎ করে। এর জন্য নিত্য নতুন মিথ্যা মোকদ্দমাও তারা করে।

সব আসামীই তাৎমাটুলির 'পঞ্চায়িতি'তে[১] আসতে ভয় পায়। শাস্তির প্রথম দফা পঞ্চায়েতের বৈঠকের মধ্যেই হয়ে যায়। মোটামুটি 'ফয়সালা' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামীর উপর চড়চাপড় পড়তে আরম্ভ করে। এগুলো ছিল আসল শাস্তির ফাউ। এই উপরি পাওনার পর অন্তিম রায় বেরোয় ;—জরিমানা, গাধার পিঠে চড়ানো, ভোজ—খেলা নয় 'ভাতকা ভোজ'[২] আরও কত কী। ছোটবেলা থেকে ঢোঁড়াই এ সব কত দেখেছে।···পুরণ তাৎমাকে সেবার অর্ধেক গোঁফ কামিয়ে একটা বড় রামছাগলের পিঠে বসানো হয়। ঢোঁড়াইয়ের বেশ মনে আছে, সে গুদর, আরও সব ছেলেরা কালকাসুন্দি আর ভাঁট গাছের ছড়ি নিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক! দু! তিন! সকলে রামছাগলটির উপর ছড়ি চালাচ্ছে, সপাসপ। বাবুলাল বলল, থাম তোরা একটু। চেরমেন সাহেবের হাওয়া গাড়ির 'পিট্রোল'[৩] সে একটা শিশিতে ভরে রাখে, ব্যথায় মালিশ করার জন্য। সেই শিশি থেকে একটু পেট্রল দেয় রামছাগলটার পিঠের কাছে। ব্যা ব্যা করে পরিত্রাহি চিৎকার করছে রামছাগলটা। সেটা অনবরত ঘুরপাক খাওয়ার চেষ্টা করে। এমন অদ্ভুত কান্ড! · রামছাগলটা শেষকালে ছটফট করতে করতে শুয়ে পড়ে। সকলে মিলে জোর করে পুরণ তাৎমাকে সেটার উপর চেপে ধরে রাখবে; নে নে পুরণা, শখ মিটিয়ে, শুঁকে নে কেওড়ার গন্ধ। সে কথা ঢোঁড়াই কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

মহতো, নায়েব, ছড়িদার সকলেরই হাত নিশপিশ করছে—ঢোঁড়াইটাকে একবার হাতের কাছে পেলে হয়।

ধনুয়া মহতো হুঁকোটায় কয়েকটা টান মেরে, তার উপরের নালটা মুছে নাল্লুর হাতে দেয়; তার মনের মতো ধোঁয়া এখনও বের হচ্ছে না।

'নে নাল্লু তামাকটা টেনে ভাল করে ধরিয়ে দে! এখনও তোরা জোয়ান মরদ আছিস, বুকের জোর আছে; আমাদের মতো বুড়ো হয়ে যাসনি। তোদের মতো বয়সে আমাদের এককোশের মধ্যে দিয়ে কোনো মেয়েছেলে যেতে সাহস করত না।'

মহতোর রসিকতায় সকলে হাসে। মহতোর বয়সকালের অনেক কান্ড সকলের মনে আছে। মহতোগিন্নী আর তার পঙ্গু মেয়ে ফুলঝুরিয়া বাইরে আড়ি পেতে ছিল। মা গর্বপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—এমন এমন কথা বলবে যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে।

ধনুয়া মহতোর উচ্চহাসি ব্যাঙের একঘেয়ে ডাকের মধ্যেও কানে বাজে। হঠাৎ সে উদ্‌গত হাসিটা ঢক করে গিলে ফেলে গম্ভীর আর সোজা হয়ে বসে। মহতোর পদের একটা মর্যাদা আছে তো। সকলেই বোঝে যে এইবার আসল কাজের কথা আরম্ভ হবে। বৈঠকের আবহাওয়া থমথমে হয়ে ওঠে।

ছেলে বাপের হয় না; ছেলে হয় জাতের। তারপর ছেলের উপর দাবি হয় টোলার। এই জিয়লের ডালের খুঁটি লেগে গিয়েছে তো; এ এখন সমস্ত চালাটাকে সুদ্ধ ঠেলে নিয়ে উঁচুতে উঠবে। সেই রকমই দ্যাখো, এই বাবুলাল তাৎমা জাতটার

---

১ স্থানীয় ভাষায় কোনো বিষয় পঞ্চায়েতে দেওয়া হয় না, 'পঞ্চায়িতি'তে দেওয়া হয়।

২ ভাতের ভোজ: অন্য শুকনো জিনিসের ভোজে খরচ কম পড়ে।

৩ পেট্রল।

ইজ্জত কত বাড়িয়েছে। হৈজার ডাক্তার১ যখন তাৎমাটুলির 'ফৌজী কুয়ো'তে লাল রঙ২ দিতে আসে, তখন আমার বুক, সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ে দুরদুর করে। বাবুলাল দেখি মোচে তা দিতে দিতে তার সঙ্গে কথা বলে; তবে না ও তাৎমা জাতটাকে একা এতটা এগিয়ে দিতে পেরেছে।'

বাবুলাল. আত্মপ্রশংসা নিজের কানে শোনেনি একন একটা ভাব দেখায়।

'আর একদিক দ্যাখো, 'সালা বদমাইসির জড়'৩ এই ঢোঁড়াই।'

সকলে ঢোঁড়াইয়ের নামে সোজা হয়ে বসে। নাল্লু শব্দ করে থুথু ফেলে; বাসুয়া চিক্ করে একটা শব্দ করে। বাবুলাল বলে. ছি ছি ছি! তারপর গোঁফের একটা অবাধ্য চুলকে দাঁত দিয়ে কাটবার চেষ্টা করে।

'সেই কুত্তার বাচ্চাটা কি না মাটি কাটার কাজ করবে, যা আমাদের সাত পুরুষে কেউ কোনোদিন করেনি! তাৎমা জাতের মুখে কালি দিল! এর থেকে মুসলমানের এঁটো খাওয়া ভাল ছিল। আর লোকসমাজে মুখ দেখানোর তো কিছু রাখল না তাৎমাদের। এখানে এল না পর্যন্ত সে নবাবপুত্তুর। কী ছেলেই মানুষ করেছে বৌকাবাওয়া! বাওয়ার নাই দিয়ে মাথায় চড়ানোর জন্যেই তো ও এত বাড় বেড়েছে। দ্যাখো দেখি কান্ড! নোখে বেলদার, আর শনিচরা ধাঙড় তাৎমার সঙ্গে সমান হয়ে গেল। আরে, মাটি কেটেই যদি পয়সা রোজগার করতে হয়, তাহলে আমরা এতদিন ফুলে 'ভাতি' (হাপর) হয়ে যেতাম। আজ এই তিনকুড়ি বছর থেকে দেখছি এই 'পাক্কী' মেরামতের জন্য মাটি কাটার লোক, কত দূর দূরান্ত থেকে আসে। ধনুয়া মহতো আঙুল উঠোলে এখনই তিনশ তাৎমা রাস্তা মেরামতির কাজে দিতে পারে। বাপ ঠাকুরদার নাম হাসালি। এই চোখের পর্দাটুকুর জন্যেই তো ধাঙড়দের পোয়া-বারো। রাতদিন পচই খেয়েও দুবেলা ভাত ডালের উপর আবার তরকারি খায়; আর আমাদের বরাতে মকাই মারুয়ার দানাও জোটে না। একখান দা কিনতে হলে অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছ থেকে দু টাকা ধার করতে হয়, দু আনা করে রবিবারে তাকে সুদ দেব এই কড়ারে। এই দ্যাখো না আমার দাখানা। এই আঙুলের মতো পাতলা হয়ে গিয়েছে, ধার দেওয়ার জায়গা নেই। নারকেলের দড়িটা কাটা যায় না এ দিয়ে। পয়সা না থাক একটা ইজ্জৎ প্রতিষ্ঠা আছে। একটা ছোঁড়ার বদ খেয়ালের জন্য আমাদের সেটাও খোয়াতে হবে?'

পঞ্চরা সকলে বেশ তেতে উঠেছে, এতক্ষণে।

'বন্ধ কর শালার হুক্কা পানি'৪।

'তাড়াও ওটাকে গোঁসাইথান থেকে'।

'বাওয়াটাই যত নষ্টের গোড়া'।

'জাকে নখ অর জটা বিশালা'।

'সেই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা।'৫

---

১ হৈজার ডাক্তার, শব্দার্থ কলেরা ডাক্তার, আসলে তারা অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যানিটারী ইন্সপেক্টর।

২ পারমাঙ্গ নেট অব পটাশ।

৩ যত নষ্টের গোড়া।

৪ একঘরে কর।

৫ যার নখ আর জটা বড়, সেই কলিকালে প্রসিদ্ধ তপস্বী (তুলসীদাস)

'সন্টিশ দাও, বাওয়াকে।'

'চল সকলে। থানে। ছোঁড়ার ছাল ছিঁড়ে আজ হাড়মাস আলাদা করব।'

চল, চল।

বাইরে তখন বেশ জোরে বৃষ্টি এসেছে।

'পড়তে দে জল,'—বলে হেঁপো রুগী তেতর বের হয়ে পড়ে ঘর থেকে। আর কারও বৃষ্টির কথা খেয়ালই নেই।

'লাঠি নিয়েছিস তো?'

## দুখিয়ার মার বিলাপ ও প্রার্থনা

আগে আগে চলেছে বড়রা—মহতো, নায়েব চারজন, আর ছড়িদার। এর পিছনে আছে ছেলে বুড়ো সকলে। এরা সব এতক্ষণ ছিল কোথায়। বোধ হয় মহতোর বাড়ির আশেপাশে সবাই জড়ো হয়েছিল সেই জলবৃষ্টির মধ্যেও আজকের পঞ্চায়তির জমজমাট 'তামাসা' দেখবার জন্য। জল কাদা ব্যাঙ কাঁটা মাড়িয়ে, অধোলঙ্গ বীরের দল নৈশ অভিযানে বেরিয়েছে। তাদের জাত্যাভিমানে আঘাত লেগেছে। অন্ধকারে সরু পথের উপর আন্দাজে পা ফেলে চলছে সকলে; পায়ের নিচের চটকানো কেঁচোগুলো থেকে আলোর আভাস ফুটে বেরুচ্ছে; গুগলি শামুক গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে খড়মড় করে। ক্ষ্যাপা শেয়ালের মতো তারা হন্যে হয়ে ছুটেছে; কোনো কান্ডাকান্ড জ্ঞান নেই তাদের এখন,—যেমন করে হোক তাদের জাতের এ অপমানের একটা প্রতিকার তারা করবে।

পাড়ায় মেয়েরাও একে একে ধনুয়া মহতোর সদ্য খালি করা একচালাটিতে এসে জড়ো হয়। বাইরে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তবু সকলে ভিজে কাপড় নিঙড়োতে নিঙড়োতে বাইরে কী যেন দেখতে চেষ্টা করে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চায়। মুখে কারও ভয় ডর মায়ামমতার ছায়াও নেই; আছে কেবল অভিযানের নিশ্চিত সাফল্যের জন্য উল্লাস, আর কয়েকটা অনিশ্চিত মজার খবরের জন্য কৌতূহল। ঐ একরত্তি ছোঁড়ার এই কান্ড! অসীম উৎসাহের সঙ্গে গুদরের মা আজকের পঞ্চায়তের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী, অন্য সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কুপীর আলোয় তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কে তার কথা শুনছে? তাদের মধ্যে এত উত্তেজনা বোধ হয় এক কেবল ধাঙড়টুলিতে আগুন লাগার সময় ছাড়া আর কখনও হয়নি। বাসুয়া, নাল্লু, তেতর এই তিন নায়েবের স্ত্রীরাও মহতোগিন্নীর চেয়ে গৌরবের অংশীদার হিসাবে কম বলে মনে করে না নিজেদের। তারাও সমস্বরে চিৎকার করছে। পাষন্ডদলনে বীরেরা বেরিয়েছেন, বীরজায়ারা যাত্রার আগে কপালে জয়তিলক কেটে দিতে পারেননি; সেইটা পুষিয়ে নিচ্ছেন চেঁচামেচি গালাগালির মধ্যে দিয়ে।

কেবল দুখিয়ার মা এদের মধ্যে নেই। সে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। দুখিয়াটা চাটাইয়ের উপর একটা কাঁচ বাতাবি লেবু নিয়ে খেলতে খেলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ রান্নাবাড়ি করার মতো মনের অবস্থা দুখিয়ার মা'র নেই। সন্ধ্যায় বাবুলাল বাড়ি থেকে বেরুবার পর থেকেই, তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে! সে কান পেতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল—যদি কোনো চেঁচামেচি শোনা যায়; পঞ্চায়তি কখনও বিনা হট্টগোলে শেষ হয় না। কেন মরতে গিয়েছিল সে কাল তালের বরফি নিয়ে ছোঁড়াটার জন্য। সেই থেকেই তো এত কান্ড! কাল গোঁসাইথানে না গেলে আজ

হয়তো ছেলেটা এ কাণ্ড করত না। চিরকাল বদরাগী ঢোঁড়াইটা—সেই যখন কোলে তখন থেকেই; কিন্তু রাগেরও তো একটা সীমা আছে! বলতে গেলাম ভাল কথা, বাওয়া আর ঢোঁড়াই দুজনেই মানে করে নিল উল্টো। মহতো নায়েবরা, বিশেষ করে চাপরাসী সাহেব, আজ আর ঐ একরত্তি ছেলেটাকে আস্ত রাখবে না। দেবে হাড়গোড় ভেঙে। চাপরাসী সাহেব কোনো দিন ছেলেটাকে দেখতে পারে না।—পঞ্চায়তির চেঁচামেচি মহতোর বাড়ি থেকে এতদূর পেঁছোয় না, কেবল বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দ শোনা যায়।

টপ্ টপ্ করে চালের ছাঁচতলা থেকে জল পড়ছে তার সম্মুখে। জলের ফোঁটা পড়েই একটা একটা টুপির মতো হয়ে যাচ্ছে। একটা নেপালী 'ফৌজ' চাপরাসী সাহেবকে একটা টুপি দিয়েছিল। সে তার পেন্সনের টাকা তুলতে পারছিল না সরকারী অফিস থেকে। বাবুলাল টাকায় চার আনা করে নিয়ে টাকাটা তুলে দিতে সাহায্য করে। তাই সে বাবুলালকে দিয়েছিল পুরনো টুপিটা। দুখিয়ার মা আবার একদিন সেই টুপির মধ্যে বাবুলালের জন্যে কাঁঠাল ছাড়িয়ে রেখেছিল। কী মারই না মেরেছিল সেদিন বাবুলাল দুখিয়ার মাকে। আবার চাপরাসীর বৌ হতে শখ যায়; থাক তুই তাৎমানী।...

বাবুলালের উপর বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে ওঠে। ঢোঁড়াইয়ের কথা মনে করে, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নিচে জলের ফোঁটা পড়ে টুপি হচ্ছে কি না, সেদিকে আর খেয়াল থাকে না। খেয়াল থাকলেও ঝাপসা চোখে তখন দেখতে পেত না।

ঐ! এইবার একটা হট্টগোল শোনা যাচ্ছে! তারা বোধ হয় পঞ্চায়তিতে ঢোঁড়াইকে মারছে! রামজী! গোঁসাইজী, তোমার থানের ধুলোবালি মেখে ছেলেটা এত বড় হয়েছে। দোষ করে ফেলেছে বলে তাকে পায়ে ঠেলো না···ছোঁড়াটা হয়তো এখন চিৎকার করে কাঁদছে।···না কাঁদবে কেন? ঢোঁড়াইকে, তো কেউ কোনো দিন কাঁদতে দেখেনি।···হট্টগোল যেন দূরে সরে যাচ্ছে, বোধ হয় গোঁসাইথানের দিকে। এ আবার 'পঞ্চ'রা কি ফয়সালা করল? বাওয়াকে আবার কিছু করবে না তো? হয়তো ঢোঁড়াইকে এত মেরেছে যে তার চলবার ফিরবার ক্ষমতা নেই, নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে; তাই বোধ হয় সকলে মিলে ধরাধরি করে তাকে বৌকাবাওয়ার কাছে পেঁছুতে যাচ্ছে।

চেঁচামেচির আওয়াজ বাড়তে থাকে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই—না হলে হয়তো কথাবার্তা কিছুটা শোনা যেত। ঝাঁপের সম্মুখে কুপির আলো পড়ে বৃষ্টির ধারা সাদাটে রঙের দেখাচ্ছিল,—চোখের জলে তাও ঝাপসা হয়ে গেল।···মাইয়া গে, তোর চুলে বাওয়ার জটার মতো গন্ধ নেই কেন?···দূরে থেকে আপিস ফেরত বাবুলালকে দেখে, ধুলোকাদা মাখা ছেলেটা রাংচিতের বেড়ার মধ্যে দিয়ে পালাচ্ছে চোরের মতো।···

হঠাৎ পায়ের শব্দ হয়। ছপ্ ছপ্ কাদার মধ্যে দিয়ে কে যেন এদিকে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বাবুলাল এসে ঘরে ঢোকে। সে যেন ধাক্কা দিয়ে দুখিয়ার মাকে দোরগোড়া থেকে সরিয়ে দেয়। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জলের স্রোত বইছে। উনুনের পাড় থেকে কুপিটা উঠিয়ে, সে ঘরের কোণার দিকে এগিয়ে যায়। আর একটু হইলে ঘুমন্ত দুখিয়াকে মাড়িয়ে ফেলেছিল আর কী! সবুজ আর গোলাপী রঙে রাঙানো বেনা-ঘাসের কাঠাটির ভিতর থেকে বাবুলাল টেনে বের করে পেট্রোলের শিশিটা। যত্ন করে তুলে রাখা কাজললতাটা কাঠা থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। বাইরের দমকা হাওয়ার

মতো বাবুলাল আবার বেরিয়ে পড়ে জলের মধ্যে। দুখিয়ার মা সশঙ্ক জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে একবার শিশিটির দিকে একবার বাবুলালের মুখের দিকে তাকায়। দোর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বাবুলাল বলে যায় 'শালা থানে নেই'…।

দুখিয়ার মা'র মনে হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তোমার পায়ের ধুলোর ইজ্জৎ রেখো, গোঁসাই। ঢোঁড়াইকে আমার, এই 'চামার'গুলোর হাত থেকে আজ বাঁচিও। বাওয়ার মতো 'ভকত' যাকে আগলে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা, তাকে এই বাবুলাল, তেতর, নাল্লু, বাসুয়া, কী করতে পারে? বিশ্বাস নেই বাবুলাল চাপরাসীকে। ও আগের জন্মের 'সুকৃতের'১ ফলে সব ক্যাটিয়ে উঠতে পারে, এ বিশ্বাস দুখিয়ার মা'র আছে। তার উপর 'পঞ্চ্'-এর রায়, দশের ফয়সলা। তার 'তাকৎ' গোঁসাই আর রামজীর তাকতের সমান। 'পীপর'২ গাছের আওতায় মানুষ হয়ে, ছেলেটা কী করে 'পঞ্চ্'-এর কথার খেলাপ যেতে পারল। ওর ঘাড়ে এখন শয়তান সওয়ার হয়েছে। নিশ্চয়ই ধাঙড়টুলির আকলুর মা, কিংবা লম্বী গোয়ারিনের মতো কোনো 'ডাইন'৩ জানা মেয়েমানুষ ওর উপর 'চক্কর'৪ দিয়েছে। তা নহলে কি কখনও কেউ এমন করতে পারে। কত পাপই না আমি করেছি, গোঁসাই তোমার কাছে! ··'পিট্রোল'-এর শিশি নিয়ে বাবুলাল আবার এখন কী করতে গেল?···

দুখিয়ার মা কিছু ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে না। ···কী একটা পোড়া গন্ধ না? ঠিকই তো!···ধোঁয়ার গন্ধ; বর্ষার ধোঁয়া উঁচুতে ওঠে না; মেঝেতে পড়া কেরোসিন তেলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতেও ভয় হয়, কী জানি আবার কী দেখব। বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঘন আঁধার ভেদ করে, থানের দিকে আকাশে উগ্র লাল আলোর ঝলক লেগেছে।

**বাওয়া ও ঢোঁড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষা**

ঢোঁড়াইকে গোঁসাইথানে না পাওয়ায় তাৎমা ফৌজের দল প্রথমটা কী করবে ভেবে পায় না।

শালা, এত রাতেও বাড়ি ফেরেনি। এই ঝড় বৃষ্টির দিনেও। শয়তানী করে নিশ্চয়ই ধাঙড়টুলিতে বসে আছে, তাৎমাদের বেইজ্জৎ করার জন্য। ঐ ধাঙড়, আর মুসলমানদের বাড়ির ভাত খাওয়াটুকুই বাকি ছিল। তা সে শখটুকুও মিটিয়ে নে। খেয়ে নিস তার সঙ্গে মুরগীর আণ্ডা। ওটাকে হাতের কাছে এখন পেলে,—যেমন ধাঙড়রা শুয়োর মারে, এই তেমনি করে…

কয়েকজন বাওয়াকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে বার করে। সে কোনো বাধা দেয় না। বাওয়ার দোষী মন, এই রকমই একটা কিছুর আশা করছিল। কিন্তু এত উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও, বাওয়াকে মারপিট করতে তাদের সাহস হয় না। তাকে কাদার মধ্যে টেনে এনে ফেলা হয়। তারপর চলে জেরা—কোথায় আছে ঢোঁড়াই, বল্। কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিস? শুক্রা ধাঙড়ের বাড়ি? নোখে বেলদারের বাড়ি? কোথায় লুকিয়ে আছে বল্? 'পাক্কী'র গাছতলায়?

বাওয়ার ঘাড় নেড়ে জবাব দেবার কথা। কিন্তু সে নির্বিকারভাবে পিট্ পিট্

---

১ পুণ্য। ২। অশত্থগাছ।
৩ ডাকিনীবিদ্যা।
৪ যাদুমন্ত্রের প্রক্রিয়াবিশেষ।

করে তাকায়; কিংবা কী ইশারা করে বলে, অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না।— আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারো না, কোন দিকে গিয়েছে? দে ঐ জটাটায় আগুন লাগিয়ে। হ্যাঁ বলেছিস ঠিক; মাথার চাঁদিতে একটু গরম লাগলেই পেটের কথা বেরুবে।

—এই যে বাবুলাল 'পিট্রোলের' শিশি আর দেশলাই নিয়ে এসেছে।

বাওয়ার ভিজে চালাটিকে জ্বালাবার পর এই পাগলের দলের আক্রোশ একটু কমে আসে। মহতো নায়েবরা বুদ্ধিমান। তারা বুঝতে পারে যে যতটা করা উচিত ছিল; তার চাইতে একটু বেশী করা হয়ে গিয়েছে। বাবুলালের ভয় হয় যে সে-ই পেট্রোলের শিশি এনেছিল। এক এক করে তারা সরে পড়ে। বাকি সকলে গোঁসাই-থানে নানা রকম গালগল্প আরম্ভ করে।

আলবৎ বটে 'পিট্রোলের' ধক। তা না হলে কি আর এ দিয়ে হাওয়া গাড়ি চলে। মাদারঘাটের বুড়ি মুদিয়াইন সেবার শীতকালে গেঁটে বাতের ব্যথায় মর মর হয়েছিল। ডেরাইভার সাহেব তাকে দিয়েছিল একটু 'পিট্রোল'। শীতে জুবুস্থবু হয়ে, পায়ে পেট্রোল ঢেলে যেই 'ধুর' এর আগুনের উপর পা তুলে ধরেছে, অমনি গিয়েছে পায়ে আগুন লেগে। চামড়া টামড়া ঝলছে একাক্কার ঃ

তুই যে আবার সেই 'শাঁখড়েল'-এর১ গল্প আরম্ভ করলি।

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবি। আমি বলছি মিছে কথা। বাসুয়া নায়েবকে জিজ্ঞেস কর, 'মুদিয়াইন'-এর কথা সত্যি কিনা।

'এই বাসুয়া!'

বাসুয়াকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সকলে তাকিয়ে দেখে যে মহতো নায়েবেরা নাই। বহুদূর থেকে হেঁপো তেতরের কাশির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তাৎমা-সুলভ ভয় ও নিজের প্রাণটা বাঁচানোর প্রয়াস সকলকে পেয়ে বসে। এক এক করে দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

প্রেতের দলের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র একজন থেকে যায়—'রতিয়া ছড়িদার'২।

বাওয়া তার সম্মুখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ছাই আর আগুনের স্তূপের মধ্যে থেকে তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে। রতিয়া বাওয়ার কাছে ঘেঁসে বসে। হাতের লাঠিটা দিয়ে খানিকটা পোড়া খড় আর ছাই সরিয়ে দেয়। নিচে থেকে আধপোড়া হাড়িকাঠটা বেরিয়ে আসে। এ কী! হাড়িকাঠ পুড়ে গিয়েছে। কৃত পাপের ভার তার বুকের উপর চেপে বসে। সকলে চলে গেলেও সে থেকে গিয়েছিল, বাওয়ার কাছে একটা প্রস্তাব আনবার জন্য; ভিক্ষের জমানো পয়সা যদি কিছু থাকে তাই দিয়ে 'পঞ্চ'-দের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা উচিত, এই সোজা কথাটা বাওয়ার মাথায় ঢুকানোর জন্য সে কাছে ঘেঁসে বসেছিল। কিন্তু হাঁড়িকাঠ পুড়ে গিয়েছে। পাপের গ্লানিতে আর রেবণগুণীর ভয়ে তার বুক দুর দুর করে। এই হাড়িকাঠের পাশেই সর্বাঙ্গে রক্তমাখা রেবণগুণীর উপর প্রতি বছর গোঁসাই ভর করেন। ভয়ে ছড়িদার ঘেমে ওঠে। বাওয়ার পা জড়িয়ে ধরতে পারলে হয়তো কিছুটা পাপের

---

১ এক শ্রেণীর পেত্নীর নাম।

২ তার কাজ পঞ্চায়েতের নোটিশ, বাদী, বিবাদী, সাক্ষী, নায়েব সকলকে জানানো, জরিমানার টাকা আদায় করা ইত্যাদি। আসলে কিন্তু সে মাতব্বরদের ঘুষের দালালী করে।

বোঝা কমত। ঝোঁকের মাথায় এ কী কাণ্ড করে বসেছে সকলে। রেবণগুণী তো সবই জানতে পারে। এই হাড়িকাঠ জ্বালানোর কথা সে নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে। এখন তার সব রাগ কার উপর পড়বে সেইটাই হল কথা···

আগুন আর ধোঁয়ায় উদভ্রান্ত পাখিগুলো অশথগাছের উপর এখনও শান্ত হতে পারে নি। অশথগাছের ঝলসানো পাতাগুলো ধোঁয়ায় কাঁপছে। এমন সময় দূরে চেঁচামেচি শোনা যায়। সাপের ভয়ে হাততালি দিতে দিতে কারা যেন আসছে।

কী হয়েছে রে? আগুন কিসের? বাওয়া কোথায়? ধাঙড়ের দল আগুন দেখে এসে পড়েছে।

ঢোঁড়াই দৌড়ে গিয়ে বাওয়ার পাশে বসে? সে সমস্ত ঘটনাটা আন্দাজ করে নিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। বাওয়ার কাদামাখা হাতখানা নিজেদের মুঠোর মধ্যে নেয়। কেউ কোনো কথা বলে না। বাওয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ঢোঁড়াই জীবনে কাঁদেনি বলেই নিজেকে সামলে নিতে পারে। সব ধাঙড়রা তাদের গোল হয়ে ঘিরে বসে। রতিয়া ছড়িদার পালাবার পথ পায় না।

শনিচরা উঠে তার দুহাত চেপে ধরেছে।

'বল কে কে ছিল? রগচটা বেড়াল রাগের জ্বালায় খুঁটি আঁচড়ায়। এ হয়েছে তাই। মুনিয়া পাখির মতো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করছিস কেন? বেশি নড়াচড়া করেছিস কি দেব ফেলে ঐ আগুনের ভিতর।'

বিরসা বলে—'পঞ্চায়তির ভোজের ফয়সালা করতে এসেছিলে নাকি বাওয়ার কাছে। দেড় টাকা পেলেই তো ভাতের ভোজ মাপ করে দেবে এখুনি।

এতোয়ারী বলে—'বাজে কথা যেতে দে। বল্ কে কে ছিল? আগুন লাগিয়েছে কে? বাওয়াকে মেরেছিস নাকি? বাওয়া তুমিই বল না।'

বাওয়া মাথা নেড়ে বলে যে, না, কেউ তাকে মারে নি।

ঢোঁড়াই বাওয়ার গায়ে হাত দেখে কোনো মারের দাগ আছে কি না। সারা গা একেবারে ছড়ে গিয়েছে। 'চামার চণ্ডালের দল।' ঢোঁড়াইয়ের চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। তারই জন্য বাওয়াকে এই জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। শনিচরা রতিয়া ছড়িদারের চুলের গোছা ধরে বলে—'সব সত্যি কথা বল। তা না হলে তোকে আজকে এইখানে আধপোড়া হাড়িকাঠে বলি দেব। এখনও বললি না। দাঁড়া তোর 'ছড়িদার গিরি ঘোচাচ্ছি।'

ছড়িদার ভয়ে ভয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলে। শনিচরা আর বিরসার রক্ত গরম হয়ে ওঠে সব শুনে। 'দাঁড়া, ধনুয়ার মহতোগিরি, আর বাবুলালের চাপরাসীগিরি বের করছি। চললাম থানায়।'

এতোয়ারী, আর শুক্রা তাদের থানায় যেতে বারণ করে। জানিস না দারোগা পুলিসের ব্যাপার। মাথা গরম করিস না, গর্ত খুঁড়ে সজারু বের করতে গিয়ে শেষকালে গোখরো সাপ বেরিয়ে যাবে। পালানোর পথ পাবি না তখন। বুড়ো হাতির কথা শোন। আমার বাবা আমাকে বলে গিয়েছিল কোনোদিন বুড়ো আঙুলের ছাপ দিস না। তার কথা মনে না রেখে সেবার কী বিপদেই পড়েছিলাম, সেই অনিরুদ্ধ মোক্তারের ব্যাপারটা মনে আছে না শুক্রা ভাই।

বিরসা বলে, 'বুড়োদের কোনো কথা চলবে না এখানে। সে সব শুনব নিজের টোলায়। চলরে শনিচরা।'

'কথা যখন রাখবি না, তখন যা ভাল বুঝিস তাই কর। বুড়োর কথা আর গুণীর

কথা না রাখ ফল ভাল হবে না, ঠোকর খাবে।'

শুক্রা সায় দেয়—'ষত অক্কেল ঘরের বেড়ার মধ্যে। পুল পার হলেই সব বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে। ঘর বৈঠে বুদ্ধ পঁয়াতস ; রাহ্ চলতে বুদ্ধ পাঁচ ; কচহরী গয়ে তো একো ন সুঝে ; যে হাকিম কহে সো সচ।'১

সকলে হেসে ওঠে।

সত্যি হলও তাই।

বিরসা আর শনিচরা যখন পাঁচ মাইল দূরের সদর থানায় পৌঁছুল তখন বেশ রাত। দারোগাসাহেব দুজনই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বহু ডাকাডাকির পর ছোট দারোগা-সাহেবের ঘুম ভাঙা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে তিনি কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করেন। —কোন 'শ্বশুর' আবার এত রাতে জ্বালাতন করতে এসেছে! কেয়া হ্যায় কুলদীপ সিং? আবার এখন এই রাতে 'আউয়ল ইত্তলায়'২ লিখতে হবে? কুলদীপ সিং বেশ করে 'সসুরা'টাকে৩ একটু পেটা তো। বেটা মিছে কথা বলতে এসেছে নিশ্চয়।

শনিচরা উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বিরসা থানার কম্পাউন্ডে ঢোকেইনি। থানা পর্যন্ত আসবার পর দারোগার নামে তার ভয় ভয় করে। শনিচরার হাজার টানাটানি সত্ত্বেও তার সাহসে কুলোয়নি। সে কম্পাউন্ডের বাইরে বসেছিল। হঠাৎ শনিচরাকে পালাতে দেখে সেও প্রানপণে দৌড়ায়—কী জানি আবার কী হল! শহরের কাঁকরভরা রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, প্রায় সেখানে গিয়ে তারা থামে। যে ঘিয়েভাজা খেকি কুকুর দুটো ডাকতে ডাকতে তাদের তাড়া করেছিল, সে দুটো আগেই থেমে গিয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সারা ঘটনার হিসাব নিকাশ করে। তারপর গাঁয়ে ফেরে।

শুক্রা আর এতোয়ারী সারা বৃত্তান্ত শুনে বিশেষ কিছু বলে না। এই রকম যে একটা কিছু হবে, তা তারা আশাই করছিল। ধাঙড়ানীরা বলে যে, যাক দারোগার হাত থেকে যে বেঁচে এসেছিস সেই ঢের।

## পুলিশের নামে ঢোঁড়াইয়ের পাপক্ষয়

এতোয়ারী পরের দিনও প্রত্যহের মতো জয়সোয়ালদের সোডা-লেমনেডের কারখানায় কাজ করতে যায়। সেখানে ম্যানেজার সাধুবাবুকে সব কথা বলে। পুলিশ সাহেবের গাড়ি, সোডা আর তার আনুষঙ্গিক পানীয়ের বোতলের জন্য জয়সোয়াল কোম্পানির দোকানে থামলে সাধুবাবু ইংরেজি মিশানো হিন্দীতে গত রাত্রের তাৎমাটুলির ঘটনাটির কথা তাঁকে বলেন। সাহেবের মাথা তখনও ঠিক ছিল ; দিনের বেলা কোনো কোনো দিন থাকত।

'তাই নাকি। আমার চোখের উপর এই ব্যাপার! চ্যাপ্যাসি, কোটি পর বড়া ডারোগাকো সলাম ডেও। আগাগোড়া পচ ধরে গিয়েছে সার্ভিসের নিচের অঙ্গগুলিতে। সব ঠিক করতে হচ্ছে।

সাহেবর রাগ দেখে কারখানার ঘরে এতোয়ারী ঘামতে থাকে।

---

১ বাড়িতে থাকলে বুদ্ধি থাকে পঁয়ত্রিশ ; পথে বেরুলে বুদ্ধি হয়ে যায় পাঁচ ; কাছারী পৌঁছে একও দেখতে পায় না, যা হাকিম বলে তাই সত্যি মনে হয়।

২ First Information Report।

৩ সাধারণ গালি।

সাধুবাবু এসে বলেন, 'এবার খাওয়াও এতোয়ারী, তোমার কাজ করে দিয়েছি।'

'আমার নাম বলেননি তো বাবু ?'

'আরে না, না, সে আর আমায় বলতে হবে না। ও কী! বুরুশ না নিয়ে, এমনিই বোতল পরিষ্কার করছিস কেন ? বুড়ো হয়ে এতয়ারি তোর কাজে ফাঁকি দেওয়া আরম্ভ হয়েছে।'

এতোয়ারী অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

সেই রাত্রেই বড় দারোগাসাহেব দুজন কনস্টেবল নিয়ে গোঁসাইথানে পৌঁছান। আলো দেখে বাওয়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। চাটাইখানা বের করে পেতে দেয়। এত বড় হাকিমকে সে কী করে খাতির দেখাবে। চাটাইটার উপর দুই চাপড় মেরে ধুলো ঝাড়বার অছিলায় দারোগাসাহেবকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দেয়।

কনস্টেবল ঢোঁড়াইকে বলে—কী রে দারোগা সাহেবের জন্য একখানা খাটিয়াও যোগাড় করতে পারিস না ?

হাঁ, কপিল রাজার জামায়ের কাছ থেকে একখান আনতে পারি।

দারোগাসাহেব বারণ করেন—না না অত 'খাতিরদারি'র১ দরকার নেই।

গাঁয়ের চৌকিদার লম্বা সেলাম করে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ সাহেবের গালাগালির কথা, দারোগাবাবুর তখনও বেশ স্পষ্ট মনে আছে—সার্ভিসবুকে কালো দাগ পড়বার ভয়; সব এই নচ্ছার চৌকিদারটা খবর দেয়নি বলে। খবর না দেওয়ার জন্যে চৌকিদারকে দুটি চড় মেরে দারোগাবাবু কাজ আরম্ভ করেন। আরম্ভ দেখেই সবাই বুঝতে পারে যে, আজ আর কারও রক্ষে নেই। চৌকিদারের মতো 'অফসর'-এরই যদি এই হালৎ হয়, তাহালে সাধারণ লোকের কপালে আজ কী-যে আছে, তা গোঁসাই-ই জানেন।

চৌকিদার যায় ধাঙড়টুলি থেকে সকলকে ডাকতে, আর কনস্টেবলরা যায় তাৎমাটুলি থেকে আসামীদের ধরে আনতে। ঢোঁড়াই এত কাছ থেকে দারোগা পুলিশকে কখনও দেখেনি। তার ভয় ভয় করে। তাই চৌকিদারের সঙ্গে সঙ্গে ধাঙড়টুলির পথ ধরে।

ধাঙড়টুলিতে হুলস্থুল পড়ে যায়। আজ আর কারও নিস্তার নেই। কাল রাতের ছোট দারোগার মারের হুমকির কথা শনিচরা আর বিরসার মনে আছে। ছোট দারোগাতেই ওই কান্ড। এ তো আবার বড়ো দারোগা। বাপরে বাপ! পালা, পালা; চল সব গাঁ ছেড়ে পালাই। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্ধকারে পালাতে আরম্ভ করে; কলেরে জঙ্গলে, পুলের নিচে, বাঁশঝাড়ে। কেবল এতোয়ারী থেকে যায়, একজনও না গেলে দারোগাসাহেব চটবে। শুক্রা পালায় সবার শেষে। 'সনবেটা'কে ফেলে পালাতে শুক্রার মন সরে না—আসবি নাকি ঢোঁড়াই ? ঢোঁড়াইয়েরও ধাঙড়দের সঙ্গে পালাতে ইচ্ছে করে। আবার ভাবে যে, না, বড় দারোগা আবার বাওয়াকে কী-না-কী করবে; বাড়িতে দারোগা। এই বিপদের সময় বাওয়াকে দারোগার হাতে একলা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আর তার জন্যই তো এত কান্ড। না হলে এতে বাওয়ার আর কী দোষ ছিল।

যাওয়ার সময় শুক্রা চৌকিদারের হাতে চার আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে যায়। এতোয়ারী আর চৌকিদারের সঙ্গে ঢোঁড়াই ফিরে আসে। পথে এতোয়ারীর সঙ্গে চৌকিদারের ঠিক হয় যে, সে যেন দারোগা সাহেবকে বলে যে ধাঙড়েরা সকলে আজ

---

১ সম্মান দেখানোর।

ভোজ খেতে নীলগঞ্জ গিয়েছে। কেবল এতোয়ারী ছিল পাড়া পাহারা দেবার জন্য। সিকিটা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে চৌকিদার ঢোঁড়াইকে বলে, তুই আবার যেন অন্য কিছু বলেটলে দিস না ছোঁড়া, বুঝলি।

ধাঙড়দের উপর চৌকিদারের এই অভাবনীয় করুণায় ঢোঁড়াইয়ের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

সমবেত তাৎমার দল সদলে একবাক্যে বলে যে, তারা কেউ কিছু জানে না। বাবুলাল পিট্রোল এনেছিল। সে, তেতর নায়েব আর ধনুয়া মহতো ঘরে আগুন লাগিয়েছে।

কনেস্টেবলরা বাবুলাল, তেতর আর ধনুয়াকে গালাগালি দিতে দিতে সম্মুখে টেনে নিয়ে আসে। কোথায় গিয়েছে তেতর নায়েবের কাল রাতের প্রতাপ, কোথায় গিয়েছে ধনুয়া মহতোর জিয়লগাছে হেলান দিয়ে বসা ন্যায়াধীশের গুরুগাম্ভীর্য, কোথায় গিয়েছে চাপরাসী সাহেবের পদগৌরব। দারোগা পুলিশের হাতে বেইজ্জৎ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার, হাকিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার। বাবুলাল করুণ দৃষ্টিতে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়, মহতো দেখে বাওয়ার দিকে—ত্রস্ত চাউনির ভিতর থেকে মিনতি আর কৃপাভিক্ষা ফুটে বেরুচ্ছে। তেতর উদ্‌গত শ্লেষ্মা গিলে দারোগা সাহেবের সম্মুখে কাশি চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় আর কাশি চাপবার উৎকট প্রয়াসে তার চোখে জল এসে গিয়েছে।

ঢোঁড়াইয়ের মনের ভিতর আগুন জ্বলছে; এইবার ঠেলা বোঝো! দেখে যা দুখিয়ার মা, যে চাপরাসী সাহেবের জন্যে তুই নিজেকে বাবুভাইয়াদের বাড়ির মাইজী মনে করিস, দেখে যা তার দশা। দেখিয়ে যা তালের বরফি দারোগা সাহেবকে, পিট্রোলের শিশির মালকাইন।

হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়; বাওয়ার মনের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পায়। সে ঢোঁড়াইকে অনুরোধ করছে—আসামীদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলো না—যা হবার হয়ে গিয়েছে, জাতের লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি জীইয়ে রাখা ঠিক নয়।···

দারোগাসাহেবের জেরা আর গালাগালির বিরাম নেই। সব কটাকে জেলে পাঠাব, সব কটার উপর 'চারশ ছত্তিস দফা'১ চালাব। সমস্ত গাঁটাকে পিষে একেবারে ছাতু ছাতু করে দেব, মুনেসোওয়ার সিং দারোগাকে চেনো না তাই। হিঁদু হয়ে থানের ইজ্জত রাখো না। মুসলমান হলেও না হয় কথা ছিল। তারা সব করতে পারে···

সব আসামীই বলে যে, তারা হুজুরের কাছে মিথ্যা বলবে না, হুজুর মা-বাপ। আকাশের চাঁদ আছেন, গোঁসাই আছেন। রামচন্দ্রজীর রাজ্য চলছে। হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়—তাদের মধ্যে যে খারাপ লোক কেউ নেই, তা বলছে না; তবে সরকারের নিমক খেয়ে সরকারের কাছে মিথ্যে বললে তাদের গায়ে যেন কুষ্ঠ হয়। তারা আগুন লাগিয়েছিল ঠিক।···

কেন? শয়তানের বাচ্চা কোথাকার!

বাবুলাল সামলে নেয়। হুজুর বাওয়ার ঐ চালাটার উপর একটা শকুন বসেছিল। শকুনবসা ঘর রাখতে নেই, তাতে পাড়ার অমঙ্গল, থানের অমঙ্গল, আর যে ঐ

১ ফৌজদারী আইনের চারশ ছত্রিশ ধারার মোকদ্দমা।

ঘরে থাকবে, তার তো কথাই নেই। এখানে একটা চামড়ার গুদাম আছে হুজুর, সেইটাই আমাদের জেরবার করল, শকুন-টকুন পাড়ায় এনে।

সকলে প্রথমটায় অবাক হয়ে যায়। আসামী আর অন্য তাৎমাদের ধড়ে প্রাণ আসে। এখন সব নির্ভর করছে বাওয়া আর ঢোঁড়াইয়ের উপর—এই বুঝি তারা সব মিথ্যে ফাঁস করে দেয়।

দারোগা সাহেব বাওয়াকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এরা যা বলছে তা সত্যি কি না।

বাওয়া উত্তর দেয় না। সে প্রথম থেকে দারোগা সাহেবের সম্মুখে এইরকম ভাবে বসে আছে। কোন কথায় সাড়া দেয়নি।

দারোগা ভাবেন লোকটা কেবল বোবা নয়, কালাও। আর সাধারণত তাই হয়। একবার যেন মনে হয়েছিল যে, সে শুনতে পাচ্ছে—তাই না খটকা লেগেছিল দারোগা সাহেবের মনে।

তুই বল ছোকরা।

ঢোঁড়াইয়ের সব ঘুলিয়ে যায়। মুখ থেকে কথা বেরুতে চায় না। জিব যেন জড়িয়ে আসছে। এত বিপদেও কি লোকে পড়ে। প্রাণপণ শক্তিতে সে কথা বলতে চেষ্টা করে।

জোরে বল্। ভয় করিস না। তুই এখানেই থাকিস নাকি? বাপকা নাম?—এক নিশ্বাসে দারোগা সাহেব বলে যান।

ঢোঁড়াই মাথা নেড়ে জানায় যে, হ্যাঁ সে এখানেই থাকে।

'এরা যা বলছে তা কি সত্যি?'

এতগুলো লোকের ভবিষ্যত এখন তার হাতে। একবার মাথা নাড়লে সে এখনই তার জাতের সেরা লোক'টির পঞ্চাগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারে, জেলের হাওয়া খাইয়ে আনতে পারে, পুলিসকে দিয়ে মার খাইয়ে বেইজ্জৎ তো করাতেই পারে। তার মনও তাই চায়। এই পঞ্চায়েতের অত্যাচারের মাথাগুলোকে নিচু করাতে, এমন নিচু করাতে যাতে তারা আর কোনোদিন মাথা উঁচু করে বাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে না পারে—যাতে তারা ঢোঁড়াইকে আর তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখতে পারে।

কিন্তু বাওয়ার চাহনির আদেশ সে অমান্য করতে পারে না।...বাওয়া নীরবে তাকে বলছে যে, জেলে ধরে নিয়ে গেলে এদের এখন ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া ভাত খেতে হবে, কোথায় থাকবে তাৎমা জাতের গৌরব, কোথায় থাকবে 'কনৌজি তন্ত্রিমা ছত্রিদের' সুযশের সৌরভ...

এতোয়ারী উসখুস করে। বয়সের অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারে যে বাওয়া আর ঢোঁড়াই কেউই সত্যি কথা বলবে না। এতক্ষণ সে মনে মনে ভাবছিল যে গোঁফমোটা জেলরবাবু রবিবারে রবিবারে আসেন জয়সোয়াল কোম্পানিতে, সওদা করতে, সাধুবাবুকে দিয়ে তাঁকে বলিয়ে বাবুলাল আর মহতোর হাতে বোনা একখানা সতরঞ্চি সে জেলখানা থেকে আনাবে; এনে একবার তার উপর বাওয়াকে বসাবে; তার জন্য যত খরচ হয় হোক। অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছ থেকে কর্জও যদি নিতে হয়, তাও স্বীকার ...কিন্তু সব 'চৌপট'১ করে দিল ঐ ঢোঁড়াইটা।

সে বলে যে, হ্যাঁ বাবুলালের কথা সত্যি।

'কবে বসেছিল শকুন?'

---

১ মাটি করে দিল।

'কাল সকালে।'

'মন্দা না মাদী।'

ঢোঁড়াই ঢোঁক গেলে।

'দুদিন পরে মোচ উঠবে এখনও শকুনের মন্দা মাদী চেনো না—বদমাস ছোকরা অশথগাছে না বসে চালার উপর বসল কেন শকুনটা—মিথ্যাবাদীর ঝাড় সব!'

ঢোঁড়াই এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে না; সে মনে মনে ভাবে, এইবার বোধহয় দারোগাসাহেব তাকে মারবার জন্য উঠবেন।

'আর কেউ কিছু জানিস, এ সম্বন্ধে। এই বুড্‌ঢা!'

এতোয়ারীর সাদা ভুরুর নিচের ঝাপসা চোখজোড়া আর নির্বিকার মুখ দেখে, তার মনের কিছু বুঝবার উপায় নেই। সে ভেবেছিল তাৎমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবে; কিন্তু থানা পুলিশের ভয়ে সব কথা চেপে যায়। ঢোঁড়াইয়ের সাক্ষ্যেই যদি এই 'চোট্টা'গুলিকে সায়েস্তা করা যেত, তাহলে, মাছও উঠত, ছিপও ভাঙত না। কিন্তু এমন সুযোগ পেয়েও এই নোংরা কুড়ের বাদশা, 'বিলকুল চোট্টা' পঞ্চগুলিকে ছেড়ে দিল ঢোঁড়াই। এ জাতটাকেই বিশ্বাস নেই। ও ছোঁড়ার শরীরেও তো এদেরই রক্ত। ···কাল সাধুবাবুর কাছে মুখ দেখানো শক্ত হবে তার।

'না হুজুর, আমি থাকি ধাঙড়টুলিতে।'

দারোগাবাবু সাক্ষী না পেয়ে বকেঝকে চিৎকার করে উঠে পড়েন। চৌকিদারকে বলেন—এ শালাদের উপর ভাল করে নজর রাখবে। না হলে তোমার চাকরি থাকবে না।

চৌকিদার ঝুঁকে কুর্নিস করে। দারোগাসাহেব কপিল রাজার জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করে, তারপর শহরে ফেরেন।

একজন কনস্টেবল কেবল থেকে যায়। সে ছড়িদারকে দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথাবার্তা বলে। ছড়িদার এসে মহতো নায়েবদের বলে যে সিপাহীজী জানে যে ঢোঁড়াই বাবুলালের স্ত্রীর ছেলে। সব খবর পুলিশ রাখে। সে এখনি গিয়ে দারোগা সাহেবকে বলে দেবে যে, এই জন্যেই ঢোঁড়াই বাবুলালের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। তারপরই সবকটাকে জেলে পুরবে।

'পঞ্চরা' চাঁদা করে কিছু কিছু দিয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলে, সিপাহীজীর সঙ্গে।

## ঢোঁড়াই ভকতের মর্যাদা বৃদ্ধি

এই ঘটনার পর ঢোঁড়াইকে মহতো নায়েবরা আর কিছু বলতে পারে না। মনে মনে নিশ্চয়ই সেই আগেকার মতই বিরূপ তার উপর, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। আর রাগ না চাপলে উপায় কী, মোকদ্দমা আবার 'খুলে যেতে' কতক্ষণ। পুলিশকে খবর দিয়েছিল কে তা তাৎমারা বুঝতে পারে না। সে লোকটাকেও খুশি করে রাখতে হবে।

বাওয়ার চালাঘর তাৎমারাই আবার তুলে দেয়। বাওয়া কিন্তু তার মধ্যে আর কখনও শোয় না। কেবল বর্ষার সময় ঢোঁড়াই বাওয়াকে ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়।

পাড়ার সকলে ঢোঁড়াইয়ের প্রশংসা করে। এতবড় বিপদের থেকে, এতবড় বেইজ্জতি থেকে, সে জাতটাকে বাঁচিয়েছে। তাকে আর কিছু হোক, তাচ্ছিল্য করা

চলে না। পাড়ার ছেলেরা ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলে ধন্য হয়, মেয়েরা ডেকে কথা বলে। তার বয়সী অন্য ছেলেদের গাঁয়ের বয়স্থ বয়স্থরা 'ওরে ছোঁড়া' বলে ডাকে, কিন্তু তাকে এখন ঢোঁড়াই ছাড়া আর অন্য কিছু বলে ডাকতে বাধে—দুখিয়ার মা'র পর্যন্ত। এতটা সম্মান বাওয়া আর ঢোঁড়াই নিজের পাড়ায় কখনও পায়নি।

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের মাটি কাটার কথাটা যেমন এই সূত্রে চাপা পড়ে যায়, তেমনি আবার একটা চার বছরের পুরনো কথা হঠাৎ বেরিয়ে আসে—ঐ 'চামড়াগুদামবালা' কপিলরাজার জামাইয়ের কথাটা। ওটা চাপা পড়ে গিয়েছিল সেবার গানহী বাওয়ার 'সুরাজ'এর১ তামাসার হিড়িকে।

বাবুলাল যে সেদিন দারোগাসাহেবের কাছে চামড়াগুদামের কথাটা তুলেছিল সেটার মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়াও অন্য কথা ছিল। এমনিই তো সবাই ছিল 'চামড়াবালা মুসলমান'টার উপর চটা। তার উপর কিছুদিন থেকে সে জিরানিয়ার একজন মেথরানীকে বাড়িতে এনে রেখেছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে, তাকে মুসলমান করে বিয়ে করবে।

কী যে পছন্দ ও জাতটার বুঝি না। একটা বৌ থাকতে আবার ঐ মেথরানীকে বিয়ে করতে ইচ্ছেও হয়। বলিহারি প্রবৃত্তির! গা দিয়ে সেটার ভক ভক ভক ভক করে নিশ্চয় দুর্গন্ধ বেরোয়। এনে রেখেছিলি তাও না হয় বুঝেছিলাম; কিন্তু তাকে মুসলমান করে নিয়ে বিয়ে? কভ্‌ভী নহী!—হেঁপো রুগী তেতর পর্যন্ত তাল ঠুকে বলে।

সেদিন দারোগাসাহেব রাতে ওর ওখানে গিয়ে কী বলেছেন, কী করছেন জানতে পারা যায়নি। নিশ্চয়ই তাড়াটাড়া দিয়ে থাকবেন,—যা চটেছিলেন থানের থেকে যাওয়ার সময়।

এই মেথরানীর ব্যাপার নিয়ে গ্রামে বেশ সোরগোল পড়ে যায়। এমনি সময়ে থানা পুলিশের ভয় ছিলই, তার উপর আবার গোঁসাইথানে হয়ে গেল ঢোঁড়াইকে নিয়ে কান্ড; তাই কেউ আর কিছু করতে সাহস পায় না।

মেথরানীটাকে মুসলমান করে বিয়ে করা জিনিসটা, ধাঙড়রাও পছন্দ করে না। তারা নিজেরা হিঁদু কিনা, এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামানো দরকার মনে করে নি; তবে তারা যে মুসলমান নয় এ কথা তারা জানত। এই মেথরানীর বিয়ের ব্যাপারটাতে তাদের হিঁদু জাতের উপর জুলুম করা হচ্ছে। মেথরানীকে তারা ছোঁয় না ঠিক; তা হলেও সে তাদের মেয়ে। সেই মেয়েকে নিয়ে যাবে গরুখোরে? ছেলে হলেও না হয় অন্য কথা ছিল; এ মেয়ের ব্যাপার; বিলকুল বেইজ্জতির কথা। আর যখন লা'র ব্যবসা ছিল, শিমুল গাছ কাটার কাজ ছিল, তখন না হয় কপিল রাজার সঙ্গে রোজগারের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই জামাইটা 'পরদেশী শুগা'২। আজ নিমফল খেতে বসেছে এখানকার নিমগাছে, কাল থাকবে না। করে চামড়ার ব্যবসা, যার সঙ্গে ধাঙড়দের রোজগারের কোনো সম্পর্ক নেই। এটার সঙ্গে কিসের খাতির?

কিন্তু কী তাৎমাটুলির, কী ধাঙড়টুলির বড়রা কেউ থানা পুলিসের ভয়ে এ বিষয়ে এগুতে রাজী নয়। ঢোঁড়াই এখন ছেলেদের মধ্যে একটু কেষ্ট বিষ্টু গোছের হয়ে উঠেছে। ধাঙড়টুলি তাৎমাটুলি দুই জায়গার ছেলেরাই তার কথা শোনে। 'পঞ্চ'রা

---

১ স্বরাজ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

২ বিদেশী টিয়াপাখি।

ঢোঁড়াইকে বলে চুপি চুপি—রাতে মধ্যে মধ্যে ঢিল ফেলিস চামড়াগুদামে। খুব সাবধানে, এসব ছেলেপিলের কাজ। তোদের বয়সে আমরাও অনেক করেছি।

'পঞ্চ'রা মনে মনে ভেবে রেখেছে যে, এ নিয়ে বিপদ আপদ কিছু হলে ঢোঁড়াইটার উপর দিয়েই যাবে।

ঢোঁড়াইরা মুসলমানটাকে একটু জব্দ করুক বাওয়াও তাই চায়। শোনা যাচ্ছে যে, 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির' মোহন্তজীরও এতে সমর্থন আছে। টোলার মহতো নায়েবদের কাছ থেকে, এত বড় দায়িত্ব আর বিশ্বাসের পদ পেয়ে ঢোঁড়াই বর্তে যায়। কিন্তু একাজ তাদের বেশিদিন করতে হয় না। হঠাৎ শোনা যায় গানহী বাওয়া জিরানিয়ায় আসছেন, 'সাভা'১ করতে। তাঁকে কি কেউ জেলে ভরে রাখতে পারে। এক মন্তরে তালা পাঁচিল ভেঙে বাইরে চলে আসেন। গানহী বাওয়া মেথর মেথরানীদের খুব ভালবাসেন। তিনি এখানে এলে তাঁকেই বলা যাবে—এই জুলুম আর বেইজ্জতির একটা কিছু বিহিত করতে।

বন্ধ করে দে এখন ঢিল ফেলার কাজ, ঢোঁড়াই। কদিন দেখই না।

ঝিকটিহার মাঠে গানহী বাওয়ার 'সাভা'য় পেঁছে তারা দেখে কী ভীড়? কী ভীড়! বকড়হাট্টার মাঠে যত ঘাস, তত লোক; ই-ই-ই এখানে থেকে মরণাধারের চাইতেও দূর পর্যন্ত লোক হবে। গানহীবাবার 'রসি সি ভর'-এর২ মধ্যেই তারা যেতে পারেনি, তার আবার তার সঙ্গে কথা বলা। গানহীবাওয়ার কাছে বসেছিলেন মাস্টার সাব, আরও কত বড় বড় লোক সব। কপিলরাজার জামাইয়ের কথাটা বলতে না পারায়, তাৎমাদের দুঃখ হয় খুব। একবার বলতে পারলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু এই 'বেশুমার' লোকের সকলেরই হয়তো নিজের নিজের কিছু কিছু কাজের কথা বলার আছে। যার ধর্ম তিনি নিজেই যদি রক্ষা না করেন তাহলে আমরা কী করতে পারি। যাক গানহী বাওয়ার 'দর্শন'টাতো হল। ঢোঁড়াই দেখে যে, তার চাইতেও বোধ হয় বেঁটে—কি লরম, ঠাণ্ডাহা৩ চেহারা—ঠিক মিসিরজীর মতো। ঢোঁড়াই শুনেছে যে ঘি খেলে নাকি অমন চেহারা হয়। কিন্তু এ কি রকম 'সন্ত আদমী'৪, দাড়ি নেই। ঢোঁড়াইদের সব চাইতে খারাপ লাগে, শৌখিন বাবুভাইদের মতো এই সন্ত আদমীর আবার চশমা পরার শখ। গানহী বাওয়ার চেলারা সকলকে বসতে বলে। দর্শন হয়ে গিয়েছে, আর তারা বসে। কেবল বৌকাবাওয়া বসে থাকে —দূর থেকে সে দেখে কম, তাই সাভা শেষে হলে একবার ভাল করে দর্শন করবে বলে।

কিন্তু আজব ব্যাপার! ঢোঁড়াইয়ে কাজ হাসিল হয়ে গেল এর দিন কয়েকের মধ্যে। চামড়া গুদামটা উঠে গেল ইস্টিশানের কাছে। আসল কথা ইস্টিশানের কাছে না গেলে চামড়া চালান দেবার সুবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু তাৎমাটুলিতে ধাঙড়-টুলিতে এর ব্যাখ্যা হল অন্য রকম। ঢোঁড়াইয়ের দলের ঢিলের জোর, গানহী বাওয়ার অদৃশ্য প্রভাব আর সেদিনের দারোগা সাহেবের হুমকি, তিনটে মিলে যে কপিল-রাজার জামাইকে এখান থেকে ভাগিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কারো কোনো সন্দেহ নেই।

---

১ সভা, মিটিং।

২ এক রশি অর্থাৎ সিকি মাইল।

৩ নরম, ঠাণ্ডা।

৪ সন্ন্যাসী মানুষ।

এই ঘটনার পর গাঁয়ে ঢোঁড়াইয়ের প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়ে, তার আত্মপ্রত্যয় বাড়ে তার চাইতে অনেক বেশি। সে মনে মনে অনুভব করে যে রামজী আর গোঁসাই তার দিকে, —ঐ এমনি বোঝা যায় না, মনে হয় তারা ঘুমচ্ছেন, কিন্তু দেখছেন সব উপর থেকে; যিনি অন্যায় করেছেন তাকে ঘা খেতেই হবে।

রামজী ঢোঁড়াইয়ের তরফে; আর এখন সে কারো পরোয়া করে না দুনিয়ায় ?

## তন্ত্রিমাছত্রিদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ

ভাগলপুর জেলার সোনবর্সা থেকে মরগামায় এসেছিল মহগুদাস। তা বলে মরগামার মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের ওখানে নয়। মুখেরিয়া তাৎমারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, তাদের 'ঝোটাহারা' মইয়ে চড়ে। তাদের ওখানে হেঁজিপেঁজি কনৌজি তাৎমাও জল-স্পর্শ করে না; তাঁর আবার মহগুদাসের মতো লোক উঠবে সেখানে। তার বলে কত হাল বলদ জমি জিরেৎ তিনটে সাদী১, ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আঙিনা, 'জনানী'রা২ বাড়ির বাইরে যায় না, ছেলেপিলে নাতিপুতি, বাড়বাড়ন্ত সংসার।

সিরিদাস বাওয়ার কুর্মী চেলারা মরগামায় একটা সাভা করেছিল। সেই কুর্মী গুরুভাইদের নিমন্ত্রণ করতে মহগুদাস এসেছিল;—আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের দর্শনটাও হয়ে যাবে, এটাই ছিল ইচ্ছা।

সেই সময় মহগুদাস কিছুক্ষণের জন্য এসেছিলেন তাৎমাটুলিতে। অত বড় একটা লোককে এরা 'খাতিরদারী' কী করে করবে, তাই তাকে এরা থাকতেও বলেনি। কেবল ডিস্টিবোর্ড অপিস থেকে ডেকে আনিয়েছিল বাবুলালকে। গাঁয়ের মধ্যে ভালা আদমির সঙ্গে কথা বলা লোক, বাবুলাল ছাড়া আর কে আছে। সেই সময় মহগুদাসই কথা পাড়ে, জাতের সম্বন্ধে—তাৎমারা যে সে জাত নয়। রামচরিতমানসে তুলসী-দাসজী বলে গিয়েছেন যে, তারা তন্ত্রিমাছত্রি, একেবারে ব্রাহ্মণ না হলেও ঠিক ব্রাহ্মণের পরেই। পশ্চিমে সব জায়গায় কনৌজী তাৎমারা এই নাম নিয়েছে, আর নিয়েছে 'জনৌ'৩। এই দেখো, বলে মহগুদাস তুলোর কুর্তার ফিতে খুলে বের করে দেখায় তার গলার পৈতেটা—আঙুলের মতো মোটা, সোনার মতো হলুদ রঙের।

মহগুদাস তো গেলেন চলে, কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন আগুন তাৎমাটুলিতে।

ঢোঁড়াই, রাবিয়া, আরও অনেকে তখনই পৈতা নিতে চায় কিন্তু মহতো নায়েবেরা রাজী না। এসব জিনিস হুট্ করে পরে ফেলা কিছু নয়। বুড়োরা ভয় পায়—'ধরম' নিয়ে ছেলেখেলা ঠিক নয়। পচ্ছিমে করছে, পচ্ছিমের লোক তোকে হাতের আঙুল কেটে দিতে বল্লে দিবি ? পচ্ছিমে এক সের আটার রুটি হজম হয়, এখানে হয় ? 'গোঁসাই'কে ঘাঁটাস না খবরদার!—যেমন আছেন তেমনি তাঁকে থাকতে দে। খুশী না হন, অন্তত তোর উপর চটবেন না।

তাৎমাদের পুরুত মিসিরজী, গত দুবছর থেকে প্রতি রবিবারে গোঁসাইথানে রামায়ণ পড়ে শুনিয়ে যান, আর এর জন্য এক আনা করে পয়সা দক্ষিণা পান পঞ্চায়েতের কাছ থেকে। তারই কাছে 'পঞ্চ'রা জিজ্ঞাসা করে পৈতা নেওয়ার কথা। তিনি বলেন যে, মহগুদাস বাজে কথা বলেছে—রামায়ণে তন্ত্রিমাছত্রির কথা লেখা নেই। কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। ঢোঁড়াই পরিষ্কার তার মুখের উপর বলে

---

১ বিয়ে। ২ ছেলেমেয়েরা।

৩ পৈতা।

দেয় যে, তিনি অন্য জাতের নতুন করে পৈতা নেওয়া পছন্দ করেন না, সত্যি কথাটা চেপে যাচ্ছেন। তুমি খামকা ভয় পাচ্ছ মিসিরজী; তুমি এলে গায়ের কম্বল চারাপাট করে মুড়ে, ইয়াঃ 'গদ্দাদার'১ আসন পেতে দেব বসতে—যেমন এখন পেয়েছ। চির-অ-কা-আল…

বাওয়া ঢোঁড়াইকে থামিয়ে দেয়।

'শুভ আচরণ কতহুঁ নোঁহি হোই

দেব বিপ্র গুরু মানই ন কোঈ।'২

বলে, মিসিরজী চটে শালুর খোলে রামায়ণটি বাঁধতে আরম্ভ করেন।

তারপর ঢোঁড়াইরা মরগামায় সিরিদার বাওয়ার কুর্মী চেলাদের সঙ্গে, এই পৈতে নেওয়া নিয়ে অনেকবার দেখাশুনা করেছে। তারাও পৈতে নিতে বারণ করে তাৎমাদের। ঢোঁড়াই চটে আগুন হয়ে যায়;—কুর্মী কুর্মছত্রি হতে পারে, কিন্তু আমরা পৈতা নিলেই পৃথিবী ফেটে জল বেরিয়ে যাবে; না?

আমাদের কথা পছন্দ না, তা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলি কেন?

তাৎমাটুলি যখন এই ব্যাপার নিয়ে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন ধনুয়া মহতোর বাড়িতে এল তার শালা মুঙ্গীলাল, 'কুটমৈতি'৩ করতে। তাৎমাটুলির তাৎমাদের মধ্যে মহতোই প্রথম বিয়ে করেছিল নিজের গাঁয়ের বাইরে ডগরাহাতে, জিরানিয়া থেকে ন' মাইল দূরে। আজকাল 'কুটমৈতি'তে কেউ এলেই বাড়ির লোক বিরক্ত হয়। কুটুম এসেই বলবেন, 'ভেটমুলাকাত'৪ করতে এলাম। কিন্তু বাড়ির লোক সবাই জানে যে, 'ভেটমুলাকাতে'র তখনই দরকার হয়, যখন নিজের বাড়িতে খাওয়া জোটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কুটুম এলেই দিতে হবে পা ধোয়ার জল, খড়ম থাকলে খড়ম, বসতে বলতে হবে বাইরের মাচাতে, নিজেরা খাও না খাও তাকে দুবেলা ভাত খাওয়াতেই হবে, পার আঁচানোর জল তার হাতে ঢেলে দিতেই হবে; কিন্তু এবার মুঙ্গীলালের খাতির বেশি, সে পৈতা নিয়েছে। পৈতেটা কানে জড়িয়েই, সে দিদির বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পা ধুয়েই সে পৈতার কথা পাড়ে। মহতোর ছেলে গুদর ডেকে নিয়ে আসে ঢোঁড়াইকে। পাড়াসুদ্ধ সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে কুটুমের মাচার উপর। খাসা মানিয়েছে পৈতেটা কানে জড়িয়ে! আরে হবে না, এ যে আমাদের নিজেদের জাতের জিনিস। সেকালে আমাদের বাপঠাকুরদারা যখন কাপড় বুনত, তখন মাড় দিয়ে সুতো মাজবার সময় সবাই কানে জড়িয়ে রাখত এক এক গাছা সুতো। মাজতে গিয়ে সুতো ছিঁড়েছে কি কানের থেকে একগাছা খুলে নিয়ে ছেঁড়াটা জুড়ে দাও। পৈতা কি আর আমাদের নতুন জিনিস।

সেকালের তন্ত্রিমাছত্রিদের পূত-গৌরবের উত্তরাধিকারীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পচ্ছিমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এ জেলায় চার কোশ দূরের তাৎমারা পৈতে নিয়েও যখন মাথায় 'বজর'৫ পড়েনি, তখন আমরা নেব না কেন? মুঙ্গীলালও এতে সায় দেয়। মহতো শালাকে কিছু বলতে পারে না। মনে মনে ভাবে যে, তাৎমা-

১ গাদিযুক্ত।

২ ভাল আচরণ আর কোথাও রইল না। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে কেউ আর মানে না। (তুলসীদাস)

৩ কুটুম্বিতা। ৪ দেখা সাক্ষাত।

৫ বজ্র।

টুলির লোকেদের দলে ভিড়াতে না পারলে, ডগরাহার তাৎমাদের 'বিয়াসাদী কিরিয়া-করম' এর অসুবিধা হবে, তাই মুঙ্গীলালটা এই সব ছোকরাদের নাচাচ্ছে।

খালি ছোকরাদের মধ্যে জিনিসটা সীমাবদ্ধ থাকলে না হয় মহতো তাড়াতাড়ি দিয়ে ব্যাপারটা সামলে নিতে পারত। নাল্লু নায়েবও ছেলেদের দিকে হয়ে গেল, বাবুলালেরও নিমরাজি নিমরাজি ভাব, এই পৈতে নেওয়ার সম্বন্ধে। হেঁপো তেতর হাঁ না কিছুই বলে না। ঠিক হয় পৈতা নেওয়া হবে। তবে এটা 'কানফুকনেবালা গুরু-গোঁসাই'১ এর অনুমতিসাপেক্ষ।

তিনি থাকেন অযোধ্যাজীতে। সেই একবার এসেছিলেন তাৎমাটুলিতে, যেবার জিরানিয়ায় 'টুরমন'-এর তামাসা২ হয়। সকলের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয়েছিল তাঁকে দেবার জন্য। অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছ থেকে কিছু কর্জও করতে হয়েছিল, তাঁর 'গদ্দীবালা কিলাসের টিকস'৩ কাটিয়ে দেবার জন্য; এগারো টাকা সাড়ে তিন আনা ভাড়া; না না মহতোর বোধহয় ভুল হচ্ছে, ন' টাকা সাড়ে তিন আনা, সে কি আজকের কথা; সাড়ে তিন আনাটা ঠিক মনে আছে,তবে টাকাটা এগার কি ন'…… বাবুলাল তুমিই বল না, 'অফসর আদমী'—তোমরা…হিসেব টিসেব জানো…

বাবুলাল বলে, দশ টাকা সাড়ে তিন আনা। সকলেই জানত যে বাবুলাল দশ টাকাই বলবে; পরিমাণ, মাপ, সংখ্যা প্রভৃতি নিয়ে ঝগড়া উঠলে মাঝামাঝি একটা নির্ণয় দেওয়াই ভালো 'পঞ্চ'দের।…

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—মহতো কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়—'গুরু-গোঁসাইকে' একখানা 'পোসকাট'৪ লেখা যাক।

গ্রামে সাড়া পড়ে যায়—অযোধীয়াজীতে পোসকাট লেখা হবে। গাঁয়ে এর আগে কখনও চিঠি লেখা হয়নি। তবে মহতো নায়েবরা খবর রাখে যে, ডাকঘরের মুন্সীজী চিঠি লিখতে নেয় এক পয়সা। মিসিরজী লেখে ভাল। কিন্তু সে কি দু'পয়সার কম কাজ করবে। যেমন জায়গায় পুজো দিতে যাবে, তেমনি খরচ হবে। 'থানে' এক পয়সার গুড়ে পুজো হতে পারে, কিন্তু অযোধিয়াজীতে পুজো তো দূরের কথা, পোঁছুতেই দশ টাকা খরচ হয়ে যাবে।

মহতো পোসকাটের দাম দিতে চায় না; বলে পঞ্চায়েতের তবিলে 'খড়মহরা'ও৫ নেই।

ঢোঁড়াইয়ের দল জ্বলে ওঠে—'কী করেছ জরিমানার সব পয়সা?'

ছড়িদার পঞ্চদের বাঁচিয়ে দেয়—'পঞ্চরা তার হিসেব দেবে কি তোমাদের কাছে?'

'হ্যাঁ দিতে হবে হিসেব,' 'কেন দেবে না?'

একটা বড় রকমের ঝগড়া আসন্ন হয়ে ওঠে।

ঢোঁড়াই নিজের বাটুয়া থেকে একটা পয়সা বার করে দেয়—'এই আমি দিলাম পোস-কাটের দাম।' সকলে অবাক হয়ে যায়—ঢোঁড়াইটা পাগল হ'ল নাকি! দশের কাজ, একজন দিয়ে দিচ্ছে কি? আর একটু অপেক্ষা করলে মহতো নিজেই দিত। বোকা কোথাকার!

---

১ দীক্ষাগুরু।

২ ডিস্ট্রীক্ট টুর্নামেন্ট (১৯১৭), যুদ্ধে সাহায্যই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।

৩ ইণ্টার ক্লাস টিকিট।

৪ পোস্টকার্ড। ৫ কানাকড়ি।

বাবুলাল ঢোঁড়াইকে বলে 'আর এক পয়সা লাগবে পোসকাটে'। ডিস্টিবোর্ডের অফিসার—পৃথিবীর সব খবর তার নখদর্পণে। ঢোঁড়াই আরও একটা পয়সা ফেলে দেয় সকলের মধ্যে।

মহতো বলে, বাবুলাল তুমিই তাহলে কিনো পোসকাট দেখেশুনে। ঢোঁড়াই তুই মিসিরজীকে রবিবারে দোয়াত কলম আনতে বলে দিস।

রবিবারে মিসিরজি রামায়ণ পাঠের বদলে চিঠি লিখে দেন; আর মেয়েরা পর্যন্ত রামায়ণ শুনতে এসেছে। কী জোর দিয়ে দিয়ে লেখে! এখানে পর্যন্ত খস খস করে শব্দ শোনা যাচ্ছে, দেখতে দেখতে কালি ফুরিয়ে যাচ্ছে কলমে। পৈতে নেওয়াটা মিসিরজীর মনঃপূত নয়, কে জানে আবার ভুলটুল না লিখে দেয় পোসকাটে…

ঠিক হয় বাবুলাল চিঠি ডাকে দেবে। সকলে ডাকঘর পর্যন্ত তার সঙ্গে যায়।

তারপর চলে কত জল্পনা-কল্পনা, ডাকপিয়নের জন্য প্রত্যহ প্রতীক্ষা। কী চিঠি মিসিরজী লিখে দিয়েছিল কে জানে। একমাস অপেক্ষা করেও চিঠির জবাব আসে না গুরু গোঁসাইয়ের কাছ থেকে।

ঢোঁড়াইয়ের আর ধৈর্য থাকে না। আবার গাঁয়ে চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে যায় এ নিয়ে।

ঢোঁড়াই বলে—'আর কেউ না নিক, আমি একাই পৈতা দেব। কালই যাব সোনবর্গা।

অন্তরের থেকে সকলে এই জিনিসটাই চাইছিল। কেবল মনে মনে একটু ভয় ছিল—কী জানি কী হয়; ডগরাহার তাৎমারা পৈতা নেওয়ার পর সেখানে অনেকগুলো গরুমোষ, দু' তিন দিনের অসুখে মারা গিয়েছে—গরুগুলো খায়ও না দায়ও না, দু' তিন দিন গোবরের সঙ্গে রক্ত পড়ে, তারপর মরে যায়।

যাক, তাৎমাটুলির লোকদের চাষবাষ গরুমোষের বালাই নেই। গুরুগোঁসাইয়ের নাম নিয়ে তারা পৈতা দেওয়ানোর জন্য বামুন ডেকে পাঠায় সোনবর্গা থেকে।

তারপর একদিন গাঁসুদ্ধ ছেলেবুড়ো একসঙ্গে মাথা নেড়া করে আগুনের ধারে বসে, গলায় কাছির মতো মোটা পৈতে নেয়। দু'দিন গাঁয়ের মেয়ে পুরুষরা আলাদা থাকে; তারপর একসঙ্গে ভাতের ভোজ খেয়ে নিজের নিজের বাড়ি ফেরে। সেদিন থেকে তাৎমারা হয় 'দাস'—ঢোঁড়াই ভকত হয়ে যায় ঢোঁড়াইদাস।

মহতো নায়েবদের বিরুদ্ধে পৈতা দেওয়ার দলের নেতৃত্ব কী করে এসে পড়েছিল ঢোঁড়াইয়ের উপর, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। লোকে বোধহয় বুঝেছিল যে মাটিকাটা নিয়ে তার দেওয়া আঘাত সমাজ সহ্য করে নিয়েছে। হিম্মত আছে ছোকরার। আর পৈতার ব্যাপারে ওটা বলে ঠিক সবার মনের কথাটা। তার একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করেছে যে যতই ঢোঁড়াই 'পঞ্চদের বিরুদ্ধে কথা বলুক, মহতো সেরকম কড়া হতে পারে না আর ঢোঁড়াইয়ের উপর। কেন যে, তা বোঝে কেবল মহতোগিন্নী আর মহতো—আর অল্প-স্বল্প আন্দাজ করে ঢোঁড়াই।

## ঢোঁড়াইদাসের নূতন জীবিকা

ঢোঁড়াই 'পাক্কী'তে[১] কাজ করে। তার পাথরে কোঁদা হাতের পেশীগুলি গত দেড় দু বছরে আরও সবল হয়ে উঠেছে। গলার স্বর ভারি ভারি ঠেকে। রাস্তা মেরামতের কাজের সব রহস্যই এখন সে জেনে গিয়েছে। বর্ষার আগে 'ডিরেসিং'এ কী করে

১ কোশী-শিলিগুড়ি রোডে।

ফাঁকি দিতে হয়, কী করে কেবল উপরের ঘাস চেঁচে নিয়ে রাস্তার গর্তর উপর চাপা দিতে হয়, সড়কের ধারের চৌকোণা মাটিকাটা গর্তগুলির মাটি উপর উপর কেটে কী করে অফিসার ঠকাতে হয়, ভাঙা পাথরের স্তূপ মাপবার সময় কেমন করে কাঠি ধরলে মাপে বাড়ে, সব তার জানা হয়ে গিয়েছে। শেষের কাজটাতেই লাভ সবচেয়ে বেশী। এইসব কাজে 'ওরসিয়র' বাবু আর ঠিকেদার সাহেব তাদের বকশিশ করেন; কেবল শর্ত হচ্ছে যে এনজিনিয়র সাহেব কি চেরমেন সাহেব হঠাৎ এসে জেরা করতে আরম্ভ করলে, তাদের গুছিয়ে জবাব দিতে হবে। জেরায় মচকেছ কি গিয়েছ। তাহলেই 'জিলা-খারিজ'১। আর জেরায় উৎরে গেলেই পেট ভরে 'দহিচুড়া'র ভোজ ;—চুড়া-দহির নয় দহিচুড়ার,—দই বেশি, চিড়ে কম। নুন দিয়ে খাও, কাঁচালঙ্কা পাবে; মিঠা দিয়ে খেতে চাও গুড় পাবে—ইয়াঃ দানাদার গুড়, একেবারে লস্‌লস্‌ লস্‌লস্‌।

রাস্তার পাকা অংশটির উপর দিয়ে গরুর গাড়ি থেকে শনিচরারা গাড়োয়ানদের ভয় দেখিয়ে পয়সা আদায় করে। ঢোঁড়াই এ কাজ করতে পারে না, তার ভয়-ভয় করে,—গোঁসাই আর রামজী সব দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে। বরঞ্চ একলা থাকলে গাড়োয়ানকে সাবধান করে দেয়। ঢোঁড়াই জানে যে গাড়োয়ানের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া পাপ; ঠকাতে হয় সরকারকে ঠকাও, চেরমেন সাহেবকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করো।

এই সেদিনও দুটো ছেলে গাড়ির রেস দিচ্ছিল। একজনের ছিল বলদের 'শ্যাম্পনি'২, আর একজনের খোলা গরুর গাড়ি। তুমুল উৎসাহের সঙ্গে তারা দুজনে পাল্লা দিচ্ছে, আর শ্যাম্পনির গাড়োয়ানটা হাসতে হাসতে বলছে, 'এইও! যে গাড়ির স্প্রিং নেই সে গাড়ি মাটির উপর দিয়ে চালাও, পাকা রাস্তা থেকে নামো শীগগির।'

'ওরে আমার হাওয়াগাড়িওয়ালারে!'

'জলদি নিচে ভাগো, কাচ্চীতে৩!'

—'দুটো চাকাতেই যে 'ফুলে কুপো'৪। চারটে চাকা থাকলে না জানি কী করতিস। একখানা হাওয়া গাড়ি আসুক না পিছন থেকে; অমনি 'সটক্‌দম' হয়ে যাবে। শুড় শুড় করে নেমে আসতে হবে 'নালায়েক'-এর৫ পাশে।

ঢোঁড়াই তাদের দুজনকেই রাস্তার কাঁচা অংশটিতে নেমে আসতে বলে।

—'তুই কোন ডিস্টিবোর্ডের নাতি যে আমাদের মানা করতে এসেছিস? প্রত্যেক বছর আমরা বলে জিরানিয়া বাজারে ফসল নিয়ে আসি বেচতে। তোদের সর্দারকে পয়সা দিয়ে এই আসছি, এখানে থেকে কোশভরও হবে না; আর তুই কোন 'ক্ষেতের মুলো'৬ লাল চোখ দেখাতে এসেছিস আমাদের উপর।'

---

১ বরখাস্ত।

২ দুই চাকার একরকম গাড়ি। এই গাড়িগুলিতে সাধারণত লোহার স্প্রিং লাগানো থাকে

৩ কাঁচা রাস্তায়।

৪ 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'-এর স্থানীয় ভাষার ইডিয়ম।

৫ অযোগ্য।

৬ সামান্য লোক। 'মশা বলে কত জল' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঢোঁড়াই তাদের বুঝোয়—আরে কথাটাই শোন আমার। খানিক আগেই রোড-সরকার আছে; তালে মহলদারের নাম শুনেছিস। রোড্‌সরকার আর সর্দারের মধ্যে সাট আছে। একজন পয়সা দিয়ে যেতে বলে দেয় 'পাক্কী'র উপর দিয়ে; আর একজন খানিক আগেই আবার ধরে পয়সা নেওয়ার জন্যে।'

'তাই নাকি!'

দু জোড়া সশঙ্ক চোখ আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'সত্যি?'

'তোমার নাম কী ভাই?' 'আর তোমাদের!' 'ধূসর? সোনৈলী থানায়?' গল্প জমে ওঠে। খয়নি বেরোয়। সেখানে রাজদ্বারভাঙ্গার তহশীল কাছারি আছে, প্রকাণ্ড গাঁ···গুরুজীর ইস্কুল আছে।

ওদের গাড়ি চলে যায়। আবার অন্য গাড়ি এসে পড়ে কঁ্যাচর কঁ্যাচর শব্দ করতে করতে, বলদের গলার ঘণ্টা বাজিয়ে, উড়ন্ত ধুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে।

ঢোঁড়াই গান বন্ধ করে আবার তাদের সঙ্গে কথা বলে। কত গাঁয়ের কত আজব আজব খবর শোনে। কোথা থেকে কোথায় চলে গিয়েছে রাস্তা। এ রাস্তা আরম্ভ কোথায় আর শেষ কোথায় সে জানে না। কেউ জানে না বোধহয়। কোনো গাড়ি আসছে ভুট্টা নিয়ে, কেউ গাড়িতে আসছে কাছারীতে মোকদ্দমা করতে, কেউ আসছে রুগী দেখাতে। দেশের বিরাটত্বের একটা আবছা ছায়া পড়ে তার মনের উপর; তার রাস্তা তোয়ের করার সঙ্গে সঙ্গে এত লোকের এত গাড়ি আসা যাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে মোটামুটিভাবে এ জিনিসটা সে বোঝে। 'পাক্কী'তে কাজ না করলে এ জিনিস বোঝা যায় না।

কিন্তু এসব কথা মনে হতে পারে ন'মাসে ছমাসে, এক আধ মুহূর্তের জন্য। এ সবের সময় কোথায়? তার গ্যাং-এর কেউ কেউ গাড়িতে মেয়েছেলে দেখে হয়তো ততক্ষণ রাজকন্যা সুরঙ্গা আর রাজপুত্র সদাবৃচের প্রেমের গান আরম্ভ করেছে। কেউবা হেসে ঢলে পড়ে, এ ওর গায়ে; খোয়ার টুকরো ছুঁড়ে মারবার ভান করে। ঢোঁড়াই সব বোঝে, দেখে মুচকে মুচকে হাসে। একটা রহস্যের কুয়াশায় ঘেরা এই মেয়ে জাতটা, তার জানতে ইচ্ছা করে, বুঝতে ইচ্ছা করে। সে মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে তার কৌতূহল চাপা দিতে চায়। আর মেয়েদের কথা ভাবতে গেলেই কোথা থেকে কখন যে এসে পড়ে যত নষ্টের গোড়া ঐ দুখিয়ার মা'টার কথা, বুঝতেই পারে না। দুখিয়ার মা তার কোনো অনিষ্ট করেনি একথা ঠিক। কিন্তু তার উপর যে কোথাও অবিচার করা হয়েছে এ কথা বুঝবার মতো বুদ্ধি তার হয়েছে। আর মহতোগিন্নী, কিছুদিন থেকে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে খুব আলাপ জমাবার চেষ্টা করছেন; তিনি ঢোঁড়াইয়ের ছোট বেলার গল্প, বেশ রং চং দিয়ে, তাকে শুনিয়েছেন কয়েকদিন। বাপ মরা ছেলেটাকে গোঁসাইথানে ফেলে দিয়ে, মা গিয়েছিল গট্‌গটিয়ে 'সাগাই' করতে। তাই এতদিন পরে মহতোগিন্নীর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠেছে ঢোঁড়াইয়ের জন্য। পাকা কাঁঠালের ভিতরের বোঁটা দিয়ে তরকারী রেঁধে তিনি ঢোঁড়াইকে আদর করে খাওয়ান, আর ঐ সব পুরনো গল্প করেন। তাঁর হাতে-খড়ম-পরা-পঙ্গু মেয়ে ফুলঝরিয়া দূরে বসে বসে শোনে।

দুখিয়ার মা না হয় বদ; সে না হয় ঢোঁড়াইকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু মহতো নায়েবরা সে সময় কী করছিল? তাৎমা জাতটা কী করছিল? বাওয়া ছাড়া আর কেউ, তার কথা ভাবেনি কেন? সকলের বিরুদ্ধেই তার অনেক

কিছু বলার আছে। আর রামজী "বজরংবলী মহাবীরজী"১ তাঁরা কি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন? এদের উপরও অভিমান ঘনিয়ে ওঠে তার মনে।

## সামুয়র সন্দর্শনে

রাস্তার কাজ করার সময়, ঢোঁড়াইয়ের রাজ্যের কথা মনে আসে। শনিচরারা মধ্যে মধ্যে বলে, কী রে ঢোড়াই স্বপ্ন দেখছিস নাকি? তোর গোঁফের রেখা দেখা দিচ্ছে; এবার একটা সাদী করে ফেল।

'ধেৎ!'

'ধেৎ আবার কি। তবে মেয়ের বাপকে দেবার টাকার যোগাড় করাই শক্ত। কিরিস্তান হতিস, তো সামুয়রের মতো সাহেবের টাকা পেতিস।'

পাদরি সায়েব সামুয়রকে মর্লি সাহেবের বাগানের মালীর কাজে বহাল করিয়ে দিয়েছিলেন। পুরনো নীলকর পরিবারের পর সব সাহেবই চলে যাচ্ছে একে একে জিরানিয়া থেকে। মর্লি সাহেবও কয়েক বছর থেকে যাব যাব করছে। জমি জিরেৎ বেচতে আরম্ভ করে দিয়েছে অনেকদিন থেকেই। জমির দাম নাকি শীগগিরই কমতে পারে এইজন্য এই বছরটায় সম্পত্তি বিক্রির হিড়িক পড়ে গিয়েছে সাহেবদের মধ্যে। মর্লি সাহেব, তাঁর চাকর-বাকর, ডাক্তার, উকিল, আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেককেই যাওয়ার আগে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যাবেন, এ খবর এই অঞ্চলের সকলেই জানে। অনেকের টাকা শোনা যায় পাদরি সাহেবের কাছে জমাও করে রেখে দিয়েছেন। এখন বিসারিয়া কুঠির সম্পত্তিটা সুবিধা মতো দামে বিক্রি করে দিতে পারলেই মর্লি সাহেব চলে যেতে পারেন জিরানিয়া ছেড়ে। শনিচরা এই মর্লি সাহেবের টাকার কথাই বলছিল।

সামুয়রও এখন জোয়ান হয়ে উঠেছে। খাঁদা খাঁদা মুখটা, কিন্তু সাহেবের মতো টকটকে চেহারা হয়েছে তার। কুঠির সাইকেলে চড়ে ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখ দিয়ে, ডাকঘর থেকে সাহেবের ডাক নিয়ে আসে প্রত্যহ। আর শিস দিতে দিতে রোজ সন্ধ্যার সময় তাড়ি খেতে যায়।

'ঐ দ্যাখ সামুয়র আসছে। ওর গোঁফ উঠছে দেখেছিস, ভুট্টার চুলের মতো।'

ঢোঁড়াই হেসে ফেলে। সত্যিই সাইকেলে সামুয়র আসছে। মাথায় একখানা রুমাল বাঁধা।

'রুমাল বেঁধেছে দ্যাখ না—ঠিক ছুরিতালাবেচা ইরাণী মেয়েদের মতো। নিশ্চয়ই ডাকঘর থেকে আসছে।'

'মোচের রেখাটা কামিয়ে নে সামুয়র' সকলে হেসে ওঠে। সামুয়র সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। এরা এক ডাকে সামুয়রকে আসমান থেকে জমিতে এনে ফেলেছে; কত কথা সে সাইকেলে ভাবতে ভাবতে আসছিল।···

নূতন আয়াটি দেখতে শুনতে বেশ। আলিজান বাবুর্চির সঙ্গেও তার আশনাই আছে, আবার সামুয়রের সঙ্গেও। গত বছর সাল শেষ হওয়ার রাতে গির্জার হলঘরের পাশের ছোট ঘরে,—যে ঘরটায় মতির মার্বেলে মেমসাহেবরা নিজের নিজের তকদীর দেখছিল২—সেই ঘরটায়—অর্ধেক রাত হবে তখন—বাইরে পোষের শীত, বরফের

১ বীর হনুমানের একটি নাম। বজ্রের মতো শক্তি যার।

২ Crystal gazing. ঐ ঘরে স্ফটিকের একটি গোলাকার পাত্রে খৃস্টানদের পবিত্র জল রাখা থাকে।

মতো ঠাণ্ডা—কিন্তু ঘরটার ভিতর কী গরম !—আয়ার গাউনটায় কী সুন্দর গন্ধ, মেমসাহেবের শিশি থেকে চুরি করা খোশবায় ; অটো দিলবাহারের চাইতেও ভাল গন্ধ, তার সঙ্গে মিশেছে সিগারেট আর পিঁয়াজের গন্ধভরা আয়াটার নিঃশ্বাস,—সেদিনের নেশার ঘোরে সবই মধুর লেগেছিল। বাবুর্চি এক নম্বরের ঘুঘু—বাড়িতে তার দু দুটো বিবি।…

আজো তাকে সামুয়র বিরক্ত হয়েই সাইকেল থেকে নামল। ভাল লাগে না এগুলোর সঙ্গে কথা বলত। সবে সে সিগারেটটা ধরিয়েছে। ভাগ্যে সে কিরিস্তান, না হলে এ লোকগুলো তার মুখ থেকে সিগারেট কেড়ে নিয়েই টান মারত। রাজার জাত হয়ে লাজ পাচ্ছে। সেই জন্যেই না আলিজান বাবুর্চি মাংসটা খাওয়ায় ; সাহেব তাকে টাকা দিয়ে যাবে বলে ; আয়াটার সঙ্গে আলাপ জমাবার সুবিধে হয়।

ঢোঁড়াই ঠাট্টা করে বলে, 'সামুয়র, তোর সায়েব শুনছি যাবে না ?'

সামুয়র বলে, 'ও না গেলেও আমার ভাল, আবার গেলেও ভাল। না গেলে এ আমাদের কাজটা তো থাকবে। আর গেলে তো কথাই নেই—টাকা পাওয়া যাবে।' কথায় কেউ হারাতে পারবে না সামুয়রকে। দু একটা আলগা আলগা কথা বলবার পর, সে চিঠি আর খবরের কাগজের তাড়া হাতে নিয়ে আবার সাইকেলে চড়ে।

'দেরি হলে সাহেব চটবে। কিছুদিন থেকে দেখছি সাহেবের মেজটা যেন ভাদ্রের কুকুরের মতো হয়ে রয়েছে।'

'তোরই তো মনিব ; আবার কেমন হবে ?'

সামুয়র সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের উপর ঝুঁকে পড়ে জোরে জোরে পা চালায়, এই গেঁয়োগুলোকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য।

'আরো জোরে চালা। আগের গরুর গাড়িতে লাল শাড়ি দেখেছে, ওকি আর আস্তে চালাতে পারে।'

'বিরষা বলে—বিলকুল লাখেড়া১ হয়ে গিয়েছে। আমি দেখছি কিরিস্তান হলেই এমনি হয়। সব বুদ্ধি ছেলেবেলাতেই খরচ হয়ে যায়।'

## ফুলঝরিয়ার খেদ ও শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা

ঢোঁড়াইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে মহতোগিন্নী। তার আজকাল খাতির কত।

বাবুলাল নাকি মহতোগিন্নীর কাছে বলেছে যে, চেরমেন সাহেব সফরে যাওয়ার সময় হাওয়াগাড়ি থামিয়ে রাস্তায় ঢোঁড়াইকে জেরা করেছেন। ঢোঁড়াই জেরার খুব ভাল জবাব দিয়েছে। বাবুলাল সঙ্গে ছিল সেই হাওয়া গাড়িতে। সেই কথাই মহতোগিন্নী শোনাচ্ছিলেন ঢোঁড়াইকে। ঢোঁড়াইয়েরও এ প্রসঙ্গে উৎসাহ কম নয়। মহতোগিন্নীর সম্মুখে তার ছিল একটা সংকোচ ভাব। কিছুক্ষণের জন্য ঢোঁড়াই এ ভাব ভুলে যায়। তাকে ধাঙড় পাওনি যে চেরমেন সাহেব জেরায় হারিয়ে দেবে! এতদিন তাহলে জাতের 'বুজুর্গ'দের২ কাছ থেকে সে কি কেবল 'পাটকাঠি ভাঙতে' শিখেছে। দলের মধ্যে বয়স কম দেখে, তাকেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। এমন 'মুহ্‌তোড়'৩ জবাব দিয়েছে যে বাছাধনের চিরকাল মনে থাকবে।…আনন্দে গুদরের

---

১ একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছে।

২ বড়দের, গুরুজনদের।

৩ মুখ ভাঙা ; কড়া আর উপযুক্ত উত্তর।

মা'র কাতলা মাছের মতো মুখ থেকে কালো দাঁত দুপাটি প্রায় বেরিয়ে আসে। হঠাৎ তার ঢোঁড়াইকে নুন দেওয়ার কথা মনে পড়ে। ঢোঁড়াইয়ের পাতার পাশেই মাটির খুরিতে নুন রাখা হয়েছে।

'ওরে ফুলঝরিয়া ঢোঁড়াইকে একটু নুন দিয়ে যা।' ফুলঝরিয়া তাঁর মেয়ে। তার পায়ের দিকটা খুব সরু। হাতে খড়ম পরে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সে চলাফেরা করে।

থাক, থাক, আমি নিজেই নিচ্ছি—বলে ঢোঁড়াই খুরিটা থেকে নুন নেয়।

'নিজে নেবে কেন। কী যে বলে আমার 'বাচ্চা' তার ঠিক নেই! ফুলঝরিয়া কি আর এখন সেই ছোট আছে।' এই কথা বলে মহতোগিন্নী নিজের মেয়ের বয়স সম্বন্ধে মেয়ের সম্মুখেই এমন একটি নির্লজ্জ ইঙ্গিত করে যে ফুলঝরিয়া ও ঢোঁড়াই দুজনই লজ্জা পায়। খট্ খট্ করে উঠোনে খড়মের শব্দ হয়। দূরে চলে যাচ্ছে শব্দটা—ফুলঝরিয়া বোধ হয় বাইরে গেল। তার শরীরের উপরের দিকটা অস্বাভাবিক রকমের পুষ্ট।

'ওরে ফুলঝরিয়া! কোথায় গেলি আবার। লজ্জা হয়েছে বুঝি। কোথা দিয়ে যে পরমাৎমা কী করেন, কী রকম যোগাযোগ ঘটান, বোঝা শক্ত। কাকে চালের খাপরা উল্টে দেয়, আর তার থেকে চলে ঘরামির রোজগার। তবে সব জিনিসের সময় আছে। তার খেলাপ হওয়ার জো নেই। জিয়লের ডাল বর্ষাকালে লাগাও, পচে যাবে; আর চোৎবোশেখে পোঁতো শুখনো ধুলোর মধ্যে তাও লেগে যাবে।' 'এ একটা কথার মত কথা বলেছ গুদরীমাই।' হটাত মহতোর গলা শুনে ঢোঁড়াই চমকে ওঠে,—ও তাহলে উঠোনেই আছে। এতক্ষণ সাড়া দেয়নি। মহতোই নিশ্চয়ই তাহলে গুদরের মাকে দিয়ে এই সব করাচ্ছে। গুদরীমাই ডাকসাইটে মেয়েমানুষ ঠিক, কিন্তু এত খাওয়ানো-দাওয়ানো, এত সব, এ মহতোর মতো মাথাওয়ালা লোক পিছনে না থাকলে, একা গুদরীমায়ের দ্বারা সম্ভব হত না। বাবুলালও হয়তো আছে এর ভিতরে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। সেই জন্যই না চেরমেন সাহেবর জেরা করার গল্প করেছে। দুখিয়ার মা-টাও থাকতে পারে এর মধ্যে। তিনিও থাকেন সর্বঘটে। 'এ শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা, ও শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা, দুনিয়ার শিউজীর মাথায় জল ঢালা' তার চাই-ই চাই১।

ঢোঁড়াই অনেক দিন আগেই মহতোগিন্নীর এত আদর যত্নের উদ্দেশ্য বুঝেছে। সে ধরাছোঁয়া দিতে চায় না।

'আর চারটি ভাত নেবে না? ওকি ছাই খাওয়া হল? এই জোয়ান বয়সে ঐ চারটি ভাতে কি হবে; এই ফুলঝরিয়া আমলকির আচার দিয়ে যা! ও মেয়ের আবার বুঝি লজ্জা হয়েছে। সর্ষে দিয়ে নিজে হাতে আচার করেছে আমার মেয়ে। কোথায় গিয়ে সে মেয়ে বসে থাকল এখন কে জানে। নিজে আচার তৈরি করে, নিজেই দিতে ভুলে গেল। কী যে আমার কপালে ভগবান লিখেছেন কে জানে। গুদরের বাপ আবার সেদিন বলেছিল যে সরকার নতুন কানুন করছে—মেয়ের বিয়ে, তিন ছেলের মা হওয়ার বয়স না হওয়া পর্যন্ত, হতে দেবে না। দিলেই কালাপানির সাজা। ঘোর কলি! এও চোখে দেখতে হল, কানে শুনতে হল। রতিয়া, রবিয়া, বাসুয়া

১ স্থানীয় ভাষায় এর অর্থ—সর্বঘটে বিরাজমান থাকা। আবশ্যক অনাবশ্যক সব কাজেই হাত দেওয়া এবং কোনো কাজই ঠিক করে না করা।

সবাই কোলের মেয়ের পর্যন্ত বিয়ের ঠিক করে ফেলেছে। ভগরাহা থেকে আমার ভাই সেদিন এসেছিল ; সে বলল যে সেখানে একজন মুসলমানের বাড়ি একটা বিয়ে হয়েছে, যখনও দুজনেই এখনও পেটে।

মহতো উঠোন থেকেই ঠাট্টা করে, তোমার ভাইয়ের তো কথা।

আমার ভাই কি মিছে কথা বলেছে। সকলকে নিজেদের মতো মনে কোরো না।

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার ভাই এত সত্যবাদী যে মুখ দিয়ে যে কথা বার করে, তা ফলে যায়। এখন ঐ পেটের দুটোই যদি মেয়ে হয়, কি দুটোই যদি ছেলে হয় তাহলে ? তোমাদের গাঁয়ে ও রকম বিয়েও চলে নাকি ?

মহতোগিন্নী ভাইয়ের কথা সরল মনে বিশ্বাস করেছিল। সে অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'আচ্ছা ও কথা যেতে দাও, রবিয়া আর বাসুয়া কোলের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে কিনা ? এখন আমার বরাতে কী আছে জানি না। আমরা তো ধাঙড় না যে সোমত্ত মেয়ে ঘরে রাখব ; আর যেসব গরীবগুলোর টাকার অভাবে বনে জোটে না, সেগুলো পদ নজর দেবে তার উপর।…'

মোড়াই উঠে পড়ে। মহতো নিজে তার হাতে জল ঢেলে দেয়।১

'ফুলঝরিয়া ! ও ফুলঝরিয়া। সকড়ি কি তুলতে হবে না ?'

ফুলঝরিয়া তখন বাড়ির পিছনের কলার ঝাড়ের পাশে বসে আকাশ পাতাল ভাবছে। …কী পাপই না সে আগের জন্মে করেছিল। তারই উপর গোঁসাইয়ের যত আক্রোশ। কোন পাপ সে করেছিল জানে না। তবে কেন সে হাতে খড়ম প'রে থাকবে ? কেন অন্য দশজনের মতো সে চলতে ফিরতে পারে না ? তাৎমাটুলির অন্য মেয়েরা বলে যে সে রূপের গরবে গত জন্মে 'শিউজী'কে২ লাথি মেরেছিল, তার বাবা বলে যে সে মরদকে দিয়ে নিশ্চয়ই পা টিপিয়েছিল আগের জন্মে। ছি ছি ছি ছি ছি ! কেন তার দুর্মতি হয়েছিল। মরদে টিপবে ঝোটাহার পা ! শিউজীর মাথায় সে মারতে গিয়েছিল লাথি ! শাস্তিই তার হয়েছে। রেবণগুণী কিন্তু বলে অন্য কথা। সে বলে যে ঠিক যেখানটায় সে জন্মায় সেই জায়গাটায় মাটির নিচে নিশ্চয়ই কালো বিড়ালের হাড় আছে। জন্মানোর ছ'দিনের মধ্যে কাঁকড়াবিছে ভাজা সরষের তেল, ঐ পায়ে মালিশ করতে পারলে; তবে ঐ বিড়ালের হাড়ের দোষ কাটাতে পারত। তা সে সময় তো আর মা বাবা রেবণগুণীকে দেখায়নি। দেখায় ছ'মাস পরে। তখন আর দেখিয়ে কী হবে। তার বাবাকে ভাগপরবাহার বৈদজী৩ বলেছিল যে এখনও যদি সদ্য মরা বুড়ো শিয়ালের পেট চিরে, তার গরম গরম নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পা ঢুকিয়ে বসতে পারা যায়, তাহলে অনেকটা উপকার পাওয়া যেতে পারে। তা ফুলঝরিয়ার বাবা আজ পর্যন্ত একটাও শিয়াল ধরার ব্যবস্থা করতে পারল না। এতদিন ফুলঝরিয়ার মনে আশা ছিল যে পঙ্গু হলেও তার বিয়ে হয়েই যাবে। কেননা কে না জানে যে তাৎমাদের বিয়েতে মেয়ের বাপ টাকা পায় ; আর এই টাকার জন্য কত গরীব তাৎমা বিয়ে করতে পারে না, বহুদিন পর্যন্ত। তার বাবা টাকা যদি না চায়, তাহলেই দুটো রাঁধা ভাত পাওয়ার লোভে, কত মরদ তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে। কিন্তু এ

১ আঁচানোর জল ঘটি থেকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নিজে ঢেলে নেওয়া, বাড়ির লোককে অপমান করা বলে গণ্য হয়।

২ মহাদেব ঃ শিবলিঙ্গ।

৩ হাতুড়ে ডাক্তার।

কি 'সরাধ'-এর কানুনের১ কথা শোনা যাচ্ছে কিছুদিন থেকে। মেয়ের বাপ হয়েও খোসামোদ করতে হবে ছেলের বাপকে? ছোট ছোট মেয়ের বাপরা তাৎমা হয়েও বরের বাপের দুয়োরে ধন্না দিচ্ছে। ঘেন্নার কথা,—টাকা পর্যন্ত দিতে তৈরী মেয়ের বাপ; টাকা! বুচকুনিয়ার বাপ তো তিন বছরের বুচকুনিয়াটার বিয়ের জন্য অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছ থেকে কর্জই করে ফেলল! তাকে দোষই বা দেওয়া যায় কী করে? সে বেচারা কালাপানি থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছেলের বাপকে টাকা দিয়েছে। এখন এই 'হাওয়ায়' কে আর ফুলঝরিয়াকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই 'সরাধ'-এর কানুন সত্যিই তারই 'সরাধ'-এর (শ্রাদ্ধের) জন্য হয়েছে। আজ যে রোগা, কাল সে মোটা হতে পারে; আজকের ছোট, কাল বড় হতে পারে; কিন্তু হাতে খড়ম পরা মেয়ে কোনোদিনই পায়ে চলতে পারবে না—হাজার শিয়ালের পেটে পা ঢুকিয়ে বসে থাকো। এখনও কি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? না হলে সরকার আবার তাকে শাস্তি দেবার জন্য এ 'সরাধ'-এর কানুন করছে কেন? সরকার তুমিও তো ভগবান। তোমারই দয়ায় রেলগাড়ি, হাওয়াগাড়ি চলে। মহাবীরজীর মতো তোমার তাকৎ; চেরমেন সাহেব তোমার 'খাশ্বাস'২। অত ক্ষমতা যার, তার ফুলঝরিয়ার মতো সামান্য লোকের উপর রাগ কেন?

তার চোখে জল আসে···

'এ গে ফুলঝরিয়া! চেঁচিয়ে যে আমার গলা ফাটল, কথা কি কানেই যায় না। বিয়ের কথাতেই মাচার উপর পা উঠল নাকি?'

পা তুলবার ক্ষমতাও যদি তার থাকত,—ফুলঝরিয়ার দু চোখ ফেটে জল এসে গিয়েছে। মাকে দেখে সে চোখ মুছে নেয়। দেখে ফেলল নাকি মা?

'এত মাকড়সার জাল এই কলা গাছের দিকে; দেখা যায় না অথচ চোখেমুখে লেগে যায়। আজ সকালেও ছিল না। মাকড়সার জাল নাকে লাগলে বড় চুলকোয়; না মা?'

## রামিয়া কাণ্ড

### তাৎমানীদের 'ধানকাটনী'র রাজ্যে যাত্রা

কার্তিক অঘ্রাণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার কিছু অনিশ্চিত হয়ে আসে। ঘরামির কাজ কমে যায় অথচ কুয়ো পরিষ্কার করার কাজ তখনও আরম্ভ হয় না। বোধ হয় সেই জন্যেই তাৎমা মেয়েরা অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে। তারা ফিরে আসে পৌষের শেষাশেষি। পুবেই যায় বেশি,—মায়সী, জামৌর, রুৎবা থানাতে। ওদিকে রোজগার বেশি, 'বাঙ্গাল মুলুকের' কাছে কিনা, সেই জন্য; কিন্তু রোজগার বেশি হলে কী হয়, 'পানি বড্ডা লরম আওর বড্ডা বুখার'৩। তার উপর ওদিকে 'মিয়া' বেশি৪। সব সময় 'জাতপাঁত' বাঁচিয়ে চলাও শক্ত, ঐ 'পাট আর পানির' দেশে। তাই অধিকাংশ বছরেই তাৎমা মেয়েরা যায় পচ্ছিমের কমলদাহা, বড়হড়ী, ধোকড়ধারা এই সব থানায়। এসব জায়গার জল ভাল 'আধাসের সাতু হজম করতে আধা ঘণ্টা।' বড় খিদে পায়

১ 'সর্দা' আইনের বিকৃত উচ্চারণ। 'সরাধ' কথাটির শব্দগত অর্থ শ্রাদ্ধ।

২ চাকর। ৩ জল বড় খারাপ আর ম্যালেরিয়া।

৪ মুসলমান বেশি।

এই যা মুশকিল। কিন্তু গেরস্তরা ভাল লোক। যে মজুরনী কম খায় তাকে তারা কাজে নিতে চায় না ;—বলে যত 'পুরুষের বিমারী সিমারী লোগ'১ ; এরা হজম করতেই পারে না, তার কাজ করবে কী ? তবে মজুরের চাহিদা পশ্চিমে কম ; তাই গঙ্গাজী, গোশীজী, কোশীজী পার হয়ে, মুঙ্গের আর ভাগলপুর জেলার হাজারে হাজারে মজুর মজুরনী এদিকে আসে 'ধানকাটনী'র সময়। তাদের মতো পরিশ্রম করতে তাৎমানীরা পারে না।

এই ধান কাটার সময়, মহতোর পরিবারের মেয়েরা আর দুখিয়ার মা ছাড়া তাৎমাটুলিতে আর কোনো তাৎমা মেয়েই থাকে না। সেই জন্য অঘ্রান পোষ মাসে বাড়ির সব কাজই তাৎমা পুরুষরা নিজ হাতে করে। এই সময় পাড়ায় নেশা ভাঙের মাত্রা বেড়ে যায়। 'ধানকাটনী'র দল দেড় মাস পরে ফিরে এলে প্রতি বারই পুরুষদের এই সময়ের কৃতকর্মের ফিরিস্তি, মহতোগিন্নী, পাড়ার মেয়েদের শুনিয়ে দেন ; ঝোটাহারা তখন নতুন আনা ধানের মালিক ; ধরাকে সরা জ্ঞান করে। প্রতি সংসারে ঝগড়া-বিবাদ বেশ জমে ওঠে। বাড়ির কর্তাই নিচু হয়ে, এই দুমাস 'ঝোটাহা'দের খোসামোদ করে। তাই তাৎমাটুলির মেয়েরা বলে—'কখনও নৌকার উপর গাড়ি, কখনও গাড়ির উপর নৌকা। দশ মাস পুরুষ রাজা, তো দুমাস মেয়েরাও রাজা।'

তাৎমাদের বছরখানেক থেকে দিন বড় খারাপ যাচ্ছে। কাজ পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার আনা তো মজুরি ; তাই দিতেই আবার বাবুভাইয়াদের তম্বি কত ! চাল, শুনতেই চার পয়সা সের ; কিন্তু সস্তা জিনিসের দাম তো দিতে হবে। ঐ চারটে পয়সাই আসে কোথা থেকে, সে খবর কি বাবুভাইয়ারা রাখে। খেতে গেলে পরনের কাপড় নেই, পরনের কাপড় কিনতে গেলে উপোস করে থাকতে হয়। পাক্কীতে কাজ করার সময় ঢোঁড়াইরা প্রত্যহ দেখে যে, পাট বোঝাই করা গরুর গাড়ির সার ফিরে চলেছে ; জিরানিয়া বাজারের গোলাদাররা আর কিনতে চায় না। তাৎমাটুলির সাঝের পর বাবুভাইয়া আর বাজারের লোকদের আনাগোনা বেড়ে যায়। ধাঙড়রা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, এবার দেখছি 'গোসাই থানে' বেলফুলের মালা বিক্রি হবে। 'ঝোটাহা'দের ঝুটিতে তেল পড়ছে দেখিস না ?

'পচ্ছিমের' ভর্সড়ে লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের 'গুরুজী' থাকে গ্রামের বাবুদের বাড়ি। সেখানেই বাবুদের ছেলে পড়ায়, খায়দায়, মোসাহেবি করে, ফাইফরমাস খাটে, মোকদ্দমার তদ্বির করে, চিঠি লিখে দিয়ে। সে এসেছিল জিরানিয়ার চেরমেন সাহেবের কাছে, ভর্সড়ের বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ; তার বদলির হুকুম রদ করাতে। বাবু চেরমেন সাহেবের পুরনো মক্কেল। চেরমেন সাহেব জিরানিয়ায় ছিলেন না। বাবুলাল চাপরাসী তাদের নিয়ে যায় কেরানীবাবুর বাড়ি। ঘিয়ের ভাঁড় আর কলার কাঁদি উঠোনে রেখে সে কেরানী সাহেবকে ডাকে। এক মিনিটের মধ্যে গুরুজির কাজ হয়ে যায়। এর জন্য আবার রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, এই 'দেহাতী' দুটো ; বাবুলাল মনে মনে হেঁসেই বাঁচে না। ভর্সড়ের বাবুসাহেব বাবুলালের হাতেও একটা টাকা দেন। বাবুলাল বলে মোটে এক টাকা ?

ধান ঘরে আসুক। বিক্রি করে তারপর টাকা দেব। এখন টাকা কোথায়, গেরস্তর কাছে ?

বাবুলাল এসব শুনতে অভ্যস্ত ; কাজ হবার পর আবার কেউ টাকা দেয় ?

---

১ পূর্বের রুগ্ন লোক।

'আচ্ছা 'ধানকাটনীর' লোক তোমরা নাও কোথা থেকে ?'

'এবার আবার লোকের অভাব ? কবে থেকে লোকেরা ঘোরাঘুরি করছে।'

'আমার টোলার লোক নাও না।

গুরুজি 'চেরমেন সাহেবের' চাপরাসীকে চটাতে রাজী নন—ভবিষ্যতে আবার এ শয়তানটার দরকার হতে পারে।

'তা, দিও, জন চল্লিশেক।'

তাৎমাটুলির বর্ধিষ্ণু লোক বাবুলাল। উর্দি পাগড়ি পরবার অধিকার পেয়েছে সে ভগবানের কৃপায়! সে নিজের জাতের জন্য এটুকুও করবে না ? আজকে এ অভাব অনটনের দিনে, এ একরকম রামজির ছাপ্পর ভেঙে দান বলতে হবে! কার্তিক মাস শেষ হতে চলল এখন পর্যন্ত তাৎমাটুলিতে ধানকাটনীর জন্য কোনো জায়গা থেকে ডাক আসেনি। এবার গেরস্তরা ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই রাখবে নাকি ? এই হতাশার মধ্যে ভর্সাড়ের খবরে, পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়! ধন্যি ধন্যি করে সকলে বাবুলালের; ঠেকারে দুখিয়ার মা'র মাটিতে পা পড়ে না। তার দেমাক আরও বেড়ে যায়, যখন সে দেখে যে, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে এবার মহতোর স্ত্রী আর খোঁড়া মেয়েও 'ধানকাটনী'তে যাচ্ছে।

যাওয়ার সময় মহতোগিন্নীর মাথার উপরের উদুখলটিতে, দুখিয়ার মা কচুপাতায় মুড়ে খানিকটা তামাক দিয়ে বলে, ভালয় ভালয় সব কটাকে ফিরিয়ে এনো গুদরের মা।'

মরমে মরে যায় মহতোগিন্নী। তবুও জবাব দেয়, 'হাঁ, সেই জন্যেই তো যাচ্ছি এদের সঙ্গে।'

দূর থেকে রতিয়া ছড়িদার চেঁচায়—'এসো না সকলে, এখনও মেয়েদের এত কি গল্প তা বুঝি না।

যাওয়ার পথে সকলে গোঁসাই থানে প্রণাম করে যায়।

'ধানকাটনীর' সময় একেবারে মেলা বসে গিয়েছে ভর্সাড়ের 'চাঁপ' এর[১] ধারে। সিরিপুর, ভর্সাড়, সোনাদীপ, কেমৈ এই চার গাঁ জুড়ে এক চকে নিচু জমিতে ধানের ক্ষেত। ধান হয়েছেও তেমনি;—শীষের ভারে শুয়ে পড়েছে গাছগুলো; কোথাও আল দেখা যায় না। উঁচু জায়গাগুলিতে কাটা ধানের সোনালী পাহাড়। তারই আশেপাশে মানুষ ঢুকতে পারে এইরকম ছোট ছোট খড়ের টোপর খাড়া করা হয়েছে, সারির পর সারি। রাতে যা হিম পড়ে! পোয়ালের পাহাড়ের 'ঘুর'[২] জ্বালালেও কিছুতেই আর কান গরম হতে চায় না[৩]।

ভর্সাড়ের বাবুদের ধান কাটতে এবার এসেছে দুদল লোক; একদল মুঙ্গের জেলার তারাপুর থেকে, আর একদল তাৎমাটুলি থেকে। সব মিলিয়ে প্রায় সত্তর জন লোক, —পুরুষ মাত্র জন দশেক।

ভর্সাড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই গান গাইতে গাইতে দোকান গলায় ঝুলিয়ে পান-ওয়ালা পৌঁছয়—'টিকিয়া, তামাকু, পান।' ধানকাটনীর অস্থায়ী গাঁগুলোয় এরা ঘুরে

১ দহ।

২ আগুন পোয়াবার স্থান।

৩ কানেই এদেশের লোকের ঠাণ্ডা লাগে সবচেয়ে বেশী। সেইজন্য শীতকালে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ঢাকা থাকুক না থাকুক, কানটি ঢাকা চাই-ই।

বেড়ায়, বিড়ি, খয়নি, তামাক, পান, সুপারি, সাবান, আরও কত জিনিস বেচতে। এ ছাড়া অন্য পেশাও আছে এদের এই ধানকাটনীর মেয়েদের মধ্যে।

পানওয়ালারা গান গেয়ে লোক জমিয়ে তারপর সওদা বেচে। কিন্তু তাৎমারা এই তো সবে এসেছে ; ধান কাটা আরম্ভ করবে, তবে না তাই দিয়ে জিনিস কিনবে।

'অবকী সমৈয়া ধিরজা ধরৌনি গে বেটী
নহী উপ্ জল্ ছেই পাটুয়া ধান,
কি রঙ্গ কে করবৌ বীহা দাম
অবকী সমৈয়া ধিরজা ধরৌনি গে বেটী।'

( এবারটা ধৈর্য ধরে থাক মেয়ে। পাট ধান জন্মায়নি কেমন করে বিয়ের খরচ করব )।

তাৎমা মেয়েরা সকলে পানওয়ালাকে ঘিরে বসে। এমন গান যে গাইতে পারে তার সঙ্গে কি আলাপ জমাতে দেরি লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই, এই ধানের রাজ্যের সব খবর পানওয়ালা তাদের জানিয়ে দেয়।

—ভর্সড়ের বাসিন্দে ধানকাটনীর লোকেরা নাকি সব চলে গিয়েছে এবার সিরিপুরে কাজ করতে। দু'একটা 'ডালার বেগুন'১, কেবল ভর্সড়ে আছে—কখনও এদিক থেকে গড়িয়ে ওদিকে যায় সেগুলো, কখনও ওদিক থেকে গড়িয়ে এদিকে আসে। এবার ধান রোপার সময়, সিরিপুরের বাবুরা প্রত্যেক মজুর মজুরানীকে জলপান-এর সঙ্গে হয় লঙ্কা, না হয় পেঁয়াজ দিত! তাই নিয়ে ভর্সড়, কেমৈ, আর সোনদীপের বড় গেরস্তারা মিটিং করে। কত বোঝায় সিরিপুরের বাবুকে, পেঁয়াজ লঙ্কা বন্ধ করবার জন্য—পরের পুরুষের লোকেরা তোমায় দোষ দেবে। গেরস্তরা মরে যাবে এতে, যা চলে আসছে তার বিরুদ্ধে যেও না, ওদের তো চেনো না—পেঁয়াজ লঙ্কা দেবার রেওয়াজ হয়ে যাবে। একবার যে গাছে বক বসে সে গাছকে খরচের খাতায় লিখে রেখে দাও।২ কিন্তু সিরিপুরের বাবুও 'হিম্মৎওয়ালা' লোক—মরদের কথা আর হাতির দাঁত ; টস্ থেকে মস্ হবার জো নেই সেখানে।৩ সেই সিরিপুরে বাবুর লঙ্কা-পিঁয়াজের উদারতার কথা মনে রেখে, কাছাকাছির যত মেয়েছেলে গিয়েছে সেখানে কাজ করতে। আরও কত খবর বিরজু পানওয়ালা শোনায়।

গুদরের মা বলে, 'তাই বলি! এই জন্যই ভর্সড়ের বাবু বাবুলাল চাপরাসীর কথা রেখেছে। শুনলে তো? আর তাই নিয়ে দুখিয়ার মা'র ঠেকারে মাটিতে পা পড়ে না।'

সব তাৎমানীরই নীরব সমর্থন আছে এই কথায়। বিরজু পানওয়ালা লোক চেনে। মহতোগিন্নীকে দিয়েই তার কাজ হবে।

## ধান্যক্ষেত্রে রামিয়ার দর্শন লাভ

অদ্ভুত এই 'ধানকাটুনী'র রাজ্য। নতুন পোয়াল আর পচা পাঁকের গন্ধে ভরা

১ হিন্দী প্রতিশব্দ—'ভাগরেকা বৈগন'।

২ জিস গাছপর বগুলা বৈঠে, জিস দরবারমে-মৈথিল পৈঠে অর্থাৎ যে গাছে বক বসেছে, আর যে দরবারে মৈথিল ঢুকেছে, তা গেল বলে।

৩ বিন্দুমাত্র নড়চড় হওয়ার জো নেই।

দহের ধার রোজ রাতে কুয়াশায় ঢেকে যায়। আগুনের 'ঘুর'-এর ক্ষীণ আলোয়, কারো মুখ চেনার উপায় নেই, অথচ কাটা ধানের পাহাড়ের উপর তাদের ছায়া নড়ে। সোনার পাহাড়গুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো হাতির মতো দেখতে লাগে। ধানখেগো হাঁসগুলোর ডাক হঠাৎ ছোট ছেলের কান্না বলে ভুল হয়। খড়ের গাদার মধ্যে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে রাতে ঘুমুতে হয়। জলের মধ্য দিয়ে 'পানডুব্বী' ভূত১ রাতদুপুরে ছপ্‌ছপ্‌ করে চলে বেড়ায়—সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দহের উপর 'রক্‌স্‌' ভূত২ আলো জ্বালিয়ে হাতছানি দেয়—এই এখানে, তো পরের মুহূর্তে 'হুই-ই ই' সাঁওতালটুলির ধারে চলে গিয়েছে। 'ঘুর-এর ধারে গল্প জমে ওঠে। সব তাৎমার অভিজ্ঞতা একই রকম,—রাতে যখন সে মাঠে গিয়েছিল, তখন তাকে একটা মেয়ে ইশারা করে সঙ্গে যেতে বলে। দেখেই বোঝা গিয়েছে যে মেয়েটা 'শাঁখড়েল'৩। তার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় সে ঐ পুরের শিমুল গাছটায় উঠে গেল। সকলের গা ছম্‌ছম্‌ করে।

একে এই বিচিত্র পরিবেশের আবেদন, তার উপর মহতো নায়েবদের নাগালের বাইরের জায়গা এটা। 'ধানকাটনী'র দল তাই এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অন্য অন্যবার দলের গিন্নীপনা করত রতিয়া ছড়িদারের স্ত্রী। এবার মহতোগিন্নী এসে পড়ায় পদমর্যাদার দাবীতে তিনিই ধানকাটনীর গাঁয়ে সর্বেসর্বা হয়ে যান। বাইরের লোকের সঙ্গে দলের তরফ থেকে কথাবার্তা চালায় রতিয়া ছড়িদার।

এই একমাসের শিবিরের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সবই তাৎমাটুলী থেকে ভিন্ন। সামাজিক বাধানিষেধ এখানে শিথিল; জাত-পাঁত-এর বিচার কম; যে বেশি ধান কাটতে পারে, সবাই তাকে হিংসা করে; যে মেয়ের যৌবন আছে তার রোজগারের অভাব নেই; যে পুরুষের বয়স আছে, মেয়েদের কাছে তার কদর আছে; এখানে তার সাতখুন মাপ।

কোনো সংস্কারের বালাই থাকলে কি এত লোক থাকতে গুদরের মা'র আলাপ হয় মুঙ্গের তারাপুর দলের রামিয়ার মা'র সঙ্গে। বেশ সুশ্রী চেহারা রামিয়ার; ভাল নাম রামপিয়ারী। তাদের লোকের কাছ থেকে তাৎমাটুলির দল প্রথম কানাঘুষো খবর শোনে রামিয়ার মা'র সম্বন্ধে। সে ছিল ব্যাজির বাড়ির দাই'৪—দাই কথাটার উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে, মুখে হাসির ইঙ্গিত এনে তারা বলে। না হলে তাৎমানীরা আবার ঝিগিরি করে নাকি? তার স্বামী ছিল পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কয়েক বছর আগে মরেছে। গত বছর ব্যাজীও মারা গিয়েছে।

'ধানকাটনী'র পরিবেশে এমন রসালো খবরও মোড়লগিন্নীর মনে উল্লাস জাগায় না। তার উপর 'রামিয়ামাই'টা৫ এত ভালমানুষ। সব সময় কুণ্ঠিত থাকে—একটু দোষী-দোষী ভাব, অথচ কোনো কথা লুকানোর চেষ্টা নেই। মহতোগিন্নীর মায়া হয় তার উপর। অন্য জায়গার সমাজের লোক সে; তার চালচলনের নাড়ী-নক্ষত্র দিয়ে তাৎমাটুলির লোকের দরকার কি? তারাপুরের দল থাকে এখান থেকে 'রশি'-খানেক দূরে। রামিয়ামাইয়ের উখলিটা থাকে এখানে—তাৎমার দলের মধ্যে। রোজ রাতে উখলিতে ধান ভানতে রামিয়ামাই আর মহতোগিন্নীতে কত সুখদুঃখের

১ জলে ডুবে মরলে এদেশে 'পানডুব্বী' ভূত হয়। এই ভূতেরা সারারাত জলের মধ্যে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করে হাঁটে। ২ আলেয়া।

৩ এক শ্রেণীর পেত্নীর নাম। এরা পুরুষ দেখলে ডাকে।

৪ ঝি। ৫ রামিয়ার মা।

কথা হয়। দুজনেরই আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে হয়েছে যত সমস্যা।

'আমার রামিয়ার পা খোঁড়া না হলে কী হয়; তার বিয়ে নিয়েও মুশকিলে পড়েছি। তুমি তো বহিন তোমার কপালকে দোষ দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছ, আমার তো সে উপায়ও নেই। আমার কপাল তো আমি নিজেই পুড়িয়েছি।'

বলেই রামিয়ামাই বুঝতে পারে যে ফুলঝরিয়ার খোঁড়া পায়ের কথাটা তোলা উচিত হয়নি, দুজনেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আবার গল্প জমে উঠতে কিছুক্ষণ সময় লাগে।

'ঐ পোড়ারমুখো পানওয়ালাটা এসে রামিয়ার কথা পেড়েছিল। ভর্সাড়ের বাবু বোধ হয় পাঠিয়েছিল তাকে। দিয়েছি তার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। তারই জবাবে দাঁত বের করে বলে কিনা—সব কেচ্ছাই জানি তোমার, মেয়ের বেলায় এত সতীপনা কেন? হারামজাদা! ধোঁদলের বিচির মতো তার দাঁতগুলো ইচ্ছে করে এক থাবড়ায় ভেঙে দি।'

মহতোগিন্নীর কাছে বিরজু পানওয়ালার স্বভাব অজ্ঞাত নয়। ঐ দালালটার কাছ থেকে সে প্রায় দু'টাকার জিনিস মাগনা পেয়েছে। অন্য অন্য বছর এই রোজগারটা করত ছড়িদারের বৌ। ঐ তো রবিয়ার বৌ আর হরিয়ার বৌ চলেছে দহের দিকে, এত রাতে। রামিয়ার মা টা আবার বুঝতে পারল নাকি? বোঝে নিশ্চয়ই সব।

খড়ের গাদা থেকে রামিয়া আর ফুলঝরিয়ার হাসির স্বর ভেসে আসে দুই মায়ের কানে; একেবারে হেসে ফেটে পড়ছেন দুই সখীতে। যাক ফুলঝরিয়াও তাহলে হাসতে জানে।

শুনে ফেলেনি তো ওরা আমাদের কথা?

না, এতক্ষণ 'উখলি-সামাট'-এর শব্দে নিজেরাই নিজেদের কথা প্রায় শুনতে পাচ্ছিলাম না, তার ওরা শুনবে।

ফুলঝরিয়ারও বেশ লাগে রামিয়াকে। কী পরিষ্কার-ঝরিষ্কার থাকে রামিয়াটা; কাপড় চোপড় দুখিয়ার মা'র চাইতেও 'সাফসুৎরা'১। প্রত্যেক সপ্তাহে ওরা বিরজু পানওয়ালার কাছ থেকে আধ কাঠা ধানের কাপড়কাচা সাবান কেনে। ফুলঝরিয়া এর দেখাদেখি সাবান কেনার কথা তুললে, তার মা তাড়া দিয়ে ওঠে। 'রামিয়ার কাছ থেকে এই সব কিরিস্তানি শেখা হচ্ছে। তুই কি নাচওয়ালী নাকি যে হপ্তায় হপ্তায় পরিষ্কার করতে হবে। কত ধান রোজ ক্ষেত থেকে খুঁটে তুলিস, সেইটা আগে হিসাব করিস, তারপর সাবান কেনার কথা ভাবিস। একটানা বসে ধান কাটবার তো মুরোদ নেই। কাটবার সময় 'সিপাহী'র২ নজর এড়িয়ে, দু-চারটে করে ধানের গোছা তোর জন্যে আমরা ছেড়ে দি, তাই কুড়িয়ে তো চলে তোর পেট, আবার কাপড়ে সাবান দেবার শখ! কেউ ফিরেও তাকাবে না তোর দিকে, যতই কাপড়ে সাবান দিস না কেন…'

ফুলঝরিয়া সকলের কথাতেই তার অঙ্গহীনতার প্রতি ইঙ্গিতের আভাস পায়। তার মা সুদ্ধ তাকে ছেড়ে কথা বলে না। তার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। কিন্তু এই জলকাদা হিম কুয়াশার দেশে, কারও চোখের পাতা ভিজল কিনা, তা দেখবার সময় নেই তাৎমাদের।

তবু বেশ লাগে তার রামিয়াকে। চোখেমুখে কথা রামিয়াটার। কথা বলবার

---

১ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

২ জমির মালিকের চাকর।

সময় হেসে ফেটে পড়ে। গান ছড়া সরস গল্প তার জিবের ডগায়! দুনিয়ার কারও তোয়াক্কা রাখে না। একটুও ভয়ডর নেই তার মনে। সব ভাল, তবু ফুলঝরিয়ার মনে হয়, রামিয়ার একটু যেন গায়ে পড়া ভাব; ধানকাটনীর গাঁয়ে এ জিনিস চলে, কিন্তু নিজের গাঁয়ে এ জিনিস চলবার নয়। হয়তো বা 'পশ্চিম'-এর গাঁয়ের শিক্ষা-দীক্ষাই এই রকম। কত দূরে তারাপুরে তার বাড়ি, মুঙ্গের জেলায়। এত দূরের কোনো লোকের সঙ্গে, এর আগে ফুলঝরিয়ার কথা বলার সুযোগ হয়নি। ওদের দেশের ভাষার টান আবার এমন যে শুনলেই হাসি আসে! কী রসিয়ে যে সে অন্যের নকল করতে পারে। 'মালিকের সিপাহী' রামনেওরা সিং লম্বা জুলফি চুলকোতে চুলকোতে কেমন করে চোখ-ইশারা করে, তারই নকল করছিল রামিয়া এখন; একেবারে হাসতে হাসতে 'নাখোদম'১ হয়ে যেতে হয়।

সেই হাসির স্বরই গিয়ে পৌঁছেচে মায়েদের কানে।

'ওরে ও রামিয়া, আজ কি আর বাড়ি যেতে হবে না?'

'বাড়িই বটে', বলে রামিয়া বিদ্রূপ করে।

'আজ চাচী, ও এখানে থাকুক না।'

'না না না ফুলঝরিয়া, তা কি হয়?' রামিয়ার মা কারও উপর ভরসা পায় না।

'কাল রাতে আবার এসো'—যাবার সময় মোড়লগিন্নী বলে দেন।

খড়ের গাদার মধ্যে গা ঢুকিয়ে শুয়ে ফুলঝরিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে। বড় একা একা লাগে তার, এত লোকের মধ্যেও। ঢোঁড়াইটা কী যে মাটিকাটার কাজ পেয়েছে। ধানকাটনীতে এলে বাবুসাহেবের ইজ্জতে চোট লাগত। নিজের গোঁতেই গেলেন। যাক্ ভালই হয়েছে না এসে। যা একগুঁয়ে। হয়তো 'শাঁখড়েল' ডাকলেও তার সঙ্গে সঙ্গে শিমুল গাছের দিকে চলে যেত। .. এ কিসের শব্দ! কুকুর-টুকুর আঁচড়াচ্ছে নাকি খড়ের গাদা! চমকে উঠছে ফুলঝরিয়া। না হরিয়ার বৌ, পা টিপে টিপে এসে খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকেছে। তাই বলো!

## রামিয়ার মাতার দেহান্ত

সেদিন রাতে মহতোগিন্নীকে ঘিরে বসে তাৎমাটুলির দল জটলা করছে। আজ কদিন হল রামিয়ার মা এখান থেকে চলে গিয়েছে দেড় ক্রোশ দূরের কেমৈ গ্রামে, সেখানকার রাজপুতদের 'কামাত'২-এ ধান কাটতে। তা না হলে রাত্তিরে মহতো-গিন্নীকে কি আর পাওয়া যেত দলের মধ্যে। যাবার সময় রামিয়ার মা মহতোগিন্নীর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে গিয়েছিল—এ কটা দিন আর তোমাকে ছেড়ে যেতাম না বহিন; কিন্তু রামনেওরা সিং আর বিরজু পানওয়ালা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এখানে থাকলে মেয়েটাকে আর বাঁচাতে পারব না। কেমৈ-এর রাজপুতরা আর যাই হোক এদিক দিয়ে লোক ভাল শুনেছি।...

এ কথার পর মহতোগিন্নী আর রামিয়ার মাকে বারণ করতে ভরসা পায়নি। ধান-কাটনী শেষ হলে, দুদিন পরে তো ছাড়াছাড়ি হতই।

...হাটের দিন দেখা কোরো বহিন।

তারপর রামিয়ার চিবুকে হাত দিয়ে বলেন, 'মন খারাপ হবে আমার ফুলঝরিয়ার।'...

---

১ প্রাণ বেরিয়ে যায়।   ২ খামার।

তার পরদিন থেকে মহতোগিন্নী রোজ রাতে তাৎমাটুলির সকলকে নিয়ে আসর জমিয়ে বসেন।

গল্প জমে উঠেছে। কেমৈ-এর ওদিকে নাকি 'হৈজার বিমারী'১ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

'যা দেশ, লোকেরা ভয়-টয় পেয়েছিল বোধ হয় রাতে২। ভয় না পেলে কখনও 'হৈজা' হয়?

সকলে মিলে ঠিক হয় রাতে কেউ ভয় পেতে পাবে না। ভয় পাব পাব হলেই সকলকে জাগিয়ে আগুনের ঘুরের ধারে বসতে হবে।

মহতোগিন্নী রামিয়ামাইটার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন—বেচারির কোথাও গিয়ে স্বস্তি নেই—কেমৈ গেল, সেখানেও আবার অসুখ আরম্ভ হল।

নতুন একটা ঝগড়া ওঠায় এ প্রসঙ্গ তখনকার মতো চাপা পড়ে যায়।...একটা মাত্র কুপি জ্বালায় তাৎমাটুলির দলের লোকেরা। সবাই কুপিটাকে নিয়ে টানাটানি করে, কিন্তু মহতোগিন্নীই ওটাকে দখল করে থাকেন বেশি। এক একদিন এক একজনের তেল কিনবার কথা ধানের বদলে; আজ বিরজু পানওয়ালা তেলের দাম পায়নি। আজ ছিল রবিয়ার বৌয়ের পালা। সে সোজা বলে দিয়েছে যে, কুপিটা থাকবে মহতোগিন্নীর কাছে, আর তেলের দাম দেবে সে? ওসব ফুটানি মহতোগিন্নী যেন তাৎমাটুলিতে ফিরে গিয়ে ছাঁটে—'বড় বাড় বেড়েছিস রবিয়ার বৌ। কার সঙ্গে কি রকম কথা বলতে হয় জানিস না।'

মহতোগিন্নী বোঝে যে সকলের সহানুভূতি রবিয়ার বৌয়ের দিকেই। কাজেই সে আর কথা বাড়াতে দেয় না···আচ্ছা, যেতে দাও না ফিরে তাৎমাটুলিতে, তারপর মজা টের পাওয়াব। কিছু বলি না সেখানে তাই।···

'আচ্ছা তেলের দাম আমি দিয়ে দেব বিরজু।'

বিরজু পানওয়ালা হাসতে হাসতে চলে যায়।

পরদিন দুপুরে রামিয়া হঠাৎ একা এসে হাজির। তার চোখ দুটো ফোলাফোলা। আজ আর এসে হেসে ফেটে পড়ল না।

কী রে রামিয়া একা যে? তোর মা'র খবর কী?

রামিয়া হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। তার মা'র 'হৈজা' হয়েছিল রাতে মরে গিয়েছে। কেমৈ-এর ধান ক্ষেতে পড়ে আছে। ওখানকার দলের সকলে পালিয়েছে 'হৈজা'র ভয়ে। কাটা ধান পর্যন্ত নেয় নি কেউ। মারা যাবার আগে কী তেষ্টা! কী তেষ্টা! সারারাত ঠায় একা। এতক্ষনে কাক শকুনে নিশ্চয়ই ঠুকরোচ্ছে। মা বলে গিয়েছিল ফুলঝুরিয়ার মা'র কাছে আসতে···

তার কান্নার মধ্যে সব কথা বোঝাও যায় না।

তাৎমারা এ খবরে বিশেষ হৈ-চৈ করে না। মরাকে তারা মানুষের একটা অতি সাধারণ বৃত্তি বলে মনে করে। কিন্তু জানোয়ার মরা, আর মানুষ মরায় তফাৎ কী? কেবল কুকুর মরলে ডোমে ফেলবে, গরু মরলে পাড়ার মধ্যে তার ছাল ছাড়াতে পারবে না, আর মানুষ মরলে ভোজ দিতে হবে; এই তফাৎ।

তাৎমার দল বিরক্ত হয়ে ওঠে মেয়েটার উপর। মরার ছোঁয়া কাপড়-চোপড় পরে,

---

১ কলেরা।

২ এদের বিশ্বাস রাতে ভয় পেয়েই কলেরা হয়।

শিশিট ছুঁয়ে একাকার করবে মেয়েটা। যাক না ও মুঙ্গেরের দলের লোকদের কাছে। তা না গুদরের মা-ই হল বেশি আপনার লোক।

ভর্সড়ের বাবুর ছেলে, বিরজু পানওয়ালা, রামনেওরা সিং সকলেই খড়গহস্ত হয়ে ওঠে মেয়েটার উপর হঠাৎ। এই মেয়েটার দেওয়া রোগের খবরে আবার ধানকাটনীর দল ভয়ে না পালায়। তাহলে অর্ধেক ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই পড়ে থাকবে। এমনিই তো কেমৈ-এর রাজপুতেরা হয়তো ডিস্টিবোডে খবর দিয়েছে এতক্ষণ। ডিস্টিবোডের 'হৈজা'র ডাক্তার যদি এসে 'সুই'১ দিতে চায়, তাহলেই তো ধানকাটনীর দল সব পালাবে।...

ভর্সড়ের গুরুজীকে পাঠানো হয় ডিস্টিবোড অফিসে, ঘোড়ার পিঠে। তিনি সেখানে লিখিয়ে দিয়ে আসবেন যে, কেমৈ-এ যারা মরেছে, তাদের হয়েছিল ম্যালেরিয়া জ্বর। ভর্সড়ের বাবু কেমৈ-এর চৌকিদারটাকে বখশিশ করেন,—সে যেন থানায় রিপোর্ট করে যে লোকেরা জ্বরে মরেছে। এখন ভালয় ভালয় ধানকটা ঘরে উঠলে বাঁচা যায়।

তারাপুরের দলের লোকেরা রামিয়াকে সঙ্গে রাখতে রাজী নয়। এমনিই রামিয়ার মা'র উপর কারও সহানুভূতি ছিল না। যতদিন ঝাজী বেঁচে ছিল, ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে, রুগ্ন স্বামীটার মুখে এক ফোঁটা জলও দেয়নি কোনোদিন।...তেমনি জল জল করে মরেছে নিজে...এলি দলের সঙ্গে এখানে। তা মন বসল না। গেলেন পটের বিবি মেয়েকে সঙ্গে করে কেমৈ।...

শেষ পর্যন্ত রামিয়া তাৎমাটুলির দলের সঙ্গেই থেকে যায়।

'মা বাপ মরা মেয়ে, সোমত্ত বয়স। আপনার জনে দূরে ঠেলেছে।'

মহতোগিন্নীর সমর্থনে রবিয়া ছড়িদারও মনে বল পায়। সে এই মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভেবে রেখেছে। তারা রবিয়ার বৌকে বলে, তুই-ই রাখ মেয়েটাকে তোর সঙ্গে। রবিয়ার বৌটা আবার একটু বোকা বোকা গোছের। সে তার সাদা মনের কথাটা বলে ফেলে।

'রাখতে আমার আপত্তি নেই, মেয়েটার মায়ের 'কিরিয়া করমে' ও২ তো গুড়় বাগনর৩ কিনতে হবে। বামুনকে পয়সা দিতে হবে। সে আমি একা দেব কোথা থেকে। মেয়ে বলে না হয় মাথা মুড়ানোর পয়সাটা লাগবে না।'

সকলেই এক এক মুঠো ধান দিলেই কাজ হয়ে যায়, কিন্তু কেউ রাজী না।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে রামিয়া। কার সাধ্যি সে মুখের সামনে দাঁড়ায়।

'মা-বাপ মরা বলে আজ হেনস্থা করছ। যদি 'কিরিয়া করম'-এর অভাবে আমার মা 'শাঁখড়েল' পেত্নী হয়, তাহলে যেন এই সতী লক্ষ্মীদের দলের সকলের সঙ্গে রাতে দেখা করে। একটা দানা ধানের আমি কারও কাছ থেকে চাই না। পুবের ভূত তোরা, 'ভুচ্চর'-এ দল৪ কোথাকার। এদের খপ্পরে তার মা তাকে ফেলে দিয়েছে।

---

১ কলেরার টিকা।

২ ক্রিয়াকর্ম।

৩ কাঁচাকলাপাকা—এদের পুজার নৈবেদ্যে দরকার হয়। জিরানিয়া জেলার অতি প্রিয় ফল।

৪ একটি সাধারণ গালি—কথাটি ভুচর অর্থাৎ জানোয়ার।

'নরম পানি'র১ লোক এরা, এদের কলিজা২ আসবে কোথা থেকে ? এতটুকু সবুর দিল্ এদের, সুপুরি হলে কেটে দেখিয়ে দিতাম—পচা পোকাড়ে, ভর্সড়ের বাবুদের আর সব বাবুভাইয়ার দিলের মতো। তাদের তবু পয়সা আছে, জামার বোতাম এ'টে 'দিল্' ঢেকে রাখে ; আর এই 'লরম পানি'র জানোয়ারগুলোর বোতাম কেনবার পয়সা নেই, মেহনৎ করবার তাকৎ নেই, তাকৎ কাজে লাগানোর মগজ নেই। আমি এখানে থাকার সময়, রামদানার৩ শীষ দহের ধার থেকে কেটে কেটে পুঁতে রেখেছিলাম। তাই দিয়ে আমি মায়ের 'কিরিয়া করমে' খরচ করব।'

অকথ্য গালি দিতে দিতে সে ছিটকে বেরিয়ে যায় দহের দিকে।

তাৎমাদের ভাষায় অশ্লীল শ্লীলের মধ্যে বাছবিচার নেই। রসিকতা আর রাগের সময় বীভৎস অশ্লীল কথা না বললে তাদের ফিকে ফিকে মনে হয় ভাষাটা। যে ওষুধের ধক নেই, সে কী আবার একটা ওষুধ ! তারাপুরের পাড়াকুঁদুলি মেয়েটা আজ এহেন তাৎমাদেরও চুপ করিয়ে দিয়েছে।

কেবল কে একজন যেন বলে ওঠে 'ফটফটিয়ে চলে গেলেন।'

মহতোগিন্নী বলেন, 'চল চল সকলে। মেয়েটাকে স্নানটাও তো করাতে হবে। ফুলঝরিয়া, সেই আচারের হাঁড়িজড়ানো নেকড়াটা আনিস তো। আবার শীতের দিনে মেয়েটা ভিজে কাপড়ে থাকবে।'

## পশ্চিমদিগ্‌বিজয়ের পর ধানকাটনীর দলের প্রত্যাবর্তন

ধাঙড়দের 'গ্যাং' রাস্তা মেরামত করছে মরগামার 'পত্থল'-এর কাছে৪। পাটনা থেকে একজন বড় হাকিম এসেছেন 'সার্কাস বাংলায়'৫। প্রায় লাট সাহেবের মতো বড় হাকিম ; ইয়ার টুপির নিচে লাল টকটকে মুখ ; সে মুখ থেকে আগুনের ঘুর-এর মতো ধোঁয়া ছাড়ে ফন ফন ফন ফন। কথা বলে বাঘের মতো। কলস্টর সাহেব তো তাকে দেখে থর থর থর থর। সেই সাহেব যাবেন শিকারে—রাজদ্বারভাঙ্গার কুশীর ধারে ভোয়া জঙ্গলে, বনভঁয়সা৬ মারতে। চেরমেন সাহেবের তো শুনেই 'সটক্ দম'৭। তাই তাদের গ্যাংয়ের সকলকে আসতে হয়েছে। এমনি তো কোনো 'পুছ'৮ নেই তাদের ; কাজ আটকালে এনজিনিয়র সাহেবের মনে পড়ে তাদের কথা। এমনি যে রোজ সকালে ওরসিয়রবাবু সারা গ্যাংটাকে তার বাগানে কাজ করান, সেটা এনজিনিয়র সাহেবের নজরে পড়বে না। তবে চোখে সোনার চশমা পরার দরকার কী ? সময় নেই অসময় নেই, জোয়ালে জুতলেই হল ?

ঢোঁড়াই সায় দিয়ে বলে—'হাঁ, বেয়াই মশায়ের বলদ পেয়েছিস৯ হাতে ; যত পারিস জুতে নে।' তার মনটা খারাপ হয়েছে, যখন থেকে ওরসিয়রবাবু আজ মহরমের দিনেও তাদের পাক্কীতে কাজ করতে বলেছেন। তারা ফুদী সিং-এর মহরমের দলের লোক। দল ভারি করতে না পারলে ওজীর মুন্সীর দলের কাছে মাথা নিচু হয়ে

১ যেখানে জল খারাপ।  ২ হৃদয়।

৩ এর থেকে এক রকম খই হয়। জলো জমিতে এর গাছ হয়। ফল মাটির ভিতর পচিয়ে তারপর ওর ভিতর থেকে দানা বার করতে হয়।

৪ পাথর, মাইলস্টোন।  ৫ সার্কিট হাউস।

৬ বুনোমোষ।  ৭ আক্কেল গুড়ুম।

৮ কদর।  ৯ একটি প্রচলিত প্রবাদ—'সমধি কা' 'বয়েল'।

যাবে। এখনও মহরমের ঢাকের শব্দ কানে আসছে আর ওরসিয়রবাবুর উপর রাগে তার গা জ্বালা করছে। আজ ফুদী সিংয়ের সঙ্গে দেখ হলেই সে বলবে, তাৎমারা চিরকাল একই রকম থেকে গেল। লাঠি 'গদকা' তোরা কোনো কালেই খেলিস না, আর সেজন্য তোদের ডাকিও না। খালি একটু সঙ্গে সঙ্গে থেকে সারা শহর ঘুরবি, বাবুভাইয়াদের কাছ থেকে বখশিশ আদায় করবার জন্য। দিনের বেলাতেই যতটা শেষ করতে পারা যায় ততই ভাল, না হলে ঐ বখশিসের পাওয়া পয়সা থেকেই রাতের মশালের তেলের খরচ দিতে হবে। এক ঘন্টা কলালীতেও১ তো যাবি সবাই। 'কলালী' আবার রাত নটায় বন্ধ হয়ে যায়···

কিন্তু সন্ধ্যার আগে কি আর এই রাস্তার কাজ থেকে ছুটি হবে।

শালা ধান বোঝাই গরুর গাড়ির আর কামাই নেই। এ রাস্তা মেরামত কিসের জন্য। একটা জিরানিয়ার হাটের দিন গেলেই তো আবার যে কে সেই। এই যে কোদাল মেরে মেরে এনে মাঠি ফেলছি, এই শীতের দিনেও গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, নবাবপুত্তুর গাড়োয়ানরা বলদের লেজ মুড়তে মুড়তে হলালালালা করে একদিনে সাফ করে দিয়ে যাবে। চেরমেন সাহেবের এত তাকৎ; আর এই গরুর গাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারে না!

এই বোকাগুলোর কথায় ঢোঁড়াই মনে মনে হাসে; আরে এটুকু বুঝিস্ না রাস্তা খারাপ না হলে তোদের রোজগার চলবে কী করে। আর এই গাড়িতেই তো ধান আসে জিরানিয়া বাজারে। ধান না এলে খেতিস কী? সত্যিই ধাঙড়গুলো বোকা। তবে এ কথা ঠিক যে চেরমেন সাহেব আর কলস্টর সাহেব ইচ্ছে করলে তাৎমা ধাঙড়দের অনেক কিছু ভাল করতে পারে। এই তো ধান চাল এত শস্তা করে দিয়েছে। এই সঙ্গে যদি বাবুভাইয়াদের উপর হুকুম করে দিত, তাৎমাদের রোজ ঘরামির কাজ দিতে, তাহলেই হতো বেশ। কিন্তু রামজীর মর্জি ছাড়া তো কিছু হওয়ার উপায় নেই। কখন না কখন গরীবদের কথা তাঁর মনে পড়বেই।

'গই বহোর গরীব নেবাজু।

সরল সবল সাহিব রঘুরাজু।'২

তিনি ছাড়া আর গরীবকে দেখার কে আছে?···

'এই 'বহলমান'৩। পাক্কীর উপর দিয়ে চালাচ্ছিস যে বড়। দিনের বেলা ঘুমুচ্ছে; ছুছুন্দর কোথাকার।'

গ্যাং-এর লোকের চেঁচামেচিতে ঢোঁড়াইয়ের নজর গিয়ে পড়ে ঐ গাড়ির দিকে। গাড়ি বোঝাই ধানের বস্তার উপর যে মেয়েটি বসে আছে, সে বস্তাগুলোর উপর হামাগুড়ি দিয়ে এসে গাড়োয়ানকে ধাক্কা দেয়—'এই! ওঠো না। সেই সিসিয়া থেকে শুয়েছে।'

'শুয়েছি তো কার পাঁজরার উপর মুখ ডলেছি৩। তোমার নামবার জায়গা এসে পড়ে থাকে তো নেমে পড়ো না।'

---

১ মদের দোকান।

২ তুলসীদাস থেকে ঃ

সরল সবল প্রভু রঘুরাজ হারানো ধন ফিরিয়ে দেন আর গরীবকে পালন করেন।

৩ গরুর গাড়ির গাড়োয়ান।

৪ একটি চলিত কথা। পাকা ধানে মই দেওয়া এই অর্থে ব্যবহার হয়।

'না, আর এক রশি আগে নামব। এখানে না।'

কে মেয়েটা ? সবাই তাকিয়ে দেখে। মহতোর মেয়ে ফুলঝরিয়া একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসে—সবাই তার খোঁড়া পায়ের কথা ভাবছে না তো।

ঢোঁড়াই বলে, 'কি ধানকাটনী থেকে নাকি ? কত ধান হল ? আর সকলে কোথায় ?'

'এই তারা এতক্ষণ চিথরিয়া পীরে হবে। গোঁসাই ডুববার আগেই এসে পড়বে।'

ফুলঝরিয়া ধানের বস্তার আড়ালে তার পায়ের দিকটা সরিয়ে নেয়, গায়ের কাপড় সামলায়, অন্যদিকে তাকাতে চেষ্টা করে। ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখে এলেই তার কেমন যেন সব ঘুলিয়ে যায়।

ঢোঁড়াইয়েরও মায়া হয় মেয়েটাকে দেখে। হেসে বলে, 'যাক খুব পোঁছেচো, মহরমের মেলার আগে। কালই দুলদুল ঘোড়া বেরুবে।'

কৃতার্থ হয়ে যায় ফুলঝরিয়া।

ঢোঁড়াইদের ফেলা মাটির উপর দিয়ে গভীর রেখা এঁকে গাড়ির চাকা এগিয়ে যায় তাৎমাটুলির দিকে। গাড়োয়ানটা আপন মনে বকতে বকতে যায়—আর কদিন পরে গেরস্তরা সত্যিই আনবে না ধান হাটে। গাড়িতে আনার মজুরি পোষায় না। কিনবার লোক নেই ; গত হাটের দিনও এই ধান ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এমন হলে তো নিলামেই বিকিয়ে যাবে জমি।...

না রামজী আছেন—ফুলঝরিয়া গাড়োয়ানকে সান্ত্বনা দেয়।...

আবার মাটি ফেলার কাজ আরম্ভ হয়। গোঁসাই ডোবার আগে ঢোঁড়াইদের আর ছুটি নেই। না হলে আবার কাল দুলদুল ঘোড়ার মেলার দিনও কাজ করতে হবে। আজ দক্ষিণ দিক থেকে তারা এগুবে বাড়ির দিকে।...

'ফুর্তিসে ভাইয়া।'[১] গোঁসাই ডুববার আর বেশি দেরি নেই।

দূরে দেখা যায়, একদল লোক এদিকেই আসছে। তাদের কোলাহলের স্বর শোনা যাচ্ছে। মহরমের দল নাকি ? না ঝাণ্ডা কই ? মাথায় কাঁধে জিনিসপত্রের বোঝা, তাই বলো। ঢোঁড়াই, তোর টোলার ধানকাটনীর দল ফিরছেন পচ্ছিম ফতে করে। রতিয়া ছড়িদার আবার মাথায় পাগড়ি বেঁধেছেন।

ধাঙড়ের দল নিবিষ্ট মনে রাস্তায় কাজ করবার ভাব দেখায়, যেন ধানকাটনীর দলকে দেখতেই পায়নি। ঢোঁড়াই হেসে তাদের সংবর্ধনা জানায়। মহতোগিন্নী মুখে এক গাল হাসি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসেন।

'ফুলঝরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি খানিক আগে ? পাড়ার খবর ভাল তো ? আর আমাদের বুড়োর খবর ? বাড়িতে এসো, নতুন ধানের চিড়ে খাওয়াব।'

যাবার সময় মহতোগিন্নী তাকে বলে যান সে যেন ঠিক আসে। অনেক দিনের জমানো কথা আছে 'বাচ্চা'র সঙ্গে। সব তাৎমা মেয়েই ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে একটা-না-একটা রসিকতার কথা বলবার চেষ্টা করে। এতদিন পরে পাড়ার ছেলের সঙ্গে প্রথম দেখা ; ধানকাটনীর হাওয়ার রেশ এখনও লেগে রয়েছে তাদের মনে। ঢোঁড়াই হেসে বলে, এখন বাড়ি গিয়ে কারও দেখা পাবে না, সব গিয়েছে ফুদী সিং-এর মহরমের দলে। রবিয়ার বৌয়ের পাশে ভরসা শাড়ি পরা মেয়েটাও খিলখিল করে হেসে ওঠে তাৎমানীদের রসিকতায়। এই তাহলে ঢোঁড়াই, যার গপ্প রামিয়া ফুলঝরিয়ার কাছে শুনেছে।

---

১ তাড়াতাড়ি ভাই।

মেয়েটিকে অচেনা অচেনা লাগে ঢোঁড়াইয়ের। পাড়ার তো নয়ই, অন্য কোথাও দেখেছে বলেও মনে পড়ে না। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, বেশ ছিম্‌ছাম, দুখিরার মা'র চাইতেও। মরগামার মেয়েটেয়ে নাকি? হয়তো জিরানিয়ার বাজারে যাচ্ছে। না, ঐ তো এদের সঙ্গেই তাৎমাটুলির দিকে চলল? 'ইনারসন'এর পরীর১ মতো দেখতে। কাঁচা কঞ্চির মতো 'লচক'২ মেয়েটার দেহে। হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে যায়, সামুয়রের সাহেবের হাওয়াগাড়ির সম্মুখের একটা 'চাঁদির মুরতে'র কথা৩। ঠিক সেই মেয়েটার মতো দেখতে এই নতুন মেয়েটাকে। একেবারে উড়ে যেতে চাইছে যেন, সেই রকম। দুটো ধনেশ পাখি সম্মুখের বটগাছের কোটরে এসে ঢোকে, ডানা ফট্‌ফট করতে করতে। দুটো বাদুড় লুইস সাহেবের পেয়ারা আর নারকুলী কুলের বাগানের দিকে উড়ে চলে যায়। তাৎমাটুলি, ধাঙড়টুলির আকাশ, দূরে জিরানিয়া শহরের গাছপালা সব রঙিন হয়ে উঠেছে—'গোঁসাই' ডুবছেন।

ভোঁ, ভোঁ, জিরানিয়া কুর্সেলা লাইনের সাঁঝের 'লৌরী'৪ ছাড়ল। রাস্তা খারাপ করার যম এই 'লৌরী'গুলো। ওরসিয়রবাবুর 'নানী মরে'৫, আর যদি ও আমাদের কাজ তদারক করতে আসে এর পরে। এক, দো, তিন! কাম খতম, পয়সা হজম! চলো চলো ঘর।

## দুলদুল ঘোড়ার উৎসবে রামিয়ার যোগদান

নূতন মেয়েটা তাৎমাটুলিতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়, ছেলেদের মধ্যে! আজব আজব পশ্চিমের খবর শোনায়। 'পূরুবের নরম পানি'র লোকেদের সম্বন্ধে নাক সিঁটকে কথা বলে। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, থাক না আর কিছু দিন, তারপর 'লরম' কি কড়া বুঝিব।

তাৎমাটুলির ছেলেরা মহরমের দলে লাঠি খেলে শুনে, রামিয়া চোখ কপালে তুলে বলে, এখনও পূরুবের হিঁদুরা ঐ গরুখোরদের পরবে লাঠি খেলে নাকি? আমাদের পাচ্ছিমে তো চার 'সাল' থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কী বন্ধ হয়েছে? লাঠি খেলা?

হাঁ হিঁদুর লাঠি খেলা, মহরমে।

সত্যই তাৎমারা এ খবর কখনও শোনেনি এর আগে। ফুদী সিংয়ের দল লাঠি খেলা বন্ধ করবে, এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। অদ্ভুত ঐ পাচ্ছিমের লোকগুলো কী করে, কী ভাবে, কিছুই বোঝা যায় না। তবে কপিলরাজার জামাইয়ের মতো বদলোককে ঠাণ্ডা করতে হলে, ঐসব একটা কিছু করতে হয়। রবিয়ার বৌ একটু ভয়ে ভয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের দেশে কি দুলদুল ঘোড়ার মেলাতেও যাওয়া বারণ নাকি?

যাক, তবু নিশ্চিন্দি যে তোমাদের দেশে দুলদুল ঘোড়ার মেলা হয় না, মহরমের পরদিন। দুলদুল ঘোড়া কী জানো না, আর এই পাচ্ছিমের এত বড়াই! অন্ততঃ এই একটা বিষয়ে তাৎমানীরা রামিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ আর নষ্ট

১ ইন্দ্রাসনের পরী। কোন মেয়ে সুন্দরী হলেই তাৎমারা বলে ইন্দ্রাসনের পরীর মতো দেখতে। ২ নমনীয়তা।
৩ রৌপ্যমূর্তি। ৪ মোটর বাস।
৫ 'নানী মরে' শব্দার্থে দিদিমা মারা যায়। 'কিছুতেই নয়' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়

করার মতো সময় নেই তাদের। আজ মেলায় যাওয়ার দিন, আজ তাৎমানীদের স্নান করতে হবে, কাপড় শুখোতে হবে, এই একরাত্তি মেয়েটার সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে বকলেই তাদের দিন চলবে না…

নরকটিয়াবাগে নবাব সাহেবদের পরিবারের 'কবরগা'১। ইমামবারা থেকে বেরিয়ে দুল-দুল ঘোড়ার মিছিল আসে ঐ 'কবরগা' পর্যন্ত। এই গোরস্থানের বাইরে পথের উপর বসে মেলা, আর 'কবরগা'র ভিতর বসবার জায়গা করা হয় সাহেব আর হাকিম-হুকমদের।

ভোঁ, ভোঁ! ধুলো উড়িয়ে লালরঙের হাওয়াগাড়ি গোরস্থানের পাশে এসে থামে। ঢোঁড়াইরা সকলে সেইদিকে তাকিয়ে দেখে। সামুয়রের সাহেব সিগারেট খেতে খেতে 'কবরগা'র ভিতর গিয়ে ঢোকেন। সাহেবের আরদালীর পোশাক পরে সামুয়রও এসেছে সঙ্গে হাওয়াগাড়িতে। ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েও হাওয়াগাড়ির সম্মুখের ডানাওয়ালা 'চাঁদির' মেয়েটাকে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তাৎমাটুলির মেয়েদের উপর। নূতন পাচ্ছিমা মেয়েটাকে খোঁড়া ফুলঝরিয়া কী যেন বোঝাচ্ছে, এই হাওয়াগাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে—বোধহয় সামুয়রের কথা। এক নজরেই বোঝা যায় যে, মেয়েটা অন্য সব তাৎমা মেয়েদের থেকে আলাদা ধরনের। একমাত্র তারই কাপড় 'হরশিঙ্গার'-এর ফুল২ দিয়ে তাজা রাঙানো! মেলার এত লোক-জনের মধ্যেও নজর গিয়ে পড়ে তারই উপর। হাওয়াগাড়ির মধ্যে বসে আছে সাহেবের ডেরাইভার, সাহেবের কুকুর, আর সামুয়র। আরদালী না ছাই!

এতক্ষণে সামুয়র নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে সিগারেট ধরাবার আর লোকজন ভাল করে করে দেখবার অবকাশ পায়। পথের পুবে রেললাইনের দিকে দাঁড়িয়েছে তাৎমাটুলির দল, আর পশ্চিমে তেঁতুলগাছের তলাটায় দাঁড়িয়েছে ধাঙড়টুলির দল। মেলাতেও তারা দু'দল এক জায়গায় দাঁড়াবে না; কিন্তু নিজের পাড়ার সকলে একসঙ্গে দল বেঁধে থাকে; কত রকমের লোক আসে মেলায়। এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েছেলে নিয়ে কাণ্ড; বলা তো যায় না। এ রকম গোলমাল বহুবার হয়েছে, এত সাবধানতা সত্ত্বেও। তার উপর ফিরবার সময় রাত হয়ে যায়। প্রতিবারেই এক আধটি মেয়ে দল থেকে ছিটকে পড়ে; একটু রাত করে বাড়ি ফেরে; বলে দুলদুল ঘোড়া যাওয়ার সময় ভিড়ের চাপে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। মাতব্বরেরা বোঝে; বাড়ির লোকেরা দরকার বুঝলে প্রহারও দেয়।

ঢোঁড়াই শালা ধাঙড়টুলির দলের মধ্যেই বসেছে দেখছি। শনিচরার বৌটা আবার দেখছি পায়ে তিনগাছা করে 'সিলবরের পৈড়ী'৩ পরেছে। আবার এদিকে তাকানো হচ্ছে! বুদ্ধি তো ঘটে খুব! ঝমড় ঝমড় শব্দ হবে হাঁটবার সময়! যাক তাতে দুঃখ নেই সামুয়রের; আজ তাকে ফিরতে হবে সাহেবের গাড়িতেই; কোনো উপায় নেই। ঢোঁড়াইটা আবার ওদিকে হাঁ করে কী দেখছে। দাঁত উঁচু মহতোগিন্নী এখানেও দেখছি জমিয়ে বসেছে। তেল পড়েছে আজ মাথায়। তার খোঁড়া মেয়েটাও দেখছি ভাল্লুকের মতো বসেছে। ওর পাশেই হলদে কাপড় পরে কে ওটা, একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ছে? খাসা মেয়েটা! বাই গড বলছি, বেশ 'নিমকিন'৪ দেখতে।

---

১ কবর দেবার জায়গা।

২ শিউলি ফুল। ৩ জার্মান সিলভারের মল।

৪ নিমকিন—সুন্দর আর লাবণ্যযুক্ত। কথাটি সম্মানজনক পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় না।

সিন্দুর আছে নাকি কপালে ? এতদূর থেকে দেখাও যায় ! সামুয়রের মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। একটানে সিগারেটটার গোড়া পর্যন্ত জ্বালিয়ে সেটাকে ফেলে দেয়। তারপর আর কৌতূহল চাপতে না পেরে এগিয়ে যায় ঢোঁড়াইয়ের কাছে।

হাঁরে ঢোঁড়াই তুই ইদিকে বসেছিস যে বড় ?

কেন ইদিকে কি কারও বাপের কেনা নাকি ?

অন্য সময় হলে এ কথা নিয়েই বেঁধে যেত কুরুক্ষেত্র…'তাৎমার বাচ্চা' বাপ তুলে কথা বলবে ? কিন্তু এখন সামুয়রের মনের ভাব সেরকম নয়। সে চায় ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে গল্প জমাতে। ঢোঁড়াইকে সিগারেট বের করে দিতে দিতে সে বলে এবার মেলা জমেনি সেরকম ; লোকের হাতে পয়সাই নেই,·তাই মেলা জমবে কী করে ? ঢোঁড়াইও অন্যমনস্কভাবে সায় দেয় সামুয়রের কথায়। পথের ওধারে দুটো ছোকরা বৌকা-বাওয়াকে দহিবড়ার ঠোঙা দেখিয়ে ঠাট্টা করছে। আর একটু বেশি বাড়াবাড়ি করলেই ঢোঁড়াইকে উঠতে হবে, ফাজিল ছোঁড়া দুটোকে ঠাণ্ডা করতে।

'ওটা কে রে ঢোঁড়াই ? ঐ হলুদ রঙের শাড়ি পরে ঢলে পড়ছে খোঁড়া মেয়েটার গায়ে ?'

'ওকে রবিয়ার বৌ এনেছে ধাননকাটনীর থেকে।'

'বড় ফুরুৎ ফুরুৎ করছে রে মেয়েটা। রবিয়ার বৌয়ের আবার কে হয় ? এখানে থাকবে নাকি এখন ঐ 'পাতলী কোমরওয়ালী' ছুঁড়িটা ?'

ঢোঁড়াই এই সব প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না। এই খৃস্টানটার সঙ্গে ঐ নূতন মেয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে মন চায় না। এই প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য সে বলে—এইবার এসে পড়ল দুলদুল ঘোড়া। ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না ? হলদে শাড়িপরা মেয়েটার পাশ দিয়ে সামুয়র শিস দিতে দিতে গট্‌গট করে, তাৎমাদের দলের ভিড়ের মধ্যে ঢোকে। রামিয়ার হাসি থেমে যায়। ফুলঝরিয়া ফিস ফিস করে, সাহেবের মতো রঙের সামুয়রের পরিচয় দিয়ে দেয়—সাহেবদের বাড়ি কাজ করে, 'ঢেরী আমদানী'র নৌকরি১ ; সাহেব অনেক টাকা দিয়ে যাচ্ছে ওকে, এখান থেকে যাওয়ার সময়…

দুলদুল ঘোড়ার মিছিল এসে পড়েছে। মেলার ছত্রভঙ্গ ভিড় জমে চাপ বেঁধে যায় মুহূর্তের মধ্যে। বুড়ো নবাব সাহেব নিজে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে দুলদুল ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে আসছেন। সাদা রঙের ঘোড়াটা। চোখ দুটো ঠুলি দিয়ে ঢাকা। সোনার ঝালর দেওয়া জিন ঘোড়ার পিঠে।—মেহেদিপাতা দিয়ে রাঙানো নবাব সাহেবের দাড়ি। মখমলে ঢাকা আস্তাবলে বন্ধ করে রাখা হয় দুলদুল ঘোড়াটাকে সারা বছর। 'হাস্‌সান হোস্‌সান !' 'হাস্‌সান হোস্‌সান !' লাঠি আর বুক চাপড়ানোর শব্দে দম বন্ধ হয়ে আসে। ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে। 'হায়রে হায় !' 'জুলুস'২ ঢুকছে 'কবরগা'র মাঠে, 'কারবালা' করতে। মেলাসুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়ে 'কবরগা'র মাঠের দেওয়ালের চারিদিকে। ফুলঝরিয়া নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারেনি। রামিয়ার একটা কথা বারবার মনে হয়—ফুলঝরিয়া বলছিল যে দুলদুল ঘোড়াটা সারা বছর মখমলের উপর থাকে। মখমলটা নোংরা হয় না ?… ভিড়ের চাপে আর কৌতূহলের আতিশয্যে, সে কখন ফুলঝরিয়াকে ফেলে এগিয়ে এসেছে

১ অনেক আয়ের চাকরি।

২ মিছিল।

বুঝতেও পারে না। টের পায় যখন দহিবড়াওয়ালা গালাগালি দিয়ে ওঠে,—তার ঝুড়ির ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে গিয়েছে রামিয়া, আরও অনেকে। কী কাণ্ড! দহিবড়াওয়ালাটা আর তাদের আস্ত রাখবে না। পুবের লোককেও রামিয়া ভয় পায় তাহলে।···হায়-রে-হায়!'···হঠাৎ দেখে যে সাহেবের মতো রং আরদালীটা কখন যেন গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। সে রামিয়ার তরফ নিয়ে ঝগড়া করে দহিবড়াওয়ালাটার সঙ্গে। তার চেহারা আর পোশাক দেখেই দহিবড়াওয়ালা আর পালানোর পথ পায় না।···'হায়-রে-হায়।'···

## ঢোঁড়াইয়ের নাগপাশে বন্ধন

ঢোঁড়াইয়ের খুব ভাল লাগে রামিয়াকে। মেয়েমানুষের উপর সে আগে ছিল একটু নিস্পৃহ গোছের; নিস্পৃহ কেন, বোধ হয় একটু বিরক্তই—কোনো কথার ঠিক নেই নোংরা ঝোটহোদের, বেটাছেলে দেখলে হেসে ঢলে পড়ে, কিন্তু এ মেয়েটা কেমন যেন অন্য রকম। কথা বলে যেন কত কালের চেনা! মেয়েটার গায়ের 'তাকৎ'ও১ খুব; বেটাছেলেদেরও হার মানায়। তাৎমাটুলির ঝোটাহারদের মতো 'কমজোর'২ না। সেদিন কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাচ্ছিল রামিয়া। তিনটে ইয়া বড় বড় কলসী একসঙ্গে, মাথায় দুটো, কাঁখে একটা। এক ফোঁটা জল পড়েনি গায়ে। ঢোঁড়াই দেখেছিল পিছন দিক থেকে; আলবৎ পচ্ছিমের পানির গুণ। বাঙালী মেয়েদের মতো চুল, 'জলের কুঁজোর মতো গলা', কোমরের নীচেটা জাঁতার মতো দেখতে৩। ভারি ইচ্ছে করে মেয়েটার সঙ্গে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে। আবার একটু ভয় ভয়ও করে ওর সঙ্গে কথা বলার সময়। হাজার হলেও পচ্ছিমের মেয়ে, ওদের 'রসম রেওয়াজ' আলাদা, সংস্কার ভাল; 'পুরুব'-এর লোক মুখে স্বীকার না করলেও প্রত্যেকেই মনে মনে একথা না মেনে নিয়ে পারে না। 'রহন সহন কিরিয়া রকম'-এর৪ যা কিছু ভাল, সবই তো পচ্ছিম মুলুকের জিনিস; পুরবে তো কেবল মিয়াদের 'কিচির-মিচির' বুলি৫; তার বাঙালীদের আচার ব্যবহারের কথা ছেড়েই দাও, তাদের তো ও সবের বালাই-ই নেই।

রামিয়া নামটাও বেশ। হবে না! পচ্ছিমের লোক; কোথায় সেই মুঙ্গের জেলা, 'গঙ্গা কিনার'৬; কাঢ়াগোলার চাইতেও পচ্ছিমে! আমাদের মেয়েদের নামেরই বা কী ছিরি! বুধনী, জিবছী; আর ওদের দেখ তো। রামিয়া—রামপিয়ারী। পচ্ছিমের মুলুকে মেয়েদের নাম যত ভাল, আমাদের জিরানিয়ার বেটাছেলেটের নাম পর্যন্ত অত ভাল হয় না। ওদের মরদদের নামের তো কথাই নেই। ঐ তো পচ্ছিমের অচ্ছেবট সিং ডিস্টীবোডের কল মেরামতিতে কাজ করে। ঢোঁড়াই তার নামের সঙ্গে নিজের নাম মিলিয়ে মনে মনে লজ্জিত হয়—রামিয়া তার ঢোঁড়াই নাম শুনে নিশ্চয়ই হেসেছে। মেয়ের গড়ন দেখতে চাও,—পচ্ছিমের; মরদ দেখতে চাও, পচ্ছিমের; 'পানি'৭ দেখতে চাও, পচ্ছিমের; আদব কায়দা দেখতে চাও,

---

১ জোর।

২ দুর্বল।

৩ এইগুলিই সৌন্দর্যের লক্ষণ বলে গণ্য হয়।

৪ আচার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম (রহন সহন কিরিয়া করম)।

৫ দুর্বোধ্য ভাষা।

৬ গঙ্গাতীর।

৭ জলবায়ু।

পচ্ছিমের ; সব ভাল পচ্ছিমের। যাক, যাদের মুলুক যেমন, তাদের 'মুলুক'১ তেমন ; হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয় ?

মেয়েটা অত হাসিখুশি হলে কি হয়, দেখলেই ঢোঁড়াইয়ের মায়া লাগে, বোধ হয় ওর মা-বাপ নেই বলে। তার নিজেরও তো বলতে গেলে ঐ একই দশা।

মহতোগিন্নীর সঙ্গে গল্পে গল্পে বলেই ফেলল ঢোঁড়াই, এই কথাটা ফুলঝরিয়ার মা কীভাবে নিল বোঝা গেল না।

'হাঁ, তোরও মা অবিশ্যি না থাকার মধ্যেই ; তবে তোর বাওয়া রয়েছে, আমরা রয়েছি। মনে করলে সবই আছে, না মনে করলে কিছুই নেই। কত কী যে ভাবে আমার 'বাচ্চা'। এ হল সেই মিল, সেই যে কথায় বলে না, তোর বেয়ানের উঠোনেও বাবলা গাছ আর আমার বেয়ানের উঠোনেও বাবলা গাছ, আমরা দুজনে আপনার লোক। তোর এ কথা হল তাই।...ও ফুলঝরিয়া, নতুন ধানের চিড়ে যে রাতে কুটলি, তাই চারটি ঢোঁড়াইকে খাওয়া না। ঘটির জলটা ছেঁকে দিস তোর কাপড়ের আঁচল দিয়ে— বড় ময়লা হয়েছে জলে।'

রামিয়া 'থান'-এ এসেছিল গোঁসাইকে প্রণাম করতে। গোঁসাইয়ের মাথায় জল ঢালবার পর সে ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করে যে পুরুবের মুলুকে কি গোঁসাইয়ের বেদী রোজ লেপতে নেই নাকি ?

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বলে এসবের দেখাশুনো বাওয়াই করে।...

না, না, বেদী নিকোনোর কাজ বাওয়ার নয়। আমাদের পচ্ছিমে পাড়ার মেয়েরাই গোঁসাইয়ের বেদী লেপে।

'সে দেশের কথা হল আলাদা।' ঢোঁড়াই এই এক কথাতেই পচ্ছিম মুলুকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়ায় রমিয়ার মনটা খুশী হয়ে ওঠে।

ঢোঁড়াই জানে যে, পচ্ছিমের লোকের ভাল লাগবে না তাদের তাৎমাটুলি ; তবু জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন লাগছে আমাদের টোলা ?' আর অন্য কোনো কথা সে চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না।

মেয়েটি বোধ হয় ঢোঁড়াইয়ের মন রাখবার জন্যই বলে, 'বেশ লাগছে, তোমাদের টোলা। বেশ, কোন মুসলমান নেই, ডোম নেই, মুসহর২ নেই। কিন্তু জমি বড় 'বালুবুর্জ'৩। আর কেউ রামায়ণ পড়তে পারে না।

অদ্ভুত পচ্ছিমের লোকদের ভাববার ধরন। এইসব দিক দিয়ে যে তাদের টোলার বিচার কেউ করতে পারে, এ তার মাথায়ই আসেনি কখনও। তারা চাষবাস করে না, তাই জমি বালুবুর্জ না এঁটেল মাটির এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। কেবল এইটুকু জানে যে, এই 'বালুবুর্জ' জমিতে অল্প খুঁড়লেই কুয়োর জল ওঠে ; বালিতে কুয়ো বেশি দিন টেকে না ; পাক্কীতে তারা যে মাটি ফেলে, তা বালি-ভরা বলে এক পশলা বৃষ্টিতেই ধুয়ে যায়। মেয়েটা মুসলমান, ডোম, মুসহর, কী সব কথা বলে।

জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, মুসলমান থাকলে কী হত ?'

'এ গোঁসাই থানে মুরগী চরত, আর কী হত !'

---

১ দেশ।

২ একটি অনুন্নত শ্রেণীর নাম; এই অঞ্চলে সবচেয়ে নোংরা বলে অখ্যাতি আছে।

৪ একেবারে বালিভরা মাটি।

তাই তো মেয়ে হয়েও রামিয়া বুদ্ধিতে বেশ দড় দেখছি। কথাটা ঠিকই বলেছে। সত্যি, যদি সে রামায়ণ পড়তে পারত তাহলে, রামিয়ার চোখে সে কত বড় হয়ে উঠতে পারত আজ। পড়তে না পারুক, রামায়ণ সে জানে, এই কথাটা রামিয়াকে জানিয়ে দেবার জন্য বলে, 'আমাদের কাছে তাৎমাটুলিই ভাল লাগে। 'জলু পয় সরিস বিকাই, দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি'১, জলও দুধের মতো বিক্রী হয়, যেখানে ভালবাসা আছে। এখানে আগে কুশীনদী ছিল কিনা, তাই এত বালি। কৌশিকীমাই চলে যাচ্ছে পচ্ছিমে; ঘোমটার আড়ালে পিদিপ জ্বালিয়ে মায়ের কাছে যাচ্ছে। ফেলে রেখে যাচ্ছে এই সব 'বালুবুর্জ'' জমি। কৌশিকীমায়ের গল্প তুমি জান না? খুব বড় গল্প। রবিবারে শুনো মিসিরজীর কাছে থেকে, তিনি যখন এই থানে রামায়ণ শোনাতে আসবেন।' এই কথার মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াই চালাকি করে রামিয়াকে শুনিয়ে দিতে চায় যে তাদের টোলাতেও নিয়মিত রামায়ণ পড়া হয়। যতটা বাজে জায়গা তাৎমাটুলিকে মনে করেছে, ততটা খারাপ জায়গা এটা নয়।

মেয়েটা কিন্তু এসব কথায় বিশেষ কান দিল বলে মনে হল না। তবে ঢোঁড়াইকে দেখে যা মনে হয়েছিল তার চাইতে অনেক চালাক-চতুর। তার কাঁধ আর হাতের ঢেউখেলানো মাংসর দলাগুলো—দেখলেই বোঝা যায়—পাথরের মতো শক্ত। ওর রোজগার ভাল হবে না তো কার হবে? এই কথাগুলোই থান থেকে ফিরবার পথে রামিয়ার মনে আনাগোনা করে।

## রেবণগুণীর ঢোঁড়াইকে বরাভয় দান

ঘরে ফিরে রামিয়ার কথা মনে পড়ে ঢোঁড়াইয়ের। অন্য কথা ভাবতেও ভাল লাগে না। রামিয়াকে একেবারে আপনার করে পাওয়া চাই, 'শাদি'২ ছাড়া তো তা হতে পারে না। শাদির কথা অমনি বললেই হল নাকি; মাথার উপর বাওয়া রয়েছে; মেয়ের দিকের কোনো বেটাছেলের কাছে কথা পাড়তে হবে; সমাজ রয়েছে; মহতো আর নায়েবদের মজুরি দিতে হবে, টাকা দিতে হবে, ভোজ দিতে হবে, তার উপর এ তো আর এখানকার 'জোটাহার' বিয়ে নয়, পচ্ছিমের মেয়ের নিজেরও পছন্দ অপছন্দ আছে। রামায়ণ পড়তে শেখেনি সে, তাকে কি আর রামিয়ার পছন্দ হবে।

পরের দিন যখন রামিয়া সন্ধ্যাবেলায় থানে পিদিপ দিতে আসে, তখনই ঢোঁড়াই তাকে এক কোঁচড় গলাকাটা সাহেবের বাড়ির কুল খেতে দিয়েছিল। এ রকম কুল পচ্ছিমে আছে, বড় যে পচ্ছিমের বড়াই করো? রামিয়া একটা খেয়েই বলেছিল 'বেটা মরে'৩ এমন কুল জীবনে খাইনি, গুড়ের মতো মুখে দিলে মিলিয়ে যায়।'

আরে বেটা কোথায় তোমার; ছেলের দিব্যি দিচ্ছ?

'বেটা কোনো দিন হবে তো।'

বোকার মতো দুজনেই হেসে ওঠে; কে কী ভাবে কে জানে। চেরা কাঁচা আমের মতো রামিরার চোখদুটোর৪ দিকে চেয়েই ঢোঁড়াই বুঝতে পারে যে, রামিয়া তার উপর বিরক্ত নয়।

---

১ 'প্রীতির কি যথার্থ রীতি দেখ, জলও দুধের মতো বিক্রয় হয়!'—(তুলসীদাস)

২ বিয়ে।

৩ মিথ্যা বললে আমার যেন ছেলে মরে যায়।

৪ এদের গল্পে গানে, প্রিয়ার চোখ কাটা আমের ফালির মত দেখতে হয়।

সেই রাতেই ঢোঁড়াই যায় রেবণগুণীর কাছে। গুণীকে রাতে ধরা শক্ত, সে নেশা করে রাতে নাকি শ্মশানে চলে যায়, সেখানে সারারাত ভূত নাচায়, মানুষের মাথা নিয়ে ভূতদের সঙ্গে খেলা করে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের বরাত ভাল। বাড়িতেই রেবণ-গুণীর দেখা পেয়ে যায়। নেশা সে করেছিল ঠিক, কিন্তু তখনও শ্মশানে যায়নি। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঢোঁড়াই তার পায়ের কাছে আট আনা পয়সা রাখে, তার গাঁজার 'ভেট'-এর জন্য। সবাই জানে যে এ না দিলে গুণীর মুখ খোলে না। কুপিটা পর্যন্ত নেই, গুণীর মুখ দেখা যাবে কী করে?

'কে?'

মদের গন্ধ আর গলার স্বরে মুখটা কোথায় ঠাহর করা যাচ্ছে। তারপর আরম্ভ হয় কাজের কথা। গুণীকে যতটা রগচটা সবাই ভাবে, ততটা নয়, কাজের সংস্রবে তার কাছে এসে ঢোঁড়াই বুঝতে পারে। নতুন 'পরদেশী শুগা'১ রামিয়ার সম্বন্ধে রেবনগুণী বেশ ঔৎসুক্যই দেখায়, ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় দরকারের চাইতেও বেশি। সেও শুনেছে মেয়েটার কথা, কিন্তু এখনও দেখেনি। 'ডবকা' নাকি? তাকে শনিবার রাতে শ্মশানে পাঠাতে পারিস? না আমারই ভুল হচ্ছে, যদি শ্মশানেই পাঠাতে পারবি তবে আর আমার কাছে আসবি কেন? তার মায়ের 'কিরিয়া করম'-এর২ কথা বলে পারিস না? তুই মরদ, না কী?...

ঢোঁড়াই বলে, 'ভুল বুঝো না গুণী। আমি তাকে শাদি করতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে গুণীর গলার স্বর বদলে যায়। তাই বল! আচ্ছা তাহলে তার শ্মশানে না গেলেও চলবে। তুই চল এখনই আমার সঙ্গে চিথরিয়া পীর।

চিথরিয়া পীরের পাকুড় গাছটার নীচের বেদীটার কাছে এসে যখন ঢোঁড়াই দাঁড়ায় তখন হাড়কাঁপানি শীতের মধ্যেও সে ঘামতে আরম্ভ করেছে। হাত পা যেন স্থির রাখতে পারছে না। ইচ্ছা হয় বেদীটা ধরে বসে পড়তে। অন্ধকার নিঝুম রাত। শুকনো পাতার উপর দিয়ে চলার সময় যে শব্দটুকু হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে তাইতেই সারা গাঁয়ের লোক জেগে উঠবে। শীতের হাওয়ায় বিরাট গাছটার ডালে ডালে ঝোলানো অজস্র নেকড়ার ফালি দুলছে। 'কিচিন' পেত্নীগুলোর৩ শাড়ি দুলছে না তো? সেগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে নাকি? না সেগুলো বোধহয় কাপড় নেড়ে নেড়ে জোনাকপোকা তাড়াচ্ছে? খোকা-ভূতের চোখ নাকি ঐ জোনাকপোকাগুলো? ...রেবণগুণী তাকে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে বসিয়ে দেয়। তারপর খানিকটা মাটি বেদীটার থেকে ভেঙে নিয়ে বলে, 'যেই আমি মন্তর পড়ে গোঁসাই জাগাব, অমনি দেখবি যে তুই হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিস। একেবারে গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ঠেকে যাবি, তবে থামবি। কারও বাপের সাধ্যি নেই তার আগে তোকে থামায়।'

গুণী মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করে। হাঁটুর নিচের মাটি কেঁপে ওঠে—কিসে যেন ঢোঁড়াইকে ঠেলে নিয়ে চলেছে—তার সম্বিত নেই, ভাববার ক্ষমতা নেই, কেবল তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তার মাথাটা গিয়ে গুঁড়িটায় লাগে, ঠিক যেখানটায় সিঁদুর

১ বিদেশী টিয়াপাখি।

২ শ্রাদ্ধ তর্পণ আদি ক্রিয়াকর্ম।

৩ কিচিন একশ্রেণীর পেত্নী। এরা যখন তখন গাছে পা ঝুলিসে বসে দোল খায়। অনেক সময় আমরা দেখি যে গাছের ডাল অকারণে দুলে উঠল, তা কিচিনদের কাজ।

লাগানো আছে। জ্ঞান হলে ঢোঁড়াই দেখে যে সে উবু হয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বেদীটার উপর।

'ওঠ্!'

ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়ায়। কেমন যেন দুর্বল দুর্বল লাগে, জ্বর ছাড়বার পরের মতো। মনে হচ্ছে হাঁটু দুটো দুমড়ে আছে।

'এই মাটি রাখ খানিকটা। কোনো রকমে তার মাথার চুলে ছোঁয়াতে হবে।'

তাৎমাটুলির মোড়ে এসে, রবিয়ার বাড়ির দিকে মুখ করে গুণী পথের বালির উপর কী সব কতগুলো আঁকেজোখে। বলে 'চক্কর মেরে দিলাম'১, কাজ হবে। আমার বাকি পাওয়া দিয়ে দিস পরের সপ্তাহে।'

গুণীর কথার খেলাপ কেউ যেতে পারে না একথা সে জানে।

ঢোঁড়াই মাটিটুকু নিয়ে থানে ফিরে আসে প্রায় ভোর রাত্রে। বাকি রাতটুকুও অজস্র চিন্তায় জেগেই কেটে যায়। কী করে তার মাথায় দেওয়া যায় এক খাবলা মাটি? দেওয়ার সময় যদি জানতে পারে! 'তরিবৎবালী'২ পচ্ছিমের মেয়ে আবার কী জানি কী ভাবে নেবে জিনিসটাকে। মেয়েটাই আমাকে গুণ করেছে কিনা কে জানে। না হলে এমন তো কখনও হয়নি। বিড়ি না খেলেও এত মন আনচান করে না। মেয়েটা 'শাঁখরেল' নয়ত? দূর কী যে 'অঠর পটর' ভাবি৩ তার ঠিক নেই।...

ঢোঁড়াই ঠিক করতে পারে না, বাওয়াকে তার এই শাদি করতে ইচ্ছার কথা বলবে কিনা। বাওয়া চেয়েছিল তাকে এই গোঁসাই থানের ভার দিতে। সেই জন্য তাকে 'ভকত' বানিয়েছিল। তার মাটিকাটার কাজ নেওয়ার পর থেকে বাওয়া বোধ হয় সে আশা ছেড়ে দিয়েছে; অন্তত তার পর থেকে আর কোনোদিন সে কথা বলেনি। তবুও লজ্জা লজ্জা করে বাওয়াকে এই শাদির কথা বলতে। বাওয়া যদি জিজ্ঞাসা করে টাকা পাবি কোথায়? তবে আজকাল বিয়ের খরচ একটু কমেছে মনে হচ্ছে, অথচ 'সরাধ' এর কানুনের৪ জন্য তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতেই হবে। লোকে খরচ করবে কোথা থেকে। অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছ থেকে টাকায় রোজ এক পয়সা করে সুদে গোটা কয়েক টাকা পাওয়া যেতে পারে। শুক্রা আর এতোয়ারী ধাঙড়ও কিছু দিতে পারে। দুখিয়ার মা? তার এক পয়সা মরে গেলেও না; এর জন্য শাদি যদি নাও হয় তাও ভাল! বেঁচে থাকুক অনিরুদ্ধ মোক্তার। বিয়ে শ্রাদ্ধয় ধার করবে না তো করবে কখন? কিন্তু শাদির পর বৌ থাকবে কোথায়? গোঁসাই থানে তো মেয়েমানুষের থাকবার জায়গা হবে না। মাটি কাটার কাজ থাকলে পয়সার অভাব হবে না; আর রামিয়া নিজেও কামাবে খুব; যা তাকৎ ওর গায়ে, ও 'কোদারীর' কাজ পর্যন্ত করতে পারে৫ দরকার হলে; এখানকার ঝোটাহাদের মতো খালি খুরপি দিয়ে মাটিতে সুড়সুড়ি দেওয় নয়। মরদের মজুরি কামাবে।

---

১ গুণীরা উদ্দেশ্য সিদ্ধকল্পে মন্ত্র পড়ে একটি বৃত্তাকার দাগ কাটে।

২ আদবকায়দা জানা স্ত্রীলোক।

৩ ছাইভস্ম; যে চিন্তার কোন মাথামুণ্ডু নেই।

৪ সরদা আইন।

৫ কোদাল। জিরানিয়ার কাছাকাছি স্ত্রীলোকেরা কোদাল নিয়ে কাজ করতে পারে না, সামাজিক বাধা অপেক্ষা শারীরিক অক্ষমতাই এর কারণ বলে বোধ হয়।

সন্ধ্যাবেলা আবার ঢোঁড়াই গলাকাটা সাহেবের হাতা থেকে কুল পেড়ে আনে। একেবারে গাছ ঝেড়ে পেড়ে নিয়ে যায় পাড়ার ছোঁড়াগুলো। আজকালকার ছেলেদের সাহস কি বেড়েছে। ঢোঁড়াইরা তো ছোটবেলায় গলাকাটা সাহেবের হাতার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেত। সে কিছুতেই ভেবে কুলকিনারা পায় না—কী করে একটু মাটি সে রামিয়ার মাথায় চুলে দেবে। খানিকটা মাথায় মাখবার সরষের তেল রামিয়াকে দিলে হয়—তার সঙ্গে এই মাটি একটু মিশিয়ে। মাথায় মাখবার তেল দিলে নেবে না, এমন 'ঝোটাহা' ঢোঁড়াই জীবনে দেখেনি। তবে এ হচ্ছে পচ্ছিমের পাখি, কী জানি যদি না নেয়। থানের পিদিপের জন্য বলে খানিকটা তেল মেয়েটাকে নিশ্চয় দেওয়া যায়; তাতে সংকোচের কোনো কথা নেই। অমন ঢের পচ্ছিমবালি ঢোঁড়াই দেখেছে।

বাওয়ার তেলের শিশি থেকে একটু তেল নারকোলের মালায় ঢেলে নেয়। ঢোঁড়াই এতদিন বাওয়াকে ঠাট্টা করেছে, কেন সে নারকোলের মালা দেখলেই কুড়িয়ে রেখে দেয়! এখন সে বোঝে যে বাওয়া সত্যিই বুদ্ধিমান। পুজোর পিদিপের তেল বলে দিলেও একটু আধটু মাথায় মেখেই নেবে, কমসে কম তেলের হাতটা মুছবে মাথায়। ঢোঁড়াই ভেবে রাখে যে, এই তেলটুকু থানেই রেখে দিতে বলবে রামিয়াকে। রোজ রোজ এখানে এসে যেন পিদিপে ঢেলে নেয়। না হলে বাড়ি নিয়ে গেলে রবিয়ার ঐ হ্যাংলা সাতগুষ্টির ভাল্লুকের মতো চুলেই—বাস্ এক মিনিটেই সাফ্।…

পিদিপটা আঁচলের আড়াল করে রামিয়া আসে গোঁসাইথানে সন্ধ্যাবেলায়। এসেই বলে—আজ বড় জলদি জলদি ফিরেছ কাজ থেকে। অথচ রামিয়া এইটাই আশা করেছিল। ঢোঁড়াই এখন না এলে একটু হতাশ হত। ঢোঁড়াইয়ের বুকের ভিতর তখন হাতুড়ি পিট্ছে, আবার ধরা পড়ে গেল না তো? একটু ঢোঁক গিলে সে রামিয়ার কথার জবাব দেয়—'হাঁ'।

থানে পিদিপ দেওয়ার আগে, আঁচলটা মাথায় দিতে দেখেই ঢোঁড়াইয়ের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে। কুল কটার সঙ্গে এক চিমটে মন্তরের মাটি মিলিয়ে রাখলে হয় না—পচ্ছিমের মেয়ের কখন কী মতিগতি কিছু বলা যায় না, কুল কটা নিশ্চয়ই আঁচলে বেঁধে নেবে; পরে আবার যখন আঁচলটা মাথায় তুলে দেবে, তখন কি মাটির একটা কণাও তাতে লেগে থাকবে না? হঠাৎ সে হড়বড় করে বলে ফেলে 'একটু তেল নেবে—'থান-এ দেওয়া পিদিপে জ্বালানোর জন্যে!'

কচি আমের ফালির মতো চোখ দুটোতে আগুনের ঝলক খেলে যায়।

'তোমার দেওয়া তেল আমি 'থান'-এ জ্বালব কোন দুঃখে? আমি কি রোজগার করে খেতে জানি না? রামজী কি আমায় হাত পা দেন নি? তোমাদের 'ঝোটাহা-দের' জানি না; আমাদের তারাপুরে এমন কথা মরদ বললে তার মোচ উপড়ে নিতাম!'

ঢোঁড়াই একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কী তেজ! কী দেমাক মেয়েটার! ফনফনিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। এই রামিয় শোন্ শোন্।

মেয়েটা ফিরে দাঁড়ায়।

'পশ্চিমের রীত রেওয়াজ তো জানা নেই।'

রামিয়ার চাউনি আগেকার মতো নরম হয়ে গিয়েছে আবার।

'গলাকাটা সাহেবের বাড়ির কুল নিতে তো মানা নেই তারাপুরের মেয়েদের?'

হেসে ফেটে পড়ে রামিয়া। এই চটে আবার এই হাসে, আজব পচ্ছিমের মেয়েদের 'চালচলন।'

'হাতে না। অনেক আছে। আঁচলটা ভাল করে পাত। ছোঁড়ারা কি কুল থাকতে দেবে গাছে ? দিনরাত গাছ ঠেঙাচ্ছে।'

রামিয়া চলে গেলে ঢোঁড়াই মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী। খুব সময় মতো মনে পড়েছিল কুলের সঙ্গে মাটি মিলিয়ে রাখবার কথা। রামিয়াটা আবার রোজ স্নান করে ; এখানকার 'ঝোটাহ'দের মতো না। কাল সকালে স্নানের আগে, এই আঁচলের ধুলোর কণা রামিয়ার চুলে লাগলে হয়। রামজী আর গোঁসাইয়ের উদ্দেশে সে প্রণাম করে, রামিয়ার মাথায় ঐ আঁচলের ধুলো একটুখানি লাগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়।

## কুক্কুরমেধ যজ্ঞের অপ্রত্যাশিত ফললাভ

জিরানিয়াতে আজ দুদিন থেকে একটা পাগলা কুকুরের উপদ্রব চলেছে। ছয়জন লোককে কুকুরটা এরই মধ্যে কামড়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের পোষা কুকুর বাড়িতে বেঁধে রাখেন। রাস্তার যে কোনো কুকুরই থাক না কেন, তার গলায় চেন কিংবা বকলেস না থাকলে তাকে মেরে ফেলা হবে। বেশ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এই নিয়ে শহরে। মিউনিসিপ্যালিটির মেথররা মোটা মোটা বাঁশ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কুকুরের পিছু এক টাকা করে তারা পাবে ; না কথাটায় একটু ভুল থাকল—এক জোড়া কুকুরের কান পিছু এক টাকা করে পাবে মেথররা! সদ্যোমৃত কুকুরের কান দুটো কেটে নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবকে দেখাতে হবে। এইটাই নিয়ম ; তবে জ্যান্ত কুকুরের কান কেটে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারলেও কে আর ধরছে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা মঞ্জুর, আর তাড়ির দোকানের সফেন আনন্দস্রোতের আবর্ত।

বিজনবাবুর বাড়ির সম্মুখে আমলকী গাছটার তলায় তাঁর আধ ডজন মেয়ের সিরিজ প্রাত্যহিক অভ্যাসমতো 'এক্কাদোক্কা' খেলছে। তারা সকলেই একই ছিটের আঁটো ফ্রক পরে, একজন হাসলে সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ে, একজন লজেন্স চিবিয়ে খেলে আর কেউ চুষে খায় না নিজের লজেন্সটা ; নতুন লোক দেখলে সকলে এক-থামের আড়ালে গিয়ে খিক খিক করে হাসে, একজনের ফ্রকে ধুলো লাগলে সকলে নিজের নিজের জামা একবার ঝেড়ে নেয়। এদের মধ্যে সব চাইতে যে ছোট তাকে পাড়ার বখাটে ছেলেরা অলমতি বলে ডাকে।

অলমতি হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে ওঠে—সে কুকুর দেখেছে, পাগলা কুকুর। অলমতির চিৎকারে শ্রীমতী চেঁচায়, সুমতি হাউমাউ করে ওঠে, বাকি তিনমতির ব্যাকুল কন্ঠ সকলের স্বর ছাপিয়ে ওঠে।

বিজনবাবু তীব্রগতিতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ওঠেন, গা-আলমারি থেকে বার করেন তাঁর বাবার আমলের পুরনো বন্দুকটা। লাইসেন্স রিনিউয়াল এর দিন ছাড়া তিনি বছরে কেবল আর একদিন করে বন্দুকে হাত দেন। প্রতি বছরের কেনা এক ডজন কার্তুজ, তিনি বছরের শেষে, এক সন্ধ্যায় দোতলার ছাত থেকে উড়ন্ত বাদুড়ের ঝাঁকের মধ্যে নিশানা করে ছোঁড়েন। ঐ একদিন তাঁর মেয়ের দল সন্ধ্যাবেলায় 'বাদুড় বাদুড় পিত্তি'র কোরাস গান বন্ধ করে। ঐ একদিন শুক্রা ধাঙড় মরা বাদুড়ের লোভে[১] বসে থেকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। আজ পর্যন্ত কোনো বছর

১ ধাঙড়রা বাদুড়ের মাংস খুব পছন্দ করে, খেতে নাকি 'খাস্তা' মচমচে।

একটা বাদ‍ুড়ও বিজনবাব‍ুর বন্দ‍ুকের গ‍ুলিতে মারা পড়েনি।

এই উড়ন্ত বাদ‍ুড় মারতে অভ্যস্ত হাত, তাই পাগলা কুকুর মারবার সময় একটুও কাঁপেনি। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার অন্যপাড়ের বাকসের জঙ্গলটা যেখানে নড়ছিল, সেখান থেকে গোঙার কাতরানির শব্দ আসে। বিজন উকিল আর পাড়ার অন্য কয়েকজন মিলে খানিক পরে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসেন বৌকাবাওয়াকে। তার ডান পায়ের উর‍ুতে বন্দ‍ুকের গ‍ুলিটি লেগেছে। সেখান থেকে রক্তের স্রোত বইছে। ময়লা কৌপীনটাতেও কিছ‍ু কিছ‍ু রক্ত জমে কালো হতে আরম্ভ হয়েছে। বিজনবাব‍ুর বাড়ির দোতলায় বৌকাবাওয়ার জায়গা হয়। চুপি চুপি বিমল ডাক্তারকে তখনই খবর দিয়ে আনা হয়, বন্দ‍ুকের ছিটগ‍ুলি বের করে দেবার জন্য। এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য বিজনবাব‍ুর স্ত্রী চিথরিয়া পীর-এ১ সিন্নি মানত করেন। বৌকাবাওয়া সে রাতটা বিজনবাব‍ুর দোতলাতেই থাকে। পরের দিন ব্যান্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে আসবার সময় বিজনবাব‍ুর স্ত্রী বলে দেন যে, রোজ তাদের বাড়িতে এসে যেন সে এক ঘটি করে দ‍ুধ খেয়ে যায়। ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে তা বিজনবাব‍ুও ভাবেন নি। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মান‍ুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। গোঁসাই থানে ফিরে গিয়ে বাওয়া সলাপরামর্শ করে, ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কী কথা হয় কে জানে। দ‍ুজনে মিলে আসে অনির‍ুদ্ধ মোক্তারের কাছে। কী মনে করে কী বিজনবাব‍ু উকিল? চিঁড়িয়ার সামিল মনে করে তাৎমা-দের। একটা বাদ‍ুড় মারার ক্ষমতা নেই আর বাওয়ার উপর বন্দ‍ুক দেগে দিল!

ফৌজদারী কাছারীতে বৌকাবাওয়াকে অনির‍ুদ্ধ মোক্তারের সঙ্গে ঘ‍ুরতে দেখে বিজনবাব‍ুর ম‍ুখ শ‍ুকিয়ে যায়। মোকদ্দমায় কিছ‍ু হোক না হোক, বন্দ‍ুকের লাইসেন্সটাকে নিয়ে টানাটানি করবে কলেক্টর সাহেব নিশ্চয়ই। বাঘে ছ‍ুঁলে আঠারো ঘা। দরকার কী হাঙ্গামা বাড়িয়ে। অনির‍ুদ্ধ মোক্তারকে ডেকে বিজনবাব‍ু একান্তে কথাবার্তা বলেন। ব্যাপারটা যাতে বেশি দ‍ূর না গড়ায় তার জন্য বিজনবাব‍ুর আর এখন টাকা খরচ করতে দ্বিধা নেই। বৌকাবাওয়াকে সাড়ে তিনশ টাকা দিতে তিনি তৈরি হয়ে যান।

বাওয়া ভয়ে কেঁপে মরে অত টাকার কথা শ‍ুনে। সতর কুড়ি টাকা। সে অনেক টাকা। এক কুড়ির চাইতেও বেশি। একটা চাঁদির পাহাড়। তা দিয়ে যা মন চায় করা যেতে পারে—র‍ুপোর মন্দির করা যেতে পারে গোঁসাই থানে; পেট ভরে ঢোঁড়াই জিলাপী খেতে পারে; ঢোঁড়াইয়ের 'শাদি' আর থাকবার ঘর তুলবার খরচা ঐ টাকা দিয়ে হতে পারে; অযোধ্যাজী যাওয়ার রেলকিরায়ার২ চাইতেও অনেক বেশি টাকা।

টাকাটা দেওয়ার সময় বিজনবাব‍ু বলেন একটু দ‍ুধটুধ কিনে খাবেন এই দিয়ে, বাওয়া। বৌকাবাওয়া ভাবে আজ সকালেও বিজনবাব‍ুর স্ত্রী উঠোন নিকিয়ে কম্বলের আসন পেতে তাকে ফল দ‍ুধ খাইয়েছিলেন; কিন্তু আজ থেকে এ বাড়ির ভিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। রামজী তার ভাল করলেন কি মন্দ করলেন তা সে ঠিক ব‍ুঝতে পারে না। এই উত্তেজনার মধ্যে টাকাটা দেখে বাওয়ার মনটা দমে যায়—চাঁদি নয়, 'লোট'! অনির‍ুদ্ধ মোক্তার টাকাটা গ‍ুনে নিয়ে তার হাতে দেন—এই এত্তো লোট! এই এক-

---

১ 'চিথরিয়া' মানে যেখানে ছেড়া নেকড়া টাঙানো হয় পীরের 'আস্তানে'।

২ রেল ভাড়া।

খানা 'লম্বরী'১। ওগুলো গুনে নাও—'পাঁচটাকিয়া দশটাকিয়া লোট'। বাওয়া দু তিনখানা গুনে হাল ছেড়ে দেয়। এত লোট! তার কপাল ঘেমে ওঠে। আর গোনাও কি সোজা কাজ। ছোট লোট তো বড় লোট ; একখানা থেকে আর একখানা আলাদাই হতে চায় না ; হরফ, ছবি, রঙবেরঙের লেখা, তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে আরম্ভ করে। সে কোনো রকমে টাকাটা অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছে রেখে দিয়ে বাঁচে ; পরে দরকার মতো নেবে।

অনিরুদ্ধ মোক্তার বলে, 'আমি খালি একখানা 'দশটাকিয়া' নেব।২ তুমি ভকত আদমী! আমরাও হিঁদু, তোমার কাছ থেকে বেশি নিলে আমারই পাপ হবে, আহা-হা থাক থাক বাওয়া ; আমার পায়ে হাত দিচ্ছ বাওয়া হয়েও? রামজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো। এ তো তিনিই করিয়েছেন আমাকে দিয়ে, আমার ধরমের কাজ।'...

বাওয়ার চোখ ফেটে জল আসে মোক্তার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। ইনিই তার রামরাজ্যের চাঁদির দুয়োর খুলে দিয়েছেন। ইচ্ছা হয় আরও খানকয়েক 'দশটাকিয়া' তাঁকে দিতে।...আচ্ছা সে পরে হবে। এখন সব টাকাই তো তাঁর কাছে থাকল।...

## মহতোগিন্নীর সমাজশাসন

রামিয়া পাড়ার মহতো নায়েবদের সুনজরে পড়তে পারে নি। মহতোগিন্নীর সহানুভূতি না থাকলে প্রথমটায় এই পরদেশী মেয়েটার তাৎমাটুলিতে জয়গা পাওয়া শক্ত হত। প্রথম থেকেই মহতো ভাবে, মুঙ্গের জেলার মধ্যে তারাপুর ডাকসাইটে গাঁ—পচ্ছিমের পানি, বাড়বাড়ন্ত গড়ন ; এ মেয়েকে সামলানো শক্ত হবে। মেয়েটা আবার একটু ছিনার৩ গোছের! অন্য পাড়ার এমন মেয়ে হলে দেখতে বেশ, বলতে বেশ ; যেমন ধাঙড়টোলার শনিচরার বৌ। কিন্তু নিজেদের বাড়িতে এ মেয়ে হলে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়! তাৎমাটুলিতে বিয়ের পর কোনো মেয়ে একটু-আধটু বাবুভাইয়াদের নেকনজরে পড়লে, স্বামীরা জিনিসটা বিশেষ অপছন্দ করে না। এতে স্ত্রীরা একটু ফরসা শাড়ি পরে, মাথায় তেল মাখতে পায়, 'পুরুখ'৪ দিনে রোজগারে না বেরুলেও তার 'ঝোটহা' রাগারাগি করে না। কিন্তু কুমারী মেয়ের বেলায় এ নিয়ম খাটে না।

তা ছাড়া এই 'সরাধের কানুনের'৫ যুগে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে মিছামিছি পাড়ায় একটা পাত্র খরচ। কটা ছেলেই বা মোট আছে তাৎমাটুলিতে। কুমারী মেয়ে পাড়ায়, সমাজের চোখের সম্মুখে অনাছিষ্টি কাণ্ড করবে, তা আর ধনুয়া মহতো বেঁচে থাকতে হওয়ার উপায় নেই। মহতো ছড়িদারকে হাড়ে হাড়ে চেনে। তার আর রবিয়ার বৌয়ের এই মেয়েটার উপর হঠাৎ সহানুভূতি উছলে উঠল কেন তা সে আন্দাজ করতে পারে। একি 'নট্টিন'দের৬ গ্রাম পেয়েছে নাকি! এখানে ওসব চলবে না—লাভের বখরা দিলেও না। কিন্তু প্রথম কদিন হুঁকোতে জোরে জোরে টান মারা ছাড়া কিছু উপায় ছিল না ; কোননা গুদরের মা মেয়েটার দিকে টেনে

১ একশ টাকার নোট। ২ দশ টাকার নোট।
৩ চটুলা। ৪ স্বামী।
৫ 'সরদা' আইন (বাল্যবিবহ বন্ধ করবার)।
৬ নাচ-গান করে যে জাতের মেয়েরা পয়সা রোজগার করে।

কথা বলত। ধানকাটনী থেকে ফিরবার পর ঝোটাহাদের একটু সমীহ করে চলতে হয়। সে জন্য মহতো তার স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করে নি। রামিয়ার পারিবারিক ইতিহাস ধানকাটনীর দলের কাছ থেকে মুখে মুখে পাড়ার বাইরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক একদিন মহতো দেখে যে হাওয়া গেছে বদলে। ভোরবেলা মহতো বসে 'কচর কচর' করে কাঁচা পেঁপে খাচ্ছে; মহতোগিন্নী এসে বলে, দাঁড়াও একটু নুন এনে দি।

মহতো অবাক হয়ে যায়। ব্যাপার কী? ধানকাটনীর পর কিছুদিন তো ঝোটাহা'দের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাওয়া যায় না।

গুঁদরের মা বলে, 'মেয়েটা বড় ঢঙ্গিলা'।১

'কোন মেয়েটা?'

'আবার কে, ঐ তারাপুরবালী।'

'সব সময় ঐ একই মুখ দিয়ে কথা বল না কি। এই তো তারাপুরবালীর তারিফে জিভ দিয়ে জল পড়ত।'

মহতোগিন্নী এ অভিযোগ মাথা পেতে নেয়।

'খোসা দেখে কি সব সময় ধরা যায়, বেগুনের ভেতর পোকা আছে কিনা।'

'মেয়েদের বুদ্ধি।'

'সে তো একশবার।'

তারপর আসল কথাটা প্রকাশ পায়। মেয়েটা নাকি ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে 'ঢলানি' আরম্ভ করেছে গোঁসাই থানে।

খবর শুনে মহতো চোখে অন্ধকার দেখে। তাদের পঙ্গু মেয়েটার একটা সুরাহা হয়ে যাবে, এ কথা নিয়ে তারা স্বামী স্ত্রী কতদিন কত জল্পনা কল্পনা করেছে, আর তাতে বাদ সাধল কিনা ঐ বেজাত মেয়েটা। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে ওঠে।

লোকে শাক খাওয়ার জন্য তেল পায় না। ছটপটবের দিনও স্নানের আগে মাথায় এক খাবলা তেল দিতে পারে না, আর ইনি গোঁসাই থানে পিদিপ জ্বালান রোজ। আড়াই পয়সায় এক ছটাক তেল। রবিয়ার এত পয়সা আসে কোথা থেকে? এদিকে তার বাড়িঘর তো নিলামে চড়াচ্ছে জমিদার, বাকি খাজনার ডিক্রিতে।

মাঝে থেকে মুশকিল হল রতিয়া ছড়িদারের। রামিয়াকে তাৎমাটুলিতে আনবার সময়, সে যেমন নির্ঝঞ্ঝাটে কিছু টাকা রোজগার করে নেবে মনে ভেবেছিল, এখন দেখে যে তা হবার নয়; একটা জায়গায় তার হিসাবে ভুল হয়েছে। সে ভেবেছিল লাভের 'হিসসা'২ দিয়ে মহতোকে হাত করবে। মহতোর সঙ্গে মিলে এ ধরণের কারবার সে অনেক করেছে। পঞ্চায়াতের 'নায়েব'গুলোর মতামত সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। সেগুলো সব সুরদাস৩; দিন আর রাতের তফাত বোঝে না। মহতোর চোখ দিয়েই তারা সব জিনিস দেখে; তার 'হাঁর সঙ্গে হাঁ মিলোয়'৪। টাকার লোভে মহতো গলে না, তা এই ছড়িদার জীবনে প্রথম দেখল। মহতোগিন্নীর সমর্থনের

---

১ ঢলানী।

২ অংশ। ৩ অন্ধ।

৪ 'হাঁ মে হাঁ মিলানা'—সায় দেওয়া।

উপরও কিছুটা নির্ভর করেছিল। দিন কয়েকের মধ্যে তাকেও রামিয়ার উপর বিরূপ দেখে, সে মাথায় হাত দিয়ে বসে। সে চালাক লোক, সব জিনিস দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে তার কাছে; এতদিনে সে বোঝে যে মহতোগিন্নীর নজর ছিল ঢোঁড়াইয়ের উপর। এ কি মুশকিলে পড়ল সে।

এসব ঝঞ্ঝাট একবার আরম্ভ হলে আর তার শেষ নেই। হলও তাই। পরদিন সকালেই ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর।

পরদিন ভোরে মহতোগিন্নী যাচ্ছিল জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ দেখে যে কুলের জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে, হলদ রঙের শাড়ি পরা একটি মেয়ে। কে মেয়েটা? ছাই, চোখে ভাল দেখিও না; তারাপুরের রাজকুমারী ছাড়া আর হলদে কাপড় এখানে কে পরবে? হাতে আবার দেখছি 'লোটা'! ব্যাপার কী? হয়তো মানতটানত করে থাকবে গোঁসাইথানে, তাই মরগামায় মোষের দুধ আনতে যাচ্ছে! কিন্তু জঙ্গলের দিকে যাবে কেন?

'ওরে ও রামিয়া, কোথায় চল্লি?' একমুখ হাসি নিয়ে রামিয়া জবাব দেয় 'এই ময়দানে১!'

'বলে কী ছুঁড়িটা? 'ময়দানে' যাচ্ছিস, ঘটি নিয়ে?'

'কেন, তাতে কী হয়েছে?'

'আবার জিজ্ঞাসা করছে, কেন। তুই কি মরদ 'লোটা' নিয়ে ময়দানে যাবি?'

'কোনো মরদের বাপের লোটা তো নিইনি।'

দেখ কী কথার কী জবাব! পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে মহতোগিন্নীর।

'বলি লজ্জা শরমের মাথা কি খেয়েছ? লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাচ্ছ, বেটাছেলেরা দেখলে বলবে কী? লোটা হাতে ঝোটাহা দেখলেই তো বেটাছেলেরা বুঝতে পারবে তুই কোথায় যাচ্ছিস, এই সোজা কথাটাও কি ঘটির মধ্যে গুলে গিলিয়ে দিতে হবে নাকি, তারাপুরের রাজকন্যাকে? এসব 'কিরিস্তানি' আচার-ব্যাভার আমার পাড়ায় চালাতে এসেছিস; একি 'নটিন'দের গ্রাম পেয়েছিস নাকি?'

মাথায় খুন চড়ে যায় রামিয়ার।

'জল না নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়া আমাদের পচ্ছিমের মুলুকে নেই; তা কোনো দিন শিখিও নি, পারবও না। জংলী মুলুকের নরম পানির লোক, তরিবৎ শেখাতে এসেছেন তারাপুরের লোককে!'

হাতের লোটাটা দড়াম করে মাটিতে রাখে। তারপর হাতের মুঠোর একটা মুদ্রা দেখিয়ে বলে, 'এমনি করে ঠুসে ঠুসে তোমার মধ্যে তরিবৎ গুঁজে দিতে পারি দশ বচ্ছর ধরে। এই যদি তোমাদের জংলী 'ভুচ্চর'দের টোলার নিয়ম হয়, তাহলে আমি এই এক লাথি দু-লাথি তিন লাথি মারি সে নিয়মে।' ঘটিটি কাৎ হয়ে পড়ে। গালির স্রোত একটানা চলতে থাকে। রামিয়া না মহতোগিন্নী কার পারদর্শিতা এ শাস্ত্রে বেশি বলা যায় না। লোক জড় হয়ে যায় সেখানে। পাড়ার মেয়েরা মহতোগিন্নীকে ঠেলেঠুলে বাড়ির দিকে নিয়ে আসে। মহতো তখন সবে একটু রোদ পোয়াতে বসেছে।

'তুমি না এ গাঁয়ের মহতো। তুমি থাকতে স্ত্রীকে, তোমার জাতকে, তোমার

---

১ হিন্দীতে 'ময়দান মে যানা'র অর্থ পায়খানায় যাওয়া। জল নিয়ে পায়খানায় যাওয়া তাৎমা মেয়েদের বারণ। মেয়েদের পক্ষে এর চেয়ে চরম নির্লজ্জতা আর কিছু হতে পারে না।

টোলাকে বেইজ্জৎ করে ঐ একরত্তি পরদেশী ছুঁড়িটা। কার সঙ্গে কেমন কথা বলতে হয় জানে না। 'অন্ধনগরী, চৌপটরাজা, টাকে সের ভাজি, টাকে সের খাজা'।১ বয়সের গরবে আজ আমার যা অপমান করেছে ঐ মেয়ে, ওকে যদি আমি 'জল না খাইয়ে ছেড়েছি'২ তবে আমি ডগরাহার মেয়ে না। আমাদেরও একদিন ছিল ঐ বয়স। কিন্তু কখনও কোনো দিন সমাজকে হেনস্তা করে লোটা নিয়ে ময়দানে যাওয়ার বেহায়াপনা করিনি। কী কুক্ষণেই এ মেয়েকে এনেছিলাম। এ যে 'ফুসকুড়ি খুঁটে ঘা করে তুললাম'।৩ ও ছুঁড়ি লাথি তো আমাকে মারেনি, মেরেছে জাতের মহতো নায়েবদের। থাকো তোমার ঐ মহতোগিরি, মোচ, আর তোমাদের তাৎমাছত্রি না কি জাত বলে তারই গরবে।'…

'কী! এতবড় আস্পর্ধা ঐ 'একচিমটি' মেয়েটার।' লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে মহতো বাড়ির বাইরে। 'কোথায় রতিয়া ছড়িদার। বোলাও নায়েবদের।' দুজন নায়েব গাঁ থেকে অনুপস্থিত ছিল সেদিন, গিয়েছিল ভিনগাঁয়ে 'কুটমৈতি'৪ করতে। 'আচ্ছা আসছে রবিবারে মেয়েটার বেহায়াপনার বিচার হবে, সাঁঝের বেলা; পঞ্চায়তে। লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাবে মেয়ে-মানুষে তাৎমাটুলিতে? আমরা বেঁচে থাকতে? কভভী নহী৫।' অকথ্য ভাষায় রামিয়ার উদ্দেশ্যে গালি দিতে দিতে মহতো বাড়ি ফেরে।

রামিয়া তখন রবিয়ার উঠোনে আপন মনে বকে, বুক চাপড়ায়, মাটিতে মাথা কোটে, মরা মায়ের নাম করে কত কী বলে কাঁদে। পাড়ার ছেলেপিলেরা রবিয়ার আঙনে উঁকিঝুঁকি মারে। ফৌজী ইঁদারাটার চারিদিকে ঝোটাহারা জটলা করে।

### বাওয়ার নিকট ঢোঁড়াইয়ের বর প্রার্থনা

তাৎমাটুলিতে শোরগোল পড়ে যায়। বাওয়া টাকা পেয়েছে। অনেক টাকা। এই এত্তো! টাকার পাহাড়, পুঁতে রাখতে গেলে ঘড়াতেই আঁটবে না তার লোটাতে কী বলছিস? কত আর বুদ্ধি হবে মেয়ে-মানুষের। হাঁড়ি নামিয়ে মহতোগিন্নী ছোটে; খুরপি হাতে নিয়ে রবিয়ার বৌ আসে; 'ফৌজী' ইঁদারাটার চারিদিকে খালি, ভরা, কাৎ হয়ে পড়া, মাটির কলসীর সার যেমন-কে-তেমন পড়ে থাকে। হরিয়াদের দলের সাতজন ঘর ছাইছিল শহরে; সেখান থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে আসে গোঁসাই-থানের দিকে। ঝোটাহার দল পাড়ার অলিগলিতে মাচার পাশে গাছের নিচে জটলা করে। মরদরা থানে পৌঁছুনোর পর তারা যাবে থানে। সেখানে তারা পিছনে আলাদা থাকবে। মরদের সঙ্গে সভায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা—মাগো! সে করুকগে ঐ ঢলানী ধাঙড়ানীর দল, সেটি আর এখানে হওয়ার জো নেই।

গোঁসাইথানে লোক গিজ গিজ করছে। ধাঙড়টুলি থেকে পর্যন্ত সকলে এসেছে, ঝুড়ি কোদাল নিয়ে। বাওয়া বসেছে মাঝখানটায়। তাকে ঘিরে বসেছে মহতো ছড়িদার আর নায়েবদের দল। এক মুহূর্তের মধ্যে বাওয়ার স্থান 'টোলার' মধ্যে

---

১ যেমন রাজ্য, তার তেমনি রাজা; এখানে শাকের দামও দুই পয়সা সের, খাজাও দুই পয়সা সের।

২ স্থানীয় ভাষার 'পানি পিলা কর ছোড়না'র মানে নাকানি চুবানি খাওয়ানো।

৩ হিন্দী প্রবাদ।

৪ কুটুম্বিতা। ৫ কখনও নয়।

অনেক উঁচুতে হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁড়াইয়েরও। বাবুলাল চাপরাসীর চাইতেও উঁচু কিনা তা এখনও ঠিক হয়নি। সময় লাগবে কথাটা বিবেচনা করতে।

মহতো বলে 'ঢোঁড়াইকে দেখছি না ; সে ছেলেটা আবার এখন গেল কোথায়।'

শনিচরা ঢোঁড়াইকে কনুই দিয়ে খোঁচা দেয়। রতিয়া ছড়িদার বলে, 'এদিকে এসে কাছে বস না কেন ?'

'এক জায়গায় বসলেই হল !'

তাৎমারা সকলেই মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয় ; আজও কি ঐ ধাঙড়দের মধ্যে না বসলেই নয়। ঐ এক ধরনের ছেলে।

আদুরে ছেলের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেবার উদারতা জেগেছে আজ সকলের মনে।

মহতো কাজের কথা পাড়ে। 'তা বাওয়া প্রসাদী তো চড়াতে হয়১ থানে—পেঁড়ার প্রসাদী। থানের দয়াতেই তো তোমার সব কিছু।'

বাওয়া ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

'আর একটা ভোজ।'

'একটা ভেড়া বলি।'

'থানের পাশে একটা ইঁদারা করে দিয়ে তার বিয়ে দিয়ে দাও২। না হলে বড় অসুবিধা হয় আমাদের 'দশবিধ'-এ৩।'

'থানের জন্য একখানা সীতা রামজীর রঙিন ছবিওয়ালা রামচরিতমানস কেনো।'

'টোলার ওজনের করতাল দুটো ভেঙে গিয়েছে ; তাই একজোড়া কিনে দাও।'

কত রকমের ফরমাস আসে। বাওয়া কারও কথার জবাব দেন না। ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে সলাপরামর্শ করে পরে যা করার তা করবে। এখন কেবল পেঁড়ার প্রসাদ সব পাবে।

মহতো নায়েবরা দুঃখিত হয়। সলাপরামর্শ করে বলার মানে সবাই জানে ; ও তো কেবল কথা চাপা দেওয়ার ফন্দি। এই থানের মাটি এককুড়ি বছর গায়ে মেখে তবে তো যখের ধন পেয়েছে। এখানে একটা মন্দির করে দেবে, এর মধ্যে সলাপরামর্শ আবার কী ! মন্দির করে দিলে নাম হবে তোমার না আমাদের ! ভিক্ষে করে যার জীবন গিয়েছে সে ইজ্জতের কথা কী বুঝবে ; 'নভ দুহি দুধ, চহত এ প্রাণী'৪। এর কাছে থেকে থানের আর পাড়ার কোনো জিনিস আশা করা, আকাশ দুয়ে দুধ চাইবার মতোই অবাস্তব। তবে টাকাওলা লোককে সমীহ করে চলতে হয়, তাদের সঙ্গে কথা বলবার আগে ভেবে বলতে হয়, আর সকলেরই মনে একটি ক্ষীণ আশা আছে যে আজকালকার মতো দুর্দিনে টাকা ধার করার জন্য হয়তো আর অনিরুদ্ধ মোক্তারের

---

১ পুজো দিতে হয়।

২ তাৎমাদের মধ্যে কুয়োর বিয়ে দেবার একটি প্রথা প্রচলিত। বিয়ের গান ইত্যাদি শুনলে বোঝা যায় এ কোনো এক 'কামলা'র সঙ্গে 'কোয়ালা'র বিবাহ অনুষ্ঠান। তাৎমাদের বিয়ের সময় এইরূপ কুয়োর জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ফৌজি কুয়ো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের। সরকারী কুয়োর ঐ সকল অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না, সেইজন্য নূতন কুয়োর কথা উঠেছিল।

৩ বিবাহ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান।

৪ তুলসীদাস—আকাশ দুয়ে দুধ চায় লোক।

খোসামোদ করতে হবে না।

ঢোঁড়াইকে বাওয়া শহরের দিকে পাঠায় পেঁড়া কিনতে। বাবুলাল ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যই বলে, 'ঢোঁড়াই লছমন হালুয়াই-এর দোকান থেকে নিয়ে আসিস।'

মহতোও সায় দেয়, 'হাঁ লছমন হালুয়াই, পেঁড়াতে চিনি কম দিয়ে ঠকায় না।' কথার সুরে মনে হয় যেন সে রোজই লছমনের আর অন্য মিঠাইওয়ালাদের দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়ে থাকে।

এখন পয়সার আকাল এসেছে দেশে। টাকার দরকার তাৎমাদের সকলেরই। এরই মধ্যে টাকার আণ্ডিল পেল কিনা বাওয়া! ছেলে নেই, পিলে নেই, ঘর নেই, সংসার নেই, 'শাদি সরাধ-এর' কোনো ফিকির নেই,১ খাওদাও ডুগডুগি বাজাও, 'না আগে নাথ, না পিছে পগাহা'২। সেই বাওয়ারই খুলল 'তকদীর'৩!

তবে ঐ যে ধাঙড়গুলো বসে রয়েছে, ওগুলো বেশ করে বুঝুক যে ঢোঁড়াই ওদের সঙ্গে মাটি কাটে বলে, ওরা ঢোঁড়াইয়ের সমান হয়ে ওঠেনি।

অনেকরাতে ভজন শেষ হবার পর সকলে চলে গেলে বাওয়া ঢোঁড়াইকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের চাটাইয়ের উপর শোয়ায়—সেই ছোট বেলার মতো। আজ ক'বছর থেকে তারা আর এক চাটাইতে শোয় না। শীতকালে আগুনের 'ঘুর'-এর এক দিকে শোয় ঢোঁড়াই, একদিকে বাওয়া—তা না হলে বড় শীত করে। বহুদিন পরে আজ আবার বাওয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। বাওয়ার জটার গন্ধে ঢোঁড়াইয়ের কত ছোট বেলার কথা মনে পড়ে।

'অনেক টাকা, না বাওয়া?'

বাওয়া মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ।'

'অনেক কুড়ি—না?'

'হাঁ।'

তারপর ঢোঁড়াই একেবারে চুপ করে যায়। বাওয়া ভাবে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ছেলেটা।

হঠাৎ ঢোঁড়াই বলে, 'বাওয়া, আমি রামিয়াকে শাদি করব। নিশ্বাস বন্ধ করে ঢোঁড়াই বাওয়ার উত্তরের প্রতীক্ষা করে। বাওয়া তার ভালবাসার অত্যাচার ছোটবেলা থেকে অনেক সয়েছে। কত সময় কত অন্যায় করেছে সে, কিন্তু বাওয়া সব সময় নিজের ব্যবহার দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার উপর অবিচার করার, জুলুম করার দাবি আছে। এই দাবিই ঢোঁড়ায়ের আসল পুঁজি। কিন্তু তবু আজ তার মনের মধ্যে খচখচ করে বেঁধে—'শাদি'র কথায় কোথায় যেন খানিকটা অনায্যতা আছে। বাওয়া চেয়েছিল তাকে 'ভকত' করতে; বিয়ের পর বাওয়ার কাছ থেকে আলদা হয়ে যেতে হবে; অথচ বাওয়া টাকা না দিলে রামিয়ার সঙ্গে শাদি হওয়া শক্ত। একটার পর একটা করে এই সব চিন্তা ঢোঁড়াইয়ের মনে আসে। তার মনে হয়

---

১ বিয়ের শ্রাদ্ধর কোনো চিন্তা নেই।

২ হিন্দী প্রবাদ—যে লোকের আগেপিছে ভাববার দরকার নেই।

শব্দার্থ: (বলদের) না আছে নাকের দড়ি সম্মুখে, না আছে রাশের দড়ি পিছনে।

৩ ভাগ্য।

বাওয়ার করস্পর্শ মুহূর্তের জন্য একটু যেন আলগা হয়ে আসে। রামিয়া, রামিয়াকে তার চাই-ই। কোনো বাধা সে মানবে না।

ঢোঁড়াই বোঝে যে বাওয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আঙুল দিয়ে ঢোঁড়াই তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। বাওয়া তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এই দিনটার অপেক্ষা বাওয়া অনেক দিন থেকে করছে। আর এ বিচ্ছেদকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। টাকার প্রশ্ন এর মধ্যে কেবল গৌণ নয়; এক রকম অবান্তর। ঢোঁড়াই বিয়ে করবে এ বাওয়া ক বছর আগে থেকেই ধরে নিয়েছে, আর বিয়ের পর তাৎমা ছেলেমেয়েদের মা-বাপ শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে থাকার রেওয়াজ নেই।

ঢোঁড়াই জানে যে বাওয়া টাকা দিতে আপত্তি করবে না। আর বাওয়া মনে মনে ভাবে যে ঢোঁড়াইটা এখনও ছেলেমানুষ আছে, মোচ উঠলে কী হয়; না হলে আজ যে খানিক আগে সকলে টাকা খরচ করবার নানারকম রাস্তা দেখাচ্ছিল তখন সে কারও কথার জবাব দেয়নি কেন। ওরে মুখ্যু, এই সোজা কথাটুকু বুঝতে পারলি না। থানে মন্দির তৈরি করবার চাইতেও বেশি আনন্দ আমার তোকে সুখী দেখলে, একথাও কি মুখ ফুটে তোকে বলতে হবে নাকি? ছোটবেলায় যখনই তোকে কোলে নিয়েছি, তখনই মনে হয়েছে যে বুড়ো রাজা দশরথ অযোধ্যাজীতে এমনি করেই একদিন তাঁর রামচন্দ্রজীকে কোলে নিয়েছিলেন।

'ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে
ভুপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে।'১

আমার সেই ঢোঁড়াই কথাটা পাড়ল, যেন ভিক্ষে চাইছে টাকা আমার কাছ থেকে! আশ্চর্য! কী চিনেছে সে আমাকে? আরে তোরই তো সব।

ঢোঁড়াইয়ের ঘর তুলে দিতে হবে। ভাল রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর ছেলেপিলে; বাড়বাড়ন্ত সংসার ঝকঝকে নেপে উঠোন, বড় বড় কাঁচামাটির জালা দাওয়ার উপর; ঢোঁড়াইয়ের বৌ রঙিন কাপড় পরে কাঁচা হলুদ সিদ্ধ করছে শুখিয়ে বিক্রি করবার জন্য, তেঁতুল গাছ জমা নিয়েছে পাঁচ টাকায়, আদা দিয়ে বড়ি দিচ্ছে উঠোনে, আমলকী আর অশথের ডগার আচার শুখোতে দেওয়া হয়েছে;— সমৃদ্ধির রামায়ণের ছবিভরা পাতা, একখানার পর একখানা খুলে যাচ্ছে বাওয়ার বন্ধ চোখের সম্মুখে। তার ঢোঁড়াই, সেই একরত্তি ঢোঁড়াই, ভিক্ষের সাথী ঢোঁড়াই। কথা বলতে পারে না বাওয়া। কী করে সে ঢোঁড়াইকে বোঝাবে তার মনের এত অব্যক্ত কথা, ভিক্ষের চালের মতো একটি একটি করে জমানো, তার মনের কত অশ্রু বেদনা ভরা কথা। ঢোঁড়াইকে একদিনও দুবেলা ভাত খাওয়াতে পারেনি। কত সাধ তার মনে। ঢোঁড়াইকে একদিন পেট ভরে আলুর তরকারি খাওয়াবে। তাকে একটা 'বিলিতি লণ্ঠন'২ কিনে দেবে। সেই লণ্ঠনের আলোতে মিসিরজী রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছেন। কত লোক! এই তো দেশি চিনি, পাকা শশা খোসা সুদ্ধ চাকা চাকা করে কাটা, এত হলদে হলদে 'বাগনর',৩ রমরমা জমজমা সমৃদ্ধির পাহাড় ফুলে ফেঁপে উঠছে। অশ্রুর ধারা তার এতকালের সঞ্চিত দুঃখের মালিন্য ধুয়ে নিয়ে

---

১ তুলসীদাস ধূলি ভরা ধূসর তনু (রামচন্দ্রের): রাজা হেসে তাঁকে কোলে তুলে নেন।

২ ডিজ লণ্ঠন।

৩ কাঁচকলা পাকা।

যায়। রামজী! অদ্ভুত তোমার লীলা। রামায়ণপড়া লোকই কত সময় বুঝতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, তা বাওয়া তো কোন ছার। ঢোঁড়াইয়ের মায়ায় সে কি ভরতরাজার মতো হয়ে যাবে নাকি। সামান্য কুকুর কামড়ানোর ঘটনার মধ্যে দিয়ে রামজী তার সম্মুখে স্বর্গের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, পৃথিবীর স্বর্গ অযোধ্যাজীর দুয়ার, বাওয়ার চিরজীবনের স্বপ্ন, মানুষের সেরা তীর্থের দুয়ার। সে যদি 'নালায়েক'১ হয়, তবেই সে রামজীর এই অদৃশ্য ইঙ্গিত মানবে না···ঢোঁড়াইটা এখনও উসখুস করছে, চাটাইয়ের নিচে থেকে ঠাণ্ডা উঠছে বোধ হয়,···ঢোঁড়াইকে জীবনে একখানা কম্বল কিনে দিতে পারেনি।···ঢোঁড়াই সুখী হবে তো রামিয়াকে বিয়ে করে? মেয়েটা আবার শুনছি লোটা নিয়ে ময়দানে যায়!···

বাওয়ার হাতের স্পর্শের ভিতর দিয়ে ঢোঁড়াই তার সমস্ত মনের কথা বুঝতে পারে। জীবনে এই প্রথম ঢোঁড়াইয়ের চোখে জল আসে।...

## ঢোঁড়াইয়ের বিবাহের আয়োজন

রোজগারের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হচ্ছে তাৎমাদের। ধানকাটনীর ধান আর কদিন চলবে। খাপড়ার বাড়ি আর নূতন করে বাবুভাইয়ারা করাচ্ছে না। ঐ যে এক ফঙ্গবেনে ঢেউখেলানো টিন হয়েছে, লোকে গোয়াল পর্যন্ত করতে আরম্ভ করেছে তাই দিয়ে; তা কাজ পাওয়া যাবে কোথা থেকে। এখনও অবিশ্যি পুরনো খাপড়ার বাড়িগুলো আছে; তাও কতক লোকে বদলে টিন দিয়ে নেওয়া আরম্ভ করেছে, বছর বছর খাপড়া বদলানোর ঝক্কি আর খরচের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সুদখোর অনিরুদ্ধ মোক্তার আর সাওজীর তো টাকার অভাব নেই। তারা নতুন ভাড়া দেবার বাড়ি করাচ্ছিল সব ঐ ঢেউখেলানো টিনের। তাদের দুজন ভাড়াটের মাথায় গোঁসাই ভর করেছিলেন জৈঠ মাহিনার দুপুরে২—আমাদের রুজি মারবার জন্য বটে। কাঁচা আমপোড়া খাইয়ে কোনো রকমে তো তারা সেরে উঠল, কিন্তু তারপর আর কেউ টিনের বাড়িতে থাকতে রাজী নয়। তাইতে এখন আবার সব বাড়ির টিনের উপর খাপড়া তো আর বছর বছর বদলাতে হবে না। তবু মন্দের ভাল! এ হল কি দুনিয়ার। দিনে দিনে সব বদলে যাচ্ছে। আগে দেখেছি কদু কুমড়োর গাছে বাবুভাইয়াদের বাড়ির চাল ভরে থাকত; আর বাবুভাইয়াদের ছেলেরা চব্বিশ ঘণ্টা খাপড়াগুলো মট্‌মট্‌ করে গুঁড়ো করে কদু-কুমড়ো পাড়ত। আজ সে গাছ পোঁতাও নেই, সে ছেলেগুলোও বদলেছে। ছেলে তো ছেলে! দুনিয়াটাই বদলে যাচ্ছে! সে রকম বৃষ্টি কোথায় হয় আর, যেমন আগে হত; যতক্ষণ তাৎমারা গিয়ে চাল মেরামত না করে দিচ্ছে, ততক্ষণ বাবুভাইয়ারা সকলে খাটের তলায় বসে থাকত। সে রকম বড় বড় 'পাত্থল'ও৩ পড়ে না আজকাল—সে রকম খাপড়া গুঁড়ো করা 'পাত্থল'। আগে বারোমাস মরণাধারে জল থাকত; এখন বছরে ছ'মাসও থাকে না।

কুয়ো খোঁড়ানো, আর কুয়ো পরিষ্কার করার রোজগারেরও ঐ হালৎ। বাড়ি বাড়ি 'বম্‌মা'৪ বসেছে আজকাল। বাবুভাইয়াদের বলতে গেলে বলে 'বম্‌মা' বসাতে খরচ, কুয়ো তৈরি করার খরচের চাইতে কম। বাবুভাইয়ারা সব তাদের বাপ-ঠাকুরদার চাইতেও বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। পয়সা আছে তোদের, যা বোঝাবি বুঝে

১ অযোগ্য।
২ জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে।
৩ শিলাবৃষ্টি।
৪ টিউবওয়েল।

যাব ! কিন্তু বুঝলেই কি পেট ভরে ?

রতিয়া ছড়িদারের দরকার টাকার। ওদিকে তো রোজগারের ঐ অবস্থা। তার উপর পঞ্চায়েতেও কম মামলা আসছে। ভোজে খরচ করার পয়সা থাকলে তবে তো লোকে পঞ্চায়েতে মামলা আনবে।

তাই ছড়িদার আসে রবিয়ার সঙ্গে গোটাকয়েক কাজের কথা বলতে। ঢোঁড়াইটার রামিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে পারলে কিছু রোজগার হতে পারে দুজনেরই।

'চলে এস আট আনা—আট আনা।'১

রবিয়া বলে, 'তা কী করে হবে। এ কি অন্ধকে লণ্ঠন দেখাচ্ছ ? আমি মেয়েটাকে এতদিন থেকে খাওয়াচ্ছি। দশ আনা—ছে আনা হলেই কাফি।'

'ধানকাটনীতে তোর বৌয়ের সঙ্গে মেয়েটাকে জুটিয়ে দিয়েছিল কে ? পঞ্চদের মত করাতে পারবি, এই বিয়ের পক্ষে ? সে সময় দরকার হবে ছড়িদারের। মহতো আবার যা বিগড়ে আছে মেয়েটার উপর ! রবিবারে পঞ্চায়তি, মনে আছে তো ?'

রবিয়া জানে যে, কথায় ছড়িদারের সঙ্গে পারা শক্ত। সে ছড়িদারের দেওয়া শর্তে রাজী হয়ে যায়।

টাকাওয়ালা লোকের বিরুদ্ধে 'পঞ্চ'রা যেতে পারে না, একথা সবাই জানে। রবিবারে পঞ্চায়তির ভিতর মহতো পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পায় না ; কেবল ভোজের সম্বন্ধে কথা হয়। মহতোর সম্মান রাখবার জন্য নায়েবরা ঠিক করে দেয় যে রবিয়া এখনই গিয়ে মহতোগিন্নীর 'গোড় লাগবে।'২ লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাবার কথাটা কেউ তোলেই না। ভাবী 'পুতহুর'৩ নির্লজ্জতার কথা উঠিয়ে আজ আর তারা বাওয়ার মতো একজন লোকের মাথা হেঁট করাতে পারে না।

বাওয়া ভেবেছিল যে, আর দু'চার মাস যাক ; কিন্তু রবিয়ার টাকার দরকার এখনই। সে বলে, 'ভাদ্রতে দেবে নাকি বিয়ে—পুরুব মুলুকের 'বেঙ্গার শাদি৪।' বাওয়া লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়ে—'না না তা বলছি না। তবে থাকবার ঘর তুলতে হবে তো।'

'সে আর কী ? সাতদিনের মধ্যে সব হয়ে যাবে।' সত্যিই সাতদিনের মধ্যে সব তৈরি করে দেয়, ঢোঁড়াইয়ের তাৎমাটুলি আর ধাঙরটুলি দু' জায়গার বন্ধুরা মিলে। বাওয়ার ইচ্ছা উঠোনের মধ্যে একটি পাতকুয়া থাকুক···প্রত্যহ স্নান করার অভ্যাস রামিয়ার। ছড়িদার চটে যায়—'তার চাইতে বল না কেন, বাড়িতে পায়খানা তৈরি করবে, চেরমন সাহেবের বাড়ির মতো।'

বাওয়া কিন্তু নিজের জিদ ছাড়ে না, 'কুয়ো এখন না করলে বর্ষাতে করা যাবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কুয়ো হয়ে যাবেখন'—বুড়ো এতোয়ারী ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করে দেয়।

---

১ আধাআধি বখরা।

২ প্রণাম করবে। ৩ পুত্রবধূ।

৪ জিরানিয়ার পূর্বদিকের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির হিন্দুরাও ভাদ্র মাসে বিবাহাদি দেয়। সেইজন্য জেলার পশ্চিমের লোকেরা এই বিবাহকে ব্যাঙের বিয়ে বলে ঠাট্টা করে।

ধাঙড়রা ঢোঁড়াইয়ের ঘর তুলতে সাহায্য করে। রবিয়া ঢোঁড়াইকে বলে, 'আবার ওগুলোকে ডাকছিস কেন ঢোঁড়াই?' দুদিনের মধ্যে রবিয়া তার শ্বশুরস্থানীয় হয়ে উঠেছে। ঐ মিচকে রবিয়াটা বাওয়ার বেয়াই হয়ে যাবে। হাসি পায় ঢোঁড়াইয়ের। বুড়ো এতোয়ারী সোডা কোম্পানী থেকে ছুটি নিয়ে ঢোঁড়াইয়ের বাড়ির বেড়া বাঁধতে বসে, আর বাওয়াকে মধ্যে রেখে অন্য তাৎমাদের সঙ্গে গল্প জমায়। এ গল্প সে গল্প।—'চৌকিদারী খাজনা' আবার বাড়িয়েছে তহশীলদার। তাৎমাটুলির ও ধাঙড়টুলির। বেইমানি করেছে। রবিয়ারও ধরেছে বারো আনা, আবার বাবুলাল চাপরাসীরাও বারো আনা। রবিয়ার বারো আনা হলে বাবুলালের তিন টাকা হওয়া উচিত; নিশ্চয়ই টাকা খেয়েছে তহশীলদার। শনিচরার কী করেছে জান? লিখে দিয়েছে যে, বছরের শেষে খরচ-খরচার পর ওর পঞ্চাশ টাকা বাঁচে। ঝুঠ্ঠা'১ কোথাকার। এর কিছু প্রতিকার হওয়া দরকার।

রবিয়া বলে—ঠিক বলেছ এতোয়ারী। তহশীলদারটা আমার পিছনে কেন লেগেছে জানি না। একটা বাকি খাজনার ডিগ্রিও করিয়েছে আমার খেলাপে। 'অত বড় টাট বাঁধিস না ঢোঁড়াই'; গল্পের মধ্যেও সবদিকে নজর আছে এতোয়ারীর। 'বীচেকলার গাছ পোঁতার জন্য পিছনে একটু একটু জায়গা থাকবে'—সকলের মনে পড়ে বাড়ির সঙ্গে একটু আবরুর দরকার হবে রামিয়ার।২ ঢোঁড়াই নিজেই কুয়োর পাট বসায়, মাটি আনতে ছোটে। বড় আস্তে আস্তে কাজ হচ্ছে; আর তর সইছে না তার। সে ভাবে বাড়ি তৈরি করার সময় একবার রামিয়াকে এনে দেখাতে পারলে হত। পচ্ছিমে মেয়ের পছন্দ অপছন্দ দরকার-অদরকারের খবর তাদের কারুরই জানা নেই। ঐ তো কলাগাছের আবরুর কথা কোনো তাৎমারই মনে ছিল না—ভাগ্যে এতোয়ারী ছিল। বাওয়া সব বিষয়ে 'পঞ্চ'দের মতামত জিজ্ঞাসা করে, আর ঢোঁড়াইকেও তাই করতে বলে। 'এখন তোর সংসার হল; আর এখন 'পঞ্চ'কে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না। যে সমাজে থাকবি তার সঙ্গে বনিয়ে চলতে হবে।'

ঢোঁড়াই গম্ভীর হয়ে শোনে- মুখ দেখে মনে হয় যে, এ বিষয়ে তারও মত ঐ একই।

বাওয়ার ইচ্ছে করে, ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করতে—'হ্যাঁরে ঢোঁড়াই, তোর কি একটু কষ্ট হচ্ছে না, আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে'।—দূর একথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে!

সুত মানহিঁ মাতু-পিতা তব লোঁ।
অবলা নাহিঁ ডীঠ পরী জব লোঁ ॥৩

আর কি এখন ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার কথা ভাববার ফুরসত আছে? ভুলুক সে বাওয়াকে; কিন্তু রামচন্দ্রজী! সে নিজে যেন সুখী হয়। রবিয়ার বৌ ছুটতে ছুটতে আসে—রামিয়ার ইচ্ছে একটা তুলসীগাছের বেদী করার উঠোনে। সকলে লজ্জিত হয়ে যায়, দেখ তো কত বড় ভুল হয়ে যাচ্ছিল, মরদদের কি অত মনে থাকে।

---

১ মিথ্যাবাদী।

২ প্রতি বাড়ির পিছনে অন্তত এক ঝাড় কলাগাছ ধাঙড়েরা রাখে মেয়েদের আবরুর জন্য।

৩ ছেলে ততদিনই বাপমাকে মানে, যতদিন তার চোখ স্ত্রীর উপর না পড়ে।

—তুলসীদাস।

বাওয়ার মুখ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে—পচ্ছিমের মেয়ে, সংস্কার ভাল। ঢোঁড়াই সুখী হবে ; তাঁর ঢোঁড়াই।

## ঢোঁড়াই রামিয়ায় বিবাহ অনুষ্ঠান

তাৎমাটুলির বিয়েতে যারা বরপক্ষ, তারাই কন্যাপক্ষ। মহতোগিন্নী, রতিয়া ছাড়িদারের বৌ, দুখিয়ার মা, হারিয়ার বৌ, এরাই 'পানকাট্টী'তে১ যায় ফৌজী ইঁদারা তলায় ; এরাই 'গোঁসাই জাগাবার গান' গায় বিয়ের আগের দিন ; তাদেরই বাড়ির পুরুষরা বরযাত্রী হয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে 'দুয়ার লাগার'২ অশ্লীল গান আরম্ভ করে। এ-বিয়েতে আবার ধাঙড়রাও বরযাত্রী এসেছে। বাওয়াকে দেখে আজ হুঁকো নামিয়ে রাখে রবিয়ার বৌ। মাথার কাপড় টেনে দিয়ে বলে, হাতের ঐ চিমটে দিয়ে 'সমধী'৩ তোমার ছেলেটাকে কোথা থেকে টেনে বের করেছিলে ? অঙ্গন-ভরা লোক হেসে ওঠে এই রসিকতায়।

দুখিয়ার মায়ের আজ খাতির কত ! হঠাৎ দুখিয়ার মা ঢোঁড়াইয়ের মা হয়ে উঠেছে। কিছু কাজ করতে গেলেই সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে। চেলাকাঠ পেতে দিয়ে বলে, বসো 'সমধীন'৪। মেয়ের বাড়িতে তুমি খাটবে, সে হয় না। এই নাও তামাক খাও। দেখো না তোমাকে আজ কী গালাগালিটা দিই।

পাঁচ এয়োত তেল, সিঁদুর গুলে মাটিতে পাঁচটা ফোঁটা দেয়। নাপিত ঢোঁড়াইয়ের আঙুল চিরে রক্ত বের করে দুটো পানের খিলিতে লাগিয়ে দেয়। এইবার নাপিত ধরেছে শক্ত করে রামিয়ার হাতখান, এই নরুন দিয়ে চিরে দিল। টপ টপ করে রক্ত পড়ছে পানের খিলির ভিতরে ! খুব শক্ত মেয়ে যাহোক, এ পর্যন্ত যত মেয়ের বিয়ে দেখেছে ঢোঁড়াই ছোটবেলায়, সকলেই এই সময় ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলে। রামিয়া একবার ভুরুটি পর্যন্ত কোঁচকাল না ! আলবৎ হিম্মৎ বটে ! রক্ত দেওয়া পানের খিলি ঢোঁড়াই খাওয়ায় রামিয়াকে। রামিয়া দিব্যি কচমচ করে চিবোয়। রবিয়ার বৌ ইশারা করে, অত হ্যাংলাপানা করে চিবুস না, লোকে বেহায়া বলবে। ঢোঁড়াইয়ের মুখে পান দিয়ে দেয় রামিয়া। ঢোঁড়াই ভকতের রক্তের কথা ভেবেই গা ঘিনঘিন করে। নোন্তা নোন্তা লাগে খেতে—সামুয়রটা আবার রামিয়াকে বলেছিল 'নোন্তা মেয়ে'। চমৎকার মানিয়েছে রামিয়াকে লাল শাড়িটিতে। কাপড়টা পছন্দ করেছে বাওয়া নিজে, লালের উপর হলদে ফুল। সিরুমলের দোকানের কাপড় ভারি টেকসই ; দামও নেয় 'পুরো'—তিন টাকা বার আনা।

বর-কনে দুজনে মিলে উখলিতে ধান ভানে৫। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনেই দুহাত দিয়ে 'সামাট'টাকে৬ ধরেছে। মহতোগিন্নী ঠাট্টা করেন—'সব দেখে যাচ্ছি, বর কনেকে মেহনৎ করতে দিচ্ছে না।' দুখিয়ার মা বলে, 'তুমি থাম দিদি এখন।' হঠাৎ দুখিয়ার মা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে…'আজ ঢোঁড়াইয়ের বাপ বেঁচে নাইরে।…এসে

---

১ 'জল সহা'র ন্যায় একটি স্ত্রী-আচার।
২ বরযাত্রীরা মেয়ের বাড়ির দুয়ারে এলে আরম্ভ হয় 'দুয়ারলাগা'র গান।
৩ বেয়াই।
৪ বেয়ান।
৫ উদুখল। ৬ উদুখলের মুষল।

দ্যাখো ছেলে আজ তোমার কত বড় লোক।' বাবুলাল চাপরাসী পর্যন্ত এতে বিষণ্ণ হয় না আজ!

মিসিরজী গুটিকয়েক চাল উখলি থেকে তুলে নিয়ে মনে মনে গুণতে আরম্ভ করেন। মেয়েপুরুষ সকলের নজর গিয়ে পড়েছে মিসিরজীর হাতের দিকে। চাল সংখ্যায় বেজোড় হলেই এ বিয়ে সুখের হবে না। তবে সকলেই জানে যে বেজোড় সংখ্যার চাল কখনও মিসিরজীর হাত ওঠে না। আর পঞ্চায়তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এলেই মহতো নায়েবরা বলে যে ফৌজী ইঁদারার জল দিয়ে 'পানকাট্টি' করা হয়েছিল বলেই বিয়ের ফল এমন হয়েছে—ও ইঁদারাটার বিয়ে দেওয়া হয়নি তো?

পুরুতমশাই চাল গুনবার সময় রামিয়া ঢোঁড়াই দুইজনেরই বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। ঢোঁড়াই সঙ্গে সঙ্গে গুনে যায় মনে মনে—এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়। ঢোঁড়ায়ের ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়, 'মাড়োয়ার'১ চাটাইটা যেন পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে...মিসিরজী সকলকে বলেন যে, চাল উঠেছে দশটা, জোড়া সংখ্যা, এ-বিয়ে খুব সুখের হবে। ঢোঁড়াই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। যাক! তার বোধ হয় গুনতে ভুলই হচ্ছিল; রামায়ণপড়া মিসিরজীর মতো তাড়াতাড়ি সে গুনতে পারবে কোথা থেকে। তাই একটা কম গুনেছিল সে।

এইবার মহতোর রামায়ণ থেকে ছড়া কাটবার কথা। কোথায় মহতো? তার বলা শেষ না হলে তো মিসিরজী নিজের ছড়াটা বলতে পারেন না। চিরকালের এই নিয়ম। মহতো ঢুলছিল বসে। সে নেশার আমেজে আছে এখন। হঠাৎ চমকে উঠে হড়বড় করে বলে ফেলে—

'সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী।
হোইহি সন্তত পিয়হি পিয়ারী॥'

সব সুলক্ষণ আছে এ মেয়ের। এ চিরকাল 'পুরুখের' পিয়ারী থাকবে।

এইবাব মিসিরজী বলেন—

'সদা অচল এহি কর অহিবাতা।
এহি তেঁ জসু পইহহিঁ পিতুমাতা॥'

এর এয়োতি অচল থাকবে; এর জন্য এর বাপ-মার নাম হবে।

বাওয়ার বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে। বহুদিন পর আজ দুখিয়ার মাকে ঢোঁড়াইয়ের খুব ভালো লাগে; চোখের জল ফেলছে তার বাবার জন্য, যে বাপের কথা ঢোঁড়াই জীবনে একদিনও ভাবেনি। বাওয়াও দুখিয়ার মায়ের ছেলে উপর এই নতুন টান দেখে মনে মনে খুশি হয়; হাজার হলেও মা—যাক ঢোঁড়াইয়ের বৌটাকে একটা দেখবার লোক তবু হল।

নাপিত চিৎকার করে—কোথায় গেলে দুই 'সমধী'।

উখলির ধান বাওয়া একমুঠো দেয় রবিয়াকে; আর রবিয়া একমুঠো ধান দেয় বাওয়ার হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের একটানা গান আরম্ভ হয়ে যায় দুখিয়ার মাকে লক্ষ্য করে।

'বুজরুকি রাখ 'সমধীন',
বল ছেলের বাপটি কে
উর্দি-পরা চাপরাসী, না লেঙট-পরা সন্ন্যাসী?

---

১ মণ্ডপের।

না অন্য কোনো নাগর ছিল,
বলেই ফেল ছাই ?
'খুসুর ফুসুর খুসুর ফুসুর'
কর কেন ?[১]
অন্য কোনো নাগর বুঝি
ভাঁটবনেতে লুকিয়ে আছে ?'

এ-গানে দুখিয়ার মা, বাওয়া, বাবুলাল, সকলেই আর দশজনের মতো হাসে। ঢোঁড়াইয়ের লজ্জা লজ্জা করে। রামিয়ার জন্মের ইতিহাসও সে শুনেছে। তবু মনে হয়, সে যেন রামিয়ার কাছে মর্যাদায় একটু ছোট হয়ে গেল। রামিয়ার গলার উপরটা নড়ছে, নিশ্চয় মনের আনন্দে পানের রস গিলছে।

মেয়েদের গানের লক্ষ্য গিয়ে পড়ে ধাঙড় বরযাত্রীদের উপর…

কর্মাধর্মার চাঁদনী রাতে
পাটের ক্ষেত নড়ছে কেন ?
এতোয়ারীর সাদা মাথায়
চাঁদের আলো পড়ছে কেন ?…
বড্ড বেশি নড়ছে যেন…

মহতো বলে, 'এতোয়ারী শুনছ তো ?'

তাৎমা-ধাঙড় সকলেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। এই বিয়ের হিড়িকে ধাঙড় তাৎমারা, দুই টোলার ইতিহাসে, এই প্রথমবার যেন একটু কাছে আসে। এই দুর্দিনের রোজগারের অসুবিধে, তহশিলদার সাহেবের বেইমানি, আরও অনেক জিনিস হয়তো এর মধ্যে আছে, কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের বিয়েকে উপলক্ষ্য করেই এটা সম্ভব হয়েছে।

## ধাঙড়টুলির অভিসম্পাত

হাসিখুশি-ভরা ধাঙড়টুলিতে হঠাৎ অমঙ্গল আর আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। শনিচরার বাঁশঝাড়টায় ফুল ধরেছে।

প্রথমটা কেউ লক্ষ্য করেনি। আকলুর মা বুড়ি কী করে ঝাপসা চোখে এর ঠাহর করল, কেউ ভেবে পায় না। সাধে কি আর লোকে যায় তার কাছে সলা-পরামর্শ করতে। সেবার বিরষার যখন 'বাই'-এর অসুখ হয়, তখন রেবণগুণী রুগীর বিছানার পাশে একুশটি পান সারি সারি সাজিয়ে যখন চোখ বুঁজে মন্ত্র পড়ছিল, তখন বুড়ি মিটমিট করে হাসছিল। তারপর কলার পাতায় তেল-সিঁদুর গুলে গুণীর সম্মুখে রেখে দেয়। গুণী চোখ খুলে সিঁদুরের ফোঁটা দেয় মাটিতে। যে রেবণগুণীকে সিঁদুরের কথা মনে করিয়ে দেয়, সে আর বাঁশের ফুলের খবর পাবে না।

এত বড় অমঙ্গলের সূচনা ধাঙড়টুলিতে আর কখনও আসেনি। 'বাঙ্গাবাঙ্গী'র[২] নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল, না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না। তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশি, সেখানে থেকো না—বারোবার গাছে তেঁতুল পাকুক। তারপর তল্পি-তল্পা গুটিয়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে।

---

১ উসখুস।
২ ধাঙড়দের দেবতা।

ধাঙড়টুলির পঞ্চায়েত বসে। এতোয়ারী মোড়ল। মেয়েদের মুখে পড়েছে শঙ্কার ছায়া, আর পুরুষদের মুখ বিষাদে ভরা। গাছ, বাঁশ, কুয়ো ফেলে যেতে হবে নাকি? আজ আর 'পচই'-এর উত্তেজনা নেই; পিড়িং পিড়িং মাদল বাজছে না; বাঁশি আর গানে কারও উৎসাহ নেই। কোনো বাড়িতে উনুনে আগুন পড়েনি। এতোয়ারী আর শুক্রা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে; আর সকলে নির্বাক।

অবশেষে এতোয়ারী এ সম্বন্ধে অন্তিম রায় দেয়। মোড়লের কাজ বড় কঠিন। কত অপ্রিয় কাজ 'বাঙ্গাবাঙ্গি' মোড়লকে দিয়ে করান; কিন্তু শেষকালে দেখবে এই কথা এখন খারাপ লাগলেও পরে ফল ভাল হয়। যার বাঁশঝাড়, তাকে ধাঙড়টুলি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

শনিচরার বৌ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

আর যাদের যাদের বাড়ি থেকে ঐ বাঁশঝাড় দেখা যায়, তাদের কারও দানাপানি জুটবে না এ-গাঁয়ে বারো বছরের পর। কাঁদিস না শনিচরার বৌ, এখন তোরা যা তো। আমরাও পরে যাব।

এই তাৎমাগুলোর থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই ভাল। বুঝি তো তা, কিন্তু নাড়ি যে বাঁধা এখানে। হয়ে ওঠে কই। তাৎমারা ঠিকই বলে—বাঁশঝাড় লাগাবে পাড়া থেকে দূরে, যে বাড়ি থেকে ভোরবেলায় পূবে বাঁশঝাড় দেখা যায়, সে বাড়ির উপর যমের নজর।

ঠিক হয় পঞ্চায়েতে যে ধাঙড়রা নূতন কলমের গাছ পোঁতা বন্ধ করবে। কুটিরের খুঁটিতে ঘুণ ধরলেও বদলাবার চেষ্টা করো না। যার যা জমে নগদ রাখবার চেষ্টা করবে। গোরু-মোষ কিনতে খরচ করবে; মুরগী ছাগল বাড়াতে আরম্ভ করো; শনিচরা পশ্চিমে কোনো জায়গায় চলে যাক 'বটেদারী'র কাজে১; কুশীর দিকে। সেখানে জমি খুব ভাল। অড়র ক্ষেতে দাঁতওয়ালা হাতি ডুবে যায়, ধনে মৌরির গাছ মানুষের সমান ডগা ছাড়ে, ভুট্টা-তামাকের তো কথাই নেই। ওদিকে পড়তি জমি আছে অনেক। নদীর জল খাস না খবরদার, গলগণ্ড হবে। শনিচরা চলে গেলে কর্মাধর্মার গান আর কি সেরকম জমবে?

'যাঁহা খেলে বোঁচাবোঁচি চলু দেখে যাই'২। মাদলের সঙ্গে কী সুরই দেয় শনিচরা।

শনিচরা একটাও কথা বলে না। অনবরত নখ দিয়ে মাটিতে হিজিবিজি কাটে। তার ছলছলে চোখের দিকে কেউ আর তাকাতে পারে না।

সে রাত্রে এতোয়ারীর ঘুম হয় না। সারারাত শনের গাছ দিয়ে তৈরী মাদুর-খানার ওপর এ-পাশ আর ও-পাশ করে। মোড়লের অপ্রিয় দায়িত্বের বোঝা আর সে বইতে পারছে না। ধাঙড়টুলির মধ্যে সব চাইতে ফুর্তিবাজ লোক শনিচরা; হাসি, নাচ, গান, গল্পে চব্বিশ ঘন্টা ধাঙড়টুলি মশগুল করে রাখে; সে কেন পড়ল বাঙ্গা-বাঙ্গীর কোপদৃষ্টিতে? তহশীলদারেরও আক্রোশ দেখছি তারই উপর বেশি। ওর বৌটার দোষ আছে ঠিকই—বড় 'ছমকী আওরৎ'৩। বক যে রকম মাছের উপর নিশানা করে বসে থাকে, সামুয়েরটাও সেই রকমই লেগেছিল শনিচরার বৌটার পিছনে। খালি

১ আধিয়ার, বর্গাদার।

২ যেখানে পুরুষ কুমির আর মেয়ে কুমির খেলা করছে, চল দেখতে যাই।

৩ উড়ু উড়ু ভাবের স্ত্রীলোক।

সামুয়রকে দোষ দিলে চলবে কেন, শনিচরার বৌটাও গায়ে পড়া। কিছুদিন আগে সামুয়রটা ধরা পড়েছিল ; সে ঐ বাঁশঝাড়টার মধ্যে ঢুকে, বাঁশের উপর বাড়ি মেরে একটা শব্দ করত রাতে আর শনিচরার বৌটা উঠে যেত বাঁশঝাড়ে। খুব ঠোকন খেয়েছিল সামুয়রটা। তারপর থেকে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। বাঙ্গাবাঙ্গী কি শনিচরার বৌকেই পাড়া থেকে সরাতে চান নাকি ? কে জানে ? সেইজন্যেই কি ওঁর ঐ বাঁশঝাড়টার উপর রাগ ?···এতোয়ারী ভেবে কুলকিনারা পায় না। দোষ করল শনিচরার বৌ ; তাও সেসব গণ্ডগোল কবে মিটে গিয়েছে ; আর সাজা পাবে কিনা শনিচরা !···

ঠক ! ঠক ! শব্দটা কানে আসছে কিছুক্ষণ থেকে। হাতুড়ি-ঠোকা পেঁচার ডাক নয়তো ? না সেরকম তো মনে হচ্ছে না। শনিচরার বাড়ীর দিক থেকেই আসছে···

ধড়মড় করে ওঠে এতোয়ারী। একখান লাঠি নেওয়া ভাল। ঠিকই শনিচরার বাঁশঝাড়টা থেকে আসছে শব্দ।

জোছনা উঠেছে শেষ রাত্রে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মেঠো পথ ! এতোয়ারী আস্তে আস্তে বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। একটা আওরৎও গিয়ে ঢোকে সেই বাঁশ ঝাড়ে। দূর থেকে এতোয়ারী দেখে—মেয়ে মানুষ বলেই তো মনে হল। আজ আর সামুয়রের রক্ষা নেই। পা টিপে টিপে ঢুকছে এতোয়ারী বাঁশঝাড়ের মধ্যে—হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে শক্ত করে। কিন্তু সে শব্দটা থামছে না—বাঁশ কাটার শব্দ বলে মনে হচ্ছে। হুড়মুড় করে শব্দে করে এতোয়ারীর কাছেই একটা বাঁশ মাটিতে পড়তে পড়তে কিসে যেন আটকে যায়—বোধ হয় অন্য একটা বাঁশে।

'সবগুলো কাটো। সবগুলোকে। একটাও রেখো না'। পরিষ্কার শনিচরার বৌয়ের গলা। বাঁশের ঝাড়কে ঝাড় একেবারে নির্মূল করে করে কেটে ফেলে দেবে শনিচরা। আর কার উপর সে তার আক্রোশ, অভিমান দেখাবে ? আগাছার মত তার গাঁ থেকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে সকলে তাকে।···তাই রাতের আঁধারে স্বামী-স্ত্রী দুজনে এসেছে এখানে।

চোখের কোনে জল আসে বুড়ো এতোয়ারীর। সে আবার পা টিপে টিপে ফিরে আসে নিজের ঘরে, কোনো সাড়া না দিয়ে।

## ঢোঁড়াইয়ের নিকট মহতোর আবেদন

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা রামিয়াকে রোজগার করতে না দেওয়া। দুখিয়ার মায়ের মতো। অন্য তাৎমানীদের মতো রামিয়া বাবু-ভাইয়াদের বাড়ি তাল, কুল, হেলেঞ্চার শাক বেচতে যাবে, সে ঢোঁড়াই পছন্দ করে না। সব সে বোঝে। সামুয়র-টামুয়রের মতো বদ লোকগুলোর চোখের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে বোঝে। তার রামিয়াকে সে বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না ; কিন্তু মাটিকাটার রোজগার দিয়ে বৌকে বেড়ার ভিতরে রাখা চলে না। বাওয়াও সে কথা জানে।

কী করবি ঢোঁড়াই ?

বাওয়ার ইচ্ছে ঢোঁড়াই একখান মুদীখানার দোকান খুলুক। কী, জবাব দিস না বে ?

ঢোঁড়াইও একথা ভেবেছে। রামিয়ার সঙ্গে কত গপ্প হয়েছে এ নিয়ে। রামিয়া পয়সা আর আনা জুড়ে সেদিন সরষের তেল, রিঠে আর খয়নির হিসাব করে দিল।

দোকান চালানোয় রামিয়া 'মদদ'১ করতে পারবে ঠিকই ; কিন্তু আওরতের সাহায্য নিয়ে রোজগার । – তেমনি মরদ ঢোঁড়াইকে পাওনি । তার উপর এককুড়ি লোক চব্বিশ ঘণ্টা তার দোকানে ফষ্টিনষ্টি করবে, ঐ সামুয়রটা পর্যন্ত—সেসব চলবে না ।

পান-বিড়ির দোকান । তাহলে তো দোকান করতে হয় জিরানিয়াতে । বাওয়ারও হঠাৎ মনে পড়ে যে, সেদিন যখন সে অনিরুদ্ধ মোক্তারের সঙ্গে কাছারির 'মুন্সীখানায়' গিয়েছিল, সেখানে কে যেন বলাবলি করছিল মহাত্মাজীর কথা—আবার নাকি একটা 'হল্লা'২ হতে পারে সেবারকার মতো। তাদের সব কথা বাওয়া বোঝেনি, তবে বুঝেছে যে, এবার 'তামাসা' জমবে আরও বেশি ।···দরকার কী এই সব সময় পান বিড়ির দোকান করে ।

তাহলে ভাড়ার গরুর গাড়ি চালা ঢোঁড়াই । ভাড়ার মাল বোঝাই করে যখন ইচ্ছে যাও, যখন ইচ্ছে ফেরো। বাড়ির দুয়োরে বলদজোড়া বাঁধা থাকবে—ইয়াঃ তাজা তাগড়া শিঙে তেল লাগানো বলদ – 'বটোহী'৩ রাস্তা থেকে তাকিয়ে দেখবে । পাড়ার লোক হিংসেয় ফেটে পড়বে, লোকে সমীহ করবে । পথের মাঝে গরুর গাড়ি আড়া-আড়ি করে রেখে দাও, মরদরা পর্যন্ত গাড়ির নিচ দিয়ে যাবে ; রাখুক তো দেখি কেউ গাড়িটা সরিয়ে একপাশে—কারও হিম্মৎ হবে না । বাড়ির সম্মুখে ঘুঁটের পাহাড় দেখে লোকের চোখ টাটাবে ।

শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের গাড়ি বলদ কেনাই ঠিক হয়—ভিখনাহাপট্টির মেলা থেকে ।

পাড়া আবার সরগরম হয়ে ওঠে । দেখতে দেখতে হয়ে উঠল কী তাৎমাটুলি । বড় যখন হয় তখন এমনি করেই হয় । এবেলা-ওবেলা বাড়ে । একেবারে বাবুলালের সমান হয়ে গেল ঢোঁড়াই । দুখিয়ার মা নিত্যি এসে 'কানিয়ার'৪ সংসার তদারক করে যায় । দুখিয়াটা পর্যন্ত 'ভাবীর'৫ ফাই-ফরমাস খাটে । রামিয়ার কাছে আসে না কেবল ফুলঝরিয়া ? ডাকতে গিয়েছিল রামিয়া ; তাও আসেনি । দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেছিল ।

বিনা কাজে মহতোর কারও বাড়ি যাওয়া নিয়ম নয়—তার পদমর্যাদায় বাধে । সে সুদ্ধ একদিন ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে এল, নতুন বলদজোড়া দেখবার ছুতো করে । মহতো তার দুয়ারে ; ঢোঁড়াই কী করবে ভেবে পায় না । রামিয়া তাকে উঠোনে নিয়ে গিয়ে বসায় । পাড়ার লোকেরা বাড়ির বাইরে জটলা করে—নিশ্চয়ই ফের ঢোঁড়াইটা কোথায় একটা কী কাণ্ড বাঁধিয়েছে ; না হলে কি আর মহতো এসেছে অঙ্গনে । পচ্ছিমে মেয়েটা আবার কিছু করেনি তো ?

রামিয়া মহতোকে পা ধোবার জল দেয় । মশলা বাঁটবার জন্য দুখিয়ার মা যে দু টুকরো পাথর দিয়েছে তাই দিয়ে সুপুরি ভেঙে দেয় । মহতো যতটা খুশী হয়, তার চেয়ে আশ্চর্য হয় বেশি । তাৎমাটুলির লোকেরা এসব পচ্ছিমে 'তরিবৎ'-এ অভ্যস্ত নয় । অথচ মহতো একথা প্রকাশ করতে চায় না । তাড়াতাড়ি পা ধোবার জলটা খেয়ে সুপুরি কয়টা মুখে ফেলে ।

---

১ সাহায্য ।
২ গণ্ডগোল ঃ আন্দোলন ।
৩ পথিক ।
৪ কনিয়া—কনে বৌ, পুত্রবধূ । ৫ ভ্রাতৃবধূ ।

রামিয়া ফিক করে হেসে ফেলায় মহতো বলে, এই রকম হাসিই তো চাই ; কিন্তু অঙ্গনের বাইরে গিয়ে নয়। এ কি মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের সিঁড়িতে চড়া মেয়ে পেয়েছে। আমাদের কনৌজী তাৎমার ঝোটাহারা মদ তাড়ি পর্যন্ত আঙিনায় বসে খাবে—'কলালী'তে১ নয়। এই আমার গুদরের বৌকে দেখ না। তাড়ি খাওয়ার পর একদিন কেউ তার চোখে জল দেখতে পেয়েছে ? বাড়ির লোকেও না। কিন্তু বেচারি এখন মুশকিলে পড়েছে ভারি। জানই তো আজকালকার রোজগারের বাজার। আমি আর গুদরের মা তোমাকে তো নিজের বেটা বলেই মনে করি। তোমার ঐ গ্যাং-এর কাজটা গুদরকে পাইয়ে দাও। তুমি তো ছেড়েই দিলে।

ঢোঁড়াই এতক্ষণে বুঝতে পারে, কেন মহতো এসেছে তার বাড়িতে। আচ্ছা আমি এতোয়ারীকে বলে দেখব। ওই তো সব—নামেই শনিচরার দল।

এতোয়ারীর কাছে কথাটা তুলতেই সে বলে যে, তা কী করে হবে! ধাঙড়টুলির কথা তো তারা আগে ভাববে। আর একটা জায়গাও অবিশ্যি খালি হবে—শনিচরারটা ; কিন্তু ক'জনকে ঢুকোতে হবে কাজে জান ? ছোটা বিরষার চাকরি গিয়েছে, তার সাহেব চলে গিয়েছে বাড়ি বিক্রি করে। সামুয়েরের খুড়তুতো ভাই, মানুয়ের, যেটা গীর্জায় ঘণ্টা বাজায়, সেটার চাকরিও টলমল। পাদরী সাহেবরা জিরানিয়া থেকে চলে যাচ্ছে দুমকা জেলা। বাচ্চাদের একপোয়া করে যে দুধ দেয় গির্জা থেকে, সেটাও যাবে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে। আরও গোটাকয়েক চাকরি যাওয়ার ফিরিস্তি দেয় এতোয়ারী। তাছাড়া সামুয়েরের সাহেব তো এই গেল বলে—তার মালীটাকেও তো এক জায়গায় ঢুকোতে হবে।

এর উপর আর কথা চলে না। ঢোঁড়াই বোঝে মহতো চটবে, কিন্তু উপায় কী ?

## বৌকা বাওয়ার অন্তর্ধান

বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের বিয়ের পর থেকে একটু বিমনা হয়ে পড়েছে। এতদিন তবু হাতের কাজ ছিল ; বিয়ের যোগাড়, ঘর তুলবার বাঁশ-খড়ের যোগাড়, গাড়ি বলদ কেনা এসব কাজে একরকম উৎসাহও এসে গিয়েছিল তার। তার ঢোঁড়াইয়ের সংসার সে নিজে হাতে পেতে দিয়েছে। রামজী তার মাথায় যে কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ছিলেন, তা বইতে ইতস্তত করেনি একদিনও। সে আর কী করেছে ; যাঁর কাজ তিনি করিয়েছেন। তবে এতদিন ঢোঁড়াই ছিল, একটা অবলম্বন ছিল। এখন বড় একলা লাগে ; ভিক্ষা চাইতে ইচ্ছা করে না ; রামজীর কথা পর্যন্ত মনে আসে না। তিনি সব দেখছেন উপর থেকে। আত্মগ্লানিতে ঘন ঘন মিলিটারি ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করে ; বেশিক্ষণ করে বসে রামায়ণ শুনতে। বার বার সেখানকার রামসীতা লছমনজী মহাবীরজীর 'মুরুৎ'গুলিকে২ প্রণাম করে। মোহান্তজী প্রসাদ করে কল্কে তার হাতে দিলে অন্যমনস্ক হয়ে টান মারে ; কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় না। ঢোঁড়াই আর রামিয়া ধরেছিল তাদের বাড়িতে খাওয়ার জন্য। সে রাজী হয়নি। তাই নিয়ে রামিয়া চোখের জল ফেলেছিল, কিন্তু বাওয়ার মতের নড়চড় হয়নি। বাওয়া স্বপাক খেত চিরকাল। তবে ঢোঁড়াইয়ের ছোয়া খেতে তার কোনোদিন দ্বিধা হয়নি।

১ মদের দোকান।

২ বিগ্রহ।

রামচন্দ্রজী যাকে ছেলে বলে কোলে তুলে দিয়েছেন তার বেলায় কি ছোঁয়াছুঁয়ির কথা ওঠে; কিন্তু তাই বলে সে আর তার স্ত্রী এক নয়। ঢোঁড়াই এজন্য মনে মনে বেশ দুঃখিত হয়েছিল। বলেই ফেলল—তোমাকে মেয়ে বাছতে দিইনি বলে রাগ করেছ বাওয়া? দেখ অবুঝ ছেলের কথা—বোঝালেও বুঝতে চায় না। আরে না না, তা কি হয়? 'তবে কেন খাবে না বাওয়া?' ঢোঁড়াইয়ের সন্দেহের নিরসন হয় না। বাওয়া হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়! অনুতাপ নয়, তবু ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে সেও যদি বাওয়ার মতো সন্নাসী হয়ে থাকত, তাহলে তার সঙ্গে গোঁসাই থানে থাকতে পারত। কিন্তু রামিয়া? তাহলে তার জীবনে রামিয়া তো আসত না। তাহলে তার আজ থাকত কী? এই কয়দিনের মধ্যেই সে রামিয়াকে বাদ দিয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবতেই পারে না। একদিনও সে জীবনে রামিয়াকে ছেড়ে থাকবে না। যদি রামিয়া কোনদিন মরে যায়—সীতারাম! সীতারাম! কেবল বাজে কথা মনে পড়বে।

বাওয়ার মন অস্থির অস্থির করে; নিঃসঙ্গতায় সে পাগল হয়ে যাবে নাকি! সবই তো সেই আছে, সেই 'থান' সেই রামায়ণ পাঠ। কেবল তার ঢোঁড়াই আর তার নেই। আর একজন তাকে একেবারে আপন করে নিচ্ছে। এতে দুঃখ কিসের; এ তো আনন্দের কথা। তার ঢোঁড়াই সুখে থাকুক এই তো বাওয়া চেয়েছিল।...

চৈতী গানের সুর ভেসে আসছে। হরখুরের মাতাল জামাইটা বোধ হয় মনের আনন্দে তান ধরেছে।

...চয়েৎ সুভা দিনোয়া রামা, হো রামা···
আবি গেলে পিয়াকী গামানোয়া১।

—চৈত্রের শুভদিন এসে গিয়েছে রাম, পিয়ার দ্বিরাগমনের সময় এসে গিয়েছে।—

পাড়ার সবাই গিয়েছে মরনাধারের পুলের কাছে, ঐ যেখানে আলো আর আগুন দেখা যাচ্ছে। কাল রাতেও এই সময় ওখানে তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলির সকলে গিয়েছিল। মহাৎমাজীর চেলারা ঐ জায়গাটাকে বেছেছেন নিমক তৈরীর মহলা দেবার জন্য।

'রংরেজ'-এর২ নিমক খেলে, 'রংরেজের' খেলাপ যেতে পারবে না। 'রংরেজ, দারোগা কলস্টরের মালিক। গরীবদের 'হালতের সুধার'৩ করতে হলে নিমক তৈরী করতে হবে। নিমক তৈয়ার করবার সময় দারেগা এলে, কী করে সকলে মিলে নিমকের কড়াইখানাকে বাঁচাবে, তারই মহলা দিতে এসেছেন মাস্টার সাহেবের চেলারা। রামিয়া, মহতোগিন্নী, রবিয়ায় বৌ আরও অনেক 'ঝোটাই' সন্ধ্যাবেলায় মরনাধারের পুলের কাছে ঐ জায়গাটাতে পিদিপ দিয়ে এসেছে। কাল একদল এসেছিল মহলা দিতে, আজ আবার এসেছে নতুন আর একদল। এরাই সব আবার গাঁয়ে গাঁয়ে চলে যাবে এর পর। কিন্তু মরনাধারের কাছে থেকে যাবে একটা নতুন 'থান'৪ মহাৎমাজীর থান, ঠিক যেখানটিতে আজ ঝোটাহারা সাঁঝে পিদিপ দিয়েছে সেইখানটায়। বাওয়া ভাবে যে সত্যি যদি ওখানে আর একটা 'থান' হয়ে যায়; তাহলে

১ তাৎমাটুলির একটি প্রচলিত চৈতীগান। চৈত্রের শুভদিন এসে গিয়েছে রাম, পিয়ার দ্বিরাগমনের সময় এসে গিয়েছে।

২ ইংরাজ। ৩ অবস্থার উন্নতি

৪ পূজার স্থান

তাৎমাটুলিতে গোঁসাইথানের গুরুত্বতেও কিছুটা টান পড়তে পারে। কাল সে মরনাধারের কাছে মাস্টার সাহেবকে দেখেছে। বাওয়া চিমটে কমণ্ডলু নিয়েও ঢোঁড়াইয়ের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না, আর মহাৎমাজীর চেলারা কি করে নিজের ছেলেপিলে ছেড়ে জেলে থাকে। তাদের কি মন কেমন করে না? না, 'বজরঙ্গবলী'র[১] শক্তি মহাৎমা আর তাঁর চেলাদের। রামচন্দ্রজীর আশীর্বাদ আছে তাঁদের উপর। কিন্তু একটা জিনিস বাওয়ার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। কয়েক 'সাল' আগের, সেই গানহী বাওয়ার তামাসা, আর হল্লার সময় আফিংখোর উকিল সাহেব আরও কত মুসলমান পিঁয়াজ ছেড়ে গানহীবাওয়ার চেলা হয়েছিল। ঐ মিয়াদের আবার বিশ্বাস! মিসিরজীর কাছ থেকে বাওয়া শুনেছে যে, অযোধ্যাজীতে রামচন্দ্রজীর মন্দিরটাকে মিয়ারা মসজিদ করে নিয়েছে। দেখ আস্পর্ধা। ঐ মিয়াদের সঙ্গে এত মাখামাখি মহাৎমাজীর চেলারা করেছিল; তবু রামচন্দ্রজী কেন মহাৎমাজীর চেলাদের উপর এত সদয়? মহাৎমাজীকে রাখুক তো দেখি সরকার জেলে? রামচন্দ্রজীর আশীর্বাদ তার মাথায়, তাকে কি কলস্টর দারোগা জেলে পুরে রাখতে পারে। তুলসীদাসজীকে একবার এক নবাব জেলে রেখেছিল; লাখে লাখে বাঁদররা গিয়ে তাঁকে জেল থেকে বের করে এনেছিল। আর মহাৎমাজীর রাখবে তালা দিয়ে। মা মরার সময় বলে গিয়েছিল অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস, সেখানে অনেক ভিখ পাওয়া যায়। হঠাৎ একথা মনে পড়ল কেন? রামজী বোধ হয় মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন আমার পথের কথা। তিনি আমার মাথায় উপর থেকে সব ভার সরিয়ে নিয়েছেন; অযোধ্যাজী যাওয়ার রেলভাড়া জুটিয়ে দিয়েছেন; বলেছেন, ভরত রাজার মতো তোর হল নাকি?

শুভদিন এসে গিয়েছে।

—আবুহো বাভনমা, বৈঠোহো আঙনমা,
গনি দেহ পিয়াকে গামনমা—
হো রামা—[২]

এসো বামুনঠাকুর অঙ্গনে বসো, পিয়ার দ্বিরাগমনের দিনক্ষণ দেখে দাও।

না না, আর পাঁজিপুঁথি দেখবার দরকার নেই। বাওয়া ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় মনের পরতে পরতে জমানো ঢোঁড়াইয়ের স্মৃতিগুলি। চৈতী গানের ইঙ্গিত, মরা মায়ের আদেশ, রামজীর অঙ্গুলিসংকেতকে তাচ্ছিল্য করতে পারে না। তাকে সব ছিঁড়ে বেরুতে হবে, না হলে তার দশা হবে ভরত রাজার মতো। এই জন্যই বোধ হয় তার মন এত অস্থির অস্থির লাগছিল। ঢোঁড়াইরা এখন সব গিয়েছে মরনাধারের কাছে মহাৎমাজীর চেলাদের তামাসা দেখতে। এখনই সময়টা ভাল—আর এক মুহূর্তও সে দেরি করবে না। চিমটে কমন্ডলু নিয়ে সে ওঠে। থানের বেদীটিকে প্রণাম করে। চিমটের আংটাটার সঙ্গে ঢোঁড়াই ছোটবেলায় একটা আধলা ফুটো করে ঢুকিয়েছিল। হঠাৎ সেটার উপর নজর পড়ায়, সেটাকে খুলে ফেলবার জন্য টানাটানি করে। না এত তাড়াতাড়ি খোলা সম্ভব নয় ওটা।

---

১ মহাবীরজী।

২ চৈতী গানের অপর এক লাইন।
এস হে বামুন ঠাকুর, অঙ্গনে বস
পিয়ার দ্বিরাগমনের দিনক্ষণ দেখে দাও
হে রাম!...

সময় নেই। সীতারাম!

'চায়েৎ সুভা দিনোয়া রামা,
আবি গেলে পিয়াকী গামানোয়া—
হো রামা—'

শুভদিন এসে গিয়েছে। আর এক মুহূর্তও সময় নেই নষ্ট করবার—

চিমটের আংটার সঙ্গে আধলাটা লেগে যে শব্দ হচ্ছিল সেটা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। তেল ফুরোনোয় থানের পিদিপটার বুক জ্বলছিল; সেটা দপ্ করে নিভে যায়।

## গানহী বাওয়ার ভিন্ন মূর্তিতে পুনরাবির্ভাব

'সার্ভে' খাতাখতিয়ান অনুয়ায়ী, মরনাধার সমেত বকরহাট্টার মাঠ, তাৎমাটুলির জমিদারবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি। আসলে তাৎমা ধাঙড়রা এখানে আসবার অনেককাল আগে থেকেই বকরহাট্টার মাঠ ছিল মরগামার লোকদের গরুচরানোর জায়গা। এ ছিল জনসাধারণের জমি১। ঢোঁড়াই জন্মাবার ছয় বছর আগে, যখন এখানে 'সার্ভে'২ হয় তখন জমিদার বাবুর টাকা পয়সা খরচ করে, এটাকে তাঁর নিজের পতিত৩ জমি বলে সার্ভে কাগজপত্রে লিখিয়ে নেন। তারপর থেকে লা'র জন্য কুলগাছ বিলি করতেন তিনিই; কপিলরাজার কাছে শিমুলগাছ বিক্রি করতেন তিনিই। কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এখন জমিদারবাবু মাথায়, বকরহাট্টার মাঠ নিয়ে অনেক জিনিস খেলছে। এর মধ্যে যদি মহাৎমাজীর 'থান' হয়ে যায়, বকরহাট্টার মাঠের মধ্যে, কিংবা এই নিয়ে যদি থানা পুলিস মামলা মোকদ্দমা হয়, তা হলে হয়তো আবার নতুন করে, এত দিনের চাপা পড়া জমির স্বত্বের কথা উঠবে। ওখানে পিদিম দেওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, এ খবরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গিয়েছেন। রতিয়া ছড়িদার, পরসাদী, নায়েব, রবিয়া সকলের নামেই বাকি খাজনার ডিক্রি করানো আছে। তারা সবাই এখন তাঁর মুঠোর মধ্যে। তিনি সাঁঝেই তাদের ডেকে পাঠান।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই হৈ হৈ কাণ্ড তাৎমাটুলিতে। মোটরে করে লাইন' থেকে পুলিস এসে হাজির, সঙ্গে আবার 'রংরেজী টুপি' পরা৪ হাকিম। তাঁরা মরনাধারের দিক থেকে ফিরছেন। মরনাধারের কাছে এখন কোনো লোক নেই, তবে রাত্রে সেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, শুকনো ঘাসের উপর তার চিহ্ন আছে। চৌকিদার আর দফাদারের খবর যে, রাতে তাৎমাটুলির আর ধাঙড়টুলির ছেলেবুড়ো সকলে ভেঙে পড়েছিল ময়নাধারের কাছে। তাই হাকিম এসেছেন তাৎমাটুলিতে। দেখা গেল যে পুলিপ সব খবরই জানে। হাকিম বললেন যে সব খবর আমরা রাখি। আজ কিছু বললাম না। যা করেছ করেছ, আর যেন ভবিষ্যতে না হয়। বাইরের লোক কেউ তোমাদের পাড়ায় এসে সরকারের খেলাপ কাজ করলেও ধরব তোমাদের। তাৎমাটুলির একখানা ঘরও দাঁড়িয়ে থাকবে না তাহলে, বলে রাখলাম। রোজগার কর, খাও দাও থাক। না হলে ফল ভুগবে। তোমাদের কিছু বলার থাকে তো

---

১ রেকর্ড অব রাইট্‌স্‌-এ লেখা থাকে, গৈর মজরুয়া আম'—সর্বসাধারণের সম্পত্তি। ২ সরকারী Cadastral Survey।

৩ অনাবাদী।

৪ হ্যাট্‌।

আমার কাছে যখন ইচ্ছা বলতে পার, কিন্তু কংগ্রেসের লোকদের পাল্লায় পড়েছ কি, তোমাদের সব কটাকে ধরে জেলে দেবে।

সকলের মন ভয়ে কেঁপে ওঠে। মহাৎমাজীর চেলারা, মাস্টারসাহেবের চেলারা তাহলে 'কাংগ্রিস'-এর লোক। কিছুদিন থেকে মিসিরজীও রামায়ণ পাঠের সময় 'কাংগ্রিস কাংগ্রিস' কী সব বলে। এখন এস, ডি, ও, সাহেবও সেই কথা বলছেন। তাই বলো। বাবুভাইয়াদের কাংগ্রিস আর দারোগা হাকিম সরকার! এদের মধ্যে লেগেছে 'টক্কর১'। হাকিম বোধ হয় ভুল বোঝাচ্ছে—মহাৎমাজীর নাম তো নিচ্ছে না একবারও।...

ঢোঁড়াই হাকিমকে সেলাম করে বলে হুজুর মা বাপ! আপনার কাছে আমাদের একটা 'আর্জি' আছে। আমাদের চৌকিদারি ট্যাকস্ বসাতে তশীলদার সাহেব বেইমানি করেছে; রবিয়ারও বারো আনা, বাবুলাল চাপরাসীরও বারো আনা। তা কী করে হয়? সকলে অবাক হয়ে যায় ঢোঁড়ায়ের সাহসে। হাকিমের সঙ্গে কথা বলছে; দারোগার সম্মুখে; আবার তশীলদার সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ! এই বুঝি হাকিম তাকে তাড়া দিয়ে ওঠেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করেন 'তশীলদার কে?'

'ঝুদনলাল, মাহীটোলার হুজুর।'

বাবুলাল চাপরাসীর গলা শোনা যায়—'এ ছোকরা তো মাত্র কদিন হল ঘর তুলেছে। এ কী জানে 'চৌকিদারি'র২ সম্বন্ধে?'

হাকিম বাবুলালকে তাড়া দেন—'তোমাকে কে জিজ্ঞাসা করেছে?' তারপর ঢোঁড়াইকে বলেন, 'লিখে দরখাস্ত দিও আমার কাছে। সব ঠিক হয়ে যাবে! কিন্তু খবরদার, সরকারের খেলাপ কিছু দেখলে, তাৎমাটুলির একটা লোকও থাকবে না জেলের বাইরে।'

এস. ডি. ও. সাহেব হাতের ঘড়ি দেখেন। একপাল উলঙ্গ ছেলে, এতক্ষণে সাহসে ভর করে, পুলিশ ভ্যানের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। টপ টপ করে মোটরের এঞ্জিন থেকে জল পড়ছে মাটিতে, ছেলেরা বলছে 'পিট্রোল'৩ পড়ছে, দরদের ওষুধ।

গাড়ি চলে যায়। লু বাতাসে তার চাকায় উড়োনো ধুলো মরনাধারের দিকে ছুটে যায়, বোধ হয় রাতের কলঙ্কের দাগ ঢাকবার জন্য।

লু বাতাসের মধ্যে দিনের বেলায় কারও বাড়ি রান্না হবে না—খড়ের ঘরে আগুন লেগে যেতে পারে! তাৎমাটুলির কেউ আর সেদিন কাজে বেরোয় না। সারাদিন সকলে মিলে সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম আলোচনা করে। গানহী মহারাজ, পুরনো গানহী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাৎমাজী হয়ে গিয়েছেন। মাস্টারসাহেবের বেটা কাল এসে মরনাধারের কাছে বলে গিয়েছে যে 'রংরেজ' সরকারের জন্যই তাৎমাদের রোজগার নেই। অনেকদিন আগে নাকি 'সরকার' তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিল। দেখ কাণ্ডখানা একবার! তবে একটা সুবিধে বুড়ো আঙুল না থাকলে—কেউ আর জোর করে সাদা কাগজে আঙুলের ছাপ নিতে পারবে না; না অনিরুধ মোক্তার, না সাওজী, না জমিদার বাবু।...তারপর থেকেই তো তারা কাপড় বুনবার কাজ ভুলেছে। ..কলিযুগে।

১ সংঘর্ষ।

২ স্থানীয় ভাষায় চৌকিদারির অর্থ চৌকিদারি ট্যাক্স।

৩ পেট্রোল—ব্যথার ওষুধ।

'নৃপ পাপপরায়ণ ধর্ম নহী।
করি দণ্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতহী।'১

সাধে কি আর মহাৎমাজী 'রংরেজ' এর নিমক খেতে বারণ করেছেন। সব দেখতে পান তিনি। ঐ রংরেজ-এর নিমক ছিল বলেই না কপিলরাজার জামাইটা তাৎমাটুলির বুকের উপর বসে, গরুর চামড়ার কারবার করতে পেরেছিল।...

আচ্ছা, আচ্ছা ছাড় এখন এসব কথা। দেখছিস তো গাঁয়ের খবর দারোগার কাছে চলে যায়। আচ্ছা পরশু রাতের খবর কে পুলিশকে দিল বলতে পারিস? ধাঙড়-টোলার কেউ নয়তো? রতিয়া ছড়িদার, আর বাসুয়া নায়েবকে হারিয়া দেখেছে 'দফাদারের' সঙ্গে জিরানিয়াতে! দফাদারের সঙ্গে আবার তাদের কী কাজ থাকতে পারে? সে দুটো গেল কোথায়? সত্যিই তাদের তো সকালবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে না।

হারিয়া বলে যে আমি কাল জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাদের। তারা বলে যে চৌকিদারি খাজনার কথা বলছিলাম।

এসব আবার কী গাঁয়ের মধ্যে! পঞ্চায়তিকে না জানিয়ে চৌকিদার দফাদারের সঙ্গে মেলামেশা! ঢোঁড়াইয়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে দফাদারকে খবর দেবে? হোক না সে নায়েব! এ মামলা নেবে কিনা বল, মহতো। 'সাফ সাফ' বল এ মামলা পঞ্চায়তিতে রাখবে কি না— 'ঘসর ফসর'২ কথা নয়। কেবল লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়া পঞ্চায়তি করেন সব।

সকলেই ঢোঁড়াইকে সমর্থন করে। গ্রামের সকলেই মুখচোখের ভাব, আর কথা-বার্তার ধরন দেখে, ভয়ে মহতোর মুখ শুকিয়ে যায়; আর ঐ সেদিনের ভুঁইফোঁড় ছোকরা ঢোঁড়াই, সেই কি না গাঁয়ের লোকের 'মুখিয়া'৩ হয়ে আগিয়ে আসে! নতুন পয়সার গরমে ফুলে 'ভাঁথী'৪ হয়েছে ছোঁড়াটা। বলরাম গুদরকে একটা কাজ দিতে মাটিকাটার; সে বেলা পারলেন না! গুদরকে আমার পাঠাতে হল মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের সঙ্গে মজুরি করতে। আমার পুতহু,৫ ঐ 'মইয়েচড়া' মুঙ্গেরিয়াতাৎমা৬ মেয়েদের সঙ্গে এক হয়ে গেল। কনৌজী তন্ত্রিমাছত্রিদের ঘরের বৌ শহরে মইয়ে চড়তে আরম্ভ করেছে—এই রকম দুর্দিন পড়েছে। এর মধ্যে আবার থানা পুলিরের ঝঞ্চাট করবার দরকার কী।...সেবারের মতো আবার মহৎমাজীর চেলারা তাড়ির দোকানে গোলমাল করবে নিশ্চয়। এই 'রুখা'র দিনে ৭ এ আবার আর এক ফ্যাসাদ—যাকগে! লোকের হাতে পয়সা থাকলে তবে তো তাড়ির দোকান যাবে।...

---

১ রাজা পাপপরারণ, তার ধর্ম নেই; প্রজাদের দন্ড দিয়ে বিড়ম্বনায় ফেলে।
—তুলসীদাস।

২ বাজে কথা।

৩ (মুখ্য শব্দ হইতে) প্রধান, প্রমুখ।

৪ হাপড়। ৫ পুত্রবধূ।

৬ তাৎমাটুলির তাৎমারা নিজেদের বলে কনৌজী, আর যে তাৎমারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে তাদের বলে মুঙ্গেরিয়া। মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের মেয়েরা রাজমিস্ত্রীর কাজ করার সময় মইয়ে চড়ে বলে, তাৎমাটুলির ঝোটাহারা তাদের অবজ্ঞার চখে দেখে।

৭ রুক্ষ শব্দ থেকে। শুকনো গরমের দিনে। এ অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস যে, গরমের সময় তাড়ি খেলে শরীর ভাল থাকে।

ঢোঁড়াইয়ের সব থেকে বেশি আনন্দ যে সে আজ হাকিমের সঙ্গে কথা বলেছে। বলবার সময় সে একটুও ঘাবড়ায়নি। যা যা ভেবেছিল সব গুছিয়ে বলতে পেরেছে। হাকিম তার কথা শুনেছেন; আর বাবুলালটা কথা বলতে গিয়েছিল সেটাকে এক ধমক দিয়েছেন।···এখন ঢোঁড়াই যে কোনো হাকিম আসুন না, তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। আজ সে আবার লোকের চোখে বাবুলাল চাপরাসীর চাইতেও উঁচুতে হয়ে গিয়েছে। রামজীর কৃপায় তার জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হয়েছে। রতিয়া ছড়িদার আর বাসুয়া নায়েবের ব্যবহারে মনটা খারাপই হয়ে গিয়েছিল ঢোঁড়াইয়ের। সেই সব কথাই ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে আসে; রামিয়ার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা হয়নি।

রামিয়া বলদের নাদায় জল ঢালছে। বাইরে এসে এসব কাজ করতে মানা করলেও সে শুনবে না।

ওটা কে? সামুয়র না!

এই যে বলদের মালিক এসে পড়েছেন। যাচ্ছিলাম বাড়ি। রাস্তা থেকে হঠাৎ বলদজোড়ার উপর নজর পড়ল।

তারপর একথা সেকথা হয়।···তোমাদের পাড়ায় তো দেখি ভীষণ কাণ্ড। আগে জানলে আমি আজ সাহেবের কুঠিতেই থেকে যেতাম। আমার সাহেবও চলে যাচ্ছে আসছে সপ্তাহে। এই সব মহাত্মাজীর হল্লার জন্য না কি কে জানে।···

তা হলে অনেক টাকা পাচ্ছ, বলো?

সামুয়র বলে, শুনেছি তো সাতশো টাকা দেবে। ভারি খুপসুরৎ তোমার বলদ-জোড়া।···

তুমিও কেনো এই রকম গাড়ি-বলদ।···

'পাতলী কমরোয়া'র১ গান গাইতে গাইতে সামুয়র ধাঙড়টুলির পথ ধরে।

অকারণ বিরক্তিতে ঢোঁড়াইয়ের মন তেতো হয়ে ওঠে।

রামিয়াই প্রথম কথা বলে। 'আজ বাওয়াকে দেখলাম না থানে।' রামিয়া জানে যে বাওয়ার কথায় ঢোঁড়াইয়ের মন সব সময়ই সাড়া দেয়। সত্যি তো সারাদিনের হট্টগোলের মধ্যে বাওয়ার কথা একবারও ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়েনি। গেল কোথায়? পুলিশের গাড়ি দেখে ভোরেই কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এতক্ষণ তো ফেরা উচিত ছিল।

এখনই ফিরে আসবে;

বাওয়ার খোঁজে ঢোঁড়াই কয়েকবার থানে যায়। রামিয়ার সঙ্গে গল্প আজ ভাল জমে না! সন্ধ্যার পর পশ্চিমা বাতাস থামলে, কাঠ জেবলে আগুন করে রাখে। 'মারুয়া'২ ঠেসে 'লিটি'র লেচি পাকিয়ে রাখে। এই বাওয়া এল বলে! পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রামিয়া এসে ডাকে, 'বাওয়া, এখনও তো এল না। তুমি খেয়ে নাও না বাড়ি এসে।'

'খিদে পেয়েছে বুঝি খুব?'

রামিয়া লজ্জিত হয়ে যায়।

১ 'সরু কোমর'টির গান।

২ গরীবের খাদ্য এক প্রকার শস্য। লিটি—রুটির মতো খাদ্যদ্রব্য।

গঙ্গাস্নানে যায় নাই তো? মিলিট্রিঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাওয়ার জন্য থেকে যায় নাই তো?

রামিয়ারই প্রথম নজর পড়ে, বাওয়ার কম্বলটা তো নাই। কম্বল নিয়ে কোথায় যাবে এই গরমের মধ্যে। নিশ্চয়ই কোথাও বাইরে গিয়েছে, দিন কয়েকের জন্য। তা যাওয়ার সময় বলে গেল না কেন?…

## ঢোঁড়াইয়ের আত্মদর্শন

বহুদিন প্রতীক্ষার পর বাওয়া ফেরে না। কী জানি কেন, ঢোঁড়াই নিজেকে এর জন্য দায়ী মনে করে। কিন্তু সত্যিই কি সে দোষী? বাওয়ার উপর ভালবাসা তার একটুও শিথিল হয়নি; এক বিন্দুও না। বাওয়ার উপর কর্তব্যের ত্রুটি সে করেনি। তার বিয়ে করায় বাওয়ার আপত্তি ছিল না। তবু সে বোঝে যে বাওয়ার চলে যাওয়ার সঙ্গে তার বিয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এমন দোষ সে কী করেছে যে বাওয়া যাওয়ার আগে তার সঙ্গে কোনো কথা বলে গেল না।

রামিয়া বলে—আমার জন্যই বাওয়া হয়তো চলে গেল। ঢোঁড়াই কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দেয়। সত্যি রামিয়াকে বাওয়া পছন্দ করতে পারেনি। না হলে হাতের ছোঁয়া খেল না কেন? কেন বিয়ের পর থেকে বাওয়া অন্য রকম হয়ে গেল। এই ধুলো রোদ্দুরের মধ্যে এখন কোথায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। সেই ছেলেবেলা থেকে, ঢোঁড়াই বাওয়াকে দেখেনি, এমন বোধহয় এর আগে একদিনও হয়নি। তা ছাড়া এখানে বাওয়া থাকলে, সে ছিল এক কথা; দেখা না হলেও মনের মধ্যে স্বস্তি ছিল যে, যখন ইচ্ছা দেখা করতে পারব। বাওয়া কিছু না করলেও ঢোঁড়াইয়ের মনে ভরসা ছিল যে, তার মাথার উপর একজন আছে। তার সংসারের বিপদ আপদের সময় বাওয়া নিশ্চয়ই এসে দাঁড়াত তার পাশে।—এইসব কথা ভাবলেই ঢোঁড়াইয়ের মন খারাপ হয়ে যায়।—চলে যাওয়ার দিন এসেছে, ঢোঁড়াইয়ের দুনিয়ায়। শনিচরটা চলে গেল ধাঙড়টুলি ছেড়ে; সেও যাওয়ার আগে দেখা করে গেল না। এতোয়ারীরা যেদিন এসেছিল, খাজনার দরখাস্তে মিসিরজীর কাছে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে, সে দিন তার কাছেই শুনেছে ঢোঁড়াই-এর খবর। বাওয়ার আগে শনিচরা আর তার বৌয়ের কী কান্না! কী কান্না! বাড়ি ঘর দেখে আর ডুকরে ডুকরে কাঁদে।…শনিচরার চলে যাওয়ার খবরেও সেদিন ঢোঁড়াইয়ের প্রাণের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল।…শনিচরা বলেই পেরেছে। ঢোঁড়াই তাৎমাটুলি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। বড় ভাল লোকটা ছিল; দিনের পর দিন তারা একসঙ্গে কাজ করেছে 'পাক্কী'র উপর। কাজের মধ্যে দিয়ে তারা আপনার হয়ে উঠেছিল। সে সম্বন্ধ কোনোদিন যাওয়ার নয়। এতোয়ারীই সেদিন খবর দিয়েছিল যে, সামুয়র বলেছে যে সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া টাকাটা দিয়ে সে ভাড়ার টমটম কিনবে,—গরুরগাড়ি কিছুতেই নয়; ঢোঁড়াইয়ের থেকে তার বড় হওয়া চাই; তোর সঙ্গে তার কী এত রেষারেষি বুঝিও না। এখন কিনলে হয় ঘোড়া আর টমটম; তার আগেই আবার নেপালে জুয়ো খেলে টাকাটা উড়িয়ে দিয়ে না আসে; সব গুণই আছে সামুয়রটার। ঢোঁড়াই ভাবে যে সকলেই তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, পাড়ার মাতব্বরগুলো পর্যন্ত। সেদিন চৌকিদারি খাজনার কথাটা হাকিমকে বলার পর থেকে বাবুলাল আর দুখিয়ার মা তার বাড়িতে আসে না। মহতোর তো কথাই নাই। রতিয়া ছড়িদার, আর বাসুয়া নায়েব, সেই

পুলিশ আসার দিন থেকে তার সঙ্গে কথা বলে না।···থাকার মধ্যে তার কাছে রামিয়া—রামপিয়ারী। রামিয়ার মধ্যে সে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর সব কিছু, আয়নায় হঠাৎ আলো পড়ার মতো মধ্যে মধ্যে সেখানে ঝলক ফেলে, আবার তখনি কোথায় তলিয়ে যায়। রামিয়ার সব ভাল। হুঁকোটা ধরার মধ্যে, তামাকেব ধোঁয়াটুকু ছড়ার মধ্যেও তার অন্য তাৎমানীদের থেকে বিশেষত্ব আছে; ভারি সুন্দর লাগে ঢোঁড়াইয়ের। আর ঠাট্টা যা করতে পারে একেবারে হাসতে হাসতে 'নখোদম'১ করিয়ে দেয়। ঢোঁড়াইয়ের কাছে সামুয়রকে বলে মর্কট। এমন মজার মজার কথা বলবে! মর্কটের সঙ্গে একটু নাকি তফাত করে দিয়েছেন ভগবান; অন্যমনস্কভাবে গড়তে গড়তে লাল রঙটা মুখেই পড়ে গিয়েছে ভুলে।···দুজনে হাসতে হাসতে গাড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই এত হাসি, এটাই ঢোঁড়াইয়ের কেমন কেমন যেন লাগে। বলে রামিয়াকে বাড়িতে থাকতে; কিন্তু কে কার কথা শোনে! চব্বিশ ঘন্টা ফুড়ুত করে উড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে এখানে ওখানে; হাসিমস্করা ফৌজী কুয়োতলায়; বেটাছেলে দেখলেও শরম নেই। কী রকম যেন। আর ঢোঁড়াই জন্য সব জায়গায় জোর দেখাতে পারে; রামিয়ার কাছে সে একটু নরম পচ্ছিমবালী' মেয়ে, বুদ্ধিতে তার চাইতে বড়; কত জোর করা যায় তার উপর। কিন্তু তার মন রামিয়ার মধ্যে ডুবে থাকলেও তার দৃষ্টির প্রসার বাড়ছে আস্তে আস্তে, তার জগৎটা বড় হয়ে উঠেছে, গাড়ি বলদ কিনবার পর থেকে। পাকীতে কাজ করার সময় দূরের 'বাটোহী'র সঙ্গে দেখা হত তার পথের উপর। এখন সে নিজেই গাড়িতে মাল বোঝাই করে কত দূরে দূরে চলে যায়, পাঁচ কোশ, সাত কোশ, পুরুবে, পচ্ছিমে, কারহাগোলার গঙ্গাস্নানে, মবেলী, কুর্বাঘাটের মেলায়। 'জাত পাঁত'২ আলদা হলে কী হয়, সব জায়গায় লোকের হালত একই রকম। তবে পচ্ছিমের গাঁগুলোতে মহাৎমাজীর 'হল্লা' আর পুলিশের হল্লাটা অন্য জায়গার চাইতে বেশি এই যা। মাতব্বরা ছাড়া, পাড়ার অন্য সকলে এইসব দূর দূরান্তরের গ্রামের খবর শুনবার জন্য আসে তার কাছে, যখনি সে গাড়ি নিয়ে ফেরে।···

## মহোতোর বিলাপ

কিছুদিন থেকে দুনিয়া দরকারের চাইতেও বেশি তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। ঘটনার পর ঘটনার আঘাত লাগছে তাৎমাটুলির সমাজে, তাৎমাদের মনে। জিনিসটা আরম্ভ হয়েছে হঠাৎ, কবে থেকে তা ঠিক মহতোর মনে নেই, এই 'এক সাল দেড় সাল' হবে আর কী। লোকের মনে কিসের যে আগুন লেগেছে যে স্রোত এসেছে চারিদিকে, মহতো তা বুঝতেই পারে না, তো তার সঙ্গে তাল রাখবে কী করে?

রোজ শহর থেকে নতুন খবর শুনে আসছে তৎমারা কাজে গিয়ে।···'অলোচী৩ ঘোড়সওয়ার শহরের রাস্তায় টহল দিচ্ছে। পাদরীসাহেবরা চলে যাচ্ছে, এখন খালি একজন দেশী পাদরী থাকবে জিরানিয়াতে। কিরিস্তান ধাঙড়গুলোর বিনা পয়সার দুধ বন্ধ হয়ে যাবে রে, পাদরী সাহেবগুলো ছিল তোদের গরু, দুধ দিত। ভেউ ভেউ করে কেঁদে নে, তোদের গরু চলে যাচ্ছে।···'কালোঝাব্বাবালী' পাদরী মেমদের৪

১ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

২ জাত।

৩ বেলুচি।

৪ কালো-ঘাঘরা-পরা পাদরী মেম।

হাসপাতাল একেবারে 'সন্নাটা'১ দেখলাম আজ। ধাঙড়টোলার ছয়ঘর কিরিস্তান আবার হিন্দু হয়ে গিয়েছে; বলেছে আর গির্জায় যাবে না; পাদরীসাহেবরা চাকরি জুটিয়ে দেবে না, তবে খৃস্টান থাকব কিসের জন্য।…সামুয়রটাও হিন্দু হয়েছে! মিসিরজী প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন তার; ভাগলপুর থেকে একজন টুপিওয়ালা সাধুবাবা এসেছেন এই কাজ করতে। প্রায় সব সাহেব চলে গেল; এইবার ধাঙড় আর কিরিস্তানগুলো মজা বুঝবে; বাঁধ এখন বাড়িতে বসে বসে রঙবেরঙের 'খুশবদার' ফুলের তোড়া। সামুয়রের 'শাম্পসী'টার২ রঙ কিন্তু চোখে ঝিকমিক ঝিকমিক করে লাগে। তশীলদার সাহেব বলতে এসেছিল যে, এবার আবার বাড়িতে বাড়িতে 'লম্বর'৩ লিখতে হবে, লোক গোনার জন্য; সেবার তো লোক গোনবার পর গাঁয়ের আধখানা উজাড় হয়ে গিয়েছিল অসুখে; তবু মন্দের ভাল যে, বেশির ভাগই মরেছিল মুসলমান; এবারে দ্যাখ কী হয়। লোক গোনবার সময় কেউ কিছু বলিস না তশীলদারকে; করুকগে শালা যা করতে পারে; এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে তো ওর বিরুদ্ধে 'চৌকিদারী'র৪ দরখাস্ত দেওয়াই আছে। কী যে হল সে দরখাস্তের তা বুঝি না। কেন, এখন যাক না ঢোঁড়াই তার পেয়ারের হাকিমের কাছে; এ কথা বললেই অনিরুদ্ধ মোক্তার বলে যে, মহাত্মাজীর হল্লার মধ্যে হাকিমের সময় নেই এসব দেখবার; যেমন সরকার তেমনি হাকিম, ঠিকই বলে মহাত্মাজীর চেলারা।…সমাজে কেউ কথা মানবে না; কারও কথা কেউ শুনবে না, কী করে সমাজ চলে? ঢোঁড়াইয়ের দল বলে—কার কথা শুনব? ঐ রতিয়া ছড়িদারের আর বাসুয়া নায়েবের? দুটোই তো দফাদারের 'খুফিয়া'।৫ ছড়িদার আর বাসুয়া শুনছি আবার মাস্টারসাহেবের বেটার খেলাপে হাকিমের কাছে সাক্ষী দেবে। মাস্টারসাহেবের বেটা নাকি কলালীতে কার মাথায় মদের বোতল দিয়ে মেরেছে; ওরা নাকি তাই স্বচক্ষে দেখেছে। ঢোঁড়াইয়ের দল তাই তাদের উপর ক্ষেপে আছে! আরে রতিয়া ছড়িদার তো কোন ছার! আমি মহতো, আমরই হাতের তেলের শিশি আসবার সময় তারা শুঁকে দেখল; বলে যে গুদরের মায়ের জন্য তেলের শিশিতে তুমি রোজ সাঝে কী কিনে নিয়ে আস সবাই জানে। এই হল সমাজের ব্যবহার তাদের মহতোর সঙ্গে। আমার সঙ্গে আসিস 'ফুটানি ছাঁটানে,; কর দেখি দফাদার সাহেবের সঙ্গে লড়াই, তবে না বুঝি হিম্মৎ! দেওয়া দেখি ডিস্টিবোর্ডের ফৌজী ইদারাটার বিয়ে, তবে বুঝব বুকের পাটা।…এই সেদিন বাবুভাইয়াদের কাছে কী অপ্রস্তুতই হতে হল পাড়ার লোকদের জন্য! এবার 'দশারায়' ৬ ভগবত্তির মুরতের ঘরে তাৎমা ধাঙড় চামার দুসাদ সকলকেই যেতে দিয়েছিল; বাবুভাইয়াদের ছেলেরা ডেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সকলকে; কেবল ছত্তিস বাবুর বুড়হিয়া মাই যখন 'পুজো চড়াচ্ছিলেন' তখন 'ছত্তিসববুর বেওয়া বহন' ৭ একখানা ইয়া মোটা সজনের ডাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—যতক্ষন বুড়ি মাইজির পুজো না হয়, ততক্ষণ তাৎমা ধাঙর দুসাদ কেউ এসেছে কি পিঠে ভাঙব এই ডাল।

১ খালি, চুপচাপ।
২ জিরানিয়ার ভাড়া গাড়ির নাম।
৩ নম্বর (আদমশুমারির)।
৪ চৌকিদারী ট্যাক্সের!
৫ গুপ্তচর।
৬ দশহরা বা দুর্গাপুজায়।
৭ সতীশবাবুর বিধবা ভগ্নী।

ঢোঁড়াইরা দল বেঁধে চলে এসেছিল সেখান থেকে। বাবুভাইয়াদের ছেলেরা পরে তাৎমাটুলিতে খোশামোদ করতে এসেছিল। আবার তাদের 'নেওতা'১ দিয়ে যেতে এসেছিল। আমি কত বোঝালাম, বাবুভাইয়ারা বলছে সকলে! কখনও তো উঠতে পেতিস না 'ভগবত্তি থানে'২ এবার উঠতে পেয়েছিস। কোন মাইজি 'পান চিরে দু টুকরো করেছে'৩ আর অমনি অনর্থ বাধিয়ে তুললি। আরে ঢোঁড়াই, তুই রাজী হলেই তোর এই 'হাঁ তে হাঁ মিলানেবোলা'৪ শাগরেদগুলো এখনই রাজী হয়। এই কথায় ফোঁস করে উঠলো সবগুলো। আচ্ছা বাবা যা ভাল বুঝিস তাই কর। বাবুভাইয়াদের কাছে তোদের টোলার ইজ্জত খুব রাখলি বটে! আবার আমাকে শোনানো হল যে, রতিয়া ছড়িদার মহাৎমাজীর চেলার খেলাপে সাক্ষী দেবে, তাতে টোলার ইজ্জত বাড়বে? সেটা বন্ধ করার মহতো তুমি না, আর বাবুভাইয়াদের পা চাটাবার মহতো তুমি।

—না, না, মহতোগিরিতে না আগেকার মতো পয়সা, না আছে সম্মান, না আছে এক মুহূর্তের শান্তি।—নায়েব ছড়িদারদের পর্যন্ত কিছু ঠিকঠিকানা নেই। তাদের মধ্যে কে যে কখন কোন দিকে বোঝা দায়। রামিয়ার সেই লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়ার ব্যাপারে সবাই চলে গিয়েছিল মহতোর বিরুদ্ধে; সেইজন্যই মহতো সে কথাটাই পাড়েনি পঞ্চায়েতে। চৌকিদারী ট্যাকসের ব্যাপারে সব নায়েবই বাবুলালের বিরুদ্ধে। মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে সব নায়েবই ছড়িদার আর বাসুয়ার বিরুদ্ধে।—এখন কাকে হাতে রাখব? কাকে সঙ্গে নিয়ে চলব? আর সমস্যা কি একটা? তাৎমাটুলি থেকে লোক চলে যাচ্ছে। বতুয়ার বোনটা মুসলমানের সঙ্গে চলে গেল। হারিয়া মেয়েটার বিয়ে দিয়ে এসেছে মালদা জেলায়, টাকার লোভে। আর বলেছে যে সেইখানেই চলে যাবে চাষবাসের কাজ করতে। আমার নিজের ছেলে গুদর, সে আজ আরম্ভ করেছে মুঙ্গেরিয়া তাৎমা রাজমিস্ত্রীদের যোগান দেওয়ার কাজ। সেই হয়তো চলে যাবে মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের গাঁ মারগামায়।—মুঠো থেকে সব পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাকে সে আটকাবে? এই দ্যাখো না ঢোঁড়াইয়ের দল তো আবার এক নতুন গন্ডগোল বাধিয়েছে। এই যে হরখুর বাপটা—যেটা ধোঁদলের ফুলে ভরা মাচাটার পাশে তেল মেখে ল্যাংটা হয়ে পড়ে থাকত সারাদিন, তাঁকে গোঁসাই টেনে নিয়েছেন ক'দিন হল। বড় ভাল হয়েছে—তাৎমাটুলির বুড়োবুড়িরা তো মরতে জানে না। ডাইনের জোর ছোট ছেলেপিলেদের উপরই খাটে কি না! পৈতা নেওয়ার পর থেকেই ঢোঁড়াইয়ের দল চেঁচামেচি করছে যে, 'তেরহমা' করবে, 'তিরসা' নয়৫। বুড়ো লোক না মরলে গাঁ-সুদ্ধ লোক মাথা নেড়া করার

১ নিমন্ত্রণ।

২ বাঙালীদের দুর্গামন্ডপ।

৩ স্থানীয় ভাষায় 'পান চিরে দু টুকরো করা'—বাঙলায় 'পান থেকে চুন খসা' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪ যারা সব কথায় সায় দেয়।

৫ শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্মাদি মৃত্যুর তেরো দিনের দিন করবে না ত্রিশ দিনের দিন, তাই নিয়ে পৈতা নেওয়ার পর তাৎমা সমাজে বেশ মতদ্বৈত হয়। এতদিন থেকে ত্রিশ দিনের দিন কাজ করাই চলে আসছিল। নতুন দ্বিজ হবার পর স্থানীয় সকল জাতের মধ্যেই এই বিষয় নিয়ে দলাদলি, মারামারি, থানা-পুলিশ পর্যন্ত হয়েছে। নতুনের দল তেরো দিনেই কাজ করতে চায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মত।

সুযোগ পায় না। এতদিনের মধ্যে এক কেবল মরেছিল বুড়ো মহাবীরা, তা সে সাপের কামড়ে। তাই তার 'কিরিয়া করম' কিছু দরকার হয়নি। এইবার এই ঢোঁড়াই শয়তানটার দল গোলমাল পাকাবে তেরো দিনের দিন। সেটা হতে দিচ্ছি না। কিসে থেকে কী হয় তার খবর রাখিস, এদিকে তো খুব ফরফর ফরফর করিস তোরা। পিতৃপুরুষের 'জল চড়ানোতে' একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কি উদ্বাস্তু হয়ে যাবি সকলে, ঘরবাড়িতে বিনা আগুনে আগুন লেগে যাবে, কালো টিকের মতো দাগ হবে প্রথমে চালে, তারপর দেখবি সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে; তাঁদের ঘাঁটাস না। আগে লেজ তুলে দ্যাখ এঁড়ে কি বকনা, তবে না কিনবি। মহতো থই পায় না; এক বছরের মধ্যে সে এত বুড়ো হয়ে পড়ল নাকি? যাকগে, মরুকগে, যা হবার তা হবেই। 'তুমহসন মিটহি কি বিধি কে অঙ্কা'১। তোমার জন্য কি বিধাতার লেখা বদলাবে?—পঞ্চায়তির জরিমানার টাকার হিসাব চায় গাঁয়ের লোক! আশ্চর্য! রাতারাতি বদলে যাচ্ছে তাৎমাটুলি। মরনাধারেরর বালির মধ্যে যেন তার পা ধসে যাচ্ছে।

হঠাৎ রতিয়া ছড়িদারের বৌ চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করে। মহতো উঠে দাঁড়ায়। মহতোর দুদন্ড নিশ্চিন্দ হয়ে বসবার জো নেই আজকাল। নিশ্চয় ছড়িদার বৌকে মারছে, আগুন-টাগুন লাগলে তো দেখাই যেত।

সকলে দৌড়ে যায় রতিয়া ছড়িদারের বাড়ি। তার বৌ কুপী ধরে সকলকে দেখায় যে ছড়িদারের ভুরুর উপর খানিকটা কেটে গিয়েছে। এখনও অল্প অল্প রক্ত পড়ছে। একটা বাঁশে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে শহর থেকে ফিরছিল; একটু বেশি রাত করেই সে আজকাল ফেরে। যেই শহরের বাইরে কপিলদেওবাবুর আমবাগানটায় পেঁছেছে, অমনি অজস্র ঢিল তার উপর এসে পড়তে আরম্ভ করে।—ছড়িদার কোনো লোককে দেখতেই পায়নি, তা চিনবে কী? তবে পায়ের শব্দ সে শুনেছে।

—মহাৎমাজীর চেলারা মাছ মাংস পিঁয়াজ রসুন খায় না। তারা কি কখনও কারও গায়ে হাত তুলতে পারে?—এই আবার এক নতুন কান্ড হল পাড়ার মধ্যে! দেখিস ছড়িদার, তুই আবার দফাদারকে এসব বলিস না যেন।—থানা-পুলিশের কথা ভাবলেই মহতোর বুক শুকিয়ে যায় ভয়ে—নিশ্চয়ই ঢোঁড়াইয়ের দলের কান্ড এটা! কিন্তু ঢোঁড়াই-টোঁড়াই সকলকেই তো দেখছি এখানে।—ছড়িদারের বৌ তখনও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে—হারামীর দলের সব কটাকে হাতে হাতকড়া পরাব।—বাইরে ঠুনঠুন করে ঘোড়ার গলার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সামুয়রটা গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছে; এই তাৎমাটুলির পথ দিয়েই সে রোজ ফেরে, মদের দোকান বন্ধ হওয়ার পর। ওঃ! তাহলে অনেক রাত হল। চল্ চল্ সকলে। ছড়িদারকে ঘুমুতে দে। শ্যাওড়া গাছের দুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কাটাটার উপর; কালই শুকিয়ে যাবে ঘা।

### তাৎমাটুলিতে ডাকপিয়নের দৌত্য

হিন্দু হওয়ার পর থেকে সামুয়রের সম্মান বেড়েছে তাৎমাটুলিতে, নাহলে ঘোড়ার গাড়ির মালিক হলেও কিরিস্তানকে কে পোঁছে। মহতো আর নায়েবরাও জল্পনা-কল্পনা করে, এক সময় তো হিন্দু ছিলো ওরা। জাত কি কারও যাওয়ার জিনিস।

১ তোমার জন্য কি বিধাতার লেখা বদলাবে।

'সোন অ নহী জরইছে',১ সোনা জ্বালালে পরিষ্কারই হয় আগের চেয়ে। লোকটাকে যত খারাপ মনে করত সকলে আগে, আসলে সে তত খারাপ নয়। সে সকালে যখন গাড়ি নিয়ে শহরে যায়, তখন মহতো, নায়েব, ছড়িদার, যার সঙ্গেই দেখা হয় পথে, তাকে গাড়িতে চড়িয়ে নেয়। এর আগে তাৎমাটুলির কেউ কোনদিন জীবনে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েছিল? তাৎমা ছেলেমেয়েরাও গাড়ি চড়ার জন্য পাগল। কিরিস্তান সামুয়রটা আজকাল সকলের 'সামুয়রভাই'২ হয়ে উঠেছে। মহতোগিন্নী পর্যন্ত এক দিন তাকে আমলকির আচার খাইয়েছে। গাড়ি নিয়ে শহরে যাওয়ার আর ফিরবার সময় সে তাৎমাটুলি হয়েই যায়; আর সকলের সঙ্গে খুব আলাপ জমাতে চায় সে আজকাল। পাদরী সাহেবের সম্বন্ধে এমন সব রসের গল্প করে যে সকলে হেসে ফেটে পড়ে।

'না, তুই বানিয়ে গল্প করছিস সামুয়র।'

'তবে শোন্ আর একটা।' এই বলে সে কাকো-ঘাঘরা-পরা মেম-পাদরীদের নিয়ে আর একটা অবিশ্বাস্য গল্প বলে।

সে যখনি গাড়ি নিয়ে এ-পথ দিয়ে যায়, একবার হেঁকে যায়—'ঢোঁড়াই বাড়ি আছিস নাকি?'

রামিয়া ভিতর থেকে জবাব দেয়, 'না, সে গরুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে সেই সকালে; এখনও ফিরবার নাম নেই।

ঢোঁড়াই কাজে বেরিয়েছে কিনা, তা বাড়ির বাইরে গাড়ি-বলদ আছে কি নেই, দেখলেই বোঝা যায়। তবু তার একবার জিজ্ঞাসা করা চাই-ই চাই। জিনিসটা মহতোগিন্নীর চোখেও কেমন কেমন যেন ঠেকেছে।

সামুয়রের এত মাখামাখি ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। মজার মজার গল্প বলে সামুয়র যে রকম রামিয়াকে হাসাতে পারে, তেমনিটি ঢোঁড়াই পারে না। এ কথা ঢোঁড়াই বোঝে, আর মনে মনে সংকুচিত হয়ে যায় এর জন্য—তার গল্প শুনে রামিয়া হেসেছে বলে ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে না; অথচ সামুয়রটা এমন করে গল্প বলে যে রামিয়া শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। এতটা বাড়াবাড়ি ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। সামুয়রটা ছেলেবেলা থেকে সাহেবদের ওখানে কত 'আণ্ডা চিড়িয়া উড়িয়েছে'৩ বোধ হয়। সে কথা মনে করলেই ঢোঁড়াইয়ের গা ঘিনঘিন করে। রসুন হজম হওয়ার পরও ঢেকুরে রসুনের গন্ধ থাকে, আর ঐ সামুয়রটা কত অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছে আগে; তার কি আর কিছু ওর শরীরে এখনও নেই। আর সেটাকে নিয়ে এখন এত মাখামাখি।

রামিয়াটা আবার একা-একা রয়েছে।

ছড়িদারের বাড়ি থেকে ঢোঁড়াই কত কী ভাবতে ভাবতে আসে।

বাড়ির দুয়ারে সামুয়র গাড়ি থামিয়াছে। তাই হঠাৎ ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের শব্দটা আর শোনা যাচ্ছিল না।

রামিয়াই প্রথম কথা বলে, 'এই শোনো এর কাছ থেকে; ডাকপিয়ন তোমাকে খুঁজছিল।'

---

১ 'সোনা জ্বলে না'—সোনা জ্বালালে আরও পরিষ্কার হয় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ২। সামুয়র দাদা।

৩ মুরগীর ডিম আর মাংস খেয়েছে।

'ডাকপিয়ন, কেন ?'

সামুয়র বলে, ডাকপিয়ন তাকে ঢোঁড়াইদাসের কথা জিজ্ঞাসা করছিল শহরে। তোমার নামে 'মানি আটার'১ আছে।

'মানি আটার ?'

'হাঁ, হাঁ, টাকা।'

ডাকপিয়নে আবার টাকা দেয় নাকি ? ঢোঁড়াই কী করবে ভেবে পায় না। টাকা কে পাঠাবে ? কত টাকা, তাও সামুয়র বলতে পারে না। কেবল ডাকপিয়ন জিজ্ঞাসা করছিল তাই বলতে পারি।

সামুয়র চলে গেলে রামিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'বাওয়া পাঠায়নি তো ?'

সকলেরই সে কথা মনে হয়েছে, ঢোঁড়াই আর সামুয়রেরও! টাকার কথা উঠলে ঢোঁড়াইয়ের অন্য নাম কি মনে পড়তে পারে ? ঢোঁড়াই কেন, সব তাৎমাই জানে যে, রোজগার করে হয় আনা—টাকা নয়। আর টাকা আসে লোকের দৈবাৎ—রামজীর কৃপাদৃষ্টি হলে। বাওয়া পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই. বাওয়া এখনও তাকে মনে রেখেছে তাহলে।

তাৎমাটুলিতে সাড়া পড়ে যায়—'মানি-আটার মানি-আটার!' মহতো নায়েবদের বুকের ভিতরে করকর করে—ঢোঁড়াইটা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বুঝি এবার। 'ডাকিয়া'২ আনল ঢোঁড়াই পাড়ার ভিতর।

উঠোন-ভরা ঝোটাহার দল সসম্ভ্রমে রামিয়ার গল্প শোনে। সে রাত্রে রামিয়া কি ঢোঁড়াই, কেউই ঘুমুতে পারে না। সারারাত তারা টাকার কথা, আর বাওয়ার কথা বলে কাটিয়ে দেয়।

দিনকয়েক পরে ডাকপিয়ন আসে সেই সন্ধ্যাবেলায়। মিসিরজী তখন পিয়নের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ফিরবার যোগাড় করছেন। বাবুলালের বাড়ি থেকে কাজললতা আসে। পিয়ন তিনটি টাকা থলির ভিতর থেকে বের করে দেয়, আর 'মানি-আটার' ছিঁড়ে একটুকরো কাগজ দেয়।

'ওলায়তী লন্ঠনের'৩ জন্য বাওয়া তিন টাকা পাঠিয়েছে অযোধ্যাজী থেকে। আর কিছু লেখা নেই কাগজে। বাওয়ার হাতের ছোঁয়া চিঠি—ঢোঁড়াই কত রকমে উলটে-পালটে দেখে। কত ছোটবেলার কথা তার মনে হয়। রামিয়ার অলক্ষ্যে কাগজখানা শুঁকে দেখে—বাওয়ার জটার গন্ধ পাওয়া যায় কিনা তাতে। তারপর সযত্নে সেখানা রামিয়ার তৈরি বেনাঘাসের কাঠাতে রেখে দেয়।

মহতো বলে, 'বড় খরচার রাস্তা—অর্থাৎ লন্ঠন জ্বালতে বড় খরচ। বাওয়া তোর ভাল করল কি মন্দ করল বলা শক্ত।'

ছড়িদার সায় দেয়. 'যাকে জেরবার করতে হবে, তাকে নাচিয়ে দেয় জমিদারবাবুরা। তারপর সামলাও তার খরচা।'

হারিয়ার ছেলে, হাঁ এসব পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কিনে রাখবার জিনিস। তাহলে দশের কাজে-কর্মে একটু উপকার হয়। ফোঁস করে ওঠে ছেলে ছোকরার দল। 'আরে রাখ্। পঞ্চায়েতের সতরঞ্চি কিনবার কথা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, তা

১ মানি-অর্ডার।

২ ডাকপিয়ন।

৩ বিলাতী লন্ঠন (ডিজ লন্ঠন)।

আজ পর্যন্ত কেনা হল না। আর 'ওলায়তী লাল্টেম' জ্বালিয়ে—'যুগীরা আর বলবাহী'১ নাচ নাচবে পঞ্চরা। এত টাকা জরিমানা ওঠে, কী কী হয় সে সব?'

মহতো এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়।

'ঢোঁড়াই, তাহলে একটা ভাল করে দেখেশুনে লন্ঠন কিনিস। কাঁচটা বাজিয়ে নিবি—ঠনন্। ঠনন্।'

'আমি কি অত শত চিনি? তা তোমরাই চল না কেন মহতো নায়েবরা, কাল সকালে বিলিতি লন্ঠনের সওদা করে দিতে।'

রতিয়া ছড়িদার তার ফ্যাটা-বাঁধা ভুরুর নিচের চোখটা দিয়ে মহতোকে কী যেন ইশারা করে।

'না না, কাল সুবিধে হবে না আমাদের। একটা কাজ আছে।'…

—আরে ফটফট করিস না, তোরা আমার হাঁটুর বয়সী। আমার মাথার চুলটা রোদ্দুরে পাকেনি। আমাদের সরাতে চাচ্ছিস কাল সকালে হরখুর বাপের 'তেরহী'২ করার মতলবে; সেটুকু আর বুঝি না?…

'ঢোঁড়াই, তুই-ই বরঞ্চ যাস সামুয়েরের গাড়িতে, কাল ভোরে ও যখন কাজে যাবে। ও সাহেবদের বাড়িতে কত ওলায়তী লাল্টেম জ্বালিয়েছে আর ছত্তিসবাবুর দোকানে গাড়িতে করে গেলে জিনিসটা দেবে মজবুত।'

## তেরহী তিরসার দ্বন্দ্ব

মহতোর কথামতো ঢোঁড়াই সামুয়েরের সঙ্গে লন্ঠন কিনতে যায় বটে; কিন্তু সকালে নয়, বিকেলের দিকে। সকাল বেলা কি ঢোঁড়াই যেতে পারে? বুড়োরা নিজেদের যতই চালাক ভাবুক, তারা 'আঙুল উঠোলে'ই৩ ঢোঁড়াইয়ের দল তাদের মতলব বুঝতে পারে।

যাস না ঢোঁড়াই খবরদার সকালের দিকে। তাহলে পাঁচ-পাঁচটা বুনো মোষের তাল সামলানো—পাঁচটা কেন, ছড়িদারকেও ধর, ছটা—সে আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না।

পরের দিন সকালে ঝগড়া-ঝাঁটি, গালাগালির মধ্যে মাথা নেড়া করবার পর্ব শেষ হয়। তাৎমাদের 'কিরিয়াকরম' এর নাপিত পুরণকে মহতো নায়েবরা বারণ করে দিয়েছিল, হরখুর বাপের 'তেরহী'তে কারও মাথা নেড়া করতে। ঢোঁড়াই ধরে নিয়ে আসে মরগামার নাপিতের ছেলেটাকে।

—সে ছোকরা নাপিতটা কি ঢোঁড়াই না থাকলে আর কারও কথা শুনত!—ঢোঁড়াই গাড়ি বোঝাই মাল নিয়ে গিয়েছিল কুশী স্নানের মেলায়। মেলায় দেখা এই নাপিতের ছেলেটার সঙ্গে। তার মেলাতে কেনা 'চাক্কী'৪ ঢোঁড়াই গাড়িতে করে এনে পৌঁছে দিয়েছিল তার বাড়িতে, ভাড়া না নিয়ে। সেই নাপিত কি এখন ঢোঁড়াইয়ের কথা না রেখে পারে?

মরগামার মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের পুরুতকেও ঢোঁড়াই ঠিক করে রেখেছিল; কিন্তু

---

১ যুগীরা আর বলবাহী দুইরকম পল্লীনৃত্যের নাম।

২ মৃত্যুর তেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধাদি করার নাম 'তেরহা'।

৩ তারা কথা বলবার আগেই ঢোঁড়াইরা তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারে—এই স্থানীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

৪ জাঁতা।

শেষ পর্যন্ত তা দরকার হয়নি। মিসিরজী রাজী হয়ে গিয়েছিল পূজো করাতে। রতিয়া ছড়িদার মিসিরজীকে ভয় দেখিয়েছিল যে থানে রামায়ণ পাঠ বন্ধ করিয়ে দেবে। ঢোঁড়াই জবাবে বলেছিল, দফাদারকে বলে করাবে নাকি রামায়ণ পাঠ, ছড়িদার? সকলে হেসে ওঠায় ছড়িদার আর ভাল করে কথাটার উত্তর দিতে পারেনি।

ভাগ্যে সামুয়রের সঙ্গে গিয়েছিল লন্ঠন কিনতে ঢোঁড়াই। না হলে তো ঠকেই মরেছিল—সামুয়র সঙ্গে ছিল বলেই না, সে বলে দেয় যে পলতেটাতে বড় ঠকায় দোকানদারেরা; নীল 'কোর'১ওয়ালা পলতে নিবি। সেই রাতে সামুয়র বিলাতী লন্ঠনটি জ্বালিয়ে দেয় ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে। ভিড় বেশি হয়নি। মহতো নায়েবের দল চটে আছে; তারা ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে আসিতেই পারে না। আর ঢোঁড়াইয়ের দল ছিল হরখুর বাড়ি, 'তেরহাঁ'র ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত।

রামিয়া বলে, 'একেবারে দিনের মতো আলো হয়েছে, না?'

সামুয়র ঢোঁড়াইকে বলে—'এমন আলো কিনলি ঢোঁড়াই একেবারে দোকানের আলো। এবার খুলে দে একটা দোকান। তোর বৌ হবে মুদিয়ানী; সওদা ওজন করবে, রামে রাম, রাম; রামে-দো দো; দুয়ে তিন তিন—'

রামিয়া হেসে লুটিয়ে পড়ে।

সামুয়রের এসব রসিকতা ঢোঁড়াইয়ের একটুও ভাল লাগে না। কিছু বলতেও পারে না; এত কষ্ট স্বীকার করে লন্ঠন পছন্দ করে দিয়েছে। বাওয়ার কথা ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ছে। তারই দেওয়া বিলাতি লন্ঠন ঢোঁড়াইয়ের আঙিনা আলো হয়ে গিয়েছে। তারই দেওয়া তো সব—বাড়ি, ঘর, গাড়ি, বলদ, রামিয়া, ঢোঁড়াইয়ের আপন বলতে যা-কিছু আছে এ দুনিয়াতে। রামজীর রাজ্যে গিয়েও বাওয়া তাকে ভুলতে পারেনি। আর সে বাওয়ার কথা ক'দিন ভেবেছে? এই সামুয়রের কথায় খিলখিল করে হাসা মেয়েটার জন্য, গেল এক মাসের মধ্যে তার একবার গোঁসাই থানে যাওয়ার কথাও মনে পড়েনি।

—আগে দেখেছি, এ মেয়ের থানে পিদিম দেওয়ার সে কী ধুম। এখন সে কথা মনেও পড়ে না। না, না, মিছিমিছি সে রামিয়ার উপর দোষ দিচ্ছে; উঠোনের তুলসীতলায় তো সে রোজই পিদিম দেয়। বাড়ির বাইরে যেতে তো সেই মানা করে রামিয়াকে।

সামুয়র কী যেন একটা মজার গল্প করছে। রামিয়াটা হাঁ করে গিলছে কথাগুলো। ঢোঁড়াই যদি অমন গল্প করতে পারত।

হঠাৎ সে আলো নিয়ে ওঠে।

'যাই বাওয়ার থানে একবার আলোটা দেখিয়ে, তারপর ওটা নিয়ে যেতে হবে হরখুর বাড়ির ভোজে। বাওয়ার দেওয়া জিনিসটা দশজনের কাজে লাগুক।

—পাড়ার লোককে নিজের বিলাতী লন্ঠন দেখানোর ইচ্ছার কথাটা সে মনে মনেই রাখে।

অনেক লোক এসেছে হরখুর বাড়ির ভোজে। আট 'বাঁশের বাতি'২ লোক খেতে বসেছে! আরও জনকয়েক পরের দলে খাবে। মহতো নায়েবদের এরকম

১ বর্ডার; নীল বর্ডারযুক্ত।

২ সামাজিক ভোজের পঙক্তিতে ভোজের সময় একখানি করে সরু বাঁশের পাতা দেওয়া হয়। এর উপর পা রেখে সকলে উবু হয়ে বসে।

পরাজয়ের কথা ঢোঁড়াই কল্পনাও করতে পারেনি। ঢোঁড়াইয়েরই জয়জয়কার। তারই নাম সকলের মুখে। তারই আনা নাপিত, তারই বিলাতী লণ্ঠন, সে-ই তো সব, বাকি লোকেরা তো 'পাহাড়ের আড়ালে' আছে।···সকলের মুখে তার প্রশংসা শুনতে শুনতে ঢোঁড়াইয়ের নিজেকে মহতোর সমান বড় মনে হচ্ছে। চোখের সম্মুখে স্বপ্নরাজ্যের ছবি ভিড় করে আসছে—মহতো মারা যাওয়ার পর তাকে পাড়ার লোকেরা মহতো করেছে? সে জরিমানার পয়সা দিয়ে তাৎমাটুলীর জন্য সতরঞ্চি কিনেছে; দলের জন্য ঢোলক কিনেছে; ভোজের জন্য প্রকাণ্ড কড়াই কিনেছে; রতিয়া ছড়িদারকে বরখাস্ত করে হরখুকে ছড়িদার করেছে; বাওয়া এসে দেখবে যে তার ঢোঁড়াই গাঁয়ের মহতো হয়েছে; রামিয়াটাকে আবার সকলে ডাকবে মহতোগিন্নী বলে; সত্যিই গিন্নি হয়ে উঠেছে সে আজকাল।···

হঠাৎ মনে পড়ে যে, সে বেচারি একা রয়েছে ঘরে। তার মন উসখুস করে।

আঁচানোর পর ঢোঁড়াই বলে, 'আলোটা থাক এখন এখানে। পরের দলের খাওয়ার সময় লাগবে।'

ঢোঁড়াইয়ের আর তর সইছে না'—সকলে হেসে ওঠে।

### 'তেরহা' যজ্ঞের কুলপতির পত্নী নিগ্রহ

ঢোঁড়াই হনহন করে বাড়ির দিকে আসছে। ভোজবাড়ি চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে অল্প অল্প। বেশ কুয়াশা হয়েছে চারিদিকে। কার্তিক মাস শেষ হয়ে গিয়েছে; পরশু বুঝি 'ছট্' পুজো'১। রামিয়া হয়তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে; একা একা কতক্ষণ আর জেগে বসে থাকে। পায়ের নিচে বালি বেশ ঠাণ্ডা; শিশির পড়ে পথের ঘাস ভিজে উঠেছে। গা শিরশির করছে ঠাণ্ডায়। হাতে তার ভোজবাজির 'মুখ-শুধ'২। ঘুমন্ত রামিয়ার মুখের মধ্যে সে এক টুকরো দিয়ে তারপর তাকে জাগাবে। ওটা কী সম্মুখে! হাতির মতো প্রকাণ্ড! তাই বল্! গাড়ি, সামুয়রের! ঘোড়াটা খুলে রেখেছে; পথের ধারে চরছে। সামুয়র তাহলে যায়নি। এত রাতেও এখানে! তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সেই সন্ধ্যায় এসেছে, এখনও গল্প করছে। একটু চক্ষুলজ্জাও তো থাকা উচিত। এত বুদ্ধি, আর এটুকু খেয়াল নেই রামিয়ার? পাড়ার লোকে কী বলবে; সামুয়রের মতো 'লাখেরা'র৩ সঙ্গে একা গল্প করা এত রাত পর্যন্ত? দোরগোড়া থেকে দেখে যে উঠোনে কেউ নেই। তাদের গল্প শোনা যাচ্ছে। কথার একবিন্দুও বোঝা যায় না। রামিয়ার হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেই খিলখিল করে হাসি। ঢোঁড়াইকে নিয়েই হয়তো হাসাহাসি করছে।

বাড়ির ভিতর ঢুকে ঢোঁড়াই দেখে যে তারা দাওয়ার উপর বসে গল্প করছে। তুলসীতলার পিদিপের ঝাপসা আলোতে তাদের পরিষ্কার দেখা যায় না। ঢোঁড়াই ঢুকতেই সামুয়র উঠে দাঁড়ায়। 'তোর বৌকে পাহারা দিচ্ছিলাম। এই আসছে তো এই আসছে। তোর জন্য অপেক্ষা করছি কি এখন থেকে। বিলাতী লণ্ঠনটা যে রেখে এলি দেখছি?'

ঢোঁড়াই তার কথার জবাব দেয় না। গম্ভীর ভাবে মাটির কলসী থেকে জল নিয়ে পা ধুতে বসে।

---

১ ষষ্ঠী এবং সূর্যের পুজো।

২ মুখশুদ্ধি, সুপারি কিংবা পান। ৩ লক্ষ্মীছাড়া।

'আচ্ছা, আমি যাই তাহলে এখন। অনেক রাত হয়েছে।'

ঢোঁড়াই বা রামিয়া কেউ উত্তর দেয় না।

সামুয়রের সঙ্গে গপ্প করলে ঢোঁড়াই চটে, এ কথা রামিয়া ভালোভাবেই জানে। কতদিন এ সম্বন্ধে ঢোঁড়াই তাকে বলেছে। রামিয়া সে সব কথা গায়েও মাখেনি। আজ কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের ভাব একটু যেন বেশি গম্ভীর লাগে রামিয়ার। রামিয়া মনে মনে হাসে। শোবার পর একটু ভাল করে গপ্প করলেই রাগ পড়ে যাবে বাবুর।

সামুয়র চলে যাওয়া মাত্র ঢোঁড়াই গট্‌গট্‌ করে ঘরে ঢোকে।

'রামিয়া।'

গলার স্বরেই রামিয়া বোঝে যে তার আন্দাজ থেকে আজ রাগটা একটু বেশি; 'তেরহাঁ'র লড়াই জিতে এসেছে কি না তাই।

'ফের যদি সামুয়রের সঙ্গে কথা বলতে কোনোদিন দেখি, তাহলে 'খাল'১ ছিঁড়ে নেব।'

'কেন?'

'আবার বলা—কেন!' ঢোঁড়াইয়ের সর্বাঙ্গে আগুন লেগে যায়। রামিয়ার চুলের ঝুঁটি ধরে তার মুখে মাথায় কয়েকটি চড়চাপড় মারে। 'পচ্ছিমা মিসিরজির মতো কথা, আর তাৎমাটুলির ঝোটাহার মতো চালচলন। মুখে মুখে জবাব! গরুর চাবুক মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। উঠোনে শানাল না, দাওয়ায় উঠে ঢলাঢলি করছিলে এতক্ষণ।

রামিয়া প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ঢোঁড়াই যে তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে, সে কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তার মাথার রক্ত চড়ে যায়। সে উঠে দাঁড়ায়। 'আমাকে তোমাদের এখানকার 'ভুচ্চর'২ তাৎমাদের ধুরপিধরা, কমজোর ঝোটাহা ভেবো না। বাওয়ার পয়সার ফুলে 'তাথি'৩! 'ভিখমাঙ্গার'৪ পয়সা হয়েছে আর বাবুভাইয়াদের মতো বৌকে বন্ধ রাখতে সাধ গিয়েছে। তা করতে গেলে বাবুভাইয়াদের মতো ব্যবহার শিখতে হয়'…গালি দিতে দিতে রামিয়া বাড়ির বাহির হয়ে যায়। এমন মরদের ঘর করতে বাপ-মা শেখায়নি'…

'তোর মা-বাপের কথা ঢের জানা আছে! থাকগে যা না সামুয়রের সঙ্গে। খানিক পরেই তো আবার 'কুত্তী'র৫ মতো ফিরে আসবি জানি।'…

দুটি দুটি পাড়ার লোক জমতে আরম্ভ করে। তাৎমাটুলিতে সব বাড়িতেই এমনি হয়। বিশেষ করে ধানকাটনীর আগে 'ঝোটাহা'দের উপর মারধরটা একটু বেশি বাড়ে। পাড়ার লোকজন এসে দুজনকে থামিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই দিব্যি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে মারধর এই প্রথম, তাই প্রতিবেশীদের মধ্যে কৌতূহলে বেশি। কারও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঢোঁড়াই শুয়ে পড়ে। পাড়ার লোকের কথাবার্তা থেকে জানতে পারে যে, রামিয়া রবিয়ার বাড়ি গিয়ে খুব চেঁচামেচি করছে। কিছুক্ষণ পরই ঢোঁড়াইয়ের আঙিনা খালি হয়ে যায়।

কুয়াশা আরও ঘন হয়ে তাৎমাটুলির বুকে চেপে বসে।

---

১ চামড়া। ২ জানোয়ার।
৩ হাপড়। ৪ ভিখারী। ৫ কুকুরী।

পরদিন সকালেও রামিয়া এল না দেখে শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই রবিয়ার বাড়িতে যায়। অনুশোচনায় তখন তার মন ভরে গিয়েছে। ঝোঁকের মাথায় কী কাণ্ডই সে করে ফেলেছে রাতে! কাল আবার ছটপরব। আজ রামিয়ার উপোস। রাত্রে রামিয়া খেয়েছিল তো? খেল আবার কখন, সন্ধ্যা থেকেই তো সামুয়ের বাড়িতে বসে।

রবিয়ার বৌ বলে যে, রামিয়াকে নিয়ে রবিয়া গিয়াছে মহতোর কাছে সেই ভোরবেলায়; রামিয়া পঞ্চায়তি করবে। রবিয়ার বৌয়ের কথা বলবার সময় নেই; ছটপরবের যোগাড়যাগাড়ের ছিষ্টিকাজ তার পড়ে রয়েছে, নিঃশ্বাস ফেলবার বলে সে সময় করে উঠতে পারছে না, তার আবার সে এখন ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে গল্প করতে বসবে।

ঢোঁড়াইয়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে—কেবল আত্মমর্যাদায় নয়, আত্মবিশ্বাসেও।

কী আক্কেল রামিয়ার! তাদের ঘরোয়া কথা নিয়ে গিয়েছে মহতো নায়েবদের কাছে! সামান্য জিনিসকে এত বাড়ানোর কী দরকার ছিল? কালকে ছটপরব তা কি রামিয়া ভুলে গিয়েছে? তাদের নতুন সংসারের প্রথম ছটপরব এইটা। কী কী জিনিস আনতে হবে তা কি ঢোঁড়াই অতশত জানে। 'সোহাগিন'১ থাকল ছটপরবের সময় বাড়ির বাইরে—ঢোঁড়াইয়েরই বিরুদ্ধে নালিশের তদ্বিরে। তার রঙিন জগৎ আবছা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

ঢোঁড়াই সেদিন গাড়ি নিয়ে কাজে বেরোয় না, রামিয়া আবার যদি বাড়ি ফিরে তাকে দেখতে না পায়। বাড়িতে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে সে রামিয়ার কাছে মাপ চাইবে। ঠোঁটের কোণে হাসি এসে রামিয়া বসবে উনুনে আগুন দিতে, ঢোঁড়াইয়ের জন্য ভাত রাঁধতে। না না আজ আবার ভাত রান্না কী? স্নান করে রামিয়া বসবে গম ধুতে ছটপরবের 'ঠেকুয়ার'২ জন্য। ঢোঁড়াই ধাঙড়টুলি থেকে নিয়ে আসবে বাতাপিলেবু, আখ, সাওজীর দোকান থেকে আনবে গুড় আর 'ঠেকুয়া' ভাজাবার তেল।...

উঠোনে বসে ঢোঁড়াই আকাশপাতাল ভাবে। সময় কাটতে চায় না। বড় একা একা লাগে। রামিয়া। বেনাঘাসের কাঠা, গোবর মাটি দিয়ে ন্যাপা তুলসীতলা, ঝকঝকে করে নিকানো উনুন, বাড়ির প্রতিটি জিনিসে রামিয়া মেশানো।

বাইরে বলদের ডাক কানে আসে। ওঃ তাই তো আজ বলদদুটোকে জল আর জাব দেওয়া হয়নি তো। একদম ভুলে গিয়েছি সে কথা।

ঢোঁড়াই ধড়ফড় করে ওঠে।

বলদদুটোকে খেতে দেওয়ার সময় রতিয়া ছড়িদার খবর দিয়ে যায় যে, রাতে মহতোর বাড়িতে রামিয়ার নালিশের পঞ্চায়তি হবে; সে যেন যায়।

'তেরহী'র মতো দশজনের ব্যাপার হলে ঢোঁড়াই মহতো নায়েবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে। কিন্তু এ নালিশ যে রামিয়ার আনা। ঢোঁড়াই দোষ করেছে; সে পঞ্চায়তের সম্মুখে সব দোষ স্বীকার করে নেবে। খালি বাড়িতে তার মন এরই মধ্যে হাঁফিয়ে উঠছে। কাল শেষরাত্রে যখন রামিয়া ময়নাধারে 'ছট'-এর পিদিপত৩ ভাসাতে

১ এয়ো। ২ আটা ও গুড় দিয়ে তৈরি একরকম শুকনা পিঠা ঃ ছটপুজোয় লাগে।

৩ ছটপরবের পরদিন ভোর রাত্রে মেয়েরা নদীতে কিংবা পুকুরে ষষ্ঠিঠাকরুন আর সূর্যদেবের নামে পিদিপ জেবলে ভাসিয়ে দেয়। প্রত্যেক বাড়ির মেয়েরা এই উপলক্ষে নদীর ধারে যাবার সময় সংগতি অনুযায়ী জাঁকজমক করে।

যাবে, তখন সঙ্গে যাওয়ার জন্য ঢুলী আনবে ঢোঁড়াই মরগামা থেকে, যেমন বাবু-ভাইয়াদের 'ছট'-এর পিদিপের সঙ্গে যায়। তার জন্য আট আনা দশ আনা যত খরচই হোক না কেন! পচ্ছিমের মেয়ের 'ছট'-এর ঘটা দেখুক তাৎমাটুলির 'ঝোটাহা'-রা। রামিয়াটা পঞ্চায়তের থেকে বাড়ি এসে কখন কোন্ কাজ করবে। সাজিমাটি পড়ে রয়েছে, তাই দিয়ে কাপড় কাচবে, গোবর দিয়ে ঘর আর উঠোন নেপবে, গম পিষবে, কত কাজ ছট-পরবের। রামিয়ার কাজ আগিয়ে রাখবার জন্য সে নিজেই উঠোন নিকোতে বসে গোবরমাটি দিয়ে। রামিরা বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে যাবে। দাওয়া নেপবার সময় মনে পড়ে যে রাতে এইখানটাতেই রামিয়া বসে ছিল। যেখানটায় সামুয়র বসেছিল সেখানে একটু বেশি করে গোবর দিয়ে দেয়; ঐ শালাই তো যত নষ্টের গোড়া। তার কথা ঢোঁড়াই ভুলতে চায়।

সাঁঝের আলোয় রঙিন হয়ে ওঠে ঢোঁড়াইয়ের নিজ হাতে নিকানো ঝকঝকে আঙিনা। তুলসীতলায় অনভ্যস্ত হাতে পিদিপ জ্বালিয়ে দেয়। ভরে তেল দেয় তাতে, রামিয়া ফিরবার সময় পর্যন্ত যাতে সেটা জ্বলে। একটু তেল শিশিতে রেখে দেয়, বিনা তেলে রামিয়াটা একদিনও স্নান করতে পারে না।...

তারপর রামজীর নাম নিয়ে ঢোঁড়াই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। মহতোর বাড়ি পৌঁছে দেখে যে মহতো নায়েব সকলে এসে গিয়েছে। সে ভেবেছিল রামিয়াকেও সেখানে দেখবে, কিন্তু রামিয়া নেই সেখানে। বোধ হয় মহতোর বাড়ির ভিতর ফুলঝরিয়ার সঙ্গে গল্প করছে। ঢোঁড়াইয়ের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে সামুয়রকে সেখানে দেখে। ঐ হাড়খৃস্টান বদমাইশটা, মহতো নায়েবদের পাশে চুপটি করে 'বগুলা ভগৎ'১-এর মতো বসে আছে কেন? রামিয়া কি সামুয়রকে সাক্ষী মেনেছে না কি? তা হলে তো সামুয়রকে নিয়েই যে কালকে রাতের ঝগড়া, সে কথা নিশ্চয়ই সবাই জেনে গিয়েছে। লজ্জায় ঢোঁড়াইয়ের মাথা কাটা যায়।

'বস ঢোঁড়াই।' ছড়িদার জায়গা দেখিয়ে দেয়। 'তাড়াতাড়ি পঞ্চায়েতের কাজ শেষ করতে হবে, বুঝলি ঢোঁড়াই। কাল 'ছট'। রামিয়া কোথায়?'

বাইরে থেকে জবাব দেয় রবিয়ার বৌ। 'সারাদিন ছটের উপোস করে শরীরটা খারাপ হয়েছে তার। কাল সাঁঝেও খায়নি তার উপর 'পা-ভারি'২। আমরা বললাম তোর আর ওখানে গিয়ে কাজ নেই, আমরা তো থাকবই। মহতো নায়েবদের তো সব কথা সকালেই বলে এসেছিস। বাড়িতে বসে পরবের আটাগুড় ফলমূল পাহারা দে। সুরুজ মহারাজের জিনিস, ওগুলো তো ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি না৩।

আচ্ছা, আচ্ছা। হয়েছে।

---

১ বক-ধার্মিকের মতো। ২ সন্তানসম্ভবা।

৩ ছট কথাটি ষষ্ঠি শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু পুজো কেবল ষষ্ঠির করা হয় না, সূর্যদেবেরও সঙ্গে সঙ্গে পুজো হয়। সাধারণ লোকেরা সূর্যদেবের পুজোকেই আসল ছটপুজো মনে করে। এ পুজোর জিনিসপত্র অতি শুদ্ধাচারে রাখা হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শুদ্ধাচারের অবহেলা হলে তাৎমারা জানে যে, সূর্যদেব তাদের কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত করে দেবেন।

তারপর ঢোঁড়াইয়ের বিচার আরম্ভ হয়। 'পা-ভারি'! ঢোঁড়াইয়ের আশ্চর্য লাগে। ঢোঁড়াই স্বীকার করে যে সে মেরেছে রামিয়াকে রাগের মাথায়।

'চব্বিশ ঘন্টা আমার মেয়েকে গঞ্জনা দেয়। বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না। কোন বেটাছেলের সঙ্গে কথা বললে মারধর করে 'পা-ভারি'র উপরও। তোমরা পঞ্চ, জাতের মালিক। ওর পড়ে পাওয়া পয়সার গরমাই ঠাণ্ডা করে দাও।—'বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয় রবিয়ার বৌ।

মহতো নায়েবরা সকলেই তার বিরুদ্ধে, এ কথা ঢোঁড়াইয়ের চাইতে কেউ ভাল করে জানে না। প্রত্যেকের তার উপর রাগের আসল কারণ সে জানে। তবু পঞ্চরা তাকে যে সাজা দেবে তা সে মাথা পেতে নিতে তৈরী আছে। এবার থেকে সে চেষ্টা করবে রামিয়ার উপর সন্দেহ না করবার। তাকে সব জায়গায় যেতে দেবে। তার 'ভারি-পা'; এ কথা ঢোঁড়াইয়ের আগে খেয়ালই হয়নি।

বাবুলাল কথার মোড় ঘুরোবার জন্য বলে, 'পা-ভারি, তবু পচ্ছিমে মেয়ের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ সারে না।'

হেঁপো তেতর কাশতে কাশতে বলে, 'ওই শুনতেই পচ্ছিমের মেয়ে; আমাদের ঝোটাহাদেরও অধম।'

বাইরের ঝোটাহাদের চেঁচামেচি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। মহতো বলবে এবার কথা। চুপ! চুপ কর্ সকলে।

'আমরা তোমার ভালই চাই ঢোঁড়াই।' সকলেই মহতোর এই কথায় সায় দেয়—আরে ঢোঁড়াই তো আমাদেরই।

ঢোঁড়াই অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকায়। মহতো নায়েবদের কথার এই সুর সে জীবনে শোনে নি। আর তার নিজের ক্ষেত্রে কোনো সহানুভূতিও তাদের কাছ থেকে আশা করেনি। সে কিছুই বুঝতে পারে না। বাবুলালের মুখের দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নেয়। সব হিসাবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ঢোঁড়াইয়ের।

'পচ্ছিমের মেয়ে 'পচানো'১ আমাদের কম্ম না।'

বাইরে থেকে মহতো গিন্নীর গলা শোনা যায়। 'সেবার লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়ার ব্যাপারটা তো একেবারে হজমই করে গিয়েছিল নায়েবরা। জোয়ান মেয়ে দেখে ঢোঁড়াই না হয় তখন উন্মত্ত; তোমরা কি করে জাতের বেইজ্জত গুলে গুলে খাচ্ছিলে তখন?'

'তোকে কে পঞ্চায়তিতে কথা বলতে বলেছে? ছড়িদার, সরিয়ে দাও সকলকে এখান থেকে।' রবিয়ার বৌ চিৎকার করে—'আমাদের মেয়ে নিয়ে মামলা; আর আমরা শুনব না?'

আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্ থাক্।

হাঁ দেখলি তো ঢোঁড়াই, বিয়ের আগেই আমরা মানা করেছিলাম। হাতির মতো জোয়ান মেয়ে পচ্ছিমের পানির। 'কা ন করই অবলা প্রবল'২·· মহতোর মুখে কথা কেড়ে নিয়ে বাবুলাল পাদপূরণ করে দেয়—'কে হি জগ কালু ন খাই'৩। বাবুলাল

---

১ হজম করা।

২ মেয়েমানুষ প্রবল হলে কী না করে।—তুলসীদাস।

৩ কাল পৃথিবীর কোন জিনিসকে না নষ্ট করে। তুলসীদাসের সম্পূর্ণ লাইনটি এই রকম—'কা ন করই অবলা প্রবল কে হি জগ কালু ন খাঈ।'

সকলকে জানাতে চায়, সেও রামায়ণের সব জানে।

হেঁপো তেতরও রামায়ণের জ্ঞানে কারও থেকে পেছিয়ে নেই। সেও ছড়া কাটে—

'নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গহি জাঈ।
জানি ন জাই নারি গতি ভাই ॥'১

আরশির উপর নিজের ছায়া যদি বা ধরে রাখা সম্ভব হয়, তবু মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়।

ঢোঁড়াই কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। মহতো নায়েবরা কী করতে চায়? কেউ ঢোঁড়াইয়ের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলছে না কেন? সকলেই দেখছি রামিয়ার খেলাপেই বলছে। পঞ্চায়তের লোকরা এত শান্ত কেন? কেউ তাকে গালাগালি দিচ্ছে না কেন?…'রামিয়া নিজে এসে আমাদের বলে দিয়েছে, যে সে আর কিছুতেই তোমার ঘর করবে না।' পঞ্চয়তের লোকজনের চেহারা ঢোঁড়াইয়ের চোখের সম্মুখ থেকে মুছে যায়। ঢোঁড়াই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে। ভারি মাথাটা নিয়ে আর সে সোজা হয়ে বসতে পারছে না। একটা গম পেষা জাঁতার চাকা ঘুরছে, তারই উপর যেন সে বসে আছে। জাঁতার শব্দের মধ্যে দিয়েও কানে পেঁছুচ্ছে রবিয়ার বৌয়ের কান্না-মেশানো কথার স্রোত।

'যা জুলুম করে ঢোঁড়াই আমার মেয়ের উপর। এক মিনিট 'দম' নিতে দেয় না। বাইরে আসতে দেয় না, ফৌজীকুয়োতলাতে পর্যন্ত না; হাসতে দেয় না। আমার মেয়ে কী টিয়াপাখি নাকি যে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখবে? রোজ মেয়ে আমার কাছে কান্নাকাটি করত। অনেক লাথিঝাঁটা সয়েছে ঐ ভিখিরির বেটা বড়-মানুষের। বাবুভাইয়াদের মাইজীরা মহাৎমাজীর নিমক বেচে, জিরানিয়ার রাস্তায়; আর ইনি আমার মেয়েকে বাড়িতে বন্ধ করে রাখবেন। সাতকাল গেল ভিক্ষে করে, আজ আমাদের বিলাতী লণ্ঠন দেখাতে আসে। চুপ করব কেন? আমার 'পা-ভারি' মেয়ের হাড় গুঁড়ো করছে ও মেরে, আর আমি চুপ করব। তোমরা পঞ্চ, আমাদের দেবতা। ওই 'পাখণ্ডী'টার২ ঘরে আর আমার মেয়েকে ফিরে যেতে বোলো না। নিয়ে নিক ও ফিরিয়ে, বিয়েতে ও মেয়েকে যত টাকা দিয়েছিল।' কান্নার শব্দে রবিয়ার বৌয়ের তারপরের কথাগুলি আর বোঝা যায় না।

টাকার কথায় ঢোঁড়াই চমকে ওঠে। কানের ভিতরের জাঁতার শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে ঘুরুনিটাও। বলে কী! রবিয়ার বৌ দেবে টাকা! জমি-দারের ডিক্রি ঝুলছে তার মথোর উপর। বিয়ের সময় মিসিরজী যে চাল গনেছিলেন তা সংখ্যায় বেজোড় ছিল; সে সময় ঢোঁড়াই ঠিকই দেখেছিল। আর কোন সন্দেহ নেই তাতে।

বাবুলাল এতক্ষণে কথা বলে। 'বলছ যে সে মেয়ে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু জোয়ান মেয়ে থাকবে কার সঙ্গে। এখন না হয় ধানকাটনী আসছে; তারপর?'

রবিয়ার বৌ ঘোমটার মধ্যে থেকে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেয়, 'সে মেয়ে কিছুতেই

---

১ আরশির উপরের নিজের ছায়া যদিই বা ধরে রাখা সম্ভব হয় তবুও মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়। তুলসীদাস।

২ পাষণ্ড।

ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে থাকবে না, মরে গেলেও না। এখন তোমরা অন্য কারও সঙ্গে ওর 'সাগাই'১ ঠিক করে দাও।

এইবার মহতো কেশে গলা সাফ করে নেয়,—

—'কথা যখন উঠেছে, তখন পরিষ্কার কথাই বলি। তাৎমাটুলির মধ্যে ঐ মেয়ের সাগাই টাগাই আর আমরা করাচ্ছি না। একবার 'কমজোরী'২ দেখিয়ে ঠকেছি।

ঢোঁড়াইয়ের মাথাটার মধ্যে যেন একখানা পাথর ঢুকে আছে—কোনো কথা ঢুকবার আর জায়গা নেই সেখানে। নিজেকে দুর্বল দুর্বল লাগছে। বিয়ের সময় ফৌজী-কুয়োর জল দিয়ে কাজ সারা হয়েছিল, ও কুয়োটার বিয়ে দেওয়া নেই। কেন সে সেই সময় আপত্তি করেনি?

'তার এই পা ভারি মেয়ে। এর অন্য জায়গায় সাগাই হওয়াও শক্ত। আমাদের জাতের মধ্যে না হয় জানাজানি সাগাই চলে। কিন্তু বাইরের লোকের মধ্যে তো তাৎমাটুলির পঞ্চদের কথা খাটবে না…'

ঢোঁড়াই ঘেমে উঠেছে। মাথার মধ্যেটা ঠাণ্ডা—ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। সাগাই… রামিয়া…কথাগুলোর মানে সে ঠিক বুঝতে পারছে না।…

তার উপর ঢোঁড়াই বিয়েতে টাকাও খরচ করেছে, সেটাও ফিরে না পেলে চলবে কেন। ওরও তো তাহলে আবার 'শাদি' করার দরকার হবে।'

'হ্যাঁ, এটা 'ইনসাফ'এর৩ কথা বলেছ মহতো।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে সামুয়র এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি। এক কোণে বসে সে একটা ঘাস দিয়ে দাঁত খুঁটছিল, আর মধ্যে মধ্যে থুতু ফেলছিল। সে ঢোক গিলে বলে, 'তোমাদের যদি মত হয় তো আমি ঢোঁড়াইয়ের টাকা দিয়ে দিতে রাজী আছি।' ঢোঁড়াইয়ের কান খাড়া হয়ে ওঠে। রামিয়াকে বিয়ে করতে রাজী আছি এ কথা পরিষ্কার না বললেও সামুয়রের কথার অর্থ সুস্পষ্ট।…

দপ করে জ্বলে ওঠে ঢোঁড়াই। 'কী বললি? জিব টেনে ছিঁড়ে নেব। শরীরের সবকটা শিরা ঢিলে করে দেব৪ পিটিয়ে।' ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়িয়েছে। আগুন বেরুচ্ছে তার চোখ দিয়ে।

মহতো একটু ভয় পেয়েছে। 'বোসো ঢোঁড়াই ঠাণ্ডা হয়ে। সামুয়র, তুই রাজী হলেই তো হল না। আবার রামিয়া রাজী আছে কিনা তাও তো জানতে হবে।'…

বাবুয়া সামুয়রের হয়ে জবাব দেয়—'আজ সাঁঝেই তো ছড়িদারের সম্মুখে বলেছে রামিয়া যে সে রাজী আছে।'

ঢোঁড়াইয়ের কাঁধ আর হাতের পেশীগুলি শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে। এই বুঝি বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পঞ্চদের উপর।…

টাকা খেয়ে সাজশ করছে, শালা চোট্টার দল!" গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে ঢোঁড়াই। তার হিংস্র চোখের মধ্য দিয়ে ঠিকরে পড়ছে অজস্র বজ্রের স্ফুলিঙ্গ। 'বজরঙ্গবলী'৫ মহাবীরজীর অসীম শক্তি এসে গিয়েছে তার দেহে আর বাহুতে। অনেক

---

১ সাগাই : নিকা। ২ দুর্বলতা।

৩ ন্যায়বিচার।

৪ স্থানীয় ভাষায়—'মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব'—এই ধরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৫ বজ্রের মত অঙ্গ ও বলশালী মহাবীরজীকে বলা হয়।

বড় দেখাচ্ছে তাকে। সম্মুখের এই 'হফ্‌তরঙ্গী'[১] পিঁপড়েগুলোকে সে ফুঁ দিয়ে ছত্রাকার করে দিতে পারে মুহূর্তের মধ্যে; টেনে ফেলে দিতে পারে দূরে যেখানে ইচ্ছে; ঝড়ের মুখে বকরহাট্টার মাঠের সিমুলতুলোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে এক নিশ্বাসে; পড়পড় করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে ঐ কুত্তা সামুয়রটাকে; যেদিকেই সবুজ দেখে সে দিকেই চরতে যায় এই পঞ্চায়তির ছাগলের দল; কিন্তু এইসব উকুন মারবার তার সময় কোথায় এখন।...রামিয়া আগে রামিয়া সেই পচ্ছিমা বাজারের আওরৎ রামিয়া[২];—সামুয়রকে বিয়ে করতে চায় রামিয়া...এতদিন থেকে তাকে ঠকিয়ে আসছে।...বলেছিল মর্কটের মতো দেখতে সামুয়রকে; পঞ্চায়ৎঘরের সকলে ভয়ে তার জন্য পথ ছেড়ে দেয়। কী করে, কখন সে মহতোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, তা সে নিজেই জানতে পারে না। সারা পৃথিবী তার চোখের সম্মুখ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে পচ্ছিমা সাপটাকে সে পুষেছিল সেটা এতদিনে ছোবল মেরেছে। তার কাছে রামিয়া সামুয়রকে নিয়ে ঠাট্টা করে কটাচোখো 'বিলাড়'[৩] বলে। কিছু জানতে পারিনি এতদিন!...পৃথিবীতে আগুন লেগে গিয়েছে—কাঁপছে, ঘুর-পাক খাচ্ছে, ধসে যাচ্ছে পায়ের নিচের মাটি।...যাক, কিন্তু কারও শক্তি নেই সেই সাপটার কাছে যাবার পথে তাকে বাধা দেয়, মহাবীরজীও না, গোঁসাইও না, খোদ রামচন্দ্রজী এলেও না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাওয়া শান্ত হয়ে গিয়েছে, তার প্রতিটি স্নায়ুর উদ্দণ্ড আলোড়ন দেখে। তার হাত মুঠো হয়ে আসছে; প্রচণ্ড শক্তিতে পৃথিবীকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে এখনই। এর প্রতিটি অণুপরমাণু তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে সারাজীবন।...মিষ্টিকে তেতো বিস্বাদ করে দিয়েছে।...

রবিয়ার বাড়ির কুকুরটা কেঁউ করে ডেকে ভয়ে পালায়।

পিদিপ জ্বলছে দাওয়ায়। রামিয়া বাঁশে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। সারাদিন উপোসের পর 'ছট' পুজোর জিনিসগুলো পাহারা দিতে তার ঢুলুনি এসে গিয়েছে।...

ঝুঠঠী[৪]!...বাজারের আওরৎ। পচ্ছিমের কুত্তী![৫]...তার মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করার মতো ভাষা নেই ঢোঁড়াইয়ের। দরকার বা কী?...লাথি...কিলঘুঁষি... চড়...এই নে!...এই নে। এখানে।...এখানে...মাথায়, মুখে, পিঠে,...সর্বাঙ্গে... ছটপরবের আখটা মট্‌ করে ভেঙে যায়।

থেঁতলে, কুটে, পিষে, চটকে, ছেঁচে ফেলতে ইচ্ছে করে, হারামজাদীর দেহটাকে — পা দিয়ে নড়ালেও নড়ে না...

রবিয়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছে ঢোঁড়াই অন্ধকারের মধ্যে। যে দুনিয়া তার বিরুদ্ধে গিয়েছে, সম্পর্ক কী তার সে দুনিয়ার সঙ্গে। রবিয়ারবাড়ির কুকুরটা ডাকছে পিছনে; থানের দিকে আলো নড়ছে। তারই বিলাতী লন্ঠনটা নিয়ে বোধ হয় সকলে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।...রামিয়ার কপালের খানিকটা কেটে গিয়েছিল ...তার 'পাক্কীর' উপর দিয়ে ঢোঁড়াই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। টিম্‌টিম্‌ করে আলো জ্বলছে দূরে রেবনগুণীর বাড়িতে। সেই—সেই রাতে রেবনগুণী বলেছিল তার পাওনাটা দিয়ে দিতে শীগগিরই; হঠাৎ মনে পড়ল সেকথা। আর

১ যারা সপ্তাহে সপ্তাহে রং বদলায়; যাদের মতের স্থিরতা নেই।

২ অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক। ৩ বিড়াল

৪ মিথ্যাবাদী। ৫ পশ্চিমের কুকুর।

কারও ধার ধারে না সে! কোমরে গোঁজা এক আনা পয়সা রেবনগুণীর নাম করে সে অন্ধকারে ফেলে দেয়। 'পাক্কীর' পাথরের উপর কেবল একটু খুট্ করে শব্দ হয়। কাছের ঝিঁঝিঁ পোকাটা পর্যন্ত সে শব্দ শুনে এক মুহূর্তের জন্য তার একঘেয়ে ডাক থামায় না।

ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক্! তাৎমাটুলিতে একটানা হাতুড়ি পিটে চলেছে কামার পাখি।[1]

# ঢোঁড়াই চরিত মানস

## দ্বিতীয় চরণ

## সাগিয়া কাণ্ড

### ঢোঁড়াইয়ের জমি ও জাতের রাজ্যে আগমন

কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাবে, ঢোঁড়াই সে কথা ভেবে আসেনি। দুনিয়ার সব জায়গাই এখন সমান তার কাছে। তবে সে চলেছিল 'পাক্কী' ধরে, বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই। বিকারের ঘোরটা কিছুক্ষণ পরে কেটে এলেও মনের জ্বর যাবার নয়। তাৎমাটুলি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা, চোখ-আঁধার করা আঁধির প্রচণ্ডতা কমে এসেছে, কিন্তু আকাশের আঁধার হয়তো কোনো দিনও কাটবে না; দুনিয়ার কাউকে সে আর বিশ্বাস করবে না, সব বেইমান। জ্বরো জিভে সব বিস্বাদ লাগে।···সেই একবার বকরহাট্টার মাঠের সব চেয়ে উঁচু শিমুল গাছটার উপর আঁধির সময় বাজ পড়েছিল। গাছের মাথাটা যেন এক কোপে একেবারে পুঁচিয়ে কেটে নিয়ে গিয়েছিল। কন্ধকাটা গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।···দমকা রাগের আঁধির মধ্যে নিজের অপমানের কথাটা এতক্ষণ ভাল করে ভাববার সময়ই পায়নি। তার রামিয়া হয়ে গেল অন্য লোকের! নিজে ইচ্ছা করে! 'ভিতরঘুন্না'[2] হারামজাদী কোথাকার! 'ঢোল, গঁবার, শুদ্র, পশু, নারী'[3] এদের সবসময় মারের উপর রাখতে বলেছে রামায়ণে। প্রথম থেকে যদি এ কথা সে মনে রাখত! কী ভুলই করেছে সে রামায়ণের কথা না মেনে। তার বলদজোড়ার চাইতেও সে অনেক বেশি ভালবাসত রামিয়াকে। বলদ জোড়া কেন বৌকাবাওয়ার চাইতেও। রামিয়ার জন্য সে বৌকাবাওয়াকেও ছেড়েছিল। ভাত খাওয়ার সময় আর একটু ডাল নিতে ইচ্ছে করলেও সে কোনদিন চায়নি, পাছে রামিয়ার কমে যায় সেই ভেবে। রামিয়া জোর করে দিতে এলেও নেয়নি। এত ভালবাসত সে রামিয়াকে। তার গাড়ির চাকার জন্য রেড়ির তেল সে একবার না কিনে সেই পয়সা দিয়ে রামিয়ার জন্য নারকেল তেল এনে দিয়েছিল। সব কি এইজন্য? আপন থেকে পর ভাল, পর থেকে জঙ্গল ভাল। কুকুর আপনার হয়, কিন্তু মেয়ে-

---

১ এক শ্রেণীর পেঁচা; এদের ডাক দূর থেকে হাতুড়ি পেটার শব্দের মতো মনে হয়।

২ ভিতরঘুন্না: যার মনের কুটিলতার কথা বাইর থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই।

৩ তুলসী দাস থেকে: ঢোল, গঁবার অর্থাৎ দুর্বিনীত লোক, শুদ্র, পশু, নারী।

মানুষ আপনার হয় না, যতই তাকে কাপড় কাচবার জন্য সাবান কিনে দাও না কেন। দুনিয়াটা আগাগোড়াই যে 'ভিতরঘুন্না'। ভাল কিছু নেই। তাই না ভাল লোকেরা সব চলে যায় অযোধ্যাজীতে। সে হাড়ে হাড়ে চিনেছে মেয়েমানুষ জাতটাকে। দুখিয়ার মা, রামিয়া, যে-কোনো মেয়ের সম্পর্কে সে এসেছে, সব ঐ একরকম। মুখে এক আর মনে এক। তাৎমাদের মধ্যে বাওয়াই এক শাদি করেনি। সেইজন্যই সে বেঁচে গিয়েছে, অযোধ্যাজীতে যেতে পেরেছে। অযোধ্যাজীতে এখন বাওয়ার কাছে যেতে পারলে একটু মনে শান্তি পেত। বাওয়া আবার তাকে ছোটবেলার মতো কাছে টেনে নিত। 'সর্বন'১-এর পাতার গন্ধের চাইতেও তার ভাল লাগে বাওয়ার জটার গন্ধটা, ঘুঁটের ছাইয়ের চাইতেও ভাল গন্ধ, হাওয়াগাড়ির গন্ধটার চাইতেও ভাল। কতদূর এখান থেকে অযোধ্যাজী; সেই মুঙ্গের জেলার কাছে। একটাও পয়সা নেই সঙ্গে, না হলে টিকিট কাটত সে অযোধ্যাজীর। তাৎমাটুলিতে তার বাড়ি গাড়ি বলদ জিনিসপত্র রয়েছে। কত টাকা পেতে পারে তা বেচে। কিন্তু এ মুখ আর যে তাৎমাটুলিতে দেখাতে পারে না। থাক সাতভূতে তার সম্পত্তি লুটেপুটে। 'পঞ্চরা' যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিক। বলদ বেচা পয়সা দিয়ে খেলে আসুক সামুয়রটা জুয়ো নেপালে। তার গাড়ি বিক্রির পয়সা দিয়ে মাখুক রামিয়া জবজবে করে নারকেল তেল, ঐ কটা মর্কটটার বুকে ঢোলে পড়বার আগে। ঢোঁড়াই তার থেকে এক পয়সাও চায় না। কী কুক্ষণেই যে বাওয়া উকিলবাবুর কাছ থেকে টাকা পেয়েছিল। ঐ টাকাটাই হল ঢোঁড়াইয়ের কাল। ওটা ছিল বাওয়ার হকের টাকা। তাই না সে ঐ টাকা দিয়ে অযোধ্যাজীতে যেতে পারল। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের ঐ টাকার উপর কোন হক ছিল না। সেইজন্যই না ঐ টাকা দিয়ে কেনা একটা আওরৎ তার জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারল। এই রকমই হয় দুনিয়ার। সব জিনিসের ফলাফল সকলের উপর কখনও কি একই রকম হয়? থাক তো দেখি তাৎমারা মুসলমানদের মতো মুরগীর আন্ডা? কুষ্ঠ বেরিয়ে যাবে গায়ে।···আবার সে ঐ পয়সার উপর লোভ করবে। লাথি মারে সে অমন পয়সায়।—বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা জ্বালা করছে। হয়তো কেটে গিয়ে থাকবে পাথরে ঠোকর লেগে। এতক্ষণ খেয়াল করেনি।···

না না, কাছে পয়সা থাকলেও সে যেত না অযোধ্যাজীতে। বাওয়ার কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে। বাওয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিয়েছিল এ বিয়েতে, তার জিদ দেখে। কেবল বাওয়া কেন, কোনো চেনা লোকের সঙ্গে সে আর জীবনে দেখা করবে না। কী করে সে মুখ দেখাবে। একটা পিঁপড়ের সমান মেয়েকে সে সামলাতে পারেনি এমনি মরদ সে। একটা বিড়ালচোখা বীটপালং এর কাছে সে হেরে গিয়েছে। যে এ কথা শুনবে সেই মুখ টিপে টিপে হাসবে তাকে দেখে। সে রুগ্ন নয়, 'কমজোর' নয়। গায়ের জোরে পারবে তার সঙ্গে সামুয়র? মরদের বাচ্চা হলে সে আসত ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে লড়তে। পিষে শেষ করে দিতে পারে সে সামুয়রকে, আঙুলের মধ্যে টিপে মেরে ফেলে দিতে পারে ছারপোকার মতো। আর উঠতি জোয়ানীর মুখে তারই সঙ্গে গেল হেরে! কারও কাছে হার মানবার ছেলে সে নয়। কিন্তু রামজীর সঙ্গে লড়াই করা চলে না। তাই সে হার মেনেছে তাৎমাটুলির সমাজের কাছে, পরাজয় স্বীকার করেছে সামুয়রের কাছে। সেইজন্যই না সে পালিয়ে এসেছে তাৎমাটুলি থেকে। যে সমাজের মাথাদের সে একদিনও নিশ্বাস নেওয়ার ফুরসত দেয়নি, সেগুলো

---

১ একপ্রকার সুগন্ধ ঘাস; Lemon Grass

সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল তার বিরুদ্ধে। ডালের মধ্যে মাছি পড়লে যেমন করে তুলে ফেলে দেয়। আঙুলে করে তেমনি করে তারা দূরে ফেলে দিয়েছে ঢোঁড়াইকে। সিঁদুর আর গাঁটের টাকা দিয়ে কেনা বৌ কি পাক্কীর ধারের গাছের পাকা আম, যে যার ইচ্ছা পেড়ে নেবে? তার দোরগোড়া থেকে গরুর গাড়িখানা দিয়ে দিতে পারত 'পঞ্চ'রা সামুয়রকে? হয়ে যেত তাহলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড তাৎমাটুলিতে। কিন্তু এখানে যে ছিল গোড়ায় গলদ; আমটাই যে ছিল পচা পোকাড়ে।

…খালি বুড়ো আঙুলটা নয়, পায়ের তলাটাও জ্বলতে আরম্ভ করেছে। দাবিয়ে রাখতে না পারলে রাস্তার পাথরগুলো পর্যন্ত দাঁত দেখায়, তার আবার মেয়ে-মানুষ!…

তাকত দিয়েছেন রামজী তার শরীরে। একটা চনমনে আওরৎকে সামলাতে পারেনি সে শরীরের তাকত সত্ত্বেও। কিন্তু একটা পেট সে যেখানেই থাকুক হেসে খেলে চালিয়ে নেবে। একেবারে একা সে দুনিয়ায়। তার মন চেয়েছিল বাঁধা পড়তে। কিন্তু তার কপালই আলাদা, ছোটবেলা থেকে সে দেখে আসছে। নইলে তার মা তাকে পর করে দিয়েছিল! নইলে 'ভারী গা'১ স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়।… 'ভারী গা'…। সেই যেটা আসবে, তার উপর পর্যন্ত কোনো অধিকার তার থাকল না। তার মন বলছে যে সেটা নিশ্চয়ই হবে ছেলে। সেটা সুদ্ধু হয়ে যাবে সামুয়রের। 'জল চড়াবে'২ ঢোঁড়াইয়ের বাপ-ঠাকুরদাকে নয়, কতকগুলো ধাঙড়কে, হয়তো বা গলকট্টা সাহেবের 'পিরেত'কে। এ জন্ম তো গিয়েইছে, পরের জন্মও তার অন্ধকার। বিনা দোষে তাকে নরকে পচে মরতে হবে, আর জল পেয়ে যাবে আজন্ম কিরিস্তান সামুয়রটা।

নিজের ক্ষমতার বিশ্বাসটুকু কাল রাতে শিকড়সুদ্ধ নাড়া খেয়েছে। তাই আক্রোশে বিষিয়ে উঠেছে তার মন, জাতের উপর, সমাজের উপর, দুনিয়ার উপর। ক্ষমতা থাকলে সে এখনি চুরচুর করে ফেলে দিত এটাকে। রামজী কি জেনে শুনেও লোকের উপর অবিচার করেন! ছি ছি! একি ভাবছে সে, সীতারাম! সীতারাম!…সারা রাতে একবারও ঘুমোনি সে। রোদ্দুরটাও আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে। পা আর চলতে চায় না, তাৎমাটুলি থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চায় সে, যত দূরে পারে। রোদ্দুরে গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। জলতেষ্টাও পেয়েছে। নিজের মনকে সে বুঝোয়, বোধহয় অনেক দূরে চলে এসেছি তাৎমাটুলি থেকে।

দূরে পাক্কী থেকে ক্রোশখানেক পশ্চিমে একখান গাঁ দেখা যাচ্ছে। এক সার ডাল-ছাঁটা শিশুগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে আকাশ ফুঁড়ে। বর্শার মতো দেখতে লাগছে। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা চিলেকোটার দেওয়ালের ছাতলাধরা সাদা রঙ। পাকা দালান থাকলেই ইঁদারা থাকবে কাছে। তাই সে ঐ বাড়ি লক্ষ্য করে পাক্কী থেকে নামে; অন্তত খানিকটা জিরিয়েও তো নেওয়া যাবে। ঐ বাড়িটা পর্যন্ত যেতে হয়নি। তার আগেই গাঁয়ে আর একটা কুয়ো দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কুয়োর পাশে একটা কঞ্চির বেড়া। বেড়াটা পলতার লতায় ঢাকা। পাশের বাড়ির দাওয়াটা ঝকঝকে নিকানো। চালের উপরটা লকলকে লাউডগায় ঢেকে গিয়েছে। একসার গাঁদাফুলের গাছ আলো করে রেখেছে উঠোনখানাকে। উঠোনের মধ্যেখানে

১ সন্তানসম্ভবা।

২ তর্পণ করবে।

দোতলার সমান উঁচু একটা মাচাতে বীজের জন্য রাখা ভুট্টার মালা ঝোলানো। ঢোঁড়াই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তার বুকের ধুকধুকুনিটা ঠেলে গলা বেয়ে উঠে আসতে চায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। ঢোঁক গিলে ঠোঁট চেপে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। তার দুঃখ তার নিজের জিনিস, অন্য কারও কাছে বলবার নয়।

পাশের তামাক-ক্ষেত থেকে একটা ছুঁচলোমুখো লোক এসে কুয়োতলায় হাত-মুখ ধুচ্ছিল। ঢোঁড়াই গিয়ে দাঁড়াল জল খাবার জন্য।

'ঘর কোথায় ? পুরুষ ? পাক্কী থেকে কত দূরে ! কী জাত ?'

'তাশ্ত্রিমাছাত্রি।'

'আরে, তাৎমা বল্ ; তাৎমা বল্।'

জল খাবার পর আরও অনেক কথা হয় লোকটির সঙ্গে।

কোথায় যাবি ? রোজগারের জন্যে যদি হয়, তাহলে এ গাঁয়েও থেকে যেতে পারিস। আমিই কাজ দিতে পারি। এখনই। এই সম্মুখের তামাক-ক্ষেতে। গাঁয়ের লোক রাখতে চাই না। কী আর কাজ ? তামাক-ক্ষেতের কাজ জানিস না ? পুরুবের লোক, জানবি কোথা থেকে। মিয়ার দেশের লোক তোরা ; তোরা বুঝিস পিঁয়াজের ক্ষেতি ! বুদ্ধি যদি কিছু থাকে তাহলে দুদিনে শিখে যাবি তামাকের ডগা ছিঁড়তে। পিঁয়াজের চাষেও পয়সা আছে বটে।...ঢোঁড়াই চাষবাসের কাজ কোনো দিন করেনি। যদি না পারে, যদি মন না-লাগে। আরও দূরে গেলে হত ! লোকটার হাবভাবে রতিয়া ছড়িদারের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে। ঢোঁড়াইয়ের ধারণা ছুঁচলো মুখের লোকগুলো হয় অতি বদ।

'কী রে ? গরু মরেছে নাকি রে তোদের বাড়িতে ? কথা বলিস না কেন ? খুব গরজ ভাবলি বুঝি আমাদের ?'

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে।

শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই এখানেই থেকে যায়। যখন ইচ্ছা চলে গেলেই হবে। সেটা তো নিজের হাত। গেঁদা ফুলে ভরা বাড়িটার গোয়ালঘরের মাচায় ঢোঁড়াই জায়গা পেয়ে যায়।

লোকটি যাওয়ার সময় ঢোঁড়াইকে শুনিয়ে যায়, এ গাঁয়ের বাবুসাহেবের দেড়শ গরু আছে। তাঁর রাখাল পায় মাসে চার আনা করে, আর বছরে একজোড়া কাপড়, শীতে একটা কুর্তা।...

ঢোঁড়াইয়ের তখন পাওনা নিয়ে দর কষাকষি করবার মতো মনের অবস্থা নয়। কোনো রকমে একটা মাথা গুঁজবার আস্তানা আর দুটি খাওয়ার সংস্থান হলেই তার দিন চলে যাবে। সেইজন্য সে ঐ লোকটি আরও কী সব বলছিল সে সব কথা ভাল করে শোনেওনি।

## বিল্টা আদির সহিত কথোপকথন

গাঁয়ের নাম বিসকান্ধা। কাজেই যে ভাঙা বাড়িটার উপর অশ্বত্থ গাছ উঠেছে সেখানে সাঁঝের পর ঢোলকের বোল উঠলে ঢোঁড়াইও সেখানে পৌঁছোয়। লোভটা অবিশ্যি খয়নি তামাকের ! কালকে থেকে খাওয়া হয়নি। হঠাৎ কিছুক্ষণ থেকে এই অভাবটাই সবচেয়ে বড় বলে মনে হচ্ছিল। তাই ঢোলের আওয়াজের ঢালাও আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেনি। লোক তখনও বেশি জোটেনি। ঢোঁড়াইয়ের হঠাৎ মনে পড়ে এরা জিজ্ঞাসা করবে এখনই যে তার বাড়ি কোথায়। মহতোগিন্নির বাপের

বাড়ি মলহরিয়াতে। এ ছাড়া আর অন্য কোনো গাঁয়ের নাম মনে আসছে না। তাৎমাটুলির কথা সে চেপে যাবে একেবারে। সকলে আপাঙ্গে তার দিকে তাকায়। কে? কোথায় বাড়ি? এদিকে কুটুম্বিতা নেই তো? তবে এদিকে কি রোজগারের জন্য? ঢোঁড়াইয়ের মনে হয়, দু-একজনের মুখে একটু কাঠিন্যের রেখা পড়ে। তারা তার পৈতার দিকে তাকাচ্ছে।

জাত? তন্ত্রিমাছত্রি? তবু ভাল যে রাজপুত ছত্রি-টত্রি নও।

আমরা কুশবাহাছত্রি১।

'এই নাও' বলে লোকটা হুঁকো থেকে কলকেটা ঢোঁড়াইয়ের হাতে দেয়।

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট,—তত্রিমাছত্রি জাতটা কুশবাহাছত্রি জাতের চাইতে অনেক নিচু।

রাত থেকে মনটা বিষিয়ে আছে নিজের জাতের উপর। পারলে সে ভুলে যেতে চায় নিজের জাতের কথা। কিন্তু কারও জাত কি গায়ের ময়লা যে, ডলে ফেলে দেবে। তাই জাতের অপমান এখনও তার গায়ে গিয়ে বেঁধে। ইচ্ছে হয় বলে যে, কোয়েরী আবার কুশবাহাছত্রি হল কবে থেকে?

চিরকাল গেল লোকের বাড়ি বাসন মেজে, আর বাবুভাইয়াদের পাতের এঁটো কুড়িয়ে, আজ এসেছেন হুঁকো থেকে ছিলিম নামিয়ে দিতে। না, প্রথম দিন এসেই সে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে পারে না।

না, না, তামাক আমি খাই না'।

তকলিফের পরোয়া করে না সে।

এতক্ষণে সকলে তার দিকে ফিরে বসে। বলে কী লোকটা! পয়সার অভাবে তামাক কিনতে পারে না এমন লোক তারা বহু দেখেছে; কিন্তু মাঙনার তামাক একজন সুস্থ শরীরের লোক খায় না, এমন জীব এর আগে তাদের চোখে পড়েনি।

'খয়নি?'

'না, খয়নিও না।'

এই আত্ম নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াইয়ের মন অপমানের প্রতিবাদ জানায়।

গিরিদাস বাবাজী পর্যন্ত খয়নি তামাক খান, আর এ লোকটা খায় না!

'বিবি আছে?'

'না।'

এই 'সরাধ'-এর কানুনের২ যুগেও। মোচ উঠে গিয়েছে তবুও। এরকম পরদেশীর সঙ্গে গল্প না করে তাচ্ছিল্য দেখানো চলে না। সকলে পাল্লা দিয়ে ঢোঁড়াইকে গাঁয়ের কথা শোনাতে আরম্ভ করে। কত খবর!

…যে লোকটির সঙ্গে ইঁদারাতলায় দেখা হয়েছিল, সে কি নাম বলেছিল নিজের? গিরিধারী মণ্ডল? ছুঁচলো মুখ, শিয়ালের মতো? ওকে আমরা বলি গিধর৩ মণ্ডল। ওর ওখানেই কাজ নিয়েছ বুঝি। তবে যে বললে কুয়োর ধারের তামাক

---

১ এই জাতের নাম কোয়েরি। আজ কাল এই জাতের লোকেরা নিজেদের কুশবাহাছত্রি বলে।

২ সর্দা আইন। (শব্দার্থ) শ্রাদ্ধের আইন।

৩ গিধর শব্দের অর্থ শিয়াল।

ক্ষেতের কথা? সে তো মোসম্মতের[১]। গিধরটা মিছে কথা বলছে। আমাদের জাতের মোড়ল হলে কী হবে, ও পরিবারটাই হাড়-বজ্জাতের ঝাড়। এক কুড়ি দু'কুড়ি সালের কথা হল—এই বুড়হাদাদাকে দেখছ, এর তখনও কোমরে নেংটি ওঠে নি। তাই না বুড়হাদাদা? সেই সময় নীলকর সাহেবদের সঙ্গে একটা ভারি হল্লা হয়, একেবারে তুলকালাম ব্যাপার। বিলসন সাহেবের কাটা মাথা পাওয়া যায় থানার বারান্দায়। সেই সময় সব গাঁয়ে হিঁদু কিসানরা[২] মন্দিরে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর মুসলমান কিসানরা মসজিদে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তাদের মধ্যে যে নীলকর সাহেবদের দিকে যাবে সে গরু শুয়োর খাবে। তখন গিধর মণ্ডলের ঠাকুর্দা গিয়েছিল নীলকর সাহেবদের দিকে। সেই থেকে গিধর মণ্ডলের পরিবারটার নাম হয় গরুখোর পরিবার।··· হ্যাক থু! থু! জয় মহাবীরজী! তখনও গাঁয়ের 'বাবুসাহেব' বচ্চন সিং যায় রাজপারভাঙার সেপাইগিরি করতে বোধ হয়। ঐ গরুখোর পরিবারটাই তখন গাঁয়ের মধ্যে বড়লোক। শিকারে, কি মোকদ্দমার তদন্তে দারোগা হাকিম এলে ঐ গরুখোরদের আঙিনাতেই তার ঘোড়া বাঁধা হত।···

ঐ তামাক ক্ষেতটা তোমাকে দেখিয়ে দেওয়ার সময় গিধরটা বলেছিল নাকি যে ক্ষেতটা তার? ও তাই বলো, তুমি হাবভাবে ভেবে নিয়েছিলে যে, ওটা তারই। গিধর বললেও খুব মিছে বলত না। মোসম্মতের বিধবা মেয়ে আছে সাগিয়া। সেই মেয়ের দেওর ঐ গিধর মণ্ডল। বক যে রকম মাছের উপর তাক করে বসে থাকে, তেমনি করে গোরুখোরটা ক'বছর ধরে লেগে আছে মোসম্মতের মেয়েটাকে 'চুমৌনা' করবে বলে। বেশ জমিজিরেত আছে মোসম্মতের, ত্রিশ চল্লিশ বিঘা হবে বৈকি। আরে ওরই উপর তো নজর গিধর মণ্ডলের। সোজা জমি নয়তো। চল্লিশ বিঘা। এদিকে আবার সাড়ে-ছ'হাতের লগার বিঘা। আর জমি কী! মাঘের শেষেও কালো হয়ে থাকে। বসলে পাছার কাপড় ভিজে ওঠে।···না না, ও বুড়িকে কেউ সাগিয়ার মা বলে ডাকে না গাঁয়ে। কেন তা জানি না। সবাই বলে মোসম্মত।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলে—এ গাঁয়ের গুণীর সর্দার ছিল কানোয়া মুসহর! সে দেহ রেখেছে অনেকদিন হল। কিন্তু কোনো চেলা রেখে যায়নি। তাই না সাপে কামড়ালে, দাঁতের পোকা ঝাড়তে হলে, কিম্বা পায়ে ঘা হয়ে গরু মোষ মরতে আরম্ভ করলে যেতে হয় আজকাল রহুয়ার গুণীর কাছে।

···হাঁ, যে কথাটা বলছিলাম···ঐ কানোয়া মুসহরটা এককালে মোসম্মতের জমি চাষ করত। নামকরা গুণী হওয়ার পরও, পুরনো মনিবের বাড়ি তার আসা যাওয়া ছিল, আর মোসম্মতকে বলত বৌমা। কানোয়া মুসহর, ডাকিনী বিদ্যা কিছু কিছু শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে ঐ বুড়িটাকে···

যে লোকটিকে সকলে বুড়হাদাদা বলে ডাকছিল, সে এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করবার জন্য সোজা হয়ে বসে।

···তুমি আবার গিয়ে এসব গল্প করো না যেন মোসম্মতের কাছে।···ভাল গাঁ বেছেচ রোজগারের জন্য! আমাদেরই আজকাল খাওয়া জোটে না। যা দিনকাল

---

১ বিধবা।

২ জিরানিয়া জেলায় কিসান শব্দের অর্থ ধনী কৃষক।

৩ নিকা, সাঙ্গা প্রভৃতির ন্যায় একপ্রকার বিবাহ ব্যবস্থা।

পড়েছে। দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। 'বিধিগতি বাম সদা সব কাহু'১। ভগবান সব সময় সকলের উপর নারাজ! ··· দেখা যাক ধানটা পাকলে যদি কিছু হালত বদলায়।···

যে ছেলেটি ঢোলক নিয়ে বসেছিল সে ঢোঁড়াইয়ের বয়সী। দুষ্টুমিতে ভরা মুখ। সে বলে এই আরম্ভ হল বুড়হাদাদার নাকি কান্না। সন্ধ্যাবেলা একটু হাসি তামাসা ভজন কীর্তন হবে, তাও এই বুড়োর জন্য হওয়ার জো নেই।

চুপ কর বলছি বিল্টা। পরদেশী লোকের সম্মুখে অমন লবড় লবড় কথা বলবি না বলছি।

ঢোঁড়াই অবাক হয়, এখানে পঞ্চায়ত আর বুড়োদের তাকত এত কম দেখে।··· বিল্টা বুড়হাদাদার কথা বন্ধ করবার জন্য দমাদ্দম ঢোলক বাজাতে আরম্ভ করে, তার পর গানের কলি আরম্ভ করে। বাকি সকলে ধুয়ো ধরে।

জমিদারের সেপাই এসেছে খাজনা নিতে, রে বিদেশিয়া
সকালবেলা ধরে নিয়ে গিয়েছে ভাসুরকে, রে বিদেশিয়া,
বেঁধে রেখেছে তাকে কুঠি খুঁটিতে, রে বিদেশিয়া,
থালা বাটি নিয়ে যা সেপাই, বাকি খাজনার দাবিতে,
তা নয়, সেপাই আসে, রাতের বেলায় জ্বালাতে।
রে বিদেশিয়া···

মহাবীরজীকে প্রণাম করে গান শেষ হয়। ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা করে বিল্টার সঙ্গে আলাপ জমাতে।

বলে, 'আমাদের ওদিকে মহাবীরজীর চাইতে রামচন্দ্রজীর নামই বেশি চলে।'

'তোদের কলিজা বোধ হয় আমাদের চাইতেও ছোট। তাই বোধ হয় মহাবীরজীর মালিক না হলে মানায় না তোদের।'

হেসে গড়িয়ে পড়ে সকলে। বিল্টার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। বিল্টা কিন্তু ঢোঁড়াইকে অপ্রস্তুত হওয়ার অবকাশ দেয় না। জিজ্ঞাসা করে, তুমি গান জানো না? লজ্জা পাচ্ছ কেন? একার গান বলছি না; একলা কি আবার গান হয় নাকি? সে তো যারা মোষ চরায় তারা ভোর রাত্রে শীতের জ্বালায় গায়; রাতদুপুরে পথিক ভয় ভাঙানোর জন্য গায়। সে কি গান নাকি। আমি বলছি এই সবাই মিলে গান গাইবার কথা। গানের সময় তোমাকে চুপ করে দেখলাম কিনা, তাই বলছি।

ঢোঁড়াই স্বীকার করে যে, 'বিদেশিয়ার গান' সেও জানে। তবে সে মহাৎমাজীর নিমক তৈরির বিদেশিয়ার গান।

বিল্টাও সে গান জানে। সকলেই জানে। কিন্তু খবরদার না! মহাৎমাজীর বিদেশিয়া এখানে গাওয়া বারণ। গাইলেই দারোগা সাহেব হাল বলদ ক্রোক করবে। ঐ শালা হাড়ীর বাচ্চা লছুয়া চৌকিদার আছে, সে গিয়ে সব খবর দিয়ে দেয় দারোগা সাহেবের কাছে।

আরও কত কথা হয়। বেশ লাগে তার বিল্টাকে।

রাতে যখন সে বাড়ি ফেরে তখনও সাগিয়া আর সাগিয়ার মা তার জন্য জেগে বসে রয়েছে।

'আমরা মা বেটিতে বলাবলি করছিলাম যে, পরদেশী লোকটা না বলেই পালাল

---

১ ভগবান সব সময় সকলের উপর বিরূপ।—তুলসীদাস।

নাকি। মেয়ে আবার বলল যে, না; চেহারা দেখে না বলে পালানোর মতো বলে তো মনে হয় না। নিশ্চয়ই ভজনের ওখানে গিয়েছে!

গোয়ালঘরের মাচার উপর পাতবার জন্য সাগিয়া একখানা কম্বল দিয়ে যায়।

'লোটা থাকল মাথার নীচে।'

অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে, ভেবে ভেবেও ডাইনীর কোনো লক্ষণ ঢোঁড়াই মোসম্মতের মধ্যে খুঁজে পায় না। রাতে শুয়ে পাশ থেকে নারকেল তেলের গন্ধ পাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তার, গত এক বছরের মধ্যে। তামাকেরই মতো, না পেলে মন খুঁত খুঁত করে। মনে না পড়ছে যতক্ষণ, ততক্ষন বেশ। এখন ঘুম এলে হয়।

**মোসম্মতের খেদ**

গাঁয়ের প্রাণ গাঁয়ের দলাদলি। দিন কয়েকের মধ্যে গাঁয়ের ঝগড়াঝাঁটির নাড়ীনক্ষত্র ঢোঁড়াই জেনে গেল। বড় গ্রাম, অনেক দল, অনেক রকম স্বার্থ। বড়র নিচে মেজ, মেজর নিচে সেজ। এখানকার ব্যাপারটা তাই, তাৎমাটুলি থেকে অনেক বেশি জটিল। সকলেরই নজর মাটির উপর, জমির উপর। মাটির রস মরলে তাকায় উপরের দিকে, তারপর চোখ বুঁজে তাকায় আটপৌরে মহাবীরজীর দিকে।

তাৎমাটুলিতে জমির গল্প কেউ করত না। জমিদারের গল্প করত কালেভদ্রে। কিন্তু এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। এখানকার হাসিকান্না গল্পরঙ্গ তামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে। অর্ধেক কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ ঢোঁড়াই ধরতেই পারে না।

এ পাড়াটার নাম কোয়েরীটোলা; এখানে সব জাতে কোয়েরী। এদের অধিকাংশই রাজপুতদের 'আধিয়ার'। রাজপুতরা থাকে, এই কাছেই রাজপুতটোলায়। জমি-জিরেতের মালিক তারাই। কোয়রীদের বাড়ির মেয়েপুরুষ অনেকে বংশানুক্রমে তাদের বাড়ি ঝি-চাকরের কাজ করে। কোয়েরীদের মধ্যে কেবল দু'চার ঘর লোকের নিজের জমি আছে।

আইনত এ অঞ্চলের জমিদার রাজপারভাঙা। সরসৌনিতে, যেখানে সেকালে উইলসন সাহেবের নীলকুঠি ছিল, সেইখানেই জমিদারের 'সার্কেল' কাছারি। লোকে বলে 'সার্কিল'। গাঁয়ে কাউকে তেল মাখতে দেখলে, বুড়োরা শ্লেষ করে জিজ্ঞাসা করে, 'কি রে আজ সার্কিলে যেতে হবে নাকি?' আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে ঢোঁড়াই এই সব কথাগুলো শোনে। মনে রাখবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক জায়গার নিজস্ব কথাবার্তা রীতিরেওয়াজ না জানলে সেখানকার লোকেরা কাউকে আমলই দিতে চায় না।

আইনের চোখে যাই হোক, আসলে কিন্তু গাঁয়ের জমিদার বচ্চন সিং—গাঁয়ের 'বাবুসাহেব'। জোত আর রায়তি জমি মিলিয়ে এঁর জমি হবে প্রায় তিন হাজার বিঘা। কিন্তু ইনি নিজেকে বলেন 'কিসান'। আজকাল নিজেকে 'কিসান' বললে লাভ আছে। বাবুসাহেবের জমি এখনও বাড়ছে। ও যে বাড়তেই হবে। জমি যে মানুষের পরিবারের মতো। ছেলেপিলে হয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলে, না হয় মরে হেজে ছোট হয়ে আসে। একই রকম কখনও থাকে না। এই তো বাবুসাহেবকেই দেখ না। একখানা বাঁশের লাঠি নিয়ে ব্যালিয়া জেলা থেকে এদিকে এসেছিলেন, 'পুরুব'-এ পয়সা সস্তা বলে। 'সার্কিলে' অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে 'মজকুরী সেপাই'-এর পদে বহাল হন। মজকুরী সেপাইরা এক পয়সাও মাইনে পায় না।

পায় কেবল পিতলের তকমাআঁটা একটা চাপরাস, একটা পাগড়ি; আর সার্কেলের খরচে তার লাঠির উপর পিতল দিয়ে, নিচেটা লোহা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। কড়া হুকুম আছে লাঠি যেন কিছুতেই এস্টেট থেকে দেওয়া না হয়। বিয়ে করা স্ত্রী আর লাঠি একই রকম জিনিস। যে লোকটা পরের লাঠি দিয়ে কাজ চালাতে চায়, খবরদার বিশ্বাস করো না তাকে। আরা, ছাপরা আর বালিয়া জেলার রাজপুত ছাড়া, আর সকলের দরখাস্ত খাস্তা খাতায় ফেলে দিও।

সেই মজকুরী সেপাই কেমন করে আস্তে আস্তে এখানকার বাবুসাহেব হয়ে গেলেন, সেটা এদিককার প্রতি গ্রামের গতানুগতিক ইতিহাস। তার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নেই।

যে ভাঙা বাড়িটার উপর অশথ গাছ উঠেছে, ঐ যে যার সম্মুখের মাঠে সাঁজোয়া ভজন হয়, সেটা ছিল 'ভক্তাইদের'১ মঠ। মঠের জমি-জিরেত বেশ ছিল। এর আগের মোহন্ত একটি মুসলমানের মেয়েকে রেখেছিলেন মঠে এনে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে চলে যেতে হয় গ্রাম ছেড়ে। আজকাল ভক্তাইদের ছেলেরাও আর নিজেদের ভক্তাই বলে পরিচয় দিতে চায় না। তাই আজ মঠের এই অবস্থা। যার লাঠি তার মোষ। স্বাভাবিক নিয়মের এই সব জমি চলে যাচ্ছে বাবুসাহেবের পেটে।

এমনি করেই জমি বাড়ে। জলে জল আনে। কোথা থেকে কেমন করে যে জমি বাবুসাহেবের হাতে চলে যায়, তা আগে থেকে লোকে টেরও পায় না। গাঁয়ের ডাইনীবুড়ি পর্যন্ত তাঁর হাত থেকে নিজের জমিটুকু বাঁচাতে পারবে বলে ভরসা পায় না। হাজার হলেও মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ পারে পেটে ছেলে ধরতে। সে কৃপাটুকুও করেনি রামজী! এমনি আমার বরাত! দেওয়ার মধ্যে দিয়েছিলে তো কেবল ঐ সাগিয়াকে। কাছে রাখব বলে গাঁয়ে ঘরে বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের পরে পাঁচ বছরও সিঁদুর থাকল না কপালে মেয়েটার। নিজের ভাতার পুত অনেক কাল আগেই খেয়ে বসেছিলাম। তারপর খেলাম জামাইটাকে, তারপর সাগিয়ার একচিমটি ছেলেটাকে পর্যন্ত। সাত মুল্লুকে আমার সম্পর্কের কোনো মরদ টেঁকে না রে ঢোঁড়াই।

এখানে আসবার তিন-চারদিনের মধ্যেই মোসম্মত ডুকুরে কেঁদে এই সব কথা ঢোঁড়াইয়ের কাছে বলেছিল। আরও কী কী যেন সব বলেছিল। কখনও বলে জামাইটা ছিল চিররুগ্ন। মেয়েকে কাছে পাব বলেই জেনেশুনেও তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম। আর ভেবেছিলাম, জামাই আমার জমিটমিগুলোর দেখাশুনা করতে পারবে। আমার মনের পাপ রামচন্দ্রজী সবই দেখেছিলেন, তাই বোধ হয় আমাকে এমন করে শাস্তি দিলেন। কখনও বলে, সরসৌনির বৈদজীই আমার নাতিটাকে মারল; ঐ যদি তখন জিরানিয়ায় নিয়ে যাই ডাক্তারের কাছে, তাহলে কি আমার কপাল এমনি করে পোড়ে! জিরানিয়ার ডাক্তারের ওষুধের ধক বড় বেশি। অতটুকু ছেলে তা কি সহ্য করতে পারত? তুই-ই বল না। সেবার একটা কোমরের ব্যথার ওষুধ আনিয়েছিলাম জিরানিয়া থেকে। বেনাঘাসের কাঠাটার মধ্যে করে রোদ্দুরে দিয়েছিলাম শিশিটাকে। ছিটকে ছিপি বেরিয়ে গিয়ে লেগেছিল বারান্দার খুঁটিতে। এখনও সে গন্ধ লেগে আছে কাঠাটাতে।

---

১ ভক্তাইরা কবীরপন্থীদের একটা শাখা। সাধারণ লোকের ধারণা এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতরে পার্থক্য কেবল তিলকের আকারপ্রকার নিয়ে।

মোসম্মত ঢোঁড়াইকে নিয়ে গিয়ে কাঠাটা শোঁকায়। কোনো গন্ধ না পেলেও ঢোঁড়াই বলে, বাপরে! বড্ডো ধক্! এ কি বাচ্চারা সহ্য করতে পারে! সাগিয়া পাটের দাঁড়ি পাকাচ্ছিল দূরে বসে। হঠাৎ তার উপর নজর পড়ে ঢোঁড়াইয়ের। তার মুখের কোণের হাসি দেখে ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে সে তার মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলেছে। তবে তার জন্য বিরক্ত হয়নি। তার চোখ বলছে, আহা বুড়ি মানুষ ওর কি কথার ঠিক আছে। যা বলেছে বলুক। তুই হ্যাঁতে হ্যাঁ মেরে যা১। …বাচ্চাটার কথা না বললেই হত। সাগিয়া শুনছে জানলে সে কিছুতেই বলত না।…জিরানিয়ার দাবাখানার২ ওষুধের শিশিটার সঙ্গেও তার কোথায় যেন আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে। স্টেশন থেকে গরুরগাড়ি করে সে ডাক্তারবাবুর মাল এনে দিয়েছিল একবার।…বেনার কাঠাটাও আর একটা বেনার কাঠার কথা মনে পাড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে ছিল একখানা কাঠের চিরুনি, একখানা ছোট টিনেমোড়া আয়না, রঙ-বেরঙের ফোঁটা দেওয়া।…সাগিয়া ঢোঁড়াইয়ের চাইতে পাঁচ-সাত বছরের বড় নিশ্চয়ই হবে।…

আবার বিল্টার কাছ থেকে ঢোঁড়াই শোনে ঐ হাড়কঞ্জুস গিধর মন্ডলটার বৌ ছেলেপিলে সব আছে তবু চুমৌনা করতে চায় সাগিয়াকে, জমির লোভে। মোসম্মতেরও আপত্তি নেই তাতে। গিধরটাই ভাই মারা যাবার পর থেকে মোসম্মতের জমির দেখাশোনা করে কি না; কিন্তু সাগিয়া হাড়ে চটা দেওরের উপর। ও হারামজাটা আবার পাশের টোলার কানী মুসহরনীর৩ ওখানে যায় রোজ। সাঁঝের পর একদিনও গিধরটাকে টোলার মধ্যে খুঁজে বার করিস তো, তবে বুঝব।

গাঁয়ের চৌকিদার লচুয়া হাঁড়ী, ঢোঁড়াইয়ের খোঁজ-খবর নিতে এসে গল্প করে যায়, কোয়েরীটোলার মেয়েদের কথা। কার কার নাম যেন করে; ঐ শুনতেই বাবুদের বাড়ির ঝি। আর দিনকতক থাক না সবই জানতে পারবি। এই জন্যই তো এদের আধিয়াদার রাখে রাজপুতেরা। না হলে, ঐ সাঁওতালটুলিতে গিয়ে দেখে আসিস; তাদের চাষ, আর এদের চাষ।

এই পরিবেশের মধ্যে ঢোঁড়াই এসে পড়েছে।

## সাগিয়ার নিকট নূতন শাস্ত্র শিক্ষা

সাগিয়া আর সাগিয়ার মা দুজনেই লোক ভাল। পরকে আপনার করে নিতে জানে। কিন্তু বুড়িটা বড় বাজে বকে। এক মিনিটও জিভের কামাই নেই। ঢোঁড়াইকে তামাক ক্ষেতের কাজ শিখিয়ে দেয়। এই, এমনি করে উপরের পাতা আলগোছে হালকা হাতে ছিঁড়বি। জঙ্গল নিড়িয়ে এইখানে জড় করবি। একটি মুথোর ডগা গজালে পাশের পাতা নষ্ট হয়ে যায়, এমনি আদুরে দুলাল গাছ তামাকের। আগে মুথো ছিল না ক্ষেতে। গত বছর যখন কুশীস্নানে গিয়েছিলাম, তখন হাড়ীর বাচ্চাগুলো শুয়োর চরিয়েছিল ক্ষেতে। আর যাবে কোথায়! সেই

১ সায় দেওয়া।

২ ডিস্‌পেন্‌সারি।

৩ একচক্ষুহীন মুসহর স্ত্রীলোক। মুসহরেরা এই অঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরীব। এরা সাধারণত ক্ষেতমজুরের কাজ করে।

থেকে মুথোয় ভরে গিয়েছে ক্ষেত১। ও বেলা একবার আমাদের আধিয়াদারগুলো কী করছে না করছে দেখে আসিস···তোর ছেলে-পিলে কী ?

একটা মিথ্যা কথা ঢাকতে অজস্র মিথ্যা কথা বলতে হয়। তাৎমাটুলির বাইরের জীবনে এত মুশকিলও থাকতে পারে তা ঢোঁড়াই আগে কল্পনাও করতে পারেনি।

এ জীবন ভাল না লাগলেও আস্তে আস্তে সয়ে যায় ঢোঁড়াইয়ের। তামাকের ক্ষেতটা ক্রমেই আপন আপন মনে হয়। তামাকের নধর পাতাগুলো তার চোখের সামনে পুরু হয়ে উঠছে, বেড়ে উঠছে, আস্তে আস্তে ঢেকে ফেলছে তারি হাতে নিড়ানো জমিটুকু, ছুঁতে চাচ্ছে পাশের গাছকে।...

পৌষ মাসে একদিন শিলাবৃষ্টি হয়ে অর্ধেক পাতা ছিঁড়ে চিরুনির মত দেখতে হয়েছিল। সেদিন সাগিয়া আর সাগিয়ার মা'র সঙ্গে ঢোঁড়াইও এসে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল ভিজে ঠান্ডা ক্ষেতের মধ্যে। মন বদলাচ্ছে তার, বিসকান্ধার জিনিসের উপর মায়া বসছে। অথচ এই সেদিন তাৎমাটুলিতে শিলাবৃষ্টি হলে, তারা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছে; ভাঙ্ মট্‌মট্ করে ভাঙ্ খাপড়া বাবুভাইয়াদের বাড়ির। সাগিয়াদের মুখের দিকে ঢোঁড়াই তাকাতে পারেনি সেদিন সংকোচে। সাগিয়াই প্রথম কথা বলে। 'বাড়িতে ব্যবহারের তামাক হবে'খন ঐ ছেঁড়া পাতাগুলো দিয়ে।' সাগিয়াই উলটে ঢোঁড়াইকে সান্তনা দিতে চায়। ঢোঁড়াইয়েরও এটা অস্বাভাবিক মনে হয় না।

তবু কি পুরনো জীবন মুছে ফেলা যায় ন্যাতা দিয়ে। ও লেগে থাকে মনের গায়ে এঁটুলির মতো। রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে কখন আপনা থেকে ঝরে পড়বে, টেরও পাবে না।

ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। যার উপর রাগ তাকে পর্যন্ত না। এখানে গরুকে জাবনা দেওয়ার সময় তাৎমাটুলির বলদজোড়ার কথা মনে পড়ে। কেই বা তাদের খেতে দিচ্ছে এখন? হয়তো নাদাতে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ছে না। যে লোকটা আজীবন অখাদ্য মাংস খেয়েছে, সেটা আজ হিঁদু হয়েছে বলে কি আর গরুর যত্ন করতে পারবে।···চারিদিকে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে ঢোঁড়াই হালের বলদটার গলা জড়িয়ে ধরে।···আবার গা ঝাড়ছে! বলদটাও বোধ হয় বোঝে যে, সে তার মালিক না। অধিকারের সম্বন্ধটুকু পর্যন্ত মনে রাখে না।

ভারী ঠান্ডা স্বভাব সাগিয়ার; বিরক্ত হয় না কিছুতেই। আনাড়ী ঢোঁড়াই কোনো কাজ ঠিক করে করতে না পারলে বলে, 'ও শিখে যাবি দু'দিনেই। ওর মধ্যে কী আছে।' কেবল আশ্বাসের স্বর না। তার সঙ্গে আরও কী যেন মেশানো, যা ঢোঁড়াইকে কুণ্ঠিত হওয়ার অবকাশ পর্যন্ত দেয় না। ঢোঁড়াই যেদিন প্রথম 'ভকত' হয়ে নিজ হাতে তিলক কেটেছিল কপালে, সেদিন বাওয়ার ঠোঁটের কোণে এই রকমই শান্ত হাসির ছাপ দেখেছিল। ঠিক এই রকম। 'পারবি রে ঢোঁড়াই পারবি। খাসা মানিয়েছে নতুন ভকতকে।' বাওয়ার কাছে যে রকম অপ্রস্তুত হওয়ার কথাই উঠত না, এখানেও সেই রকম।

তামাকের পাতা মজলে, সাগিয়া ঢোঁড়াইকে বুঝিয়ে দেয় কী করে আঙিনার দড়িতে বেঁধে পাতাগুলোকে টেনে বড় আর লম্বা করতে হবে। তবে ব্যাপারীরা গাঁয়ে তামাক কিনতে এলে বেশি দাম পাওয়া যাবে। দেখিস ঢোঁড়াই, শাগরেদের নামেই

১ এ জেলায় চাষীদের ধারণা যে শুয়োর চরলে ক্ষেতে মুথাঘাস হয়।

গুরুনাম। মণ্টুমলের লোক পরশুই আসবে গাঁয়ে।

মজা পাতায় এত ঝাঁঝ হতে পারে তা ঢোঁড়াইয়ের জানা ছিল না। বিকাল বেলাটায় তার গা বমি বমি করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সাগিয়া বলেছে, আজকে এই বোঝা শেষ করতে। শেষ সে করবেই করবে। 'তাকতে' সে কারও চাইতে কম নয়। সন্ধ্যার সময় মাথাটা ঘুরে ওঠে। শরীরটা একটু আনচান করে। জ্বর আসবে নাকি? তামাকের বোঝাটা সুদ্ধ তার পিছনে লেগেছে, উঠে পড়ে লেগেছে তাকে হারাবার জন্য, অন্যর চোখে তাকে ছোট দেখাবার জন্য।…দড়ির ফাঁসের মধ্যে তামাক পাতার ডাঁটাটা আর সে ঢুকোতে পারছে না। কেমন ফসকে যাচ্ছে।…তারপর বাড়ি ঘর উঠোন, তামাক সব অস্পষ্ট হয়ে আসে তার কাছে।

সে রাত্রে সাগিয়া খুব খেটেছিল তার জন্য। সারা রাত মাথায় বাতাস করেছিল। বলেছিল, তার দোষেই অমন হল; সে আগে সাবধান করে দেয়নি। গা বমি বমি আরম্ভ হলে তখনই তামাকপাতা বড় করবার কাজ ছেড়ে দিতে হয়। তখনই গুড় আর এক লোটা জল খেয়ে শুয়ে পড়তে হয়। ভুমি পুরুবের লোক এসব জানা নেই, তা খেয়ালই হয়নি; মাথায় লাউয়ের বীচির তেল দিয়ে তার রগ দুটো সাগিয়া টিপে দিয়েছিল বহুক্ষণ।

…সকলেরই তাহলে এ কাজ করতে গেলে কখনও কখনও এমন হতে পারে।… হবেই যে এমন কোনো কথা নেই।…

এর মধ্যে হেরে যাওয়ার অপমান আছে কি নেই ঢোঁড়াই বুঝবার চেষ্টা করে। ভাববে কী! সব ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে, কানে যে খসখসানি শব্দটা আসছে সেইটার জন্য। মাথা টিপবার সময় এই শব্দটা হচ্ছে। বেশ লাগে সাগিয়ার এই দরদটুকু। এখানে তাহলে মরলে কুকুর-শিয়াল টেনে নিয়ে যাবে না। এখানেও দুটো মিষ্টি কথা বলবার লোক তাহলে আছে।

মেয়েদের উপর রাগটা ঢোঁড়াইয়ের মনের একটা খোলস। তার স্নেহবুভুক্ষু মন নিজেকে ফাঁকি দেবার জন্য ঐ আবরণের আড়ালে যেতে চায়।

তাই কথার ধুকোড়ি মোসম্মত রাতে তামাক খেতে উঠে সাগিয়ার কাছ থেকে যখন তাঁর খোঁজ নিয়ে যায়, তখন তার স্নেহকাঙাল মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

### ভুস্বামীর যশোকীর্তন

বাবুসাহেবের মনটা আজ খুব খারাপ আছে। আজ তাঁর আর একটা দাঁত পড়েছে। মাত্র তিন-চারটে তো অবশিষ্ট ছিল। তাও পড়ল কিনা পাঁপড়ভাজা খাওয়ার সময়! তাঁর বয়স হয়ে আসছে। মরবার কথাটা মনে করতে ভয় ভয় করে। কত লোক একশ বছরও তো বাঁচে। হাতের শিরাগুলো বেরুলে কী হয়, এখনও যথেষ্ট 'তাকত' আছে তাঁর শরীরে। লোকে ভাবে যে, তাঁর লাঠির জোর কমেছে। সে বুঝেছে হাড়ীর ব্যাটা লচুয়া চৌকিদার সেদিন। 'কিছু মানেই লাগাতে চায় না'[১] গাঁয়ের চৌকিদার হয়েছে বলে। এখান থেকে বসেই তিনি সেদিন দেখেন কী গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে হাড়ীর ব্যাটা যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে, রাজপুত্তুর বিজাসিংয়ের মতো। রামজীর কৃপায় বাবুসাহেবের চেখের তেজ এখনও কমেনি। তাই না এই দোতলা থেকেও দেখতে পেয়েছিলেন। বলে কিন দারোগাসাহেব খুব জলদি যেতে বলেছিল বলে গাঁয়ের

১ তাচ্ছিল্য করে।

মধ্যে ঘোড়ায় চড়েছিলাম। শুধু আপাদমস্তক জ্বলে গিয়েছিল বাবুসাহেবের। তিনি আজকাল ভজনপূজন নিয়েই বেশি থাকেন। সংসারের কাজকর্ম দেখেন বড় ছেলে অনোখীবাবু১। তবু তিনি থাকতে পারেননি। গুনে পঁচিশ জুতো মেরেছিলেন বাবুসাহেব লচুয়া চৌকিদারকে। আর এক টাকা জরিমানা। ভেবেছিস কী? 'পচা তেলী, নয়শ আধুলী'। এখনও। বুঝলি? সরকার আমার উপর নারাজ থাকলেও। আমর ছোট ছেলে লাডলীবাবু 'নেংটা'-গুলোর সঙ্গে জেলে গেলেও বুঝলি?

জরিমানার টাকাটা অবিশ্যি তিনি নিজে নেননি। তিনি আর আজকাল ঐ সব টাকা-পয়সার ব্যাপারে থাকেন না। তাঁর নিজের কামানো পয়সা থেকে ছেলেরা চারটি খেতে দেয়, তাইতেই তিনি খুশী, জরিমানার টাকাটা নিয়েছিল তাঁর বড় নাতি। তাঁর নিজের ছেলে দুটো তো অপগণ্ড। বড় অনোখীবাবু ভাং খেয়ে ঘুমোয়, আর ছোট লাডলীবাবু নেংটাগুলোর সঙ্গে জেলে তিরিশ আতের এঁটো খায়। মহাত্মাজীর কাজ না ছাই! নাতিটার তবু বিষয়বুদ্ধি আছে, এই বয়সেই। গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে জরিমানার পয়সা তুলে, তাই দিয়ে আসাসোটা, মকমলের বিছানা-টিছানা আনিয়েছে। আশ-পাশের গাঁয়ের বিয়ের মাইফেলের সময় ভাড়া দেয়। শরীরটাও ভাল। রাজপুতী ঠাট রাখতে পারবে। ঐ তো নিচে মোষের নাদার কাছে বসে রয়েছে। মোষের বাচ্চাগুলোর শিঙ গজাবার সঙ্গে সঙ্গেই ও রোজ সেগুলোকে নেড়ে নেড়ে দেয় স্নানের আগে এক ঘণ্টা। তবে না ওগুলো মারকুটে হবে; গোপাষ্টমীর দিন শুয়ারের পেট ফুঁড়বে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে।২ রাজপুতের ছেলের এই তো চাই! এ নাতিটা তাঁর গুণ পেয়েছে; বাপকাকার মতো নয়। তাই এটাকে তিনি এত ভালবাসেন। একে তিনি নিজের মনের মতো করে তৈরি করে যাবেন। এর মনের মধ্যে গেঁথে দিয়ে যাবেন, দুনিয়াদারির অ আ ক খ। বাড়িয়ে যাও হাত যতদূর পোঁছায়, ঐ লাঠিসমেত হাত। হাত গুটিয়ে বসে থেকো না কখনও। আলের মাটি কেটে এগিয়ে যাও একটু একটু করে। কচার ডালের খুঁটি নতুন করে সরিয়ে পোঁতো। জমির সীমানার বেড়া ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাও রাস্তার দিকে, নইলে পরে নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা পাবে না। আগে নেবে 'পবলিস'-এর৩ জমি। আস্তে আস্তে এগুবে যাতে কারও নজরে না পড়ে প্রথমটায়। তবুও যদি পিঁপড়েগুলো কামড়ায়, তাহলে বুঝিয়ে দিও যে, তুমি রাজপুত। মঠের জমি; নিকাশের জমি; কুশীর ধারের জমি; এক দিনে নয়, আস্তে আস্তে। নদীর ধারে প্রথমে খেসারি কুর্থি ফেলতে আরম্ভ করো। প্রথম দু' এক বছর গরু চরবে সেই জায়গায়। তার পর আস্তে আস্তে অন্যের গরু সেদিকে যাওয়া বন্ধ করে দাও। লাঠি নিয়ে দাঁড়াও। জমি হচ্ছে কদুর গাছের মতো। লাঠির ঠেকনা পেলে তবে লকলকে হয়ে লতিয়ে ওঠে। বাকি সব পরে আসবে। আপনা থেকে আসবে। রসিদ, আঙুলের ছাপ, ফৌজদারী আদালত, দারোগা, হাকিম কোনোটা ফেলনা নয়। যাক এখন ছেলেদের সংসার। তারা জিজ্ঞস করলে সলাপরামর্শ না দিয়ে পারেন না, তাই একেবারে সব ছাড়তে

---

১ জিরানিয়া জেলার যেসব পরিবার নিজেদের অভিজাত শ্রেণীর বলে মনে করেন, সেই সব পরিবারের বয়স্থ লোকেরাও ছেলে এবং নাতিকে পর্যন্ত 'তুমি' না বলে 'আপনি' বলেন। সম্বোধনের সময় প্রত্যেক নামের শেষে বাবু শব্দটি যোগ করে দেন।

২ প্রচলিত উৎসব।

৩ পাবলিক।

পারেননি। কেউ কেঁদেকেটে এসে পড়লে, অবিশ্যি বলেন, ছেলেদের কাছে যেতে, তারাই মালিক।...

একটা মাত্র তাঁর বাসনা আছে, রামজী পূর্ণ করবেন কিনা জানি না। এরকম ইচ্ছাগুলো যখন আসে তখন আর সুস্থির হতে দেয় না এক দণ্ডও। অন্য সব খুচরো আটপৌরে ইচ্ছাগুলোকে ডুবিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি লেগেই থাকে, মাথা রুক্ষ থাকলে মাথার মধ্যেটা যেমন করে, তেমনি। এর আগে যখনই তাঁর এইরকম একটা কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, তখনই রামজী তাঁর উপর কৃপাদৃষ্টি করেছেন। জজসাহেবের পাশে কুর্শিতে বসবার বাসনা১ তাঁর রামজী পূরণ করেছিলেন; রান্নাঘর বাড়ির বাইরে আনবার আকাঙ্ক্ষা২ রামজী পূরণ করেছিলেন। সে-বিশ্বাস তাঁর নিজের উপর আর রামজীর উপর ছিল। এবারে একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছেন রামজীর দেরি দেখে। 'লোচন সহস ন সূঝ সুমেরু।'৩ হাজারটা চোখ থাকতেও কি তুমি সুমেরু পর্বতটা পর্যন্ত দেখতে পাও না? ঐ যে এখান থেকে চোখের সম্মুখে সবুজ কালো রেখাটা দেখা যাচ্ছে আকাশের নিচে, ওটা পাক্কীর ধারের বট অশথের সার। কোশখানেক দূর হবে। এখান থেকে ঐ রাস্তা পর্যন্ত এটুকুনি তিনি এক 'চক'-এ৪ দেখে যেতে চান। নিজের দোরগোড়া থেকে পাক্কীতে যেতে হলে যেন অন্যের জমির মধ্যে পা না দিতে হয়। নিজে জমির মধ্যে দিয়ে তাঁর বলদের শ্যাম্পানিটা৫ চলেছে তো চলেইছে, পথ শেষ হয়ই না, হয়ই না; কারও খোসামোদ করবার, মুখের দিকে তাকাবার দরকার নেই, দু'পাশের ক্ষেত থেকে নিজের 'আধিয়া-দার'রা হালচালানো থামিয়ে 'বন্দেগী' করছে। একথা ভাবতেও আনন্দ।

রামজী তাঁর ইচ্ছা প্রায় পূরণ করে এনেছেন। এখন মধ্যে পড়ছে কেবল দু'চার টুকরো ছিটেফোঁটা খুচরো জমি। তারই মধ্যে আছে মোসম্মতের জমি। এগুলোকে দেখতে বড় খারাপ লাগে! তেতো হয়ে ওঠে মনটা। তাঁর সেই আগেকার যুগ হলে ভাববার কিছুই ছিল না। চারিপাশের বিরাট সমুদ্র ও দু'ফোঁটা গণ্ডুষের জলকে হুস করে টেনে নিত পেটের ভিতর। আজকাল দিনকাল হয়ে অসেছে অন্যরকম। সত্যি কথা নিজের কাছে স্বীকার করতে কষ্ট নেই,—লাঠির জোরও কমেছে। তাঁর ছেলেরা বড় লোকের ছেলে, তাঁর মতো লাঠিসম্বল গরীবের ছেলে নয়তো। তার পর নরম পানিতে জন্ম। পারবে কোথা থেকে?...তবে এই বুড়ো বয়সে চোখে ছানি পড়বার আগে এইটুকু আমায় দেখিয়ে দাও রামজী!

তবে অনোখীবাবুকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, এ কথা তিনি জানেন। কাল বলতে এসেছিল যে, লাডলীবাবুর যে তিন শ টাকা জরিমানা হয়েছে তাইতে হাকিম আমাদের গরুর গাড়ি ক্রোক করবার হুকুম দিয়েছে। মুখ্যু কোথাকার! কী করে চালাবি এত বড় সম্পত্তি। এজমালি সম্পত্তি একজনের জরিমানা উশুল করবার জন্য ক্রোক করলেই হল। এই তো ঘটে বুদ্ধি!...

---

১ দায়রা কোর্টের 'অ্যাসেসর'।

২ গ্রামে এটা আভিজাত্যের একটি লক্ষণ বলে গণ্য হয়। বাহির থেকে রেঁধে পাচকেরা মেয়েদের জন্য ভিতরে খাবার পৌঁছে দেয়।

২ তুলসীদাস থেকে।

৪ এক টুকরোতে, এক plot-এ।

৫ লোহার 'স্প্রিংওয়ালা গরুর গাড়ি।

সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। অনোখীবাবু বোধ হয় আসছে, আবার আর একটা কিছু জিজ্ঞাসা করতে।…ও! না, 'ঘরবালী'১। উল্কিতে ভরা হাতটা প্রথমে নজরে পড়ে। আবার কী মতলবে! বয়স হওয়ার পর আজকাল কিছুদিন থেকে বাবুসাহেব ঘরবালীকে একটু শ্রদ্ধা ও প্রশংসার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন। বোধ হয়, পুত্রবধূদের সঙ্গে তার তুলনা করে। ঘরবালী চিরকালের অভ্যাস মত প্রত্যহ স্নানের আগে বাবুসাহেবের পুরনো লাঠিখানাতে তেল দিয়ে রাখে। সে জানে যে, লাঠি তার সতিন; কিন্তু ও সতিনে কোঁদল করে না। লাঠি তো নয়, লক্ষ্মী আটকে রাখবার হুড়কো। ও একা হাতে একদিন সব করেছে; আর আজকাল ওর ছেলের বৌরা নিজের পানটা পর্যন্ত সেজে খায় না। রান্নাবাড়ির কথা ছেড়েই দাও। ও সব পাট তো বাড়ির বাইরেই চলে গিয়েছে আজকাল।

…এলাচ লবঙ্গ চাইতে নয় তো? কালই আটটা এলাচ দিয়েছি।…

বাড়ির মেয়েদের হাতে যাতে এক পয়সাও না যায় – সে বিষয়ে এ অঞ্চলের গেরস্ত-দের সজাগ দৃষ্টি আছে। এলাচ লবঙ্গটা পর্যন্ত বাড়ির কর্তা বৈঠকখানায় তালাবন্ধ রাখেন।

বাবুসাহেব ঠিকই ভেবেছেন। গিন্নী এসেছেন আবার এলাচ চাইতে। ইচ্ছে হয়, জিজ্ঞাসা করেন, কালকের অতগুলো এলাচের কী হল।…না ওর নিজেরই এটা খেয়াল হওয়া উচিত। তা যখন হয়নি তখন আর এসব নিয়ে খিচখিচ করতে ভাল লাগে না। একটা প্রশান্ত উদারতার ভাব দেখিয়ে তিনি খড়ম জোড়া পায়ে দেন। বৈঠকখানার গা-আলমারির চাবি খুলে এলাচ বার করে এনে দিতে হবে। বেশি দিলেও একদিন চলে, আবাব কম দিলেও ঐ একদিন চলে। চিরকাল তিনি এই দেখে আসছেন। তবে, বেশি দেওয়ার দরকার কী! আর যখনই বলবে, তখনই চাই। একেবারে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসে। এক মিনিট দেরী হলে চলবে না।… এর থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আবার সাওজীর দোকানে বিক্রি হচ্ছে না তো? গত বছর খুব বার করেছিল নাতিটা তার ঠাকুমার বালিশ কেটে সতরটা টাকা। কোথা থেকে কী করে যে লুকিয়ে গোলার ধান বেচে দেয় মেয়েরা, বুঝবার জো নেই।…

### গিধরের উপদ্রব

এই বুড়ো শকুনের নজর থেকে নিজের জমিটুকু বাঁচানোর জন্যই মোসম্মতের দরকার ছিল একজন বেটাছেলের। সেইজন্যই সে এতদিন ঝুঁকেছিল গিধর মণ্ডলের দিকে। সাগিয়া কিন্তু দেওরের সঙ্গে সাঙা করতে রাজী নয়, রাজী হয়ই বা কী করে। একপাল নেংড়িগেংড়িওয়ালা সতিনের ঘর কে আর সাধ করে করতে চায়। আর যখন তার বাড়িতে দুমুঠো খাওয়ার সংস্থান আছে।

মেয়েমানুষের স্বাভাবিক বৈষয়িক বুদ্ধিতে মোসম্মত বোঝে যে, ঢোঁড়াই লোকটা খাঁটি। বিশ্বাস করা যায় ওকে। পয়সার খাঁই নেই একেবারে। হাতে করে কিছু দিলে খাবে, না দিলে খাবে না। গিধর মণ্ডলের মতো রামায়ণ পড়তে না জানুক, তাহলেও রামায়ণ বেশ মুখস্থ। আপন করে রাখতে পারলে টিকবে। কথাবার্তায় মনে হয়, 'তীরথ' করবার দিকে ঝোঁক, আবার পালিয়ে টালিয়ে না যায়। তার

১ গিন্নী।

দিনেরও ইচ্ছে, একবার অযোধ্যাজী সেরে আসে। আর কত দিনই বা বাঁচবে। আর এই পোড়াকপালী মেয়েটাকেও একবার গয়াজীতে নিয়ে যাওয়া দরকার; মরা জামাইটার একটা সদ্‌গতি করাতে হবে। তার জন্য এক আধ বিঘা জমি যদি বিক্রিও করতে হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। গতবার এ কথা গিধর মন্ডলের কাছে তুলতেই সে চটে লাল। বলে কী না, 'মেয়ের দেওয়া পিণ্ডি তুমিই নিও হাত পেতে গয়াজীতে।' জমি বিক্রি করার কথাটা তার মনঃপুত হয়নি। লজ্জায় ঘেন্নায় মাথাকাটা গিয়েছিল মোসম্মতের। মেয়েকে সাঙা করার আগেই এই!...

আর একটু শিখলেই ঢোঁড়াইটা পারবে মোসম্মতের জমি-জিরেত ভালো করে দেখতে। এবার 'আধিয়াদার'দের কাছ থেকে ফসল ভালই পেয়েছে মোসম্মত। পাবে না? এতদিন গিধর মন্ডলই ছিল মালিক। মোসম্মত জানে যে, গিধরের হাতের তেলোয় আঠা মাখানো। টাকাকড়ি ফসল তার হাত দিয়ে যা কিছু যায় আসে, কিছুটা অংশ তার হাতেই লেগে থাকে। দু-দশ বোঝা ধান কোন্ বছর না পৌঁছত তার বাড়িতে, সাঁঝের আঁধারের পর? বাঙালী ব্যাপারীদের কাছে থেকে পাওয়া, তামাকবেচা টাকাটাও গিধরের হাত দিয়েই আসত।

রাগে গিধর মন্ডলের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা হয়। বেশি সাবধান হতে গিয়ে সে গাঁয়ের বাইরের লোককে এনে ঢুকিয়েছিল, মোসম্মতের বাড়ির চাকরিতে! দেখতে হাবাগবা বলেই মনে হয়েছিল তখন। ভাবতেই পারেনি যে, ওটার পেটে' পেটে এত শয়তানি। দু' দুটো 'আওরত'কে তিন মাসের মধ্যে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিল! কোথাকার না কোথাকার একটা পরদেশী ছোঁড়া! মোসম্মত আর তাকে আগের মতো আমলই দিতে চায় না আজকাল। গিয়ে পড়লে 'এসেছ? বেশ। বসেছ? তাও বেশ' এমনি একটা ভাব দেখায়। এ কী খাল কেটে কুমীর আনল সে। এর একটা কিছু বিহিত করতেই হয়।

সেদিন ভোরে মোসম্মতের বাড়ির সম্মুখে ঢোঁড়াই, মোসম্মত, সাগিয়া, আরও দু' একজন প্রতিবেশি আগুন পোয়াচ্ছে। পাশের বাড়ির নেংটা ছেলেটা আগুনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তবু ঠক ঠক করে কাঁপছে। ছেলেটা আগুনে একটা রাঙা আলু দিয়েছে পোড়াতে। ঢোঁড়াই তাকে ক্ষেপাচ্ছে, 'ওরে তোর দিদিমার মাথায় ধবল হয়েছে'; আর সাগিয়া, সাগিয়ার মা সকলে হেসে উঠছে ছেলেটার রাগ দেখে।

'কি? কার দিদিমার ধবল হয়েছে?' গিধর মন্ডলের গলা না? এত ভোরে?

মোসম্মত আগুনের ধারের একটি ঘাসের বিঁড়ে চাপড় মেরে পরিষ্কার করে দেয়, গিধরের বসবার জন্য। 'কোথা থেকে?'

কোথা থেকে আবার ক্ষেত থেকে। 'নিত্য ক্ষেতী দুসরে গাই'। ক্ষেত দেখতে হয় রোজ, আর গরু একদিন অন্তর একদিন।'

কথাগুলো শুনতে কিছুই না। কিন্তু সবাই বোঝে, রোজ কথাটার উপর জোরটা। গিধর মন্ডল খোঁচা দিয়ে বলতে চায় যে, তোমাদের ক্ষেতখামারের দেখা-শুনো ঠিক হচ্ছে না। অথচ কেউই ধরা পড়তে চায় না গিধরের কাছে। মোসম্মত ভাবে ঢোঁড়াই বোধ হয় বুঝতে পারেনি। সাগিয়াও ঢোঁড়াইয়ের ব্যঞ্জনাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে জানিয়ে দিতে চায়, 'আরে বলতে দে। বললেই তো আর তোর গায়ে ফোসকা পড়ছে না।'

তার কথার খোঁচাটা কেউ গায়ে মাখল না দেখে গিধর একটু ক্ষুব্ধ হয়। ঢোঁড়াই

তখন খুব মনোযোগ দিয়ে 'ঘুরের' ছাই সরাচ্ছে একটা কাঠি দিয়ে। ধোঁয়ার জন্য চোখদুটো বুজে এসেছে তার। সেদিকে দেখে বুঝবার উপায় নেই, কী ভাবছে।

হঠাৎ ঢোঁড়াইকে এক তাড়া দিয়ে ওঠে গিধর মণ্ডল। 'ঘুরের আগুনের ছাই নিচে থেকে উপরের দিকে ওঠাচ্ছিস কেন দিনের বেলায়? বেকুব কোথাকার! মোচ উঠেছে, আর এটুকু জানিস না যে, ঘুরের ছাই সাঁঝের পর নিচ থেকে উঁচুতে ঠেলে তুলতে হয়, আর সকালে উপর থেকে নিচে নামাতে হয়।'১

—তারপর ছোট ন্যাংটা ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুই জানিস না এ কথা?'

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে জানায় যে হ্যাঁ সে জানে এ কথা।

'এখানকার ছোট ছেলেটা পর্যন্ত যে কথা জানে, পুরুবের জানোয়ারগুলো তা জানে না। আমরা এসব বাপ ঠাকুর্দার কোলে বলে শিখেছিলাম।'

ঢোঁড়াই কিছুতেই চটবে না। যতই বলো। সত্যিই তো সে এখানকার আচার-ব্যবহার জানে না কিছুই। সে আগুন সরিয়ে রাঙা আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা দেখে। মোসম্মত কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে বলে, 'শিখে যাবে সব। ছেলেমানুষ। নতুন এসেছে এদেশে।'

দেওরের ব্যবহারে অপ্রস্তুত হয়ে যায় সাগিয়া। ভোরবেলা কোথায় সীতাজী, রামজী, মহাবীরজীর নাম নেবে, তা নয় এ কী আরম্ভ হল বাড়িতে। বয়সে বড় দেওর। কিছু বলাও যায় না মুখের উপর। ঠিক যেসব কথাগুলো ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখে বলা উচিত না, অনবরত কি সেই কথাগুলোই ওর মুখে আসবে। এই তো আবার মাকে বলল, 'ঢোঁড়াইয়ের মাইনে দেওয়া হয়েছে তো? চার আনা করে মাইনে আমি ঠিক করে দিয়েছিলাম!' আমি, আমি, আমি। কে বলছে যে তুমি বহাল করোনি ঢোঁড়াইকে। ঢোঁড়াই তো বলছে না যে, সে চাকর নয়। কী দরকার তাকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়ার।

মোসম্মতেরও মাইনের কথাটাতে লজ্জা লজ্জা করে। সব ফসল, টাকা-পয়সা ঢোঁড়াইয়ের হাত দিয়েই আসে। ওর হাতে কি চার আনা পয়সা মাইনে বলে তুলে দেওয়া যায়। এ কথা সে গিধরকেও জানাতে চায় না। বলে, 'সে হবেখন।'

'এবার শুনলাম—তোমাদের ঢোঁড়াই ফসল ভাগ করেছেন আধিয়াদারের বাড়িতে'২। একেও পরদেশী ছেলেমানুষের কাণ্ড বলে উড়িয়ে দাও। গাঁ সুদ্ধ সব গেরস্তর বিরুদ্ধে যাওয়া! ছেলেমানুষ তো ওর মুখে তেল মাখিয়ে দিয়ে তার উপর বসে বসে হাত নাড়ো। যাতে একটাও মাছি না বসতে পারে।'

'এবার আধিয়াদারের বাড়িতে ভাগ করে ফসল তো অন্যবারের চাইতে কম পাইনি আমি।'

গিধর মন্ডলের মনে হয় তার সততাকে লক্ষ্য করেই মোসম্মত কথাটা বলল। সে চটে ওঠে।

---

১ সন্ধ্যায় সকলের লক্ষ্য থাকে যাতে আগুনটি সারারাত জ্বলে। আর সকালে চায় যে রোদ উঠবার পর আগুনটি নিবে যাক। এই জন্যই বোধ হয় গ্রামাঞ্চলে এই নিয়ম প্রচলিত।

২ যে স্থানে ফসল কেটে জড়ো করা হয়, তাকে বলে 'খলিহান'। ভাগ-চাষীদের ফসল, ভূস্বামীর খলিহানে জড়ো করাই প্রথা। কিন্তু এতে জমিদার যথেচ্ছ ফসল ভাগ করার সুবিধা পেয়ে যায়।

'তোমার একার কথা ভাবলেই তো দুনিয়া চলবে না। গাঁয়ের অন্য সকলের কথাও ভাবতে হবে।'

কথার ঝাঁঝে মোসম্মত একটু মিইয়ে পড়ে। বলে, 'তা তো হবেই।'

আর ঢোঁড়াই থাকতে পারে না। অনেকক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে সে লড়েছে।

'গাঁয়ের লোকের ক্ষতিটা কোথায় হয়েছে শুনি। তোমার সেপাই ওজন করলে 'কিয়ালি'১ কেটে নিতে, আধিয়াদার ওজন করেছে কিয়ালি না নিয়ে। তোমার বাড়ির গুরু পুরুতের অংশ ভাগ হওয়ার আগে কেটে রাখতে, সেইটা পাবে না। নিজের অংশ থেকে খাওয়াক না রাজপুতেরা তাদের পুরুতকে চার আঙুল সরের দই। চার-পাট করা কম্বলের আসনে বসাক না তাদের বামুন ঠাকুরকে। আধিয়াদাররা নিজের অংশ থেকে তা দেবে কেন? সে বামুন কি আধিয়াদারদের বাড়ি পুজো করে?'

মোসম্মত ঢোঁড়াইকে চুপ করতে বলে। এক রকম ধমক দিয়েই ওঠে। 'কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে গিধরের, তার মধ্যে তুই কথা বলতে আসিস কেন, ঢোঁড়াই?'

গিধর ঢোঁড়াইয়ের কথার উপযুক্ত জবাব খুঁজে পায় না। হাতের একটা মুদ্রা দেখিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে বলে, 'তুমি নিজের বটুয়া ভ'রো না যেন, ম্যানেজার সাহেব।'

'কী! কী বললি?' ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়িয়েছে। এক মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের চেহারা বদলে গিয়েছে।

সাগিয়া আর মোসম্মত তাদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। 'আমাদের দুয়ারে গিধরের অপমান হলে লজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না। না না তুই থাম ঢোঁড়াই।

'আমি কি ওর ক্ষেতের মুসহরনী২ যে ও আমাকে গালাগালি করবে, আমি হেসে আদর করব? আমি কি ওর টাকা কর্জ খেয়েছি? ওই গোরুখোরটার?"

গিধর মন্ডল আর কথা বাড়ায় না। এরকমটা সে ঠিক আশা করেনি। ঢোঁড়াইটা যে মুসহরনীর কথা বলল, সেটা কানী মুসহরনীকে লক্ষ্য করে না তো? এখনই হয়তো সাগিয়া আর মোসম্মতের সম্মুখে সেই কথা নিয়ে আরও চিৎকার আরম্ভ করে দেবে। সাগিয়ার আশা অর্থাৎ সাগিয়ার মা'র জমির আশা সে এখনও ছাড়েনি।

'যাই, রোদ উঠে গেল বলে সে গুটি-গুটি বেরিয়ে যায়। দূর থেকে বলে যায়, 'দ্যাখ, ছোট মুখে বড় কথা বলা ভাল নয়।

ঢোঁড়াই এ কথার জবাব দেয়না। গিধর চলে গেলে সে মোসম্মত সাগিয়া কারও সঙ্গে কথা বলে না।...মোসম্মত কিনা বলে, আমাদের কথার মধ্যে কথা বলিস না। যাদের জন্য করি এত, তারাই এই বলে! এই নিমকহারাম স্বার্থপর মেয়েমানুষের বাড়ি তার দানাপানি নেই। রামজীর সৃষ্টি সারা দুনিয়া তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। হাতদুটো আছে, দুমুঠো খাওয়া জুটেই যাবে। কোনো জিনিস সে এখানে আসবার সময় আনেওনি, এখান থেকে যাওয়ার সময় নিয়েও যেতে চায় না। মেয়েমানুষ দু-জনের কারও দিকে না তাকিয়ে সে বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

সাগিয়া তাকে লক্ষ্য করছে মায়ের সেই কথাটার পর থেকে।

'মা বুড়ি মানুষ। তার কথার কি কিছু ঠিক আছে। তার কথায় রাগ কোরো না ঢোঁড়াই।'

যা ভাবা যায় সব কি করা যায়! আর সাগিয়ার চোখের জল দেখবার পরও।

---

১ ওজন করবার পারিশ্রমিক বাবদ একটি ফসলের অংশ।

২ মুসহর জাতের স্ত্রীলোক। এরা ক্ষেত মজুরের কাজ করে।

মোসম্মত পর্যন্ত 'বেটা' বলে তার কাছে এসে দাঁড়ায়।

'বড় বোকা তুই। এই পরদেশী 'বেটা'কে নিয়ে আচ্ছা মুশকিলে পড়লাম দেখি। বোস। দাঁতন কর। আমি ততক্ষণ ভুট্টার খই ভেজে আনি।'

সাগিয়া মনে করিয়ে দেয় মাকে, 'দেখো, খই আবার বেশি ফুটে না যায়।'

সে আর বলতে হবে না বুড়িকে।

আসলে ঢোঁড়াইয়ের রাগের থেকে অভিমানটা হয়েছিল বেশি। রাগ তো সব লোকের উপরই হতে পারে। এখানে ঢোঁড়াইয়ের অভিমান করবার দাবি জন্মেছে এরই মধ্যে। নইলে ঢোঁড়াইয়ের রাগ কি অত তাড়াতাড়ি থামে; না অত নিঃশব্দে আসে যায়।

## জমি জাতির রাজ্যে শনির দৃষ্টি

খালি বিসকান্ধায় কেন, সারা জিরানিয়া জেলা জুড়েই আকাল এসেছে। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে আসছিল ক'বছর ধরেই। পয়সার আকাল। বড় 'কিসানদের' বাড়ি ধান আছে। এতদিন ঘুমিয়ে ছিল না কেউ; কিন্তু কী করতে হবে কারও জানা ছিল না। বচ্চন সিংয়ের পর্যন্ত না। সবাই নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। পুরনো ধানে বাবুসাহেবের আটটা পাঁচশমনী গোলা ভরা। না চাইলেও যে ধানটা আসবে, সেইটা রাখবার জায়গা করাই শক্ত। গতকাল পাট পচেছিল মাচার উপর। জলের দরে বিক্রি করতে হয়েছিল মংটুরামের আড়তে। তাই আবার কত খোসামোদ। বলে যে তার গুদামে জায়গা নেই। পাট তো তাও বিক্রি হয়েছিল, ধান মকাই বিক্রিই করতে পারেন নি অনোখীবাবু। বছর ঘুরতে না ঘুরতে মকাইতে পোকা ধরে। তাই গাঁয়ের মধ্যে 'খয়রাত' করতে হয়েছিল। না চাইতে ফসল দেওয়ার নামই খয়রাত। একটা লম্বা খাতায় টিপসই দিয়ে নিতে হয়। শীতের শেষে এর দেড়গুণ ওজনের রবির ফসলে শোধ দিতে হবে। এবারে সস্তা রেটে খয়রাত ছেড়েছিলেন; অন্য অন্য বার লাগত দ্বিগুণ। তবে তিনি দেওয়ার সময় 'সাফ সাফ' বলে রেখেছেন; বাজে কথা নেই তার কাছে; অন্য কিষাণদের মতো তিনি লুকিয়ে কিছু করতে চান না, ষাটের ওজনে নিতে হবে, ফেরত দিতে হবে আশির ওজনে, যা এখানে চলে। এ রেট খাওয়ার জন্য মকাই নিলে। বীজের জন্য নিলে তার রেট আরও বেশি।

এই পোকাড়ে ভুট্টার দানাগুলো বীজের জন্য কেউ নেয়ওনি। এ দিয়ে কেবল খাওয়া চলে।

পয়সার আকালটা এবার কী করে ধানের আকালে বদলে গেল তা কেউ বুঝতে পারেনি। রবির ফসলের পর লাঠির জোরেও এবার বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না, তা সব 'কিষাণই' জানত। তাই এবার বহু জমি অনাবাদী রেখেছিলেন বাবুসাহেব। বিক্রি না করতে পারলে ফসলে লাভ কী। গোলায় আর কত আঁটবে! ফসল যদিই বা বিক্রি হয় তো যা দাম পাওয়া যায় তাতে খরচে পোষায় না।

এই আকালের গপ্পই হয় আজকাল প্রত্যহ, মাঠের সম্মুখের ভজনের আসরে। আষাঢ় মাস শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু ধান রুইবার মতো জল হল কই। ইন্দ্রাসনে আগুন লেগেছে এবার। আমটা ভাল ফললেও না হয় তলা কুড়িয়ে১ কিছু দিন

১ স্থানীয় প্রথানুযায়ী গাছ থেকে পড়া আম যে পায় তার; গাছের মালিকের নয়।

চলত। মেয়েরা যে পূর্ণিমার রাতে জাট-জাট্টিনের গান গাইল[১] ক্ষেতের মধ্যে, তবু বৃষ্টি হল কই? খায় কী লোকে? জাম ফুরিয়েছে; বুনো পেয়ারার 'যাগ' চলছে; ময়নার ফল আর তাল পাকতে এখনও অনেক দেরি। যখন ঢোলার উপর কুদৃষ্টি পড়ে তখন এমনি করেই পড়ে। শীত যেমন গায়ে বেঁধে ছেঁড়া কাঁথার মধ্য দিয়ে। এদিক দিয়ে সামলাতে যাও ওদিক দিয়ে ঢুকবে। পিঁপিড়ের সার মুখে করে ডিম নিয়ে গেলেও জল হয় না আজকাল।

বৃষ্টি না হলে মন শক্ শক্ করে; আবার জল হলে যে কী হবে সে কথা ভাবতেও মন খারাপ হয়ে যায়। বীজের ধানটা পর্যন্ত কারও কাছে ছিল না যে চারা করে। হলেও বিপদ, না হলেও বিপদ। এদিকে বাপে কুত্তা খায়, ওদিকে মায়ের পরান যায়। গল্পটা জানিস তো? বাপ মাংস রাঁধতে বলে গিয়েছে। মা রেঁধে রেখেছে একটা কুকুরের বাচ্চা মেরে। এখন ছেলে যদি বাপকে বলে দেয় একথা তাহলে মায়ের পরাণ যায়, আর না বললে বাপকে কুত্তার মাংস খেতে হয়। এ হয়েছে তাই বুড়হাদাদা!

বুড়হাদাদা অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করে দেখতে চেষ্টা করে, বিল্টাটা আবার ঠাট্টা করছে না তো। যা ফাজিল ছোঁড়াটা! মনে তো হচ্ছে না যে ফাজলামি করছে এখন।

'বুঝলি বিল্‌ট! বাবুসাহেবের এ পাপের পয়সা থাকবে না। এই আমি বলে রাখলাম দেখে নিস। না হলে আমার নামে কুকুর পুষিস। যত ওর আগের জন্মের রোজগার করা পুণ্যি থাকুক না কেন!'

মনের গহীনের একই দুঃখে, ঢোলার সব লোকের মন সাড়া দিয়েছে। তাই বিল্টাকে বিল্‌ট বলে ডাকছে বুড়হাদাদা।

রামচন্দ্রজীর রাজ্যের নিয়মকানুন সব বদলে গেল নাকি?

'অউর করই অপরাধ
কোউ আউর পাব ফল ভোগু'।[২]

একজন দোষ করে, আর একজন তার ফল পায়! আশ্চর্য!

সেই রাতেই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। কলিযুগে লোকের মধ্যে পাপ ঢুকেছে। তাই 'জাট-জাট্টিন'-এর গানের ফল ধরতে একটু দেরি হয়। বৃষ্টির সময় গাঁ-সুদ্ধ সকলে জেগে উঠেছিল। সব বাড়িতেই মেয়ে পুরুষ সকলে বলাবলি করে যে, এ জল এখুনি থেমে যাবে। এ এক আঁজলা জলে আর কী হবে! কেবল কুশের শিকড়গুলো গুণসুচের মতো ডগা ছাড়বে, হাল চালানোর সময় পায়ে বিঁধবার জন্য। তবে ধুলোটা মরবে।

আকাশ ভেঙে জল পড়ছে। সকলে দেখছে যে, ছাঁচতলায় নিচে দিয়ে জলের স্রোত বইছে। তবু কেউ নিজের কাছে, নিজের বাড়ির লোকের কাছে, সত্যি কথাটা বলবে না।

বৃষ্টি থামবার পর সবে গাঁ-খানা একটু ঝিমিয়ে এসেছে। এমন সময় হঠাৎ হট্ট-

---

১ বৃষ্টি না হলে গ্রামের মেয়েরা মিলে কোনো মাঠে রাত্রে জাটজাট্টিনের পালা অভিনয় করে। পুরুষদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের কোনো সম্বন্ধ নেই। গ্রামের পুরুষরা ভাব দেখায় যে তারা এই অভিনয়ের সম্বন্ধে যেন কিছু জানেই না।

২ তুলসীদাস থেকে।

গোল শোনা যায়। দূরে, পশ্চিমের দিক থেকে।

নিশ্চয়ই চোরটোর কিছু হবে! নিজের ঘরে চুরি হবার মতো কোনো জিনিস না থাকলেও সকলেই ছোটে লাঠি, বাঁশ, সজনের ডাল যার হাতের কাছে যা জোটে তাই নিয়ে। বিসকান্ধায় ভাঙা মঠের কল্যাণে ইটপাটকেলের অভাব নেই এ কথা গনোরীর মনে পড়ে, পায়ে ইঁটের ঠোকর খেয়ে। কোঁচর ভরে ইট নেয় সে। আওয়াজটা ততক্ষণে বাবুসাহেবের বাড়ির দিকে পেঁৗছে গিয়েছে।

রাতে বাবুসাহেবের বাড়ির চারিদিকে গান গেয়ে গেয়ে না হয় বাঁশি বাজাতে বাজাতে পাহারা দেয়, একজন বজ্রবাঁটুল সাঁওতাল। তার হাতে থাকে তীরধনুক আর বল্লম। কাছেই সাঁওতালটুলিতে তার বাড়ি। সারাদিন সেখানে ঘুমোয়, আর রাতে বাবুসাহেবের দেওয়া ধেনো খেয়ে ডিউটি দেয়। সেই লোকটা বাবুসাহেবের পশ্চিমের ক্ষেতের দিকে, একটা ছপ্ ছপ্ শব্দ পেয়ে ভেবেছিল বুনোশুয়ার কি নীলগাইটাই হবে। আলের পাশ দিয়ে দিয়ে সে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে গিয়েছিল। তার পর ভাল করে চোখ মুছে নেয়। নিজের হাতের আঙুল তো ঠিকই গুনতে পারছে! ভাগ্যে সে তীর ছোঁড়েনি। তারপর সে চীৎকার করে লোক জাগিয়েছিল।

কোয়েরীটোলার দল বাবুসাহেবের বাড়ি পেঁৗছে দেখে তাজ্জব ব্যাপার! বাবু-সাহেবের ছেলে অনোখীবাবু খড়ম দিয়ে পিটছে বুড়হাদাদাকে। পাশে রাখা রয়েছে এক বোঝা ধানের চারা। বুড়হাদাদা কাঁদছে আর মাথা কুটছে অনোখীবাবুর পায়ে। 'আর কখনও এ কাজ করব না ছোটামালিক।'

সাঁওতালটা বলে, 'বাঁশি থামলেই উপর থেকে বাবুসাহেব যে চিৎকার করে, আমি ঢুলছি বলে। দেখো, আমি জেগে থাকি কিনা।'

তারপরটা সাঁওতালটা এগিয়ে আসে, কোয়েরীটোলার লোকদের কাছে, সারা ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। বুঝোবার দরকার ছিল না।

সাঁওতালটা হেসেই কুটিকুটি। ছোট মালিককে নিচে থেকে ডেকেছে, ঘুম ভাঙানোর জন্য। ঘুম কি ভাঙে! ভাং-এর ঘুম! বৃষ্টির পর! ঘুম ভাঙলে পর আমার উপর রেগে টং। আমি যেন কালো গাইটার বাছুর হচ্ছে বলে ডাকছি।

টোলার লোকদের উপর নজর পড়ায়, হঠাৎ বুড়হাদাদার কান্না থেমে যায়। লজ্জায় সে এদিকে তাকাতে পারে না।

অনোখীবাবুর নজর পড়ে এই দিকে। 'ভাগো ভাগো শালা সব। চোট্টার দল। চোরকে সাহায্য করতে এসেছে। মাঝি১! এ লোকটাকে ধরে রেখে দাও আজ। সকালে ওটাকে হাজতে পাঠাব।'

বুড়হাদাদা আবার হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

## মধুবনের শান্তিভঙ্গ

বাবুসাহেবের বাড়ি থেকে, কোয়েরীটোলার সকলে এসে বসে বিল্টার বাড়ির সম্মুখের মাচায়। কাজটা বুড়হাদাদা করেছে অন্যায়! চুরি করা কি ভাল মানুষের কাজ? ছি ছি! এ কি দুর্মতি হয়েছিল বুড়োর। তিনদিন পরে মরবি, এখনও কি 'পরমাৎমা'কে ভয় করে না? অভাব তোর বুঝলাম। সে তো সবারই আছে। কিন্তু বেশি খিদে পেলে কি লোকে দু হাত দিয়ে ভাত খায় নাকি? অসম্ভব কান্ড!

কিন্তু বুড়হাদাদার এই বিপদের সময় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন তো যায় না। একটা

১ এখানে সাঁওতালদের মাঝি বলে সকলে ডাকে।

কিছু করতে হয়। তবু তো এখনও বাবুসাহেব ওঠেননি। রাত থাকতেই ওঠেন বাবুসাহেব। খবর তো রাখিস ছাই। কেবল বাজে ফট্‌ফট্‌ করিস তুই গনৌরী। এতক্ষণে বাবুসাহেব উঠে 'ধ্যানে বসেছে।'

লছমনিয়ার নানী বাবুসাহেবের বাড়িতে কাজ করে। সে বলে যে 'ধিয়ান' করবার সময় বাবুসাহেবের ঘরে একেবারে হাওয়াগাড়ির মতো শব্দ হয়। তারপর গলার মধ্যে দিয়ে তিনি দড়ি ঢুকোন পেটে। বাবুসাহেবের 'ঘরবালী' বলেছেন যে, এ করলে জোয়ানী ফিরে আসে; বুড়োরও আবার দাঁত গজায়। তারপর তিনি রাখালদের ডেকে দেন, মোষ চরাতে নিয়ে যাবার জন্য।

অনোখীবাবুই তো খড়মের সঙ্গে বুড়হাদাদার মাথার চুল তুলে নিয়েছে। দেখো আবার বাবুসাহেব কী করে। গুড়ের মাছি না চুষে ফেলে ও চামারটা। লচুয়া চৌকিদারকে ছেড়ে কথা বলে না, ও আবার ছাড়বে বুড়হাদাদাকে! এ কথাটা থানায় গিয়ে বলবার পর্যন্ত হিম্মৎ হয়নি হাড়ীর বেটার, আর ঘোড়ায় চড়বার শখ আছে!

বড় নিরীহ লোকটা বুড়হাদাদা!

হ্যাঁ, তা লচুয়া হাড়ীর কথাই যদি তুললি তবে বলি। তার কাছ থেকেই শুনেছি যে, থানায় আজকাল বাবুসাহেবের 'টিয়াপাখি' কথা বলে না।[১] সে-ই বলেছে যে, দারোগাসাহেব আর বাবুসাহেবের দিকে হতেই পারে না। 'মোটারকম' পান খাওয়ালেও না। বাবুসাহেব কাছারীতে মোকদ্দমা লড়ে দারোগা সাহেবের হাত থেকে গরুরগাড়ি ছাড়িয়ে এনেছে।

তাই দারোগাসাহেব বেইজ্জত হয়েছে উপরওয়ালাদের কাছে।

দেখিসনি সেদিন বিল্টা, সেই যে হাকিমের হাওয়াগাড়ি খারাপ হয়েছিল পাক্কীর উপর, গাঁয়ে লোক ডাকতে এল, গিধর মন্ডলের দাওয়ায় উপর খাটিয়াতে বসল; কিন্তু বাবুসাহেবের বাড়ির চৌহদ্দি মাড়াল না। ঠিকই বলে লচুয়া চৌকিদার। কলস্টর হাকিমরা এখন সবাই বাবুসাহেবের বিরুদ্ধে ওর ছেলে লাডলীবাবু মহাৎমাজীতে নাম লিখিয়েছে বলে।

দারোগাসাহেব হাতের লোক না হলে কি কেউ সাধ করে থানার হাতায় ঢোকে। এ দারোগা যতদিন বদলি না হচ্ছে ততদিন বাবুসাহেবেরা থানার পথ মাড়াবে না; এই আমি মাটিতে লোহার দাগ কেটে বলে রাখলাম।

সকলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। যাক, বুড়হাদাদাকে তাহলে সরকারের খিচুড়ি খেতে হবে না। দু-চার ঘা মারের উপর দিয়েই যাবে।

এতক্ষণে সবাই অস্পষ্টভাবে বোঝে যে, যদিও তারা এখানে বসেছিল বুড়হাদাদার ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে, মনের তলায় গোপনে আনাগোনা করছিল অন্য জিনিস। মুখে বলেছে বটে, রামচন্দ্রজী বুড়হাদাদাকে ধরা পড়িয়ে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন বলছেন, ভেবো না যে আমি ঘুমচ্ছি। অভ্যাসের বশে বলেছে এ কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে যে, কথাটার মধ্যে কোথাও একটি অসংগতি আছে। 'মনের মাখন গলানো' কথা, আর ময়নার কথার তফাৎ শুনলেই বোঝা যায়। সেই জন্যই না এক-একজনের পণ্ডিতজীর রামায়ণ পাঠ শুনলেই চোখে জল আসে, আর এক-একজনের শুনলে আসে ঢুলুনি।

ভিজে মাটির গন্ধে কারও মনকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না। কেউ কথাটা তুললে

১ দিন গিয়েছে।

আর সকলে বাঁচে। সকলেরই মনে পড়ছে নিজের অক্ষমতার কথা, দুরদৃষ্টের কথা। ইচ্ছা করে নিজের জমিটা একবার দেখে আসি এই রাত্রেই। কিন্তু তারপর? বুড়হাদাদার ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু মনের ভিতরের প্রশ্নের কি কোনো জবাবই নেই? অমন মিষ্টি গন্ধভরা ভিজে ক্ষেত কি অমনিই থেকে যাবে রামচন্দ্রজী? নিজেদের কাছেও যে কথা বলা না যায়, সে কথা বলা যায় তাঁর কাছে।

ভোরের আলোয় দেখা যায় যে এতগুলো চোখের আয়নাতে ভিজে ক্ষেতে ছোপ পড়েছে।

কেশে গলা সাফ করে নেয় ঢোঁড়াই। নিজের কথাগুলোর ওজন বাড়ানোর জন্য উবু হয়ে বসে।

দারোগা, হাকিম, চৌকিদার যখন বাবুসায়েবের খেলাপে, তখন আর ভয়ের কী আছে?

এ আবার কী বলে ঢোঁড়াইটা? ভাবলাম বুঝি কাজের কথা পাড়বে, যে কথাটা মনের মধ্যে কিরকির করছে সকলের, বৃষ্টির পর থেকে। এ বোধ হয় আরম্ভ করল আবার বুড়হাদাদার কথা নতুন করে। বুড়হাদাদা ওকে একটু ভালবাসে কিনা তাই। বুড়হাদাদার একটানা বাজে গল্প, যে বসে শোনে তাকেই বুড়ো ভালবাসে।…না, ঢোঁড়াইটার চোখে মুখে যে একটা হাসির ঝলক দেখছি; দুষ্টুমিভরা হাসির! একটা কিছু মতলব নিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই কথা। আরে বলবি তো পরিষ্কার করেই বল না কথাটা। পেয়েছিস দু-দুটো মোসম্মতকে হাতের মধ্যে, নিজের বলতে কিছু নেই এখানে, তোর এখন হাসি আসবে না তো কার আসবে? হাজার হলেও পরদেশী লোক। গাঁয়ের লোকের জন্য মনের ভিতর থেকে দরদ আসবে কেমন করে! মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল বলে এখন। আমরা এর মধ্যে আর হাসিমশকরা করিস না রে ঢোঁড়াই। ওসব করিস গিয়ে তোর মলহরিয়াতে, বুঝেছিস ছোঁড়া। সব জিনিসেরই একটা সময় আছে। 'খিরা, সবেরে হীরা'১। শশাটা পর্যন্ত খাওয়ার সময় আছে।

ঢোঁড়াই চটে যায়, 'আরে, আরে আমার কথাটা শুনবি তো আগে! তারপর না বলবি। পরদেশী লোকের কথা শুনলেও কি কানে পোকা পড়বে? সবাই মিলে দল বেঁধে চল বাবুসাহেবের ওখানে।'

তারপর ঢোঁড়াই পরিষ্কার করে গুছিয়ে নিজের কথাটা বলে সকলের কাছে।

'…কেবল মুখের কথায় মালপোয়া ভাজলে কিছু হবে না'; এই বলে ঢোঁড়াই নিজের কথা শেষ করে।

দুই-একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা যায়। 'বন্দুকটাই না হয় সরকার দিনকয়েক আগে কেড়ে নিয়েছে। তাহলেও বাবুসাহেব বাবুসাহেবই। দারোগার হাত থেকে গাড়ি বলদ ছিনিয়ে আনবার হিম্মৎ রাখে এখনও। থাকবে না? অ্যাসেসর যে ও'!

রেগে গজগজ করে ঢোঁড়াই; এবার থেকে রোজ জল হবে দেখিস। জলভরা ক্ষেতের ধারে বসে বসে তোরা দাদ চুলকুবি নাকি? আর রামজী এসে তোদের বাল-বাচ্চার মুখে দলা গুঁজে দিয়ে যাবেন?

'বেঁটে সাঁওতালটা কিন্তু মারকুটে মোষের মতো তাড়া করে আসবে তীরধনুক নিয়ে।'

'আরে না না, ওটা তো সূর্যি উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ডিউটি সেরে বাড়ি চলে যায়।'

---

১ শশা সকালে হীরা।

শেষ পর্যন্ত যেন এই সাঁওতালটার বাড়ি যাওয়ার উপর তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ভর করছিল। তবু কি বুকের টিপটিপুনি থামে? বোধ হয় সেটাকে ভুলবার জন্যই সকলে বিল্টার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে চেঁচায়, 'বজরংবলী মহাবীরজী-কি জয়!'

ভোরের আলোর আগুন লেগেছে তখন বিসকান্ধার আকাশে, মঠের উপরের বটগাছে, ঢোঁড়াইদের চোখে।···

বাবুসাহেব ধানের চারা চুরির ব্যাপারটা রাতেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই সময় তাই নিয়ে চেঁচামেচি করেননি। বাড়ির কর্তার কথার ওজন থাকা চাই। সময় নেই অসময় নেই যখন তখন হাঁ-হাঁ করে উঠলে. 'কিছু মানে লাগায় না'[১] সে লোকের। ভোরে দাঁতন করবার পর সবে গলার মধ্যে ফিতেটা ঢুকিয়েছেন, হঠাৎ কানে আসে, 'মহাবীরজী-কি জয়'-এর আওয়াজটা। কেমন কেমন যেন লাগল। আজ কোনো পরব তো নেই। মঠে আবার ব্যাটারা কুস্তির আখড়া খুলল নাকি? ছেলে-ছোকরারা তো বোঝে না, তর্ক করতে আসে। ইস্কুল আর কুস্তির আখড়া; দুটোই সংস্কার বিগড়োবার যম। তাইতো ছেলেদের বলি যে, ঠেকে শিখবি তোরা। বিনা পুজোয়, মহবীরজীর জয় দেওয়া রড় কুলক্ষণ! চেঁচামেচি এই দিকেই আসছে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝে নেন যে কোয়েরীটোলার লোকেরা, চোট্টাটাকে ছাড়াবার দরবার করতে আসছে। এগুলোকে রামজী সুমতি দেন না কেন? তাঁর রাজ্যে তো চুরি ছিল না। ছেলেগুলো হয়েছে অপদার্থ। একদিন মাত্র বড়টাকে লাঠি তুলতে দেখেছিলাম। তাও দেখি সরু দিকটা নিয়েছে হাতের মুঠোর মধ্যে। এ কি কোদাল পাড়া নাকি? এখনও ঘুম ভাঙেনি। বৃষ্টির পরদিন কোথায় তাড়াতাড়ি উঠে ক্ষেত দেখতে যাবে. ধান রোপার ব্যবস্থা করবে, তা নয় এখনও ঘুমুচ্ছে। দেখি কত ঘুমুতে পারে।···আমি কিছুতেই ডেকে তুলছি না।

বাবুসাহেবের বাড়ির কাছাকাছি এসে ঢোঁড়াইদের দলের উৎসাহ একটু মিইয়ে আসে। দুই-একজনের নিমের দাঁতন পাড়বার কথা মনে পড়ে। যাদের আঁছলা জোটে না তারাও পিছনে থাকতে চায়। পরদেশী লোকের কত সুবিধা! না বাবুসাহেবের জমির আধিয়াদারি করে, না কর্জ খায়, না লাঠিরযুগের জোয়ান বাবুসাহেবের খবর রাখে!'

'বাচ্চন সিং কোথায়? আমরা 'ভেট' করতে চাই তাঁর সঙ্গে।'

'বাবুসাহেবেয় সঙ্গে? কেন? দরকার থাকে তো ছোটামালিক এলে তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করিস।'

আরে বচ্চন সিংই সব—অনোখীবাবুকে সামনে রেখে, সেই তো সব কাজ চালায়।

বাবুসাহেবের কান খাড়া হয়ে ওঠে। তাঁর দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে বলছে বচ্চন সিং! কোনো বুড়ো গলা বলে তো মনে হল না।

তিনি সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর সম্মুখে কোয়েরীটোলার লোকদের এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। ডান পা দিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে জড়িয়ে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ানো জমিদারের সম্মুখে, এটা কেবল এ গাঁয়ের রেওয়াজ নয়, এ মুল্লুকের।

অবাক হয়ে যান বাবুসাহেব। আরও অবাক হয়ে যান নিজের সহিষ্ণুতা দেখে।

'হুজর, আমরা এসেছিলাম একটা নিবেদন করতে কোয়েরীটোলা থেকে।'

---

১ গ্রাহ্য করেনা।

বাবুসাহেবের ইচ্ছা হয় যে বলেন, 'আমার কাছে আবার কেন?' কিন্তু এরা যে জানে, বচ্চন সিং অনোখীবাবুকে সম্মুখে রেখে নিজেই কাজ চালায়। তাঁর মনে হয় এ কথাটা খানিক আগে পর্যন্ত এত পরিষ্কার করে জানতেন না। ধরা পড়ে গিয়েছেন তিনি এদের কাছে।

ঢোঁড়াই মনে মনে তৈরি হবার সময় পেয়েছে অনেকক্ষণ। সত্যিই পরদেশী হওয়ার লাভ আছে। হারলে পরোয়া নেই, গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হলেও পরোয়া নেই। যেখানেই তার শিকড় ছিল, সেখানেই বলে যে 'পঞ্চ'দের সঙ্গে টক্কর দিতে পেছপা হয়নি. তার আবার এখানে সে ভয় পাবে। সেখানে সে হার মেনেছিল জাতের মাথাদের কাছে নয়, সে হার মেনেছিল নিজের মনের একটা দুর্বলতার কাছে। তা নইলে ঢোঁড়াই কখনো কারও কাছে ছোট হয়?

আর যখন সে জানে যে সে রামজীর কাছে কোনো পাপ করছে না, অন্যায় করছে না। দারোগা হাকিমকে সে এখনও ভয় করে। বাবুসাহেব দারোগা, হাকিমের কাছে আজকাল আর যেতে পারবে না, এটা না জানলে, তার মনের জোর এখন এতটা থাকত কিনা বলা শক্ত।

বাবুসাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'এই চোট্টাটাকে ছাড়ানোর দরবার করতে এসেছিস নাকি?'

'না হুজুর, আমরা এসেছি ধান নিতে।'

'ধান? তুই আবার ধানের 'বালিস্টর'১ হলি কবে থেকে? তুই তো মোসম্মতের ওখানে চাকরি করিস।'

ঢোঁড়াই এ কথার কোনো জবাব দিতে পারে না। জবাব দেয় বিলটা। 'হুজুরই মা-বাপ। হুজুরের জুতোর বোঝা মাথায় করে আমাদের দিন চলে। ধান আমাদের আজ চাই-ই ক্ষেতের জন্য।

বাবুসাহেবের মতো লোকও হকচকিয়ে যান, বিলটার গলার স্বরের দৃঢ়তা দেখে। তাতে প্রার্থনার লেশমাত্র নেই। লোক ডাকাতে পারেন তিনি এখনই, কিন্তু তাতে কি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা হবে না। নিজের লোকই বা ক'জন। সব চলে গিয়েছে ক্ষেতে। রাখালগুলো এখনও মোষ চরিয়ে ফেরেনি। অনোখীবাবু ঘুমুচ্ছে। তিনি এরকম গলার স্বর কোয়েরীদের মুখ থেকে কখনও শোনেননি। সত্যি করে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন তিনি। নইলে এই সামান্য ব্যাপারে কোনো একটা হুকুম দেওয়ার আগে, এত সাত-পাঁচ কথা মনে আসবে কেন?

বাবুসাহেবের কথার জবাবটা সময়মতো মনে জুগোয়নি। নিজের উপর রাগ হয় ঢোঁড়াইয়ের।

ঢোঁড়াইরা গোলার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে আমরা গোলা থেকে মেপে ধান বার করে নিচ্ছি। এক ছটাক ধানও এদিক ওদিক হবে না। সকলের নাম লিখে রাখুন গোমস্তাজী। সকলে টিপসই করে দেবে। ধামা আছে আপনাদের? আপনিই গুনে দেন গোমস্তাজী। এক এক করে। সকলে একসঙ্গে ভিড় কোরো না।

বাবুসাহেবকে আর বেশি ভাববার ফুরসত দেয়নি। রাগে বাবুসাহেবের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করে। হতভাগা লাডলীটা গঞ্জের বাজারে কাপড়ের দোকানের সম্মুখে মহাৎমাজীর হল্লা না করলে আজ এ হতে পারত না। এতক্ষণে এখানে বন্দুক চলে যেত, তারপর ঘোড়াতে চড়ে বাবুসাহেব নিজে যেতেন থানায়। নিজের

১ ব্যারিস্টার।

লাঠির উপর তিনি আর ভরসা পান না। তবু তাঁর একটা সম্ভ্রম আছে গাঁয়ে। ছোট যা হবার তা হয়েছেন।

'গোলার টোপরটা খুলে উপর থেকে নে ধান। রাতে জল পড়ছে ধানে, পুরনো টোপরটার মধ্যে দিয়ে। ওটাকে নামিয়ে রাখিস, মেরামত করতে হবে। ধানগুলো একটু রোদবাতাসও পাক।'

একটা উদারতার খোলস পরিয়ে বাবুসাহেব নিজের সম্মানটুকু বাঁচিয়ে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি বোঝেন যে কথাগুলোয় কাজ কিছু হল না। ব্যাটারা বোঝে সব। থাকে অমনি চুপ করে! তবু মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করতে হয়।

চোখের সামনে এই ধান ওজন তিনি আর দেখতে পারেন না।

'গোমস্তাজী, তুমি লিখে রাখো সবার নাম।' এই বলে বাবুসাহেব গোয়ালঘরের দিকে চলে যান। ধান দেওয়া-নেওয়ার মতো তুচ্ছ মামুলি ব্যাপারে মাথা ঘামানোর তাঁর সময় নেই, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে যান।

গোয়ালঘরে গিয়েও নিস্তার নেই। সেখানেও মূর্তিমানরা গিয়ে হাজির। 'কী আবার?' যতদূর সম্ভব কড়াভাবে বাবুসাহেব জিজ্ঞাসা করেন। বলতে চেয়েছিলেন কত জোরে! কী রকম আস্তে হয়ে গেল!

'ধানের কিছু চারাও চাই হুজুর সকলের।' এবারে ঢোঁড়াই জবাবটা সব ঠিক করে রেখেছে। বলুক আবার বাবুসাহেব 'ব্যালিস্টর' তাকে।

'আমার নিজের ক্ষেতে পুঁতবার জন্যও কিছু রাখিস তা বলে।' লচুয়া চৌকিদারটাও অন্তত আজ যদি তাঁর মধ্যে থাকত! এ কথাটুকু ভেবেও বাবুসাহেব একটু সান্ত্বনা পান মনে। বার্ধক্যের জন্য তাহলে তাঁর আজকের এই দুর্বলতা নয়; ও একটু ভুল সন্দেহ হয়েছিল তাঁর মানে। রাজপুত কেবল যে লাঠি চালাতে জানে তা নয়। দরকার হলে 'ভুমিহারী চাল'১ সেও দেখাতে পারে। টিপ-সইগুলো নিল তো গোমস্তাজী ঠিক করে।

পড়া দাঁতের ফাঁকটায় বাবুসাহেবের জিভটা কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

## বাবুসাহেবের কটক সঞ্চারণ

এর পর থেকে কোয়েরীদের সঙ্গে বাবুসাহেবের লড়াইটা জমল বেশ ভাল করে। এত বড় আস্পর্ধা! রাজপুতদের বাড়ির বাসন মেজে যাদের সাতগুষ্টির জন্ম গেল, তারা শাসায় বাবুসাহেবকে। চুরি করে আবার চোখ রাঙায়। গোমস্তাজীর উপর হুকুম চালায়! এ বরদাস্ত করবার পাত্র বচ্চন সিংকে পাওনি। স্নানের পর বাবুসাহেবের তিলক কাটবার তর সয় না। আঁচানোর পর হাতের উলটো পিঠ দিয়ে সাদা গোঁফ জোড়াকে সাজিয়ে নিতে ভুল হয়ে যায়। সাবেককালের মতো বৈঠকখানার বারান্দায় এসে তিনি আবার বসতে আরম্ভ করেন।

এ হল কী কালে কালে! ইংরাজের রাজত্ব আবার চলে গেল নাকি, মহাৎমাজীর দু ফোঁটা নুনের ছিটেতেই! অনোখীবাবুর ঘুম ভাঙেনি নাকি এখনও?

'যা শিগগির ছোট মালিককে ডেকে নিয়ে আয়।'

গোমস্তাজী তটস্থ হয়ে ওঠে। বাবুসাহেবের এ চেহারা তার অপরিচিত নয়।

---

১ ভুমিহার ব্রাহ্মণদের এ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কুটিল বলে অখ্যাতি আছে। (শব্দার্থ) ভুমিহার ব্রাহ্মণদের কূটনীতি।

এখনই তিনি বার করতে বলবেন, পুরনো আঙুলের ছাপ দেওয়া কাগজগুলো। একটার পর একটা উদ্ভট ফরমাস আরম্ভ হয়ে যাবে। বুড়ো হয়ে মেজাজটা আগের চাইতেও খিটখিটে হয়ে উঠেছে।

পুরনোগুলো নয়। বাবুসাহেব ধানের দরুন নেওয়া আঙুলের ছাপগুলো দেখতে চান। দাগগুলো ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া লাগছে।

'গোমস্তাজী, সব কাজে তোমার হুড়বড় হুড়বড় !'

আবার কী হল ! গোমস্তাজী মাথা চুলকোয়।

'ও ! না !'

কাগজটা দূরে ধরলে দাগটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কথাটা জোরে বলে তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। সুচে সুতো পরাতে তিনি নিশ্চয়ই পারেন এখনও। বহুকাল পরে কাগজে হাত দিয়েছেন কিনা !

'গোমস্তাজী, রাখালরা ফিরেছে ?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ইশারাই যথেষ্ট। গোমস্তাজী আঙুলের ছাপ দেওয়া কাগজগুলি নিয়ে যায় যেখানে মোষগুলো বাঁধা থাকে খুঁটিতে, অধিকাংশের গায়ের কাদাই এখনও শুকোয়নি। একটা শুকনো গোছের গা দেখে গোমস্তাজী সেইটার উপর ঘষে, একটু ময়লা ময়লা করে নেয় কাগজগুলোকে। বাবুসাহেবকে আর সে কথা খরচ করবার তকলিফ দেবে না। কাগজগুলোয় আর কী লিখবে সেইটা খালি একবার জিজ্ঞাসা করে নেবে। বাস্! আর কিছু না ! এতদিন ধরে বাবুসাহেবের খিদমৎ করেছে সে। বাকি সব কাজ তার জানা। কাজও তো ভারি ! চিনিগোলা জল খানিক খানিক কাগজগুলোর উপর এখানে-সেখানে লাগিয়ে দেওয়া। তারপর পিঁপড়ে গেলে, বাঁশের চোঙার মধ্যে ভরে গুঁজে রেখে দিতে হবে রান্নাঘরের বাতায়। ভুসির মধ্যে রাখার চাইতে এতে জিনিসটা হয় অনেক ভাল।

গোমস্তাজী আবার যখন বৈঠকখানায় ফিরে এল, তখন বাবুসাহেব অনোখীবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। ছোট মালিক আবার দেখছি বাবুসাহেবের সামনে তক্তপোশের উপর বসেছে। বয়স তো হল। চুল পাকবে দুদিন পরে। এখনও বসবে না।

'এস গোমস্তাজী, তুমিও শোন।'

'অনোখীবাবু, আপনি চলে যান জিরানিয়ায়। অনিরুদ্ধ মোক্তারের সঙ্গে সলা করে জোতের কোয়েরী 'রায়ত'গুলোর উপর বাকি খাজনার নালিশ ঠুকে আসুন। কটাই বা 'রায়ত' হবে। অধিকাংশ কোয়েরীই তো 'দররৈয়ত আধিয়াদার।'১ যেখানে পারেন এইগুলোর জায়গায় সাঁওতালটুলির লোকদের ঢোকান। ঐ যে নতুন লোকটা ঢোঁড়াই না কী নাম, ওটা ফেরারী-টেরারী নয়তো ? বাড়ি যাওয়ার নাম করে না এক দিনও। এটাই বোধ হয় উসকানি দিচ্ছে সকলকে। মোসম্মত যে রায়ত রাজপার-ভাঙার। আমার হলে না হয় একটু চাপ দিলেই লোকটাকে সরিয়ে দিত। এ সম্বন্ধে অনোখীবাবু আপনি একবার রাজপারভাঙার তশীলদারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। গোমস্তাজী, আপনিও যাবেন।' বাবুসাহেব জানেন যে, গোমস্তাজী সঙ্গে না থাকলে, এসব কাজের থই পাবেন না অনোখীবাবু।

---

১ রায়তের অধীনে ভাগচাষী। জোতদারের অধীনে ভাগচাষী হলে কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়।

এতক্ষণে গোমস্তাজী কথা বলবার সাহস পান। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাউণ্ডকীপার ইনসান আলি হাতের লোক। বাবুসাহেবের টাকা দিয়েই সে খোঁয়াড় নিয়েছে, নিলামে ডেকে। 'মোসম্মতের ক্ষেতে গরুমোষ রাতে ছাড়লেই তিন দিনের মধ্যে কাবু হয়ে যাবে। হুকুর, ঝোলাগুড় দিয়েই যদি মাছি মরে, তবে বিষ দেওয়ার দরকার কী।'

বাবুসাহেব তাড়া দিয়ে ওঠেন গোমস্তাজীকে। কেবল কথা! যা দরকার বুঝবে করবে। তা নিয়ে এত কথা কিসের?

কোয়েরীরা রাজপুত বচ্চন সিংকে 'চুনৌতি'১ দিয়েছে। বড় বাড় বেড়েছে কোয়েরীগুলোর! গাঁয়ের অন্য রাজপুতরা সকলেই এই ব্যাপারে বাবুসাহেবকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তাই ছোট মালিক পরের দিন থেকে ভাঙের শরবতের ভাঁটি খুলে দিতে আরম্ভ করেন প্রত্যহ সন্ধ্যায়। শরবতের লোটা তাদের দিকে ঠেলে দিয়ে ছোট মালিক তাদের হেসে আপ্যায়িত করেন। 'জাতবেরাদারদের খোঁজখবর নিয়মিত নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর চিরদিনই; রাজপুতই রাজপুতের গতি তা সে চান্দেলাই হোক, আর বুন্দেলাই হোক; আর কিছু না হোক, ভালবাসা বলে একটা জিনিসও তো আছে পৃথিবীতে। হে-হে-হে।'

যারা বীরাসন হয়ে বসতে ভুলে গিয়েছিল তারাও ভুলটা শুধরে নেয়।

'যবে থেকে পৈতে নিয়ে ছত্রি হয়েছে, তবে থেকে তেল বেড়েছে হারামজাদা কোয়েরীগুলোর।'

'তেল বলে তেল।'

'বুঝলেন ছোটামালিক, ছোটলোকদের মাথায় চড়িয়েছে লাডলীবাবুরা। 'নুনিয়া'রা মাথায় টুপি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'ভালা আদমী'দের২ সম্মুখে।'

'আরে নুনিয়ার কথা ছেড়ে দে গজাধর সিং। জেলে মুচি চামারেরা ছোঁয়া কি আর খাচ্ছে না লাডলীবাবু।'

'হ্যাঁ, তোর তো জেলের সব হালতই জানা আছে লছমপৎ সিং।'

লছমপৎ সিং একবার ঘোড়া চুরি করে জেলে গিয়েছিল। 'বাপের বেটা হোস তো চলে আয়' বলে লছমপৎ সিং গজাধরের গলার টুঁটি চেপে ধরে।

সকলে মিলে তাদের ছাড়িয়ে দিলে দুজনেই বলে যে, বাবুসাহেবের বাড়িতে না হলে আজ একটা কান্ড হয়ে যেত এখানে।

'আর কিছু না থাকুক 'মোহব্বত'৩ বলেও তো একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে।'

কোনার দিককার কার যেন নেশাটা জমে এসেছে। সে বলে, 'তোরা কি আর পারবি কোয়েরীদের সঙ্গে লড়তে। ওগুলো এঁটো ধোয়ার সেপাই।'

'এক হাতে থালার ঢাল আর এক হাতে ঝাঁটার তরোয়াল দিয়ে বসিয়ে দেন ওদের একটাকে আপনার বদমাশ ঘোড়াটার পিঠে। তারপর ছোট মালিক চাবুক মারুন ঘোড়াটাকে সপাসপ।'

ভাঙের উপর এই সূক্ষ্ম রাজপুতী রসিকতার দমকে ঘরসুদ্ধ সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

---

১ Challenge : যুদ্ধে আহ্বান।

২ নুনিয়ারা মাটি কাটার কাজ করে। আগে এরা মাটি থেকে সোরা বার করার কাজ করত। গ্রামে ভাল আদমী অর্থাৎ 'ভালো লোক'-এর অর্থে বড়লোক।

৩ ভালবাসা, টান।

'বুঝলেন, অনোখীবাবু, মেয়েমানুষ বুকে টানে সুখের সময়, আর জাতে বুকে টেনে নেয় বিপদের সময়।'

'তা তো বটেই! 'মোহব্বত' বলেও তো একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে।'

## ঢোঁড়াইয়ের অমৃত ফল লাভ

কোয়েরীরাও বসে থাকে না। রাজপুতদের মাটিতে কাটা লোহার দাগ মুছে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াইয়ে।১ কিছুদিনের মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়ার আরম্ভ সে কথা সকলে ভুলে যায়। আর কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা জানেন কেবল মহাবীরজী। কিন্তু ঘটনার স্রোতের প্রতিটি ঢেউ নেওয়া চাই কোয়েরীটোলার প্রতিটি লোকের।

বাধা না পেলে ঢোঁড়াইয়ের আসল রূপ খোলে না। তাই কী করে যে সে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না; বুঝতে চেষ্টাও করেনি বোধ হয়। এই টক্কর দেওয়ার সাধ বড় মিঠে। মধুর মতো। মাছি জড়িয়ে পড়বে জেনেও তাতেই বসে।

যে রায়তগুলোর উপর বাকি খাজনার নালিশ করেছে বাবুসাহেব. সেগুলো হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায় এখানে-ওখানে। পাশের গাঁয়ের রামনেওয়াজ মুন্সি জিরানিয়ার কাছারীতে মুহুরিগিরি করে। এক রবিবারে কোয়েরীর দলের সঙ্গে ঢোঁড়াই মুন্সিজীর দুয়োরে ধরনা দেয়। আশপাশের গাঁয়ের বহু লোক তার আগেই সেখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে।

'ভারি চোখা বুদ্ধির লোক মুন্সিজী। বালিস্টরকেও হারিয়ে দেয়; নইলে কি আর চশমা পরবার হক পেয়েছে মাঙনা।'

বিল্টা কনুই দিয়ে খোঁচা দেয় ঢোঁড়াইকে—'ঐ শোন না কী বলছে।'

রামনেওয়াজ মুন্সি তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে নির্লিপ্তভাবে বলে চলেছে।—'সেবার যুদ্ধের সময় জিরানিয়ায় টুরমনের তামাসা২ হয়েছিল না? সেই সময় অনেক টাকা উঠেছিল। তাই দিয়ে কমিটি কিনেছিল 'বার'-এর কাগজ৩। সেই টাকা সুধে আসলে সাত লাখ হয়েছিল। কলস্টর সাহেব অংরেজের বাচ্চা। বললে যে এই টাকা দিয়ে জিরানিয়া জেলার চাষবাসের উন্নতি করাত হবে 'ফারম'৪ খুলে। জিরানিয়ার পুরুবে ঐ বকরহাট্টার মাঠ আছে না, সেই মাঠ কেনা হয়েছে এ টাকা দিয়ে। তারই খেলাপে বিজনবাবু ওকিল তাৎমাটুলির পাবলিকের তরফ থেকে আর্জি লিখে দিয়েছিল। বিজনবাবু বলে যে, এটা পাবলিকের গরু চরাবার জায়গা চিরকাল থেকে। পাবলিক নিমক তৈরি করেছিল মরণাধারের কাছে। অনিরুধ মোক্তার আর্জি দেখেই তো ঢোক গিলে, টাক চুলকে অস্থির। তখন ডাক পড়ল রামনেওয়াজ মুন্সির। সার্ভে খতিয়ান মক্কেলের দিকে, শিমুলগাছ কাটার সাক্ষী রয়েছে হাতে; দিলাম জবাব হেনে ঠুকে। পাটনার 'হাইকোর্ট' পর্যন্ত বাহাল থেকে গেল, আমার লেখা জবাব। এই তো গত হপ্তায় এসেছি পাটনা থেকে। খালি বিজন ওকিল কেন, হাইকোর্টের হাসান ইমান বলিস্টর পর্যন্ত 'প্যুটুর প্যুটুর' তাকাতে থেকে গিয়েছিল।'…

---

১ লোহার দাগ মোছার অর্থ, to accept challenge।

২ District War Tournament ১৯১৭ সালে জিরানিয়ায় হয়েছিল।

৩ বার—ওয়ার লোন।

৪ Agricultural Demonstration Farm।

কোয়েরীটোলার দল ভারি দেখে মুন্সিজী চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে নেয়। কান থেকে কলমটা নিয়ে খশখশ করে একটা হিসাব লিখে দেয়, বাবুসাহেবের সঙ্গে মোকদ্দমা করবার খরচের। প্রথম দিনই লাগবে ছাব্বিশ টাকা। লম্বা তারিখ চাও তো আরও চার টাকা বেশি।···না না, এক পয়সা কম হবে না। রামনেওয়াজ মুন্সির কাছে দরদস্তুর নেই। ঐ এক কথা। সস্তার কাজ চাও, জেলায় অনেক উকিল-মোক্তার আছে। রামনেওয়াজ মুন্সির কাছে কেন? তোমরা খরচ করতে না পার, বাবুসাহেব লুফে নেবে রামনেওয়াজ মুন্সিকে! তোমরাও যেমন পার্বলিক, বাবুসাহেবও সেই রকম পার্বলিকের বাইরে নয়।

ঢোঁড়াইয়ের মন চায়, মুন্সিজী বকরহাট্টার মাঠের, তাৎমাটুলির কথা আরও বলুক। কিন্তু আর কি বলবে মুন্সিজী! লোকটা আর একটু কম বুদ্ধিমান হলেই ছিল ভাল। তাহলে হয়তো বিজন ওকিল বকরহাট্টার মাঠটাকে বাঁচিয়ে নিতে পারত হাইকোর্টে।···

গাঁয়ে ফিরে এসে টাকার যোগাড় আর হয় না। যাদের নামে মোকদ্দমা নেই তারা কেন পয়সা খরচ করবে। এ কি বিদেশিয়া'র গান, না 'ছক্করবাজি' নাচ। এ টোলার পঞ্চায়তের মোড়ল গিধর মণ্ডল। ঝাড়ু মার! ঝাড়ু মার! ও যাবে বাবুসাহেবের বিরুদ্ধে তাহলে আর আমরা গোড়া ছেড়ে, পাতায় জল দিতে যাই।

কষ্টেসৃষ্টে এক টাকা বারো আনা যোগাড় হয়। ঢোঁড়াইয়ের মনটা খারাপ হয়ে যায়। তারই শলা অনুযায়ী বাবুসাহেবের ধান আনা থেকেই, এই ঝগড়া পর্বের পত্তন। আর সে কিছু সাহায্য করবে না মোকদ্দমার খরচ দিয়ে? তার নিজের বলতে একটা পয়সাও নেই। কোমরের নেংটি, আর মুখে দানা রামজী তার জুটিয়ে দিয়েছেন। ভেবেছিল তার জীবনে পয়সা দরকার হবে না। কিন্তু মহাবীরজী গন্ধমাদন পর্বত মাথায় নিয়েছিলেন, সে কি নিজের খাওয়া-পরা জোটেনি বলে?

ঢোঁড়াই মোসম্মতের কাছে মোকদ্দমার খরচের টাকার কথা তোলে। মোসম্মত চোখ কপালে তুলে চিৎকার করে।

'তাদের বাবারা কি বাঁশের কেঁড়েতে করে আমার কাছে টাকা আমানত রেখে গিয়েছিল? ওরে আমার হিতৈষী রে! আমার বরাতে কি সব কটাই এমনে লোকই জোটে।'

মরমে মরে যায় ঢোঁড়াই। গিধর মন্ডল যে চার আনা করে মাইনে ঠিক করে দিয়েছিল অন্তত সেটাও যদি মোসম্মত দিত! কিন্তু একথাটা কি বলা যায় মোসম্মতের কাছে।

ঘুম আর আসতে চায় না, সে রাতে ঢোঁড়াইয়ের।

মোসম্মত এমন করে মুখ ঝামটা দেবে, তা ঢোঁড়াই আশা করেনি। যে লোকটা মাইনে নেয়নি একপয়সাও তাকে এমনি করে কথা শোনাতে একটু সংকোচও হল না! সাগিয়াও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও তো মাকে কিছু বলতে পারত। কিন্তু মোসম্মতের কথাটা অন্যায্য নয়। তাই এ নিয়ে রাগ করা চলে না তার উপর।

ঘুম না এলেই মাচার ছারপোকাগুলো জ্বালাতন করে। আজকাল সজাগ হয়ে থাকাই ভাল। এই তো গত হপ্তায় খুঁটি থেকে মোষ খুলে নিয়ে গিয়ে পুরেছে খোঁয়াড়ে। নিশ্চয়ই ইনসান আলি পাউণ্ডকীপারের কাণ্ড। নিজে হাতে ঢোঁড়াই

খুঁটিতে বেঁধেছিল। খোঁয়াড় থেকে ছাড়াতে গিয়ে দেখে বইয়ের পাঁচ দিন আগের পাতায় লেখা আছে। পাঁচ দিনের চার্জ লেগে গেল মিছামিছি। এসব কার কান্ড তা কি মোসম্মত বুঝতে পারছে না? তবুও মোকদ্দমার জন্য দু'টাকা সাহায্য করল না।

তার উপর 'উজাড়' এর১ পালা চলছে গাঁয়ে কিছুদিন থেকে। ঘোড়ার খাওয়া দেখলেই চেনা যায়। গরু-মোষের খাওয়া একেবারে আদেখলে হাভাতের সাপটে মুড়িয়ে খাওয়া। আর ঘোড়ায় খায় শুঁকে উলটে পালটে; ফরুরুর করে নিঃশ্বাস ফেলে ধুলো উড়িয়ে পাতার ডগাগুলো খায়। ঠিক যেন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিয়েছে। ঘোড়ার খাওয়া মানেই রাজপুতের কান্ড। রাজপুতেরা ছাড়া আর ঘোড়ায় চড়ে কে গাঁয়ে। ঐ চড়তে গিয়েছিল একদিন লচুয়া ছাড়ী।...

সেই ছোটবেলায় ঘোড়ায় চড়া রাজপুতের বিজা সিং মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে যেত...মরণাধারে বেলেমাছের ভুড়ভুড়ি কাটার ঢেউয়ে কোথায় সে ছায়া মিলিয়ে যেত...

মিষ্টি চিন্তার আমেজে ঢোঁড়াইয়ের চোখের পাতা বুজে আসছিল।...হঠাৎ ও কী কাপড়ের খস্‌খসানির শব্দ না। একটা ছায়া নড়ল যেন ঘরে? ইনসান আলীর ভাড়া করা লোক নয়তো? মাচার পাশে রাখা বল্লমখানা শক্ত করে ধরে ঢোঁড়াই।

'কে?'

'হাতভরা গালার চুড়িগুলো খট্‌ খট্‌ করে শব্দ করে ওঠে।

'আমি, আমি!' চুপ!

'সাগিয়া।'

কেন যেন, ভয়ে ঢোঁড়াই ঘেমে উঠে।

'এইটা রাখ ঢোঁড়াই।'

অবাক হয়ে যায় ঢোঁড়াই। 'কী!'

'টাকাকড়ি তো আমার কাছে থাকে না। সে মা কোথায় বাতায় গুঁজে রাখে, আমাকে জানতেও দেয় না। আমার গহনাগুলো দেওয়া এ বাড়িতে আনতেই দেয়নি। এইটাই কেবল আমার আছে? মোকদ্দমায় খরচ করিস।'

জিনিসটা কী ঢোঁড়াই আঙ্গুল দিয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করে।

'না, করিস না ঢোঁড়াই—'

বিরাট গলা খাঁকার দিয়ে ইঁদারাতলার দিক থেকে ধ্বনি ওঠে 'হো-হে...ঘরবালা জাগো-ও-ও-ও-হে।'

একেবারে চমকে উঠেছে দুজনে।

লচুয়া চৌকিদার কোয়েরীটোলার দিকে পাহারা দেওয়া বাড়িয়েছে কিছুদিন থেকে! না হলে 'গরিবমার' হয়ে যাবে। একবার ধরতে পারলে ও ঐ মুসলমান পাউন্ডকীপারকে খাট্টা খাইয়ে ছাড়বে!...

বাড়ির ভিতর থেকে মোসম্মত কেশে চৌকিদারকে সাড়া দেয় যে, সে জেগেই আছে।

অন্ধকার ঘরে মায়ের খাটের তলে বেশ একটু শব্দ করেই লোটাটাকে রাখে সাগিয়া।

---

১ গরু মোষকে নিয়ে অপরের ক্ষেতের ফসল খাইয়ে দেওয়া।

ঢোঁড়াই সাগিয়ার দেওয়া জিনিসটা প্রাণে ধরে বেচতে পারে না! জিনিসটা পাকানো সুতোর গোছা দিয়ে গাঁথা একটা মালা। ছোট ছেলের গলার। মালা মানে, তাতে রয়েছে দুটো চাঁদির টাকা। একটা রামচন্দ্রজির টাকা। তীরধনুক কাঁধে দুই ভায়ের ছবি দেওয়া। আর একটা ফারসি লেখা সিক্কা। অতি পরিচিত জিনিস। হিন্দু মুসলমান কোনোকরম ভূত দানো নজর দিতে পারে না, এই মালা ছেলের গলায় থাকলে। যাদের 'পরমাৎমা' দুধ-ঘি খাওয়ার মুখ দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা এমনি মালা গলায় পরে।

ঢোঁড়াই বোঝে এ জিনিসের দাম কত সাগিয়ার কাছে। কতদিন গল্পে গল্পে ছেলেটার কথা বলে ফেলে সাগিয়ার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। তাকে পরমাত্মা ঐ একটাই দিয়েছিলেন। তিন বছরের দামাল ছেলের চলে যেতে তিন দিনের জ্বরেরও দরকার হল না। জ্বরের সময় মাকে চিনতে পর্যন্ত পারেনি এক পলকের তরে।...

সে সময় ঢোঁড়াই কী বলে সাগিয়াকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায়নি। ইচ্ছা করেছে তার মাথার চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে। ইচ্ছে হয়েছে বলে, 'কাঁদিস কেন সাগিয়া?' মনে হয়েছে যে, আসল লোকসান সেই ছেলেটার, যেটা চলে গিয়েছে। এমন মা পেয়েছিলি!

আরও কত কী কথা ঢোঁড়াই সে সময় ভেবেছে। কিন্তু বলার সময় আনাড়ীর মতো বলেছে, 'ছেলে কি কখনও মরে, সোনা কি কখনও জ্বলে ছাই হয়ে যায়?' কারও ছেলে মরলে এই বলাই নিয়ম। তবু এর স্বরের গভীরতা সাগিয়ার অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে। নিজে এ ব্যথা না বুঝলে এত দরদ কি কারও আসে! ছেলের মা হলেও না-হয় কথা ছিল! তার কোল-খালি-করা ছেলের জন্য এত ব্যথ্য এই লোকটার!

হঠাৎ ঢোঁড়াই অনুভব করেছে যে সাগিয়া তার দিকে তাকিয়ে; তার মুখচোখের মধ্যে কী যেন খুঁজছে।"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে ঢোঁড়াই বলে ফেলেছে, 'যাঁর জিনিস, তিনিই ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

সাগিয়া হাতে করে দিল বলেই কি ঢোঁড়াই ঐ মালাটা রাজপুতদের সঙ্গে জেদাজেদিতে খরচ করে দিতে পারে? আবার ফিরিয়ে দিলেও সাগিয়া দুঃখিত হবে। কথা তো বেশি কিছু বলবে না, কিন্তু তার চোখের কোণে জল এসে যাবে, সে কথা ঢোঁড়াই বেশ জানে। তাই মালাটাকে নিজের কাছেই রেখে দেয় ঢোঁড়াই। সে মনে মনে বোঝে যে, এটা তার খাতিরেই দিয়েছে সাগিয়া।

গঞ্জের বাজারের নৌরঙ্গীলাল গোলাকদার লোক ভাল, কোয়েরীটোলার লোকদের আঙুলের ছাপ নিয়ে সাতটা টাকা দেয়। ছাপ'না নিরে আর উপায় কী!

সাত টাকায় না-ই বা রাখতে পারলি রামনেওয়াজ মুন্সিকে। অনিরুদ্ধ মোক্তারও একটা কেউকেটা লোক নয়। জলদি করতে হয়। পরশু আবার বাবুসাহব গিয়েছে অ্যাসেসরীতে। হাকিমকে দিয়ে কী করাচ্ছে কে জানে!

অগত্যা অনিরুদ্ধ মোক্তারের শলা অনুযায়ীই কোয়েরীরা কাজ করে। তাঁর এক কথা—'সমন কি লুটিস কখনও নিও না। বাস। আর কিছু করতে হবে 'না।

দুই পক্ষকেই মোকদ্দমার শলা দেয় অনিরুদ্ধ মোক্তার। জিরানিয়ায় অনিরুদ্ধ

মোক্তারের শলা নিতে কোয়েরীরা গিয়েছিল কাছারিতে। রামনেওয়াজ মুন্সিই তাদের সঙ্গে যেচে কথা বলে সেখানে।

আরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন তোরা। বচ্চন সিংও কদিন থেকে আমার বাড়িতে আছে। ও আমার কাছে এসেছে তোদের খেলাপের মোকদ্দমার তদ্বিরে নয়। ও এসেছে অন্য কাজে। ওর নাম 'সেসরের ফিরিস্তি'১ থেকে কেন যেন হেঁটে দিয়েছে। পেশকারসাহেব অ্যাসেসরিতে ওর নাম আবার ঢুকানোর জন্য চায় দু'শ টাকা। কিন্তু বচ্চন সিংটা এমন হাড়কঞ্জুস যে, পেশকার সাহেবকে পঁচিশ টাকার বেশি খুশী করতে রাজী না। আমি বলি যে, ওয়াজিব খরচ করতে পেছপা হলে চলবে কেন। নিজে গাড়োয়ান আর দুটো বলদ, সব মিলিয়ে বোধ হয় পঁচিশ টাকার খেয়েছে এই ক'দিনে, তবু ন্যায্য খরচ করবে না। কাজের মধ্যে তো রাতে আমার বাড়িতে ঘুমনো। আর সারাদিন 'টুরমনের ফারমের'২ মরণাধারে ক্ষেতে জল সেচবার পাম্প বসিয়েছে না, সেখানে বসে বসে চীনাবাদামের ক্ষেত দেখা। বেশি চালাক কিনা? রাজপুতী বুদ্ধি আর কত হবে!

'বাবুসাহেব তাহলে বলো আর 'সেসর' নেই? তবে যে সেদিন অংরেজী কুর্তারও উপর পাটকরা ভাগলপুরী চাদর কাঁধে ফেলে শ্যাম্পানিতে এল? কোয়েরীটোলার মধ্যে দিয়ে আসবার সময় চেঁচিয়ে পিছনের হরবংশ সিং সেপাইটাকে বলল যে ছ-সাত দিন লাগবে এ অ্যাসেসরীটায়! এর মধ্যে পচ্ছিমটোলার ক্ষেতটা যেন তোয়ের হয়ে থাকে!

'আমি যে বলছি যে, ওর অ্যাসেসরী নেই, সেটা আর কিছু না, ও কী বলল সেইটাই বড় হল?' মুন্সিজী চটে ওঠে, এই মুখ্যু গেঁয়োগুলোর উপর।

কারও দেওয়া গালাগালি এর আগে কখনও এত ভাল লাগেনি কোয়েরীদের। এটা বুড়হাদাদার গালাগালির চাইতেও মিষ্টি। ঢোঁড়াইটাও এল না! এলে এখন জমত? তারপর মুন্সিজী কাজের কথা পাড়ে, 'তোরা হাজির হয়ে যাবি নাকি মোকদ্দমায়? কত টাকার যোগাড় করেছিস? উঠেছিস কোথায়?'

'এখনও টাকার যোগাড় হয়নি,' বলে বিল্টারা কোনোরকমে সেদিনকার মতো কথাটা এড়িয়ে যায়।

তারপর গাঁয়ে ফিরে এসে বিল্টারা গান বাঁধে।···

আজকাল মুন্সিজীর কুঠরীতে জজসাহেবের কাছারি;
নড়বে নাকো বচ্চন সিং মুন্সিজীর পা ছাড়ি;
কোথায় গেল কুর্সি এখন, কোথায় গেল সেসরী?···ওরে বিদেশী!

## গিধরের সহিত বাবুসাহেবের মিতালি

বাবুসাহেবের সঙ্গে গিধর মন্ডলের হঠাৎ ইদানীং একটু গলাগলি হবার কারণ ছিল।

থানার চৌকিদার কিছুদিন আগে হাটে হাটে ঘন্টা বাজিয়ে বলেছিল, কবে যেন গঞ্জের বাজারে সভা হবে। কিসের না কিসের সভা হবে, থানা-পুলিশের ব্যাপার। যা দিনকাল! কেউ আর তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কেবল খবর রাখত গঞ্জের

১ জজসাহেবের অফিসের অ্যাসেসরদের নামের তালিকা।
২ Tournament Agricultural Farm। ৩ কোট।

বাজারের লোকেরা। মুলুক জুড়ে 'আমনসভা'১ হচ্ছে থানায় থানায়। দারোগা-সাহেব ভিতরে ভিতরে ঠিক করেছে, এ থানার আমনসভায় সভাপতি করবে রাজপার-ভাঙার সার্কেল ম্যানেজারকে। তারই মিটিন হবে। থানা আমনসভার নিচে পরে হবে গ্রাম আমনসভা।

মিটিনের সময় নৌরঙ্গীলাল গোলাদারের খাদ্দীপরা ছেলে ভোপতলাল করে বসল এক কাণ্ড। ছোকরা পড়ত ভাগলপুরে। সেখান থেকেই মহাৎমাজীর আন্দোলনে তিন সাল 'হয়ে এসেছে'। মিটিনে সে উঠে **প্রস্তাব** করে যে, যার আয় একশ টাকার উপর সে যেন আমনসভার মেম্বর না হতে পারে। সকলে তো অবাক। বলে কী ছোকরা!

বাইরে বাইরে ইংরাজের দিকে, ভিতরে ভিতরে মহাৎমাজীর দিকে, আর সব সময় নিজের দিকে; এই তো দেখি সবাই। এ ছোকরা দারোগা আর সার্কেল ম্যানেজারের সম্মুখে নিজের দিকের কথাটা একেবারেই ভাবলই না। 'আলবৎ' বুকের পাটা বটে। চেঁচামেচি হৈ-চৈ-এর মধ্যে সেদিনকার সভা ভেঙে যায়।

সেইদিন বাজারের সবাই জানতে পারে যে, থানা আমনসভার সভাপতি, মামুলী 'অফসর' নন। কলস্টর, হাকিম, যিনিই আসুন এদিকে, আগে তাঁরই সঙ্গে এসে 'ভেট মোলাকাৎ' করবেন, তারপর ডেকে পাঠাবেন দারোগা সাহেবকে থানা থেকে। সেখানে এসেও দারোগা সাহেব বসতে পারবে না কুর্সিতে। বসুক তো; অমনি দারোগাগিরি নিলামে চড়বে; সরকারী ডাক এক। সরকারী ডাক দো। সরকারী ডাক তিন। আর দেখতে হচ্ছে না।

তারপর একদিন কী করে যেন, সার্কেল ম্যানেজার থানা আমনসভার সভাপতি হয়ে যান। গিধর মণ্ডল হয় বিসকান্ধা গ্রাম-আমনসভার 'মুখিয়া'।২

বড় দায়িত্বের কাজ। মহাৎমাজীর চেলারা 'লেংটাদের'৩ মাথায় চড়িয়েছে। তারা সাপের পাঁচ পা দেখছে আজকাল। সরকারী কানুন নিয়ে তামাসা। কানুনেরই বাঁধন যদি আলগা করে দেয়, তাহলে জাত-পাত আচার ব্যবহারের বাঁধন থাকবে কোথা থেকে? ভূতের নাচন আরম্ভ হবে দেশে। হবে কি হয়ে গেছে! কাজের খরচা পাবেন কিছু কিছু। আর ভাল কাজ করতে পারলে ইনাম বকশিশের কথাও সরকার মনে রাখবে।......

দারোগা সাহেব আরও কত কী বোঝাল গিধর মন্ডলকে।

এত বুঝোবার দরকার ছিল না। গিধর ভাল করেই জানে যে, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে লাডলীবাবুটা মহাৎমাজী তার মাস্টার সাহেবের ফাঁদে পা দিয়েছে। নইলে ঐ বচ্চন সিংয়ের গুষ্টি থাকতে, বিসকান্ধায় আর কারও 'অফসর' হতে হত না।

বাবুসাহেবও হাড়ে হাড়ে বোঝেন যে, দারোগা পুলিশ বিরুদ্ধে থাকলে, রাজপুতের লাঠি হয়ে যায় পেঁকাটির মতো ফঙ্গবনে; রাজপুতের ঘোড়া হয়ে যায় গাধার শামিল। আরে আহাম্মক লাডলী, বুঝিছস না যে, তোকে ঐ কুচক্করে মাস্টার-সাহেবটা তাদের বোঝা বইবার গাধা করেছে, নিয়ে যাচ্ছে ঘাটের দিকে। বংশের

---

১ শান্তিসভা। এই সময় গ্রামাঞ্চলের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রতিরোধকল্পে গভর্ণমেন্ট তার বিশ্বাসী লোকদের সহযোগিতায় সর্বত্র আমনসভা স্থাপিত করে।

২ সংস্কৃত শব্দ মুখ্য থেকে। সেক্রেটারি গোছের কাজ। ৩ ছোটলোকদের।

ইজ্জতে ঘুণ ধরিয়ে দিলে ; আর কি 'লেংটা'রা বচ্চন সিংয়ের পরিবারকে মানবে ? সেসরীর 'জান'টুকু এখন পর্যন্ত ধুকধুক করছিল রাজপুতী কলজের ভিতর, তাই ঐ শকুনগুলো এখনও ছিঁড়ে খায়নি। এখন আমনসভার 'মুখিয়া'টাকে হাতে রাখতে পারলে সময়ে অসময়ে কাজ দিতে পারে।

তাই জাতের ইজ্জত তুলে গিধর মণ্ডলটার সঙ্গে 'হাত মিলিয়েছিল'১ বচ্চন সিং নিজে উপযাচক হয়ে।

আর গিধর মণ্ডল জানে যে, ঢোঁড়াইটাকে শায়েস্তা করতে হলে, রাজপুতদের সাহায্য বিনা হওয়ার উপায় নেই। তার উপর লছুয়া চৌকিদারটাও একদিন নিরিবিলিতে তার কাছে সাগিয়া আর ঢোঁড়াইয়ের সম্বন্ধে কি সব যেন বলে গিয়েছে। দাঁত বার করে আবার হারামজাদা হাড়ীর বাচ্চাটা যাওয়ার সময় খোঁচা দিয়ে বলে গেল যে, তোমাদের বাড়ির বৌয়ের কথা বলেই তোমার কাছে কথাটা বললাম মোড়ল।

সেইদিন থেকে তার মনটা ঢোঁড়াইয়ের উপর আরও বিগড়েছে।

আর ঐ নচ্ছার কুটনী মোসম্মতটা ! ঐটাই তো যত নষ্টের গোড়া !

## কোয়েরীটোলার উদ্যোগ

সেই যে রাতে সাগিয়া মায়ের খাটিয়ার নিচে ঠকাস করে লোটাটা রেখেছিল, তার পরদিন থেকে তাদের বাড়ির ভাব হয়ে ওঠে একটু থমথমে মতন। মায়ে বেটিতে রঙ্গরস কমে আসে। যে মোসম্মতের মুখে চব্বিশ ঘণ্টা বাজে কথার খই ফুটত, সে সুদ্ধ হয়ে আসে একটু গম্ভীর। রোদ, বাদল, বলদ, উনুন প্রতিটি জিনিসের উদ্দেশ্যে, হুঁকোর ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে উগলে দেওয়া গালির স্রোতে মন্দা পড়ে। ঢোঁড়াইয়েরও মোসম্মতের সঙ্গে ব্যবহারে অকারণে একটা আড়ষ্টতা এসে যায়।

ঢোঁড়াই সাগিয়াকে ঠিক বুঝতে পারে না। বড় দুঃখ হয়, বড় মায়া হয় তার সাগিয়াকে দেখে। দুনিয়ার দুঃখের বোঝা মনে হয় সাগিয়ার বুকে পাথর হয়ে জমে আছে, কিন্তু তা নিয়ে মুখে রা কাটবার মেয়ে সে নয়। সূর্য্যিঠাকুরের মতো, ঠিক যে সময় যে কাজটি করা দরকার, মুখ বুজে করে যায়, বাদলে ঢাকা পড়লেও কাজে কামাই নেই। তাকে দেখলেই ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে, ঢলাকুমারের গানের সেই রাজকন্যের কথা২। এত ভাল, তবু এত পোড়াকপাল নিয়ে জন্মেছে ! ডাইনীবুড়ী হিংসে করে তাকে নিমগাছ করে রেখে দিয়েছে। রাজপুত্তুর ঢলাকুমারের কি তাকে চিনতে ভুল হয় ? চোখের জলে বুক ভাসে ঢলাকুমারের, শুকনো নিমের গুঁড়ির উপর মাথা কুটবার সময়। আশ্বিনের মরণাধারের মতো কালো চোখদুটির তলায় কী আছে জানতে ইচ্ছা করে। সাগিয়া হাসবার সময়ও তার চোখদুটো ছলছল করছে বলে ভুল হয়। মেয়ে জাতটার অন্যগুলোর মতো নয় ; তাই ঠিক বোঝা যায় না তাকে। একেবারে আপন করে টেনে নেবে, আবার দূরে দূরেও রাখবে। মজা নদী মরণাধারের মতো সাগিয়া। বান ডাকে না, পাড় ভাঙে না, আঁধি তুফানেও ঢেউ খেলে না। ঝিরঝির হাওয়ায় উপরটা কাঁপে, নিচের শ্যাওলাটা একটু নড়ে, কেবল দুপুরের রোদ লাগলে তলের বালি চিকচিক করে। রোদ্দুরে যখন ঢোঁড়াই তেতেপুড়ে আসে, তখন চাউনিটা হয়ে যায় বোকা বাওয়ার মতো। মুখে কিছু না বললেও দরদের

---

১ বন্ধুত্ব করেছিল।

২ প্রচলিত পালাগান।

পরশটুকু আদেখলে মনে বড় মিষ্টি লাগে। একে দেখলেই মন ভিজে ওঠে ঠাণ্ডা মিষ্টিরসে। এ কাছাকাছি আছে জানতে পারলেই মনটা ভরপুর হয়ে যায়।

আপনা থেকেই ঢোঁড়াইয়ের মনে আসে আর-একটা আওরতের কথা। 'পানের পাতার মতো' পাতলা ঠোঁট ছিল তার। তাকে দেখলেই দিলের উপর সাপ উল্টানি-পাল্টানি খেত। দিলের ভিতরটা হয়ে উঠত গরম। গুড়ও মিঠা, চিনিও মিঠা। তবু লোকে চিনিই চায়।

না, না, একটুও মনের উপর লাগাম নেই তার। সেই হারামজাদা আওরতটার উপর এখনও সে মন খরচ করছে। স্যাগয়ার সঙ্গে তুলনা করলে রামিয়ার মত মেয়েলোকের দর 'এক কড়িতে তিনটে'। সেই রক্তের দলাটা আজ বোধ হয় তিন বছরের দামাল ছেলে। সে জিরানিয়াতে থাকলে ছেলেটাকে দুলদুল ঘোড়ার মেলা থেকে মাটির ঘোড়া কিনে দিত। এখনও হয়তো একজন দিচ্ছে। আর সেই দুষ্টু ছেলেটা হয়তো কটা মর্কটটার বুকের লাল চুলগুলোর মধ্যে খেলার ঘোড়াটা চরাচ্ছে; খা ঘোড়া লাল ঘাস খা! আর বোধ হয় খিলখিল করে হেসে ফেটে পড়ছে সেই বেজাত আওরতটা, যেটা ঢোঁড়াইয়ের সবুজ দুনিয়াটাকে গরু দিয়ে মুড়িয়ে খাইয়ে দিয়েছে।···

বাইরে কয়েকজন লোকের গলা শোনা যায়। 'কীরে ঢোঁড়াই এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছিস যে?'

'আমি ভাবলাম যে আজ আবার তোদের জাতের মিটিন হবে মঠের মাঠে···'

'তুইও যেমন!'

বিল্টা ঢোঁড়াইকে টেনে মাচা থেকে নামায়। অথচ ঢোঁড়াই বাজে কথা বলেনি।

কোয়েরীদের ক্ষেতের ফসল রোজ রাতে রাজপুতদের গরু মোষ ঘোড়ায় খেয়ে যাচ্ছিল। দিন দিন বেড়েই চলেছে! একটু-আধটু ফসল খাওয়ানো, চিরকাল আছে, সব গাঁয়ে আছে। বুকে হাত দিয়ে বলুক তো দেখি কোনো ভৈসোয়ার১ নিঝুম রাতে কলাই কুথির ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দু-চার গাল ফসল তার মোষকে খাওয়ায়নি। হতেই পারে না। মোষের পিঠে চড়লেই মনের ভাব ঐ রকম হয়ে যায়। মোষের গাটা চকচক করবে; হাড়-পাঁজরা ঢাকা পড়বে; ফেনায় ভরা কেঁড়েটার মধ্যে ছরর্ ছরর্ দু আঁজলা বেশি দুধ পড়বে, এর লোভ কোনো ভৈসোয়ার সামলাতে পারে না।

কিন্তু এ হচ্ছে অন্য জিনিস। একেবারে যা নয় তাই কাণ্ড! একজন সেপাই খয়নি খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে বুড়হাদাদুকে হুউ-উ পাক্কীর দিকে নিয়ে গিয়েছে, আর একজন তার ক্ষেতে একপাল গরু ঢুকিয়েছে সেই ফাঁকে।

বিল্টার ক্ষেতের বেলা কী হল! বাবুসাহেবের রাখালটা একটা উটকো গরুর পিছনে ছুটল আসল গরুর পালটা বিল্টার ক্ষেতের আলের উপর ছেড়ে। সেটা ভাব দেখাল যে, দূরের গরুটা পাছে অন্যর ক্ষেত নষ্ট করে দেয়, সেই জন্য তার ভাবনার অন্ত নেই। সব বুঝি আমরা; ওসব আমাদের মুখস্থ। কিন্তু সবচেয়ে জবর কাণ্ড করেছে মোসম্মতের যব-মটরের ক্ষেতে। রাতে ক্ষেতের পাহারাদার মাচায় ঘুমুচ্ছিল! মাচার চারিদিকে ফণীমনসার কাঁটা দিয়ে ঘিরে, তারপর মোষ ছেড়ে দিয়েছে ক্ষেতে। সে মোষ খোঁয়াড়ে দিয়েই বা কী। বাবুসাহেবেরই তো খোঁয়াড়, ইনসান আলির নামে নেওয়া। কোয়েরীদের চাইতেও মুসলমান হল আপনার লোক! এ নিয়ে ঢোঁড়াই

১ মোষ চরাবার রাখাল।

থানা-পুলিশ করতেও ভয় পায়। দারোগা সাহেব আবার তার ঘরবাড়ি নিয়ে কী সব জিজ্ঞাসা করবে। যদি তাকে জিরানিয়া কাছারিতে যেতে হয়! না না, সে পড়তে চায় না ওসব গোলমালে।

কিন্তু একটা কিছু করতে তো হয়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করার সম্বন্ধে। গিধর মন্ডলটাও আবার এখন বাবুসাহেবের সঙ্গে মিলে গিয়েছে জাতের লোকের বিরুদ্ধে। জাতের মোড়ল হয়েছেন!

বাবুসাহেবের 'ধরমপুরিয়া চাল'১ দেখেছিস? জাতের মোড়লকে দিয়ে জাতের বরবাদ করাচ্ছে। সত্যিই প্যাঁচে, ভুমিহার আর লালা কায়েতের চাইতে কম যায় না রাজপুতেরা!

তাই বিল্টা কাল দলবল নিয়ে গিয়েছিল গিধর মণ্ডলের কাছে সে কেন জাতের লোকের বিরুদ্ধে গিয়েছে, তারই জবাবদিহি নিতে। গিধর জিভ কেটে বলে, 'তা কী হয়? কী যে বলিস তোরা। আমার কি বিয়ে শ্রাদ্ধর ফিকির নেই? আমি যাব জাতের বিরুদ্ধে। জাতের সওয়ালে আমি জাতের দিকেই। আমরণ। তবে কি জানিস, ভদ্রতার জ্ঞানটা তো ধুয়ে পুঁছে ফেলতে পারি না। বাবুসাহেব যেচে আলাপ করতে চায়, আমি কেমন করে না করি! আর জাতের মোড়ল বলে কি আর তোরা আমাকে মানিস! আজকাল জাতের মোড়ল মলহরিয়ার তাৎমা। সে ডাইনে চলতে বললে চলবি ডাইনে। বাঁয়ে চলতে বললে বাঁয়ে। কই রে বিল্টা, মোসম্মতের মানিজর সাহেবকে আনিসনি কেন সাথে?' বিল্টা হেসে জবাব দিয়েছিল যে, 'গিধর গুরুজীর২ সাথে মিতালি করেছে বুড়ো গিধ৩। এবার থেকে জ্যান্ত মানুষ খাবে। আর মানিজর এমুখো হয়? লেজ তুলে গাঁ থেকে পালানোর পথ পাবে না।'

'বড় শয়তান তুই বিল্টা' বলে কোয়েরীরা হাসে। গিধর এ হাসিতে যোগ দিতে পারে না। শয়তানটার রসিকতার ইঙ্গিত আবার 'গরুখোর' কথাটার দিকে নয় তো! লেজ তুলে পালালো—বুড়ো শকুন।

অপ্রস্তুত হয়ে গিধর মণ্ডল বলেছিল, 'কাল সাঁঝে সকলে আসিস মঠের মাঠে। 'জাতিয়ারী' কথার বিচার করা যাবে। তোরা আমাকে জাতের বিরুদ্ধে মনে করিস সকলে!'

কোয়েরীদের জাতের সভায় ঢোঁড়াই গিয়ে কী করবে? এই জন্যই আজ ঢোঁড়াই সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিল্টার হাত থেকে কি নিস্তার আছে!

## ঢোঁড়াইয়ের সুমন্ত্রণা প্রদান

টোলার সব লোক জড় হয়েছে মঠের মাঠে। বাইরের লোকের মধ্যে এসেছে একমাত্র লছুয়া হাড়ী। সবচেয়ে শেষে পৌঁছুল গিধর মণ্ডল।

'যে জাত জেগে থাকে, সেই জাতই বেঁচে থাকে।' বলে গিধর মণ্ডল মধ্যখানটাতে গিয়ে বসে। অনেক ভেবে ভেবে কথাটা তৈরি করে সে এসেছে। এখন এগুলো বুঝলে হয়।

---

১ এ জেলার মধ্যে ধরমপুর পরগণা কূটবুদ্ধিতে সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত।

২ শৃগাল পণ্ডিত।

৩ শকুনি।

সবাই বলে, 'হাঁ, এ একটা কথার মত কথা বলছে বটে মোড়ল।'

তার মানেই হচ্ছে যে কথাটা বুঝতে পারেনি কেউ। গিধরের মনটা প্রথমেই খারাপ হয়ে যায়।

রাজপুতরা কোয়েরীদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। সেই কথাই সকলে উঠোতে চায়। আজ মোসম্মতের হয়েছে, কাল তোর ক্ষেতে হতে পারে! বল মোড়ল, কী করা যায়।

গিধর রাজপুতদের প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। 'তাই বলে কি জল কাটবি নাকি ছুরি দিয়ে? কার মোষ তার ঠিকঠিকানা নেই। আগে সেটা ঠিক জানবি, তবে তো ভাবা যাবে তার পরের কথাটা। নীলগাইটাই এসে খেয়ে যাচ্ছে না তো?

সকলে চেঁচামেচি আরম্ভ করে। 'নীলগাইতে ফণীমনসার কাঁটা দিয়ে গিয়েছে মাচার চারিদিকে?' 'যে মোষটাকে ধরে ইনসান আলির খোঁয়াড়ে দিলাম সেটাও কি কালো রঙের নীলগাই নাকি?' 'কী যে বল মোড়ল। তোমার মতো রামায়ণই না-হয় পড়তে শিখিনি, তাই বলে গাই আর নীলগাইয়ের তফাত বুঝব না।'

'আরে তা নয়। সাঁওতালরা তীর-ধনুক দিয়ে যে নীলগাই মারল সেদিন ক্ষেতে দেখলি তো? আমি বলছিলাম যে হতেও তো পারে নীলগাই।'

গনৌরী বলে, 'নীলগাইয়ের কথাই যদি তুললি, তবে শোন বলি, আর এক ব্যাপার। নীলগাইয়ের মাংস বিলি হচ্ছিল যখন সাঁওতালটোলায়, তখন পিথো সাঁওতালটা কী বলছিল শুনেছিস? বলছিল তোদের জমি যেগুলো বাবুসাহেব নিলাম করিয়েছে, সেগুলো আমাদের দেবে বলেছে। আমি বলি নিলাম আবার করাল কবে? অনিরুদ্ধ মোক্তার বলেছে, নুটিস না নিলে নিলাম হবে না। তুই বললেই হল।'

যে কথাই পাড়ো রাজপুতদের কথা এসে পড়বেই পড়বে। গিধর মণ্ডল বিরক্ত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় বলে যে, জাঁতায় ভুট্টা পিষতে গেলে দানার মধ্যের দু-চারটে ঘুণ পিষে যাবেই। কিন্তু অনর্থক গোলমাল বাড়িয়ে লাভ কী? বলে, অনিরুদ্ধ মোক্তারের চাইতেও পণ্ডিত হয়ে উঠছে সাঁওতালগুলো আজকাল।'

বুড়হাদাদা এই কথায় সায় দেয়।

একটা ছোকরা বলে, 'বুড়হাদাদা সেই রাতের বাঁধনের কথাটা ভুলতে আর পারছে না।'

ঢোঁড়াই বিল্টাকে খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দেয় যে আসলে কাজের কথা কিছু হচ্ছে না। এই জিনিসই তো চায় গিধর মন্ডল।

'বাবুসাহেব বোধ হয় সাঁওতালদের কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে কিছু সেলামি নিতে চায়।' বিল্টা আবার বাবুসাহেবের কথা তুলেছে। গিধর আর একবার কথার মোড় ঘুরোবার চেষ্টা করে।

'জাতের কে কে নীলগাইয়ের মাংস খেয়েছিলি সেদিন?'

প্রায় সকলেই দোষী। কেউ জবাব দেয় না।

এ আবার কি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল!

বিল্টা বলে, 'আসল কাজের কথায় এস 'মড়ল'! আমি চাই জাতের তরফ থেকে আমাদের মেয়েদের রাজপুতদের বাড়ি কাজ করা বন্ধ করে দাও। পৈতা নেওয়ার পর থেকে কুশবাহাছত্রি মরদরা রাজপুতদের বাড়ির এঁটোকাঁটার কাজ বন্ধ করে দিল। তবে মেয়েরা করে কেন সে কাজ এখনও? আমাদের টোলার তিন-তিনটে মেয়ে বিয়ের

পরও শ্বশুরবাড়ি যায় না। সেখান থেকে নিতে এলেও তাদের বাপ মা 'রোকশোদি'১ করায় না। কেন শুনি? পরগণা সুদ্ধ লোক এ কথা জানে। আমার সাফ-সাফ কথা, রাজপুতদের বাড়ি দাইয়ের কাজ করা বন্ধ করে দাও। ঘরের বেড়ায় মেমের ছবি টাঙিয়েছে লছমনিয়া; পেলে কোথা থেকে?

তুলকালাম আরম্ভ হয়ে যায় মঠের মাঠে। বুড়হাদাদু ঠকঠক করে কাঁপে। হল কী কালে কালে! এখনও তবু তার ছেলের বৌটা রাজপুতদের বাড়ি কাজ করে যা হোক দুমুঠো খেতে পাচ্ছে! 'নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারিস না রে বিল্টা। তবে হ্যাঁ, যে মেয়েদের বয়স কম, তাদের জন্যে একটা নিয়ম করলে হয়!'

খেঁকিয়ে ওঠে একসঙ্গে কয়েকজন।

'আমার মেয়ে লছমনিয়াকে ঠেস দিয়ে কথা বললি, সে বাবুসাহেবের বাড়ি কাজ করে বলে?'

'তোর ছেলের বৌয়ের বয়স দেড় কুড়ি হয়েছে বলে কি তার চরিত্তিরটা দুধ দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করা হয়ে গিয়েছে?

'তোর চুরির জন্য আমাদের এই হালত আজ, আর তুই দিস আমার মেয়েকে খোঁটা?'

বিল্টার আর ধৈর্য থাকে না। সে কারও কথায় কান না দিয়ে গিধরকে বলে, কী গিধর মণ্ডল! তুমি যে মুখে রা কাটছ না, রাজপুতদের বিরুদ্ধের কথা বলে? পহরে পহরেও তো একবার তোমার বুলি শোনাবে। তুমি একবার 'জিব নাড়লেই' তো রাজপুতী 'ময়লা' সাফ হয়ে যায়।'২

রাগে গিধর মন্ডলের সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। তবু মুখে হাসি এনে বলে, 'এটা কি কুশবাহাছত্রিদের জাতের মিটিন নাকি যে এখানে জাতের তরফ থেকে ফয়সালা হবে কোনো জিনিসের?'

সকলে অবাক হয়ে যায়। এটা জাতের মিটিন না! তবে যে কাল বললে সকলকে এখানে জুটতে? সব সময় একই মুখ দিয়ে কথা বল, না আর একটা মুখ আছে তোমার?'

এতক্ষণে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে গিধর মণ্ডল।

'জাতের মিটিন হবে, সে আবার আমি কখন বললাম! জাতের মিটিন হলে এর মধ্যে লচুয়া হাড়ী এসেছে কেন? ওই তাৎমাটা এসেছে কেন? তন্ত্রিমাকোয়েরী বলেও কি একটা নতুন জাত সৃষ্টি হয়েছে নাকি আজকাল? না হয়ে থাকলেও হবে। কী বলিস চৌকিদার?

লচুয়া চৌকিদার ছাড়া কথাটার ইঙ্গিত এই উত্তেজনার মধ্যে কেউ খেয়াল করে না।

'সব জিনিসে কেবল মারামারি, কাটাকাটি এ গাঁয়ে!'

গিধর মণ্ডল ধড়মড় করে উঠে পড়ে। 'এই সব দলাদলির মধ্যে থাকা আমার অভ্যাসও নেই, আর আমনসভার 'মুখিয়া' হয়ে আমি তা করতেও পারি না।'

ঢোঁড়াইয়ের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে সে চলে যায়।

'ওরে আমার অভ্যাস-না-রাখনেওয়ালা! দেরি হয়ে যাচ্ছে; যা শিগগির কানী

---

১ দ্বিরাগমন।

২ দ্ব্যর্থবাচক কথাগুলি। ময়লা কথাটির অপর একটি অর্থ বিষ্ঠা। জিব নাড়ানোর একটি অর্থ কথা বলা।

মাসহরনীর কাছে অভ্যাস বদলাতে!'

এতক্ষণে লচুয়া চৌকিদার বলে যে, গিধর মণ্ডল তাকে আসতে বলেছিল, আমনসভার বৈঠক হচ্ছে বলে!

তাই নাকি! হারামীর বাচ্চা, গরুখোরটা।

'আমনসভার মিটিনের 'রপোর্ট' মাসে একটা না পাঠালে দারোগা সাহেব চটে যে।'

অনেক আশা করে আজকে সকলে জাতের সভা করতে এসেছিল, সাঁঝের ভজন বন্ধ করে। যে লোকগুলো সাঁঝের ভজনে আসে, সেগুলোই শাদি আর শ্রাদ্ধের ভোজে যায়, বিষহরির আর রামনবমীর পুজো করে, রামখেলিয়া আর ভমরের গানের আসর পাতে। কিন্তু যেদিনের যে কাজ। আজ কি আর এখন 'জাতিয়ারী' সভার জন্য তৈরী করা মন ভজনে বসে! সে কথা কেউ ভাবতেও পারে না। ঐ শালা গিধরটার জন্য কি জাতের কাজ আজ টকরসে জারানো থাকবে? তুই কি বলিস ঢোঁড়াই?

আরে জাতের সওয়াল তো জাতের সওয়াল। তাই বলে কি তুই কিছুই বলবি না? এখানে না থাকলে কি আর বলতাম তোকে। জাতের ব্যাপারে কি আর আমরা রামনেওয়াজ মুন্সির কাছে যাই না কেন? আরে তোর গায়ে তো তশিলমাকোয়েরীর ছাপ দিয়ে দিয়েছে জাতের মোড়ল নিজে।

বুড়হাদাদু বিল্টার শলাতে ভরসা পায় না। ও ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে! ধান ভানবার সময় বাড়ি মারতে হয় আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে। তবে না গোটা চালটা বেরিয়ে আসবে। জোরে বদান করে মার, একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে চাল। এই সোজা কথাটা বিল্টা বোঝে না।

ঢোঁড়াই কেন বিল্টাও বোঝে যে, এই অভাব-অনটনের দিন কোয়েরী মেয়েরা রাজপুতদের বাড়ি কাজ করা বন্ধ করতে পারে না। ঠিক হয় কোয়েরীটোলার মেয়েদের বিয়ের দু বছরের মধ্যে 'রোকশোদি' করাতে হবে। যেমন করেই হোক এইসব মেয়েদের নিয়েই জাতের দুর্নাম সবচাইতে বেশি। এতে রাজপুতদের বলার কিছু নেই।

গনোরী কথা তোলে, কোয়েরীটোলার মেয়েরা বাবুদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে বলে কি রাজপুত মরদের কাপড় কাচবে নাকি?

সকলেই আশ্চর্য হয়, এত বড় অপমানের কথাটা তাদের এতক্ষন মনে পড়েনি দেখে। গনোরীটা কথা বলে কম। কিন্তু বলে বড় সময়মতো কাজের কথা।

সকলেরই মনে মনে গর্ব হয়; যাক! রাজপুতদের বিরুদ্ধে তবু তারা জবর একটা কিছু করতে পেরেছে! কিন্তু মোড়ল যে চলে গেল; ওটা আবার নীলগাইয়ের মাংস খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে গোলমাল-টোলমাল না করে! বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ কথাটাই তুলছিল মোড়ল! পৈতা নেওয়ার পর থেকে নীলগাইয়ের মাংস খাওয়ার সুযোগ কোয়েরীটোলার লোকের এর আগে হয়নি। বিবেকের দংশনটাই বোধ হয় মোড়লের কথা বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল। অর্থাৎ আজকের নীলগাইয়ের আপদটা সেকালের নীলকর সাহেবের মতনই বড় আপদ হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই সকলকে সাবধান করে দেয়, 'দেখ, আজ থেকে আর কেউ নীলগাই বলবি না। বলবি বনহরণা১, সাঁওতালরা যা বলে। সবাই এই মঠের মাঠে অশথ গাছের সমুখে হলপ নে, কেউ কথার খেলাপ করবি না। গিধর মোড়লের বাপ মোড়ল এলেও 'বনহরণা'র মাংস

১ বনহরিণ। যথার্থই নীলগাই, এক শ্রেণীর হরিণ।

খেলে 'হুকাপানি'১ বন্ধ করতে পারবে না।

'বনহরণা! খুব মাথায় খেলেছে যা হোক ঢোঁড়াই তোর। রামনেওয়াজ মুন্সির শাগরেদ হলি না কেন তুই?'

বনহরণা! এত বড় একটা প্রশ্নের এত সহজে সমাধান হয়ে যেতে পারে, তা কেউ আগে কল্পনাও করতে পারে নি।

আলবৎ চোখা বুদ্ধি ঢোঁড়াইটার!

বণহরণা! বনহরণা!

হটাৎ হাসির ধুম পড়ে যায় সভায়। বনহরণা!

বুড়হাদাদুর হাসতে হাসতে কাশি এসে যায়। বিল্টার পর্যন্ত হাসতে হাসতে জল এসে গিয়েছে চোখে।

'ম'ল বুঝি বুড়োটা এবার!'

তন্ত্রিমাকোয়েরী কথাটা ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। গিধরটা তাকে ঠাট্টা করে গেল; আর সে জবাব দিতে পারলে না কথাটার! দিতে পারত সে জবাব ঠিকই। ইচ্ছা করেই সে কিছু বলেনি। একটা কিসের বাধা ছিল, সংকোচ ছিল তার মনে।

না, আর কেউ কথাটা ধরতে পারেনি বোধ হয়!

পরিষ্কার সামনাসামনি দু'পক্ষের লড়াই জিনিসটা ঢোঁড়াই ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পারে। এ কেমন যেন অনেক দলের লড়াই, অনেক লোকের লড়াই, অনেক রকমের ঝগড়ার মুখ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কে কোন দলে, কোন দল কখন কোনদিকে বোঝা যায় না। হরেক ধন সামলাতে লাগে লড়াই, অথচ একা হাতে লড়া যায় না। তাকে একা পেয়েই না তাৎমাটুলির 'পঞ্চ'রা তাকে যা করবার নয় তাই করেছিল। এই একা লড়া যায় না বলেই লোকে জাতের দুয়োরে মাথা কোটে। তাই না বচ্চন সিং অন্য রাজপুতদের রোজ সন্ধ্যাবেলায় সিদ্ধির শরবত খাওয়ায়। জাতের বাইরে যে লোকের সাহায্য পাওয়া যায়, তার কাছেই লোক আপনা থেকেই ছুটে যায়। তাই বাবুসাহেব যায় মুসলমান ইনসান আলির কাছে, তাই না বাবুসাহেব টানে লালাকায়েত রামনেওয়াজ মুন্সিকে তার দিকে। তাইজন্যেই না কোয়েরীরা ঢোঁড়াইয়ের মতো রামায়ণ না পড়া-লোকেরও সাহায্য চায়। রাজপুতেরা তাদের চাইতে বেশি বুদ্ধি রাখে। তারা কোয়েরীদের মোড়লকে দল থেকে ভাঙিয়ে নেয়; নিক তো দেখি কোয়েরীরা একজনও রাজপুতকে, তাদের দল থেকে ভাঙিয়ে। সাঁওতালদেরও কি বাবুসাহেব নিজের দিকে করেছে? পিংথো খামকা মিথ্যে বলবে কেন!

সাগিয়া গোয়ালঘরে আগুন জ্বালাতে এসেছিল ধোঁয়া করবার জন্য। ঢুকতেই ঢোঁড়াই জিজ্ঞাসা করল, কী সব হল 'জাতীয়তা সভায়'? তামাক খাওয়ার শব্দ শুনে ঢোঁড়াই বুঝতে পারে মোসম্মতও শোয়নি এখনও এই খবর শোনবার জন্য।

নিজে এসে জিজ্ঞাসা করুক, তবে ঢোঁড়াই বলবে তাকে খবর! নইলে দায় পড়েছে ঢোঁড়াইয়ের।

সাগিয়া সব শুনে যাওয়ার সময় বলেছিল, 'এত পাপও কি ধরতিমাই২ সহ্য করতে পারে!'

---

১ হুঁকো জল। একঘরে করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২ ধরিত্রী দেবী।

সাগিয়ার কথা বোধ হয় ধরতিমাইয়ের কানে গিয়েছিল।

সে কী ধরতিমাইয়ের সাড়া![1] গম্-গম্-গম্-গম্! গুড়গুড়—গুড়গুড়! এক কুড়ি মেঘের ডাক যেন টগবগ করে ফুটছে তাঁর বুকের ভিতর। হুংকার ছাড়ছেন ধরতিমাই। বুকখানা তাঁর ফেটে যাবে বুঝি এবার! যা ভাবা, তাই কি হল। চড়মড় করে তামাকক্ষেতের মধ্য দিয়ে জমিটা ফেটে গেল। ফোয়ারা দিয়ে বাতাস সমান উঁচু জল আর বালি বেরুল, ফাটলের মধ্য দিয়ে এখানে, ওখানে অগুন্তি জায়গায়। অগুন্তি হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলছে পাতাল থেকে। শব্দ থামেই না, শব্দ থামেই না! কুয়োটা গবগব করে জল বমি করছে। চারিদিকে বালির সমুদ্দুর ভুরভুর কাটছে। তামাকক্ষেত কখন ডুবে গিয়েছে জল-বালির মধ্যে, তা ঢোঁড়াই লক্ষ্যও করে নি। ভয়ে ঢোঁড়াই রামচন্দ্রজীর নাম পর্যন্ত ভুলে যায়। দুনিয়াটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে এইবার! আর রক্ষে নেই তার! কোথায় তলিয়ে যাবে সে! হঠাৎ কেন যেন আবছাভাবে মনে হয়, এইমাত্র ঐ দূরের উঁচু পাক্কী সড়কে যেতে পারলে তার প্রাণটা বাঁচতে পারে। ঢোঁড়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয় পাক্কীর দিকে। দৌড়ান কি যায়। কাদা বালির মধ্যে টলে টলে পড়ছে সে। অসম্ভব! এই তামাকক্ষেতটুকু পার হতেই তার জন্মযুগ কেটে যাবে। তাৎমাটুলির সেই আওরতটার মুখ হঠাৎ মনে পড়ে…তিন চার বছরের নেংটা ছেলেটা ভয়ে তার বুকে মুখ গুঁজছে…

'এগে মাইয়া গে! এ ঢোঁড়াই! জান গেল রে!'

সাগিয়ার গলা। ঢোঁড়াই থমকে দাঁড়ায়। এতক্ষণ সাগিয়ার কথা মনেই পড়েনি। তামাক ক্ষেতে তারা কাজ করছিল। ঢোঁড়াই ফিরে দেখে যে, সাগিয়ার কোমর পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছে একটা ফাটলের বালির মধ্যে। মায়ে ঝিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছে। ঢোঁড়াই আর মোসম্মত মিলে ধরাধরি করে সাগিয়াকে টেনে তোলে। মা-বেটিতে ঢোঁড়াইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে বসে। তারা দুজনেই তখনও ঠকঠক করে কাঁপছে ভয়ে। তাদের বুকের ধুকধুকুনিটা পর্যন্ত ঢোঁড়াই শুনতে পাচ্ছে। বেশ নূতন নূতন লাগে ঢোঁড়াইয়ের। বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে কত কী বলে যায়।

…বক্রির কানদুটো ধরলে ব্যা-ব্যা করে ডাকবার সময় তার চাউনিটা কেমন যেন হয়ে যায় লক্ষ্য করেছিস ঢোঁড়াই? আমার মেয়ের চাউনি হয়ে গিয়েছিল সেই রকম। …সাগিয়া, তোর কোমরে মাজায় লাগে-টাগেনি তো?…আমি ভাবলাম, আমার কপাল বুঝি পুড়ল। তুই না থাকলে কি করতাম ঢোঁড়াই, ভাবতে গেলেও বুক শুকিয়ে যায়।…

ঢোঁড়াই সব কথা ভাল করে শুনছেও না। মন চলে গিয়েছে তাৎমাটুলিতে। সেখানে কে কেমন থাকল। ছেলেটা।…আর তার মা-টাও। ছেলের মায়ের অমঙ্গল সে চায় না। দোষ রামিয়ার নয়, দোষ ঢোঁড়াইয়ের কপালের। পাচ্ছিমা আওরতটা, কখনোই ঢোঁড়াইয়ের মায়ের মতো ব্যবহার করবে না তার ছেলের সঙ্গে। সব মা সে-রকম হলে পাপের ভারে রোজ আজকের মতো ভূমিকম্প হত। এই সাগিয়াকেই দেখ না, এখনও মরা ছেলেটার কথা মনে করে চোখের জল ফেলে। ঢোঁড়াইয়ের সংসার

---

১ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪। বিহার ভূমিকম্প।

যদি 'হরাভর'১ থাকত, তাহলে বাঙলী বাবুভাইয়াদের ছেলের মত আরামে রাখত সে ছেলেটাকে। মায়ের দুধের উপরও মোষের দুধ কিনে খাওয়াত। ভগবানের সেরা দান ছেলে। তার নিজের জাত-বেরাদারই যখন তার হাত কেটে নিয়েছে, তখন সে দোষ দেবে কাকে। দোষ তার আগের জন্মের কৃতকর্মের।···ছেলেটার চেহারা যদি সেই কটা মর্কটটার মতো হয়। ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। এ কথা কত সময় তার মনে হয়েছে। ছেলের কথা মনে হলেই এই কথাই সব চাইতে আগে মনে হয় তার। না, তার মন বলছে যে, তা হতেই পারে না! রামচন্দ্রজী আছেন। কখনও হতে পারে না—যত পাপই সে করে থাকুক আগের জন্মে। তার ছেলে পর হয়ে যেতে দিয়েছে সে, কিন্তু মনের এই সান্ত্বনাটুকুকে কেড়ে নিতে দেবে না সে কাউকে, খোদ রামচন্দ্রজীকেও না। তা হলে সে কি নিয়ে থাকবে।···খৃষ্টান হলেই কি রামচন্দ্রজীর রাজ্যের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে হয় নাকি?···দুটোকেই বাঁচিও রামজী, আজকের বিপদ থেকে; তারা খৃষ্টান হয়নি। ···কার হাতের কাঁপুনি কার কথা মনে করিয়ে দেয়। শিরশির করে মনে পড়াগুলো উঠছে ঢোঁড়াইয়ের মাথার দিকে।

হঠাৎ নজর পড়ে সাগিয়ার দিকে। একটা কী বুঝবার চেষ্টা করছে। ঢোঁড়াইয়ের চোখ মুখের উপরের লেখাটার মানে বোধ হয়।

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটাবার জন্যে ঢোঁড়াই সাগিয়াকে ইশারা করে বুঝিয়ে দেয় —'যাক, তোর মা'র রাগটা পড়েছে, এই হিড়িকে।' বাড়ির থমথমানিটা যাওয়া কম লাভ নয়।

মোসম্মতের কান্নার লক্ষ্য ততক্ষণে গিয়ে পড়েছে বালি ভরা তামাক-ক্ষেতটার উপর। আপন বলতে ভগবান আর কী রেখেছেন তার, ঐ মেয়ে আর জমি ছাড়া। তাতেও কি চোখ টাটাচ্ছে তাঁর।

সাপ দেখলে শালিখ পাখির ঝাঁক যেরকম কিচিরমিচির করে, সেই রকম একটা অবিচ্ছিন্ন হট্টগোলে গাঁয়ের আকাশ-বাতাস ভরে গিয়েছে। রাজপুতটোলার দিক থেকেই চেঁচামেচিটা আসছে।

'যাস কোথা ঢোঁড়াই?'

এ সময় একজন মরদ কেউ কাছে না থাকলে ভয় করে মোসম্মতের আর সাগিয়ার।

'এই এলাম বলে।'

ন্যায়বিচারের হদ্দ করেছ রামচন্দ্রজী। গাঁয়ের যে বাড়ি যত বড়, সে-বাড়ি ভেঙেছে তত বেশি। কোয়েরীটোলার খড়ের বাড়িগুলোর কিছু লোকসান হয়নি। পাকা দালানে ভরা রাজপুতটোলার রূপ হয়েছে শুয়োর চরাবার পর কচুর ক্ষেতের মতো। বাবুসাহেবের বাড়ির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে মাটির ফাটলটা। দালানটাকে একেবারে দু টুকরোয় ভাগ করে দিয়েছে। ছাতের একদিক থেকে আর একদিকে যাওয়া শক্ত।

এর মধ্যেও বিল্টা ফিসফিস করে বলে, একেবারে গঙ্গাজী চলে গিয়েছে ছাদের মধ্যে দিয়ে—

পয়সা, পয়সা!
এক পয়সা!
পয়সা ফেকো!

১ সবুজ। সোনার সংসার।

লালা দেখো!

কালী কলকত্তাবালী পুলে!

গঙ্গাজীর উপর!

এর মধ্যেও তোর হাসি-মশকরা আসে? মুখে বলে বটে ঢোঁড়াই। কিন্তু বহুকাল পরে রামচন্দ্রজী ভগবান এই অন্ধ দুনিয়াটাকে দেখিয়েছে তাঁর ন্যায়বিচারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'চার কাঙলা, তো এক বাঙলা।'১ চারজন গরীব থাকলে তবে একটা পাকা দালান হয়। থাক পাকা দালানে আরাম করে গিধর মণ্ডল! কোয়েরীটোলার মধ্যে ঐ একটা বাড়িই গিয়েছে। খড়ের বাড়িগুলোর আর যাবে কী! একটু আধটু বাঁশ-খুঁটি নড়েছে কোনো কোনোটার।

কিন্তু এতটা কড়া না হলেও পারতে রামজী, রাজপুতটোলার মেয়ে আর বাচ্চাদের উপর। তারা কি এই শীতের মধ্যে সারারাত বাইরে বসে থাকতে পারে!

সব চাইতে অবাক কাণ্ড হল জল নিয়ে। সেবার কলেরার সময় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে টিউবওয়েল বসিয়ে গিয়েছিল মঠের মাঠে। সেটাতে জল ওঠেনি। মিস্ত্রিরা বলে গিয়েছিল যে, সদর থেকে আরও নল এনে পুঁতে দেবে। তাহলেই জল উঠবে। মিস্ত্রিরা সেই যে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি বিসকান্ধায়। সেই কলটাতে ভূমিকম্পে হঠাৎ জল এসে গিয়েছে।

রাজপুতদর্পহারী অবধবিহারী রামচন্দ্রজীর অদ্ভুত লীলা। বিসকান্ধায় সব কুয়ো ইঁদারা বালিতে ভরে গিয়েছে। রাজপুতটোলার লোকদের এবার থেকে পায়ের ধুলো দিতে হবে কোয়েরীটোলায়, কল থেকে জল নেওয়ার জন্য। ইঁদারার ফুটানি দেখাত এতদিন!

## সাগিয়া ঢোঁড়াই সংবাদ

ভূমিকম্পের হৈ-হল্লার মধ্যে গাঁয়ের ঝগড়া-দলাদলির ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়॥ বাবুসাহেবের ছোট ছেলে লাডলীবাবু ফিরে আসেন গাঁয়ে; সরকার মহাত্মাজীর চেলাদের ছেড়ে দিয়েছে জেল থেকে ভূমিকম্পের জন্যে। মঠের টিউবওয়েলটাতে চব্বিশ ঘণ্টা মেলা লেগে রয়েছে। দু-কোশ দূরের কুশীতে স্নান করতে যেতে হয় সকলকে। সেখান থেকে মেয়েরা কলসীতে করে জলও নিয়ে আসে। নইলে কলতলাতে রাজপুতদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে জল নেওয়া সে কি মোসম্মত ছাড়া যে-সে মেয়ের কর্ম। তাছাড়া হাজার হলেও 'ভাল আদমী' ঘি-দই খাওয়ার মুখ দিয়ে ভগবান তাদের পাঠিয়েছেন।২ কোয়েরীরা সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করলেই তারা যদি একটু আরাম পায় তো পাক। এতে কোয়েরীদের পয়সা খরচ নেই। তবে হ্যাঁ, চোখ রাঙিয়ে যদি কলে জল নেওয়ার 'হক' দেখাতে আসত, তাহলে ছিল আলাদা কথা।

দু-ঘড়া জল দু-ক্রোশ বয়ে আনা, এ কি চাট্টিখানি কথা। সাগিয়া দু-ঘড়া জল নদী থেকে এনে রেখে যেন ধুঁকছে। শক্তি ছিল তাৎমাটুলির সেই 'পচ্ছিমা' মেয়েটার। তিনটে জলভরা কলসী একসঙ্গে নিয়ে আসবার সময় এক ফোঁটা জলও উছলে পড়ত না তার গায়ে। সব সময় ঢোঁড়াই সেইটার সঙ্গে সাগিয়াকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। উঠানের মধ্যে কুয়ো না হলে চলত না সে মেয়েটার। সাগিয়ার কিন্তু কোনো

---

১ স্থানীয় প্রবাদ শব্দ।

২ ভাল লোকের অর্থ বড়লোক, জিরানিয়া জেলাতে।

আবদারের বালাই নেই। নিজে দিয়েই খুশী ; যা পায় তাতেই খুশী। দাবি কিছুর নেই। সেটা ছিল সোহাগী বিল্লি। যত দাও, তত তার চাই ; তৃপ্তি তার নেই কিছুতেই! শীতের রাতে কম্বলখানির ভাগ চাই ; তবে তিনি আরামে গরর গরর শব্দ করতে করতে ঘুমোবেন। ঘুমের ঘোরে লেজে হাত পড়ে গেলে আঁচড়াতেও কসুর করবেন না।

ভাগ্যে সাগিয়া পচ্ছিমের তরিবত শেখেনি। তাই ঢোঁড়াই এক মুহূর্তের জন্য ভাববার অবকাশ পায়নি যে, সে কোনো বিষয়ে সাগিয়ার চাইতে ছোট।

এ অঞ্চলের কুয়ো খোঁড়ার কাজ করে 'নুনিয়া'রা। তারা আগে মাটি থেকে সোরা আর নুন বার করবার কাজ করত। নিমকের হল্লার সময়, এরাই মহাৎমাজীর চেলাদের নিমক তৈরি করতে শেখাত! তাই এদের উপর পুলিশের নজর ছিল তিন-চার বছর থেকে। কলস্টরসাহেবের হুকুমে ভূমিকম্পের পরদিনই দারোগাসাহেব ডাকতে পাঠায় থানায় সব নুনিয়াদের। 'মুলুক জুড়ে' কুয়ো পরিষ্কার করবার কাজ করতে হবে বলে। তারা বিশ্বাস করতে পারেনি চৌকিদারের কথা। একবার থানায় গেলে দারোগা জেলের খিচুড়ি খাওয়াবে, সেই ভয়ে সবাই নিজের নিজের গাঁ ছেড়ে পালিয়েছিল।

কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ তাৎমাটুলির লোকের কাছে নূতন নয়। সাগিয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে নদী থেকে জল আনতে। ঢোঁড়াইয়ের জীবনের উপর দিয়ে একটা করে বিপদের ঝাপটা কেটে যাওয়ার পরই সে দেখেছে যে, কিছুদিনের মধ্যে রামচন্দ্রজীর কৃপা অজস্র ধারায় তার দুনিয়াটুকুর উপর পড়েছে। নতুন করে কাজে উৎসাহ পাচ্ছে সে।

সাগিয়া ঢোঁড়াইকে বারণ করে, না, না, ঢোঁড়াই, তুই নামিস না ইঁদারার মধ্যে। ঐ দেখতে মনে হচ্ছে বালিতে ভরে গিয়েছে কুয়োটা, কিন্তু ভিতরে পাতালে কী আছে, কে জানে।

ঢোঁড়াই হেসে বলে, 'ধরতিমাই সীতাজীকে পাতালে টেনে নিতে চান। আমার মত অচল টাকাতে তাঁর দরকার নেই।'

সাগিয়ার মুখে সলজ্জ হাসির আভাস ফুটে ওঠে। 'তুই-ই তো টেনে তুলেছিলি।'

'তুলেছিলাম কি আর সাধে। জান গিয়া রে ঢোঁড়াই বলে কী চিৎকার।'

'জানের ডর নেই কার? তুই দৌড়ুচ্ছিলি কেন পাক্কীর দিকে? সে সময় তো আমাদের কথা মনে হয়নি।'

কথাটা সত্যি। ঢোঁড়াই লজ্জিত হয়ে যায়। বালি-ভরা বালতিটা সাগিয়ার হাতে দেয়।

ঢোঁড়াই বালি তোলে কুয়ো থেকে, সাগিয়া বালতি-ভরা বালি দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসে।

ঢোঁড়াই 'পাক্কীর' সঙ্গে তার নাড়ী বাঁধা। লাঙলের ফালের দাগ যেন 'পাক্কী', আর তার দু পাশের গাছের সার, হলরেখার দু ধারের উঁচু মাটি। জীবন কেটেছে ঐ গাছের আওতায়, গোঁসাই থানে, শীতের হিমে, বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের লু-বাতাসে। পাক্কীর ধারের মাটি কাটার গর্তগুলো দেখলেই তার মনের মধ্যে ভিড় করে আসে, বাবুলাল, দুখুয়া, ঠিকেদারসাহেব, ওরসিয়ারবাবু, আরও কত কে। সবাই তারা ছিল ভাল লোক। সেখানকার সেই ছেলেটা আর তার মা, আর এখানে সাগিয়া, এই

দুইয়ের সংযোগের সূত্র পাক্কী। তাই না তার মন ওখান থেকে ছুটে এখানে আসে। সেখানে ঘা খেয়ে, এই পাক্কী ধরে এসেছিল বলেই তো, আজ এখানকার সাগিয়া বিপদে পড়লে জান বাঁচানোর জন্যে তাকেই ডাকে। বর্ষায় দু-ধার জলে ডুবে গেলেও মাথা উঁচু করে থাকে রাস্তাটা। পাক্কী ঢোঁড়াইয়ের কাছে নির্বিঘ্নতা, দৃঢ়তা আর বিশালতার প্রতীক! তাই সে ছুটে যাচ্ছিল পাক্কীর দিকে, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।

'বুঝলি সাগিয়া, এই পাক্কী ধরে এসেছিলাম বলেই তো এখানে পৌঁছে-ছিলাম।'

'তবু ভাল। চুপ করে থাকতে দেখে আমি ভাবলাম বুঝি আমার কথায় গোসা হল সাহেবের। দেখেছিস তো পাক্কীর ফাটলগুলো। সেদিন ছুটে মলহরিয়াতে যেতে চাইলেও যেতে হত না।'

সাগিয়া ঠাট্টাই করছে, না তার ছুটবার একটা মন গড়া মানে করে নিয়েছে, তা ঢোঁড়াই ঠিক বুঝতে পারে না। গল্পে গল্পে কুয়োর বালি তোলার কাজ চলে। শীতের দিনে সাগিয়ার কপালে ঘাম ঝরছে! দেখতে রোগা না হলেও সাগিয়া বড়ই ক্ষীণজীবী।

'আর বেশি পারবি না সাগিয়া। এ কি মেয়েমানুষের কাজ। আমি বরঞ্চ বিল্টাকে ডেকে নিয়ে আসি!

'না'।

ছোট্ট জবাব। রামিয়া হলে নিশ্চয়ই বলত, 'হয়েছে, আর মরদাগিরি ফলাতে হবে না।' ক্ষেতে সাগিয়ার সঙ্গে বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু আজকের মত এত তৃপ্তি কোনোদিন হয়নি ঢোঁড়াইয়ের কাজ করে। এক থালায় ভাত খাওয়ার মতো। সেই রকমই আপন-আপন লাগছে।

বিল্টাকে ডেকে আনতে হয় না। খালি বিল্টা কেন, গুটিগুটি পাড়ার সব লোক এসে জোটে, কেবল জোটে না, ঢোঁড়াইকে সাহায্যও করে। কুয়োর বালি তোলার কাজ এত সোজা, তা আগে জানা ছিল না।

সাঁঝের খানিক আগে লাডলীবাবু পর্যন্ত এসে ঢোঁড়াইয়ের পিঠ ঠুকে তারিফ করে যান।

'এই তো চাই। নইলে সরকারের ভরসায় বসে থাকলেই হয়েছে। পাক্কীর ফাটল মেরামত হবে, তবে আসবেন হাকিম সাহেবরা হাওয়া-গাড়িতে! আলবাত নজীর দেখিয়েছে কোয়েরীটোলা! পথ দেখাতে পারলে কি আর সাথে চলার লোকের অভাব হয়? এবার বিসকান্ধার সব কুয়ো ঢোঁড়াই তোমার দলকে করতে হবে। এই তো কাংগ্রেস আর মহাত্মাজীর হুকুম!'

কৃতার্থ হয়ে যায় ঢোঁড়াই। সে অবাক হয় একই মায়ের পেট থেকে লাডলীবাবু আর অনোখীবাবু দুজন দুরকমের লোকের জন্ম হয় কী করে!

ঢোঁড়াই! ঢোঁড়াই!

এর পর চারিদিকে কেবল ঢোঁড়াইয়ের নাম। সকলের ক্ষেত থেকে বালি সরাবার কাজের তদারক করে ঢোঁড়াই, কিন্তু কেন যে সে কুয়োর বালি তোলার কাজ আরম্ভ করেছিল, মনের কোণের সেই গোপন খবরটা সে কাউকে জানতে দেবে না। সেটা ঢোঁড়াইয়ের নিজের জিনিস।

কলির রঘুনাথ মহাৎমাজী। তাঁর চেলাদের বলে 'কাংগ্রেস'। বিলেত থেকে এসেছিল লাল টকটকে সাহেবের দল ভূমিকম্পের লোকসান দেখবার জন্য। কাংগ্রেসের লোকের সঙ্গে গঞ্জের বাজারে যাওয়ার পথে বিসকান্ধায় লাডলীবাবুদের বাড়ি হয়ে যায়। অতিথ-অভ্যাগতকে 'আলবৎ খাতিরদারি'১ করতে পারে বাবু-সাহেবরা। 'পুরি' খেল না। লোটা-ভরা গরমাগরম মোষের দুধের মধ্যে থলে থেকে বার করে চায়ের পাতা দিল। লাডলীবাবু তাড়াতাড়ি নতুন তোয়ের করা খড়ের ঘরটা থেকে একথালা ভুরা এনে দিলেন। হাকিম-দারোগারা ইদানীং বাবু-সাহেবের বাড়িতে আসতেন না, তাই চা ছিল না তাঁদের বাড়িতে; নইলে অমন দশটা সাহেবকে মোষের দুধে নাইয়ে দিতে পারে বাবুসাহেব।

এই দলের সঙ্গে লাডলীবাবুও গিয়েছিল গঞ্জের বাজারে। ফিরে এসে খবর দেয়, কাংগ্রেস থেকে সাহায্য করবে লোকদের, বিশেষ করে গরীবদের। নতুন নতুন কুয়ো খুঁড়িয়ে দেবে; মাটির পাট নয়, সিমেণ্টের পাট দেওয়া। লাখ লাখ বস্তা সিমেন্ট এসেছে, জিরানিয়াতে মাস্টার সাহেবের আশ্রমে। বাঁশ, খড়, কাঠের তো কথাই নেই। এই সরসোনী থানায় রিলিফ দেওয়া হবে লাডলীবাবুর 'রিপোর্টে'-এর উপর। তাই জন্যেই সরকার ছেড়ে দিয়েছে কাংগ্রেসের লোকদের জেল থেকে। কোথায় গেল এখন সাহেবি-টুপি-পরা সরকার? কত ধেনো জমি বালি পড়ে উঁচু হয়ে গেল, তার খবর নিয়েছে নাকি, ঐ খাসী খাওয়ার যম দারোগাসাহেব?

বড় সাচ্চা লোক লাডলীবাবুটা। সে কাংগ্রেসে বলে দিয়েছে যে, তার নিজের গাঁ বিসকান্ধার 'রিপোর্ট' যেন উপর থেকে কাংগ্রেসের লোক এসে নিয়ে যায়। গাঁয়ের সবাই তার পরিচিত। কাকে ছেড়ে সে কাকে দেবে। সত্যি, দৈত্যকুলে এমন প্রহ্লাদ জন্মাল কি করে। যেদিন লাডলীবাবু প্রথম জেল থেকে এল, সেদিন বাবুসাহেব সিধা হুকুম দিয়েছিল যে, এক হপ্তার মধ্যে তাকে কাংগ্রেস ছাড়তে হবে। লাডলী-বাবুটাও নাকি রুখে জবাব দিয়েছিল, তোমাকে এক হপ্তার মধ্যে জজসাহেবের সেসরী ছাড়তে হবে। অমনি জোঁকের মুখে নুন, এঁটুলির গায়ে চুন। সবে বলে বাবুসাহেব আড়াইশ' টাকা খরচ করে 'সেসরীতে' আবার নাম ঢুকিয়েছে।

লাডলীবাবু আবার বলেছে যে মহাৎমাজী আসবেন জিরানিয়ায়। ভূমিকম্পে মুলুকের লোকসান দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে। এত বড় 'সন্ত' তিনি যে আঙিনার কোণের সরষে গাছটা পর্যন্ত ঝাঁটা চাপা পড়লে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। কোথায় থাকেন মহাৎমাজী। পাক্কী যেখানে শেষ হয়েছে তার থেকেও অনেক দূরে, মুঙ্গের তারাপুর, অযোধ্যাজীর চাইতেও দূরে। পুরুবে ধান কাটনীর দেশ, গনোরীর ভাইটা যেখানে কাজ করে, সেই কলকাতা, জিরানিয়া, তাৎমাটুলি, বিসকান্ধা, শোন-পুরের মেলা, কুশীজী পার হয়ে গঙ্গাজী পার হয়ে অনেক গাঁ, আর একটা কী যেন খুব ভাল নাম, ভাগলপুর ভাগলপুর, আর কাটিহার, আরও কী কী যেন,…এই মুলুকটার ভালমন্দ দেখাশুনার ভার মহাৎমাজীর উপর। আঙুলের ডগা কেটে গেলে মাথা জানতে পারবে না? তার ব্যথা লাগবে না? তাই মহাৎমাজী আসছেন জিরানিয়াতে।

---

১ উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন।

লাডলীবাবুকে নিশ্চয় মহাৎমাজী খুব পেয়ার করেন। ধন্য জীবন লাডলী-বাবুর!

সাগিয়া হুজুগে নেচে উঠবার মেয়ে নয়। তবুও 'গানহী ভগমান'কে দর্শন করবার লোভ সামলাতে পারে না। এক সিরিদাস বাবাজী ছাড়া আর কোনো সন্তের দর্শন তার ভাগ্যে ঘটে নি। না ঢোঁড়াই, আমাদের নিয়ে চল্।

মোসম্মতের গম্ভীর ভাবটা আজকাল কেটেছে। সে-ও মেয়ের কথায় সায় দেয়। ঢোঁড়াই নানা রকম ছুতো দেখায়। কিন্তু মোসম্মতের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।

'বারো কোশ পথ তো কী হল? কত দূর দূর থেকে বলে লোকেরা আসবে। গাঁয়ের অন্য মেয়েরা যাচ্ছে না কে বলল? রাজপুতটোলা থেকে সাতখানা গাড়ি যাবে। গাড়ি নেই বলে কি আমরা যাব না। না যাক কোয়েরীটোলার আর কেউ, আমরা যাব। পাক্কী দিয়ে হাওয়াগাড়িতে চলে যাবেন মহাৎমাজী। আমাদের টোলার লোকেরা সেই ঝাঁকি দর্শনেই খুশী। আজ আছি, কাল নেই। তীরথ সাধু-সঙ্গ জীবনে হল না। কম্মের মধ্যে সেই মরা লোকটার নামে একটা ইঁদারা করে দিয়েছিলাম। সেটা পর্যন্ত ভূমিকম্পে ফেটে গিয়েছে। কপালই আমার ফাটা রে ঢোঁড়াই। হয়তো দেখবি দর্শনের আগেই আমি খতম হয়ে গিয়েছি। মরা স্বামী জামাইয়ের নাম করে মোসম্মত বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসে।

ঢোঁড়াই এর আগে জিরানিয়া যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু সাগিয়াটা তো কখনও কিছু আবদার করে না! তার কথা ঢোঁড়াই ঠেলতে পারে না।

এতদিন সে এই বিষয়ে নিজের মনের উপর কড়া রাশ টেনে রেখেছিল। ঢোঁড়াই নিজের কাছে পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না যে, জিরানিয়ার আকর্ষণ সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। পাছে আবার কেউ বুঝে ফেলে, তাই ঢোঁড়াই জিরানিয়া ফেরত কোয়েরীটোলার লোকেদের নিজে থেকে খুঁচিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। বিল্টা গত বছর মোকদ্দমার তদ্‌বির থেকে ফিরে বলেছিল যে, বকরহাট্টার মাঠে ফট্‌ফট্ ফট্‌ফট্ করে হওয়া গাড়ি চলে আর বিঘার পর বিঘা জমি চাষ হয়ে যায়। ঐ গাড়ি মেরামতের ঘর করেছে পাক্কীর পীপর গাছের কাছে। দৈত্যর মতো গাড়িগুলো দেখলেই গা ছমছম করে। এরই মধ্যে একটা লোকের 'জান' নিয়েছে। লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে। বলা নেই, কওয়া নেই, উপরের লোকটা দিয়েছে গাড়ি চালিয়ে। আর যাবে কোথায়! পিছনের লোকটা হালের ফালগুলো দিয়ে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে! সরকারী ব্যাপার বলে সাজা হয়নি কারও, না হলে ডেরাইভার সাহেবকে লটকে দিত হাকিমরা। রামনেওয়াজ মুন্সি নিজে বলেছিল।

ঢোঁড়াই সেদিন বিল্টাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ময়নার জঙ্গলগুলোও কেটে দিয়েছে নাকি বকরহাট্টার মাঠের?

বিল্টা একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। হালওয়ালা হাওয়াগাড়ির কথা জানতে আগ্রহ লোকটার নেই, জানতে চায় ময়নার জঙ্গলের কথা! ঢোঁড়াইটা কী রকম যেন!

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, 'ময়নার ডাল দিয়ে কোদালের বাঁট হয় কিনা, তাই মনে এল।'

এমন জিরানিয়ার খুচরো খবর আরও দু-একদিন ঢোঁড়াইয়ের কানে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ গাড়োয়ান চোখ বুজে কানে তুলো গুঁজে গাড়ি চালায়। কোনো খবর রাখে না। কেবল জিরানিয়া বাজারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানোর কেরামতির বড়াই! কেউ ধরলেও হয়তো তালে মহলদার কিম্বা অন্য কোনো চেনা লোকের কিছু

খবর পাওয়া যেত। দু-বৎসরের কথাটা এক যুগ আগের বলে মনে হয়, আর এক যুগ আগেকার কথাগুলো মনে হয় যেন সেদিনকার। কতদিন মনের কোণে কত ইচ্ছা এসেছে। ছেলেটাকে দেখতে, রামিয়ার কোলে। রাতের বেলায় গিয়ে বলদজোড়াকে একটু আদর করে আসতে। সাহস হয়নি। ঠেলে দূরে করে দিয়েছে এইসব চিন্তাগুলোকে মন থেকে। বিসকান্ধা তো আর খারাপ লাগে না। লোকের কি আর জায়গা ভাল খারাপ লাগে। সেখানকার লোকজনের সঙ্গে সম্বন্ধটাই লাগে ভাল কি বা খারাপ। এখানেও তো ঢোঁড়াইয়ের নতুন মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কত লোকের সঙ্গে। ছোটবেলার জানাশুনা আর বড় হয়ে পাঁচজনের মধ্যে তফাৎ গরম ভাত আর ঠান্ডা ভাতের মধ্যে তফাত। জিরানিয়ায় যেতে ইচ্ছে করলেও সে এতদিন ঠিক করেছিল যে, মরে গেলেও সে ওমুখো হবে না জীবনে। এখন ঠিক করে যে যেতে ইচ্ছে না থাকলেও সে যাবে। নিজের ইচ্ছাটাই জীবনের একমাত্র জিনিস নয়। অন্যের ইচ্ছাও কত সময় রাখতে হয় দুনিয়ার। নিজের সংকল্প বজায় রাখার চাইতে সাগিয়ার আবদার রাখতে মনে তৃপ্তি পাওয়া যায় বেশি।

অন্ধকার হওয়ার পর সে সাগিয়াদের নিয়ে জিরানিয়ায় পৌঁছুবে, যাতে তাৎমাটুলির কোনো চেনা লোকের সঙ্গে তার দেখা না হয়ে যায়।

### পাপ ক্ষয়ের উপায় কথন

জিরানিয়ায় সেদিন মোসম্মত আর সাগিয়া প্রাণভরে মহাত্মাজীর 'দর্শন' করেছিল। ধন্য তাদের পুণ্যের বল! ধন্য হো রামচন্দ্রজী! দেখে আর তাদের তৃপ্তি হয় না! সাধুবাবাজী তারা এর আগেও দেখেছে। কিন্তু দেবতার সাক্ষাৎ দর্শন' এর আগে হয়নি। চারিদিকের সাদা আলোগুলো, তাঁর শরীরের ঠান্ডা জ্যোতির কাছে মিটমিট করছে।

কত কী বললেন মহাত্মাজী! তাঁর কথা নিজে কানে শুনতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা!···

···'পৃথিবীর পাপের বোঝা বেড়েছে। তাই জন্যই দেশে এই ভূমিকম্প হয়েছে।'

ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় ঠিক বলেছেন মহাত্মাজী। রাজপুতদের পাপ; তাৎমাটুলির মোড়লের পাপ।

···'অছুৎ হরিজনদের উপর আমরা অন্যায় করি। তাদের মানুষ বলে ভাবি না। ধরতিমাই সে পাপের বোঝা সইতে পারেন নি।'···

কথাটা ঢোঁড়াই ঠিক বুঝতে পারে না। রাজপুতদের পাপের কথা কি তাহলে ভুল? তাৎমাটুলির মোড়লদের পাপের কি তাহলে কোনো ওজন নেই।

···'এই বিপদে কত লোক জেরবার হয়ে গিয়েছে! রামজীর উপর বিশ্বাস রাখবে। সমাজে যে সব চাইতে নিচে আছে, তার সঙ্গেও ভাইয়ের মতো ব্যবহার করবে। তবে না, পৃথিবীতে রামরাজ্য ফিরে আসবে। রামরাজ্যে—

নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা
নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা।১

রামরাজ্যে দরিদ্র, দীনদুঃখী, নির্বোধ বা অলক্ষুনে কেউ থাকবে না! তারই জন্য আমরা চেষ্টা করছি, তারই জন্য তোমাদের মাস্টারসাহাব চেষ্টা করছেন। তাঁর উপরই

১ তুলসীদাস থেকে।

এ জেলার ভূমিকম্পের রিলিফ সেবার ভার আমরা দিয়েছি। যে মাস্টার সাহাব পৃথিবীতে রামরাজ্য আনবার জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন আমি জানি তাঁর হাতে গরীবের উপর অবিচার হবে না।'···

এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের নজর পড়ে মাস্টার সাহেবের উপর। আগের চেয়ে একটু বুড়ো বুড়ো লাগছে। তবু একজন চেনা লোকের মুখ সে দেখতে পেয়েছে। এতদূর থেকেও ভারি আপন-আপন লাগে মাস্টার সাহেবকে।

মহাৎমাজীর পা ছোঁয়া কি সোজা ব্যাপার! জিরানিয়া বাজারের সাওজী যেন সকালবেলা দানা ছিটোচ্ছে কবুতরদের! ওখানে পৌঁছানোর সাগিয়ার সাধ্যি নাই! এখান থেকেই ছুঁড়ে দে পয়সা সাগিয়া, মহাৎমাজীর নাম করে। দে আমার কাছে, আমিই ছুঁড়ে দি। তুই কি পারবি অতদূরে ফেলতে?

আবার গায়ে-টায়ে না লাগে! মোসম্মতকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সে প্রণাম করবেই মহাৎমাজীর পা ছুঁয়ে। ভিড়ের চাপে সে এগিয়ে যায়। ঢোঁড়াই সাগিয়াকে আগলাবার জন্য সেখানেই থেকে যায়।

তারপর ঢোঁড়াই আর সাগিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করে মোসম্মতের জন্য। ভিড় পাতলা হয়ে যাবার পরও মোসম্মতকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুজনেই চিন্তিত হয়ে ওঠে। গেল কোথায়! গাঁয়ের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে থাকবে। হয়তো তাদেরই সঙ্গে চলে গিয়েছে। দেখ দেখি আক্কেলখানা একবার!

জিরানিয়া থেকে বেরিয়ে আকাশ-বাতাসের পরিচিত গন্ধটা হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের নাকে যায়। চোখ বাঁধা থাকলেও সে বুঝতে পারত যে কোথায় এসেছে। শীতের সাঁঝে শহর থেকে বেরিয়ে এখানে এলেই কনকনানিটা একটু বেশি মনে হত। আরম্ভ হয়ে যেত স্বর্ণলতায় ভরা কুলের ঝোপ, হরিয়ালের ঝাঁকের অশথপাতার সঙ্গে খুনসুরি।

একটা অজ্ঞাত ভয়ে শিহরণে ঢোঁড়াইয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বুকের টিপ-টিপুনিটা কমানোর ক্ষমতা মানুষের হাতের মধ্যে থাকলে বেশ হত! কী সব যেন বলছে! চারিদিকে ঢোঁড়াই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। অন্ধকারে বকরহাট্টার মাঠে গাছ পালা আছে কিনা কিছুই ঠাহর করা যায় না। শুনেছিল তো চীনাবাদামের চাষ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে হবে এই জায়গাটুকু। যদি আবার কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! নিজের বাড়ির দিকটায় তাকাতে ভয় করে। সেই দিকটা ছাড়া, এতক্ষণ ঢোঁড়াই আর সব দিকের জিনিস দেখবার চেষ্টা করেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না; কেবল মিটমিটে আলো দু'চারটে। যে দিকটা দেখছে না সেটারই ছবি পড়েছে তার মনে, সাড়া জাগিয়েছে তার প্রতিটি রোমকূপে। এ কেবল একটা অহেতুক কৌতূহল নয়। এ তার সত্তার অঙ্গ। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।···

···তার বাড়ির বাইরে একটা আলো জ্বলছে। কুপীর আলো বলে বোধ হয় না। নিশ্চয়ই সেই বাওয়ার দেওয়া বিলিতি লন্ঠনের আলো। যদি সেই ছোটছেলেটা ঐ আলোর পাশে ঘুরঘুর করে বেড়াত এখন। একটা ছায়া নড়তেও যদি দেখা যেত ওখানে। সাগিয়া সঙ্গে না থাকলে আর একটু কাছে যেত সে বাড়িটার। সাগিয়াটা আবার লক্ষ্য করছে না তো। গোঁসাইথানের অশ্বত্থ গাছটার তলাটা ভাঁটের জঙ্গলে ভরে গিয়েছে।

'এটা গোঁসাইথান সাগিয়া। ভারি জাগ্রত।' দুজনে সেখানে প্রণাম করে।

সেইখানেই পিদিম দিয়ে প্রণাম করার সময় আর-একজনের চুলের বোঝা ছড়িয়ে পড়েছিল। গলাকাটা সাহেবের হাতার কুলের গাছটা আছে কিনা কে জানে। শুকনো

পাতাভরা একটা গর্তর মধ্যে ঢোঁড়াইয়ের পা পড়ে, হয়তো ভূমিকম্পের সময়ের ফাটল। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে এটা নিশ্চয় বাওয়ার উনোনের গর্তটা। কেন যেন সেটাকেও মনে মনে প্রণাম জানায়।

গরুর গাড়ির সার চলেছে রাস্তা দিয়ে। নিশ্চয়ই মহাত্মাজীর সভায় গিয়েছিল এরা সকলে। পাক্কীর ধারে এটা আবার কার বাড়ি? ইয়া উঁচু! টিনের বাড়ি? কয়েকজন হাফপ্যাণ্ট পরা লোক জটলা করছে। এইটাই তাহলে লাওলের হাওয়াগাড়ি মেরামতের ঘর, যেটার কথা বিল্টা বলেছিল। লোকগুলোর গল্প কানে ভেসে আসে।

'এতদিন থেকে এত হই-হই রই-রই। লে হালুয়া! তিন মিনিটের মধ্যে মহাত্মাজীর তামাশা শেষ হয়ে গেল। খেল খতম! পয়সা হজম!'[১]

কতদিন পর ঢোঁড়াই 'লে হালুয়া! খেল খতম পয়সা হজম।' কথাগুলো শুনল। বিসকান্ধায় এসব কেউ বলে না। এইকথা কয়টার মধ্য দিয়ে সমস্ত পুরনো তাৎমাটুলিটা মনে হচ্ছে কথা বলছে তার সঙ্গে।

আন্না গন্ধটা ফিকে হয়ে আসছে। আর ঢোঁড়াইয়ের তাড়াতাড়ি এ জায়গাটা পার হয়ে যাবার উৎসাহ নেই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে গন্ধটা উপভোগ করবার চেষ্টা করে।…

এতক্ষণে সাগিয়ার কথা কানে আসে। 'এখানে খানিক বসে মায়ের জন্য অপেক্ষা করে গেলে কেমন হয়? হয়তো আগেই চলে গিয়েছে।

এই গাড়োয়ান! এই শগগড়![২]…তালে মহলদার ঘুমন্ত গাড়োয়ানদের জাগিয়ে পয়সা আদায় করছে। মহাত্মাজীর কৃপায় আজ হঠাৎ মরসুম পড়েছে তার।

'না না, সাগিয়া, আর খানিক আগে গিয়ে বসা যাবে মোসম্মতের জন্য।…'

## মোসম্মতের অভিশাপ

ঢোঁড়াই আর সাগিয়া যখন গিয়ে বিসকান্ধায় পৌঁছুল তখনও সাগিয়ার মা বাড়ি ফেরেনি।

'এ দ্যাখ আবার কী কান্ড হল! না ঢোঁড়াই, তুমি জিরানিয়াতে একবার খোঁজ-খবর কর মায়ের। তখনি আমি বলেছি। কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে। বুড়ো মানুষ!'

'দেখা যাক না আর খানিক। কোন দলের সঙ্গে নিশ্চয়ই আসবে। আর 'পাক্কী' ধরে একা আসতে অন্ধতেও প্যারে।'

সাগিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না। ঢোঁড়াই বলদের খাওয়ার জন্য জল আনতে চলে যায় ইঁদারায়। মোসম্মত দশ মরদের সমান? ও হারাবার মেয়ে নয়! অথচ এ কথাটা সাগিয়ার কাছে বলা যায় না।

উৎকণ্ঠায় যখন সাগিয়ার পুণ্য অর্জনের মিষ্টি আমেজটুকু প্রায় উবে গিয়েছে, তখন তার মা এসে বাড়ি পৌঁছুল। সাগিয়া আর ঢোঁড়াই দুজনেই দাওয়ায় বসে।

---

১ এ জিরানিয়া শহরের বাক্যরীতি; গ্রামাঞ্চলের নয়। 'লে হালুয়া'—কথাটির অর্থ 'আশ্চর্য!' কোনো পর্ব শেষ হলেই বলে 'পালা' শেষ হল। পয়সা হজম হয়ে গেল।

২ গরুর গাড়ি।

দুশ্চিন্তায় থমথমে মুখ। উনোনে আগুন পড়েনি।

...মহাৎমাজীকে প্রণাম করবার পর মোসম্মত ভিড়ের চাপে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। আঁধারে দিক ঠিক করতে পারেনি। ভীড়ের সঙ্গে এ মুল্লুক ও মুল্লুক ছিষ্টি সাত মুল্লুক ঘুরতে ঘুরতে দেখা গিধর মন্ডলের সঙ্গে 'হালুয়াই'-এর দোকানের সমুখে। গিধর আবার তাকে নিয়ে যায় সভার মাঠে। সেখানে গিয়ে কত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি! ও ঢোঁড়াই! ও সাগিয়া! কে শুনছে বুড়ির কথা! তখন কেঁদে বুক চাপড়ে মরে। গিধর বলে, ভাবনা কী; ওরা বাড়ি ফিরবে ঠিকই। ওই হারাম-জাদাটার সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার মেয়ে সাগিয়া নয়। তবে দিনকাল খারাপ; মন না মতি; ঘি আর আগুন। বাড়ি পেঁছুবে ওরা ঠিকই। কেবল আগে আর পরে। তুমি কেঁদে আর কী করবে। আমার গাড়িতে করে তোমায় নিয়ে যাব। ভোর রাত্রে বেরুনো যাবে? বুড়ো মানুষ; এতটা পথ হেঁটে আসবার দরকার কী ছিল? আমাকে একটা খবর দেওয়াতেও আজকাল অপমান হয় তোমাদের। মহাৎমাজীকে 'দর্শন'-এর পরও এই প্রবৃত্তি! কেঁদে কী হবে। সব ঠিক হয়ে যাবে মহাৎমাজীর আশীর্বাদে।

চোখের জল আর ঢুলুনির ফাঁকে ফাঁকে মোসম্মত গিধর মন্ডলকে কত হাবিজাবি মনের কথা বলে। বড় আপনার জন বলে মনে হয় গিধরকে আজ। লোকটা খারাপ নয়। তবে দশে মিলে বিশেষ করে ঢোঁড়াই অহরহ মোসম্মতের কানে মন্তর পড়ে পড়ে বিষ করে তুলেছে লোকটাকে। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিল না জেনে এতদিন। তোকে দোষ দিই না গিধর। তুই করেছিস আমার খুব। নিজের হাত আমি নিজে কেটেছি।

গপ্পে গপ্পে এক রাত্রের কথা বেরিয়ে আসে। কথাটা লচুয়া চৌকিদার গিধর মন্ডলকে বলেছিল। তুমি জান না মোসম্মত, এ নিয়ে কানাকানি হয়েছিল গাঁয়ে। তোমায় আর এ কথা কে বলবে?

মোসম্মতের চোখে ছানি পড়েনি এখনও রামজীর কৃপায়। কানেও সে তুলো গুঁজে থাকে না। ইঙ্গিতে ইশারায় ইঁদারাতলায় এ নিয়ে কেউ ঠেস দিয়ে কথা বলেছে বলে মনে তো পড়ে না তার। আগে সে ভেবেছিল চুপ করে যাওয়াই ভাল। এতক্ষণে জানতে পারে যে, দুনিয়াসুদ্ধ সব লোক তাকে দেখে এসেছে এতদিন। আর আজকের এই কেলেঙ্কারির পর তো গিধর ঢিঢিক্কার করে দেবে সারা গাঁয়ে। এর চাইতে সাগিয়াকে রাজপুতদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করতে পাঠালে দুর্নাম কম ছিল।...

গাড়ি থেকে নামতেই ঢোঁড়াই আর সাগিয়া ছুটে আসে, রাজ্যের প্রশ্ন মুখে নিয়ে। একটা কথারও জবাব দেয় না সাগিয়ার মা। সাগিয়া ঢোঁড়াইকে ইশারা করে, 'খুব চটেছে!' ঢোঁড়াইয়ের দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে সাগিয়ার মা বাড়ির ভিতরে ঢোকে।

ঢোঁড়াই অবাক হয়ে যায়। হল কী আবার বুড়ির। পাড়া মাতিয়ে কোঁদল করবার সময় এখন, অথচ যেন গরু মরেছে উঠোনে! গিধরটাও জুটেছে দেখছি সঙ্গে।

মোসম্মত মন ঠিক করে ফেলেছে।

শোন ঢোঁড়াই অনেকদিন থেকে বলব বলব মনে করছি। তোমাকে রাখা আর আমার পোষাবে না। মুখে খানিক, আর পেটে খানিক, তেমন কথা নেই আমার কাছে।

গিধর জিজ্ঞাসা করে, মাইনে-টাইনে বাকি নেই তো?

ঢোঁড়াই, সাগিয়া আর মোসম্মত তিনজনের কারও কানে কথাটা গেল কিনা বোঝা যায় না।

## সাগিয়ার অন্তর্ধান

যখনই ঢোঁড়াইয়ের জীবনটা চলনসই গোছের হয়ে আসে, অমনি একটা করে আঁধি উঠে সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে যায়। তার জীবনে বরাবর লক্ষ্য করে আসছে এটা ঢোঁড়াই! মনের রাজ্য চালানোর এই রীতি রামচন্দ্রজীর।

সেদিন তখনই সে বিল্টার বাড়িতে চলে এসেছিল। আসবার সময় সাগিয়ার দিকে সংকোচে তাকাতে পারেনি।

'চাকরি থেকে 'জবাব' হয়েছে কি রে?'—বিল্টা হেসেই বাঁচে না। 'গিধরটা আছে নাকি এর মধ্যে? সে আমি আগেই বুঝেছি।'

টোলার লোকে এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না।

জোয়ান মরদ; খেটে খাবে; তার এখানেই বা কী আর ওখানেই বা কী? মাথার ঘায়ে বলে কুকুর পাগল! এখন ঐ ডাইনী মোসম্মতটা রইল কি মরল কে ভেবে মরছে তা নিয়ে। ও বুড়িটার কথা ভাববার ঠিকে দেওয়া আছে, ঐ শালা গরুখোরটার উপর। 'আমনসভার' জুলুস ঘুচেছে গিধরটার গা থেকে। আর এখন সরকারের আমনসভার দরকার নেই। নতুন দারোগা সাহেব এসেছে। তাঁর সঙ্গে লাডলীবাবুর বেশ মাখামাখি হয়েছে, ভূমিকম্পের রিলিফের ব্যাপার নিয়ে। দারোগা হাকিমেরা আবার এসে বাবুসাহেবের ভাঙা বৈঠকেই পুরি-হালুয়া উড়োচ্ছে। এখন আর গিধরকে পোছে কোন রাজপুতটা। বাবুসাহেবের লেজ ধরে যতখানি যাবে, ততখানি ওকে পুছবে ওরা আর দারোগাসাহেব। ক'ষে ধরে থাকিস গিধর! দেখিস, বাবুসাহেবের কাছাটা আবার খুলে না যায়!

এত কথা ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। তার মন টক হয়ে আছে।

কিছুদিন পর 'বিদেশিয়ার নাচ'-এর দল এসেছিল গাঁয়ে। গরম আর বর্ষাটা গাঁয়ে গাঁয়ে দেখাবে, আর শীতকাল ঘুরবে মেলায় মেলায়। 'পচ্ছিম'-এর জিনিস; জিনিস ভাল। হাটের চালাটায় উঠেছে 'বিদেশিয়ার দল'। স্থায়ী কুষ্ঠরুগীটা তাদের জন্য খাতির করে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। গাঁয়ের ছেলেবুড়ো ভেঙে পড়েছে সেখানে। সরকার এখন আর বিদেশিয়ার গানের উপর বিরক্ত নয়। কেননা মহাৎমাজীর নিমক তৈরির গান, তালগাছ কাটার গান, চরখার সুদর্শন চক্র দিয়ে দুশমন তাড়ানোর গান উঠে গিয়েছে এরই মধ্যে! তবু লচুয়া চৌকিদারকে এখনও 'রপোর্ট' দিতে হবে থানায়, বিদেশিয়ার দল কোন্ গান গাইল।

ঢোঁড়াই দুদিন যায়নি। বলে ভাল লাগে না। তৃতীয় দিনে বিল্টা আর গনৌরী জোর করে ধরে নিয়ে যায় ঢোঁড়াইকে। কত বলে নতুন নতুন গান আমদানী করেছে এই দল, 'লালমুনিয়ার গান', 'গরুবেচার গান', কত কত! শুনলে কান্না আসে। আজকেই শেষ। কাল চলে যাবে এরা ফলকাহাটে। কোনো ওজর শোনা হবে না তোর ঢোঁড়াই!

বাধ্য হয়ে ঢোঁড়াই যায়। গান তখন চলেছে।

> গিয়েছে সে পুরুবে বাঙালা মুলুকে,
> আমাকে ছেড়ে গিয়েছে আমার রাজা,
> গিয়েছে করতে চাকরি,
> নিশ্চয় শুখিয়ে হয়েছে লাকড়ি।

মরি মরি। হাঁটুর উপর রঙিন ধুতি,
কী শোভাই দিচ্ছিল!১
ভাবলেই মন দিয়ে রস গড়ায়।
ওরে বিদেশী!
জানি তুমি এখন কার কথা শুনছ,
জানি কেন রোজগারের পয়সা গুনছ,
নিশ্চয়ই তার জন্য কিনছ,
আঁটো আঁটো ফাটো ফাটো 'চোলি'।২
ওরে বিদেশী!

মেয়ে-পুরুষ সকলেই সীতাজীর মতো অত ভাল মেয়েটার দুঃখে হাপুস নয়নে কাঁদছে। বিল্টা যে বিল্টা সে সুদ্ধ নাক ঝাড়বার ছুতো করে লুকিয়ে চোখটা মুছে নিল। কিন্তু ঢোঁড়াই নির্বিকার। সব লাগছে ফিকে, পানসে। কত অঙ্গভঙ্গি করে দেখানো, কত কসরত করে গাওয়া শেষের লাইনটা, ঠিক ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখে এসে· তারপর তার থুতনিটা ধরে নেড়ে মেয়েটা শেষ করল 'ওরে বিদেশী'। নিশ্চয়ই বিল্টা-টার শেখানো। তাই আজ ঢোঁড়াইকে ধরে এনেছে। রাগ হলেও রাগ দেখাতে নেই গানের আসরে। এটা হল ইজ্জতের কথা। ঢোঁড়াই হেঁসে ট্যাঁকের থেকে এক আনা পয়সা বার করে দেয়। সকলে হেসে বলে, যাক লোকটার 'দিল' আছে!

অথচ ঢোঁড়াইয়ের মনে এ গান একটুও সাড়া জাগায় না। দেখতে হয় দেখছে। শুনতে হয় শুনছে। সে দশটা আঁটো আঁটো ফাটো ফাটো কাঁচুলি কিনলেও দুনিয়ার কোথাও কেউ কেঁদে মরবে না! দুনিয়াতে তার জন্য কেঁদে মরবার লোক থাকলে আর তার দুঃখ কিসের!

পরের দিন গাঁয়ে দারুণ হট্টগোল। সাগিয়া চলে গিয়েছে বিদেশিয়ার দলটার সঙ্গে।

…ঐ যে দলের কর্তাটাকে দেখিসনি, শিয়ালের লেজের মতো গোঁফ, জবজবে তেল মেখে টেড়ি কাটা, ঐ যে যেটা 'হরমুনিয়া' বাজায় সেইটার সঙ্গেই ভেগেছে। রাতে নাচ দেখে বাড়িতে ফিরেছিল। তারপর ভোর রাতে উঠে, বাইরে যাবার নাম করে, উড়েছে ফুড়ুত করে। সকালে গিধর কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল প্রথমটায়। কিন্তু পারেনি। কে কে যেন যেতে দেখেছে, সাগিয়াকে বিদেশিয়ার দলের গরুর গাড়িতে। বাজে কথা নয়, তারা স্বচক্ষে দেখেছে, মাথায় কাপড়টা পর্যন্ত তুলে দেয়নি বেহায়া মেয়েটা!

সাগিয়া! সাগিয়া পালাবে ঐ লোকটার সঙ্গে! বিশ্বাস হয় না ঢোঁড়াইয়ের। কাপড়টা পর্যন্ত টেনে দেয়নি মাথায় গাঁয়ের লোক দেখেও! সে যে জোরে কথা বলতে জানে না। রাগতে জানে না বলে গিধরকে দেখে চোখ নামিয়ে দেয়। ছেলের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে মরে। মনের মধ্যে ঝড় বইলেও মুখের ভাব বদলায় না। ঠাণ্ডা মিষ্টি কথা ঝরে তার মুখ থেকে, ঠিক যেন মালসা থেকে বোশেখে টুপটুপ করে জল পড়ছে নিচের তুলসী গাছটার উপর। হাঁটুর উপর রঙিন ধুতির গান শুনে, ঘর ছাড়বার মেয়ে তো সে নয়।

---

১ হাঁটুর নিচে পুরুষদের কাপড় নামালে এদের চোখে খারাপ লাগে।
২ স্ত্রীলোকদের খুব ছোট কুর্তা। গানের লাইনটিতে আছে 'কস্‌মস্‌ চোলিয়া।'

ঢোঁড়াই বুঝবার চেষ্টা করে। সে জানে সাগিয়াকে। তার উপর রাগ করা যায় না। আওরত জাতটার উপর ঢোঁড়াইয়ের মনটা আর বিষিয়ে ওঠে না। গিধরের হাত থেকে বেঁচেছে সাগিয়া। সেই বিদেশিয়ার দলের মোচওয়ালা কর্তাটার উপরও তার রাগ হয় না। তার দুঃখ নিজের কপালটাকে নিয়ে। সব জায়গা থেকে তাকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে তার কপাল। রামজীকে পর্যন্ত সে আজ দোষ দেয় না। দুনিয়া চালানোর এই নিয়ম। তাদের নিজেদের দরকারেই তারা রামজীকে ডাকে। দুনিয়ার দরকার আছে রামচন্দ্রজীকে, কিন্তু তাঁর এই দুনিয়াটা না হলেও চলে।

বিল্টা বলে, ঐ দলের কর্তাটা আবার কী জাত না কী জাত কে জানে। জাতের মেয়ে নিয়ে গেল আর সকলে তাই পিট্‌পিট্ করে দেখবে? কত দূরই বা গিয়েছে। কাল থেকে তো ফলকাহাটে বিদেশিয়ার গান হবার কথা আছে। শুনে ঢোঁড়াইয়ের মনেও একটু খটকা লাগে। লোকটা মুসলমান নয়তো? যে রকম জুলফির বাহার!

মোসম্মত এসে কেঁদে পড়ে। ঢোঁড়াই, তুই একবার যা ফলকাহাটে; তুই বললে ফিরে আসতেও পারে। আমি গিধরের সঙ্গে গিয়েছিলাম, ফিরিয়ে আনতে পারিনি। কোন কথা বলেনি আমাদের সঙ্গে।

গিধর হন্যে হয়ে উঠেছে। সব গুছিয়ে এনেছিল আটঘাট বেঁধে। কেবল একটা দিক দেখেনি। এখন দেখছে সেই দিকটাই ছিল আসল। মোসম্মতকে নিয়ে ফিরবার সময় গিধররা রামনেওয়াজ মুন্সির বাড়ি হয়ে এসেছিল। মুন্সিজী বলছে এ নিয়ে মামলা চলবে না।

জুলফিওয়ালা দলের পাণ্ডাটাকে আমি জেলের খিচুড়ি খাইয়ে ছাড়ব; সদরে তিন দফার নালিশ ঠুকব; যতই মুন্সিজী মানা করুক না কেন। আমি ওকে ছাড়ছি না। অনিরুধ মোক্তারকে দিয়ে আমি এস. ডি. ও.. সাহেবের কাছে মামলা দায়ের করব। শালা বলে কিনা, আমি কি ঐ আওরতকে নিয়ে এসেছি? ও নিজে এসেছে। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। আমি আটকাচ্ছি না ওকে। বিদেশিয়ার গান শুনে 'হরহামেশা' জোয়ান জোয়ান ছুঁড়িরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসে। যতদিন ইচ্ছে থাক, যখন খুশি চলে যাও। তাদেরই বলে আটকে রাখি না, তার আবার এই এত বয়সের আওরতকে আটকাব! ও চলে যেতে চায় এই মুহূর্তে চলে যেতে পারে।…ঐ ধড়িবাজটাকে জুলফি আর মোচ দেখেই চিনেছি আমি। কত বলে 'ভালা আদমী'দের[১] দেখে নিলাম, হরমুনিয়ার বাজনাদার এসেছে আমাকে কানুন দেখাতে। আর বলিহারি ঐ মেয়েটার প্রবৃত্তির! গিধরের সব রাগ গিয়ে পড়ে সাগিয়ার উপর।

মোসম্মত ঢোঁড়াইয়ের পায়ে মাথা কোটে। না করিস না ঢোঁড়াই। কবে তোকে কী বলেছি সে কথাটা মনের মধ্যে গিঁট দিয়ে বেঁধে রাখিস না। বুড়ো হয়েছি, মুখের বাধন নেই। আমার সাতটা পাঁচটা নয়, ঐ একটা মাত্র মেয়ে। ঐ গিধরটার জন্যেই আজ আমার এই হাল। ওকে চুমৌনা করবার জন্য চাপ না দিলে হয়তো সাগিয়া আমার এমন করত না। তুই একবার যা ঢোঁড়াই।

ঢোঁড়াই যখন ফলকাহাটে গিয়ে পেঁছিল তখন রাত হয়েছে। ইটের উনান পেতে সাগিয়া বসেছে রাঁধতে, দলের লোকের জন্যে। পাড়ার লোকে ভিড় করছে খানিক দূরে গোলার সম্মুখের নিমগাছটার তলায়। সেই জুলফিওয়ালা দলের কর্তাটা তরই মধ্যেখানে বসে কথার তুবড়িতে আসর জমাচ্ছে। দলের অন্য সকলে হাটের এদিক-

---

১ ভাল লোকদের অর্থাৎ বড়লোকদের।

সেদিক ছড়ানো মাচাগুলোর উপর গড়াচ্ছে।

আশ্চর্য লাগে ঢোঁড়াইয়ের। একটুও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না সাগিয়ার মুখে চোখে ব্যবহারে।

কে, ঢোঁড়াই। নিজের বসবার ইটটা এগিয়ে দেয় সাগিয়া। কুপীর আলোয় মুখের খুঁটিনাটি দেখা যায় না। এই আলো-আঁধারির খেলায়, সাগিয়ার নরম মুখটা পাথরের 'মুরত'-এর মতো লাগছে। চোখের জলও কি তার শুকিয়ে গিয়েছে! ঢোঁড়াইকে দেখেও কি তার চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল আসতে নেই। অদ্ভুত মেয়ে। কথা বলে না। একটা কথা বলতেও কি ইচ্ছা করছে না ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে।

ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা ঢোঁড়াইয়ের মুখ দিয়ে বার হয় না। দারোগা হাকিমের সম্মুখে গড়গড় করে কথা বলে যায় সে, আর এখানে কী কথা বলবে খুঁজে পাচ্ছে না।

বলে, 'গিধর মন্ডল এসেছিল না?'

বলেই মনে হয় ঠিক এই গিধরের কথাটাই না তোলা উচিত ছিল এখন।

'হ্যাঁ।'

আবার কথা ফুরিয়ে যায়। সাগিয়া ভাতের ফেন গালে। ঢোঁড়াই একটা আধ-পোড়া পাটকাঠি ভেঙে, অন্ধকারে মাটিতে কী সব হিজিবিজি কাটে।

'মোসম্মত পাঠিয়েছিল।'

বলেই, আবার ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যেন ভুল করেছে সে। ঠিক কথাটা বলা হয়নি। সাগিয়া মুখ তুলে তাকায়। কুপীর আলো পড়েছে মুখে। মুখ দেখে তার মনের নাগাল পাওয়া ভার। তবু ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে, তার চোখদুটো কী যেন জিজ্ঞাসা করতে চায়। যদি এখনই বলে 'ও! তাই জন্য এলে?' কথার সূক্ষ্ম মারপেঁচ ঢোঁড়াই বোঝে না। যা মনে আসে তাই বলে ফেলে। আজ কী হয়েছে তার। যা বলতে চায় তা বলতে পারছে না কেন। কিছু কি তার বলবার নেই? কত কী ভেবেছে এতদিন। কিছু না বলাই ভাল ছিল। না আসাই ছিল উচিত। যাক, এসেছিল বলে তবু তো দেখা হল।

ঢোঁড়াই উঠে পড়ে।

'মাকে দেখো।'

ফল্গুতেও বান ডাকে। চোখের জল লুকোবার জন্য দুজনেই আঁধারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

## লঙ্কা কাণ্ড

### কোয়েরীদের নিদ্রাভঙ্গ

অনেকদিন আগে একজন মহাৎমাজীর চেলা বিসকান্ধার লোকদের ভূমিকম্পের দরুণ ক্ষতির তদন্ত করতে এসেছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক; সকলকে জিজ্ঞাসা করে অনেক লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন কাগজে। লাডলীবাবুর বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। সকলেই শুনেছিল যে, তাঁর 'রপোর্ট'-এর উপরই ভূমিকম্পের রিলিফ দেওয়া হবে সকলকে।

তারপর বছর ঘুরে ঘুরে গেল। 'রিলিফ'-এর আর কোনো সাড়াশব্দ পায়নি কোয়েরীটোলার লোকে। একরকম ভুলেই এসেছিল তারা এই কথাটা। হঠাৎ একদিন কী করে যেন সবাই জেনে গেল যে, বাবুসাহেবের বাড়িতে যে স্তূপাকার ইট আর

সিমেন্টের বস্তা জড় করা রয়েছে সেগুলো কাংগ্রেস থেকে রিলিফ পেয়েছে। গিধর মণ্ডলও পেয়েছিল দু'শখান ঢেউখেলানো টিন, শালের গুঁড়ি, চুন, সিমেন্ট আরও কত কী।

তখনই বিল্টারা দল বেঁধে দৌড়ায় জিরানিয়ার মাস্টারসাহেবের আশ্রমে। অনেক কিতাব ঘেঁটে মাস্টারসাহাব বিসকাণ্ডার রপোর্টটা পড়ে শেষ করেন। তাতে লেখা আছে 'কোয়েরীটোলায় গিধর মণ্ডল ছাড়া আর সকলেরই খড়ের ঘর। খড়ের ঘরগুলির ভূমিকম্পে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। কেবল যে ঘরগুলো মাটি দিয়ে ফাটল গিয়েছিল তার বেড়াগুলো হেলে পড়েছিল। সেগুলো কোয়েরীরা নিজেরাই মেরামত করে নেয়। ঘরের ভিতরের ফাটলগুলিও তদারকে বহু পূর্বেই তারা ভরাট করে নিয়েছিল! গ্রামের আসল ক্ষতি হয়েছে পাকা দালানগুলির। আসল পরিমাণের ফিরিস্তি পরে দেওয়া আছে। ঐ পরিমাণে রিলিফ এদের দেওয়া উচিত। কোয়েরীটোলার এক গিধর ওরফে গিরিধারী মণ্ডল ছাড়া বাকি সব পাকাবাড়ির মালিকের বাড়িই রাজপুতটোলায়। কোয়েরীটোলার যে জমিগুলিতে বালি উঠেছিল সেগুলি তারা আগেই পরিষ্কার করে নিয়েছে। ইঁদারার বালি তোলবার জন্যও তারা পরমুখাপেক্ষী নয়। এর জন্য তারা সত্যিই প্রশংসার পাত্র। এখানকার ইঁদারাটির পাট কয়েক জায়গায় ফেটে গিয়েছে। তবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি টিউবওয়েল কোয়েরীটোলার মধ্যে থাকায়, গরমের সময় লোকের অসুবিধা হয়নি। জমিগুলি থেকে বালি সরানো হলেও কিছু কিছু বালি থেকে গিয়েছে। ঐ সব জমিতে চীনাবাদাম লাগিয়ে দেখা যেতে পারে। টুর্নামেণ্ট এগ্রিকালচার ফার্ম থেকে কিছু কিছু চীনাবাদামের বীজ, কোয়েরী আধিয়ারদের দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। রাজপুতটোলায় একটি নতুন ইঁদারা দেওয়া উচিত। তাদের সব পাকা ইঁদারাগুলিই খারাপ হয়ে গিয়েছে। সাঁওতাল-টোলায় ক্ষতি কিছুই হয়নি। তারা বালিতে গর্ত খুঁড়ে যে জল বোরোয় তাই পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করে। ভূমিকম্প রিলিফের টাকা থেকে সাঁওতালটোলার জন্য একটা ইঁদারা কিম্বা টিউবওয়েল করিয়ে দিলে ঐ টাকার অপব্যয় করা হবে না বলেই আমার ধারণা।'

এর মোটামুটি মানেটা মাস্টারসাহেব বিল্টাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

যাদের যাদের বাড়িতে ফাটো ছাতা ধরে তারাই পাবে রিলিফ? এরই নাম রপোর্ট। তাই বল! যখনই লোকটা পুরি হালুয়া খেয়েছে বাবুসাহেবের বাড়ি তখনই বোঝা উচিত ছিল! মাস্টারসাহেব নিজে যদি রপোর্ট লিখত, তবে মহাৎমাজীর কথা থাকত। মহাৎমাজী বলেছিলেন যে, কাংগ্রেস থেকে সাহায্য দেওয়া হবে গরীবদের যারা নিজেরা খরচ করতে পারে তাদের নয়। তাঁর কথা থাকল কই?

সকলে গাঁয়ে ফিরে এসে ঢোঁড়াইকে দোষ দেয়। তার পাল্লায় পড়ে নিজেরা জমির বালি সরিয়ে এই ফল হল। কুয়োর বালিটা না তুললেই হত। রপোর্টে একটা রিলিফের কথা একবার লিখতে আরম্ভ করলে হয়তো কলমের ডগায় কত রিলিফ এসে যেত। সত্যিই ঢোঁড়াইটার কথায় না পড়লেই হত। লাডলীবাবু যে বলেছিলেন, নিজের হাতে কাজ করাই মহাৎমাজী চান, তবে যারা নিজে হাতে বালি তোলেনি তারা মহাৎমাজীর রিলিফ পেল কী করে?

খালি ঢোঁড়াই কেন, কোয়েরীটোলার ছোট ছেলেটা পর্যন্ত বোঝে যে, 'রপোর্ট' বাবুসাহেবের পক্ষে। যতগুলো লোক রিলিফ পাচ্ছে সবাই বাবুসাহেবের দিকের। এক রইল কেবল সাঁওতালটোলার কথা। তারা কী করে কাংগ্রেসে তদ্বির করাল,

সেটা কোয়েরীটোলার লোকেরা বুঝতে পারে না। যাকগে। গরীব মানুষ। আমাদেরই মতো পোড়াকপাল ওদের। মহাত্মাজীর নেকনজর যদি পড়ে থাকে ওদের উপর তা নিয়ে আমাদের চোখ টাটানো পাপ হবে।

এদের প্রশ্নের হঠাৎ সমাধান হয়ে যায় একদিন। নৌরঙ্গীলাল গোলাদারের ছেলে ভোপতলাল, ঐ যে, যে ছেলেটা সেবার আমনসভার মিটিনে বাগড়া দিয়েছিল, সেটা একদিন ঢোঁড়াইদের ডেকে বলে, তোরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুস নাকি? বাবু-সাহেবরা সাঁওতালটোলার পাশে যে নতুন কলমবাগান করেছে, তাতেই এনে বসিয়েছে কাংগ্রেসের দেওয়া সাঁওতালটোলার টিউবওয়েলটা! ঘুষ খাইয়েছে মহাৎমাজীর চেলাদের।

গিধর মন্ডল বলে, ও যাদের টোলার ব্যাপার তারা বুঝুক গিয়ে। আমাদের "পাবলিশে'র[১] ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দরকার কী?

ভোপতলাল ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলে যে, আমি এই ব্যাপার নিয়ে মহাৎমাজী পর্যন্ত লেখাপড়া করব। বাবুসাহেব আগে আগে হাল দিয়ে চলেছে, আর তুমি বকধার্মিক পিছনে পিছনে চলেছ খোঁড়া মাটির পোকা খাওয়ার জন্য! আশ্চর্য! গিধর মণ্ডল চটে না। আচ্ছা বাবা, যাদের জিনিস তাদের জিজ্ঞাসা করলেই তো লেঠা চুকে যায়, যে তারা টিউবওয়েলটা কোথায় বসাতে চায়।

কথাটা সকলের মনে ধরে। দল বেঁধে সবাই যায় সাঁওতালটোলায়। সাঁওতালরা বলে, থাকুক টিউবওয়েলটা বাবুসাহেবের বাগানে। আমরা ওখান থেকেই জল নিয়ে আসব।

"দেখলি তো?'

মিলেছে ভাল! গরুখোর গিধরটার সঙ্গে শুয়োরখোর সাঁওতালগুলোর। মুখের কইমাছ পিছলে পালিয়েছে ফুস মন্তরে। তাই গিধরটা রাগে নিজের হাত কামড়াচ্ছে। আর এখন ওর মোসম্মতেরই বা দরকার কী, নিজের জাত বেরাদারের সঙ্গেই বা সম্পর্ক কী। ঢোঁড়াই, তোকে একবার ও বলেছিল না তন্ত্রিমাকোয়েরী? এবার থেকে আমরা বলব যে, ও জাতে রাজপুত কোয়েরী। বাবুসাহেবের কাছ থেকে ও মন্তর নিয়েছে জানিস না? 'রপোর্ট'-টপোর্ট সব ওরা মিলে সাজশ করে করিয়েছে। নিতে হবে না চীনেবাদামের বীজের রিলিফ, রাজপুতদের পাতকুড়ানো বকশিশ।

পরের দিন ঢোঁড়াই মাচার নিচের ছায়ায় বসে একটু আরাম করে নিচ্ছে। বিল্টা কাজ করছে পুবের ক্ষেতে। একা বসে থাকলেই তার মন চলে যায় 'পাক্কীর' দিকে। পাক্কীর উপরের গরুর গাড়ির সারকে ঠিক পিপড়ের সার বলে মনে হয়। ধুলো উড়িয়ে কুরসাইলার বাস চলে গেল। এখান থেকে গাড়ির ভেঁপুর শব্দ শোনা যায়। গরুর গাড়িগুলো বাস চলে যাবার পর আবার সার বেঁধেছে। দূরে গরুর গাড়ি যেতে দেখলেই সাগিয়ার কথা মনে পড়ে; এক মেলা থেকে আর এক মেলাতে হয়তো যাচ্ছে; মাথার কাপড়খানা পর্যন্ত তুলে দেয়নি।...

লাইন ভেঙে একখানা গাড়ি পাক্কী থেকে নামল এদিকে। গাড়ির উপর বস্তা বোঝাই করা। হবে হয়তো বাবুসাহেবের!...হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের বুকের স্পন্দন একটু দ্রুত হয়ে ওঠে।...সেই রকমই তো মনে হচ্ছে! ঠিক সেই রকমই সোজা সোজা শিঙ! বাঁ দিককার বলদটার কপালের কালো দাগটা আরও কাছে এলে নজরে পড়ে।

১ পাবলিক।

এ গাড়ি বলদে তো ঢোঁড়াইয়ের ভুল হতে পারে না ; লেজের গোছার অর্ধেক চুল সাদা, ডাইনের লালিয়া বলদটার।...ক্ষেত থেকে বিল্টা জিজ্ঞাসা করে, 'কোথাকার গাড়ি ?'

জিরানিয়া টুরমনের ফারমের১। এটা বিসকান্ধা না ? কোয়েরীটোলা ? এখানকার জন্যে চীনাবাদামের বীজ পাঠিয়েছে, টুরমনের ফারম থেকে।

চেনা চেনা লাগে গাড়োয়ানের গলার স্বরটা।...যা মনে করেছিল ঠিক তাই। 'মোড়ল। তাদের তাৎমাটুলির মোড়ল। তার গাড়ি মোড়ল চালাচ্ছে কেন ? কী ভেবে যেন ঢোঁড়াই পাশের বেড়াটার আড়ালে গিয়ে বসে। আশপাশের ক্ষেত থেকে লোক গিয়ে জমে গাড়ির চারিদিকে।

'ফারম থেকে বলে দিয়েছে, যাকে যেমন দেওয়া দরকার, লাডলীবাবু খাতায় লিখে লিখে সকলকে দেবে।'

'ঐ যে আগ হাঁ করে রয়েছে, ঐটাই লাডলীবাবুর বাড়ি। ওখানেই নিয়ে যা গাড়ি। আর এ পথে ফিরবার দরকার নেই। ঐ হাঁ-করা বাড়িটার মুখের মধ্যে পুরে দিস এই বস্তাগুলো। বড় পেট ওদের। তারপর যদি কিছু বাঁচে বিলিয়ে দিস রাজপুতটোলায়।'

গাড়োয়ানটার চোখেমুখে কথা। এক মুহূর্তে সে ব্যাপারটা বুঝে নেয়।

'আরে, চটে কী করবি। ভূমিকম্পে তোদের আর কী হয়েছে। আমরা করতাম ঘরামির কাজ, আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। ভূমিকম্পে ভাঙবার পর সব খোলার ঘরে টিনের ছাত উঠেছে, সব বাড়িতে টিউবওয়েল বসেছে। তিরিশ টাকায় টিউবওয়েল পাওয়া যায়, কে আর কুয়ো খোঁড়াচ্ছে! 'ধরতিমাই'র খেয়ালই বলব একে। তাই না এই চীনেবাদামের বস্তার উপর সারারাত বসে কাটাতে হচ্ছে। আর যা পাচ্ছিস নিয়ে নে। ক্ষেতে না লাগাস খেয়ে ফেলবি। এও কি পৈতিস নাকি ? আশ্রমের মাস্টারসাহেব রপোট দেখে এক হুড়ো দিয়েছে ফারমের উপর যে, এক বছরের উপর হল এখনও কটা চীনাবাদামের বীজ পাঠাতে পারলে না বিসকান্ধায় ?

বিল্টা ক্ষেপে ওঠে, 'ঢের হয়েছে, তোর রাজপুতদের তরফ থেকে 'বালিস্টারি' করতে হবে না। জলদি বেরো আমাদের টোলা থেকে!'

রাগে গজগজ করতে করতে গাড়োয়ান বলদের লেজ মোড়ে। 'বাপের কেনা সড়ক তোদের। ধার অনেক, তো কিনে নে 'ঘোড়া'—তোদের হয়েছে তাই।'

ঢোঁড়াই বেড়ার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।...রাশের টান আলগা, তবু বলদ জোড়া মুখ উঁচু করে রয়েছে। বাতাস শুঁকছে নাকি ? নিশ্চয়ই তার গন্ধ পাচ্ছে। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দেয়। হাত-বুলোনো দূরের কথা, এমনি কপাল করে পাঠিয়েছে রামচন্দ্রজী যে, নিজের গাড়ি-বলদও বেড়ার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়।

## অভীষ্ট পূরণে বাবুসাহেবের উল্লাস

'সেসরসাহেবের পায়াভারি খানদান। কিছুদিন টাল খেয়ে পড়েছিল। এতদিনে আবার মাথা উঁচু করে জমিয়ে বসেছে গাঁয়ে। লাডলীবাবুই না একটু বিপথে গিয়ে অমন পরিবারটার জলুস একটু কমিয়ে দিয়েছিল, সেই লাডলীবাবুর কল্যাণেই তাঁদের ছাতলাধরা বাড়িঘরদোর আবার চকচকে ঝকঝকে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দারোগা-

১ টুর্নামেণ্ট এগ্রিকালচারাল ফার্ম

হাকিমের চোখেও তাঁদের কলঙ্কের দাগ মুছেছে। আসলে সব হয়েছে সময়ের গুণে; কিন্তু বাবুসাহেব বাড়িতে বলেন যে, তিনি সংসারের ভার আবার হাতে নিয়েছেন বলেই সামলাতে পেরেছেন।

বাবুসাহেব আজ সাঁঝের পর এখনও বাড়ির ভিতরে যাননি। গিধর মণ্ডলের জন্য অপেক্ষা করছেন। গিধর আজকাল প্রায় রোজই আসছে। সংসারের কাজে তালিম দেওয়ার জন্য বাবুসাহেব নাতিকে নিয়ে বসেন এই সময়টায়। আজকে গিধর সেই ব্যাপারটার একটা অন্তিম নিষ্পত্তি করে আসবে বলেছে। সব হয়েই এসেছে। গিধর করেছে এবার খুব। কাজটা করেছেও বেশ গুছিয়ে। আজকে খবরটা শুনবার পর তবে তিনি গিয়ে পুজোয় বসবেন। পুজোর উপচার সব ঠিক করাই আছে। 'ঘরবালী'১ ইতিমধ্যেই দুবার ডেকেও পাঠিয়েছেন। মেয়েমানুষের কাণ্ড! বুঝবে না কিছু, কেবল রাত হয়েছে, রাত হয়েছে!

মনের অস্থিরতা কাটাবার জন্য বাবুসাহেব অভ্যাস মতো নাতিকে উপদেশ দেওয়া আরম্ভ করেন। সে বেচারা অনেকক্ষণ থেকে বসে বসে ঢুলছে।...'অতিথি এলে দুধদই দেবেন পুরো। কিন্তু সব সময় বলবেন যে, আজকাল আর দুধ কই বাড়িতে। সব মোষ মরে হেজে গিয়েছে।...মরদের জমি বেড়ে চলে, মেয়েমানুষের জমি কমে যায়, আর হিজড়ের জমি যেমন-কে তেমন থাকে।...জমির সীমানায় তালগাছ পোঁতাটা একদম ভুল। ও হিজড়েরা পোঁতে। ঐ একটা বেঢঙ্গা লম্বা গাছ সাপ শকুনের আড্ডা। দু-পুরুষে জমি বাড়ে মোটে বেড়ের অর্ধেকটা।...যেদিকে লোক চলাচল কম সেদিককার সীমানার বাঁশঝাড়ই ভাল, আর বাড়ির কাছে কলার ঝাড়। বাবুসাহেব মনে মনে ভাবেন, মেয়েমানুষের জমির ধর্মই যে কমে যাওয়া। গিধর মণ্ডল তো শুধু নিমিত্তের ভাগী।

গাঁয়ের লোকের মন না মতি। ঘুঘু গিধর মণ্ডল এই নরম জায়গাটায় যা দিতে পেরেছিল এতদিনে। বুড়হাদাদার পাঁচ বছরের নাতিটা রক্তবমি করে দুদিনের জ্বরে মারা গিয়েছিল। তারপর গিধর বুড়হাদাদাকে কী সব যেন বলেছিল।

'ঠিক বলেছিস গিধর, এ ঐ ডাইনী মোসম্মতটারই কাজ। এ তো আমার মাথায় ঢোকেনি আগে।' বুড়হাদাদার ঘোলাটে চোখ দুটোকে লেজে-পা পড়া বিড়ালের চোখ বলে ভুল হয়। রাগের জ্বালায় এখনই বুঝি বেড়া আঁচড়াতে বসে।

বুড়হাদাদার পুত্রবধু চিৎকার করে কাঁদছিল। তার হঠাৎ মনে পড়ে যে মোসম্মত একদিন তার কাছে আগুন নেওয়ার জন্য এসেছিল।

লছমিনিয়ার মা-ও লক্ষ্য করেছে যে, মোসম্মতের খাওয়ার পরও তার হেঁশেলে এক থালা ভাত নিত্য ঢাকা থাকে। নিশ্চয়ই সেই যাদের নাম করতে নেই তাদের খাওয়ানোর জন্য।

সাক্ষী অভাব হয় না।

সারারাত নাকি মোসম্মত জেগে বসে থাকে। পায়ের শব্দে চমকে ওঠে।

সত্যিই তা! বিল্টাও নিষুতিরাতে একদিন ক্ষেতে পাহারা দিয়ে ফিরবার সময় মোসম্মতের তামাক খাওয়ার শব্দ শুনেছে।

সাঁঝের পর কে একজন যেন মোসম্মতকে হাটের চৌরাস্তার বটগাছটার নিচে বসে থাকতে দেখেছে। সেদিন হাটের দিন ছিল না। চারিদিকে চুপচাপ ফাঁকা, জনমানবের

---

১ গিন্নী।

চিহ্ন নেই, তারই মধ্যে বুড়ি বসে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল যে, হাটের কুষ্ঠ রোগীটাকে চারটে ভাত দিতে এসেছিল। বুড়োমানুষ, থকে গিয়েছিলাম বলে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।

আরও কত রকমের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 'গাঁয়ের মধ্যে থেকে এই কান্ড! জাতের বুকের উপর বসে জাতের দাড়ি উপড়ানো! এর এখনই একটা 'জাতিয়ারী'[1] বিহিত করতে হয়।

'ঠিক বলেছে গিধরটা।'

বিল্টা পর্যন্ত বলে, 'না, না ঢোঁড়াই এ আমাদের জাতের সওয়াল। তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না। সত্যিকারের ডান কিনা সেটা না দেখেই কি আর কিছু করা হবে? তোকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল তবে তোর দরদ খোচে না ঐ ডানটার উপর।'

এই 'ডাইনী কিনা দেখা' কথাটার মানে সকলেই জানে। পরীক্ষায় উতরে গেলেও নিস্তার নেই। বিষ্ঠা গুলে খাওয়ানোর পরও সে যদি স্বাভাবিক থাকে, তখন আবার প্রশ্ন উঠবে ঐ জিনিস খাওয়া লোককে জাতে তুলবার। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এ ব্যাপারটির গুরুত্বও কম নয়।

'আচ্ছা বিল্টা, তোরা গাঁ-সুদ্ধ লোক যদি চাস যে, মোসম্মত গাঁ ছেড়ে চলে যাক, তাহলে সে চলেই যাবে। তা বলে কোনো জুলুম করিস না তার উপর। আমি তাকে মানিয়ে নেব! দেখছিস না কী ছিল আর কী মানুষ হয়ে গিয়েছে, মেয়ে চলে যাওয়ার পর। তুই বরঞ্চ একবার বলে দ্যাখ গিধর মন্ডলকে।'

অনেক সাধ্যসাধনা, কথা কাটাকাটি, সলা পরামর্শের পর ঢোঁড়াইয়ের কথা রাখে গিধর। 'একবার তোর কথা রাখলাম বলে, বার বার অনুরোধ করতে আসিস না যেন ফিরে ফিরে।'

এখান থেকে খানিক দূরে, রামনেওয়াজ মুন্সীর বাড়ির পথে একটা জলা জমি উঁচু হয়ে উঠেছিল ভূমিকম্পে। সেই জমিটা বাবুসাহেবকে বলে মোসম্মতকে পাইয়ে দিল গিধর মন্ডল।

…'পুরনো ধরণের লোক বাবুসাহেব। কেউ গিয়ে কেঁদে পড়লে না করতে পারেন না। খোসামোদ করে যা চাও পেতে পার তাঁর কাছ থেকে, কিন্তু রুখে কথা বল, ঠকবে। তা ছাড়া মোসম্মতও তো আমার পর না। নগদ পয়সা বার করাই আজকালকার দিনে শক্ত। তাই নতুন জমিটার বদলে, কোয়েরীটোলার জমিটা বাবুসাহেবকে দিতে হল। তবে হ্যাঁ, সকলেরই টাকার দরকার। বাবুসাহেবকে ভাবিস সকলে 'ডবল' মানুষ[2]। আরে মানুষও যেমন 'ডবল' তেমনি তার খরচাও ডবল। সেসবের আন্দাজও তোরা করতে পারবি না, বুঝলি রে গনোরী। আমি অনেকদিন মিশেছি কিনা, আমি জানি।'…

এবার গিধরটা মোসম্মতের জন্য সত্যিই করেছে খুব। এককালে যে টাকা খেয়েছে সেটা সুদে আসলে উসুল করে দিয়েছে। বাবুসাহেবকে বলে তাঁর লোকজন দিয়ে, নিজের তদারকে, সে মোসম্মতের চালা আর খুঁটিগুলো উপড়ে নতুন জমিতে বসিয়ে দিয়ে এসেছে। কদিন ধরে দিনরাত মেহনত করেছে এর পিছনে।

---

১ জাতের পক্ষ থেকে।

২ বড়লোক।

ঢোঁড়াই মোসম্মতের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। সেই মুখরা ডাইনী বুড়ি কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। স্বামীর ভিটে ছাড়বার সময়ও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদে না। জাতের লোকদের গালাগালিটা পর্যন্ত দেয় না। তার জাতের লোকেরা তো খারাপ না! যার মেয়ে জাতকুল ভাসিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, তাকে সুদ্ধ এতদিনে একঘরে করেনি। জাতের মোড়ল গিধর, সেও তার এই বিপদের সময় যতটুকু পেরেছে করেছে। সে তার এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে থেকেও একটা কিছু ভাল খুঁজে বার করে, মনে স্বস্তি পেতে চায়।…গাঁয়ের বাইরে গেলে হয়তো সাগিয়াটা কোনোদিন মা'র কাছে আসতেও পারে।…মহাবীরজী আজ তাকে তার জাতের লোকের হাতে বেইজ্জতি থেকে বাঁচিয়েছেন।

যাবার সময় মাটির তাল বাড়ির গোঁসাইটিকে কোলে নিয়ে মোসম্মত উঠোনের তুলসীতলায় প্রণাম করে 'জয় মহাবীরজী।'

এই খবরের প্রতীক্ষা করেছিলেন বাবুসাহেব সন্ধ্যা থেকে। গিধরের কাছে খবরটা পেয়েই, তিনি তাঁর ঠাকুরঘরে ঢোকেন। ডাকবার মতো করে ডাকতে পারলে ভক্তর কথা শুনতেই হবে তাঁকে। কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বিগ্রহের পায়ের কাছ থেকে তাঁর মাথা তুলতে আর ইচ্ছা করে না। নিজের জমির উপর দিয়েই তাঁর গাড়ি সদর দরজা থেকে সোজা গিয়ে 'পাক্কী'তে উঠতে পারবে এবার থেকে।…

জয় জয় হো জানকীবল্লভ রঘুনাথজী! জয় জানকী মাঈ! জয় লছমনজী, ভরতজী, দশরথজী, কৌশল্যা মাঈ, মহাবীরজী, শত্রুঘনজী, সুগ্রীব, বিভীষণ…আর কোনো নাম ছেড়ে গেল না তো? রামচন্দ্রজীর আয়ুধগুলির নাম তার মনে পড়ছে না ঠিক। বুড়ো হওয়ার নানা লেঠা। 'পরিত্রাণায় সাধুনাং রামোজাতঃ স্বয়ং হরি,' বলে বাবুসাহেব মন্ত্র শেষ করে ওঠেন।

ও অনোখীবাবু, কোয়েরীটোলার ভজনের দলকে পাঁচসিকে চাঁদা পাঠিয়ে দেবেন কাল সকালে মনে করে।

### রামরাজ্য আনয়নার্থে যজ্ঞ

রবিবার করলে কুষ্ঠরোগ সারে বটে, কিন্তু এক রবিবারে নয়। কথাটা মনে রাখবার মতো স্মৃতিশক্তি বাবুসাহেবের এই বুড়ো বয়সেও আছে। আজকে গাছ পোঁত, দশ বছর পরে ফল ধরবে! জমি-জিরেতের ব্যাপার! অত হড়বড় করলে কি চলে!

তাই সত্যি করে ঘাড়ে পড়বার আগে কোয়েরীটোলার লোকরা তাদের বিপদের কল্পনাও করতে পারেনি। জানতে পারল হঠাৎ!

সাঁওতালটুলির লোকেরা এ জেলার লোকদের বলে 'বিরকু'১। নেহাত দরকার না পড়লে তারা বিরকুদের পাড়ায় আসে না। সেইজন্য এক রাতে মঠের ময়দানে সাঁওতালের দলকে আসতে দেখে কোয়েরীটোলার লোকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপার কী! শিকার-টিকার থেকে ফিরছে না তো? কী রে, বড় শিকার না ছোট শিকার? খরগোস না শজারু? বোস রে ঐদিকে। খয়নি নে। আগুন নিবি?

সাঁওতালরা প্রথমটায় কোন কথা বলে না। অন্ধকারের মধ্যে তাদের সাদা দাঁতগুলো দেখে বোঝা যায় যে, তারা হাসছে। তারপর পিথো মাঝি এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে যে, গেনা, গনৌরী, পরসাদী, ভবিয়া আরও কার কার যেন জমি ছেড়ে দিতে

১ 'বিরকু' কথাটির মধ্যে খানিকটা অবজ্ঞা মেশানো।

হবে সাতদিনের মধ্যে।

ঠেসে পচই চড়িয়েছে রে শালা আজ! চেঁচামেচির মধ্যে দিয়ে আসল কথা বেরোয়, আস্তে আস্তে। বাবুসাহেব ঐ সব রায়তী জমি সেলামি নিয়ে বন্দোবস্ত দিয়েছে সাঁওতালদের কাছে। সদরে ডিগরি করিয়ে দু'বছর আগেই নিলামে কিনে নিয়েছিল। তবে যে অনিরুধ মোক্তার বলেছিল 'লুটিস' না দিলে কিছু করতে পারবে না! হাকিমটা রাজপুত নাকি জাতে? না হলে নিশ্চয় টাকা খেয়েছে। নিলাম আবার কবে হল? ঢোল নেই, ঢাক নেই, গোরার বাদ্যি! চাপরাশি নেই, লুটিশ নেই, নিলাম হলেই হল আর কী!

'জান কবুল!'

এই দিন যে হাতাহাতিটার আরম্ভ, সেটা চলে বহুদিন। থানা পুলিশ, মাথা ফাটাফাটি, ফৌজদারি আদালত, কিছু করেই জমিগুলো রাখা যায় নি। দারোগা হাকিম, এমনকি হাসপাতালের ডাক্তারটা পর্যন্ত সবাই বাবুসাহেবের দিকে। শেষ পর্যন্ত একদিন পুলিশের সম্মুখে সাঁওতালরা ঐ জমিগুলোর উপর মুর্গি কেটে খেল।

এই আবহাওয়ার মধ্যে প্রথম যৌবন যেদিন 'বলণ্টিয়র'রা গান গাইতে গাইতে কোয়েরীটোলায় এল সেদিন গাঁয়ের বড়রা গান শুনবার জন্য তাদের উপর ভেঙে পড়েনি। মহাৎমাজীর চেলাদের নাম 'বলাণ্টিয়ার'।

ছেলেরা তাদের বলে, এখান থেকে সিধা গেলে লাডলীবাবুদের বাড়ি পাবেন।

তারা লাডলীবাবুদের বাড়ি থেকেই এদিকে এসেছে। সেখানে উঠবে বলে গিয়েছিল। বাবুসাহেব খাসকামরায় তাদের ডেকে বলেছিলেন যে ছাপোষা মানুষ তিনি। সংসার ধর্ম করে খেতে হয়। ছেলে হচ্ছে নিজের হাত-পা। তারই একটাকে তিনি তো দানই করেছেন মহাৎমাজীকে। লাডলীবাবুর দোস্তরা তাঁর ছেলেরই মতন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের থাকতে দেওয়ার মানে রাজপারভাঙার বিরুদ্ধে যাওয়া। কোয়েরীটোলায় ভাঙা মঠটা এখনও লোক থাকবার যোগ্য আছে। শীত পড়ে এসেছে, এখন আর সাপের ভয় নাই ওখানে।

'তোমাদের টোলায় এলাম, আর তোমরা চলে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিচ্ছ? টোলায় আমাদের থাকতে দিলে পুলিসে ধরবে না।'

সাঁওতাল, রাজপুত, আর পুলিশের সঙ্গে বলে কত লড়লাম, এই কয় বছর ধরে, তার আবার পুলিসের ভয়! ভারী সুন্দর কথা বলে বলণ্টিয়ররা।

'তাসের গোলাম বড়র খেলা জান না? আমাদের মুলুক সেই গোলাম বড়র রাজ্য। অংরেজের মাইনে পাওয়া চাকর কলক্টর দারোগা, আর পাতের এঁটো কুড়ানোর চাকর জমিদার। লড়ে দেখেছ তো? এদের সঙ্গে লড়লে 'পাবলিস' হেরে যায়। মহাৎমাজীর খেলায় পাবলিসের এক্কা[১] বড়।'

কত মজার মজার কথা বলে বলণ্টিয়ররা। বোট[২] না কী একটা কথা তারা ঠিক ধরতে পারে না। কেবল এইটুকু বোঝে যে একদিকে মহাৎমাজী, আর এক দিকে রাজপারভাঙা। মহাৎমাজীর দিকে আছে কাংগ্রিস আর মাস্টারসাহেব। রাজপার-

১ এক্কা কথাটি স্থানীয় ভাষায় দ্ব্যর্থবাচক। এর একটি অর্থ একতা। অপর অর্থ তাসের টেক্কা।

২ ভোট।

ভাঙার দিকে বাবুসাহেব, রাজপুতরা, দারোগা সাহেব, ইনসান আলি আড়গড়িয়া, গিধর মণ্ডল। বাবুসাহেবের পা-চাটা সাঁওতালগুলো কোন দিকে বোঝা যাচ্ছে না। কোন দিকে আর হবে। যে দিকে বইয়ের ক্ষেত সেই দিকেই ঐ মোষগুলো মুখ বাড়ায়।

'তোরা মানুষ না কি! 'পাবলিস'-এর জমি হড়পাচ্ছে বাবুসাহেব। মঠের জমি। আখের চাষ আরম্ভ করেছে সেই সব জমিতে। মঠবাড়ির চৌকাঠগুলো সুদ্ধ খুলে নিয়ে গিয়েছে।'

ঢোঁড়াই বলে, 'হুজুর! নিজের জমিই বলে আমরা বাঁচাতে পারলাম না জান কবুল করেও, তার আবার 'পাবলিসে'র জমি। বলন্টিয়ররা বলছে বটে কড়া কথা, কিন্তু কথাগুলো দামী কথা। গুরুজীও তো ছাত্রদের গালাগালি দেয়, বাপও ছেলেকে মারে। না হলে আবার আপনার জন কী?

'হুজুর বলোগে তোমাদের বাবুসাহেবকে, আর দারোগা হাকিমকে। মহাৎমাজী আমাদের বলে দিয়েছেন, যে-যে গাঁয়ের লোক তোমাদের হুজুর বলে সে গাঁয়ে থেকো না।'

কোয়েরীরা সকলেই ঢোঁড়াইয়ের উপর চটে ওঠে, 'মহাৎমাজীর এই হুকুমটুকুও জানিস না ঢোঁড়াই?

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয় না। বলে, আমরা মুখ্যু লোক, চোখ থাকতেও অন্ধ। আপনারা রামায়ণ পড়া লোক, আপনাদের হুজুর বলতেই আমাদের বাপ-দাদা শিখিয়েছে। এ শুধু আপনাদের ইজ্জত দেখান নয়, রামায়ণকে ইজ্জত দেখান।'

এই লোকটাই তাহলে ঢোঁড়াই! এরই কথা লাডলীবাবু বলে দিয়েছিল। কথার বাঁধুনি তো খুব। বলন্টিয়ররা হঠাৎ ঢোঁড়াইকে আপনি বলে কথা বলতে আরম্ভ করে। একে দিয়েই তাদের কাজ হবে। এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা ঢোঁড়াইয়ের জীবনে। ঠাট্টা করছে বলে তো মনে হচ্ছে না মুখ দেখে। আজকে তেল মেখেছে বলে বাবুভাইয়া ভাবল না তো তোকে! কী রকম একটা অস্বস্তি লাগে মনে।

আ গয়া! এসে গেল! এসে গেল! এল আবার কী! সাদা বাক্সতে আবার কী? 'বোট'! বোট! ভয়ের তো লক্ষণ দেখছি না বলান্টিয়রদের মুখে। মহাৎমাজীর খাদি সাদা, মহাৎমাজীর বাক্স সাদা! সাদাতে মনের ময়লা কাটবে। 'পাকসাফ'! জমিদারে রক্ত শুষে সাদা ফ্যাকাশে করে দিয়েছে আপনাদের, তাই আপনাদের বাক্স সাদা। দিতেই হবে আপনাদের। সাদা বাক্সতে।

কোনো চাঁদা কিংবা তোলা টোলা নয়তো? এ টোলায় যারা দশ আনার বেশি চৌকিদারী খাজনা দেয়; তাদেরই কেবল বোট দিতে হবে। সাঁওতালটোলায় যারা পাঁচ আনা খাজনা দেয় তারাই বোট দিতে পারবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে বুড়হাদাদার। ভাগ্যে সে সাঁওতাল নয়। খুব বেঁচে গিয়েছে সে। তাকে চৌকিদারী খাজনা দিতে হয় সাড়ে-ছয় আনা।

বিল্টার চোখ জ্বলে ওঠে। জবরদস্তি পেয়েছ! আমার বোট বসালেই হল নাকি! সার্কিল মানিজর, জমিদার আমি কিছু বুঝি না।

ঢোঁড়াইয়ের সব শুনে মনে হয় যে বোটটা গঞ্জের বাজারে সাদা বাক্সতে দিতে হয় 'ধর্মদায়'-এর মতো। নৌরঙ্গীলালের গোলায় পাট, তামাক বেচতে গেলেই দাম থেকে গাড়ি পিছু চার আনা করে কেটে নেয় 'ধর্মদায়' বলে। নৌরঙ্গীলাল সিকিটা একটা তালা দেওয়া বাক্সের ফুটোর মধ্যে ফেলবার সময় সুর করে বলবেই 'গৌ সেবা কি করো

তৈয়ারি, প্রাণ বাঁচে গোমাতাকী।'…

অদ্ভুত জিনিস এই 'বোট'। হঠাৎ টাকা পেলে লোকের ইজ্জত বাড়ে, এর অভিজ্ঞতা ঢোঁড়াইয়ের জীবনে আগে হয়ে গিয়েছে। বোটও সেই রকম রাতারাতি লোকের ইজ্জত বাড়িয়ে দেয়, কেবল যে বোট দেবে তার নয়, সারা গাঁয়ের। তাই মানিজর সাহেবের মতো অত বড় একটা লোক একদিন বাবুসাহেবকে সঙ্গে করে কোয়েরীটোলায় এলেন। বাবুসাহেব তাঁকে বলেছিলেন যে, ঢোঁড়াইটাকে বুঝোতে পারলেই কোয়েরীটোলার কাজ হয়ে যাবে। এত বড় একটা 'অফসর আদমী'১, পায়খানাতেও নাকি কুর্সিতে বসে, যার আরদালি জিরানিয়া থেকে সাইকেলে রোজ পাউরুটি আর খবরের কাগজ নিয়ে আসে। এহেন সার্কিল মানিজর সাহেবও ঢোঁড়াইকে চেনেন, নাম ধরে ডাকেন, তুই না বলে তুমি বলেন। গর্বে ঢোঁড়াইয়ের মন ভরে ওঠে।

বলণ্টিয়ররা বলেছে সারা মুলুক জুড়ে এই রকম 'বোট' হচ্ছে। চেরমেন সাহেব যদি তাৎমাটুলিতে যান এইরকম, তবে না তাৎমাটুলিকে বলব গাঁ! বলণ্টিয়ররা মঠের বটগাছে একটা সুন্দর ঝাণ্ডা বেঁধে সেইখানেই আস্তানা গেড়ে বসেছে কিছুদিন থেকে।

একদিন জিরানিয়া-ফেরত একজন বলণ্টিয়র ঝোলার ভিতর থেকে বার করে দিল মহাৎমাজীর চিঠি; যে যে 'বোট' দেবে সবার নামে এক-একখান। রামায়ণের হরফের মতো লেখা মহাৎমাজীর। যারা দশ আনা চৌকিদারী খাজনা দেয় তাদের স্ত্রীদের নামেও মহাৎমাজী চিঠি দিয়েছেন। সন্ত আদমী'রা সকলের নামধাম সব জানতে পারেন। তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াইয়েরও চৌকিদারী ট্যাক্স দেড় টাকা ধরা হয়েছিল। সেখানে থাকলে তার নামেও মহৎমাজী চিঠি দিতেন। আরও একখান চিঠি যেত 'রামপিয়ারী জোজে'২ ঢোঁড়াই-এর নামে। এখন হয়তো গিয়েছে রামপিয়ারী 'জোজে' সামুয়র। মহাৎমাজীর স্বীকৃতির সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে এত বড় একটা অবিচারের উপর। এই মনখারাপ করা কথাগুলো ঢোঁড়াই দূর করে ফেলতে চায় মন থেকে। মহৎমাজী বোধ হয় সামুয়র ধাঙড় লিখবেন না, লেখা থাকবে রামপিয়ারী জোজে সামুয়র হরিজন…কী ভাগ্যি লোকগুলোর যেগুল মহাৎমাজীর চিঠি পায়!…

শেষ পর্যন্ত মহাৎমাজীর কাছ থেকে ঢোঁড়াইয়ের নামে একখানা চিঠি আনিয়ে দিতে রাজী হয় বলণ্টিয়ররা, যদি ঢোঁড়াই তাদের সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের গাঁয়ে মহাৎমাজীর গান গেয়ে বেড়ায়। আপনার গানের গলাটা বেশ, ভজনের সময় শুনেছি তো। এ কথা কাউকে বলবেন না যেন। সেই 'বোট'-এর দিন চিঠি দেব।

ধন্যি ভাগ্যি তার, যে মহাৎমাজীর চেলাদের নেকনজরে পড়তে পেরেছিল। মনে মনে ভাবত যে দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছে সে। ছাই জানে সে! এত বড় ব্যাপার 'বোট' যার জন্য সার্কিল মানিজর দুয়োরে মাথা কোটেন, মহাৎমাজী চিঠি দেন, তার সম্বন্ধে কিছুই জানত না সে। দৈবক্রমে সে বলণ্টিয়রদের কাছ থেকে জেনেছে, বোটের মানে সাদা ডাক বাক্সে চিঠি ফেলতে হবে, মহৎমাজীর চিঠির জবাবে। বিনা টিকটের চিঠিই ঠিক জায়গায় পেঁছোয়! ঐ চিঠি পেলেই মহৎমাজী বুঝবেন যে তোমরা রামরাজ্য চাও কিনা। প্রথমেই তিনি কানুন করবেন খাজনা কমাবার

১। ক্ষমতাশালী লোক।

২। রামপেয়ারী স্ত্রী ঢোঁড়াই, ভোটারদের তালিকায় স্ত্রীলোকদের নাম এইভাবে লেখা হয়।

আর জমিদারকে কাবু করবার।

সাদা বাক্সর গান তো নয়, রামরাজ্য কায়েম করবার গান; রামচন্দ্রজী আর মহাৎমাজীর নামেই মহিমা প্রচারের ভজন। অষ্টপ্রহরভজনের দিন যে-রকম ঘোর ঘোর আবেশ আসে, সেই রকম মাদকতা আছে সাদাবাক্সর গানে। থামতে আর ইচ্ছে হয় না। ঠেলে নিয়ে যায়। সার্কিল মানিজর সাহেবের দিক থেকে টাকার লোভ দেখাতে এলে, গিধর মন্ডলকে মারতে ইচ্ছা করে। ভোটের দিন সার্কিল মানিজর তাদের কুশীঘাটের নৌকা সরিয়ে নিলে, এই নেশাটা সাঁতরে নদী পার হতে বাধ্য করে। সাঁওতালের দলকে ওদের তাঁবুতে পুরি খেতে দেখলে, মনটা পাগল হয়ে ওঠে; ঝাঁপিয়ে কেড়ে নেয় ঢোঁড়াই পাশের বলণ্টিয়রের হাতের চোঙাটা; গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে:

মাগনা কচুরি পাও খেয়ে নিও
মাগনা গাড়ি পাও চড়ে নিও
পয়সা পাও বটুয়াতে ভরে নিও
কিন্তু ভোটের মন্দিরে গিয়ে বদলে যেও ভাই হামারা
সাদা বাক্স' মহাৎমাজীকা সাদা বাক্স!

বাবুসাহেবের পাহারাদার বজ্রবাঁটুল তিলকুমাঝি ছুতো করে তাঁবুর বাইরে এসে ঢোঁড়াইকে ইশারা করে জানিয়ে যায় যে, তারা ঠিক আছে।

বলণ্টিয়রা মহাৎমাজীর চেলা। সাচ্চা আদমী। তারা তাদের কথা রেখেছিল, সেদিন বেলাশেষে। সাদা ছোট এক টুকরো কাগজে ভারী সুন্দর কী যেন একটা লিখে দিয়েছেন মহাত্মাজী। হোক ছোট। দেশজোড়া লাখ লাখ লোককে লিখতে হচ্ছে তাঁর। কত আর লিখবেন! একখানা চিঠি লিখতেই বলে মিসিরজী হিমশিম খেয়ে যায়।

বলণ্টিয়র ভাঙা গলায় তাকে বলে', 'তোর নাম ঢোঁড়াই কোয়েরী, বাপের নাম কিরতু কোয়েরী বিসকান্ধার। হাকিম জিজ্ঞাসা করলে বলবি। মুখস্ত রাখিস, বাপকা নাম কিরতু কোয়েরী। হাকিম আর একখানা মহাৎমাজীর চিঠি দেবে।' এখান নিয়ে গিধর মন্ডলের তন্ত্রিমাকোয়েরী কথাটা ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে। এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় তার সারা শরীর ঘেমে ওঠে; সকলে বোধ হয় তাকে দেখছে; চলবার সময় পা জড়িয়ে আসছে। সে যখন হাকিমের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি চটে আগুন হয়ে পিথো সাঁওতালকে বকছেন। চিঠি ফেলবার আগে সাদা বাক্সটায় সিঁদুর দিচ্ছিল সে।...জেলে পুরব তোকে আমি; বাক্সর রং বদলান হচ্ছিল!...

ঢোঁড়াইকে দেখেই অসহায় পিথো অকূলে কুল পায়। 'দেখছিস ঢোঁড়াই হাকিমের কাণ্ড! আমি বলি হাকিম তুমিও নাও না কেন বিড়ি খাওয়ার জন্য এক আনা পয়সা। তা নয় আমাকে হাজতে পুরবে বলছে!...,

হাকিম ঢোঁড়াইকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই হাত বাড়ান, তার হাত থেকে মহাৎমাজীর চিঠিখানা নেওয়ার জন্য। 'ঢোঁড়াই কোয়েরী?' নতুন মহাৎমাজীর চিঠিতে হাকিম ডাকঘরের মোহর মেরে দেন। 'যাও!' হাকিমের চিৎকারে ঢোঁড়াই চমকে ওঠে। তবু ভাল! হাকিম পিথোটাকে ছেড়ে দিল।

ঘরের মধ্যে সাদা বাক্সটাতে প্রণাম করে ঢোঁড়াই চিঠিখান তার মধ্যে ফেলে। ধন্য হো মহাৎমাজী, ধন্য হো কাংগ্রেসের বলণ্টিয়র, যাদের দয়ায় নগণ্য ঢোঁড়াই রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাটবেড়ালীর কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল। দুঃখে

তার বুক ফেটে যায়, সে যদি লিখতে জানত তা হলে নিজে হাতে লিখে দিত মাহাৎমাজীকে। এই চিঠির মধ্যে দিয়ে মুলুকের এক পারের লোক সেই কোথায় অন্য পারের মহাৎমাজীর কাছে পেঁছিতে পারছে, এক সঙ্গে, এক সময়। তাৎমাটুলি, জিরানিয়া, বিসকান্ধা, গঞ্জের-বাজার, ঢোঁড়াই, রামপিয়ারী, পিথো সাঁওতাল, বলন্টিয়র, তিলকুমাঝি, মাস্টারসাহেব একই জিনিস চায়। তারা সকলে একই চিঠি দিয়েছে মহাৎমাজীকে। সরকার, হাকিম, পুলিশ, জমিদার, সার্কিল মানিজর, গিধর কোয়েরী, বাবুসাহেব, ইনসান আলি বোধ হয় কিরিস্তান সামুয়র, সব তাদের বিরুদ্ধে। জাতের মিল নেই, তবু কত কাছে এসে গিয়েছে তারা। রামিয়া আর তার ছেলেটা যে-রকম আপন হলেও পর, তেমনি এরা সব পর অথচ আপন। মাকড়সার জালের মতো হালকা স্থতোর বাঁধন, ধরতে গেলেই ছিঁড়ে যায় এমন মিহি। সব সময় বোঝাও যায় না আছে কি নেই ; হাওয়াতে যখন দোলা দেয়, ভোরের শিশিরে যখন ভিজে ওঠে, হঠাৎ-রোদের যখন ঝলকানি লাগে, তখন দেখা যায় ; তাও খানিক খানিক। রামজীর রাজ্য জুড়ে পলকা স্থতোর জাল বুনে চলেছেন তাঁরই অবতার মহাৎমাজী। সেই পশ্চিমা মেয়েটার বাঁধন, সেই সাত বছরের ছেলেটার বাঁধন, সাগিয়ার বাঁধনের মতো এ বাঁধন কেটে বসে না গায়ে। ঝামা দিয়ে ঘষলেও কলজের উপর থেকে সেগুলোর দাগ তোলা যায় না, কিন্তু এটাতে কেবল আমলকী খাওয়া মুখের মতো একটা ফিকে স্বাদ রেখে যায়।

'এই করছ কী ভিতরে ?'

হাকিমের তাড়া খেয়ে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে !

### লাডলীবাবুর চরু লাভ

লাডলীবাবুটা আবার আনাগোনা আরম্ভ করেছে কোয়েরীটোলায়। ও লোক ভাল, মহাৎমাজীর চেলা। 'দুবার হয়ে এসেছে'১। কিন্তু তবু বিশ্বাস নেই ঐ রাজপুতদের ঝাড়কে।

বিল্টা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এই যে তিন মাস অন্তর বোট আরম্ভ হল এর শেষ আছে কি নেই। আসল কাজের কথা কিছু নেই, কেবল নিত্যি তিরিশ দিন 'বোট, বোট, বোট'। বোট জিনিসটা খারাপ নয়। সেদিন দারোগা সাহেব আর সার্কিল মানিজর সাহেবের গা ঘেঁষে তারা চলে গিয়েছিল, আদাব না করে। আরে কাংগ্রেসের লোকেরা লাটসাহেবের সঙ্গে লড়েছে, ওরা দারোগা-জমিদারকে গিলে ফেলতে পারে গলার গুলিটাকে পর্যন্ত না নাড়িয়ে। আর এই রাজপুতদের ? চোখেও দেখা যাবে না ; উটের মুখে জিরে ! ফুঃ !

লাডলীবাবুর সম্মুখে রাজপুতদের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস তাদের হয়েছে, আগের ভোটের পর থেকে। কাংগ্রেস থেকে আধিয়াদারদের জন্য নতুন কানুন হবে বলন্টিয়র বলেছে। আর পরোয়া কিসের !

বাবুসাহেবের খোশামোদ করে তো গনৌরী, ভাবিয়া, পরসাদী কেউ জমি রাখতে পারেনি। ভোলাকে যেতে হয়েছে কাটিহারে কাজের জন্যে। গনৌরী, ভাবিয়া আর পরসাদী গিয়েছে কুরসাইলা। সেখানে রাজপারভাঙা চিনির কল খুলেছে তিন বছর থেকে। আর চায় না তারা বাবুসাহেবের পা চাটতে। এক সময়ে অসময়ে কিছু

১ জেল থেকে।

খরচখরচার ব্যাপার। রামজীর আশীর্বাদে তারও একটা সুরাহা হয়েছে। গঞ্জের বাজারে নৌরঙ্গীলাল গোলাদার, ঐ যে, ভোপতলালের বাবা, সেই দরকার হলে খরচ দেয়। যত চাও। ভাল রক্তের লোক। ধার শোধ দেবার সময় বুড়হাদাদু প্রতিবার দাড়িতে যে গিঁট দিয়ে রাখে, সেটাকে কখনও অবিশ্বাস করেনি আজ পর্যন্ত। ঐ ত বাবুসাহের! সব জানা আছে। এত বছর থেকে দেখছে বাবুসাহেব আর তাঁর গোমস্তাদের। এক কথার মানুষ নৌরঙ্গীলাল গোলাদার। সাফ বলে দিয়েছে আখের চাষ আর লঙ্কার চাষ করতে হবে। না করলে তার গোলামুখো হওয়ার দরকার নেই। সে কুরসাইলা মিলে আখের যোগান দেয়, আর লঙ্কা পাঠায় পূর্বীবাঙাল। তারই গাড়ি এসে গাঁয়ে থেকে নিয়ে যায়। কোনো হুজ্জত নেই। তবে আর রাজপুতদের এত 'খাতিরদারি' কিসের? বিপদের সময় রামচন্দ্রজী কাকের মুখ দিয়ে পথের হদিশ পাঠিয়ে দেন। তাই না নৌরঙ্গীলালের কাছ থেকে তারা এমন আখ পেয়েছে পুঁতবার জন্য, যা বাবুসাহেব পর্যন্ত যোগাড় করতে পারেননি। বুনো শুয়োরের দাঁত ভেঙে যায় সে আখ চিবুতে গেলে। পাটনাই লঙ্কার বীচি দিয়েছে, এত বড় বড়, এই আঙুলের মতো; কাঁচা লঙ্কারও যা দর, পাকা লঙ্কারও তাই দর। গোলাদারই তো শিখিয়েছে, কেন এতদিন ক্ষেত পাহারা দিবি, কাঁচাই বেচে দে। এই নৌরঙ্গীলালই প্রথম কাঁচা লঙ্কা পাঠাতে আরম্ভ করেছে রেলগাড়িতে। বাবুসাহেব চটবে তো বসে বসে নিজের গোঁফের চুল কাটবে দাঁত দিয়ে।

লাডলীবাবু বলে 'হাঁ, পূর্বীবাঙাল'-এর মতো নরম পানির দেশে কাঁচা লঙ্কা না খেলে লোকে বাঁচে না। আমি একবার গিয়েছিলাম। খালি পানি, খালি পানি। সাধে কী আর বাঙালীরা এখানে এসে জমিয়ে বসে। এই মাস্টারসাহেবকে দেখ না। এবার ঠিক ডিস্টিবোর্ডের চেরমেন হওয়ার চেষ্টা করবে।'

কেউ কথাটার উপর কোনো গুরুত্ব দেয় না। ঢোঁড়াইয়ের একটু আনন্দই হয়। তবে পুরনো চেরমেনসাহেবের মতো অত বড় একটা লোকের কাজ মাস্টার সাহেব চালাতে পারবে তো? বড় ভালো লোক ছিল চেরমেন সাহেবের বাড়ির বুড়ি-মাইজী।

সবাই জানে যে, লাডলীবাবু এবার ডিস্টিবোর্ডে দাঁড়াচ্ছে কাংগ্রিসের থেকে। হাতে কাটবে এবার। ডিস্টিবোর্ডে যাওয়ার আগেই বলে খোঁয়াড়ের মালিক ইনসান আলি, গঞ্জের-বাজারের হাসপাতালের ডাক্তার, ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। রাজপুত-দের সঙ্গে জমি নিয়ে ঝগড়ার সময় কিছু বলতে গেলে বলত যে, আমি তো জমি-জিরেত সম্বন্ধে কিছু জানি না; জমি দেখাশোনা করেন অনোখীবাবু আর বাবু-সাহেব।

মরে যাই রে! মুখের মাছিটা তাড়াতে পারেন না! সব বুঝি রে, আমরা সব বুঝি।

লাডলীবাবুও এদের হাবভাব সব বোঝে, কিন্তু তবু হাল ছাড়ে না।

হঠাৎ এরই মধ্যে একদিন টোলাসুদ্ধ সকলের নেমন্তন্ন হয়ে গেল 'সত্যদেবের কথা' শুনবার জন্য, গিধর মণ্ডলের বাড়িতে।

ব্যাপারখানা কী! হাড়কঞ্জুস লোকটা তো বিনা পয়সায় গায়ের ময়লাটুকুও কাউকে দিতে রাজী নয়। সে করবে দেড় টাকা খরচ বিনা মতলবে! আরে, বাবু-সাহেবের দেওয়া ভজনপার্টির দরুন সেই পয়সাটা নয় তো? ঠিক, ঠিক, ঠিক! উগলে দিচ্ছে। দেবদানো পুরুত গুণীর পয়সা কি কারও পেটে থাকে? সে যত বড়

গরুখোরই হোক না কেন।

ঢোঁড়াইয়ের নেমন্তন্ন হয়নি। সকলের চোখেই জিনিসটা বিসদৃশ ঠেকে। 'জাতিয়ারি' সত্যদেবের কথা, এ তো জন্মেও কেউ শোনেনি কোনোদিন।

সেখানে গিয়ে, এদিককার কোয়েরী জাতের মাথা গরভু পত্তনিদারকে দেখে' তারা ব্যাপারটার মোটামুটি আন্দাজ করে নেয়।

পুজোর পর গরভু পত্তনিদার কাজের কথা পাড়ে।···সবাই মিলে রাজপুত আর ভুমিহার বামুনদের ঠাণ্ডা করতে হবে। নামেই মহাৎমাজীর কাংগ্রেস। রাজপুত ভুমিহাররাই মহাৎমাজীকে ঠকিয়ে এটাকে হাত করেছে।···লাডলীবাবু! কোথায় ছিল লাডলীবাবু, যখন ইনসান আলির আড়গড়িয়ার খোঁয়াড় থেকে, একটা লাল বলদ কর্পূরের মতো উবে গিয়েছি বকরঈদের আগে। সে সময় কোথায় ছিল রাজপুতগিরি? 'মহাবীরী ঝাণ্ডা' নিয়ে যাওয়ার দিন কলস্টরকে খবর দিয়েছিল কে? হাতে কঙ্কণ, আরশির দরকার কী? অনেক চেটাং চেটাং কথা বলেছিল কংগ্রেস মহাৎমাজীর ভোটের আগে। এখনও শুনছি কানুনই তৈরী হচ্ছে। একটা কানুনও করবে না, এই বলে রেখে দিলাম।···আমাদের সাহায্যেই ভোটে কাংগ্রেস জিতেছিল আগেরবার। এবার তাই আমরা ঠিক করেছি কূর্মছত্রি, কুশবাহাছত্রি, আর যদুবংশীছত্রি ১ এই তিন জাত মিলে রাজপুত ভুমিহারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব। এই তিন জাতে মিলে হয়েছে, ত্রিবেণী সঙ্ঘ।'

ভারী সুন্দর নামটা। তিরবেণী সং।

বুড়হাদাদু গরভু পত্তনিদারকে শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিল্টাকে, 'এত বুদ্ধির কথার সঙ্গে এর আগে মোলাকাত হয়েছে জিন্দেগীভরে?'

রাজপুতি শান দেখাতে আসে! অবজ্ঞায় বাঁকানো ঠোঁটের পিচকারী থেকে, চিক চিক করে খয়নিগোলা থুতু মেঝের উপর ছোটে।

গিথরটা এতক্ষণ কথা বলেনি। সকলের উঠবার সময় কেবল বলে, 'যে জাত ঘুমিয়ে থাকে, সে জাত বাঁচে না।'

বিল্টার ছাঁত করে মনে লাগে কথাটা। এর আগেও একবার কথাটা শুনেছিল গিধরের মুখে, কোথায় যেন। মনে করে দেখবার চেষ্টা করে বাড়ি আসতে আসতে।

ডিস্টিবোড ঢোঁড়াইয়ের কাছে যেমন জীবন্ত জিনিস, এদের কাছে ততটা নয়। ছোট বেলায় সে অষ্টপ্রহর শুনেছে ডিষ্টিবোডের কথা—বাবুলাল চাপরাসী' ঠিকাদার-সাহেব, শনিচরার দল, তালে মহলদার, রোড পিয়ন। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে ডিস্টিবোডের ঘড়িঘরের ঘড়ি বাজবার শব্দ শুনেছে।···তবু এই ডিস্টিবোডের ব্যাপারে কোয়েরীটোলার লোকেরা তাকে আমলই দিতে চায় না। ঢোঁড়াইয়ের 'পাক্কী'র মালিক ডিস্টিবোডে কী করে যেন, কোয়েরীদের 'জাতিয়ারি সওয়াল'২ হয়ে গিয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা 'তিরবেণী সং' শুনতে শুনতে একেবারে কান ঝালাপালা!···গয়লাদের মধ্যে দুটো ভাগ আছে জানিস তো? 'কিসনৌৎ' আর 'বিসনৌৎ'। একটা দুধে জল মেশায় আর একটা মেশায় না। ঐ দুধে জল মেশানোর যমগুলোকে রাজপুতরা তাদের দলে টেনে নিয়েছে মহাৎমাজীর নাম করে।···আরও কত কথা।

···'এক গাছের বাকল কি অন্য গাছে জোড়া লাগে?'

---

১ কুর্মি' কোয়েরী, গোয়ালা।

২ জাতের প্রশ্ন।

ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে, তাকে শুনিয়েই কথাটা বলল বুড়হাদাদা।…

ভোটের দুদিন আগে খবর পাওয়া যায় যে, গরভু পত্তানদার নাম তুলে নিয়েছে। বিনা ভোটে লাডলীবাবু ডিস্টিবোডে যাবে।

জাতের মাথা গরভু পত্তানদার; সে কিনা জাতের সঙ্গে এই নেমকহারামি করল রাজপুতদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে! তাই জন্যই গিধরটা ক'দিন থেকে লাডলীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে বোধ হয়।

এর দিনকয়েক পরে কী করে যেন লাডলীবাবু ডিস্টিবোডের চেরমেন হয়ে গেল।

তবে যে লাডলীবাবু বলেছিল মাস্টারসাহেব চেরমেন হবে? এবার সত্যিই হাতে কাটবে রাজপুতরা!

কোয়েরীটোলার কেউ আর সেদিন ক্ষেতে কাজ করতে যায়নি।

## আচম্বিতে দৈববাণী হওন

লাডলীবাবু চেরমেন হওয়ার পর থেকে জিরানিয়ায় মাস্টারসাহেবের আশ্রমেই থাকেন। ডিস্টিবোডের ওরসিয়রবাবু এসে 'পাক্কী' থেকে বাবুসাহেবের বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা তোয়ের করিয়ে দিয়েছেন। নতুন কুরসাইলা জিরানিয়া লাইনের বাসটা সেই রাস্তা দিয়ে রোজ বাবুসাহেবের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। বাবুসাহেব প্রত্যহ জিরানিয়াতে যাতায়াত করেন অনিরুধ মোক্তারের কাছে। ঢোঁড়াইরা আবছাভাবে অনুভব করে যে, একটা কোনো বিপদ আসছে তাদের উপর। কোথা দিয়ে আসবে, কেমন করে আসবে, তা তারা জানে না। তবে বাবুসাহেব কাছারী যাচ্ছে রোজ। নিশ্চয়ই রামনেওয়াজ মুন্সি কানুনী সলা দিচ্ছে তাঁকে।

পরিষ্কার করে বলে না ঢোঁড়াই। কিন্তু তারা সবাই জানে বিপদ একদিক থেকেই আসে 'আধিয়াদারদের'। জমির দিক থেকে। যেদিন ইচ্ছে জমি থেকে সরিয়ে দিতে পারে বাবুসাহেব। এতদিন হয়ে গেল, এখনও কাংগ্রেসের কানুন এল না। বলণ্টিয়রকে জিজ্ঞাসা করলে বলে কানুন কি কমলালেবুর বীচি যে, টিপে দেবেন আর পুচং করে বেরিয়ে আসবে।

এদিকে বাবুসাহেব যে রোজ ডেকে পাঠাচ্ছে সাঁওতালটোলার আর কোয়েরী-টোলার 'আধিয়াদারদের' নতুন করে টিপসই দেওয়ানোর জন্য!

সকলে যখন প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তখন একদিন সত্যিসত্যিই কানুন এসে গেল। বলণ্টিয়রকে দিয়ে মহাৎমাজী পাঠিয়েছেন পাটনা থেকে।

বলণ্টিয়র বলে, কত নেবেন নেন—একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, আরও…

বিল্টা 'আরও একটা', বলে সার্কাসের ভাঁড়ের মতো বটুয়া থেকে বিড়ি বার করে—

মরদের কথা হাতির দাঁত। কাংগ্রেস কথা রেখেছে কিনা দেখুন। দুমুখ দিয়ে কথা বলে না মহাৎমাজীর চেলারা। বিনা রসিদে কোনো আধিয়াদার ফসল দেবেন না। আঠারো সের পাবে জমিদার, বাইশ সের আপনি। আধাআধি নয়।

'মজকুরী সেপাই' আর কোনো জমিদার রাখতে পারবে না।

যারা নগদ খাজনা দেয়, তাদের খাজনা কমে যাবে।

যাদের জমি নিলাম হয়ে গিয়েছে, ফেরত পাবে। তার জন্য দরখাস্ত দিতে হবে 'ফারম'এ১। আমার কাছে 'ফারম' আছে। আমি শস্তায় 'ফারম' দেব আপনাদের। আট আনা করে দাম। সাদা রঙের। রামনেওয়াজ মুন্সিরা বেচবে চার আনা করে,

---

১ দরখাস্তের ফরম।

কিন্তু সেগুলোর রং হলদে, যাতে করে সাওজী পোস্তদানা বেচে। আমার ফারম পাটনায় ছাপা। আজকাল কাংগ্রেসের সরকার, কাংগ্রেসের হাকিম, তাই কাংগ্রেসের 'ফারম'-এই ফল ভাল হবে। খাতা খেশরা নম্বর দিতে হবে দরখাস্তে। যাদের নেই তারা আমাকে তিন টাকা করে দিলে জমিদারী সেরিস্তা থেকে আমি আনিয়ে দেব ;...

জমিতে কুয়ো খুঁড়তে পারবেন আপনারা।

এতদিন পারা যেত না নাকি। নিজের অজ্ঞানতায় ঢোঁড়াই মনে মনে লজ্জিত হয়। স্বর্গের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে বলন্টিয়র। সাঁওতালগুলো আবার কখন এসে জুটেছে। বোস বোস মাদলটা নিয়ে এলে পাগতিস বড়কামাঝি।

ঢোঁড়াই একরাশ রাঙা আলু দেয় উনুনে।

ঘরের ধোঁয়ায় চারিদিকের কুয়াশা আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো একটা একটা করে লোকের চেহারার মত হয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কারও বাপ দাদার আকৃতি নিশ্চয়। বাপ-দাদারা স্বপ্নতেও যা ভাবেনি, তাই আজ দেখিয়েছে বলন্টিয়র। চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোনালি ধানের স্তূপ, তার বাইশের দিকটা 'মোরঙ্গ'-এর[১] পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠছে ; আর আঠারোর দিকটা যেন মেঠো ইঁদুরের গর্তর উপরের বালির ঢিপি। সেদিকটায় বসে রয়েছে বাবুসাহেবের সেপাই বটেশোয়ার সিং।

বলন্টিয়র উঠে দাঁড়ায়। বাবুসাহেবের নূতন বৈঠকখানায় তার শোবার জায়গা রয়েছে।

সেই ভাল বলন্টিয়র, শীতের মধ্যে।

বলন্টিয়রের বোধ হয় একটু লজ্জা লজ্জা করে। সে আগুনের মধ্যে থেকে একটা রাঙা আলু বার করে নেয়।

'আমরাও কিসানের ছেলে, কীর্তিগঞ্জের রাজার খানদানের লোক না। লাডলীবাবু আবার তাঁদের ওখামে খাইনি শুনলে দুঃখিত হবেন তাই...'

সকলে দল বেঁধে তাকে বাবুসাহেবের বাড়ির গেট পর্যন্ত পেঁছে দেয়।

'বন্দেগী।'

বলন্টিয়র বলে, 'নমস্তে!'

ফিরবার পথে বড়কামাঝি বলে, কিতাব পড়া লোক বলন্টিয়র ; দেখিস না 'মৈ মৈ'[২] বলে পাচ্ছিমা বিল্লির মতো।

সকলে হেসে সমর্থন জানায় বড়কামাঝির কথাটাকে।

ঢোঁড়াইয়ের মনে হয়, এত ভাল মহাত্মাজীর বলন্টিয়র, এর কথা শুনতে ভাল লাগে, দেখলে ভক্তি হয়, তবু কোথায় যেন একটা ব্যবধান আছে। ভাল না হলে কি আর রামায়ণপড়া লোক তাদের দুয়োরে দুয়োরে ঘুরে বেড়ায়। রামায়ণের হরফগুলো একটা পাতলা পর্দা টেনে ধরেছে তাদের আর বলন্টিয়রের মধ্যে।

## রসিদ প্রার্থনায় বিপত্তি

গঞ্জের বাজারের ভোপৎলাল ঢোঁড়াইকে বলে দিয়েছিল, নতুন কানুনে বারো

---

১ মোরঙ্গ নেপালের একটি জেলার নাম।

২ যুক্তপ্রদেশের হিন্দীতে আমি অর্থে 'মৈ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিহারে ঐ অর্থে 'হম' কথাটি প্রচলিত।

শহরের উপর দখল থাকলে 'আধিয়াদারদের' কিছুতেই সরাতে পারবে না বাবুসাহেব। এর কথা তো বলেনি বলণ্টিয়র।

'মরে মুছে যাবি' তবু দখল ছাড়িস না। 'আঠার বাইশ' ভাগের সময় আগে রসিদ নিয়ে তবে ফসল দিবি। ঐ রসিদখান পরে দখলের প্রমাণ হয়ে যাবে হাকিমের সম্মুখে।'

বড়কামাঝিও এসেছিল সঙ্গে। সে জিজ্ঞাসা করে, 'আর দারোগার সম্মুখে?'

'সেখানেও!'

'সেই রসিদখানাই?'

'হ্যাঁ।'

অদ্ভুত! একথা ভাবতেও মনে একটা উদ্দীপনা আসে। ফসল দেওয়ার কথাটা এক টুকরো কাগজে লিখে দেবে, আর সেটা হয়ে যাবে রসিদ। দুনিয়ার 'গুড়ের ভাণ্ডার আথ'১ যে ঐ কাগজটুকুর মধ্যে, তা কি সে আগে জানত। কাঁচা ধানের দুধটা যেমন আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে চাল হয়ে ওঠে, তেমনি রসিদটা হয়ে উঠবে দখলের প্রমাণ! হদ্দ করেছে কংগ্রেসী সরকার! বেদখল করতে না পারার মানেই যে পায়ের নিচের মাটিটুকু এক রকম তারই হয়ে যাবে।

এতখানি উঁচু আল দেওয়া চারিদিকে; নিড়ানো আগাছাগুলির একটাও সে আলের বাইরে যেতে দেবে না; একটুখানি গোবরও ধুয়ে যেতে দেবে না ক্ষেতটুকুর বাইরে; ক্ষেত থেকে বেরুবার সময় পায়ের কাদামাটিটুকু আলের ধারে মুছে নেবে। ও যে নিজের। একেবারে নিজের ছেলের মতো খাওয়াবে বুড়ো বাপকে।...

সেই রাতেই কোয়েরী আর সাঁওতালরা মঠের মাঠে জড় হয়। ফসল তোয়ের ক্ষেতে। তাই দেখেই মহাত্মাজী কানুন পাঠিয়েছেন জল্‌দি করে।

চেঁচামেচি হট্টগোলের মধ্যে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা কিছু হয় না। মহাত্মাজী কানুন করে দিয়েছেন। আর ভাববার কী আছে। রসিদ দখল, রসিদ জমি, রসিদ জিন্দগি, জান কবুল; মরে মুছে যাও; রসিদ দেও, ফসল লেও! রসিদ দেও, ফসল লেও! মহাবীরজীকি জয়! মহাত্মাজীকি জয়! ভোপৎলাল লোকটা বলণ্টিয়রের চাইতে ভাল; কিন্তু বলণ্টিয়রের মতো আমাদের গাঁয়ে আসে কই! কেবল দোকান আর বাজার!

রসিদ চাইবার প্রথম ঝাপটা গেল সাঁওতালটুলির উপর দিয়ে।

ঢোঁড়াই বলে দিয়েছিল, ফসল কেটে টোলার খালিহানে২ জড় করতে। সেখানেই ভাগ হবে। না হলে বাবুসাহেবের খলিহানে একবার গেলে কি আর রসিদ দেবে, না আঠার-বাইশ ভাগ করবে?

ক্ষেতে ফসল কাটছিল বড়কামাঝি, তার স্ত্রী আর পুত্রবধূ। খবর পেয়ে বাবুসাহেব গিয়েছিলেন হাতিতে; পিছনে ঘোড়ার উপর বটেশোয়ার সিং লাঠি নিয়ে। পিছনে ঘোড়ার পিঠেই এসেছিল। বিশেষ কিছু গোলমাল হবে তা বাবুসাহেব ভাবেনওনি। শুধু সাঁওতালটুলিকে একটু ভয় দেখানোর জন্যে হাওয়ায় একটা বন্দুক ছুঁড়েছিলেন।

---

১ স্থানীয় বাক্যরীতি।

২ যেখানে ফসল কেটে প্রথমে জড় করা হয়। প্রতি গ্রামে এরকম একটি করে জায়গা থাকে। এ ছাড়া খুব বড়লোকদের নিজের নিজের আলাদা খলিহান থাকে।

অমনি ডুমডুম-ডুমডুম করে মোষের চামড়ার কাড়া বেজে উঠেছিল। তীর, ধনুক, লাঠি, খুন্তি নিয়ে প্রতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ।

সবাই এসে দাঁড়ায় বড়কামাঝির আলের উপর, এক দিকে একটুখানি পথ রেখে ক্ষেতে হাতিটাকে ঢুকতে দেবার জন্যে। ডুম-ডুম-ডুম বেজে চলেছে কাড়া একটানা। কেটে চল বড়কামাঝি, থামিস না। ওদিক পানে তাকাস না। ঘাবড়াস না, এসে পড়ল বলে কোয়েরীটোলার দল কাড়ার শব্দ শুনে। কথা হয়ে গিয়েছে কালকে এই নিয়ে। কারও মুখে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য নেই, সকলে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

পিথো মাঝির বৌ আখ চিবুতে চিবুতে হাতির দিকে এগিয়ে গেল। অদ্ভুত সাহস! শক্ত করে চেপে ধরে হাতের লাঠি বটেশোয়ার সিং। তাই বল! সাঁওতালনীটা হাতির নাদ কুড়োচ্ছে। এমনি বড় বড় অশথের চাকলা থাকে এর মধ্যে। ভাল জ্বালানি হয়। পিথোর স্ত্রীর দূরদর্শী গিন্নি বলে পাড়ায় সুনাম আছে।

'চল মাহুত!' বাবুসাহেব ফিরে যান।

ডিগি ডিগি ডিগি ডিগি; বিজয়ের উল্লাসে কাড়ার তাল দ্রুত হয়ে ওঠে! বড়কামাঝি হুংকার ছাড়ে, 'হাঁ, নাচতে আরম্ভ কর ক্ষেতের মধ্যে। পায়ে পায়ে সব ফসল যে ঝরে পড়ল।'

কে তার কথায় কান দেয়! সকলে তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'রসিদ দাও, ফসল নাও।' বাবুসাহেবকে শোনাচ্ছে।

ঢোঁড়াইকে দূর থেকে ছুটে আসতে দেখে, এতক্ষণে সাঁওতালদের খেয়াল হয় যে কোয়েরীটোলার কেউ কাড়ার ডুমডুম শব্দ শুনেও আসেনি। ঢোঁড়াই কেবল দুঃখিত নয়, অপ্রস্তুতও হয়েছে বিলক্ষণ। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'ওরা কেউ এল না বড়কামাঝি। বলন্টিয়র এসেছিল এখনি, কলস্টরসাহেবের কাগজ নিয়ে। তাতে লেখা আছে, বাবুসাহেব 'কিসান'১। তার আধিয়াদারদের উপর আঠার-বাইশের কানুন চলবে না। ও কানুন হচ্ছে রাজপারভাঙার আধিয়াদারদের জন্য।'

বলন্টিয়রের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। সেদিন বলল এক কথা, আজ বলছে আর এক কথা। কোয়েরীদের উপর সকলে ক্ষেপে ওঠে।

'মরদ! বাবুদের বাড়ির মেয়েদের শাড়ি কাচতে কাচতে শালাদের মর্দামি ঘুচে গিয়েছে।'

ঢোঁড়াই এ কথার জবাব দিতে পারেনি। মহাৎমাজীর কানুন কলস্টরসাহেব বদলে দিল! কলস্টরসাহেব কী মহাৎমাজীর থেকেও বড়?

তারপরেই চলেছিল থানা-পুলিশ। তিনজন সাঁওতালের জেল হয়েছিল। রসিদ কেউ পায়নি। হাকিম বলেছিলেন যে, এদের বুড়ো আঙুলের ছাপ দেওয়া কাগজে লেখা আছে যে, এদের জমি দেওয়া হয় এক বছরের জন্য। এরা জোর করে অন্যের ফসল নিচ্ছিল।

ঢোঁড়াইরা কি করবে ভেবে পায় না। ভোপৎলালের কাছে সলা নিতে যেতেও মন চায় না। ওটা বোধ হয় পন্ডিতমশাইকে কোদো২ দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিল। কানুনের হরফ পড়তে পারে না।

---

১ রায়তী-স্বত্বধারী লোক।

২ ধানের ক্ষেতের একরকম আগাছা।

কার কাছে দরখাস্ত করলে সুবিচার হবে জানা নেই। ডিস্টিবোডের নূতন নিলামের ডাকে ইনসান আলির জায়গায় গিধর মন্ডলকে খোঁয়াড়টা দিয়েছে লাডলীবাবু। কাজ গুছিয়েছে গিধরটা। বাবুসাহেবেরই বেনামদার। ইমসান আলি তাই সবুজ নিশানের লিগে১ গিয়েছে, আর পাটনার জিন্দাবাদ-সাহেবের কাছে না কার কাছে নালিশ করেছে। এ কথা ভোপৎলালকে একদিন গল্প করতে শুনেছিল বাজারে। ওটার পর্যন্ত দরখাস্ত করার লোক আছে রে, আমাদের নেই।

তাই ইচ্ছা না থাকলেও ছুটতে হয় ভোপৎলালের কাছে। ভোপৎলাল বলে, এদের ঠাণ্ডা করতে পারে একমাত্র কিসানসভার স্বামীজী। তারপর কোয়েরী টোলার লোকদের টিপসই নিয়ে কী সব লেখাপড়া করে।

কোথা থেকে কী হয় তা ঢোঁড়াই জানে না; হঠাৎ একদিন একজন হাকিম এসে হাজির। তিনি বাবুসাহেবের বৈঠকখানায় কিছুতেই উঠলেন না; উঠলেন গিয়ে ইনসান আলির বাড়িতে। কলস্টরসাহেব তাঁকে পাঠিয়েছেন কোয়েরীটোলার রসিদ দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে। হাকিম বলেন দুপক্ষ থেকে দুজন বলবে। বাবুসাহেবের দিক থেকে কাগজপত্র দেখায় রামনেওয়াজ মুন্সি; আর কোয়েরীটোলার সকলে বলছে ঢোঁড়াইকে সকলের হয়ে কথা বলবার জন্য। ঢোঁড়াই বলে ভোপৎলালকে ডাক, কিন্তু বিল্টারা কেউ বিশ্বাস পায় না ভোপৎলালকে; তার কানুনে বিদ্যের দৌড় আগেই দেখা গিয়েছে।

বিজন উকিলকে হারায় রামনেওয়াজ মুন্সি! একেবারে কানুনের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ঢোঁড়াইয়ের বুক ঢিপঢিপ করে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল বলতে পারবে না ঠিক করে। কিন্তু একবার আরম্ভ করবার পর, রসিদ আর দখলের কথা ছাড়া, দুনিয়ার সব কিছু মুছে যায় তার মন থেকে।

রামনেওয়াজ বেশি কিছু বলে না। সাত-আট বছর আগে ধান নেওয়ার সময়কার আঙুলের ছাপগুলো কেবল দেখায় হাকিমকে। বুড়ো আঙুলের ছাপে লেখা হয়ে গিয়েছে, কেউ রসিদ পাবে না।

হাকিম রামনেওয়াজ মুন্সি আর বাবুসাহেবকে তাড়া দেন, 'সব বুঝি, ঘাস খাই না আমরা।' তারপর অংরেজীতে 'চোখ-গরম করা' কী সব কথা যেন বলেন বাবুসাহেবের দিকে তাকিয়ে। আলবৎ বলেছে বটে ঢোঁড়াইটা!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাকিমের রায় শুনে অবাক হয়ে যায় সকলে। বুড়ো আঙুলের কানুনের জোর, মহাৎমাজীর কানুনের চাইতেও বেশি!

সাহেবী টুপি না থাকলে কী হয়, লাডলীবাবুও হাকিম। নতুন হাওয়াগাড়ি কিনেছে দেখিস না চেরমেনসাহেব। সরকারী হাকিম কখনও কাংগ্রেসের হাকিমের বিরুদ্ধে যেতে পারে! জাত বেরাদার সব হাকিমে। দেখলি না বাবুসাহেবের নতুন সড়ক দিয়ে এই সরকারী হাকিমের হাওয়াগাড়ি এল! অন্য কোন লোকের গাড়ি বাবুসাহেব আসতে দেয় ঐ রাস্তা দিয়ে?

শ্বশুর!

## বলীণ্টয়রের পতন

রামরূপ, গনৌরী, পরসাদি, ভবিয়া এরা তিন বছর থেকে কাজ করত কুরসাইলা

---

১ জিরানিয়া জেলায় মুসলিম লীগকে সাধারণ লোকে বলে 'লিগ'। শব্দটি বিদ্রূপাত্মক বা বিদ্বেষপ্রসূত নয়।

চিনির কলে। সারা বছর মিল চলে না। তাই কয়েকমাস করে গাঁয়ে থাকতেই হয়। সেই যে বলণ্টিয়রের 'ফারমের'১ উপর টিপসই দিতে গাঁয়ে এসেছিল বাবুসাহেবের কাছ থেকে নিলাম করা জমি ফেরত পাবার জন্য, আর ফিরে যায়নি তারপর। আবার কোনদিন হাকিম জমি ফেরত দেবার জন্য এসে খোঁজ করবে তারই প্রত্যাশায় ছিল। হাকিমের ডাক, আর নিলামের ডাক! এক, দুই, তিন খতম! তাই আর যেতে সাহস করেনি। খানদানের অযোগ্য ছেলে তারা, বাপদাদার করা জমিটাও রাখতে পারেনি। পরের জমির ধানে নবান্ন করিয়েছে বাড়ির মেয়েদের। তাদের বাপদাদার পায়ের ধুলো মিশে আছে ঐ জমিতে, তাঁরা উপর থেকে দেখছেন। মহাত্মাজীর কৃপায় সে-জমি ফিরে পাবার একটা সুরাহা হল, 'ফারম'-এর জবার এল কই? প্রত্যেক বলণ্টিয়রকে সাত টাকা বারো আনা করে দিয়েছে; ফারমের কোণের দিকে পর্যন্ত বলণ্টিয়ার লিখে দিয়েছিল, তবু হাকিম সাড়া দেয় না কেন? এক বছরের উপর হয়ে গেল।

আরও কত লোকের এই অভিযোগ, নিত্য তিরিশ দিন ঢোঁড়াইয়ের কাছে।

বলণ্টিয়র এখন আসাও কমিয়ে দিয়েছে। একদিন ঢোঁড়াইয়ের দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। গনৌরীদের 'ফারম'-এর কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই বলে, 'দেড় লাখ দরখাস্ত পড়েছে; আপনাকে ঢোঁড়াইজী আমি ওয়াকিবহাল লোক বলেই তো জানি। আপনি সুদ্ধ এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে চলবে কেন?'

ঢোঁড়াইজী! আশ্চর্য কথাটা। গায়ের মধ্যে শিরশিরুনির ঢেউ খেলে যায়। যেদিন প্রথম 'আপনি' শুনেছিল সেদিন লেগেছিল মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। শুধু আপনি কথাটা দূরে ঠেলে, আপনার করে না। কিন্তু ঢোঁড়াইজী! কথাটা শুনলেই বোঝা যায় যে, বলণ্টিয়র যে স্বীকৃতিটুকু দিচ্ছে ঢোঁড়াইকে সেটা অনিচ্ছায় নয়। একজন তার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়ে যাচ্ছে মাত্র। ইজ্জত গায়ে লেখা থাকলে তবে লোকে বলে 'জী'। বড় মিষ্টি এর অনুভূতি, একেবারে নূতন। এরপর বলণ্টিয়রকে দরখাস্তের সম্বন্ধে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে না সে আজ। বড় ভাল বলণ্টিয়র। এবার থেকে সেও বলণ্টিয়রজী বলবে।

তার নিজের এক ধুরও জমি নেই, রামায়ণও পড়তে জানে না। কিন্তু বলণ্টিয়রজী আজ তাকে পুনর বিঘা জমিওয়ালা লোকের ইজ্জত দিয়েছে, রামায়ণ-পড়া লোকের ইজ্জত দিয়েছে। তবু কেন যেন আজ তাকে 'বন্দেগী' করতে বাধছে! 'নমস্তে বলণ্টিয়রজী!'

'নমস্তে!'

গনৌরীর ভাল লাগে না বলণ্টিয়রের হাবভাব। এ কখনও হয় কাছারিতে? কোন খোঁজ নেই খবর নেই কাছারি থেকে! জমি যাবার সময় এমনিই হয়েছিল তাদের। হঠাৎ জানতে পেরেছিল যে জমি নিলাম হয়ে গিয়েছে। টালবাহানা করিস না ঢোঁড়াই এ ব্যাপার নিয়ে। তুই টোলার 'সরগনা আদমী'২ বলেই বলছি। গিধর যদি মোড়লের মত মোড়ল হত, তাহলে কি আর আমরা তোর কাছে ছুটে আসি।

'থাকুক গিধরটা খোঁয়াড়ে আটক।' বিল্টার রসিকতায় বুড়হাদাদা হেসে ওঠে।

এই সব কাজের ভার কী করে কবে থেকে ঢোঁড়াইয়ের উপর এসে পড়েছে, তা জিজ্ঞাসা করলে গাঁয়ের লোক কেউ বলতে পারবে না। জলের ধারা কেন নিচের দিকে

---

১ দরখাস্তের ফরম।

২ গণমান্য লোক।

গড়িয়ে এক জায়গায় জমা হয় এ প্রশ্নও তারা কোনো দিন করেনি।

এসব কাজে ঢোঁড়াইয়ের ক্লান্তি নেই। বাপ-দাদার ভিটে ছাড়ার যে কী দুঃখ, তা ঢোঁড়াই বোঝে। কাজের মলম দিয়ে সে নিজের মনটাকে ঢেকে রাখতে চায়। নিজেকে সে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে, কয়েকটা মুখের ছবি যেন তাকে অনবরত নিচের দিকে টানছে; সে যেতে চায় উপরে, বাওয়ার মুছে আসা স্মৃতি যেদিকে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, পটের ছবির মহাবীরজী যে পা-দুটির দিকে তাকিয়ে তাকে পথের ইঙ্গিত দিচ্ছেন; সেইখানে পেঁছুবার সড়কের নির্দেশ দিচ্ছেন সেই চরণেই আশ্রিত মহাৎমাজী। এই যে সে যখন-তখন সাঁওতালটুলি, গঞ্জের বাজার, ভোপৎলাল আর বলণ্টিয়রের কাছে ছুটোছুটি করছে, অন্যের কাজে, এটা হুজুগের নেশা নয়। রামচন্দ্রজীর হুকুম মানবার নেশা; আর দশজন তার কাছে ছুটে এসে যে ইজ্জত দিচ্ছে তাকে, সেইটার দাম দেওয়ার নেশা। আবার নেশাটার ফাঁকে ফাঁকে তার মনে হয়েছে যে এসব নিজের মন ভুলোনোর 'নৌটাঙ্কী'১। মনের নিচে, অনেক ভিতরে একটা জায়গা আছে যেখানে কারও হুকুম খাটে না; দাম দেওয়া-দেওয়ির পালা সেখানে অচল। রামজী এক হাতে নেন, আর এক হাতে দিয়ে দেন। তাঁরই কৃপায় আজ গাঁয়ের লোকে তার কাছে ছুটে এসে দুঃখের কথা বলে মন হালকা করে যায়, টোলার লোকে 'সরগনা' বলে, হাকিমের সম্মুখে সে রামনেওয়াজ মুন্সির সঙ্গে বহস করে, বলণ্টিয়র ঢোঁড়াইজী বলে। কিন্তু রামজী যত ঢোঁড়াইয়ের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন তত কী আশীর্বাদের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছেন? ছি ছি, এ কী ভবছে সে? এর কী হিসাবনিকাশ চলে, আখ আর কাঁচালঙ্কার দামের মতো!

আছে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ভোপৎলাল। অনেক খোশামোদ করে ঢোঁড়াই তাকে রাজা করায়, কাছারি থেকে দরখাস্তগুলোর কী হল জেনে আসতে। ভোপৎলাল পাঁচ টাকা খরচ করে কাছারির সেরিস্তায় তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কোয়েরীটোলার কোনো দরখাস্ত কাছারিতে নেই।

এসে বলে যে বলণ্টিয়র টাকাগুলো খেয়েছে। ওর বলণ্টিয়ারী আমি ঘোচাচ্ছি মহাৎমাজীর কাছে চিঠি লিখে। তোমরা এই কাগজে টিপসই দিয়ে দাও।

'টিপসই? মরে গেলেও না।'

সকলের মুখে কাঠিন্যের রেখা পড়ে। জীবনে একবারই লোকে ভুল করে। বাপ দাদার উপদেশ না মেনে, বুড়ো আঙুলের এক ছাপে ভিটেমাটি ছাড়া হতে চলেছে টোলা-সুদ্ধ লোকের! বাপরে বাপ! 'না না ভোপৎলালজী, বাবুসাহেবই হয়তো কাছারিতে টাকা খরচ করে সরিয়ে ফেলেছে দরখাস্তগুলো।'

## বলণ্টিয়রের পুনরুত্থান

গঞ্জের বাজারে সার্কিল মানিজর সাহেবের বাংলায় একটা কল আছে না, যাতে করে মেমসাহেবরা গান শোনায় তাঁকে, সেই কলে লাটসাহেব তাঁর কাছে খবর পাঠিয়েছে যে বিলাতে ইংরেজ-জর্মন লড়াই লেগেছে। সেখানকার হাটে ঢোঁড়াইরা কথাটা শুনেছিল। সেখানে আরও কানাঘুষা শুনেছিল যে লড়াইয়ে লংকা, তামাক খুব লাগে। দাম বাড়বে। নৌরঙ্গীলাল গোলাদার যাই বলুক কাঁচালংকা, আর বেচা নয়। গাছে পাকানোই ঠিক।

১ যাত্রার মতো একরকম গ্রাম্য অভিনয়।

এর কিছুদিন পরই বলণ্টিয়র একদিন গাঁয়ে এসে হাজির। এতদিন শত চেষ্টা করেও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এল যখন, একেবারে আসার মতো আসা! ফৌজের উর্দি পরে, খটমট খটমট করে। গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে আসে, ছোট ছেলেরা বেড়ার পাশে লুকোয়, বিল্টার বুড়ী চাচী মাথার শনের নুড়োর উপর ঘোমটা টেনে দেয়। ঢোঁড়াই পর্যন্ত ভাবে, 'বন্দেগী হুজুর' বলবে, না নমস্তে করবে।

অনেক দূর দেশ থেকে আসছে বলণ্টিয়র। তাজা নতুন খবর এনেছে রংরেজ-জর্মান লড়ায়ের। লড়ায়ের খবর ফৌজের লোকে জানবে না তো আর কে জানবে! সব চেয়ে জবর খবর কাংগ্রিস রংরেজ সরকারের দেওয়া পাটনার গদিতে লাথি মেরে চলে এসেছে।

'তাহলে মহাৎমাজীর হুকুমত আর নেই মুলুকে?'

'নেই বলেই তো ঢোঁড়াইজী এসেছি আপনাদের কাছে কাংগ্রিসের ফৌজে ভর্তি করাতে।'

'ফৌজে?'

সকলে চেঁচামেচি আরম্ভ করে। বিল্টার চাচী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। বুড়হাদাদু বলণ্টিয়রের হাত চেপে ধরে, যেমন করে হোক দারোগাকে বলে, আমাদের ফৌজ থেকে নাম কাটিয়ে দাও বলণ্টিয়র। উথলি বাঁধা দিয়ে আমি তোমাকে খুশী করব।

লড়াইয়ের খবর প্রথম দিন শুনে সবার মনে হয়েছিল বিলাতে লড়াই। তাতে বিসকান্ধার কী? এ আবার কী বিপদ এসে উপস্থিত হল। চায় না তারা লঙ্কাগুলোকে গাছে পাকিয়ে বিক্রি করতে!

বলণ্টিয়র তখন কাংগ্রিসের ফৌজে ভর্তির ফারম'১ বার করে সকলকে বুঝায় যে, সে এতদিন ছিল রামগড়ে। সেখানে আসছে বছর মহাৎমাজীর প্রকাণ্ড জলসা হবে। সেখানেই বলণ্টিয়র ফৌজী 'টিরেনি'২ নিতে গিয়েছিল। এখন সে জিরানিয়ার সকলকে ফৌজে ভর্তি করে নিজেই 'টিরেনি' দেবে। তারই 'ফারম' এগুলো।...

ফারমের কথা ওঠায় এতক্ষণে গনোরী কাজের কথা পাড়বার সুযোগ পায়।

'লট্‌পট্‌ কথা ছাড়ো বলণ্টিয়র। আমাদের জমি ফিরে পাবার দরখাস্তের কী হল? একবছর থেকে হয়রান করছ তুমি আমাদের।'

মহাৎমাজীর চেলা হলে কী হয়। বলণ্টিয়র জানে যে, কখন রাগে জ্বলে উঠতে হয়।

'নেমখারামের দল কোথাকার!' তারপর ঢোঁড়াইকে বলে, 'কোন খাস্তা খাতায় ফেলে রেখে দিয়েছে তার কি হিসেব আছে? তার উপর কাংগ্রিসের উজিররা ইস্তফা দিয়েছে; আর কি এখন সাহেব কলস্টর ঐ সব দরখাস্ত পড়বে মনে করেছেন? এতদিন সেই সাহেবই ঐ হরিজন মন্ত্রীর ছেলেটাকে সফরের সময় কোলে নিয়ে, নাকের শিগনি মুছত।' আরও কত কথা বলণ্টিয়রজী বলে যায়। তার সিকিও ঢোঁড়াইরা বোঝে না। শোনবারও উৎসাহ নেই তাদের। বিল্টার সুদ্ধ কথা বার হয় না মুখ দিয়ে। কতদিন থেকে ভেবে রেখেছিল যে বলণ্টিয়র এলে, চেপে ধরবে তাকে।

কপালটাই পোড়া কোয়েরীটোলার! রংরেজ জর্মন লড়ায়ের গরম তাজা খবরের

১ ফরম। ২। ট্রেনিং।

মধ্যে কোয়েরীটোলার এতগুলো লোকের হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কোন খাস্তা খাতায় তলিয়ে যায়।

যাবার সময় বলণ্টিয়ার দুঃখ করে যায়—'শ্বশুররা' যে যুদ্ধে হারতে জানে না!

কোয়েরীটোলার গিধরেরও দুঃখ কম হয়নি। সে সবে দেড় বছর থেকে খদ্দর পরা ধরেছিল। শান্তি আর নেই কিছুতে! সব চেয়ে চিন্তার কথা যে নাইট স্কুলের নাম করে সে একটা লণ্ঠন, আর এক টিন করে মাসে কেরোসিন তেল, আরও কী কী যেন, লাডলীবাবুর সাহায্যে পেয়ে আসছে। এত দিন 'নিসপেক্টর'সাহেব লাডলীবাবুর ভয়ে কিছু করতে সাহস করেনি। এবার নিশ্চয়ই রিপোর্ট করে দেবে যে, কোয়েরীটোলায় কোনো ইস্কুল খোলেনি গিধর মণ্ডল। সে বলে, 'পাবলিসের কথাটা একবারও ভাবল না কাংগ্রিস গদ্দি থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগে। নে! দুবচ্ছর খুব উড়িয়েছিস হালুয়াপুরি, এবার মজা চাখাবে সরকার!'

কিন্তু সরকার সব চেয়ে আগে মজা চাখাল কিনা গনৌরীদের।—ঢোঁড়াইয়ের মনটা খারাপ হয়ে যায়। মহাৎমাজীর লোকেরা তবু চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সরকারের চাকর এই হাকিম দারোগা, এরাই না বাবুসাহেবের দিকে গিয়ে সব পণ্ড করে দিল। দারোগা-হাকিমদেরই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে। যার নুন খায় তার গুণ গায়। রংরেজ বাদশা হল দুনিয়ার রাজা, কত বড়লোক। তাই না সে চাকর রাখতে পারে, কলস্টর দারোগাকে। কোথায় পাবে অত টাকা মহাৎমাজী! ঢোঁড়াই সেবার দর্শন করতে গিয়ে দু'পয়সা দিয়েছিল মহাৎমাজীর পায়ে। দু'পয়সা সে, দু'পয়সা সাগিয়া, দু'পয়সা মোসম্মত, ছ'পয়সা। এই সব পয়সার রোজগার থেকে কি কলস্টর দারোগা পোষা চলে? তার জন্যে দরকার লোটের১।

হঠাৎ সাগিয়ার কথাটা মনে এল কেন? ভাল আছে তো?

অনেকদিন পর আজ বাড়িতে ফিরে ঢোঁড়াই সেই সিক্কার মালাটা বার করে দেখে, যে তেলচিটচিটে সুতোগুলো দিয়ে এগুলো গাঁথা ছিল, সেগুলো ঝুরঝুরে হয়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। রুপোর সিক্কাগুলো কালো হয়ে উঠেছে কলঙ্ক পড়ে। ঢোঁড়াই ছাই দিয়ে সেগুলোকে ঘষতে বসে।

সাগিয়া যেন ভাল থাকে রামচন্দ্রজী!

## ভূম্যধিকারীর তপস্যায় বিঘ্ন

জিরানিয়া জেলার পশ্চিমে যত নদীনালা সবগুলোর নামই 'কোশী'। রগচটা 'কোশীমাই' পুরুবের 'বাঙাল মুলুক' থেকে বাপের বাড়ির দিকে চলেছেন হোঁচট খেতে খেতে। চোখের জলের অজস্র নদী-নালায় রেখে যাচ্ছেন তাঁর নামের, আর চলার পথের চিহ্ন। রাগটা পড়লেই তিনি আবার ফিরবেন, এ কথা জিরানিয়া জেলার প্রত্যেক লোক জানে। তাঁর বউকাটকী শাশুড়ী, তাঁর ফেরবার পথ বন্ধ করবার জন্যে জিরানিয়া জেলা জুড়ে শিমুল, কুল, বাবলা আর ক্যায়া-গোলাপের কাঁটা-জঙ্গল ভরে রেখেছিলেন। আস্তে আস্তে অনেক বছর ধরে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে এখনও সকলে কোশীমাইয়ের প্রতীক্ষায় ঢোলক, ঘণ্টা, ঝাঁঝর, শিঙে নিয়ে বসে আছে। হোক পাগল, হোক বদমেজাজী, তবু মা না থাকলে আবার সে কি একটা সংসার। যতদিন মা না ফিরে আসে, ততদিন এইসব মরা নদীগুলোকে তারা সাবধানে আগলে বসে থাকবে। তারপর কোশীমাই ফিরে এলে আবার সমৃদ্ধির জোয়ার আসবে এই পথে। এখন

১ নোট।

তো কেবল বর্ষাকালে মাটির হাঁড়ি বোঝাই নৌকো যায়। তখন আবার বারো মাস পাক্কীর মোটর ট্রাকগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবে যাতায়াতী নৌকোগুলো। বিরতাহা গোলায় পাটের গাঁইট বাঁধবার পেঁচকলগুলোয় আবার রেড়ির তেল পড়বে।

মরা কুশীকে, আর কুশীর ধারের পড়তি জমিগুলোকে গাঁয়ের লোকে কী চোখে দেখে তা বাবুসাহেব জানেন। জানেন বলেই তাঁর এত ভাবনা।

জমিগুলোকে বহুকাল থেকে লোকে জানত রাজপারভাঙার পড়তি জমি বলে। নদীর ধারের জমির উপর বাবুসাহেবের নজরটা বেশি। নদী আর নৌকোই তাঁর পছন্দ। তার সঙ্গে কি আর রেলগাড়ির তুলনা হয়। কিসে আর কিসে। নদীর পথেই তিনি প্রথম এসেছিলেন। দূর দূরান্তর থেকে মাটির গন্ধ যাদের টানে, কুলের গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবার যাদের 'তাকত' আছে, শিমুলগাছ কেটে ডোঙা তৈরি করবার নিয়ম যার জানা, বাবলা গাছ দেখলেই যার লাঙলের কাঠের কথা মনে পড়ে, বুনো শুয়োরের সঙ্গে লাঠি নিয়ে ভেড়বার হিম্মত যে রাখে, সেই আসে নদীর পথে। আর রেলের গাড়ি টানে দুধ-ঘি খাওয়া লোকদের যারা কুলগাছ দেখলে রেশম আর লা-র কথা ভাবে, শিমুল গাছ কাটায় মাটিহারদেশাইয়ের কারখানায় ঠিকেদারের জন্যে, স্টেশনের কাছে বাবলা গাছ দেখলে দৌড়ে একগোছা দাঁতন কেটে নিয়ে এসে তখনি বাক্সে পোরে! এই রামে রাম, দুয়ে-দু'র দল শেষ জীবনে জ্ঞান হলে বনেদী হবার জন্যে কেনেন জমি। যে ইজ্জত প্রতিষ্ঠা চায় তাকে যে এই পথে আসতেই হবে।

যতই কোয়েরী আর সাঁওতালগুলো জ্বালাতন করুক না কেন, জমি রাখার মধ্যে আছে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ, অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার তলেও তলেও আছে একটা গভীর পরিতৃপ্তির ভাব কিন্তু নিশ্চিন্দি আর নেই। ঘুরেফিরে নাকের উপর মাছি বসলে ধ্যানী সন্ন্যাসীরাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন, বাবুসাহেব তো কোন্ ছার। কোয়েরী-সাঁওতালগুলোর সেই যে তড়্পানি আরম্ভ হয়েছে, আট-দশ বছর আগে থেকে, এ কি কোনদিন থামবে না। নিত্যি নতুন ফ্যাসাদ বাধিয়েই রেখেছে। করবি আধিয়া-দারদের কাজ, তার আবার দারোগা-পুলিশের মতো মেজাজ!

কুশীর ধারের রাজপারভাঙার পড়তি জমিগুলোতে গত ক'বছর থেকে কলাই কুর্থি ছিটোচ্ছিলেন বাবুসাহেব। ওটা ছিল গাঁয়ের লোকের গোরু-মোষ চরাবার জায়গা। কলাই কুর্থি'র দামই বা কী ছিল। গোলাতে পচত। গাঁ-সুদ্ধ লোকের মোষের গায়ের খাঁজ ঢেকেছে ঐ কলাই-কুর্থি'র গাছ খেয়ে, বাবুসাহেব একদিনও বারণ করেননি। সেইজন্যেই রাজপারভাঙার পড়তি জমির উপর কে কোথায় কলাই ছড়িয়েছে তা নিয়ে গাঁয়ের লোকে মাথা ঘামায়নি। বাবুসাহেবের অধিকারের পলি, এই ক'বছর পড়বার পর, বাবুসাহেব হালে বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন ঐ জমি রাজপারভাঙার কাছ থেকে। রাজপারভাঙার স্বত্বে বোধ হয় কোন গোলমাল ছিল, কিংবা বোধ হয়, সার্কেল ম্যানিজর চেরমেনসাহেবের বাবাকে নারাজ করতে চাননি, তাই নামমাত্র সেলামিতে ছেড়েছিলেন জমিগুলো। তারপরই লেগেছিল খটাখটি। সাঁওতালটুলির মোষ নদীর ধার থেকে ধরে, গিধরের খোয়াড়ে দিয়েছিলেন বাবুসাহেব। বড়কা-মাঝি তখন জেল থেকে ফিরেছে! তার ছেলে বলে, 'এবার আমাকে হয়ে আসতে দাও।'

বাবুসাহেবের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। কোয়েরীটোলার লোকেরা সাঁওতালের মোষ খোঁয়াড়ে দিলে মাথা ঘামাবে তা তিনি ভাবেননি। তাদের 'কোশীমাই'ইকে নিয়ে

ব্যাপার। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বলে কি মায়ের বে-ইজ্জতি 'প্যুটুর প্যুটুর'১ দেখবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওগুলো হল তাদের সারা গাঁয়ের 'নিকাশ' জমি। সকলের গোরু মোষ জল খেতে যায় ঐ পথে; মেয়েছেলেরা যায় দরকার পড়লে নদীর ধারের আবরুতে; 'দশবিধ করম' আছে নদীর ধারে; জানোয়ার মরলে ফেলতে হবে, ছোট ছেলেটা মরলে পুঁততে হবে, ঘর নেপবার মাটি আনতে হবে সেখান থেকে খুঁড়ে; তারই নাম 'নিকাশ'। এই 'নিকাশ' কেড়ে নেওয়ার আবার জাত আছে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে টোলার পঞ্চায়েৎ বসে যায় মাঠে মাঠে। দিনের বেলায় মাঠে মাঠে 'পঞ্চায়তি' বুড়হাদাদু পর্যন্ত এর আগে জীবনে দেখেনি।

এত বড় কথা! এ কী জবরদস্তি কান্ড বাবুসাহেবের। আর ঐ গিধরটা হাত মিলিয়েছে বাবুসাহেবের সঙ্গে। সাজস না থাকলে সে খোঁয়াড়ে মোষ নিল কেন? মোড়ল তো মোড়ল! তার হয়েছে কী? সাজিমাটির মধ্যেও ময়লা থাকে। দে গিধরটার হুক্কাপানি বন্ধ করে। জেলার জাতের বড় মাতব্বররা গিধরের হাতের লোক। 'গিধর গুরুজী'২ বড়ডো কানুন জানে, সেইটাই ভয়। শালা গোরুখোর, গোরু খেয়ে হাঁড়িটা ফেলবি কোন্ চুলোয় 'নিকাশ' গেল! কানী মুসহরনীটা যে দিকেই তার কানা চোখটা ফিরিয়ে রাখে, সেদিকেই তার আবরু; কাজেই মেয়েদের যে 'নিকাশ'-এর আবরুর দরকার, তা কি আর গিধরটা বুঝবে? ভূমিকম্পের রিলিফের দয়ায় ওর মেঝে দেয়াল পাকা হয়েছে। আর ওর নদীর ধার থেকে মাটি কেটে আনবার দরকার হয় না তো।

সব দিক ভেবে-চিন্তে ঠিক হয় যে, গিধরের হুঁকোজল বন্ধ করবার কারণগুলোর মধ্যে খোঁয়াড়ের ব্যাপারটার সঙ্গে কানী মুসহরনীর ব্যাপারটাও জুড়ে দেওয়া ভাল।

তারপর মহাবীরজীর জয় দিতে দিতে নিজেদের গোরু-মোষ নিয়ে সকলে পৌঁছোয় সাঁওতালটোলাতে।

আরে ভয়ের কী আছে! রাজপুতদের লাঠি আজকাল ভাঙ ঘুঁটবার নিমের কাঠি হয়ে গিয়েছে। আর 'ভালার'৩ কাছে লাঠি। এখান থেকে ছুঁড়ে দেব এই-ই ফন্-নন্…সাঁওতালটুলির আর কোয়েরীটোলার গরু-মোষ ছেলে-বুড়োর বিরাট মিছিল গিয়ে ঢোকে কুশীর ধারের কলাই-কুর্থির ক্ষেতগুলোতে। সবচেয়ে আগে ঢোঁড়াই, আর বড়কামাঝির ছেলে।

দু'দলকে একসঙ্গে চটান না বাবুসাহেব। মুহূর্তের অনবধানতায় চালে ভুল করে ফেলেছেন। বাবুসাহেব দোতলা থেকে দলটাকে যেতে দেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বটেসোয়ার সিং সেপাই দৌড়ে বাবুসাহেবকে খবর দিতে এসেছিল। কিন্তু সে অবাক হয়ে গিয়েছিল বাবুসাহেবের রকম-সকম দেখে। মালিক বন্দুক রাখবার দেরাজটা তো খোলেনই না, উপরন্তু নড়েচড়ে পর্যন্ত বসেন না।

ভুল করে ফেলেছেন, স্বীকার করতে দ্বিধা করলে চলবে কেন। বড়কা-মাঝির পরিবারের সরকারের খিচুড়ি খাওয়ার ভয়টা কেটে গিয়েছে! ভাল লক্ষণ না এটা!… আরও ক'বছর অপেক্ষা করা বোধ হয় উচিত ছিল।…যাক' যা হবার হয়েছে। গুড় দিয়েই যদি মাছি ধরে, তবে বিষ দেওয়ার দরকার কী?

বটেসোয়ার সিং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কোনো জবাব না পেয়ে চলে যায়।

---

১ পিটপিট করে। ২ শৃগাল পণ্ডিত।

৩ ভল্ল।

তাই আজ ভাববেন বলেই ভাবতে বসেছেন বাবুসাহেব।

## বাবুসাহেবের অক্ষয় তূণীর লাভ

জিরানিয়ার টুরমনের ফারমের কাজ চালানোর জন্য একটা কমিটি আছে। ডিস্টি-বোর্ডের চেরমেনসাহেব তার একজন মেম্বর থাকেন। লাডলীবাবু আগের বার যখন বাড়িতে এসেছিলেন তখন বাবুসাহেব শুনেছিলেন যে টুরমনের কমিটি এবার দেহাতে আস্তে আস্তে কাজ বাড়াবে ঠিক করেছে, গাঁয়ের লোকদের ভালর জন্য। এই নিয়ে বাবুসাহেবের মাথায় একটা জিনিস খেলছে, দিনকয়েক থেকে।

লাডলীবাবুটা চেরমেন হবার পর থেকে বাড়ি আসা আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়েছেন। কাংগ্রেসি চেয়ারম্যান, খাটুনি বেশি। এ তো আর আগেকার ওকালতি করা রায়বাহাদুর চেয়ারম্যান নয়। তাই বোধ হয় সময় হয় না। কিছুদিন থেকে বাড়ির মেয়েমহলে বাবুসাহেব কানাঘুষো শুনছিলেন যে, লাডলীবাবু নিজে বাসা ভাড়া করবেন। মাস্টারসাহেবের আশ্রমে থাকবার ঠিক সুবিধা হচ্ছে না। কত লোকজন, সাহেবসুবো, পণ্ডিত, ঠিকেদার আসে দেখা করতে চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে··· মাস্টার সাহেবকে আজকাল আর কে পোঁছে।···

আবার এক খরচের রাস্তা করছে! আজকালকার ছেলেরা পয়সা চেনে না। আর কেবল বাসা ভাড়া করলে কোনো চিন্তার কারণ ছিল না, ভালই হবে। মাস্টার-সাহেবের আশ্রমে গিয়ে উঠতে তাঁর মন চায় না আর। কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে লাডলীবাবু তাঁর স্ত্রীপুত্র নিয়ে যেতে চান সদরে। বলেছেন যে নইলে তাঁর ছেলেদের লেখা-পড়া হবে না। প্রকাণ্ড জিলা ইস্কুল আছে সেখানে, বাবুসাহেবও দেখেছেন। রাজ-পারভাঙার জমিদারের ছেলে পড়ে নাকি সেই স্কুলে। তাদেরই পড়ারই যুগ্যি পেল্লায় মহল, সদর কলস্টরি থেকেও বড়। হাঁ, বড় হয়েছ, চেরমেনসাহেব হয়েছ, তোমার ছেলে তো আর তোমার মতো মজকুরি সেপাইয়ের ছেলে নয়। পড়াতে হবে বৈকি তাদের, রাজরাজড়ার ইস্কুলে। কিন্তু বউ নিয়ে যাওয়া? কভভী নহী! চন্দ্রাবৎ রাজপুতের বাড়ির বউ গিয়ে থাকবে নিজের সংসার ছেড়ে সেইখানে! লোকে থুতু দেবে না তাহলে বাবুসাহেবের গায়ে। লাডলীবাবুর মাকে যখন তিনি প্রথমে আনতে চেয়েছিলেন তাঁদের দেশ থেকে তখন কি সে আসতে চেয়েছিল? সে এক রকম জোর করে আনা। আর এ বোধ হয় লাডলীবাবুর বউই স্বামীর কানে মন্তর দিচ্ছে। তাঁর মায়ের তো তাই ধারণা। আসতে দাও লাডলীবাবুকে এবার।

···জোতজমি সব এখান থেকে পাক্কী পর্যন্ত আবছা দেখা যাচ্ছে। সমস্তটা এক 'চক' হয়ে গিয়েছে কবে। নতুন রাস্তাটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। পরিতৃপ্তির বোঝার নিচে সেটা যেন চাপা গিয়েছে। এখন মনের মধ্যের সমস্ত জায়গাটা জুড়ে আছে কুশীর পারের জমির ফ্যাসাদটা। এক জোড়া হাওয়াগাড়ির আলো নামল পাক্কী থেকে তাঁর নিজের রাস্তাটার উপর। এত দূর থেকেও তিনি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন আলো দুটোকে। তাঁর অত সাধের রাস্তাটা তাঁকে দেখানোর জন্যে আলো ফেলছে। কোনো হাকিম-টাকিম নাকি? বাবুসাহেব একটু তটস্থ হয়ে ওঠেন। অনোখীবাবু, ও অনোখীবাবু। ঢুলছে বোধ হয়। দেখুন তো কে এল। জানলার মধ্যে দিয়ে তাঁর ঘরের মধ্যে আলোটা এসে পড়েছে। নীচে লাডলীবাবুর গলা শোনা যায়। তাই বলো! সঙ্গে একজন টুপি-পরা হাকিম। বাবুসাহেব নিজের মনের অস্থিরতা চাপবার জন্য কেশে সোজা হয়ে বসেন। নিচে হাঁকডাকের সাড়া পড়ে যায়।

খানিক পরেই লাডলীবাবু বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এই ঘরে আসেন। কাল ভোরেই চলে যেতে হবে। একজন হাকিম আছেন তাঁর সঙ্গে সফরে। তখনও বোধ হয় বাবুসাহেবের পুজো শেষ হবে না। তাই এখনই দেখা করতে এসেছেন।

'এতদিন পরে এলেন, তাও যেন ধান রোপার কাজ ফেলে এসেছেন।'

ভাষাটা অনুযোগের হলেও কথায় সুরে বিরক্তির আভাস নেই।

'আমি একা থাকলে কথা ছিল না। সঙ্গের হাকিমটি ভোরেই যাবেন কি না।'

'কিসের হাকিম উনি ?'

'রেশমের হাকিম। ভাগলপুর থেকে এসেছেন।'

'ও!' তাহলে এ জেলার হাকিম নয়? লাডলীবাবুকে বেশিক্ষণ পাবেন না তিনি। তাই বাবুসাহেব আর দেরি করেন না। একেবারে কুশীর ধারে জমিসংক্রান্ত কাজের কথাটা পাড়েন।

লাডলীবাবু বলেন, তার আর কী। এই রেশমের অফিসার এদিককার কয়েকটা গাঁয়ে গুটিপোকার চাষের সেন্টার খুলতে চান। তারই জায়গা দেখতে এসেছেন সফরে। লড়ায়ের জন্য খুব দাম হবে এণ্ডির রেশমের। গুটিপোকা খাওয়ানোর রেড়ির চাষের জন্য নদীর ধারে জমি পেলে তাঁরা তো লুফে নেবেন। এক রকম নতুন জাতের রেড়ির বীজ বেরিয়েছে, গাছ বড় হয় না, হাত দিয়েই ফল পাড়া যায়। ওরই কাছে ঘর তুলে নেবে, পোকা রাখবার জন্য। টুরমনের ফারম থেকে আমি পাঠিয়ে দেব দুজন 'কামদারকে'[১]। তাদের দেহাতে নতুন ধরণের চাষবাসের কাজ শেখানোই ডিউটি। বকরহাট্টার মাঠের টুরমনের ফার্ম লোকসানে চলছে। একেবারে বেলে জমি, চীনেবাদাম পর্যন্ত ভাল হয় না। তাই সরকারী কমিটি ঠিক করেছে এর কাজ অন্য দিকেও বাড়াতে। ফৌজী ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গেও একটা কথাবার্তা চলছে বকরহাট্টার মাঠ নিয়ে।

লাডলীবাবু আরও কী কী সব বলে যান। সে সব কথা বাবুসাহেবের কানেও যায় না। এত তাড়াতাড়ি এত বড় একটা প্রশ্নের সুরাহা হয়ে যেতে পারে তা বাবু-সাহেব ভাবতেও পারেন নি। গর্বে, তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে ওঠে। ধন্যি সেই আওরত যে এই চেরমেনসাহেবের মতো ছেলে পেটে ধরেছিল। তার গায়ের দুসের চাঁদির সত্যিই যুগ্যি সে। বৃথাই এত দিন মনে হত যে সে চুরি করে গোলার ফসল বেচে পয়সা জমায়। সেটা চুরি নয়, তার আগের জন্মের জমানো পুণ্যের রোজগার। বহু বছর আগেকার একটা ছবি তাঁর চোখের সম্মুখে জ্বলজ্বল করে·· তখন হরিয়ানা গোরুর চাইতেও নধর চিকন তার দেহ; ফুটফুটে রঙের উপর সর্বাঙ্গে নীল উল্কির মিনে করা; তার কোলে ছোট্টো লাডলী; মায়ের নাক থেকে বার হওয়া তামাকের ধোয়ার কুণ্ডলীটাকে থাবলে ধরবার চেষ্টা করেছে। কৌশল্যা মাইয়ের মতো দেখতে লাগে, বেশ লাগছে ভাবতে। কিন্তু লাডলীবাবুটা কী মনে করছে? তাই বলতে হয় 'তোমাদের হালচাল বল, ডিস্টিবোডের।'

মন্ত্রীর গদি ছেড়েই কাংগ্রেস ভুল করেছে। আরও করবে যদি ডিস্টিবোড ছাড়ে। ছাড়লে তো সরকারেরই সুবিধে; সরকার ডিস্টিবোডের সব পয়সা লড়ায়ের কাজে লাগাবে। এই তো রাস্তার রোলারগুলো ডিস্টিবোড থেকে চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি থাকলে দু-চারমাস সে চিঠির জবাব না দিয়ে চেপে রাখতে পারি কিনা!

---

১ এগ্রিকালচারাল ফার্মের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী।

তা তো বটেই।

তা নয়, 'ন এক পাই, ন এক ভাই'১ বলে জেলে চলে গেলেই অংরেজ হেরে গেল আর কী! আমি তো সাফ বলে দিয়েছি যে, চেরমেনের পদ থেকে আমি ইস্তফা দেব না। 'পাবলিসের' ভালর জন্য এসেছি এখানে। যতদিন পারব সাধ্যমতো 'পাবলিসের' উপকার করে যাব।...

কথাটা শুনতে শুনতে আনন্দে আর উদ্বেগে বাবুসাহেবের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। যাক, রামচন্দ্রজী সুমতি দিয়েছেন লাডলীকে। খুব মুখ রেখেছেন তাঁর। এমন দিনকাল পড়েছে যে ছেলে 'চেরমেন' না হলে, আজকাল [illegible] কেউ পোঁছে না; তার 'আধিয়াদার'রা পর্যন্ত না। চেরমেন সাহেবের বাপ না হলে পাক্কীর ধারের মাটি কাটার গর্তগুলোতে ধান লাগানো যায় না; তিন টাকায় কুশী থেকে মহানন্দা পর্যন্ত পাক্কীর ধারের আম কাঁঠাল জমা নেওয়া যায় না। এমন ছেলের উপর যে চটে, সে ছেলের বাপ না।

'শুনুন লাডলীবাবু, বৌমাকে যদি নিয়ে যেতে চান তাহলে একটা ভাল আবরু-ওয়ালা বাসা ঠিক করবেন। সেসরসাহেবের মর্যাদার যোগ্য বাসা হওয়া চাই। রাজপুতদের নিয়ম যে দাঁতওয়ালা হাতির পিঠে চড়েও আঙিনা দেখা যায় না বাইরে থেকে; এত উঁচু হবে বাড়ির পাঁচিল। রেশমের সাহেবটা আবার বদমেজাজী নয়তো? চলুন একবার দেখা করে আসি তাঁর সঙ্গে। বলছিলেন না এণ্ডির গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসবার পর গুটিগুলোকে সিদ্ধ করতে হয়? যাক নিশ্চিন্দি! তাহলে প্রাণীহত্যা করতে হবে না। একটা জীবন তোয়ের করতে পার না, তবে জীবন নেবার কী অধিকার আছে? মরবার পর রামজী এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব তিনি দিতেন।' তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামেন। মৃত্যুর কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হয় যে পাতালপুরীর গভীর অতলে নেমে চলেছেন।

লাডলীবাবু ইনসান আলির বাড়ি থেকে ভালমন্দ কিছু রাঁধিয়ে টাঁধিয়ে আনতে বলে দিয়েছেন নাকি হাকিমের জন্যে? রেশমের হাকিম বড় হাকিম।

## সতিয়াগিরার উৎসব

আজ জমজমাট 'তামাসা' কোয়েরীটোলায়। বলণ্টিয়র 'সতিয়াগিরা'২ করবে গাঁয়ের। 'রামখেলিয়ার নাচ' এলেও গাঁয়ে সাড়া পড়ে যায় এই রকমই। কিন্তু সতিয়াগিরা তার চাইতেও জবর জিনিস। সতিয়াগিরার মানে যে কী তা ঢোঁড়াইও জানে না, তবে শোনা শোনা মনে হয় কথাটা। ভূতের গল্প শোনার আনন্দ গা ছমছমানিটুকু। সতিয়াগিরার রহস্যের সঙ্গেও সেই ভয় মেশানো;—পুলিশ, লালপাগড়ি, হাল-বলদ ক্রোক হওয়া, জেলের খিচুড়ি, হাকিম, আরও কত জানা-অজানা আতঙ্কের। সতিয়াগিরার সম্বন্ধে কৌতূহলের সঙ্গে মেলানো আছে মহাৎমাজীর নামের সম্মোহন; রঙ্গ-তামাসার মধ্যেও আছে বিশ ক্রোশ দূরের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মন্দিরে 'জল ঢেলে আসার'৩ সমান পরিতৃপ্তি।

---

১ ইংরেজের যুদ্ধে একটি পয়সা বা একটি লোক দিয়েও সাহায্য করব না।

২ সত্যাগ্রহ।

৩ কুশীতীরের সিংহেশ্বরথান নামে জায়গা।

ঢোঁড়াইয়ের সারারাত ঘুম হয়নি। এত বড় দায়িত্ব এর আগে কখনও তার মাথায় পড়েনি। আবার সামলাতে পারলে হয়। 'ডাবর কমঠ কি মন্দর লেঁহী ?'১ ডোবার কচ্ছপ কি মন্দার পর্বতের ভার সইতে পারে ? ভিনগাঁ থেকেও কত লোক আসছে দেখতে। আশপাশের এত গাঁ থাকতে তাদের টোলাকেই বেছেছে বলণ্টিয়র। এখন কোয়েরীটোলার ইজ্জত তার হাতে। যে গাঁয়ে যত বলণ্টিয়র সেই গাঁয়ের লোকেই লুফে নিত তাকে। এ কি আর নিমক তৈরির যুগের 'বিদেশিয়ার গান' ? তখন লোকে গাঁয়ের বাইরে করাত তামাশা, থানা-পুলিশের ভয়ে! বড় ভাগ্যি কোয়েরী-টোলার যে বলণ্টিয়র এই জায়গাটাই পছন্দ করেছে।

সে যেদিন জায়গা ঠিক করতে এসেছিল সেদিন বলেছিল যে, মহাৎমাজী ভাল ভাল লোক দেখে দেখে বেছে নিয়েছেন অংরেজের বিরুদ্ধে সতিয়াগিয়া করবার জন্য। বড় ভাল লোক বলণ্টিয়রজী ; নইলে কি আর গত বছর ফৌজের উর্দি পরবার অধিকার দিয়েছিলেন তাকে মহাৎমাজী। এতকাল বাবুসাহেব বলণ্টিয়রকে ভূমিকম্প রিলিফের টাকায় করা নতুন বৈঠকখানায় থাকতে দিত, সবচেয়ে কশা দড়ির খাটিয়াখানা দিত, ওয়াড় দেওয়া বালিশ দিত, পুরনো কলের গানের চাকার রেকাবি করে অঢেল ছোট-এলাচ দিত। কাংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছাড়াতে, 'ছু মন্তরে ফুস বিড়াল' হয়ে গিয়েছে সব। লাডলীবাবু, যে লাডলী বাবু মহাৎমাজীর মত আদরের চেলা, সে সুদ্ধ তার হুকুম মানলে না, চেরমেনগিরির রোজগারের লোভে। লোকটা যে কেবল 'মুখেই মালপুয়া ভাজে' তা কি কেউ আগে ভাবতে পেরেছিল। আসল কাজের সময় না কে কী মেক-দারের লোক বোঝা যায়। 'ঐরু গৈরু নথু খৈরু'২ শুনতে সবাই ভাল গোরুর গাড়ি চালায়। আঁধার রাতে থানাডোবায় গাড়ি উলটানোর মুখে, যে বাঁচিয়ে নিতে পারে, তাকেই না বলি ভাল গাড়ি-চালিয়ে। চিরকাল হাকিম পুলিশের দিকে ওরা। দেখে আসছি তো। লড়ায়ের সময় অংরেজের পা চাটবে না তো কী ? চারপেয়ে জানোয়ার-গুলো যেদিকে সবুজ দেখে সেইদিকে ছোটে চরতে। এরা হচ্ছে সেই শিংওয়ালা রাজপুত।

ঢোঁড়াইয়ের কাজের অন্তর নেই। এমন বে-আক্কিলে টোলার ছেলেগুলো যে বলণ্টিয়রজীর মালার জন্য, রাতে বাবুসাহেবের বাগান থেকেই ফুল চুরি করে এনেছে। বাবুসাহেবের বাড়ির ফুলে কি মহাৎমাজীর কাজ হয়! মঠের বটগাছে বলণ্টিয়রের দেওয়া মহাৎমাজীর ঝাণ্ডাটা টাঙানো হয়েছে। চারকোশ দূরের থানা থেকে দেখতে পায় তো দেখুক দারোগাসাহেব। ছানিপড়া চোখটা আঙুল দিয়ে ঘষে নিয়ে বুড়হাদাদা বলে, 'মহাবীরী ঝাণ্ডাটা'৩ তুলে ভাল করলি না ঢোঁড়াই। ইনসান আলিটা আবার 'লিঙে' খবর দিয়ে হাকিম না আনায় গাঁয়ে। বেটা আবার শাঁখ বাজানোকে আজকাল বলে 'কড়ি ফোঁকা'।

বিল্টা সকাল থেকে ঢোল গরম করতে বসেছিল। বুড়হাদাদার কথায় হঠাৎ কী মনে হয়, সে ঢোল ছেড়ে ওঠে, নদীর ওপারের গয়লাদের বস্তি থেকে বাজিয়ে সমেত শাঁখের যোগাড় করতে। পাড়ায় মেয়েরা রন্ধননিপুণা গনৌরীর বউয়ের বাড়িতে জটলা করছে। সেখানে আলুর তরকারি রান্না হবে। চাঁদা করে দেড় পোয়া আলু

১ তুলসীদাস থেকে। ২ রাম শ্যাম যদু মধু।

৩ 'মহাবীরী ঝান্ডার' মিছিল নিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হয়। মহাবীরের নামে এই নিশান ওড়ানো হয়।

কেনা হয়েছে। বেচারা বলণ্টিয়রকে আবার কতকাল জেলের খিচুড়ি খেতে হবে।

শিউজীর বেলপাতা, আর মহাৎমাজীর খাদি। বলণ্টিয়রের বসবার জায়গাটায় খাদি দিয়ে দিলে হত। গিধরটা তো দিন কতক পরছিল খাদি। না, ওর কাছ থেকে চাওয়া হবে না কোনো জিনিস, যতই এই চুটিটুকুর জন্য মন খুঁতখুঁত করুক। দারোগাসাহেবকে দেওয়ার জন্য একখানা কুর্শিরও দরকার ছিল, কিন্তু পাওয়া যাবে কোথা থেকে।

বলণ্টিয়র গাঁয়ে এসেই জিজ্ঞাসা করে এখনও দারোগাসাহেব আসেননি? এখনও এলেন না কেন? গোঁসাই ঠিক মাথার উপর এলেই সতিয়াগিরা করবার কথা। পনর দিন আগে সরকারের কাছে রেজেষ্ট্রি লুটিশ পাঠিয়েছি। তবু দারোগাসাহেব এল না এখনও। শীতের দিন, ছোটবেলা। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক দুপুরে সময়টা ঠিক করেছিলাম। এখান থেকে থানা-হাজতে যাতে দিনে দিনে পেঁছে যেতে পারি।

আজব জিনিস এই সতিয়াগিরা। গঞ্জের 'বাজারের নাটক' সার্কেল মানিজর-সাহাব না আসা পর্যন্ত আরম্ভ হয় না। সতিয়াগিরাও তেমনি দারোগাসাহেব না এলে আরম্ভ হয় না।

ঢোঁড়াই বোঝায়, আরে না না। এ একটা লড়াই। মহাৎমাজীর সঙ্গে রংরেজের লড়াই। রাম-রাবণের যুদ্ধে রামজীর অনুচররা যে রকম লড়েছিল রাবণের নাতি-পুতির সঙ্গে, এ তেমনি মহাৎমাজীর চেলা বলণ্টিয়র লড়বে,…রংরেজের নাতি দারোগা-সাহেবের সঙ্গে।

তাই বল ঢোঁড়াই! এ হবে 'উঠাপটক'১ দারোগাসাহেবের সঙ্গে। তা না, সতিয়াগিরা! সতিয়াগিরা।

বলণ্টিয়র সকলের ভুল ধারণা শুধরে দেওয়ার জন্য কী সব যেন বলে, কেউ বুঝতে পারে না। থামেই না, থামেই না বলণ্টিয়র। ভারি সুন্দর সুন্দর কথাগুলো। একেবারে থুতু ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু চেষ্টা করেও কোনো মানে বোঝা যায় না। সতিয়াগিরার মনগড়া অস্পষ্ট মানেটা, আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে। সাধুসন্তদের কথার ধারাই এই। মধ্যে মধ্যে মাথা নেড়ে সায় দিতে হয়, বলণ্টিয়রের মুখে হাসি দেখলে হাসতে হয় তার সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে সোজা হয়ে বসতে হয়। আর কত বোঝাবে বলণ্টিয়র।…

ঢোঁড়াই তিনটি কথা বোঝে। মহাৎমাজী চান সকলে সত্যি কথা বলুক; সকলে 'বৈষ্ণব'২ হয়ে থাক; আর দারোগার সঙ্গে লড়ায়ের সময় বলণ্টিয়রজী কিছুতেই চটবে না। এই তিনটি কথা। সে বাপু এরাই পারে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই লোক বেড়ে চলেছে। দারোগাসাহেবের এখনও দেখা নেই। বলণ্টিয়রের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়। যে দুজন ছোকরাকে দূর থেকে দারোগাসাহেবকে দেখবার জন্য বটগাছের মগডালে চড়ানো হয়েছিল, তারা ধৈর্য হারিয়ে নেমে আসে।

বলণ্টিয়র বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'নবাবপুত্তুরদের স্বভাব যাবে কোথায়। খেয়েদেয়ে এক ঘুম দিয়ে বোধ হয় আসবে।'

---

১ তুলে আছাড়।

২ জিরানিয়া জেলায় বৈষ্ণব কথাটির অর্থ নিরামিষাশী। এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

ঢোঁড়াইয়ের মতো লোকও হঠাৎ বলণ্টিয়রের মুখ-চোখ দেখে আবিষ্কার করে যে, তার বিরক্তির চাইতে উদ্বেগই হয়েছে বেশি।

'বলণ্টিয়রজী, দারোগাসাহেব ভয় পেলেন না কি ?'

'কে জানে। সে খোঁজে আমার দরকারও নেই।'

বলণ্টিয়রজীর কথার ঝাঁঝ দেখে ঢোঁড়াই চুপ করে যায়। হাতের খারু দেখতে আয়নার দরকার কী? বলণ্টিয়র ফৌজের উর্দি পাওয়া লোক বলে বোধ হয় দারোগা-সাহেব একটু ভয় পেয়েছে। এ দারোগাটাও আবার একটু রোগা রোগা গোছের।

একটানা কীর্তন শুনিয়েও এত লোকের ভিড়কে আর শান্ত রাখা যাচ্ছে না। দারোগাসাহেব বোধ হয় আর আসবেন না। ঢোঁড়াই একেবারে মুষড়ে পড়েছে। দুদিন ধরে দিনরাত মেহনত করেছে তারা। সে কি এই জন্যে। সতিয়াগিরা না হলে রাজপুতটোলার লোকেরা মুখ টিপে টিপে হাসবে। বলণ্টিয়রজী তো বেশ বসে বসে চরখা কাটছে। 'বলণ্টিয়রজী' সতিয়াগিরা কি তাহলে আর হবে না আজ ?'

বলণ্টিয়রজী চটে কী যেন বলে। কীর্তনের কানফাটানো মাতনের মধ্যে ঢোঁড়াই কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারে না। তবে এটুকু বোঝে যে সতিয়াগিরা হবে। আর বোঝে যে, মহাৎমাজী দারোগাসাহেবের উপর রাগ করতে বারণ করেছেন বলণ্টিয়রকে, কিন্তু ঢোঁড়াইদের উপর চটে উঠতে মানা করেননি।

হবে! হবে! দারোগা না এলেও হবে। সকলের মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে।

বলণ্টিয়র হাত উঁচু করে বলে, 'শান্তি! শান্তি!' কীর্তনের মাতন থামে। লোকের হট্টগোল থামে। সে দাঁড়িয়ে বলে, মহাৎমাজীর হুকুম ছিল বেশি কিছু না বলা। কিন্তু দারোগাসাহেব যখন আসেননি তখন খোলসা করেই বলি।...তারপর সে অংরেজ-জর্মান লড়াই, কাংগ্রেস মহাৎমাজী কত কী বলে যায়।...অনেক্ষণ বলবার পর শেষের দিকে ভারি ভাল কথা বলতে আরম্ভ করে। বাবুসাহেবকে বলে 'জুলুম-কার'। পাবলিস জুলুমকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। 'সবচেয়ে বড় বড় জুলুমের অংরেজ সরকার, তাকে সাহায্য করতে এসে দাঁড়ায়। 'এই দেখুন কুশীর ধারের গাঁয়ের 'নিকাশ' বাবুসাহেব হড়পে নিল। এগিয়ে দিল অংরেজ সরকারকে। পোকা থাকবার জন্য যে আটচালা তুলেছে সরকার, তেমন ঘর আপনাদের টোলায় একখানও আছে? রেঁড়ির বীচি চলে যাবে বিলাতে লড়ায়ের কাজে, আর আপনাদের খুঁটিতে বাঁধা গরুগুলো জল না পেয়ে তড়পে মরবে। এণ্ডির চাদর গায়ে দেবে, বাবুসাহেবের মতো জয়-চন্দদের আওরতরা, আর আপনাদের বাড়িতে মা-বোনেদের আবরু-ইজ্জত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে'...

আগুনের হলকা ছিটোচ্ছে বলণ্টিয়রের কথাগুলো। সকলের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। সব মনগুলো গলে তাল পাকিয়ে এক হয়ে গিয়েছে। বলণ্টিয়রজী যে এ রকম প্রাণের কথা বলতে পারে তা আগে কারও জানা ছিল না। দামী কথা বলেছে। 'জুলুমকার!'

বলণ্টিয়র লচুয়া চৌকিদারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বলে দিও তোমার দারোগাকে আমি সরকারের বিরুদ্ধে কী কী বলেছি। কানুন যদি ভাঙতেই হয় তবে ঠিক করে ভাঙাই ভাল।'

উত্তেজনায় সকলে উঠে দাঁড়িয়েছে। বুড়হাদাদার ছানিপড়া চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে গাল বেয়ে। সে বলে, বসে পড় সবাই। এরপর সতিয়াগিরা বাকি রয়েছে।

এখনই সবাই উঠে পড়লে কেন ?

কে কার কথায় কান দেয় তখন।

বলণ্টিয়র বলছে 'অংরেজ', আর সকলে বলে 'জ্যলমকার'।

ঢোঁড়াই বলে 'বাবুসাহেব!' সকলে বলে জ্যলমকার!' 'লাডলী বাবু'! 'জয়চন্দ্র!'

কখন যেন সকলে বলণ্টিয়রের সঙ্গে সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছে। কুশীর ধারে যেখানে গুটিপোকার ঘর হয়েছে সেখান পর্যন্ত গিয়ে সকলে প্রাণভরে চেঁচায়। তারপর বলণ্টিয়রজী 'ন এক পাই, ন এক ভাই অংরেজকী লড়াইমে' বলে ভঁটসাদিয়ারার পথ ধরে।

মহাৎমাজীর হুকুম, যতদিন পুলিশ না ধরে গ্রামে গ্রামে এই বলে বলে ঘুরে বেড়াতে হবে। সাঁঝের আগে বোধ হয় ভঁইসাদিয়ারায় পৌঁছুতে পারবে না। দেখছিস না হাওয়াই জাহাজ চলল। জিরানিয়ায় নেপালী ফৌজ ভর্তি করবার ছাউনি খুলেছে। সেখানকার ফৌজি হাকিম রোজ হাওয়াই জাহাজে কলকাত্তা থেকে আসা যাওয়া করে।

ছেলেপিলেরা বলণ্টিয়রের দেওয়া মালাগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। বলণ্টিয়রকে আর চেনা যাচ্ছে না এতদূর থেকে। হাতের বার্নিশ করা চরখার বাক্সটার উপর রোদ্দুর পড়ে ঝকমক করে উঠল। কুশীর ধারে টিলার পিছনে গোঁসাই পাটে বসবেন এইবার।

'পরণাম মহাৎমাজী!' 'পরণাম'! 'পরণাম'!

তারা সকলে ফিরে এসে দেখে, মঠের মাঠে বুড়হাদাদা তখন মেয়েদের বসিয়ে রেখেছে, সবাই এলে সতিয়াগিরা আরম্ভ হবে বলে।

## হাকিম রায়বার

বেচারা বলণ্টিয়রকে গ্রেপ্তার না করে দারোগাসাহেব ভারি বিপদে ফেলেছে, একবার জ্বর গায়ে কোয়েরীটোলায় এসে সেই যে ভাঙা মঠে আস্তানা নিয়েছিল, সেই থেকে রয়ে গিয়েছে সেখানেই। দু-চার দিন পর পর এ-গাঁ, সে-গাঁ, মাস্টারসাহেবের আশ্রম ঘুরে আসে। কোয়েরীটোলার লোকের ইচ্ছে যে বলণ্টিয়র তাদের গাঁয়েই থাকে। থাকলে পর সময়ে অসময়ে একটু মনে বল পাওয়া যায়। জিরানিয়া থেকে এসেই তার খদ্দরের ঝোলার মধ্যে থেকে বলণ্টিয়র প্রত্যেকবার বার করে একখানা করে মহাৎমাজীর কাগজ। তার উপর মহাৎমাজীর ছবি, হাঁসের পিঠে চড়ে উড়ে যাচ্ছেন আকাশে। তার থেকে পড়ে পড়ে কত খবর শোনায় মুলুকের। এ ছাড়াও বলণ্টিয়র আরও কত খবর আনে।

...অংরেজকে কাবু করছে জর্মন!...লাডলীবাবু জেলা 'কৌমি মোর্চার'১ সভাপতি হয়েছে; লোটা ভরা টাকা পাবে মাইনে, সরকারের কাছ থেকে। খুব বড় হাকিম।... পাট-তামাকের দাম বাড়ছে।...ঐ দেখ নেপালী রংরুটদের হাওয়াগাড়ি চলেছে পাক্কী দিয়ে—এক, দু, তিন, চার, পাঁচ। রোজ বিশখান করে যায়। কুরসাইলা স্টেশনে এগুলো চড়বে রেলগাড়িতে। জিরানিয়ার 'বাঙালিয়া'গুলো২ আজকাল ভারি কাবু; বাজারের সব মাছ এই নেপালী রংরুটগুলো কিনে নেয়। খায় কী করে জানেন তো? পুড়িয়ে।...

---

১ ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট।

২ বাঙালীদের তাচ্ছিল্যে 'বাঙালিয়া' বলা হয়।

লাডলীবাবু আরও বড় হাকিম হয়েছে—কথাটা ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। কোয়েরী আর সাঁওতালরা বাবুসাহেবের মঠের দরুন জমিগুলোতে গোরু চরানো আরম্ভ করেছিল। তারা জানে যে, এ জমিগুলো নিয়ে বাবুসাহেব মামলা-মোকদ্দমা করতে সাহস করবে না। যে চুরি করে খায় সে কি হাকিমের কাছে যায়? লাডলীবাবু বড় হাকিম হয়ে গেলে আবার কলস্টর দিয়ে গোলমাল না করায়।

কলস্টর না হোক, একদিন এস ডি ও সাহেবকে নিয়ে সত্যিই লাডলীবাবু এল গাঁয়ে। খবর দিল মিটিন হবে; সকলে ভয়ে কাঠ। এই দিনই আবার বলণ্টিয়রের জিরানিয়া না গেলে চলছিল না। কী যে করে সেখানে বুঝি না। লাডলীবাবু নিজে এসে সকলকে ডেকে নিয়ে গেলেন মিটিনে।

তাজ্জব ব্যাপার! মিটিনে মঠের জমির কথা কিছু বলেন না এস ডি ও সাহেব। কেবল লড়ায়ের কথা। হিটলার রাবণের মতো 'জুলুমকার'। রাঙা আলুর চাষ করা খুব লাভের। সাড়ে সাত টাকা করে মণ উঠেছে। গাঁয়ের উচিত, চোর-ডাকাতের বিরুদ্ধে 'রক্ষীদল' কায়েম করা গাঁয়ে গাঁয়ে।

ঢোঁড়াই হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ায়। 'আমাদের বাড়ি থেকে আর হুজুর কী নেবে ডাকাতে?

হাকিম বোঝান, 'এ কথা বললে কী চলে? সকলকে মিলে-মিশে থাকতে হবে গাঁয়ে।'

'হয়ে আসা'১ বড়কামাঝি বলে, 'বলছ বটে ঠিক হাকিম, শুনতে লাগছে ঠিক বাপের কথার মতো। কিন্তু কুশীকিনারের নিকাশে, তোমরা আর লাডলীবাবুরা মিলে যে রেড়ির চাষ করছ, আমাদের টোলার মেয়েরা কি কুর্বাঘাটে মেলার তাঁবুর আওরত?'

এস ডি. ও. সাহেব প্রথমে কথাটা ধরতে পারেননি। লাডলীবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি একটু আমতা আমতা করেন। বাবুসাহেব পাট-করা চাদরখানার উপর হাত বুলোতে বুলোতে কাশেন।

'দিনকাল বোঝেন না আপনারা।'

হাকিমের মুখ-চোখ দেখে বিল্টাটা আবার বুঝতে পারল কি না পারল, তাই পিথো মাঝি তার পায়ে খোঁচা মেরে বুঝিয়ে দেয় 'বকছে রে বাবুসাহেবকে।'

'না, না, লাডলীবাবু, এদের সঙ্গে সম্বন্ধটার একটু উন্নতি হওয়া দরকার।'

লাডলীবাবু কথাটা অস্বীকার করেন না। আজকালকার দিনে কি চাষবাসে, কি অন্য কাজে লোকবলই আসল বল। ফসলের দাম বাড়ছে। এখন এদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটিটা জিইয়ে না রাখাই ভাল।

কথাটা বাবুসাহেবও কিছুদিন থেকে ভাবছেন; কিন্তু হাকিম একথা ক'টা তাদের আলাদা ডেকেও তো বলতে পারতেন।

এস ডি. ও সাহেব ইনসান আলিকে সঙ্গে করে হাওয়াগাড়িতে ওঠেন। ইনসান আলির বাড়িতেই খানাপিনা করবেন আজ!

লাডলীবাবু বাড়ি ফিরবার সময় বলেন, 'এস ডি. ও টা লম্বরী 'লিগি'২ তাই জন্যই ইনসান আলি আড়গাড়িয়ার বাড়ি গেল।'

'আবার রাবণের কথা তুলেছিল বক্তৃতার মধ্যে।

---

১ জেল থেকে। ২ লিগি—মুসলিম লীগের লোক।

লচুয়া হাড়ি বলে, 'হাকিম চটেছিল কেন জানিস? 'কৌমি মোর্চার' মিটিন করবে বলে লাডলীবাবু হাকিমকে আনিয়েছিল এখানে। জেলার সব বড়লোককে, কাকে কত ওঅর-ফাণ্ডে দিতে হবে, কলস্টর সাহেব ঠিক করে দিয়েছে। অত দিতে চায় না লাডলীবাবু। এখানে এনে এস. ডি. ও. সাহেবকে বলে পাঁচশ টাকা নিতে। তিনি তো শুনে চটে লাল। কলস্টর বসিয়েছে তিন হাজার টাকা। এস. ডি. ও. কি পাঁচশ টাকা নিয়ে ছেড়ে দিতে পারে? তুই হলি 'কৌমি মোর্চার সভাপতি।'...

ঢোঁড়াইদের কারও এসব কথা শুনবার উৎসাহ নেই। কী বাজে গল্প করতেই ভালবাসে এই লচুয়া চৌকিদারটা! এখন এটা গেলে বাঁচা যায়!

লচুয়া হাড়ি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের কথা আরম্ভ হয়।

লাডলীবাবুটা তাহলে বেশি বড় হাকিম নয়। দেখলি না এস. ডি. ও. সাহেবের চাইতেও ছোট হাকিম।

হাঁ, 'ডবল' হাকিমের গরমই আলাদা।

যা তাড়া খেয়েছে। আর সাহস করবে না মঠের জমি নিয়ে গোলমাল করতে। বাবুসাহেবের কাছ থেকে 'আধি বন্দোবস্ত' নেওয়া মঠের জমিগুলোর ফসলের ভাগ এবার না দিয়ে দেখলে হয়। দেখাই যাক না বাবুসাহেব কী করে। মঠের পড়তি জমিতে গোরু চরালেও কিছু বলেনি, সাতিয়াগিরার দিনের অত গালাগালিও হজম করে গিয়েছে। বাবুসাহেবকে না দিয়ে কিছুটা বলণ্টিয়রকে দিলে কী হয়। ওরও তো বাল-বাচ্চা আছে নিজের গাঁয়ে।

বড়কামাঝিরও রায় তাই। 'তুইও বুড়হাদাদার মতো পুতুপুতু করিস না ঢোঁড়াই, এই সব ব্যাপার নিয়ে! যা হবার হবে, পরে দেখা যাবে। কাজ আজকাল দুয়োরে দুয়োরে ঘুরছে লোকের।'

সে কথা ঢোঁড়াইও জানে। এই তো ইনসান আলি এসেছিল পরশু লোকের জন্য। সেই বলল, রাজপুতেরা ডিস্টিবোডের খোঁয়াড় তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তার 'সুথনী'১ করবে। লড়ায়ের জন্য সরকারবাহাদুর 'পাক্কী' নিয়ে নিয়েছে ডিস্টিবোডের হাত থেকে। এখন পাক্কীর ধারের গাঁয়ে গাঁয়ে লোক রাখবে, রাস্তা মেরামত করবার জন্যে। তারই ঠিকেদারি পেয়েছে ইনসান আলি। ইনসান আলি আড়গড়িয়া আরও বলে গিয়েছিল, এই জন্যেই বাবুসাহেবরা পাক্কীর ধারের আমগাছ তিনটে তাড়াতাড়ি কাটিয়ে নিল। জিরানিয়ায় চালান করছে। ও রপোট করবে লাটসাহেবের কাছে। আজই হয়তো বলবে, এস ডি ও. সাহেবের কাছে; দুজনই তো 'লিঙে'র লোক।... ডিস্টিবোডের রাস্তা মেরামতির কাজ আবার যদি ঢোঁড়াই নেয়! ভাবতেও বেশ লাগে। কোথায় গিয়েছে সেই শনিচরা বুদ্ধুর দল...রাস্তায় কাজ করতে করতে যদি সে কুশীস্নানের দিন দেখে যে, গোরুর গাড়িতে করে রামিয়া আর তার ছেলে চলেছে ...উদাস হয়ে উঠে মনটা।

না, এখন পাক্কীর কাজ নিলে এরা ভাববে যে বাবুসাহেবের মুখে এদের ছেড়ে দিয়ে সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। তা হয় না।

### জমি জাতির রাজ্যে খবরের দৌরাত্ম্য

আজকাল বছরে যত দিন তত খবর, হাটে যত লোক, তত খবর। আর সব খবর সত্যি। না পেলে মন শক্ শক্ করে; মৌতাতের জিনিস পাওয়া না গেলে যেমন

১ একরকম কন্দ। 'কচুপোড়া' করবে এই অর্থে ব্যবহৃত।

হয়, তেমনি। এতকাল মঠের মাঠের খবরগুলো টিকত অনেক দিন। তার থেকে চুইয়ে চুইয়ে রস নিতে হত ন-মাস ছ-মাস ধরে। এখনকার খবরগুলো আসে ভিড় করে। একটা সত্যি খবর আর একটা সত্যি খবরকে ঠেলে নিজের জায়গা করে নেয়। কালকেরটা কালকে খুব সত্যি ছিল. আজকেরটা আজকে আরও সত্যি। তবে সত্যির মধ্যে কড়া ফিকে আছে। হাটের সত্যির চাইতে গঞ্জের বাজারের সত্যি কড়া। গনোরি র কুরসাইলা থেকে আনা খবর আরও কড়া। বলণ্টিয়রের জিরানিয়া থেকে আনা রামায়ণের হরফের খবর, তার উপর তো কথাই নেই।

কাপড়ের জাপানীরা হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এবার বাঘের খেলা, জর্মনবালা! লে লে লালা! সুরুজজী মহারাজের আর বুধভগমানের১ পুজো করে জপেনীরা। গোরু-টোরুর গণ্ডগোলের মধ্যে তারা নেই। ঠেলা বোঝাবে ইনসান আলি আড়গড়িয়াকে!

কাগজ দিয়ে ওরা হাওয়াই জাহাজ তৈরি করে, রবার দিয়ে জাহাজ। জল খাইয়ে ছাড়বে টমি পল্টনকে। জলের নিচ দিয়ে একেবারে কলকাতা থেকে কুরসাইলা পেঁাছে যাবে

রাজপারভাঙার তরফ থেকে রেলগাড়িভরা লোকদের যখন বিনা পয়সায় পুরি-তরকারি খাওয়ান হচ্ছিল সেই সময় একদিন কোয়েরীটোলার কাঁচা লঙ্কার গাড়িগুলো ফেরত এল নোরঙ্গীলালের গোলা থেকে। 'পুর্বিবাঙ্গাল' মুলুক নাকি জপেনীরা নিয়ে নিয়েছে। হাটে আর কত কাঁচা লঙ্কা বিক্রি করা যায়। সব বরবাদ হল। কিছু-দিন পর শোনা যায় যে, নোরঙ্গীলালের গোলায় কাঁচা লঙ্কা বিক্রি 'খুলে গিয়েছে'২ আবার। যে গনোরী আগের খবর দিয়েছিল সেই বলে যায় যে 'টিশন-মাস্টার' সাহেব বখেড়া তুলেছিল। দস্তুরের চাইতেও বেশি চাচ্ছিল পান খেতে। তাই লঙ্কা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল নোরঙ্গীলাল কিছুদিনের জন্য। জপেনীরা পুর্বি বাঙ্গাল নিয়েছে না ছাই!

আগেকার কাল হলে বিল্টারা তাকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করত, সে ক'টা মুখ দিয়ে কথা বলে? এখন কারও সে কথা খেয়াল হয় না। সাত জঙ্গলের লাকড়ি এক করে আঁটি বাঁধা; সব কি সমান জ্বলে।

তবে হ্যাঁ, বলণ্টিয়রের খবরের সঙ্গে গনোরীর খবরের তুলনা! কিতাব দেখে বলুক তো গনোরী কবে রামনবমী! এক মাস আগে বলণ্টিয়র বলে গিয়েছিল যে, পরের মাস থেকে পাক্কী দিয়ে গোরুর গাড়ি যেতে দেবে না, কাঁচা অংশটা দিয়েও নয়। পাক্কী দিয়ে চলবে খালি হাওয়াগাড়ি। ফৌজী সড়ক হয়েছে পাক্কী, একেবারে কামিখ্যামাইয়ের দেশ থেকে পালাবার রাস্তা করে রাখছে সরকার পচ্ছিমে! ঠিক বলেছিল কি না বলণ্টিয়র? বর্ষায় জিরানিয়া বাজারে কেউ পাট নিয়ে যেতে পেরেছিল?

অষ্টপ্রহর ফৌজী হাওয়াগাড়ি চলছে পাক্কীতে। এত গাড়িও কি ফৌজের ছিল। বলণ্টিয়র বলেছে যে জিরানিয়াতে টুরমন ফারমের৩ লাঙলের হাওয়াগাড়ি সারাবার আর রাখবার যে ঘর ছিল না, সেইখানে হাওয়াগাড়ি মেরামতের কারখানা খুলেছে

---

১ সুর্যদেব ও বুদ্ধদেব।

২ আরম্ভ হয়েছে।

৩ Tournament Agricultural Farm।

ফৌজি সরকার। একেবারে পাক্কীর পশ্চিম দিকটা ভাঙা। হাওয়াগাড়িতে ভরে গিয়েছে। কত ঘর তৈরি হচ্ছে সেই দিকটায়। বিজলী বাতি বসাবে। আর পূবের দিকের টুরমনের ফারমের সিধা রেললাইনের কাছে কাঠের ইস্টিশান করেছে ফৌজের সাহেবরা। বড় বড় চালা তুলেছে সেখানে। গোরু, ঘোড়া, ছাগল, খচ্চর, ভেড়ায় ভরা। সব বেলুচি ফৌজ মুসলমান নইলে এত কসাই আর কে হবে। অথচ মুসলমানরা চটবে বলে উট আর শুয়োর রাখেনি সরকার। ফৌজ না হাতি! সাহিস, সাহিস! উর্দি পরেছে বলে ছাগল চরানোর রাখালকে ফৌজ বলতে পারি না। আর ফারমের কী হালত জানেন তো ঢোঁড়াইজী? বিলিতী ঘাস পোঁতা হয়েছে ঐসব জানোয়ারদের খাওয়ানোর জন্য। তার আবার যত্ন কত! মরণাধার থেকে নলের পিচকিরি দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে, সেই খচ্চরের খাওয়া ঘাসের জন্য।

ঢোঁড়াই জানে যে বলিণ্টয়র বাজে কথা বলে না।

আরও বলুক বলিণ্টয়র পাক্কীর ধারের ঐ জায়গাগুলোর খবর। সেখানকার লোকগুলোর কথা তো কিছু বলে না। 'টুরমনের ফারমের' উপর তার মনে মনে আক্রোশ আছে; তাদের বকরহাট্টার মাঠ নষ্ট করে দিয়েছিল চিরকালের জন্য। আবার চীনাবাদামের বিচি দিতে এসেছিল সেবারে। হাওয়াগাড়ির লাঙল দিয়ে চীনে-বাদাম করতে গিয়েছিলি, এবার থেকে ফলবে ছাগলের নাদি?

তার 'পাক্কী'ও কি তাহলে বদলে গেল? ক্ষেতের রঙ বদলায়, লোকের মন বদলায়, আজকে ছোট ছেলেটা কাল জোয়ান হয়ে ওঠে, রোজার তাকত কমে, রোজগারের ধারা বদলায়, তাৎমাদের মোড়ল গোরুর গাড়ি চালায়, দুনিয়ার সব জিনিস বদলায়। বদলায় না কেবল 'পাক্কী' আর রামায়ণ। এ দুটোর সঙ্গে যে নাড়ি বাঁধা তার। এগুলো চিরকাল একরকম। পাক্কীর বটগাছের পাতা ঝরুক শীতে; পশ্চিম বাতাসে নূতন পাতা গজাক, বর্ষায় রাস্তার মাটি ধুয়ে যাক; রাস্তা চওড়া কর না যত ইচ্ছে, কামাখ্যাজী থেকেও আগে নিয়ে যাও না যদি চাও; এসবকে সে বদলানো বলে না। কাঁচা অংশটা দিয়েও গোরুর গাড়ি যাবে না, গাড়োয়ানের গান শোনা যাবে না রাতে, লোকে ব্যবহার করতে পারবে না, ছাগল-ভেড়ার কদর হবে মানুষের চাইতে বেশি, একেই বলে বদল। শিলিগুড়ি নকসাল-বাড়িতে গোরাদের জন্য শুয়োরের পাল নিয়ে যাচ্ছে রোজ ডোমরা এই পথে, কিন্তু ধান নিয়ে যেতে দেবে না লোককে গোরুর গাড়িতে। অদ্ভুত! ফৌজের লোক ছাড়া আর যেন লোক নেই দুনিয়াতে!

কানে আসছে বলিণ্টয়রের কথা—থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে—সৌরা, সলিম-পুর, বিরসোনি, বাজিতগঞ্জ, সাতকোদারিয়া…না, না, বিসকান্ধা মৌজার নাম নেই ফিরিস্তিতে…

বলিণ্টয়রজীর গল্প তাহলে এবার শেষ হল। বলিণ্টয়র প্রতি সপ্তাহে জিরানিয়া থেকে মহাৎমাজীর কাগজ নিয়ে এলেই সকলে ঘিরে বসে তাকে। সব খবর বলা শেষ হয়ে যাবার পর, সবাই বলিণ্টয়রকে বলে কাছারীর নিলামী ইস্তাহারটা দেখতে, মহাৎমাজীর কাগজখানা থেকে। বিসকান্ধার নামটা নেই তো? কিছু বিশ্বাস নেই বাবুসাহেবকে। দেখছি তো! হাজার লড়ায়ের খবর বল, মহাৎমাজীর খবর বল, আর জিরানিয়ার ফৌজী ছাউনির খবর বল, এর কাছে আর কোনো কথা কথাই না।

জমির কাছে আবার অন্য কথা! ফৌজে বকরহাট্টার মাঠের জমি নেয়, সরকার

পর্যন্ত কুশীর ধারের জমি নেয়। রোজগার মানেই যে জমি। ইজ্জতের সঙ্গে রোজগার, জমি। আবার রোজগারের সঙ্গে ইজ্জত চাইলে তাঁরও দরকার জমির। চাষের জমি, গোরু চরাবার জমি, নিকাশের জমি, ধেনো জমি, তামাকের জমি, ভুট্টার জমি। যার আছে, সে আরও চায়, যার কোনোদিন ছিল না, সে-ও আজকে চায়; যাদের ছিল, গিয়েছে, তারা তো চাইবেই। বদলাক দুনিয়া। হয় যদি হোক রামায়ণে বদল। জমি, আর জমি, আর জমি! অথচ সকলেই চায় রামায়ণের নজিরের বলে।

উদাস হয়ে উঠেছে ঢোঁড়াইয়ের মন একটা অজানা উৎকণ্ঠায়।

## দিব্যদৃষ্টি লাভ

'পাক্কী' ঢোঁড়াইয়ের কাছে একটা সজীব জিনিস। তার কোনোরকম সন্দেহ নেই যে পাক্কীটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। লোহাতে ঘুণ ধরেছে, সোনাতে মরচে পড়েছে; এ কি কলির শেষ হয়ে এল নাকি? বাবুসাহেব কাটিয়ে নিয়েছিল পাক্কীর ধারের অনেক আমগাছ। ফৌজের থেকে কাটিয়ে নিল সব সেগুন, শাল আর শিশুগাছ-গুলো। কুশী থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পাক্কীর গাছের মৌচাকগুলো একজন পাঞ্জাবী ঠিকাদার জমা নিয়েছে। আসামে ফৌজদের জন্যে মধু চালান যাবে। ফৌজি হাকিমরা 'পাক্কীর' ধারের জমি কতদূর পর্যন্ত তাদের, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই দুধারের মাটিকাটা গর্তগুলোতে বাবুসাহেব ধান লাগিয়েছে।

দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে। এর খুঁটিগুলো এত পলকা তা আগে জানা ছিল না। পায়ের নিচের শক্ত মাটি, তাতে দাঁড়িয়েও যেন নিশ্চিন্দি নেই; ঐ শুনতেই রাঙাআলু সাড়ে-ন' টাকা মণ! রোজার রাজ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন রাজা—সরকার বাহাদুর। এতদিন 'ইনরধনুর'—আড়ালে 'ইনরজী মহারাজের'[১] মতো ছিল সাত-সমুন্দুর তের নদীর পারের রাজা। সূর্যিঠাকুরকে সেই রূপকথার রাজা রাখতেন দারোয়ান। সে দারোয়ানের চোখের পলকটুকু পর্যন্ত ফেলবার হুকুম ছিল না। রাজপুত্তুর 'চলাকুমার আর বিজাসিং'-এর রূপটা তবু পালাগানের সুরে আর ঢোলকের বোলে ধরা পড়ত। এ রাজাকে জানবার সে উপায়টুকু ছিল না। সেই রাজা এসে গিয়েছেন কাছে। আবছা রূপটা স্পষ্ট না দেখা গেলেও অনুভব করা যায়। 'পাক্কী' আর পাটের দামের রাজা, কাপড় আর কেরোসিনের রাজা, মাটিতে জমিদার হাকিম দারোগা ফৌজের রাজা, আকাশে 'হাওয়াই-জাহাজের' রাজা, বাতাসে ফৌজী হাওয়াগাড়ির গন্ধের রাজা। রামায়ণে এ-রকম রাজার কথা লেখা নেই। 'বিলাক'-এর[২] কথা লেখা আছে? লাডলীবাবু নিজের বৈঠকখানায় দোকান মঞ্জুর করে দিয়েছিল, অনোখীবাবু, ইনসান আলি আড়গাড়িয়া আর গিধর মণ্ডল এই তিনজনকে। পনের টাকা দিয়ে নাম লেখালে তবে চিনিখোররা সেই দোকান থেকে জিনিস পেতে পারে। রামায়ণপড়া পণ্ডিতজীও জানত না যে ঐ দোকানের নাম 'কণ্ট্রোল'। এসব জিনিসের কথা রামায়ণে থাকে না, নিলামি ইস্তাহারওয়ালা মাস্টারসাহেবের কিতাবে। বলণ্টিয়রজী জানে। তাই না এসব জানতে হলে বসতে হয় বলণ্টিয়রজীর কাছে।

বদলায় অথচ বদলায় না। পুরনো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে

---

১ রামধনুর আড়ালের ইন্দ্রদেব।

২ ব্ল্যাকমার্কেটিং।

যায়। ইনসান আলি পাক্কীর ঠিকেদার হওয়ার পরও তার ইনসান আলি 'আড়গড়িয়া'১ নাম ঘোচে না। গিধর মোড়লের মোড়লি ঘুচল, তবু সে গিধর মোড়লই থেকে যায়। খোঁয়াড়ে কাজ করলেও কেউ তাকে আড়গড়িয়া বলে না; কলকাতায় রাঙাআলু চালান দেওয়ার ঠিকে নিলেও কেউ তাকে ঠিকাদারসাহেব বলে না। ভাঙখোর অনোখীবাবু রাত জাগতে হবে বলে আজকাল অন্য জিনিস খায়; কৌমি মোর্চা'র২ সাহায্যে কণ্ট্রোলের দোকানের নাম করে কেনা নুন রোজ রাতে নৌকা বোঝাই করে চালান দেয় বাঙ্গাল মুলুকে; তবুও সে নিজেকে বলে 'কিষাণ'। কুরসাইলার চিনির কলের আর বাস লাইনের মালিক রাজপারভাঙা; তবু সবাই বলে জমিদার।

যা শোন সব আসামে যাচ্ছে। রাজ্যশুদ্ধ লোক ঠিকেদার হয়ে উঠছে। মন হয়ে যাচ্ছে অন্যরকম। গোরু দুইতে আরম্ভ করেছে কিষাণরা। জিরানিয়া জেলায় এত দিন গোরু রাখা হত বাছুরের জন্য আর গোবরের জন্য কেবল। গাছের থেকে পড়া ফল যার ইচ্ছে নেওয়ার অধিকার ছিল গাঁয়ে, এখন ঠিকেদাররা কাঁচা আমই চালান করে দিচ্ছে, গাছতলায় ফল আসবে কোথা থেকে। যদিই বা দেবাৎ কোনো বাগানে গাছে আম পাকতে দেওয়া হয়, সেখানেও ঠিকেদাররা তলের ফল কুড়োতে দিচ্ছে না।

এতও খেতে পারে মৌজারা!

ঢোঁড়াই কিছুতেই বুঝতে পারে না কী করে তারা এত জিনিস নিয়ে, মধু থেকে আরম্ভ করে রাঙাআলু পর্যন্ত।

বলণ্টিয়র বলে, 'মৌকা এসেছে যে যা পারে করে নেবার। এমন সুযোগ জীবনে একবারের বেশি আসে না। কালকে এ সুবিধা নাও থাকতে পারে। সাধে কি আর মহাৎমাজী গরমেছেন! বরদাস্তের বাইরে হয়ে গিয়েছে। মহাৎমাজী বলে গিয়েছেন এই তাঁর শেষ লড়াই, দুনিয়াতে রামরাজ্য আনবার লড়াই।'

রামচন্দ্রের অবতার মহাৎমাজী! রামায়ণের লেখার সমান তাঁর কথার ওজন।

এবার আর আগের মতো নিমক তৈরীর ফিস্-স্ স্ আর সতিয়াগিরার ফুস্-স্ স্ নয়। আর সে সব ছিল খোঁড়া-নুলোর 'নৌটাঙ্কি'। এবার মরদের লড়াই রেললাইন তুলবার, তার কাটবার আরও অনেক! অনেক! মাস্টারসাহেব পাটনা থেকে খবর নিয়ে এসেছে।

মাস্টারসাহেব এনেছে? পাটনা থেকে? তবে আর এ খবর অবিশ্বাস করার কিছু নেই। রেলগাড়ি দিয়ে কি আর রামরাজ্যে পৌঁছন যায়। ওতে করে সব জিনিস পাঠানো যায় আসামে, কুরসাইলা থেকে আর জিরানিয়ার ইস্টিশান থেকে। বুড়হাদাদা বলণ্টিয়রকে জিজ্ঞাসা করছে, মাতাল গোরাপল্টনরা কেরোসিন তেল খায় নাকি? না হলে এত তেল কী হয়? বুড়হাদাদার উপর ঢোঁড়াইয়ের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। এত বাজে কথাও বলতে পারে। এইবার নিশ্চয়ই দেশলাই নুন আর কাপাড়ের পুঁথি খুলে বসবে।…না না বলণ্টিয়রজী, এসব কথা যেতে দিন। মহাৎমাজীর কথা বলুন। ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা হয় আরও শোনে, সব কথা শোনে। রামায়ণ শোনবার পুণ্যি না থাকুক এতে। তবু এ'কথা আরম্ভ হলে বলণ্টিয়রের কাছে ঘেঁষে বসতে ইচ্ছে করে। রাবণের চাইতেও অংরেজ সরকারের উপর আক্রোশ আরও জীয়ন্ত হয়ে ওঠে। ধন্য তার পুণ্যের বল যে সে অমন মহাৎমার দর্শন করতে পেরেছিল। এই দর্শনের দিনের সঙ্গে তার জীবনের কতখানি অংশ জড়ানো। শুধু তার কেন আরও একজনের। সে

---

১ খোঁয়াড়রক্ষক। ২ ন্যাশন্যাল ওয়ারফ্রণ্ট।

এখন কোথায় কোথায় জলকাদায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেঁচে আছে কি মরে গিয়েছে কেউ জানে না।···

অজ্ঞাতে ঢোঁড়াইয়ের হাত চলে যায় কোমরের বটুয়াটিতে। উপর থেকে টিপে টিপে দেখলে চাঁদির সিক্কাগুলো বোঝা যায়। ভাল লোকদের অদ্ভুত ধরন অবিচারের প্রতিবাদ জানাবার। সাগিয়া প্রতিবাদ জানায় নিজেকে কাদায় নামিয়ে; বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের উপর প্রতিশোধ নেয়। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মহাৎমাজী অংরেজের জুলুমের জবাব দেন জেলের খিচুড়ি খেয়ে; সীতাজী নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন ধরতিমাইয়ের কোলে গিয়ে।

'ও বলন্টিয়র। গোঁসাই মেঘে ঢাকা রয়েছে বলে আজ কি আর খাওয়ার সময় হবে না?

বলন্টিয়র এক-একবেলা এক-একজনের বাড়িতে খায়। গনৌরীর বৌ তাকে ডাকতে এসেছে।

'আর এ গাঁয়ের দানাপানি উঠল আমার।'

আবার কী হল। গনৌরীর বৌয়ের মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে। এত বড় একটা লোককে খাওয়ানোয় আবার কিছু ত্রুটি হয়ে যায়নি তো! তার স্বামী থাকে কুরনাইলা। গাঁয়ে জমি কেনবার মতো টাকা জমলে তবে ফিরবে। তার কষ্টের সংসার থেকে, কত চেষ্টা করে বলন্টিয়রের খাওয়ার পালাটা চালাতে হয় তাকে।

'না না, তা বলছি না, জেলের খিচুড়ি আবার খেতে হবে শীগগিরই'—একটু আদর কাড়তে চায় বলন্টিয়র।

'বাবুসাহেব?'

'মেয়েমানুষের আবার কত আক্কেল হবে।' বুড়হাদাদা অবাধ্য মাজাটা সোজা করে নিয়ে বসে, তারপর এই বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকটিকে এক কথায় সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়, 'মহাৎমাজীর লাইন তোলা হবে।'

বলন্টিয়রের খাওয়া হলে, গাঁসুদ্ধ সকলে তাকে টিপটিপুনি বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে দিতে আসে। 'জিরানিয়া থেকে খবর পাঠিও বলন্টিয়র।

'মহাৎমাজীর মুখ রেখো ঢোঁড়াই।'

'ও বলন্টিয়র, থামো থামো।' গনৌরীর বৌ ছুটে আসছে তার বিছানায় পাতবার বোরাটা নিয়ে। 'গায়ে মাথায় দিয়ে নাও এটা, না হলে এক কোশ যেতে না যেতেই ঐ অমনি হয়ে যাবে চেহারা। গনৌরীর বৌ বাবুসাহেবের ভুট্টা ক্ষেতের কাকতাড়ুয়াটাকে দেখায়। যেদিন কলস্টরসাহেব লাডলীবাবুর সঙ্গে কণ্ট্রোল খুলতে এসেছিলেন, সেদিন তাঁকে দেখানোর জন্য প্রজাপতি ছাঁটের গোঁফওয়ালা হিটলার কাকতাড়ুয়াটিকে এখানে খাড়া করা হয়েছিল। খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি। রোদে বৃষ্টিতে সেটার রূপ গিয়েছে বদলে, এখন সেটাকে দেখিয়েই মুখখুদ গনৌরীর বৌটা হেসেছিল, যাতে রামায়ণপড়া বলন্টিয়রজী চটের বোরাটা নেওয়ার সময় কুণ্ঠিত হবার অবকাশ না পায়।

মহাৎমাজী সাবধান করে দিয়েছেন অংরেজকে। কী করতে হবে তা বলন্টিয়র বলে যায়নি। তবে কাঠবিড়ালের কর্তব্য করতে ঢোঁড়াই পিছপা নয়।

### বিসকান্ধার অঙ্গীকার

বাবুসাহেব বহুকালের অভ্যাসমতো আজও হাটে এসেছিলেন। দুদিন থেকে

তাঁর মনের উপর দিয়ে বড় অশান্তি চলেছে। তাঁর ছাব্বিশ বিঘার বাঁশঝাড় নির্মূল করে অনোখীবাবু কোশীজী গঙ্গাজী দিয়ে পাটনায় পাঠিয়েছে। এক টাকায় একখানা করে বাঁশ বলে কী সব বেচতে হবে? ছেলেদের এ হ্যাংলামি বাবুসাহেবের পছন্দ না। বললেও শোনে না। তোদের জিনিস যা ভাল বুঝিস কর। তবে তিনি শর্ত করিয়ে নিয়েছেন যে, ওর থেকে এক পয়সাও ফঙ্গবেনে ঠিকেদারির কাজে খরচ করতে দেবেন না তিনি। ঐ টাকা দিয়ে গোরু, বলদ, মোষ কিনতে হবে, যত আক্রাই দাম পড়ুক না কেন। কম করে পাঁচশটা গোরু-মোষ না হলে সেগুলোকে নিজের রাখালের দলের সঙ্গে 'মোরঙ্গে'১ পাঠান যায় না চরবার জন্য। জনকয়েকে মিলে পাঠাতে হয়। সে-রকম লোকদের এ অঞ্চলে আভিজাতদের মধ্যে ধরা হয় না। যা দাম বাড়ছে গোরু-মোষের! বাঁশের দাম বাড়াটাই দেখছে অনোখীবাবু, মোষের দাম বাড়াটা আজ নজরে পড়ে না। হুগ্গে দরে হাঁটুজল। সেই বাঁশঝাড়ের জমিটা থেকে, তিনি বাঁশের শেকড় খুঁড়ে বার করাচ্ছিলেন দিনকয়েক থেকে। মুসহরগুলোর২ উপর কোনো কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জো নেই! একদিন রোজগার করে দুদিন জিরোয়। তিন দিন থেকে সেই বে-আক্কেলে লোকগুলো কাজে আসছে না। বোঝে না যে আজকালকার দশ টাকা মণ রাঙাআলুর দিনে এক ধুর জমি অনাবাদী ফেলে রাখলে কিষাণের মত লোকসান। পোপাই মুসহরটা হাটে এসেছে ঠিকই। কিন্তু গেল কোথায়?

তাকে দেখতে পাওয়া যায় কুয়োর পাশের ভিড়টার মধ্যে। রাজপুতটোলার বাচিতরোয়াটাকেও৩ তো দেখছি একটা কাগজ দেখে দেখে কী যেন পড়ছে। ব'স মুসহর আর হাড়ীগুলোর গা ঘেঁষে! মহাত্মাজীর হল্লা। এসব বহু দেখেছেন তিনি সারাজীবন ধরে। দেবে সরকার বাহাদুর ভুট্টা পেটানোর মতো করে ঠেঙ্গিয়ে, অমনি টাঁয় টাঁয় ফিস্-স্৪ হয়ে যাবে সব। প্রত্যেক ক'বছর পর পরই তে হয়। এবার যেন একটু তাড়াতাড়ি! তা করছিস বাপু তোরা কর। এর মধ্যে আবার মুসহর-টুসহরকে নেওয়া কেন?

'এই পোপাই, শোন্ এদিকে।'

'চেঁচামেচি করবেন না এখানে। কাল সকাল আটটায় নটায় যাব।'

'কেন এখানে কি রামায়ণপাঠ হচ্ছে নাকি? হাটে কথা বলতে হলেও খাজনা দিতে হবে?' 'ফের এখানে বকবক করবে তো জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

বহুদর্শী বাবুসাহেব মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারেন যে, এরা যা বলছে তা করতে ইতস্তত করবে না আজ। দারোগাসাহেব পরশু ঠিকই বলেছিলেন, বাবুসাহেব, ইনসান আলি, গিধর মণ্ডল তিনজনই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথা। তাঁর টোলার বাচিতর নামের ছোকরাটা কী সব বলছে তাঁর কানেও যায় না। চারিদিকে এত ভিড় চাপ বেঁধে গিয়েছে এই চেঁচামেচিতে যে বেরুনও শক্ত। সেখানেই বসে পড়েন তিনি। ঘড়ির টাইম ছাঁটে মুসহরের ব্যাটা! শিখল কোথা থেকে?

সরকার জুলুমকার! অংরেজ জুলুমকার! বলে বাচিতর সিং শেষ করল তার কথা। মহাত্মাজী গ্রেপ্তার! হো যাও তৈয়ার! হঠাৎ ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়িয়েছে।

---

১ নেপালের একটি জেলা।

২ একটি স্থানীয় অনুন্নত জাতের নাম। এরা ক্ষেতমজুরের কাজ করে।

৩ বিচিত্র সিং নামের তাচ্ছিল্যসূচক উচ্চারণ।

৪ বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়া।

'কেউ মহাত্মাজীর হুকুমের বিরুদ্ধে যেও না। যে খেলাপে যাবে সে পাবলিসের দুশমন। বিসকান্ধার বিশ কাঁধ এক হলে কারও দাল গলবে না সেখানে। তাঁর কথা রাখবে তো সকলে?'

সকলে চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'নিশ্চয়।'

'মরদের এক কথা!'

'নিশ্চয়।'

'দেখো, যার এক বাপ, তার এক বাত!'

এত মনের মতো করে কথা কি বাচিতর সিং বলতে পারে? ঢোঁড়াইয়ের কথা মনে গিয়ে বেঁধে। পা ঠুকে ঠুকে আর হাত নেড়ে নেড়ে সকলে চিৎকার করে, এক বাপ! এক বাত! এক বাপ! এক বাত! এত মনের মতো কথা তারা এর আগে কখনও শোনেনি।

বিল্টা একটা ঘন্টা হাতে করে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে বাচিতর সিংয়ের হাতে দিয়ে ভিড় ঠেলে আসে বাবুসাহেবের কাছে। তাঁর হাত ধরে তাঁকে টেনে দাঁড় করায়। চুপ করে কেন? বলো এক বাপ, এক বাত। বলো, বলো, থেমো না।

কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলেন বাবুসাহেব। সকলে শ্রান্ত হয়ে থামবার পর বড়কামাঝি লচুয়া চৌকিদারের হাত চেপে ধরে। বলবি নাকি এসব কথা তোর বাপ দারোগার কাছে? সে ঘাড় নেড়ে জানায় যে সে বলবে না।

'এক বাপ! এক বাত!'

চৌকিদারকে ধরে এনে বাবুসাহেবের পাশে দাঁড় করান হয়।

আবার বলো। দুজনে একসঙ্গে বলো।

মহাত্মাজীর কাজে তারা কাঠবেড়ালির সাহায্যটুকু করতে পেরেছে, এই সন্তোষ মনে নিয়ে সেদিন সবাই বাড়ি ফেরে। ঢোঁড়াইটাকে আগে রেখে মনে ভরসা পাওয়া যায়। ও যাঃ!

বিল্টা ঠিক করে গিয়েছিল, 'হাটে ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে' যে আর কাউকে চৌকিদারি খাজনা দিতে হবে না। এক বাপ এক বাতের ঠেলায় যথাসময়ে সেটা ভুলে গিয়েছে। আর এখন হাট ভেঙে গিয়েছে।

## তিতলি কুঠি দাহন

এর পরে কয়দিন এক রকম নেশার মধ্য দিয়ে কেটে যায়। একটা যা হোক কিছু করবার নেশা। দল বেঁধে বেঁধে সকলে এখানে-ওখানে সাত জায়গায় ছুটে বেড়ায়। সবাই সব-কিছু করছে মহাত্মাজীর 'সেবাতে'। থানাতে স্বরাজ হয়ে গেল। ঢোঁড়াই কাউকে বলে না, কিন্তু তার মনে মনে দুঃখ যে সে মহাত্মাজীর কাজ কিছু করবার সুযোগ পেল না। লোকে জানুক, দশজনে বলুক যে, সে খুব মহাত্মাজীর কাজ করছে। এই বাসনাটি প্রবল হয়ে উঠেছে আজ কয়েকদিন থেকে।

গঞ্জের বাজারের দাগী আসামী বিশুনি কেওট পর্যন্ত ভোপতলাল আর বলন্টিয়রের প্রশংসা পেয়ে গেল মহাত্মাজীর কাজ করে। থানার কাগজ জ্বালানোর দিন সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে দারোগাসাহেবের চালাকি। তার 'শ্বশুরা' দারোগা নাকি 'দাগী রেজিস্টার খান'১ লুকিয়ে রেখে বাজে কাগজগুলো জ্বালানোর জন্য দিয়েছিল।

১ 'Village Crime Note Book'।

তারপর পেট্রল দিয়ে ছোট দারোগাকে সমেত থানার ব্যাপারটা সে নিজে শেষ করে। মাঝে থেকে ফাঁকি দিয়ে নাম কিনে নিল ভোপতলাল আর বাচিতর সিং। তবে বিশুনি কেওটের মতো মহাৎমাজীর কাজ করতে সে চায় না। বলণ্টিয়রের দেখা পাওয়াই শক্ত। নইলে ঢোঁড়াই তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করত।···

একদিন বিসকান্ধার দল কুরসাইলার কাছের একটা রেললাইনের ব্যাপার দেখে ফিরছে। কাঁধে তীর-ধনুক, বড়কামাঝি তান ধরেছে। নেশায় গলা ভেঙে এসেছে। কাল রাত থেকেই 'পচই'-এর[১] স্রোত বইছে সাঁওতালটোলায়। স্বরাজ হয়ে গিয়েছে। বড় দারোগা ভেগেছে, সারকিল মানিজর হাকিমি টুপি খুলেছে। অংরেজকার সরকারকে এতদিন এক টাকা করে বছরে দিতে হত পচই খাওয়ার কাগজের জন্য। জয় হো মহাৎমাজী! তার রাজ্যে পচই খেতে আর কাগজ[২] নিতে হবে না। পাওয়া যেত এখন সেই পচইয়ের হাকিমটাকে, তাহলে কেড়ে নেওয়া যেত তার কুর্তা পাতলুন। নাচ শালা হাকিমি নাচ। কী করে যে স্বরাজ এসে গেল ঠিক বোঝাও গেল না। মহাৎ-মাজীর কাজ প্রাণভরে করাও গেল না। দুঃখে তাই কান্না এসে গিয়েছে বড়কামাঝির। তাই ভাঙা গলায় সে তান ধরেছে—

···রেললাইন উঠিয়ে ফেললে  
তো পা ভেঙে দিলে সরকারের।  
তার কেটে দিলে  
তো কান কেটে দিলে সরকারের।  
থানা জ্বালিয়ে দিলে  
তো চোখ গেলে দিলে সরকারের।[৩]

নেশার ঘোরে তুই অংরেজের জন্যে কাঁদছিস নাকি রে বড়কামাঝি?

নেশার ঘোরে! পচইয়ের আবার নেশা, তা আবার ধরবে বড়কামাঝিকে! ঐ দ্যাখ কুশীর ধারে কাকচিল উড়ছে; পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। নেশা হলে কি দেখতে পেতাম।

বলেই বড়কামাঝির সন্দেহ হয় নিজের উপর। একটা চিলকে অতগুলো চিল দেখছে না তো?

বিল্টা বলে, 'বাদলা পোকাটোকা উড়ছে মনে হয়।'

বড়কামাঝি নিশ্চিত হয়, যাক, তাহলে চোখের ভুল হয় না। শিকারীর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সে বোঝে যে কাকচিলগুলো উড়ছে গুটিপোকার ঘরের উপর। ডালা পরিষ্কার করে রোগা পোকাগুলোকে ফেলছে বোধ হয়।

কাছে এসে দেখে যে ঠিক তাই। 'তিতলি'র হাকিম[৪] হাফ পাতলুন পরে, গুটিপোকার ঘরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। দারোগাতে রাজ্য ছেড়েছে, তিতলি'র আবার হাকিম। এতদিন 'তিতলি'র হাকিম কথাটার মধ্যে কেউ হাসির কিছু খুঁজে পায়নি।

---

১ ভাত থেকে তৈরী এক রকম মদ।

২ আবগারী বিভাগের লাইসেন্স।

৩ স্থানীয় গীত।

৪ তিতলি—প্রজাপতি। রেশমের গুটি কেটে প্রজাপতি বার হয়। সরকারী রেশম বিভাগের কর্মচারী।

ঠিক বলেছিস বড়কামাঝি। পচইয়ের হাকিমের পিসতুতো ভাই তিতলির হাকিম? চৌকিদার উর্দি ছেড়েছে, কিন্তু তিতলির সাহেব পাতলুন ছাড়েনি। গুট্‌ মোটিং। গুট মোটিং তিতলি সাহেব। সকলে উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। হাফপ্যান্টপরা লোকটি ভয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। সকলে সেইদিকে আগিয়ে যায়।

হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের মুখচোখে একটা জিনিস মনে পড়ার ঝলক লাগে। হাতের কাছের এমন জরুরি কাজ এতদিন মনে পড়েনি কেন তাই ভেবে সে আশ্চর্য হয়।

ঢোঁড়াই বলে, বাইরে চলে এস তিতলিসাহেব, ঘরে আগুন লাগাচ্ছি আমরা। চালের খড় সকলে টেনে বার করে এক এক মুঠো।

একখানা লুঙ্গি পরে তিতলি সাহেব বেরিয়ে এসেছে।

দম বন্ধ করা ধোঁয়ার মধ্যে ঢোঁড়াই গুটিপোকার ডালাগুলোকে এক এক করে বার করে মাঠে রাখে। কিলবিলে পোকাগুলোকে দেখে গা ঘিন ঘিন করে।

'যত তোর উদ্ভট কান্ড! কার জন্য বার করছিস ওগুলো? এখনই তো কাকে চিলে খেয়ে যাবে।

'তা খাক।'

—মাথায় জড়ানো গামছাখানা আলগোছে খুলে নিয়ে বড়কামাঝি ঢোঁড়াইয়ের পায়ের কাছে রাখে; নাটকে ঠিক যে রকম সে দেখেছে। 'লোহা মানছি১ আমি তোর ঢোঁড়াই আজ থেকে। তোর খুনে পানি নেই।'

ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে সেই একদিনকার কথা ছোটবেলার, যেদিন রেবণগুণী লোহা মেনেছিল মহাৎমাজীর। আজ সাঁওতালটুলি তার লোহা মানছে। এতে আনন্দ আছে। কাল হয়তো আরও দূরের লোকেরা তার তারিফ করবে। দেখা হলে বলণ্টিয়রজী পিঠ চাপড়ে দেবে তার। মহাৎমাজীর কাজ মন বদলে দেয় লোকের দেখতে দেখতে। অন্য কাজে কেবল নিজের গাঁয়ের লোকের প্রশংসা পেলেই মন ভরে ওঠে। এ কাজে শুধু ঐ টুকুতে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু সে কদর পেতে হলে রামায়ণ-পড়া লোক হতে হয়।

তার সত্যিকারের তৃপ্তি হয়েছে পোকা-ক'টাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে।

সত্যই ঢোঁড়াই নিজেকে বুঝতে পারে না। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে, খুঁজে পায় না নিজেকে। দিন কয়েক আগে যেদিন পাক্কীর ধারের অশ্বত্থগাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছিল সেইদিনের কথা। অত মেহনত, অত হৈ-চৈ, কিন্তু তার মধ্যে কেবল একটা কথাই তার মনে আছে। অনেকদিনের পর সেদিন মোসম্মতকে দেখেছিল সেখানে, গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে। মোসম্মত তাকে একপাশে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—'তুই নিজে অশ্বত্থগাছ কাটার মধ্যে থাকিস না ঢোঁড়াই। ওতে অমঙ্গল হয়।'

কী ভাল যে লেগেছিল তার এই কথাট! মহাৎমাজীর কাজের চাইতেও ভাল। কিছুক্ষণের মধ্যে মহাৎমাজীর কাজ তার চোখের সমুখ থেকে মুছে গিয়েছিল সেদিন। মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে কথা ক'টা। বড়কামাঝির কথা কানে আসছে।···মাস্টারসাহেব কলস্টর হবে। লাডলীবাবু অংরেজের হাকিম হতে গিয়েছিল, এখন লে

---

১ পরাজয় স্বীকার করা।

সুথনি১। ঢোঁড়াই তুই চেষ্টা করিস দারোগা হতে, 'তিতলি'র হাকিম তো মহাৎমাজীর রাজ্যে থাকবেই না।···

## ঢোঁড়াইয়ের আজাদ দস্তায় প্রবেশ

যেদিন বড় দারোগাসাহেবকে সঙ্গে করে গোরারা আসে বিসকান্ধায়, সেদিন সকালেই ঢোঁড়াই পালিয়ে এসেছিল কুশী পার হয়ে, 'আজাদ দস্তা'য়২। লচুয়া চৌকিদার খবর দিয়ে দিয়েছিল যে, তাকে ধরবার জনাই টমিরা আসছে।

ভিনদেশের রঙবেরঙের পাখি লালমুখো কাকতাড়ুয়া দেখে দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছিল। সাঁঝ পড়াতে একগাছে রাত কাটাচ্ছে। তার নাম 'আজাদ দস্তা।' বুলিমুখস্থ তোতা আছে, নাচনদার ফিঙে আছে, পাঁকের পাখি কাদাখোঁচা আছে, সবজান্তা ভুশন্ডী কাক আছে। ইস্কুলের ছেলেই বেশি। নাম জিজ্ঞাসা করলে নামের শেষে 'আজাদ' কথাটা যোগ করে দেয়।

ভালমন্দ যেমন লোক চাও সব পাবে এখানে। কাজের লোক কি আর নেই? বলন্টিয়রজী আছে, ভোপতলাল আছে, মিলিটারি-ফেরত সর্দারজী আছে; মাস্টারসাহেবের ডান হাত বিস্তুন শুকুলা আছে। বিস্তুন শুকুলাকে ঘিরেই দলটা দানা বেঁধেছে।

পুলিশের নজর এড়ানোর জন্যে দলের যোগ্য লোকেরা নতুন নাম পায়। ভোপতলালের নাম হয়েছে গান্ধী, বিশুন শুকুলার নাম জওয়াহর, বলন্টিয়রজীর নাম প্যাটেল, বাচিতর সিংয়ের নাম আজাদ; মিলিটারি-ফেরত লোকটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সর্দার'। এই নাম পাওয়ার চাইতে বড় সম্মান দলের মধ্যে আর কিছু নেই। এ নিয়ে ঈর্ষা দ্বন্দ্বেরও অন্ত নেই।

এ দিকটা বন্যার দেশ। তের মাইলের মধ্যে হাওয়াগাড়ির রাস্তা নেই; টমিরা আসতে পারবে না। তাই সবাই নিশ্চিন্দি হয়ে কী কী ভুল করে ফেলেছে, তারই বিরামহীন গল্প করবার ফুরসত পেয়েছে।

ঢোঁড়াই যেতেই বলন্টিয়রজী সকলকে বলে দেয় যে, এ আমাদের চেনা লোক। 'খুফিয়া'৩ নয়।

'বাবুসাহেব আর ইনসান আলির পাখিমারা বন্দুক দুটো যদি নিয়ে নিতিস রে ঢোঁড়াই।'

'বন্দুক? বন্দুক নিতে তো বলেনি বলন্টিয়রজী কখনও। আর ভোপতলালজী তুমি তো আমাদের ওদিকে যাওইনি।

সকলে একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে ওঠে। সকলের মুখ দেখে ঢোঁড়াই বোঝে যে সে কোথায় যেন একটা দোষ করে ফেলেছে। সে ভেবে পায় না, কী আবার বলল সে? বলন্টিয়রজী বলে দেয় যে, এখানে বলন্টিয়রজী আর ভোপতলালজী বলে ডাকা বারণ, তবে জওয়াহরকে বিস্তুন শুকুলা বলে ডাকতেও পার। সবে নতুন এসেছে সে। সেইজন্যে আর অজ্ঞতা সেবারকার মতো দলের লোকে মাফ করে দেয়।

'গান্ধী' হেসেই খুন। 'পাখিমারা বন্দুকের কথায় আকাশ থেকে পড়িস।

---

১ খা কলা পোড়া। সুথনি এক কন্দের নাম।

২ 'আজাদ-দস্তা'র শব্দগত অর্থ স্বাধীন-দল।

৩ গুপ্তচর।

তোরা আবার অংরেজের সঙ্গে লড়বি।'

কোনা থেকে গর্জে ওঠে 'প্যাটেল'। 'ডিং হাঁকিস না[১] গান্ধী। এই আমাদের সকলের সমুখে বলে রাখলাম, গান্ধী যদি পাখিমারা বন্দুকেও টোটা ভরতে পারে তবে আমার নামে কুকুর পুষবেন। ফৌজের কাছ থেকে নেওয়া তিন-তিনটে রাইফেল পড়ে রয়েছে। কাউকে তো একদিনও চালাতে দেখলাম না।'

'চালাবে কি টোটা খরচ করবার জন্যে? আমাদের ইস্কুলের পণ্ডিতজী বলতেন 'বৃহৎ দন্তা হি ক্বচিৎ মূর্খাঃ।' প্যাটেলটা সেই 'ক্বচিৎ'-এর মধ্যে পড়ে গিয়েছে।'

প্যাটেলের সমুখের দাঁতকয়টি বড়। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। একবছর ভাগলপুরে কলেজে গান্ধী পড়েছিল বলে সংস্কৃততে অপমান করবে!

দুজন হাতাহাতি হবার উপক্রম। জওয়াহর সব ব্যাপারে গান্ধীর দিক টেনে কথা বলেন। আজাদ দস্তায় এসব চলবে না।

আবার একটা চেঁচামেচি আরম্ভ হয়।

একেবারে হতভম্ব হয়ে যায় ঢোঁড়াই সমস্ত দেখে।

সেই রাতেই ঢোঁড়াইয়ের পাহারা দেওয়ার ডিউটি পড়ে সম্মুখের মাঠে। দুজন দুজন করে একসঙ্গে ডিউটি দেয়। তার সঙ্গের লোকটিকে ঢোঁড়াই দেখেই চিনতে পারে, গঞ্জের বাজারের দাগী আসামী বিশুনি কেওট। এইটাই থানা জ্বালানোর দিন দারোগাসাহেবের চালাকি ধরে ফেলেছিল।

সে গল্প জমায় ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে। দুনিয়ার বহু খবর রাখে লোকটা।

...তোর মাগ ছেলে নেই ঘরে, তবে এই পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? পোকার ঘর পোড়ানোর সাজা আর কতদিন হবে; দুধে দম্বল দিয়ে জেলে যাবি, আর ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে সেই দই খাবি।...বিস্তুন শুকলাকে এরা দলের পাণ্ডা করেছে কেন জানিস? এখন কাজের মধ্যে তো চাঁদা তোলা কেবল। বিস্তুন শুকলা মাস্টার সাহেবের চেলা কিনা, তবু লোকে ভাববে যে টাকাটা মহাৎমাজীর কাজেই লাগবে। দেখলি না ঐ জন্যই তো দল থেকে নিয়ম করে দিয়েছে যে, ওকে বিস্তুন শুকলাও বলতে পার, জওয়াহরও বলতে পার। ঐ পঞ্চপান্ডবের মধ্যে আর কাউকে আসল নাম ধরে ডাকো তো! তাহলেই কালকে খাওয়া বন্ধ? পাঁচজনে আবার যাওয়া হল ভুখনাহার বালে-সোয়ার যাদবের বাড়ি শোবার জন্য। সে নাকি বিশ্বাসী লোক। আরে বুঝি সব। খুব দুধ দই চালাচ্ছে সেখানে রোজ রাতে। দেখলি না কত কটা করে ভাত খেল এখানে। তোরাও মহাৎমাজীর কাজ করেছিস, আমরাও মহাৎমাজীর কাজ করেছি। তবু দুধ দইটার বেলায় শুধু তোরাই থাকবি কেন? নিজেরা গান্ধী জওয়াহর সব ভাল ভাল নাম নিয়ে নিল। ওরে আমার ভাল নাম লেনে-ওয়ালারে! জেলের মধ্যে কত কান্ডই দেখেছি এইসব মহাৎমাজীর চেলাদের।...বিস্তুন শুকলা করনজাহা ইউনিয়ন বোর্ড পুড়িয়েছে কেন জানিস তো? টাকা খেয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডের। তাই হিসাবের খাতাপত্তরগুলো নষ্ট করে দিল। এই আজাদ দস্তার নামে নেওয়া চাঁদার টাকাও খাবে ওই দশভুতে মিলে। এ আমি বলে রেখে দিলাম দেখে নিস। চাঁদা আর বলিস না ওকে।...

নিজের তর্জনীটি বেঁকিয়ে বন্দুকের ঘোড়া টিপবার মুদ্রা দেখায়।...এই এরই ভয়ে। নইলে কেউ উপুড়হস্ত করত?...দ্যাখ না, আর কয়েক দিন। রেলগাড়ি

১ বড় বড় কথা বলিস না।

আবার চলতে আরম্ভ হয়েছে। এই টাকার থলে নিয়ে নিয়ে সব বেরুবে কাজের নাম করে।

আসল রাজনীতির এই প্রথম পাঠ নিতে নিতে ঢোঁড়াই হাই তোলে। বিশুনি কেওট বলে, 'খুব থকে আছিস, না ঢোঁড়াই? কাল সারাদিন সারারাত হেঁটেছিস।...গান্ধীটা সুশীলা'র১ দলের কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সুশীলা আর কামিনী দুই সতীন জানিস তো। একজন যদি বলে পুবে যাবার কথা, আর একজন বলবে পচ্ছিমে। কত বলে দেখেছি এসব জেলে। একদল যদি বলে মাংস খাব, আর একদল বলবে আণ্ডা খাব!...বুঝলি ঢোঁড়াই, টাকার দরকার সব কাজে। নইলে সব বসে যাবে, মাঝপথে বলদ বসবার মতো।... দে দেখি একটু খৈনী; চোখের পাতাটা ভারি হয়ে আসছে। এই! এই ঢোঁড়াই! ঘুমিয়েছে শ্বশুরটা'...

পরদিন সকালে খোঁজ পড়লে দেখা যায় কার্তুজগুলোর একটাও নেই। বিশুনি কেওটেরও কোনো পাত্তা নেই। বন্দুকগুলোর মধ্যে একটা মাত্র গিয়েছে। মহাত্মাজীর কাজের সে ক্ষতি করতে চায় না। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা জিনিসও নেয়নি।

রামরাজ্য স্থাপনের কাজে অবহেলা করবার কলঙ্ক প্রথম দিনই ঢোঁড়াইয়ের উপর পড়ে। দু দিন খাওয়া বন্ধর সাজা সে মাথা পেতে নেয়।

## স্বর্গের সোপানের সন্ধানলাভ

ঢোঁড়াইয়ের সবচেয়ে ভাল লাগে সর্দারকে! কনৌজী ব্রাহ্মণ! ভারি ঠাণ্ডা স্বভাব। পুজো করে, রামায়ণ পড়ে। সকালবেলায় দু-ঘণ্টা করে ড্রিল করায়। তারপর সারা দিন ছুটি। ছোট ছোট দলে কোথাও তাস, কোথাও দশ-পঁচিশ খেলা। প্যাটেল, গান্ধী আর জওয়াহর সফরে বাইরেই বেশি থাকেন। কে কোথায়, কেন যাচ্ছে, সেসব খবর ঢোঁড়াই রাখে না। সে খুশি যে, সর্দার বলেছে তাকে এক বছরের মধ্যে রামায়ণ পড়া শিখিয়ে দেবে। মুখস্থ তোমার যখন আছেই ঢোঁড়াইজী, তখন হয়তো এক বছরও লাগবে না। এখন এতদিন সময় পেলে হয়।

ঢোঁড়াইয়েরও সেই ভাবনা। এরই মধ্যে একদিন জওয়াহর তাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলেছিলেন যে, ঢোঁড়াইকে তাঁর ভারি পছন্দ। সে যদি রাজী থাকে, তাহলে তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারেন, নিজে হাতে তাকে কাজ শেখানোর জন্য। তাহলে তিনি ঢোঁড়াইকে দল থেকে একটা নাম দেওয়ানোরও ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। 'ইস্কুলিয়া'দের২ মধ্যে কেউ হলে এ-প্রস্তাবে হাতে চাঁদ পেত। কিন্তু ঢোঁড়াই রাজী হয়নি। বর্ণ পরিচয়ের অক্ষর তো নয়, রামায়ণের স্বর্গে উঠবার এক-একটা সিঁড়ি। সেই পিছল সিঁড়িতে হাত ধরে টেনে তুলছে তার মতো অযোগ্য লোককে সর্দার।

দলের প্রত্যেকেই জওয়াহরের সান্নিধ্য চায়। তাই তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, ঢোঁড়াই তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে। সেই দিন থেকে তিনি ঢোঁড়াইয়ের পিছনে লেগেছিলেন। কোথাও দূরে চিঠি পাঠাতে হলে ঢোঁড়াইয়ের উপরই সেই ডিউটি পড়ত। এটা দলের সবাই লক্ষ্য করেছিল। তবে সুবিধের মধ্যে জওয়াহর

১ জিরানিয়া জেলার গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা সোস্যালিস্ট ও কমুনিস্ট দলকে সুশীলা ও কামিনী বলে বিদ্রূপ করে।

২ ইস্কুল কলেজের ছাত্র।

বাইরেই থাকতেন বেশি। সেই সময়টার জন্যেই ঢোঁড়াই অপেক্ষা করে থাকত। মিলিটারি ড্রিল করালে কী হবে, সর্দার ভাবপ্রবণ লোক। সে ঢোঁড়াইয়ের দরদী মনের মধ্যে এমন একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছিল, যা সে দলের আর কারও মধ্যে পায়নি।

ঢোঁড়াই গান্ধীকে ব্যাপারটা বলেছিল। সে বলে, 'খুব ভালো করেছিস, জওয়াহরের সঙ্গে না গিয়ে। ও তোকে কাপড় কাচানো আর বিছানা বওয়ানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। 'ইস্কুলিয়া'রা সে কাজ করবে না বলে তাদের বলেছি। কাজ শেখাত না ছাই। 'সব বেলনায় বেলা আছে আমার।' জানি তো ওকে আমি।'

ঢোঁড়াইয়ের আর তর সয় না। 'গান্ধী, তোমরা তো প্রায়ই পাটনা-ভাগলপুর-মুঙ্গের যাও। আমার জন্য একখানা রামায়ণ কিনে এনো।'

সর্দার বলে, 'হবে, হবে। ঠাকুরদা মরবে তবে তো বলদ ভাগ হবে! এত হুড়বড় কিসের?'

'বুঝলে না সর্দার, হবে তো ঠিকই। তবে কিনা আগে থেকে কেনা থাকবে···'

তার মনে হয় যে, এখনই যদি কেনা না হয়, তাহলে আর কখনও কেনা হয়ে উঠবে না।

'আমার রামায়ণখান দিয়ে চলবে না?'—সর্দার হেঁসে ঢোঁড়াইকে জড়িয়ে ধরে। 'গান্ধী, কাল তো জামালপুর যাচ্ছ তুমি। নিয়ে এসো একখান রামচরিত-মানস কিনে ঢোঁড়াইজীর জন্য'।

'মনে থাকলে আনব।'

সে রাতে ঢোঁড়াই ঘুমোয় না। ধন্য রামচন্দ্রজী, যিনি তাকে এই পথে নিয়ে এসেছিলেন। চিরকাল তিনি তার উপর সদয়। আগে থেকে তার ইচ্ছেটা বোঝা যায় না, তাই লোকে ভুল করে। রানায়ণখান হবে তার একেবারে নিজের। ঠিক নিজের জমির মতো, নিজের ছেলের মতো।···দূর ভুখনহাদিয়ারায় একটা আলো দেখা যাচ্ছে; ঠিক তারার মতো দেখাচ্ছে। চরার ক্যায়া-গোলাপের জঙ্গলের মধ্যে তিতির পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। খয়ের আর বাবলা গাছগুলোর নিচের জলের ভাপসা পচা গন্ধটাও মিষ্টি লাগছে। কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই, কোনো সমাজের চাপ নেই এখানে। বামুন সর্দার এখানে তার সঙ্গে বসে ভাত খায়। সমুখে মহাৎমাজীর রামরাজ্য স্থাপনা করবার কাজ নিশ্চয়ই আছে। কী, তা সে জানে না। 'ইস্কুলিয়া'রাও জানে না। দলের মাথাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'হবে, হবে! আর ক'দিন সবুর কর না।' তা নিয়ে ঢোঁড়াইয়ের বিশেষ দুশ্চিন্তাও নেই। তার উপর যা হুকুম হবে, সে তাই করবে।···ততদিনে তার রামায়ণ এসে যাবে। তার বটুয়ার মধ্যে সাগিয়ার ছেলের মালাটা ছাড়া এক টাকা তিন আনা আছে। শেষ রাতে যখন গান্ধী রওনা হবে, তখন তাকে এগিয়ে দেওয়ার ছুতো করে, খানিকটা পথ তার সঙ্গে যাবে সে। তারপর চুপিচুপি এই এক টাকা তিন আনা তাকে দেবে; রামায়ণের দাম। মহাৎমাজীর পয়সায় কেনা রামায়ণ নিলে তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে না?

যেদিন গান্ধী ফিরে এল জামালপুর থেকে, সেদিন দলের কারও মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। রাতে চৌকিদার এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল যে, জওয়াহর পুলিশের কাছে 'সারেণ্ডার' করেছেন। তার বাবাকে জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছিল; তাই আর তিনি থাকতে পারেন নি।

গান্ধী বলে, 'বন্দুক-পিস্তল আসতে আরম্ভ করেছে দেখে ঘাবড়েছে। 'ঘরে থুতু

ফেলা বারণ', এই প্রচারের কাজ যদি আজাদ দস্তা করত, তাহলে জওয়াহর থাকত এখানে। হারামী!'

প্যাটেল বলে, 'হুতো খুঁজছিল পালাবার। কায়ের।'[১]

আজাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জওয়াহর একটা পুলিশের 'খুফিয়া'[২]। আবার দলের সকলকে না ধরিয়ে দেয়। গোরু একবার যখন উখ্‌লিতে মুখ দিয়েছে, তখন কি আর কিছু না খেয়ে ছাড়বে?

এই আবহাওয়ার মধ্যেও ঢোঁড়াইয়ের মন পড়ে রয়েছে গান্ধীর ঝোলাটার উপর। অনেকক্ষণ উশখুশ করবার পর সে আর থাকতে পারে না। গান্ধীর গা ঘেঁষে গিয়ে বসে, যদি তাকে দেখে রামায়ণের কথাটা মনে পড়ে। সর্দার গান্ধীর ঝোলাটা খুলে লাল রঙের পকেট রামায়ণখান বার করে দেয় ঢোঁড়াইয়ের হাতে। কী ঠান্ডা রামায়ণখান। ঢোঁড়াইয়ের হাতে কাঁপুনি ধরে গিয়েছে। গান্ধী যে তার দিকে কটমট করে তাকাল, সেদিকে তার খেয়ালও নেই।

## ক্রান্তিদলে ঢোঁড়াইয়ের নূতন নামকরণ

'আজাদ দস্তা'র নাম 'ক্রান্তিদল' হয়ে গিয়েছে। না হলে ভাগলপুর মুঙ্গের জেলার দলগুলোর সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল না। জামালপুর থেকে পিস্তল আর কার্তুজ তৈরির সরঞ্জাম এসেছে, মুঙ্গের থেকে মিস্ত্রি এসেছে। মাচার উপর পাটনা থেকে আনা ইস্তাহারগুলো 'ইস্কুলিয়া'রা দিনরাত বসে বসে নকল করছে। প্যাটেল 'মন্ত্রী' হয়েছে এখানকার ক্রান্তিদলের। কাছাকাছি বাবলা গাছের গুঁড়িগুলো পিস্তল ছোঁড়া অভ্যাস করবার ঠেলায় মৌমাছির চাকের মত দেখতে হয়ে গিয়েছে। অনেকগুলো জায়গায় দলের কেন্দ্র হয়েছে। নিত্যি নতুন নতুন 'ইস্কুলিয়া' আসছে দলে ভর্তি হতে। কতক বা চলে যাচ্ছে নেপালে।

সব চেয়ে বড় কথা, ঢোঁড়াই নতুন নাম পেয়েছে। তার তাম হয়েছে 'রামায়ণজী'। সর্দারই প্রস্তাব করে! গান্ধীর এ নামে আপত্তি ছিল। সে বলেছিল যে, এখনও অনেক লীডারের ভাল ভাল নাম বাকি রয়েছে। ক্রান্তিদলে আবার রামায়ণ-টামায়ণ আনা কেন? কিন্তু তার কথা টেকেনি।

এখন আর নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই কারও। কাজের আর কথার অন্ত নেই। গল্পের মধ্যে যেমন লোকে অজানতে চলে যায় এক কথা থেকে অন্য কথায় তেমনি এরা যায় এক কাজ থেকে অন্য কাজে।

ছোট বড় কাউকে ছেড়ে কথা বলা হয় না প্রাত্যহিক 'মিটিনে', মন্ত্রীকে পর্যন্ত না।

সেদিন 'মিটিনে' প্যাটেলের দল গান্ধীর দলকে হারিয়ে দিয়েছিল হাফপ্যাণ্ট কাচবার ব্যাপার নিয়ে। আজকাল সকলের উর্দি হয়েছে খাকির হাফপ্যাণ্ট, হাফশার্ট। প্যাটেল বলেছিল খাকির হাফপ্যাণ্ট আবার কাচানো! ও কি ময়লা হয়! নেহাত দরকার পড়লে, মাসে একবার কাচলেই যথেষ্ট। গান্ধীর দল বলেছিল এতবড় একটা ব্যাপারে দল থেকে নির্দেশ দেওয়া ঠিক হবে না। আজাদ গান্ধীকে সমর্থন করেছিল—কাপড়কাচা সাবানের খরচ কমানোর আগে, পান-জর্দার খরচ কমানোর দরকার।

ভোটে হেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীর দলের একটি ছোকরা চেঁচিয়ে বলে, পানের

---

১ কাপুরুষ।

২ গুপ্তচর।

খরচ যার চোখে বেঁধে, নিজের হাতের ঘড়িটা কি তার নজরে পড়ে না ? আবার মিটিনে নতুন করে সাড়া পড়ে যায়। দলের পিরথিলাল পুলিশের কাছে যাতায়াত করত। তাই সেটাকে দিনকয়েক আগে খতম করে দেওয়া হয়েছিল। কুশীতে ফেলবার আগে আজাদ লাশটার হাত থেকে রিস্টওয়াচটা খুলে নেয়।

'কেড়ে নেওয়া হোক ওর নামটা।'

এই নিয়ে বাদানুবাদ যখন বেশ জমে এসেছে, আজাদ উঠে দাঁড়ায়। নাটকীয় ভঙ্গিতে দুহাত দিয়ে পড়্‌পড়্ করে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলে। অনাবৃত বুকটায় একটা চাপড় মেরে বলে, 'বুক চিরে যদি দেখান যেত তাহলে দেখাতাম আমার মনের মধ্যে কী ছিল···

প্যাটেলের মুখের কাঠিন্য নরম হয়ে এসেছে। 'দেখি দেখি আজাদ, বুকের সেই চিতি সাপ লাগবার জায়গাটা। ঘা হয়নি তো দেখছি।'···

সঙ্গে সঙ্গে সকলের নজর গিয়ে পড়ে সেই দিকে। দিনতিনেক আগে হামিদপুরে আজাদ যেখানে শুয়েছিল, মিলিটারি ঘেরাও করে সেই পাড়াটা। একখানা পুরনো চালা মাটিতে নামানো ছিল। আজাদ তারই নিচে উপুড় হয়ে সারারাত কাটিয়েছিল। সকালে সে নাকি দেখে যে, একটা চিতি সাপ চেপটে মরে রয়েছে তার বুকের নিচে।

কে যেন বলে, 'খানিকটা আমের আঠা লাগিয়ে নিলি না কেন বুকে ?'

আমের আঠার কথাটা ওঠায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে বিসকান্ধার লোকে খবর দিয়ে গিয়েছে যে, ঠিকেদার দু-একদিনের মধ্যে আম চালান দেওয়া আরম্ভ করবে। বাগানে বসে ঝুড়ি বুনছে।

ফলার খাবে রে, আসামের ফৌজে! চল চল। এখনই!

ঘোড়ায় চড়ে উর্দিপরা ক্রান্তিদল চলে।

বাগানে পেঁছুতেই ঠিকেদার বলে, এখন হাতে পয়সা নেই। আর দিনকয়েক পরে আমটা বেচেই আমি হুজুরদের খুশী করব। আমি নিজে গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসব।

তার গলার টুঁটি চেপে ধরে আজাদ। 'শালা, পিটিয়ে তোর শরীর ঢিলে করে দেব। খুশী যা করবে সে আমরা জানি। আমটা পাড়বার পরও তোমরা বসে থাকবে কিনা এখানে।'

কোয়েরীটোলার আর সাঁওতালটোলার যে ছেলেকয়টি বাগান পাহারা দেবার কাজ নিয়েছে তাদের গাছে চড়িয়ে সব আম পাড়ানো হয়।

'বিলিয়ে দিও তোমাদের টোলায়।'

ঠিকেদার আর চুপ করে থাকতে পারে না, 'হুজুররা আমার দোষ দেখছেন, আমি পচ্ছিমের লোক বলে। এই গাঁয়ের গিধর মণ্ডল যে 'কৌমী মোর্চার'১ চাঁদা মাফ করিয়ে দেবে বলে, টৌলা থেকে এত টাকা নিল তাকে তো কিছু বলেন না ?'

'গিধর মণ্ডল ?'

যারা আম পাড়ছিল তারা বলে কথাটা মিথ্যে নয়।

'তবে আমাদের খবর দিসনি কেন ?'

'ওতো 'বার'২ বসায়নি আমাদের উপর। যেটা বসেছিল সেটাকে মাপ করিয়ে দিয়েছে।'

---

১ ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্ট ২ ওয়ার লোন।

তাকে মুখ ভেংচে ওঠে গান্ধী! আহাম্মক কোথাকার! মাপ করিয়ে দিয়েছে! এই, তোদের বলে রাখলাম, আম বিলি করবার সময় সবাইকে আম দিবি, একে খবর্দার দিস না!...'

গিধর মণ্ডলের এই কান্ড! সকলের নাকের উপর!

আর এখানে সময় নষ্ট করা যায় না।

গিধরের বাড়ি যেতে যেতে মাঝপথে প্যাটেলের মনে পড়ে, যে হরিজনগুলো ঝুড়ি বুনছিল, তাদের আম দেওয়ার কথা তো ঐ তো গাছের ছোঁড়াদের বলা হয়নি। আবার ফিরে গিয়ে কথাটা বলে আসা হয়।

গিধর মণ্ডলের দেখা পাওয়া যায় না বাড়িতে। আঙুল থেকে 'বার করা রক্ত দিয়ে একখানা কাগজে কী যেন লেখে গান্ধী। তারপর সেখানাকে আমের আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয় গিধরের বারান্দায়।

টোলার লোকেরা বলে ইনসান আলি আড়গড়িয়াকে বলেই গিধর 'বার' মাফ করিয়েছিল। সে আজকাল সদরে থাকে কিনা। জিরানিয়া স্টেশনের কাছে ওর বেয়াইয়ের সঙ্গে মিলে বড় ঠিকেদারি কারবার খুলেছে, সব হাকিমের সঙ্গে তার দোস্তি।

সকলের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। হাতের কাছে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না!

প্যাটেল গর্জে ওঠে, এখানে থাকে না কেন ইনসান আলি?'

'হুজুর, আপনার ভয়ে।'

যাক্! তবু মনটা একটু ঠান্ডা হয়।

রাজপুতটোলাতেও সাড়া পড়ে গিয়েছে। 'কেরাশ্টি! কেরাশ্টি!'[১] বাবুসাহেব লোটা নিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করছিলেন। ধরা পড়ে যান।

'আসুন। পায়ের ধুলো পড়ল আপনাদের সকলের অনেকদিনের পর।

গান্ধী কোমরের ভিতর থেকে একটা কালো রঙের রিভলবার বার করে খাটিয়ার উপর রাখে। ভাবে দেখাতে চায় যে কোমরের বেল্টটা আলগা করে দিয়ে একটু আরাম করে নিচ্ছে মাত্র। তারপর ফরমাশ করে, 'কাউকে ক'টা দাঁতন দিতে বলবেন তো। ছ'টা নিমের, চারটে বাবলার।'

এর ইঙ্গিত বাবুসাহেব বোঝেন। 'ও অনোখীবাবু, এরা সকাল থেকে কিছু খাননি, কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করুন আগে। ও আজাদ, আপনি তো ঘরের ছেলে। রান্নাঘরে ঠাকুরকে বলে আসুন না গোলমরিচ দিয়ে যেন রাঁধে; প্যাটেল আবার লঙ্কা খান না।'

ক্রান্তিদলের সবাই হেসেই খুন। কোন যুগের দুনিয়ায় আছে ঐ বুড়োটা? সেই লঙ্কা না খাওয়া বলন্টিয়রের জীবন কি আর ক্রান্তিদলেও চলে নাকি!

বাবুসাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকান সকলের মুখের দিকে। কিছুই তাল পাওয়া যায় না এদের কথাবার্তার। তাঁকে খাটিয়া থেকে উঠতে দেবে না, তার কারণটা তিনি বুঝতে পারেন...একসঙ্গে সকলে খেতে বসবে না, সেটার কারণও বোঝা যায়; তাঁদের পুরো বিশ্বাস পায় না, তাই দুজন পাহারায় থাকে। কিন্তু এদের হাসি, এদের রাগ, এদের চাউনি, এদের কথাবার্তা সব বদলে গিয়েছে! দলের প্রায় বেশির ভাগ লোকই তাঁদের আগেকার জানা! তারা কী করে এই কদিনে বদলে গেল।

---

১ সাধারণ লোকে ক্রান্তিদলকে কেরাশ্টি বলত।

কোয়েরীটোলার ঢোঁড়াইয়ের পায়ে জুতো উঠেছে, শুধু জুতো। লোটা নিয়ে ময়দানে যাবে, তাও পায়ের জুতো খুলবে না।...জাতের লোক বাচিতর সিং, গাঁয়ের লোক ঢোঁড়াই, কত পরিচিত বলশিউয়র, ভোপতলাল! এখন এদের সম্মুখে আসতে ভয় করে।...

পান জর্দা খাওয়ার সময় প্যাটেল কাজের কথা পাড়ে। 'আর সিংজী, আপনি তো লাল হয়ে গেলেন যুদ্ধের বাজারে।'

'কী যে বলেন আপনারা।'...উদ্‌বেগে বাবুসাহেব মাড়ি দিয়ে জিবটা একবার চিবিয়ে নেন। এ কী জুলুম! এই তো কালই নিয়ে গিয়েছে তিনশ টাকা। আবার সরকারী হাকিমও এসে নিয়ে গেল চারশ টাকা, কিসের যেন চাঁদা বলে, গত রবিবারে। দুদিক থেকে জুলুম 'পাবলিসের' উপর!...

'দেখুন প্যাটেলজী, আমি কি আর আপনাদের 'বাইরে' নাকি? কালই তো বিশুনি এসে নিয়ে গিয়েছে ক্রান্তিদলের জন্য তিনশ টাকা। আপনারা বলেন তো রোজই দিতে হবে, কিন্তু...'

'কোন বিশুনি? বিশুনি কেওট? কে বলল ও ক্রান্তিদলের লোক?'

'সকলেই তো তাই জানে। উর্দি আছে, বন্দুক আছে, জুতো আছে। কাল এখান থেকে গিয়েছিল রামনেওয়াজ মুন্সির ওখানে। এখনও হয়তো সেটা ওখানে আছে।'

'তাই নাকি?' দশজোড়া চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। এখনো হয়তো ধরা যেতে পারে শয়তানটাকে। জল্দি! দস্তা! এক কাতার।[১]

ধুলোর ঝড় বইয়ে আপদ বিদায় হল বাবুসাহেবেদের বাড়ি থেকে। এখন কেবল সরকারের কানে না গেলে হল যে, ক্রান্তিদলকে তার বাড়িতে খেতে দিয়েছেন আজকে। শান্তি আর নেই 'পাবলিসের'।

দৈবক্রমে বিশুনিকে রামনেওয়াজ মুন্সির বৈঠকখানাতে পাওয়া যায়। রামনেওয়াজ মুন্সির কাছ থেকেও সে তখনই দু'শ টাকা নিয়েছে।

আজাদ প্রথমেই গিয়ে তার বন্দুকটা কেড়ে নেয়। একটাও কার্তুজ পাওয়া যায় না তার কাছে! সে বলে ফুরিয়ে গিয়েছে।

নিজের বোকামিতে রামনেওয়াজ মুন্সি হাত কামড়ায়। বিনা কার্তুজের বন্দুকের ভয়েই দু'শ টাকা বার করে দিয়েছে সে।

'দস্তা। এক কাতার!'

টানতে টানতে বিশুনি কেওটকে নিয়ে যাওয়া হয় গাঁয়ের বাইরে, পামারসাহেবের নীলকুঠির দীঘির ধারে। একটা বাদামগাছে বাঁধা হয় তাকে। বিশুনি চিৎকার করে কাঁদে। আর কখনও সে এমন কসুর করবে না, মহাৎমাজীর নামে ছেড়ে দাও, অনেক জমানো টাকা আছে তার, সে দেবে ক্রান্তিদলকে, দুটো নাবালক ছেলে অনাথ হবে, তোমরাও ছেলেপিলের বাবা...

ক্রান্তিদলের লোকেরা এ-সব অনেক শুনেছে। রামায়ণজী আর থাকতে পারে না। সে প্যাটেলের হাত চেপে ধরে।

'না না, এটাকে প্রাণে মেরো না। আমার কথা রাখো।'

গান্ধী বিরক্ত হয়। 'এই জন্যই তো এসব কাজে রামায়ণজীকে আনতে বারণ করি।'

---

১ দলের সকলকে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে তৈরী হবার জন্য হুকুম।

'এর কি ঠিক ছিল নাকি ? আগে থেকে জানব কী করে ?'

সকলেই ভাব দেখায় যে তারা রামায়ণজীর দুর্বলতায় বিরক্ত। অথচ রামায়ণজীর কথায় তাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। তারা নিজেদের ঢাকতে চায় কঠোরতার আবরণে ; নইলে দলের মধ্যে 'কায়ের' ( কাপুরুষ ) বলে দুর্নাম হয়ে যাবে। এর চেয়ে বড় দুর্নাম দলের মধ্যে নেই, এক কেবল 'খুফিয়া' ( গুপ্তচর ) কথাটা ছাড়া। এরা সবাই সব সময় 'ক্রান্তিকারী' বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চায় ; যে যত নিষ্ঠুর সে তত ক্রান্তিকারী, যে যত বেপরোয়া সে তত ক্রান্তিকারী, যে যত মুখখিস্তি করতে পারে সে তত ক্রান্তিকারী খাওয়ার সময় যে যত উদ্দণ্ডতা দেখাতে পারে সে তত ক্রান্তিকারী ; আরও অনেক অনেক কাজ, হাবভাব থেকে দলের সাধারণ অশিক্ষিত সদস্যরা অন্য লোকের ক্রান্তির কাছে যোগ্যতার সম্বন্ধে বিচার করে।

দশজোড়া বিদ্রূপভরা চোখ পড়েছে রামায়ণজীর দিকে। এখনও লজ্জায় মিশে গেল না রামায়ণজী। 'না না, প্যাটেল, একে অন্য কোনো সাজা দাও।' তখন বাধ্য হয়ে বিশুনির উপর লঘুদণ্ডের আদেশ দেয় প্যাটেল।

ক্ষিপ্রহস্তে আজাদ হাফপ্যান্টের পকেট থেকে আম আর নখ কাটবার ছুরিটা বার করে। মানুষের নাকের মাংস যে এত শক্ত তা ক্রান্তিদলে আসবার আগে কারও জানা ছিল না। আজাদ এ কাজে বিশেষজ্ঞ। পরিত্রাহি চিৎকার করছে বিশুনি কেওট। বলুক তাকে সকলে ভীরু। এ আর দেখা যায় না, রামায়ণজী চোখ বুঁজে ফেলে।

আবার ঘোড়ার পিঠে চড়বার সময় রামনেওয়াজ মুন্সী ছুটতে ছুটতে এসে বলে যায় যে, বিশুনির কাছ থেকে পাওয়া দু'শ টাকা যেন তাঁর চাঁদা বলে লিখে নেওয়া হয়···না, না, একেবারে রজিস্টারের সত্যিকারের লেখা নয়—তাঁরাও ছা-পোষা মানুষ ···এই মনে করে রাখবেন আর কি, আমার নামে টাকাটা, প্যাটেলজী···

বেলা পড়ে আসছে। রামায়ণজীর কর্মব্যস্ত জীবনের একদিনের প্রোগ্রাম শেষ হয়। এখনও হয়তো আর একটা নতুন কিছু মনে পড়ে যেতে পারে গান্ধীর না হয় প্যাটেলের।···

শ্রান্ত দেহ আর মন নিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে পর্যন্ত ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে হয় পথের পাশেই শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঢোঁড়াইজী জানে রাতের আঁধারে, চৌকিদারের দেওয়া 'দিহাত' এর১ পুলিন্দাগুলো মাথায় দিয়ে সার সার যখন সকলে শুয়ে ঘুমোবার ভান করে, তখন সবাই মনের কাছে হিসাব খতিয়ে দেখে। আর সকলে অস্বীকার করুক, রামায়ণজী করবে না। সাঁইবাবলার বনে বোকাবাওয়ার দীর্ঘনিঃশ্বাস বয়ে যায়, তারাগুলোর নিষ্পলক চাউনিতে মনে পড়ে একজনের কথা, আকাশের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া হিমে ভিজে ওঠে ধোঁয়ার দাগে ভরা বন্দুকের নলটা পর্যন্ত, তখন কি ঘুম আসতে পারে রামায়ণজীর।···আবার কাল ভোর হতে না হতেই হয়তো কত জমা.করা কাজের কথা মনে পড়ে যাবে এদের। এই নিত্য নতুন 'পোরোগারেমের' মধ্যে এত একঘেমিও কি থাকতে পারে।

অন্ধকার গাঁখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সর্দার বলে ঐ শোন শোন কী বলছে। পাশের খড়ের ঘরখানার ভিতর মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

খোকন !

এতগুলো ভাত খাবে ?

---

১ বিহার গভর্ণমেন্টের প্রচারপত্র।

'কেরান্টিতে যাবে ?
ওরে হাতি দাম দে
'কেরাণ্টি'তে নাম দে।
ঘোড়ার লাগাম দে
'কেরান্টি'তে কাম দে।[১]

গান্ধী বলে, দেশে আর ছাগল চরাবার লোক জুটবে না রে এর পর।

তার রসিকতায় কেউ হাসে না। একজন অপরিচিতা মায়ের ক্রান্তিদলের উদ্দেশে দেওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি রামায়ণজীর মনের অবসাদ মুছে দেয়। তাদের অসাক্ষাতে বলা বলেই কথাটার দাম এত। তাহলে হয়তো তারা মহাৎমাজীর কাজ কিছু কিছু করছে! লোকে তাহলে তাদের অনেক উঁচুতে মনে করে—ক্রান্তিদলের জাতকে। কনৌজী ব্রাহ্মণ হলে নিশ্চয় এই রকমই মনে হয়। একবার জিজ্ঞাসা করে দেখলে হয় সর্দারিকে।

## হতাশা-কাণ্ড

### সাগিয়ার পুনরাবির্ভাব

সরকার মানে ফৌজ। সেই ফৌজের বুকের পাটা বেড়েছে। আগে ফৌজদের ক্যাম্পগুলো থাকত গাঁয়ের বাইরে, অনেক দূর পর্যন্ত কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। এখন তারা থাকে গাঁয়ের ইস্কুলের ঘরগুলোতে। বেলুজী ফৌজের দল যখন-তখন ঘোড়ায় চড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়ায়। গিধর মণ্ডল রাতে কানী মুসহরনীকে ফৌজী 'অফসরের' তাঁবুতে পাঠায়। আর দিনে তাকে নিয়ে খাঁ-সাহের ইনসান আলির বাড়িতে বসে পাইকারী জরিমানার লিস্ট তয়ের করে। চৌকিদার 'দিহাত'-এর পুলিন্দাগুলো আর ক্রান্তিদলকে দেয় না, বিক্রি করে দেয় বাবুসাহেবের বাড়ির 'কন্ট্রোল'-এর দোকানে ঠোঙা তয়ের করবার জন্য। লাডলীবাবু আর ইনসান আলি মিলে চাল কাপড়ের আড়ত খোলে নেপালে; এখান থেকে নিয়ে যায় রাতে। বাবু-সাহেবের দস্তখতে লোকে কাপড় পায়। একদিন ক্ষেতে কাজ করিয়ে নিয়ে তারপর দস্তখত দেন তিনি।

আগে রামায়ণজী শুনত কোশীজী থেকে আরম্ভ করে শিলিগুড়ি পর্যন্ত 'পাক্কী'। এখন এতদূর পাক্কী সে দেখেছে কিন্তু এর আদি অন্ত পায়নি। শুনেছে পুবে পাক্কী চলে গিয়েছে চীনের দেশে কামাক্ষ্যামাই হয়ে। পচ্ছিমেও কোথায় যেন গিয়েছে নাম মনে আসছে না। এই রকমই হয়! রামায়ণ পড়তে শিখলেও 'দিহাত'-এর[২] পাতা পড়া যায় না। শেষ নেই কিছুর।

দলের যত লোক ধরা পড়ে, তত নতুন লোক ভর্তি হয় না। আসে মধ্যে মধ্যে দু একটা ইস্কুলিয়া এখনও, রহস্য আর রোমাঞ্চের টানে।

দল ছোট হয়ে এলে কী হবে, দলের মধ্যের গোলমালটা দিন দিনই বাড়ছে। এটা বেশিদূর গড়িয়েছে কিছুদিন থেকে। গান্ধী গিয়েছিল জিরানিয়ায় ভাল লোহার ব্যবস্থা করতে। সেখানকার ফৌজী হাওয়াগাড়ি মেরামতের কারখানার সর্বণ মিস্ত্রীর

---

১ আগে ঘুমপাড়ানি ছড়া ছিল: এতগুলো ভাত খাবে—ছাগল চড়াতে যাবে? —ইত্যাদি!

২ বিহার গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধকালীন প্রচারপত্রের নাম ছিল 'দিহাত'।

সঙ্গে পরিচয় আছে দলের। জামালপুরের লোহাটা বড় খারাপ দিচ্ছিল। সে লোহার তৈরি পিস্তলের নিশানা বড় তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ইদানীং। জিরানিয়া থেকে গান্ধী এর জন্যে টাকা চেয়ে পাঠায়। প্যাটেল গঞ্জের বাজারের নৌরঙ্গীলাল গোলাদারের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে গান্ধীকে টাকা পাঠায়। চাঁদাটা অবশ্য তোলা হয়েছিল সাবেক ক্রান্তিদলের ধরনে, একটু জিরিয়ে নেবার অছিলায় রিভলভার সুদ্ধ কোমরের বেল্টটা খুলে সমুখের খাটিয়ায় রেখে। পুরনো থিতোনো মনোমালিন্য হঠাৎ নাড়া পেয়ে উপরে উঠে আসে। প্যাটেল বলে, 'বিলাকে'১ আমার বাবাও যদি লাখ টাকা রোজগার করত তাহলে আমি তাকেও ছাড়তাম না।' এই ঝগড়াটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে দলের মধ্যে। একজনের সমর্থকদের হাতে বেশি বন্দুক গেলে অন্যের সমর্থকরা ভরসা পায় না। রাতের পাহারায় দুদলের দুজনের এক এক সঙ্গে ডিউটি পড়ে।

দল থেকে ঠিক হয়েছে যে, যেসব লোক বিয়াল্লিশ সালে জেলে গিয়েছিল এখন ফিরে আসছে, তাদের দলে টানবার চেষ্টা করতে হবে। না হলে আনাড়ী রংরুটদের দিয়ে বেশি কিছু কাজ হবে না। জেলফেরতদের দলে আনতে পারলে লোকের চোখে দলের সম্মানটা বাড়ে আর টাকাপয়সাসংক্রান্ত দুর্নামটা একটু কমে! দলে যদি সে নাও আসতে চায়, বাইরে থেকেও তো সাহায্য করতে পারে। সরকার একবার যখন ছেড়েছে তখন আর চট করে ধরবে না তাদের। তাই কে কবে ছাড়া পাচ্ছে সব খবর দলের লোকের নখাগ্রে।

বিসকান্ধার বিল্টা আর বড়কামাঝি ছাড়া পেয়েছে দিনকয়েক আগে। তাই প্যাটেল রামায়ণজীর উপর ডিউটি দেয় তাদের সঙ্গে দেখা করবার।

যাওয়ার সময় হঠাৎ প্যাটেল বলে,

'না রামায়ণজী, আমি ভেবে দেখলাম যে, বড়কমাঝির সঙ্গে দেখা করে আর দরকার নেই। ওর বুদ্ধিটা বড় মোটা। চুপচাপ কোনো কাজ ওকে দিয়ে করান যাবে না। কেবল বিল্টার সঙ্গেই কথাবার্তা বলবেন। আর কিছু না করুক দলের লোকগুলোর মোকদ্দমার তদ্‌বিরটাও যদি করতে পারে ঠিক করে কাছারীতে তাহলেও অনেক কাজ হয়। তিনগুণ করে টাকা নেবে বিজন উকিল বলেছে; তারিখের আগে তাকে মনে পড়িয়ে দেওয়ার জন্যও তো একজন লোকের দরকার। আপনার দোস্ত সে, আপনি বললে শুনবে।'

'বিজন উকিলের দেবার টাকাটা আসবে কোথা থেকে ?'

রামায়ণজী বিশেষ কিছু ভেবে বলেনি কথাটা। সকলে এর মানে নেয় উলটো। দলের টাকা যোগাড় করবার ধরণের উপর ইঙ্গিত বলে ধরে নেয় সকলে এটাকে। আরও একটা প্রচ্ছন্ন মনের ভাব আছে রামায়ণজীর কথার পেছনে, নিজেকে দলের অন্য সকলের চাইতে ভাল ভাবা। এটা ক্রান্তিদলের লোকেরা বরদাস্ত করতে পারে না। এতগুলো উদগ্র স্নায়ুর বারুদে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

গান্ধী কম্বল চাপড়ে বলে, 'যেমন করে হোক জোটাতেই হবে এর টাকা আর সর্বণ মিস্ত্রির টাকা।' কে একজন বলে, 'রামায়ণগিরি ফলাতে আসো, আর নিজের ইমান-দারির দিকে তাকিয়েও দেখ না ?'

'মুখ সামলে কথা বলবি বলছি।' তার ইমানদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এরা!

---

১ ব্ল্যাকমার্কেটে।

এরা তাৎমাটুলির 'পঞ্চ' না, যে ঢোঁড়াইয়ের চোখ রাঙানো দেখে ভয় খেয়ে যাবে।

'সার্চ' করা হোক রামায়ণজীর বটুয়া'। কেঁপে ওঠে রামায়ণজীর বুক। এতক্ষণে সে বোঝে এরা কী বলতে চায়। তার ঘুমোনোর সময় এরা বোধ হয় বটুয়াটা খুলে দেখে থাকবে।

'না, না, বিশ্বাস করো গান্ধী; সর্দার তুমি অবিশ্বাস কোরো না। এ রাহাজানির জিনিস নয়। ভুল ভেবো না। এই রামায়ণ হাতে করে বলছি। আমার ইমানদারিটুকুতেও যদি সন্দেহ কর তাহলে আমার আর থাকল কী?'

নানা রকম জেরা করে সকলে। তার বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষও জমানো ছিল এ লোকগুলোর। এটা তার মরা ছেলের গলার মালা, এ কথা কেউ বিশ্বাস করল কিনা কে জানে। বলেনি কেন সে এ কথা আগে নিজে থেকে। তার কথাটা বিশ্বাস করলেও হয়তো সবাই তাকে স্বার্থপর ভাবছে; দলের এত দরকারের সময়ও নিজে জিনিসটা দলকে দেয় নি বলে। প্যাটেল আর গান্ধী দুজনেই তাকে নিজের দলে টানতে চায়। যে কোনো একটা দলে গেলে তার সমর্থন পাওয়া যেত এখন। শেষ পর্যন্ত সকলকে ঠাণ্ডা করে গান্ধী। প্যাটেল রামায়ণজীর পিঠ চাপড়ে কথাটা ভুলে যেতে বলে। দলের অন্য সকলে হাসি তামাশা আরম্ভ করে অন্য একটা বিষয় নিয়ে। এসব ভাব-আড়ির খেলা তাদের অষ্টপ্রহর। একটা জিনিস নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানো আজকাল আর তাদের ধাতস্থ হয় না। মুহূর্তে মুহূর্তে এদের মন বদলায়। আমাদের শোনাতে এসেছিলে কথা, তোমাকেও শুনিয়ে দিয়েছি, দলের আর দশ জনের চাইতে তুমি এক চুলও ভাল না—এই হচ্ছে সকলের মনের ভাব।

আগুন ঝলসানো ছোলার গাছগুলো নিয়ে ততক্ষণে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে দলের মধ্যে। একজন রামায়ণজীকেও কতকগুলো দিয়ে গেল।

মনের উপর একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে রামায়ণজী বিসকান্ধার পথে বেরোয়। যাত্রাটা প্রথমেই খারাপ হয়ে গিয়েছে আজ; বরাতে কী আছে কে জানে। বটুয়াটা বাইরে থেকে টিপে টিপে দেখে। এইটাকে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল হল আজকে। অথচ যার দেওয়া, সে একটা খবরও রাখে না; সে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল তার মাকে দেখতে। রাখতে পেরেছে কি তার কথা?

রামায়ণজী যখন বিসকান্ধায় পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ভজন শেষ হওয়ার পর বিল্টা বাড়ি ফিরলে, তখন গিয়ে চুপচাপ দেখা করবে তার সঙ্গে। ততক্ষণ এই শীতের মধ্যে কোথায় বাইরে বসে রাত কাটাবে, তার চাইতে টোলার বাইরে মোসম্মতের বাড়িতে যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া সাগিয়ার যাওয়ার সময়ের কথাটাও রাখা হবে। আজকের আসবার আগের ঘটনাটার জন্যই বোধহয় সাগিয়ার কথাটা বার বার মনে পড়ছে।

এদিকটায় কোনো ভয় নেই। ফৌজের ক্যাম্প কুশীর ধারে, গুটিপোকার ঘরের পাশে। মাঘ মাসে জলা জমিটার জল শুকিয়েছে। মানুষসমান একরকম ঘাসের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথ। দূরে বাবুসাহেবের বাড়ির দিকে, আর কোয়েরীটোলায় গিধর মণ্ডলের বাড়ির দিকে, শীতের ধোঁয়ার মধ্য দিয়েও অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। বাকি গাঁখানা অন্ধকার।

মোসম্মতের বাড়ির মধ্যে যেন কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ও বুড়ির চিরকাল আপন মনে বকা অভ্যাস। যাক, বুড়ি তাহলে ভালই আছে। উঠোনের ঝাঁপ বন্ধ ভেতর থেকে, এই সাঁঝ রাতেই। গাঁয়ে মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে বলে বোধ হয়।

রামায়ণজী দরজায় জুতো খুলে রাখে। এই জুতো পরা আর চা খাওয়ার কথাটা লোকে ব্যবহার করে ক্রান্তিদলের বিরুদ্ধে, ডাকাতি অভিযোগের প্রমাণ। গাঁয়ের সাধারণ লোক জানে যে সৎপথে থাকলে তাদের শ্রেণীর কারও পক্ষে এই বিলাসিতা ও ব্যসনের খরচ জোটানো সম্ভব নয়। তাই জুতো পরে সাগিয়ার মায়ের সম্মুখে যেতে লজ্জা করে।

'মোসম্মত! ও মোসম্মত! বাড়ি আছ নাকি মোসম্মত?'

'কে?'

কথার স্বরটা কী রকম যেন একটা লাগে। মনটা এখনও সুস্থির হয়নি, সেই জন্য বোধ হয় এমন মনে হচ্ছে।

'মেহমান'১।

বোধ হয় ভরসা পাচ্ছে না বুড়ি। পাশের গোয়ালঘরে একটা গোরু ডাকছে। অনেক দিন মোসম্মতের গোয়ালঘরে কাটাতে হয়েছে তাকে। গোরুটা কি তার গলার স্বর চিনতে পারল নাকি? সে গোরুটা কি আর এত দিন বেঁচে আছে?

বেড়ার ফাঁকের ভেতর দিয়ে একটা মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে। গোবর লাগানো প্যাটকাটির আলোটা কাছে আসছে।

'কে?'

'ঢোঁড়াই!'

'ঢোঁড়াই!'

'সাগিয়া!'

অজস্র প্রশ্ন ভিড় করে আসে ঢোঁড়াইয়ের মনে। ঝাঁপখানাকে ধরে দাঁড়াতে হয়।

'ও মা, দেখে যাও কে এসেছে। সকালে দেখি এই বেড়ার উপর একটা কাক আর একটা কাকের মুখে খাবার গুঁজে দিচ্ছে। তখনই আমি মাকে বলেছি ঘরে অতিথি আসবে। আমরা মায়ে বেটিতে ভেবে মরছিলাম যে না আছে ভাতারপুত না আছে সাতগুষ্টিতে আপনার বলতে একটা কেউ! ভয়ে মরি! অতিথি বলতে চোরডাকাত, না-হয় ফৌজী ক্যাম্পের সেপাই।'

এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের কথা বেরোয়। 'কবে এলে?' অনেক দূর থেকে যেন এল স্বরটা।

'এই তো কিছুদিন আগে। এসেই সব শুনেছি তোমাদের কথা মা'র কাছ থেকে! দেখি একবার 'মেহমানের' চেহারাখানা ভাল করে।'

সাগিয়া পাটকাঠিটা তুলে ধরে ঢোঁড়াইয়ের দিকে। ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে, সাগিয়া বোধ হয় আগের চেয়ে একটু প্রগল্‌ভা হয়েছে।

'একি ছাই চেহারা হয়েছে ঘুরে ঘুরে! কিছু খাও-দাও, না উপোস করেই থাক? আবার ফৌজের উর্দি চড়েছে গায়ে! ও উর্দি আজকাল পচে গিয়েছে!'

না, সাগিয়া বদলায়নি। দরদভরা বকুনিগুলো শুনেই ঢোঁড়াই বুঝতে পারে। একটু কালো হয়েছে আগের চেয়ে, আর কথাবার্তায় আত্মপ্রত্যয় অনেক বেড়েছে। বোধ হয় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছেছে বলে, কিম্বা হয়তো পৃথিবীর সঙ্গে এই কয়বছরের যাযাবরী পরিচয়ের ফলে। ঢোঁড়াই লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে যে সাগিয়ার চোখদুটো তার চোখের মধ্যে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে কি না, সেই আগেকার মতো। না। প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় পেয়ে গিয়েছে সে। হয়তো তার আর জবাবের দরকার নেই। কিন্তু

---

১ অতিথি।

সেই সাগিয়া ঠিক তেমনই আছে। নইলে তার বকুনিটাকে কি কখনও আদর বলে মনে হয় ?

বুড়ি এসে ঢোঁড়াইকে জড়িয়ে ধরে। 'আর তো আমাদের ভুলেই গিয়েছিস তুই, বড়লোক হয়ে। তবু যে মনে পড়েছে আজ, সে আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।'

মোসম্মতের কথায় প্রতিবাদ করে না ঢোঁড়াই। বুড়ো মানুষ! ভাল মনে বলছে। ভাগ্যে সে জুতোজোড়া বাইরে রেখে এসেছে।

কী করবে সাগিয়া ভেবে পায় না। খাটিয়াখানার উপর কম্বল বিছিয়ে দেয়, ঘটিতে জল এনে দেয় পা ধোয়ার জন্যে, নারকেলতেলের শিশিটা পেড়ে নিয়ে গরম করতে বসে পাটকাঠি জেবলে।[১]

'ওমা, দ্যাখ আমার আক্কেল! মা'র সঙ্গে গল্প করো ততক্ষণ। তেলের শিশিটা ঢোঁড়াইয়ের হাতে দিয়েই সাগিয়া ছোটে গোয়ালঘরের দিকে।

'মিছে দৌড়ুচ্ছিস সাগিয়া। বাছুর খুলে দেওয়া হয়েছে কখন। এখন কি আর পাবি এক আঁজলাও ?'

মোসম্মতের কাছ থেকেই ঢোঁড়াই সব জানতে পারে। যেমন হঠাৎ চলে গিয়েছিল, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই ফিরে এসেছে। মাঝের জীবনের খুঁটিনাটিগুলো ঢোঁড়াই শুনতে চায় না। সাগিয়া ফিরে এসেছে সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা। কী রকম যেন সাগিয়ার মা'টা! সব খবর সে ঢোঁড়াইকে শোনাবে। বিদেশিয়ার দলেই সেই গুঁফো হারামজাদাটা, কী একটা ফৌজে কাজ পেয়েছে। জায়গায় জায়গায় গিয়ে নাকি ফৌজদের গানবাজনা শুনিয়ে বেড়াতে হবে। যেমন সরকার তার তেমনি ফৌজ! সাগিয়াকে ছেড়েই দিয়েছে না-কি ? সে তারপরেই চলে এসেছে। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি তাকে। সে নিজে থেকেই যা কিছু বলেছে। যেদিন আসে সেদিন শুধু বলেছিল যে, বয়স দুকুড়ি পেরোনোর পর লোকে কিছু বললে গায়ে লাগে না।

তারপর ফিসফিস করে ঢোঁড়াইয়ের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, 'টোলার লোকও নরম হয়েছে আমাদের উপর এখন। হবে না ? সেই তুই যখন পালালি না, সেই সময় টমিরা কার বাড়িতে কী করেছিল সে তো সবার চোখে দেখা। বাড়িশুদ্ধ লোকে জানত যে টমিরা ভুট্টা-ক্ষেতে ঢোকে না। তাই গাঁয়ের মেয়েদের রাখা হয়েছিল ভুট্টা-ক্ষেতে। ঢোকে আবার না! যেতে দে সে সব কথা। আর গিধর কোয়েরী পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটাতে যায় ?...

কী বকতেই পারে বুড়িটা! এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সাগিয়া কী যেন উনুনে চড়িয়েছে। মুখের একদিকে আগুনের আলোটা পড়েছে। সে চলে যাওয়ার দিনও হাটে তার এই রূপই দেখেছিল। মাথার কাপড়টার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কাঠিণ্যের মুখোশটা খসে পড়েছে। এই কাজেই তাকে মানায় ভাল। কতদিন আগের দেখা কোথাকার একটা লোকের একটু তৃপ্তির জন্যে, নিজের সমস্ত একাগ্রতা নিঃশেষ করে দিয়েছে সাগিয়া। অন্য লোকের তৃপ্তির জন্যে নয়; নিজের তৃপ্তির জন্যে। এর বদলে সে কিছু চায় না নতুন করে।

তার জন্য রাঁধা...দুধ দোয়ানো...ন্যাতা দিয়ে নিকিয়ে তার উপর পিঁড়ি পাতা,... খাওয়ার সময় একটার পর একটা করে পাটকাঠি জ্বালানো,...তার একার জন্য...আর

১ এ দেশে মাথায় তেল মাখার সঙ্গে স্নানের কোনো সম্বন্ধ নেই।

কারও জন্যে নয়···ভাবতেও বেশ লাগে ঢোঁড়াইয়ের।

কীর্তনের মাতন কানে আসছে দূর থেকে। এইবার বোধ হয় শেষ হবে। আঙিনার বেড়ার উপর দিয়ে দেখা যায় ঘন কুয়াশার মধ্যে জোনাকিপোকা জ্বলছে মিটমিট করে···

মোসম্মত বলে, 'হাতে জল ঢেলে দে সাগিয়া।'১

সাগিয়া হেসে ওঠে, 'ঢোঁড়াই আবার 'মেহমান'—তার আবার হাতে জল ঢেলে দিতে হবে!'

বলে, কিন্তু জল ঢেলে দেয় ঠিকই।

'এই যে গো সিরি পঞ্চমীর মেহমান২, তোমার শোবার খাটিয়া।'

'আজ সিরি পঞ্চমী নাকি? আর কি আমাদের দিনক্ষণের হিসেব আছে!'

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা করে দুটো ক্রান্তিদলের কথা বলে সাগিয়ার কাছে একটু বাহাদুরি দেখাতে, আরও একটু আদর কাড়তে। সে সুবিধে সাগিয়া দেয় না। একটা ভাঙা কড়াতে করে উনুন থেকে আগুন নিয়ে আসে। নাও, হাত-পা গরম করে নাও। সিরি পঞ্চমীর ফাগ একটু কপালে দিয়ে দেয়। সদ্যমাখা নারকেলতেলের উপর দাগটা নেপটে বসে। কম্বলের নিচে এই কাঁথাখানা দিয়ে নাও আরাম হবে।

খেরোর বালিশটার বহুদিনের সঞ্চিত নারকেল তেলের পচা গন্ধটা, খারাপ লাগে না। মনের মধ্যে এই গন্ধের পরিচয় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে; ধূপকাঠি নিভাবার অনেকক্ষণ পরের ফিকে সুবাসের মতো; নিরাপত্তা আর স্নিগ্ধ আরামের আবেশ মেশানো। ঢোলক খঞ্জনীর শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। শোনা গেলে বেশ হত। বিল্টা তাহলে এবার বোধ হয় বাড়ি ফিরেছে। শীতের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার পর একবার কম্বলের মধ্যে ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছা করে না।

উঠোনের দুয়ারের বাইরে একটা আলো দেখা যায়। ঢোঁড়াই উঠে কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। ক্রান্তিদলের লোকের জীবনে এসব বহুবার ঘটে গিয়েছে। কারা যেন কথা বলছে বাইরে! অন্ধকারের ভেতর সাগিয়া সাগিয়ার মার কারও মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছে না।

সাগিয়া কোনো কথা না বলে ঢোঁড়াইয়ের হাতটা ধরে তাকে টেনে এনে বিছানায় শোয়ায়! তারপর কম্বল আর কাঁথাটা দিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়। ছি! ছি! কী ভুলই করে ফেলেছে সাগিয়া। ভেতরের থেকে দরজার ঝাঁপটা বেঁধে দিলেই খানিকটা সময় পাওয়া যেত! কে আবার এল এই রাতে! সাগিয়ার দেখাদেখি মোসম্মতও উঠোনে নামে। হাতে লণ্ঠন। কেরোসিন তেল জ্বালানো বাড়ির লোক দেখছি। কে, কারা?

'কোথায় গো মোসম্মত।'

'কে? গিধরের বৌ। আয় আয়। এত রাত্তিরে? টোলার বার তো মনের বার।'

'মনের বার হলে কি আর এসেছি। আজ টোলার সিরি পঞ্চমীর ভজন আমাদের দুয়োরেই হল কিনা। তাই ভাবলাম বচ্ছরকার দিনের প্রসাদ আর ফাগ দিয়ে আসি

১ অতিথি নিজে হাতে জল ঢেলে নিলে গৃহস্থের পক্ষে তা অসম্মানসূচক।

২ শ্রীপঞ্চমীর দিন থেকে ফাগের খেলা আরম্ভ হয়।

৩ নারকেল তেল কেবল শৌখিন মেয়েরা মাখে।

দীদিকে। তোমার ছেলে বলল, তা দিয়ে এস না কেন। দূরেও তো কম নয়। তার উপর যা দিনকাল। একা পথে চলতে দিনেই সাহস হয় না তার আবার রাতে; ঐ মুখপোড়া-গুন্ডোর জ্বালায়। অতি কষ্টে গনৌরীর ছেলেটাকে সঙ্গে করে এসেছি।'

আজকাল পাইকারী জরিমানার ফৌজী হাকিম গিধর মণ্ডলের হাতের মধ্যে। তাই কেউই আর এখন গিধরকে চটাতে রাজী নয়। সেও এই হিড়িকে জাতের মণ্ডলের হৃত সম্ভ্রম ফিরিয়ে পাবার চেষ্টা করছে। তাই তার বাড়িতে সে সিরি পঞ্চমীর ভজনের আয়োজন করেছিল। আর সাগিয়ার কাছে গিধরের বৌ কৃতজ্ঞ। সেইজন্যেই বোধহয় আজ এই প্রসাদ আর ফাগ নিয়ে এসেছে।

গিধরের বৌ আর গনৌরীর ছেলেটা অন্ধকার শোবার ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। ঢোঁড়াইকে দেখতে পাচ্ছে না তো? এদের উঠে বসতে বলবে নাকি বারান্দায়? আগুনের কড়াখান আনবে নাকি?

সাগিয়া বলে, 'মা, প্রসাদ আর ফাগ নাও। শীতের মধ্যে ওরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে এমন করে?'

'না না, আমি আর বসব না। বাড়ির ছিষ্টি কাজ ফেলে এসেছি।'

গিধরের বৌকে আগিয়ে দেবার জন্য সাগিয়া আর মোসম্মত উঠোন থেকে বার হয়। দরজার বাইরে গিয়েই গিধরের বৌ বলে, 'জুতো দেখছি।'

হাতের ফুলুরিটা অতর্কিতে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে—যেমন ব্যাপারটা ঠিক ভাল করে বোঝাই যায় না, তেমনি অবস্থা হয় মোসম্মত আর সাগিয়ার। কী আক্কেল ঢোঁড়াইয়ের। এই কথাই তাহলে ওরা বাড়িতে ঢোকবার আগে বলাবলি করছিল। সাগিয়া বলে, 'ও-ও-ও-মা! নিশ্চয়ই ফেলে গিয়েছে সেই বৈদটা[১]। সাদা বলদটা খাচ্ছেও না দাচ্ছেও না, দিন দিন হাড়পাঁজরা বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা বৈদ যাচ্ছিল হেঁকে। তাকেই মা ডাকল। সে বলে যে এ কিছু না। গায়ে পোকা হয়েছে তাই। একটু হলুদ খাওয়াও। কেরোসিন তেলে ছাই ভিজিয়ে তাই দিয়ে গা ডলে দাও, একদিনে সেরে যাবে। পোড়া কপালে রামজী ছাই দিয়েছেন, ছাই না-হয় জুটল; কিন্তু আজকালকার দিনে কেরোসিন তেল জোটাই কী করে;...'

বিদেশিয়ার দলের সঙ্গে এতকাল সাগিয়া বৃথায় কাটায়নি।

গিধরের বৌ এ কথায় ভুলল কিনা বোঝা যায় না। গনৌরীর ছেলেটা বলে, 'ফৌজী জুতো'!

'কোনো ফৌজের লোকের কাছ থেকে কিনে থাকবে বৈদটা।'

গিধরের বৌয়ের কানে কথার সুরটা একটা অযাচিত কৈফিয়তের মতো ঠেকে।

তারা দূরে চলে গেলে সাগিয়া মাকে বলে যে, এসব কথা আর ঢোঁড়াইয়ের কাছে তুলে দরকার নেই। একদিন একটু আরামে ঘুমোক।

আজকের মতো দিনে, তাদের বাড়িতে সে ঢোঁড়াইয়ের দুর্বহ জীবনকে অযথা ভারাক্রান্ত করতে চায় না।

মোসম্মত গম্ভীর হয়ে তামাক খেতে বসে। তার মনের মধ্যে কুয়াশা জমে আসে। তার মেয়ে বুঝি 'মেহমান'কে বাঁচাতে গিয়ে, আবার নতুন করে একটা কলঙ্কের টিকা নিল কপালে। এ ব্যাপার এখন থামলে হয়।

প্রসাদ খাওয়ার পর, ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে, এইবার যাওয়া উচিত বিল্টার সঙ্গে

---

১ গোবদ্যি।

দেখা করতে। নইলে বিল্টা ঘুমিয়ে পড়বার পর গেলে অসুবিধে। তাছাড়া ক্রান্তি-দলের নির্দেশ যে, যার বাড়িতে খাবে তার ওখানে শুয়ো না। অনেক অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই নির্দেশ। এ কথা না মেনে কে কোথায় কবে ধরা পড়েছে সব ঢোঁড়াইয়ের জানা। তাই আর এই ঢালা আদেশকে অহেতুক মনে হয় না ঢোঁড়াইয়ের। সে একরকম জোর করেই বিছানা থেকে উঠে পড়ে। অবাক হয়ে যায় সাগিয়া।

'আমায় যেতে হবে এখনি. কাজ আছে।'

'এই রাত্তিরে!'

'রাত্তিরে না তো কী? সিঁদ কি দিনে কাটে নাকি লোকে?' হেসে ঢোঁড়াই হালকা করে দিতে চায় মনের উপরের বোঝাটাকে। তাকে যেতেই হবে।

'হ্যাঁ, তোমরা হলে কাজের মানুষ'—

ঢোঁড়াই বুঝতে চেষ্টা করে সাগিয়া কী ভেবে কথাটা বলল। ঠাট্টা করল না তো? ঠিক বোঝা যায় না। মোসম্মত দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল। একটু ফাগ ছুঁইয়ে প্রণাম করে তাকে ঢোঁড়াই। বড়ো ভালো লেগেছে তার আজকে মোসম্মতকে।

বুড়িও হুঁকোটা ঢোঁড়াইয়ের মাথায় ঠেকিয়ে বচ্ছরকারদিনে আশীর্বাদ করে, রামজী করুন যেন তাদের সুমতি হয়। কেবল টাকা কামাচ্ছিস এবারে বিয়ে-থা করে সংসারী হ।'

প্রসাদের থালা থেকে চিনিটুকু সাগিয়া একখান নেকড়ায় বেঁধে ঢোঁড়াইয়ের উর্দির পকেটে দিয়ে দেয়।

বুড়ি বলে; 'ঐ গিধর মণ্ডল বলেই চিনিটা যোগাড় করতে পেরেছিল। নইলে আজকাল কি আর পুজোপার্বণ করবার জো আছে।'

বলে সে নিজেই বোঝে যে তার কথাটা সময়োপযোগী হয়নি। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলে, 'এ আসবার দরকার কী ছিল?'

…ঢোঁড়াই কতক্ষণই বা ছিল। মাত্র তিন-চার ঘণ্টা হবে। তবু সে চলে যাওয়ার পর বাড়িটা খালি খালি লাগে। শীতের রাতের ঝিঁঝির ডাকে নিঃসঙ্গতা আরও বেশি বলে মনে হয়। ঢোঁড়াইয়ের কথা মনে করে, আগুনের কড়াইখানা কোলের কাছে টেনে নিতে সংকোচ লাগে। আকাশ-পাতাল ভেবে নিঝঝুম ঠাণ্ডা মনটাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনবার চেষ্টা করতে হয়। মোসম্মতের তবু তো হুঁকোটা আছে।

বাড়ির কাছেই শিয়াল ডেকে ওঠে। রাত দুপুর হয়ে গেল নাকি এরই মধ্যে? তারপর ডাকে একটা কুকুর। কুকুরের স্বরটা একটু ভাঙা ভাঙা গোছের। মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে, তার আবার কুকুর। গাঁয়ের কুকুর এতদূর এসেছে শিয়ালের পেছনে? সত্যিই ঢোঁড়াইটার কী আক্কেল! কুকুর শিয়ালেও তো জুতোটা বাইরে থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারত।…মিয়াও। মিয়াও।…মা মেয়ে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকায়। আর ভুল না হয় কারও। এতক্ষণ প্রায় বুঝেও মনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছিল।

'তখনই আমি বলেছি সাগিয়া।'

'মিয়াও!'

'কে?'

'তোর পিসেমশাই।'

ঝাঁপ ঠেলে টোলার ছেলের দল উঠোনে ঢোকে। গনৌরীর ছেলেটা ফিরে গিয়ে পাড়ায় বন্ধুদের খবর দিয়েছিল। ফৌজের লোক! ফৌজী জুতো! গাঁয়ের বাইরে করে দিলে কী হবে? জাতে তো কোয়েরী। এ কি কানী মুসহরনী পেয়েছে?

এখানে এসে দেখে যে ফৌজ ফেরার। জুতো জোড়া নেই। সকলে গনৌরীর ছেলেটাকে দোষ দেয়। জুতোজোড়া তার নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হাকিমের কাছে দাখিল করবার জন্যে। তারপর সব রাগ গিয়ে পড়ে সাগিয়ার উপর।

তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে; স্বভাব যাবে কোথায়। ফের যে-কে-সেই। ফৌজের লোক না হলে আর শানায় না আজকাল।…

সাগিয়া কোন কথা বলে না। এইসব ছোট ছোট পাড়ার ছেলেরা। তার পেটের ছেলে বেঁচে থাকলে এদের থেকে কত বড় হত আজ। এদের কাছে নিজের চরিত্রের সাফাই দিতেও ঘেন্না করে। আর ঢোঁড়াইয়ের নাম জানাজানি হলে হয়তো এখনই গিধর মণ্ডল ফৌজে খবর দিয়ে দেবে। হয়তো ঢোঁড়াই এখনও কাছাকাছিই আছে।…

'আগে একবার টোলা-ছাড়া করেছিলাম, এবার দেশছাড়া করাব। ভাবিস না যে ঐ ফৌজের বাপও তোদের বাঁচাতে পারবে।'

হাসি-টিটকারি গালির তোড়ে, আর আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মোসম্মত আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না! এই ঢোঁড়াইটাই হয়েছে তার মেয়ের কাল।

'শোন গো বাছারা।'

তারপর মোসম্মত সব কথা বলে ছেলেদের। একটা কথাও লুকোয় না। ফৌজের লোক ঘরে আনবার দুর্নামের চেয়ে ঢোঁড়াইকে ঘরে আশ্রয় দেবার দুর্নাম অনেক ভাল।

রামায়ণজী! চুপ! চুপ! আস্তে।

কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এত হট্টগোল চুপি চুপি সেরে ফেলা যায় না। টোলার লোকেও তখন লাঠি নিয়ে পেঁছে গিয়েছে চেঁচামেচি করতে। গনৌরীর ছেলের কাছ থেকে খবরটা জানবার পর বড়রা এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করছিল।

জমাট কুয়াশা চিরে ফৌজী ক্যাম্পের হুইসল বেজে ওঠে। গুটিপোকার ঘরের দিক থেকে অনেকগুলো টর্চের আলোর ঝাঁটা দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

সিটি মেরেছে রে! পালা পালা। এই এসে পড়ল বলে।

থাকে কেবল, যারা যেতে পারে না। লচুয়া চৌকিদার, মোসম্মত আর সাগিয়া।

…ফৌজ যেন আগে এখানেই আসে রামজী। তাহলে ঢোঁড়াইটা খানিকটা সময় পায় দূরে চলে যাবার।

## রামায়ণজীর ক্ষোভ ও আশা

মাস্টারসাহেবদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। মাস্টারসাহেব বেরিয়েই ছাপা ইস্তাহার বার করেছেন। প্যাটেল পড়ে শোনাল।

'কংগ্রেসের লোক যাঁরা আজও ফেরারী আছেন, মহাত্মজীর আদেশ অনুযায়ী, তাঁরা যেন সরকারের সম্মুখে অবিলম্বে নির্ভীক চিত্তে হাজির হয়ে যান। মহাত্মাজীর এই আদেশের পর কারও আত্মগোপন করে থাকবার অর্থ হয় না। সর্বসাধারণকেও

জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, এই মাসের পর কোনো ফেরারী ব্যক্তিকে, তাঁরা যেন কংগ্রেসের লোক বলে ভুল না করেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী যাঁরা কাজ করেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত সেই সময়ের মোকদ্দমাগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমরা বহন করব।'

দলের মধ্যে হট্টগোল পড়ে যায়। ছাগলের দুধ খেতে খেতে মাস্টারসাহেবের বুদ্ধিতেও বোটকা গন্ধ হয়ে গিয়েছে; যাদের ফাঁসি সাজা হতে পারে, তাদের বলে কিনা সারেণ্ডার করতে? এর পর আর কেউ চাঁদা দেবে ক্রান্তিদলকে? ধরিয়ে দেবে। নিজেরা তো জেলের মধ্যে বসে মজা উড়িয়েছিস এতদিন! যারা প্রাণ হাতে করে কাজ করল এতদিন বাইরে থেকে, তাদের মোকদ্দমা পর্যন্ত তদ্‌বির করবে না।

দলের কে কী মানে করে মাস্টারসাহেবের ইস্তাহারে, তা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু দেখা যায় যে, প্যাটেল হাকিমের কাছে 'সলণ্ডর' করে দিনকয়েক পরে। আজাদ একটা কাজে নেপালে গিয়ে আর ফিরে আসে না; শুধু রিভলবার নয়, দলের দু'হাজার হাজার টাকাও তার কাছে ছিল।

রামায়ণজীর দুঃখ যে, মোসম্মত আর সাগিয়াকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবরে ক্রান্তিদল 'লেজটা পর্যন্ত নাড়ায়নি'। মুখ ফুটে অবশ্য এ কথা সে বলেনি দলের লোকের কাছে। বললে তারা মিথ্যাবাদী রামায়ণজীর সঙ্গে তখনই ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিত। 'লেজটা পর্যন্ত নাড়ায়নি'! বললেই হল। কত সওয়াল কত বহস হয়েছিল বলে! নতুন প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, কোনো কাজে কারও বাড়ি গেলে কেউ যেন জুতো খুলে না রাখে।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে রামায়ণজী বলতে চায় অন্য কথা। মেয়েদের স্বীকারোক্তি নেবার সময় তাদের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হয়েছিল বলে যে কথাটা রটেছিল, সেটাকে নিয়ে ক্রান্তিদল মাথা ঘামায়নি। একটু খোঁজও তো নিতে পারত। নাকের সামনে যে জুলুম করছে, তাকে সাজা দেবার সাহস যদি চলে গিয়ে থাকে, আজ তবে দরকার কি এত কার্তুজ আর পিস্তল তয়ের করে। তার মনের মধ্যে দলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো জড় হয়েছে, তার সঙ্গে এটাকে সে গেঁথে রেখে দিয়েছে। সব ভাল-না-লাগাগুলো জমে জমে দানা বেঁধে বেঁধে অভিযোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেখানে। প্রথম প্রথম যেমন দলটাকে আপন মনে হত, এখন আর তা হয় না। তা না হলে যে নিজের কাছেই নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হত।

তবু দরকার প্রাণ বাঁচানোর। তাছাড়া আর এখন কাজই বা কী? দুদিন উপরোউপরি এক জায়গায় থাকবার উপায় নেই। চৌকিদারগুলোকে পর্যন্ত দেখলে আজকাল লুকোতে হয়। মায়া বসাবার মতো কোনো জিনিস মনের কোনায় পাওয়া যায় না। কাল মাথা গুঁজবার মতো জায়গা পাওয়া যাবে কিনা, এ কথা ভেবে মন খারাপ করতেও ভয় করে। রাতে কুকুরের ডাক শুনলে ধড়মড় করে উঠে বসতে হয়। বাতার ঘুণধরা বাঁশের কুট্‌কুট্‌ শব্দকেও ঘোড়ার খুরের শব্দ বলে ভুল হয়। রাতের আঁধারে পথ চলতে হয়। মাঠের গোরু মোষ আর অন্য জানোয়ারগুলো বর্ষাকালে শুকনো জায়গা দেখে দেখে দাঁড়ায়। তাই রাতে জলকাদার মধ্যে পথ চলবার সময় পথ ঠিক করতে হয়, কোথায় তাদের চোখ জ্বলছে তাই দেখে। রাতটা তো তবু একরকম করে কাটে, দিন আর কাটতে চায় না। ঘোড়সওয়ার ফৌজদের টহল দেওয়ার নিয়ম রাতে। কিন্তু রাতে তারা কাজে ফাঁকি মেরে ঘুমোয়, আর দিনে ঘোড়ায় চড়ে হাটে যায়, ডিউটি আর সস্তায় জিনিস কেনা একসঙ্গে সারবে বলে। তাছাড়া

আছে টোলায় টোলায় সরকারের 'খুফিয়া'১। দিনের বেলা এদের নজর এড়িয়ে চলা শক্ত।

শক্ত করে ধরবার মতো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না মনের কাছে। এর পর কী তা কেউ জানে না। এত কথা, এত তর্ক, কিন্তু রামায়ণজীর মনে পড়ে না কেউ একদিনও রামরাজ্য স্থাপনের কথা বলেছে দলের মধ্যে।

এই প্রাণ বাঁচানোর চাইতেও দলের বেশি দরকার টাকার। এতগুলো লোকের খাওয়াপরা চালাতেই হবে। অনিশ্চিত এবং প্রায় অজ্ঞাত কোনো উদ্দেশের জন্যে কার্তুজ আর পিস্তল তৈরির কাজ চালিয়েই যেতে হবে। ক্রান্তিদলের মোকদ্দমায় বিজন উকিল তিনগুণ ফি নেয়। সে খরচ যেমন করে হোক জোটাতেই হবে। একজন দুজন করে এক এক গেরস্তর বাড়ি গেলে তবু খেতে পাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাতে ভয় আছে, গেরস্ত দুষ্টু হলে। তাছাড়া নতুন লোকদের বন্দুক নিয়ে একা ছাড়তেও ভয়-ভয় করে। কত লোক যে বন্দুক নিয়ে পালিয়েছে, তার ঠিকানা নেই।

এত সাবধানতা সত্ত্বেও রোজ কানাঘুষো শোনা যায়, দলের অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধে। এ কেবল বাবুসাহেবের মতো 'কিসানের' বক্রোক্তির মধ্যে দিয়ে নয়। আজকাল অভিযোগ আনে ঘোড়ায়-চড়া গরিব হাটুরে, পাটের গাড়ির গাড়োয়ান, পরিষ্কার ভাষায়; ক্রান্তিদলের লোকের বন্দুক দেখিয়ে পাঁচ টাকা দশ টাকা নেওয়ার অভিযোগ। সব বুঝেও গান্ধী বলে, ক্রান্তিদলের নাম করে কোনো বদমাশ রাহাজানি করে বেড়াচ্ছে। একবার ধরতে পারলে হয় শালাকে!

রাঙাআলু তোলা ক্ষেতের মধ্যে খুঁটে খুঁটে, খুঁজে খুঁজে যখন আর একটা কড়ে আঙুলের মতো মোটা শেকড়ও পাওয়া যায় না, তখন যদি দলের দুজন নতুন লোক বলে যে দেখি কিছু মুড়ি-চিড়ের যোগাড় করতে পারা যায় কিনা গাঁয়ে, কে আর জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছে তাদের কাছে পয়সা আছে কিনা। কথা বাড়িয়ে লাভ কী।

এই অস্থির অনিশ্চিত জীবনে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে, ভাববার ধারা চলে অপ্রত্যাশিত খাতে, ত্রস্ত চঞ্চল চোখের চাউনিতে সকলের সন্দেহের ছায়া পড়ে। কেউ কাউকে বিশ্বাস পায় না। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া বেধে ওঠে। উৎসাহের ফেনা মরে এসেছে। শক্ত অবলম্বন চায় মন। মন্থনদণ্ডের গায়ে ফেনাটা লেগে থাকলে বাঁচতে পারে। তাই রামায়ণজী দিন দিন নিজেকে বেশি করে গুটিয়ে নেয়, রামায়ণখানার মধ্যে।

## দৈবানুগ্রহে এণ্টনির সাক্ষাৎলাভ

রামায়ণের আড়ালে গিয়েও মনের অস্থিরতা কাটে না রামায়ণজীর; ওর মধ্যে ডুবে থেকেও মনে বল পায় না। স্বাদ পাওয়া যায় না কিছুতে। একটা সর্বগ্রাসী উদাসীনতার ছায়া পড়েছে মনের উপর। হয়তো রামায়ণজীর মতো দলের আরও অনেকের মনের ভাব এই রকম। কে আর জানতে পারছে! আজকাল দলের লোকেরা যা ভাবে তা বলে না, যা বলে তা করে না। সর্দারেরও সকলে সন্ধ্যার পুজোটা বেড়েছে।

আবার বলতে আসে যে, সাগিয়াদের গ্রেপ্তারের সময়—'লেজ নাড়ায়নি' সে কথা

১ গুপ্তচর।

ভুল ! দল কই, দলের লেজটুকুই তো আছে। সেইটুকুই তিড়িং-মিড়িং করে লাফায় টিকটিকির খসা লেজের মতো ; প্রাণটুকু বাঁচানোর উদ্দীপনায় লাফায় ; না ভাবার লোকসানটা পুরিয়ে নেবার জন্য লাফায়। মূল শেকড় কেটে গিয়েছে। এখন বাঁচতে হলে ছোট ছোট বিধিনিষেধ, আর বড় বড় কথার মধ্যেই বাঁচতে হবে। প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টার একঘেয়েমিটুকুকেই ভালবাসতে হবে ; প্রাত্যহিক মিটিনের বিরামহীন তুচ্ছতা-গুলোতে আনন্দ পেতে হবে।

নইলে হবে এই রামায়ণজীর হাল। সে সমান তালে পা ফেলে চলেছে দলের সঙ্গে ; কিন্তু হোঁচট খেতে খেতে ছুটেছে একঘেয়েমি থেকে উদাসীনতার পথে, তারপর উদাসীনতা থেকে বিতৃষ্ণার দিকে। পথ ফুরিয়ে এসেছে।

তাই আজকাল মিটিনের সময়ও সে বহু দূরে বসে থাকে রামায়ণ খুলে। কেউ কিছু বলে না। দলের যে ঝাঁঝ মরেছে। সকলেই জানে যে, পড়তি পরিবার যখন আর চাল মেরামতের পয়সা জোটাতে পারে না, তখন দেওয়ালের হাতি ঘোড়ার 'রঙ্গোলি'গুলোতে১ ভাল করে রঙ দেয়।

সেইজন্য আজকাল হয়েছে মিটিন আর মিটিন, আর মিটিন। সুযোগ আসছে, তৈরি হও, তৈরি কর, এ কথা গত আড়াই বছর ধরে প্রতি মিটিনে তারা শুনেছে।

আজকের মিটিনে মনোহর ঝা বলেই ফেলল। 'আবার কবে আসবে ? আর এসেছে সুযোগ।'

গান্ধী চটে ওঠে, 'সেদিনের ছোকরা ইস্কুল পালিয়ে ক্রান্তিদলে এসেছে। শালিখের রোঁয়ার মতো গোঁফ। আজ দরকার পড়লে যে গোঁফদাড়ি গজিয়ে চেহারা বদলাতে পারবে, সেটুকুসুদ্ধু হয়ে উঠবে না তোমার দ্বারা। আর কেবল বড় বড় কথা ! তুমি হচ্ছ ভাদ্রের শিয়াল, বোঝো তো ? একটা শিয়াল ভাদ্র মাসে জন্মেছিল। আষাঢ় শ্রাবণ দেখেইনি। জন্মেই বলে, এত বৃষ্টি তো কখনো দেখিনি। তোমার হয়েছে তাই।'...

সকলের মনের কথা বলেছে 'ইস্কুলিয়া'টা। কিন্তু কেউ তার পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে সাহস করে না। তাহলেই সে হয়ে যাবে হয় কাপুরুষ, না হয় গুপ্তচর। কেবল এই ভয়টার জন্যেই কেউ কিছ বলল না তা নয়। ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্তুর বিজা সিং হওয়ার স্বপ্ন এদের বহুদিন আগেই ভেঙেছে। সকলে মনে মনে বোঝে যে, এ দানের খেলায় তারা হেরে গিয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ফেরবার পথটা পর্যন্ত বন্ধ করে এসেছে। একটা কিছু হয়তো এখনও ঘটে যেতে পারে, এই মিথ্যে সান্ত্বনা-টুকুও যদি নিজের মনকে না দিতে পারে, তাহলে এরা কী নিয়ে বাঁচে। সেটাও বন্ধ করে দিতে চলেছিল আজকের মনোহর ঝা, খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে। ঠিক জবাব দিয়েছে গান্ধী—।

কিন্তু আজকের 'মিটিন'টা আর এরপর জমবে না। 'ইস্কুলিয়া'দের দল এরই মধ্যে বিড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে দিয়েছে। এখনই নিশ্চয় তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। রামায়ণজীর রামায়ণ যেমন-কে-তেমন সম্মুখে খোলা পড়ে রয়েছে। অন্যমনস্কভাবে একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে সে দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সম্মুখে; কিন্তু দেখছে না ; মন উড়ে গিয়েছে কোথায়।

---

১ রঙিন আলপনা।

নতুন একটা ছোকরা এল এখনই। চুপ! চুপ! কে আবার এল! কোনো খবর ছিল নাকি আসবার, গান্ধী? সকলের হাত চলে গিয়েছে কোমরে। কাঁধে একটা থলে! মোচ ওঠেনি এখনও ভাল করে! তাহলে নিশ্চয়ই 'ইস্কুলিয়া'! কামিজ আর হাফপ্যাণ্ট দেখেই বোঝা গিয়েছে। এরকম তো হরহামেশা যায় আসে, ক্রান্তি-দলের আজকের এই দুর্দিনেও! একজন বড় বড় গোঁফদাড়িওয়ালা লোক ঠাট্টা করে, 'গান্ধী, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে নিও, মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কিনা। না হলে আবার হরেসোয়ারের মতো রাতে কান্নাকাটি করবে ভূতের ভয়ে।'

এই হাসির অভ্যর্থনায় ছেলেটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তবু খানিকটা সময় কাটবে। ভিড়ের মধ্যে থেকে গান্ধীর গলার আওয়াজ শোনা যায়।

'সর্বন মিস্ত্রি এত কম লোহা দিল কেন? এটুকুতে কী কী হবে?'

'বলেছে বারে বারে নিয়ে আসতে। এক সঙ্গে বেশি আনা ঠিক নয়।'

'বাড়ি কোথায়?'

'জিরানিয়ায়।'

রামায়ণজীর কান খাড়া হয়ে ওঠে। সে সোজা হয়ে বসে। ছি! রামায়ণ পড়তে পড়তে হাত এঁঠো করেছে। হাতের ঘাসের শিষটা ফেলে সে হাতধোয়ার জলের জন্য ওঠে।

'নাম?'

'এনটনি।'

'আসল নাম বলুন। আমাদের কাছে লুকোনোর দরকার নেই।'

'ওই এনটনিই আমার আসল নাম। আমরা কিরিস্তান যে।'

'কিরিস্তান!'

কিরিস্তান এসেছে ক্রান্তিদলে! সকলে এই অদ্ভুত জীবটিকে ঘেঁষে দাঁড়ায়। সরকারের চর নয় তো? কিরিস্তান, মুসলমান, এরা কখনও ক্রান্তিদলে আসে? পাইকারী জরিমানার লিস্টে নাম চড়ে না এদের।

'সর্দার।'

সর্দারকে কী একটা ইঙ্গিত করে মুখে-বিড়ি দুটো 'ইস্কুলিয়া' হাসতে হাসতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ল।

সর্দার কনৌজী ব্রাহ্মণ। ক্রান্তিদলে এসেছে বলে জাত দিতে পারে না। গত বছর একজন মুসলমান নাচগান শেখাবার জন্য দিন পনের দলের সঙ্গে ছিল। তখন খাওয়ার সময় সর্দার অন্য লাইনে বসত। তাই নিয়েই এই ঠাট্টা। আবার এক কিরিস্তান এল। এইবার জমবে সর্দারের!

সর্দার কটমট করে ছেলেদুটোর দিকে তাকায়। 'ফাজিল কোথাকার—!' গান্ধীর জেরা এখনও শেষ হয়নি।

'আপনার পিতাজীর নাম?'

'আমার পিতাজীর নাম ছিল সামুয়র।'

'বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'বাড়ি জিরানিয়ার কোথায়?'

'শহরে না। ধাঙড়টুলি জানেন? ঐ পাক্কীর ধারে যেদিকে ফৌজী হাওয়া-

গাড়ির কারখানা আর টমি অফিসারদের ঘর হয়েছে, সেইদিকে ছিল আমাদের বাড়ি! ধাঙড়টুলির সকলকে উঠে যেতে হয়েছিল সেই সময়। টোলাসুদ্ধ সকলে চলে গিয়েছে মোরঙ্গে১ চাষবাস করতে। লোকজন বেশি হলে তার মধ্যে ধাঙড়রা থাকে না। কেবল কিরিস্তানরা যায়নি। কলস্টর সাহেব নিজে এসে তাৎমাটুলিতে সব কিরিস্তানের থাকবার জায়গা করে দিয়েছে। তাই আমরা এখন থাকি তাৎমাটুলিতে।'

'আমরা মানে?'

'আমি আর আমার মা।'

'তোমাদের চলে কিসে?'

'জিরানিয়ায় সাতজন ফৌজী অফিসার থাকে, 'টমি'। ঘাসের অফিসার, চাষের অফিসার, ঘোড়া গোরুর অফিসার, মোটর-মেরামতির কারখানার অফিসার, সব মিলিয়ে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার দেখাশুনো করে বৌটসসাহেবের বিধবা মেম। আর তাকেই সাহায্য করে আমার মা। ফাদার টুডু পাদরিসাহেব আছে না, সেই করিয়ে দিয়েছিল কাজটা।'

থাক, সর্বন মিস্ত্রি বিশ্বাসী লোক। সে যখন পাঠিয়েছে তখন আর ভাববার দরকার নেই। এত খুঁটিনাটি কেউ বানিয়ে বলতে পারে না। গান্ধী প্রশ্ন করা বন্ধ করে।

'কিছু মনে কোরো না। নতুন লোককে এসব জিজ্ঞাসা করা আমাদের নিয়ম।'

রামায়ণজী এঁটো-হাতটা ধুয়ে ঘটিটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিল। প্রথমটায় মাথার মধ্যেটা মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ নিভে যায়। তারপর ঠাণ্ডা ঝিমঝিম মাথাতে, একটা অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার ঢেউ লাগে। সম্বিতের সঙ্গে সঙ্গে এটা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে আর মনে।

...যা ভয় করছে যদি তাই হয়! চারিদিক থেকে সকলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছেলেটাকে। সরবার কোনো লক্ষণ নেই। কেবল কতকগুলো মাথা, উর্দি আর পায়ের মেলা। অথচ নিজে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার চেহারাটা ভাল করে দেখবার সাহস নেই রামায়ণজীর। কৌতুহলের চাইতে আশঙ্কা বেশি তার মনে। অথচ এই সত্যি কথাটা সে স্বীকার করতে চাইছে না। তবু তাকে দেখতেই হবে। যতক্ষণ না দেখছে নিস্তার নেই তার!

ওদিকে আগিয়ে যাবার সময় তার বুক দুরু দুরু করে। শেষ মুহূর্তে মনে হয় যে, সে মিছে এতদিন নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে এসেছে। ছেলেটার রঙ নিশ্চয়ই সাহেব-দের মতো, চুল কটা, চোখ বিড়ালের মতো। দেউলে যদি হতেই হয়, তবে কিনে নে হাতি, এমনি একটা বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভান করে সে ভিড় ঠেলে ঢোকে। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা আছে যে, খারাপটা ভেবে নিলে ভালটা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

জয় হো রামচন্দ্রজী! ধন্য তোমার করুণা! ছেলেটার রঙটা ঘষা ঘষা কালো। চোখ, চুল সব কালো, বয়সের আন্দাজে বেশ জোয়ান চেহারা। কতই আর বয়স হয়েছে! এই তো পনর বছর এখনও পোরেনি।...

তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ থেকে আজ রামায়ণজী বেঁচে গিয়েছে।

এ যে না হয়েই পারে না। এখনও যে চন্দ্র সূর্য মুছে যায়নি আকাশ থেকে। সবাই মিলে একে পর করে দিয়েছে। কিরিস্তান করে দিয়েছে। হয়তো অখাদ্য

---

১ নেপালের একটি জেলা।

কুখাদ্যও খাইয়ে থাকবে। কিন্তু তাহলেই কি আপন রক্ত পর হয়ে যায় নাকি? গঙ্গাজীতে ময়লা পড়লে কি জল খারাপ হয়। ছেলে যে সোনা। গলালে পোড়ালেই যে সোনার আসল রূপ খোলে। গায়ের আঁচিলটা বলে খুঁটে ফেলা যায় না, আর এ তো হল ছেলে। আপন বলতে তো তার এই একটা জিনিসই আছে।

গান্ধী পরিচয় করিয়ে দেয়, 'ইনিই রামায়ণজী।'

'রামায়ণজী!'

এঁর নাম শুনেছে এন্টনি ক্রান্তিদল-ফেরত স্কুলের একজন বন্ধুর কাছে।

ছেলেটি রামায়ণজীকে নমস্কার করে। নম্র অথচ বেশ সপ্রতিভ ছেলেটি। কতদূর হেঁটে এসেছে! একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো! এখনও মুখ চোখে জল দেবার সময় পায়নি।

'এই ইস্কুলিয়ারা। তোমরা কি কেবল গল্পই করবে। অন্তত প্রথম দিনটাতেও একটু খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দাও এন্টনির জন্যে।'

উর্দির পকেটের নেকড়া বাঁধা চিনিটুকু রামায়ণজী সকলের অলক্ষ্যে ঘটির মধ্যে গোলে, এই শ্রান্ত ছেলেটাকে একটু শরবত খাওয়ানোর জন্যে।

## হতাশার রাজ্যে নূতন নাগপাশ

রামজীর কৃপায় রামায়ণজী তার হারানো ধন ফিরে পেয়েছে। নেড়েচেড়ে উলটে পালটে কতরকম করে দেখে। আদেখলের তৃপ্তি আর হয় না, রোজ রোজ দেখেও। মনের আলগা শেকড়গুলো আবার খানিক রসাল মাটির সন্ধান পেয়েছে। পরিবেশের একটানা রুক্ষতায় তার প্রাণ আর হাঁফিয়ে ওঠে না। আঁকড়ে ধরবার মতো জিনিস পেয়েছে সে হাতের কাছে। দুনিয়া আজ তার প্রতি অনুকূল। মনের উপরের গাদ মরেছে, নিচের থিতুনো তলানি সরেছে। একটা অনাবিল ক্ষমাশীতলায় তার মনপ্রাণ ভরে আছে।

…সব ভাল, সবই ভাল। উপর থেকে শুধু খারাপটুকুনি দেখা যায় বলে লোকে ভুল ভাবে। দলের লোকেরা যে ছোট ছোট তুচ্ছতার মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখে, তা তাদের মন ছোট বলে নয়; রামরাজ্য না আনতে পারবার দুঃখ ভুলতে চায় বলে। আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচতে চায় বলে। তাৎমাটুলির সমাজও তাকে ন্যায্য শাস্তিই দিয়েছিল। ছেলে হয়ে সে বাওয়ায় মনে দুঃখ দিয়েছিল। অভিমানে বাওয়াকে দেশত্যাগী হতে হয়। জাতের দেবতা 'পঞ্চের' মুখ দিয়ে সেই অভিমান শাপ হয়ে বেরিয়েছিল, মনের কাছ থেকে প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নেবার ব্যথা কেমন হয়, সেইটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে। চোখের জলে বুক ভেসেছিল বাওয়ার, আর তার মন কেঁদেছে এতদিন গুমরে গুমরে। বাওয়া ছিল পুণ্যাত্মা লোক, তাই সে ঘুরে বেড়াতে পেরেছে রামজীর মন্দিরের দুয়োরে দুয়োরে। আর রামায়ণজী পাপী মানুষ, তাই তাকে ঘুরে মরতে হচ্ছে মঘাইয়া ডোমের১ মতো। রামিয়ার উপরও সে অন্যায় করেছিল, অবিচার করেছিল। সীতাজীর চাইতেও বেশি দুঃখ তাকে সইতে হয়েছে। পশ্চিমের তরিবৎ আর উঁচু সংস্কার ভুলতে হয়েছে। যে লোকটার আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা সুদ্ধ মরেছে আসামের চা-বাগানে। এখন পাদরির পা চেটে, আর 'টমিদের' পাত চেটে দু-দুটো পেট চালাতে হচ্ছে। এন্টনির কাছ থেকেই সকলে শুনেছে এসব কথা। নিজের

১ বেদেদের মতো একটি যাযাবর জাত। এরা Criminal Tribes এর অন্তর্গত।

থেকেই যা বলে, নেইলে রামায়ণজী কি জিরানিয়ার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে ছেলেটার কাছে। রামায়ণজীর সবচেয়ে জানতে ইচ্ছা করে যে, সামুয়র হিন্দু হয়ে গিয়েছিল বলেই সবাই জানত। আবার কিরিস্তান হল কী করে? ঐ পাদরিটার জন্যেই তাহলে রামিয়ার জাতিধর্ম সব গিয়েছে। কত কী হয়তো খেতে হয়েছে। তা হোক, তবু পাদরিসাহেব লোক ভাল। এণ্টনিই বলেছে গান্ধীর কাছে যে, সে জিরানিয়ার জেলা ইস্কুলে পড়ে। ইস্কুলে পড়বার খরচ দেয় পাদরিসাহেব। বড়লোকদের ইস্কুল সেটা, লাডলীবাবুর ছেলে পড়ে, রাজপারভাঙার ছেলে পড়ে। এই পাদরিসাহেবকে কি সে খারাপ লোক ভাবতে পারে?

যেদিন থেকে এণ্টনি এসেছে, ঢোঁড়াই তাকে চোখে চোখে রেখেছে। ক্রান্তিদলের মেম্বর হওয়ার গৌরবের আমেজ, তার মন থেকে এখনও কাটেনি। এইটাকেই রামায়ণজী ভয় করে। আর দুদিন যেতে দে, তারপর বুঝবি। এখন নতুন নতুন তেঁতুলের বীচি। এখনও কেন যে মরতে আসে ছেলেরা এই দলে তা রামায়ণজীর মাথায় ঢোকে না। দলে নিত্যি নতুন কাণ্ড লেগেই আছে। হতাশার আঁধারের মধ্যে ছুটতে ছুটতে দলের অনেক মরিয়া হয়ে উঠেছে। কবে একটা কী করে ফেলবে, তখন আর এণ্টনির ফিরে যাওয়াও পথ থাকবে না। ইস্কুলে কী পড়ায় ছেলেদের? ইস্কুলিয়াগুলোর আজকের দিনেও মোহ কাটছে না। ক্রান্তিদলের নামের! এণ্টনিটা এখন 'সোবাসবাবু'১ কবে যেন রেডিওতে কী বলেছিলেন, সেই কথাই বলে। তিনি আর এসেছেন! একে এই নিরর্থকতার গণ্ডি থেকে বাঁচাতেই হবে। ঐ অবুঝ ছেলেটার ভবিষ্যৎ সে নষ্ট হতে দিতে পারে না। ক্রান্তিদলকে সাহায্য করতে ইচ্ছা হলে, জিরানিয়াতে থেকেও করা যায়। দরকার পড়লে সর্বণ মিস্ত্রির কাছ থেকে জিনিসপত্র পেঁছে দেবার কাজ করতে পারে! একবার ভালভাবে জড়িয়ে পড়বার পর বাঁধনটা কাটা বড় শক্ত। এখনও ছেলেটার মনে পেঁচ ঢোকেনি। সেদিন ও জিজ্ঞাসা করছিল, 'আচ্ছা রামায়ণজী, ইস্কুলে যে শুনেছিলাম, একদিন ফৌজের গুলি লেগেছিল তোমার গায়ে। সেটা পকেটের রামায়ণখানায় লাগাতে তুমি বেঁচে গিয়েছিলে। নিশ্চয়ই ছিটেভরা কার্তুজ ছিল! তাই নয়?'

'দূর বোকা কোথাকার! এসবও তোরা বিশ্বাস করিস মেয়েদের মতো! ইস্কুলে পড়িস কেন বুঝতে পারি না!'

ছেলেটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন হুল্লোড় করে সবাই স্নান করছে কুয়োর ধারে। এণ্টনিটা মাথায় জল ঢালছে। জলটা মাথা দিয়ে পিঠ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু ঘাড়ের কাছের খানিকটা জায়গা, ঠিক যেমনকে-তেমন শুখনোই থেকে যাচ্ছে। গায়ে জলটা পর্যন্ত নিজে নিজে ঠিক করে ঢালতে শেখেনি ছেলেটা। দেখে দেখে আর রামায়ণজী থাকতে পারে না। 'দে তো দেখি বালতিটা' বলে কুয়োতলায় দিয়ে দাঁড়ায়। এই এমনি এমনি এমনি করে ভিজো ঐ জায়গাটা! অন্য সব ইস্কুলিয়াগুলো হেসে ওঠে। রামায়ণজীর এই ছেলেটাকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি সকলেই লক্ষ্য করেছে। রামায়ণজী এ হাসি গায়েও মাখেও না। সে তখন নিজের ভাবেই বিভোর—ছেলেটার মাথায় যদি একটি টিকি থাকত, তাহলে কী সুন্দর মানাত!

সবচেয়ে আনন্দের কথা, ছেলেটাও রামায়ণজীকে পছন্দ করে। এমন বেআক্কেলে

২ সুভাষবাবু।

ছেলে যে বাড়ি থেকে একখান কম্বল পর্যন্ত আনেনি সঙ্গে।···

রামায়ণজীকে চুপি চুপি বলেছিল, 'সেগুলো মিলিটারি অফিসারদের কম্বল কিনা। কোনা দিকে ইংরাজী হরফে লেখা। দেখলেই সবাই বুঝবে যে, কোথা থেকে পেয়েছে। তাই আনিনি সঙ্কোচে।'

'লজ্জাটা কিসের শুনি? ক্রান্তিদলের কি মিলিটারি রিভলভার নেই?'

বলে বটে রামায়ণজী। তবু মিলিটারি অফিসারগুলোর উপরে কৃতজ্ঞতার বদলে কেন যেন আক্রোশ জমে ওঠে।

'লজ্জা কী, আমার কম্বলেই শো। আমি বলছি শো।'

সবাই ঘুমোলে, ঘুমন্ত ছেলেটার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। অন্ধকারে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে কার সঙ্গে যেন একটা সাদৃশ্যের কথা মনে ভাবতে চেষ্টা করে। নিজে হাওয়া খাওয়ার ছলে একখানা পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে ছেলেটার গায়ের থেকে মশা তাড়ায়। আহা, পিঠটা ঘেমে উঠেছে। মাটি থেকে এখনও গরম ভাপ উঠছে কিনা!

নিদ্রাহীন চোখের সমুখে তাৎমাটুলির মধুর স্মৃতির ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠছে ···একটা পাচ্ছিমা ছবি···পিদিম দিতে এসেছে গোঁসাইথানে।···

রামায়ণজী বুঝতে পারেনি, কখন সে গুনগুন করে একটা রাময়েণের চৌপই গাইতে আরম্ভ করেছে, ছোটবেলার বাওয়ার সঙ্গে ভিক্ষা করতে যাবার সময় যেমন গাইত!···হঠাৎ এই কথাটা তার খেয়াল হয়। পাগলামি না! গত এক বছরের মধ্যে দলের কেউ গান গেয়েছে বলে মনে পড়ে না। সেণ্ট্রেডিউটিতে ছিল একজন ইস্কুলিয়া। সে ঘুমেভরা স্বরে চেঁচায়, 'রস জেগেছে কার এই রাত দুপুরে? দলসুদ্ধ সকলকে ধরাবে নাকি?'

যাক! রামায়ণজী আগেই সাবধান হয়ে গিয়েছে। নতুন ইস্কুলিয়াদের মধ্যে কেউ জানেও না যে, রামায়ণজী আবার গাইতে জানে।

ঘুমন্ত ইস্কুলিয়াদের মধ্যে থেকে একজন গলা খাঁকারি দিয়ে ওঠে। তারপর একে একে সব ইস্কুলিয়াগুলোর গলা খাঁকারের শব্দ রামায়ণজীর কানে আসে। সব কটা তাহলে মটকা মেরে পড়ে ছিল এতক্ষণ! এখন খিকখিক করে হাসা হচ্ছে! অতি বদ এই ছেলেগুলো! একটা বলছে, 'রামায়ণ পড়া ছেড়ে দিয়েছে আজকাল রামায়ণজী কিছুদিন থেকে, দেখেছিস? পছন্দ না করলেও রামায়ণজী মনে মনে স্বীকার করে যে, কথাটা মিথ্যে নয়। তবে হ্যাঁ! ছেড়ে দিতে যাবে কেন রামায়ণ পড়া। এমনিই পড়ে না; মানে এই—হয়ে ওঠে না—আর-কি।···

## হৃদয় অন্বেষণের ফল

সেদিন পামারসাহেবের ভাঙা নীলকুঠিটাতে ছিল ক্রান্তিদল। এই পামার-সাহেবরা বাপদাদার আমলে নোট ছাপত। এখন এদিকটায় এত ঘন জঙ্গল যে, লোক-জন কেউ আসে না। লোকে বলে বাঘ থাকে।

দিনের লু বাতাসটা থেমেছে অনেকক্ষণ আগেই। কিন্তু গরম কমেনি তখনও। এণ্টনি অনেকক্ষণ ধরে কম্বলের উপর এপাশ-ওপাশ করছে। দুবার ঘটি থেকে জল খেল। রামায়ণজী আর থাকতে পারে না।

'কী রে, কী হয়েছে এণ্টনি? উঃ আঃ করছিস কেন? ঘুম আসছে না? জবাব

দিস না কেন ? দম আটকানি ধুলোতে হাঁসফাঁস লাগছে ? এ ছেলে কিছু কি বলবে ? গায়ে হাত দিয়ে দেখে গাটা গরম আগুন !

সেই রাতেই আরম্ভ হয়ে যায়, এন্টনির 'সুলবাই'১। পশ্চিমে ধুলোর ঝড়ে বোশেখ মাসে প্রতি বছর এর বিষ ছড়িয়ে দেয় 'মুলুক' জুড়ে, এ কথা জিরানিয়া জেলার প্রত্যেকে জানে। ছোট ছেলেপিলের এ রোগ হলে আর নিস্তার নেই ; বড়দের মধ্যে তবু অনেকে বাঁচে। তাই বছরের মধ্যে ধুলোর ঝড়ের সময় এলে মায়েরা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। অন্য রোগে তবু ঝাড়ফুঁক তন্তরমন্তর চলে ; কিন্তু এর দেবও নেই, দানোও নেই। বেহুঁশ জ্বরে আরম্ভ, তারপর বাস! চারদিনের মধ্যেই খতম। যেটা বাঁচে লোকে বলে বাগভেরেণ্ডার রস বাতাসের মধ্যে দিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল বলেই বেঁচেছে। আর যেটা মরে সেটার বেলায় বুকচাপড়ানি কান্নার মধ্যে বাগভেরেণ্ডার রস কেন কাজে লাগল না, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর সময় পায় না।

এর পরের কয়দিন রামায়ণজী লড়েছে যমের সঙ্গে একা হাতে।

ভাগ্যে নীলকুঠিটার কাছে তারা তখন ছিল, তাই ছেলেটা মাথা গুঁজবার একটা জায়গা পেয়েছিল। 'জরুরী মিটিন' বসে। দলের সকলের এক জায়গায় বেশিদিন থাকা ঠিক নয়। তার উপর রোগটাও ছোঁয়াচে। সারলেও গায়ের জোর ফিরে পেতে অনেক সময় নেবে। রামায়ণজীকে এন্টনির সেবার জন্য অনেকদিন থেকে যেতে হবে, সেটা দলের লোকেরা এত ভালভাবে জানে যে, সে সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করতেও তারা ভুলে যায়। কেবল ঠিক হয় যে, কান্তলাল বলে একজন রামায়ণজীকে সাহায্য করবার জন্য এখানে থাকবে। লোকটা বেশ চালাক চতুর।

যাবার সময় গান্ধী রামায়ণজীকে আশ্বাস দিয়ে যায়। এ রোগে বড়দের ভয় কম। এন্টনি জোয়ান ছেলে। ওষুধের চেয়ে দরকার সেবার আর পথ্যির।…

তারপর কদিন আর ঢোঁড়াই সেখান থেকে নড়েনি। কান্তলালকে রুগীর কাছেও আসতে দেয়নি। বলেছে তুমি খালি রোজ সকালে একখান বাতাসায় সাদা বাগভেরেণ্ডার রস নিয়ে আসবে, তাহলেই হবে।…

সবজান্তা কান্তলাল বলে, এখানকার মাটিতে অভ্র আছে। লোকে যা ইচ্ছে হয় বলুক, আমার ধারণা ধুলোর সঙ্গে অভ্রের গুঁড়ো পেটে গিয়ে এই রোগ হয়। অভ্র গলাতে 'বার্লিস'-এর২ মতো আর কিছু নেই।। অভ্র এমনিতে আগুনে পোড়ে না। ফেলো তো তার উপর এক ফোঁটা 'বার্লিস' ; ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে আমি বলে রাখলাম।'

'আচ্ছা তুমি বাগভেরেণ্ডার রস নিয়ে তো এস।' রামায়ণজী চায় যে লোকটা দূরে দূরে থাকুক! ছেলেটা যন্ত্রণায় অধীর হয়ে যখন মাইগে৩ বলে কাতরায় তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না।

কী হয়েছে বেটা! বলবি তো! নাইয়ের চারিধারটা আস্তে আস্তে একটু টিপে দি ? এইবার আরাম লাগছে একটু ? একটু সেরে ওঠ্ বেটা ; তারপর তোকে নিয়ে যাব, তোর মা'র কাছে। মায়ের কাছে যাবার জন্য বড্ডো মন কেমন করছে ? তাই নয়। রোগ হলে তাই হয়। মায়ে যেমন করে রুগীর দেখাশুনো করতে পারে, তেমন করে কি আর কেউ পারে ?

পনের বছরের ছেলেটাকে রামায়ণজীর মনে হয় এতটুকুন বাচ্চা! নিজের অক্ষমতার

---

১ ব্যাসিলারী আমাশয়ের লক্ষণযুক্ত একটি রোগে প্রতি বৎসর এই সময় জিরানিয়া জেলায় বহু লোক মারা যায়। 'সুলবাই'এর সাধারণ অর্থ আমাশয়।

২ বার্লি।

৩ মাগো।

কথা রামায়ণজী নিজে যতটা জানে, ততটা আর কেউ না।

· কেউ না সে এণ্টনির কেউ না। সরকারী কানুনের মোহর পড়ে গিয়েছে তার উপর। না হোক সে এন্টনির কেউ। থাকুক ছেলেটা একা তার মায়ের। রামিয়ার যে আর কেউ নেই দুনিয়ায়। বাঁচিয়ে দাও রামচন্দ্রজী ছেলেটাকে! এ গেলে সে কী নিয়ে থাকবে দুনিয়াতে। কিরিস্তান বলে পায়ে ঠেলো না।

ছেলেটার একটু তন্দ্রা এলে তার অলক্ষ্যে রামায়ণখানা বার করে তার মাথায় ঠেকিয়ে দেয়। হোক কিরিস্তান। রামচন্দ্রজীর আবার জাতবিচার আছে নাকি। গুহক চন্ডালকে তিনি কোলে টেনে নিয়েছিলেন। আহা দেখা হয়নি; রামায়ণখানার পাশের দিকে একরকম পোকায় বাসা করেছে, ঠিক ধুনোর মত চটচটে একটা জিনিস দিয়ে। একেবারে এঁটে গিয়েছে পাতাগুলো। খোলা যায় না। একখান একখান করে খুলতে অনেক সময় লাগবে। থাক এখন!···

ভগবান রামায়ণজীর ডাকে মুখ তুলে চেয়েছিলেন।

এখন ছেলেটার বিপদ কেটে গিয়েছে। একটু ভালর দিকে। সেবার ত্রুটি রামায়ণজী হতে দেয়নি একটুও। এরই মধ্যে একটু খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে।···ছেলে কি একা মায়েরই নাকি? তবু মায়েরা জাদু করে রাখে ছেলেকে। বাপ যে পর সেই পরই থেকে যায়।···এ রোগে দরকার সেবার আর পথ্যির। বলে তো গেল গান্ধী যাবার সময়। কিন্তু ব্যবস্থা কী করে গেল তার। পথ্যি আসবে কোথা থেকে। 'বার্লিস' বললেই হয় না। তাতেও পয়সা লাগে। আর আজকাল যা আগুন দাম! যেমন দল তার তেমনি ব্যবস্থা! এ কয়দিনের মধ্যে খবরটা পর্যন্ত নেওয়া দরকার মনে করল না। না, গান্ধী টাকা-পয়সা দেবে কোথা থেকে? দলের পয়সা কোথায়? কান্তলালকে বললেই সে এখনি কোনো রকমে কিছু যোগাড় করে নিয়ে আসবেই।··· সে রামায়ণজী হতে দেবে না কিছুতেই।···অংরেজ বাদশার চাইতেও বড়লোক ছিল এক সময় পামারসাহেব। তাই না তার নামের নোট চলত এক যুগে। তারই ভাঙা কুঠিতে বসে দ্যাখো রামায়ণজী রামায়ণপড়া হাতে রোগা ছেলের মুখে'বার্লিস' দিতে পাচ্ছে না।

···কোমরের বটুয়ার থেকে রামচন্দ্রজী আঁকা আর ফারসি লেখা সিক্কার মালাটা সে বার করে দেয় কান্তলালের হাতে। গঞ্জের বাজারে সোনারের কাছে বেচিস। তা আর বলতে হবে না কান্তলালকে। লোকটা দরকারের চাইতেও বেশি চটপটে।

কান্তলাল অবাক হয়ে রামায়ণজীর মুখের দিকে তাকায়। এই জিনিসটাকে নিয়ে দলের মধ্যে কত বদনাম হয়েছিল তার। থাক রামায়ণজী। এটা তোমার মরা ছেলের জিনিস। আমি যেমন করে হোক সব জিনিস যোগাড় করে আনছি।

কান্তলালদের 'যোগাড় করার' নাড়ীনক্ষত্র রামায়ণজী জানে।

না না! কান্তলালের হাতে মালাটা গুঁজে দেবার সময় রামায়ণজী সেদিকে তাকাতে পারে না। যায় যদি যাক, দুটো বানভাসি মনের মাঝের একমাত্র সেতু। পিছনের ও-পথে রামায়ণজী আর কখনও ফিরবে না। পারলে মনের উপর থেকে স্মৃতির সেই খোসাটা সে আলগোছে ছাড়িয়ে ফেলে দেবে।···হয়তো আপনা থেকেই খসে পড়বে।

এখন কোনো রকমে, এ যার ছেলে তাকে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দিতে পারলে সে বাঁচে। তারপর···

তার পরের কথাগুলোও ছেলে ভাল হবার মুখে এলে আস্তে আস্তে ভাবতে আরম্ভ করে রামায়ণজী। অনেক দিন আগের মনের নিচের চাপা-পড়া কথাগুলো উপরে ভেসে ওঠে। সেই পচ্ছিমা আওরতের কথাটা তার সমস্ত মনখানাকে জুড়ে বসে।

এতকাল সে নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। মনটাকে আড়াল করবার জন্যে কত-রকমের পলকা পাঁচিল তোলবার চেষ্টা করেছে। জলের উপরে কুমিরের দেহের কতটুকুই বা দেখা যায়। বেশিটাই তো থাকে নিচে। জাতিস্মর জানতে পেরেছে যে এক যুগ আগের সেই স্মৃতিটুকুই আসল। বাকি সব সেই শাঁসটুকুর উপরের খোসা। পেঁয়াজের খোসার মতো পরতের পর পরত সাজানো, কোনোটা পুরু।···সামুয়রটা মরে গিয়েছে চা-বাগানে···

## স্বর্ণসীতা

রাতে কোনো গাড়োয়ান গাড়ি চালাতে রাজী নয়, মিলিটারির ভয়ে। অতি কষ্টে একখানা গাড়ি যোগাড় করে কান্তলাল। ঘোড়সওয়ারগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আট আনা করে পয়সা দিতে হয়। সেটা যে গাড়ি ভাড়া নিচ্ছে সেই দেবে, এই শর্তে গাড়োয়ান রাজী হয়। সাঁঝ-রাতেই টহল দেয় ফৌজগুলো ; তাই অর্ধেক রাতে রওনা হয় ঢোঁড়াইরা গাড়িতে।

'নমস্তে কান্তলালজী! বলে দিও গান্ধী আর সর্দারকে যে, আমি গিয়েছি এণ্টনিকে তার মায়ের কাছে পেঁছে দিতে।'

কান্তলালের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রান্তিদলের সঙ্গের শেষ সম্বন্ধটুকুও মনের আড়াল হয়ে যায়। ঘর-পালালানো ঢোঁড়াই আবার সেই ঘর-জ্বালানী আওরতটার কাছে ফিরে যাচ্ছে, রামায়ণজী না, ঢোঁড়াই। আড়াই বছরের রামায়ণজীকে ফেলে এসেছে পিছনে, ক্রান্তিদলের দৈনন্দিন তুচ্ছতা আর বিধিনিষেধগুলোর সঙ্গে। ঢোঁড়াইয়ের মনে হচ্ছে যে, সে এতদিনে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে। এতদিনকার গুপ্ত জীবনের ঝিমিয়ে-পড়া মনটা, জীয়নকাঠির পরশ পেয়ে চেখ তাকিয়েছে।

ছেলেটা এখনও গায়ে জোর পায় না। রামায়ণের ঝোলাটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে তার হেলান দেবার তাকিয়া করে দিয়েছে ঢোঁড়াই। রুগ্ন ছেলে, ঘুমুতে পেলে ভাল হত ; কিন্তু তার কি উপায় রেখেছে ফৌজে। পাক্কী দিয়ে গোরুর গাড়ি যেতে দেবে না। খানা-ডোবার পথে কি গাড়িতে ঘুমোন যায়! রোগের পর একেবারে ছোট্টো আবদারে ছেলের মতো হয়ে গিয়েছে এণ্টনি। রাগ অভিমান, কথা গল্পের মধ্যে দিয়ে, খুব কাছে এসে গিয়েছে সে ঢোঁড়াইয়ের। এণ্টনির গল্প আর ফুরোয় না···

ধাঙড়টুলির লোকদের কলস্টরসাহেব জমি দিতে চেয়েছিল! কিন্তু ফৌজদের কাছাকাছি থাকতে তারা কিছুতেই রাজী হল না।···যাবার আগে বুড়ো এতোয়ারী মা'য় কাছে এসে বলে গেল, ধাঙড়টুলির ভাত আমাদের কপালে নেই, তার আর ভেবে কী করবে এণ্টনির মা। মা যত বোঝায় যে টমিদের যত খারাপ লোক মন করছে, তত খারাপ নয় তারা। তাতে এতোয়ারী বলে কী জান? বলে যে তারা কিরিস্তানদের জন্য ভাল হতে পারে, হিন্দুদের জন্য নয়। টাকা যখন কিছু দিচ্ছে সরকার, তখন জমি নিয়ে চাষবাসই করব নেপালে।···

.. ধাঙড়টুলির শুক্রা, এতোয়ারী, বড়কা বুদ্ধু, কর্মাধর্মার নাচ, শনিচরা মাদল বাজাচ্ছে···। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে বলেই বোধ হয় এত সেখানকার গল্প করছে ছেলেটা।

'টমিদের সকলেই খারাপ লোক নয়। একটা খোঁড়া পাগলী মেয়ে আছে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলে, গোঁসাইথানের কাছে মিউনিসিপ্যালিটির টিউবওয়েলটার পাশে থাকে, সেটা টমি দেখলেই বলে সাহেব ওটা কি! বন্দুক! একটা ভুঁড়োশিয়াল মেরে দিয়ো তো আমাকে বন্দুক দিয়ে। সাহেবরা বলে কাল দেব। আর রোজ তাকে সিগারেট দেয়, পয়সা দেয়। এক-আধটা পয়সা না, দু আনা, চার আনা করে পয়সা।

সে পাগলীটা তো আর কিরিস্তান নয়।'

···ও ফুলঝরিয়া, অশথের পাতার আচার একটু ঢোঁড়াইকে দিয়ে যা।···স্পষ্ট মোড়ল গিন্নির গলা মনে হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে ঢোঁড়াই।

'রতিয়া ছড়িদার বলে একটা বুড়ো আছে তাৎমাটুলিতে, সে ফৌজী সাহেবদের নিমের দাঁতন দেবার ঠিকে কেমন করে পেয়েছিল জানতো রামায়ণজী! এক ডালা মুলো ভেট নিয়ে একেবারে বড়োসাহেবের অফিসে হাজির। সাহেব হেসেই খুন। পাছে লোকটা দুঃখিত হয় ভেবে একটা মুলো অফিসে বসেই খেল সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে রতিয়া ছড়িদারকে দাঁতনের ঠিকেদারি দিয়ে দিল। রতিয়া ছড়িদার কি কিরিস্তান? কিরিস্তান হওয়ার যে কী দুঃখ, সে যে কিরিস্তান নয় সে বুঝবে না। তাৎমাটুলিতে কি আমরা সাধ করে এসেছি। অথচ কেউ সেখানে দেখতে পারে না আমাদের। বাড়িটা কিন্তু বেশ। উঠোনে কুয়ো আছে। নইলে মিউনিসিপ্যালিটির টিউবওয়েলে যা ভিড়! বাড়িটা ছিল বাবুলাল চাপরাসীর ছেলে দুঃখিয়ার। বাবুলাল এবার পেন্সন নিয়েছে বলে দুখিয়ার চাকরি হয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দারোয়ানগিরির। সেখানেই কোয়ার্টার দিয়েছে দুখিয়াকে। খালি ঘরখানাতে বাবুলাল পেন্সনের পর চায়ের দোকান দেবে ঠিক করেছিল। এখন ভাল চলতে পারে দোকান ওখানে। জায়গাটা ভাল। তার জন্যই তো বাবুলালের রাগ আমাদের উপর।'

চায়ের দোকান! ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে যে তাকেও একদিন বাওয়া দোকান খুলতে বলেছিল। কত জল্পনা-কল্পনা তাই নিয়ে। তবে সেটা চায়ের দোকান নয়।

'তা এণ্টনি, তোমরাই ওখানে একটা দোকান খোল না কেন?'

ছেলেটা চুপ করল কেন! ও তাই বল! ঢুলুনি এসে গিয়েছে! দুর্বল শরীর! ভাল করে শুয়ে পড় এণ্টনি। এই ঝাঁকানির মধ্যে ঘুমুবি কী করে? ধুলোর ঝড়টাও আরম্ভ হয়ে গেল বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। তাৎমাটুলির গল্প শুনে ঢোঁড়াইয়ের তৃপ্তি আর হয় না। খানিক পরই নিজের চোখে এইসব জিনিস দেখবে। তবু তীর্থযাত্রীর ব্যাকুলতা-ভরা মন মানে না। 'অবধ তঁহা জঁহা রাম নিবাসু[১]; যেখানে রাম থাকেন সেইখানেই অযোধ্যা। অবধ তঁহা জঁহা রামিয়া নিবাসু; যেখানে রামিয়া থাকে সেখানেই অযোধ্যা। বেশ লাগে কথাটা। বারকয়েক মনে মনে লাইনটা আওড়ায়। ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির আজকালকার ছবি কল্পনা করতে চেষ্টা করে; কিন্তু পনের বছর আগের, তারও আগের ছবিগুলোই শুধু তার মনে মূর্ত হয়ে ওঠে। সে যুগের তার পরিচিত দুনিয়াটুকুর ক্লেদগ্লানি আবর্জনাগুলো, সারের মাটি হয়ে তার মনের গহীনের খানাডোবাগুলোকে ভরাট করে তুলেছে! ছেলেটার মাথায় রোদ্দুর লাগছে। ঢোঁড়াই একটু সূর্যের দিকে আড়াল করে বসে।···কিরিস্তান হওয়ার যে কী দুঃখ, তা যে কিরিস্তান নয় সে বুঝবে না।

এতকালের বন্ধ্যা প্রতীক্ষা হঠাৎ নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাচ্ছে।

পনের বছর আগেও তাৎমাটুলির পঞ্চায়ত যা করেছিল, টাকা খরচ করতে পারলে আজও হয়তো তা সম্ভব হবে। করবে আবার না! টাকা পেলেই করবে। গোঁসাইথানে জোড়া ভেড়া কবলালেই করবে! যে পঞ্চায়তের মোড়ল গাড়ি হাঁকায়, ছড়িদার দাঁতনের ঠিকেদারি করে, মোড়লের ছেলে রাজমিস্ত্রি, সে পঞ্চায়তের বিষদাঁত কি আর আছে।

দূরে পাকীর গাছের সারি, এত ধুলোর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, ধোঁয়ার মতো! ঘুঘু-

১ তুলসীদাস থেকে।

গুলো একটানা ডেকে মরছে। ধাঙড়টুলির লোকগুলো কি চালাকি করেই ঘুঘু ধরত সেকালে। আগে একটা ঘুঘু ধরে, তারপর ঘুঘুর ডাকের নকল করত। এ ডাক যে ঘুঘু শুনেছে তার আর নিস্তার নেই। সাথী পাবার দুর্বার আকর্ষণ তাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবেই।

বেলাবাড়ার পাখি[১] হুক হুক করে ডাকছে। বোধ হয় তার সাথী খুঁজছে।

...তোমার আজ নাওয়া-খাওয়া সেই নাকি? বেলাবাড়া পাখি কখন থেকে ডাকছে। কী আদেখলে বলদই হয়েছে! বলদের গায়ে এটুলি ওবেলা ছাড়ালেও চলবে। ...মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। দূরটা কাছে এসে গিয়েছে। বকুনিটুকুও কত মিষ্টি ছিল। হবে না? পচ্ছিমের মেয়ে।

গাড়োয়ান গাড়ি থামায়। এই পর্যন্তই যেতে দেয় গোরুর গাড়ি! ধুলোর গন্ধটা বদলে গিয়েছে। আগেকার চেনা ধুলোর গন্ধটা ঢোঁড়াই চোখবাঁধা হলেও বলে দিতে পারত। যেখানে সেকালে রেবণগুণীর বাড়ি ছিল, সেখানে এখন কেবল তার লিচুগাছ দুটো আছে। গাছের নিচের মাচায় কত্তান ফৌজের উর্দিপরা লোক জটলা করছে। মেয়েলোকও আছে সেখানে; বোধ হয় লিচুগাছ জমা নিয়েছে।

কোথাও একটাও কুল, ময়নাকাঁটা, কামিনী কিংবা শিমুল গাছের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কয়েকটা ছেলেমেয়ে রোদে ঝলসানো মাঠে গোবর কুড়োচ্ছে। তার মধ্যে দুটো আবার হাফপ্যান্ট পরেছে! তাৎমা বলেই মনে হচ্ছে ওদের দলের মেয়েগুলোকে! ছোটবেলায় ঢোঁড়াইরা এই রোদে ঝলসানো মাঠে আগুন লাগাত। আজকালকার ছেলেরা বোধ হয় মিলিটারির ভয়ে পারে না...বকরহাট্টার মাঠটা কিন্তু সবুজ হয়ে রয়েছে। এণ্টনি দেখায় ঐগুলো ঘাসের ক্ষেত। ঐ দিকটা 'হাতিঘাস'। 'হাতিঘাস' ঘোড়ায় খায় না, গোরুতে খায়। জুটি কেটে খাওয়াতে হয়। ঐ দিকটা 'গোলোভার'[২] ঘাস। ঘোড়াদের জন্য বাক্স করে প্যাক করা ঘাস আসে রেলগাড়িতে।

যা রোদ্দুর! আকাশে গোঁসাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে তিন পহর বেলা হবার আর বেশি দেরি নাই। ছেলেটার মুখটা গরমে লাল হয়ে উঠেছে। নিজের জামাটা খুলে এণ্টনির মাথায় জড়িয়ে দেয়; ঢোঁড়াইয়ের এক কাঁধে কম্বল জড়ানো রামায়ণের ঝুলিটা। ছেলেরা তার কাঁধে ভর দিয়ে চলেছে। এখনও পায়ে জোর পায় না। তাকে সূর্যের দিকে তাকাতে দেখে এণ্টনি বলে, 'দুটো বাজল এখন। ঐ যে তাৎমা টুলির লোকের সার চলেছে 'হাতিঘাসে' জল দিতে। একটা থেকে দুটো খাবার ছুটি।'

মরণাধারের কাঠের পুলটা সেই রকমই আছে। পুলের গায়ে সে ছোটবেলায় ছুরি দিয়ে কেটে যে তারাটা এঁকেছিল, সেটা অস্পষ্ট হয়ে এলেও এখনও বোঝা যায়। পুলের নিচে বড় বড় চৌবাচ্চা করেছে।

এণ্টনি বলে এগুলোতে বারমাস জল থাকে। ঐ পাশের বাটিগুলো দেখছ না, গোরুতে যেই ঐ বাটিতে মুখ দেবে আর অমনি ওগুলো ভরে যাবে জলে; যেই মুখ তুলে নেবে অমনি আর জল থাকবে না।

তার গর্ব মেশানো কথার সুরটুকু ঢোঁড়াইয়ের কান এড়ায় না। গর্বেরই তো কথা! আগে এইখানে পথের উপর ঢোঁড়াইদের কল্কে ফুলের বীচি দিয়ে খেলার গর্ত থাকত।

---

১ এক জাতের সবুজ রঙের পাখি। চৈত্র-বৈশাখ মাসে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের ডাকের অবিরাম ধ্বনি চরমে ওঠে।

২ Clover।

আজকাল ছেলেরা সে খেলা খেলে না নাকি ?

'একটু বসবি নাকি এণ্টনি গাছটার তলায় ?'

'না, একেবারে বাড়ি গিয়ে বসা যাবে।' বসলে একটু সময় পাওয়া যেত। তার কাঁধে হাত দিয়ে রয়েছে এন্টনি। তার বুকের হঠাৎ ধড়ফড়ানিটা বুঝতে পারছে নাকি ? মনটা দুর্বল-দুর্বল লাগছে শেষ মুহূর্তে। তার এতক্ষণকার আত্মপ্রত্যয় হঠাৎ সে হারিয়েছে। হয়তো এই দাড়ি গোঁফওয়ালা ফেরার ঢোঁড়াইকে চিনতে পারবে না রামিয়া। রামিয়ার মন এখন কী চায়, সে কথা তো ঢোঁড়াই জানে না।

···সারা দুনিয়ার দুয়োরে মাথা কুটে-কুটে ফিরে এসেছে ঢোঁড়াই তোমার কাছে। তোমার টানে, তোমার দুঃখের কথা মনে করে। তারই জন্য রামচন্দ্রজী তোমায় সৃষ্টি করেছিলেন। তারই সঙ্গে তোমার জীবন বাঁধা। ঢোঁড়াই অপমানের কথা ভুলেছে, কোনো অভিমান নেই তার আজ। বিনা শর্তে সে নিজেকে ফিরিয়ে দেবার জন্য ফিরে এসেছে। তুমিও ভুলে যাও মাঝের যুগের এই সব কথা। জীবনের রামায়ণখানার মাঝের অধ্যায় ধুনোর মতো পোকার আঠা দিয়ে আঁটা থাক। খোলবার দরকার নেই সে পাতাগুলো। তোমার দুঃখ ঢোঁড়াই যদি না বোঝে তবে আর কে বুঝবে।···

রামচন্দ্রজী ছাড়া এখন ঢোঁড়াইয়ের মনে বল আনবার আর কোনো সম্বল নেই! তাই কম্বলের বোঝাটাকে সে শক্ত করে চেপে ধরেছে। এণ্টনি যে বাড়িটায় নিয়ে যায়, সেটা ঢোঁড়াইয়ের নিজের বাড়ি। এইটাই তাহলে সে চলে যাওয়ার পর দুখিয়ার মা দুখিয়াকে দিয়েছিল! বানভাসি চড়ায় ঠেকার সময়ের মুহূর্তের আঘাতের মধ্যেও এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিত দেখতে পায়।

···বলদের নাদা দুটো নেই। সেখানে দুটো মাটির ঢিবি উঁচু হয়ে রয়েছে।··· হাকিম এই বাড়ি পাইয়ে দিয়েছেন এণ্টনির মাকে। এন্টনির মা কথাটা শুনতে ভাল লাগছে না রামিয়াকে। ঐ মনে হয় হাকিম করেছেন! কিন্তু হাকিমের হাত দিয়ে দুনিয়াতে কে করাচ্ছেন এসব, তার খবর রাখে কজন!

মা নিশ্চয়ই বাড়ি এসেছে। দুটোর সময় অফিসারদের খাওয়া হলে, তারপর মা খাবার নিয়ে আসে বাড়িতে।'

এন্টনি ডাকে, 'মা কোথায় ?'

উঠোনে ঢুকেই ঢোঁড়াই কম্বলের পুঁটলিটা দাওয়ার উপর খুঁটির পাশে রাখে। তারপর সেইখানেই বসে, মনের উত্তেজনাটা একটু কমাবার জন্য। এই খুঁটিতে হেলান দিয়েই, ঢোঁড়াই গাঁ ছাড়বার দিন, রামিয়া বসে ছটপরবের জিনিস পাহারা দিচ্ছিল। নেড়া তুলসীতলার মাটির বেদীটার উপর আমসি শুকোচ্ছে।

ঘরের ভেতর থেকে গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে। রামিয়ার গলাটা একটুও বদলেছে মনে হচ্ছে। নিজের বদল নিজে বোঝা যায় না। কম দিনের কথা হল না তো!

'কে রে—তাই বল! এ কী চেহারা হয়েছে! রোজ মনে করি এন্টনির চিঠি আসছে, চিঠি আসছে। সে চিঠি আজও আসছে, কালও আসছে। থাকতে না পেরে কাল তালঝাড়ির মিশনে চিঠি লেখালাম। ঠিক বুঝেছি। অসুখ করেছিল। কী অসুখ ? দাঁড়া এক মিনিট, বিছানা পাতি। না গেলেই চলছিল না তালঝাড়ির পাদ্রিসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। কী জ্বালানোই যে জ্বলাস তুই আমাকে! মা যদি হতিস তাহলে বুঝতিস! মরদে বোঝে না সে কথা। আমার কপাইল যে পোড়া। আর কার ঝাড় দেখতে হবে তো। সেই বাপেরই তো ছেলে!'

এন্টনি মায়ের স্বভাব জানে। এসব কথা একবার আরম্ভ হলে তার মুখরা মা

শিগগির থামবে না, সে তা জানে। তাই মাকে চুপ করাবার জন্যেই বোধ হয় বারান্দায় ঢোঁড়াইকে দেখিয়ে বলে, 'উনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।'

'এখানে বসে কেন? ছেলে বলছে তুমি করেছ খুব ওর অসুখের সময়। একে তুমি আমার হাঁটুর বয়সী, তার উপর তালঝাড়ি মিশনের লোক। তোমাকে কিন্তু বাপু আপনি বলতে পারব না, আগে থেকেই বলে রাখছি।'

ঢোঁড়াইয়ের তখন সম্বিৎ নেই। খাকী রঙের শাড়ি পরা এই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটিই এণ্টনির মা! মুখটি অস্পষ্টভাবে চেনা-চেনা মনে হয়। কোথায় যেন দেখেছে আগে। আয়নায় আলোর ঝলকের মতো হঠাৎ মনে পড়ে। মর্লিসাহেবের বাড়ির সেই ডাক-সাইটে আয়াটা, যেটাকে নিয়ে সাহেবদের বাড়ির বাবুর্চি আর আরদালী মহলে সেকালে খুব হৈ চৈ ছিল। অনেকের সঙ্গে এর আশনাই ছিল। ধাঙড়টুলির পাকী মেরামতির দলের গল্পের একটা মস্ত খোরাক, এর সঙ্গে সামুয়েরের আশনাইয়ের ব্যাপারটা। রামিয়া কি তাহলে···

এণ্টনির মা ততক্ষণে জমিয়ে বসেছে ঢোঁড়াইয়ের কাছে, হারানো কথার খেইটা সামলে নিয়ে। নিজের একটানা দুরদৃষ্টের কথা বলে চলেছে সে।

···'এদের ঝাড়টাই এই রকম। এর বাপ বিয়ের পর যে কদিন একসঙ্গে ঘর করেছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে আমাকে। নেশাভাঙ করে সব খুইয়ে শনিচরা ধাঙড়ের বৌটাকে নিয়ে পালিয়েছিল। মরেছে কি বেঁচে আছে দশ-বারো বছরের মধ্যে কোনো খবর নেই! মরলে পরে হাড় জুড়িয়েছে। শুধু কি বিয়ের পর জ্বালিয়েছে? বিয়ের আগেই বা কী! সে কাণ্ড যদি শোন তো বলি।'···

সেই কাণ্ডই ঢোঁড়াই শুনতে চায়। চায় কিনা তাও ঠিক করে ভাববার ক্ষমতা নেই তার এখন···রামিয়া? অতল শূন্যতার মধ্যে কতকগুলো অস্পষ্ট কথার আবর্তে সে ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছে।···কুর্বাঘাটের মেলায় জুয়োর দোকানের সাদা ছকটার উপর কাঁটাটা বনবন করে ঘুরছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে··

'বলার কি আর কথা। ছেলে বড় হয়েছে। নিজেরও তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এখন আর লাজই বা কী; শরমই বা কি।'

তারপর গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলে, 'এই যে বাড়িটা দেখছ না, এটা বাবুলাল চাপরাশীর ছেলে ঢোঁড়াইয়ের। তারই বৌটাকে বিয়ে করবে বলে পঞ্চদের টাকা খাইয়ে, নিজের জাতজন্ম খুইয়েছিল। সে বৌটা তো একটা মরা ছেলে বিয়োনর পর মারা যায়। সে মেয়েটার দোষ ছিল কি না-ছিল ভগবান জানেন। শুনি তো যে তাকে না জানিয়েই পঞ্চরা এই কাণ্ড করেছিল। সেবারে সাহেব পাদরিরা চলে গিয়েছিল, কিনা এখান থেকে, তাই এন্টনির বাপের সাহস হয়েছিল, গোঁসাইথানে ভেড়া বলি দিতে। আমার তখন এন্টনি পেটে। রাঁচিতে গিয়ে সাহেব পাদরিকে ধরি। সাহেব তো চটে আগুন, এন্টনির বাপের জাত দেবার কথা শুনে। সাহেব নিজে এসে, খোর-পোষের মোকদ্দমার ধমকি দিয়ে, কোনোরকমে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেয়।···এই ছেলেটার মুখ চেয়েই বিয়ে করেছিলাম ঐ হতভাগাটাকে। নইলে আমার জন্যে আমি ভাবি না। যতদিন গতর আছে খেটে খাব। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, যখন শরীরের শক্তি যাবে, তখন যেন আর বাঁচতে না হয়। না হলে এই ছেলে আমায় রোজগার করে খাওয়াবে? তাহলেই হয়েছিল। আমি ওর ইস্কুলের খরচের জন্যে কোথায় গিয়েছি, আর কোথায় না গিয়েছি! আরে না পাড়িস তো তাই বল পরিষ্কার করে। রোজগার করে খাওয়ার বয়েস হয়েছে। ফৌজের সাহেবকে ধরে একটা চাকরিই জুটিয়ে দি।

অনিরুধ মোক্তারের ছেলেটা হাওয়াগাড়ি মেরামতের কারখানায় মিস্ত্রির কাজ শিখছে, আর তুই শিখতে পারিস না। না-হয় এখানেই দোকান দে। বিজন উকিলের নাতির গোঁসাইথানের চায়ের দোকান চলছে কি না? মিলিটারিগুলো থাকতে চলবে আবার না! তা নয়, ইস্কুল কামাই করে উনি চললেন তালঝরি মিশনে। এই দেখ! এক-দম ভুলে গিয়েছি। জল এনে দি, হাত পা ধোও। যা হোক চারটি খেয়ে-দেয়ে নাও। এণ্টনির কলা খাওয়া বারণ না কি? আজ ভাল কলা এনেছি মেস থেকে।'

কথাগুলো ঢোঁড়াই শেষ পর্যন্ত বোধ হয় শোনেওনি। কয়েকটা কথার বালি পড়ে তার শরীরের আর মনের সব যন্ত্রগুলো বিকল হয়ে গিয়েছে। জুয়ার খেলায় সর্ব-স্বান্ত হয়ে গিয়েছে সে। অবচেতনের মতো সে উঠোন থেকে বেরিয়ে আসে! এই নিঃসীম রিক্ত জগৎটার মধ্যে 'পাক্কী' না কী নামের যেন একটা অপরিচিত রাস্তা দিয়ে সে চলছে। ঠিক অনুতাপ নয়। হতাশার গ্লানি তার নিঃসঙ্গতাকে আরও নিবিড়, আরও দুঃসহ করে তুলেছে। একেবারে একা সে আজ এই দুনিয়াতে। বুকের বোঝার চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আশমানে দিনের চাকা ঘোরানোর গোঁসাই 'পশ্চিমে' ঝুঁকেছেন। তাঁর কাজের কামাই নেই, নিচে গোঁসাই থানের গোঁসাই হাল ছেড়ে দিয়ে ভাটবনে উইয়ের ঢিবি হয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমে ধুলোর ঝড় জেদ ধরেছে থামবে না বলে। ঝাপসা চোখের মধ্যে একটা আকৃতি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে এই পথটা তবু পা রাখবার একটু শক্ত জমি। সিধে চলে গিয়েছে কাছারি, জেলখানা, আরও কত দূরে। আর বেশি দূরে সে যেতে চায় না। জেলে সাগিয়া আছে। চিনিও মিষ্টি, গুড়ও মিষ্টি। তবু লোকে চিনিই চায়। আর চিনি না পেলে? সব পুঁজি খোয়ানোর পর তার মনে পড়েছে বহুদিন আগের জমানো বাতায় গোঁজা পয়সার কথা। ঢোঁড়াই চলেছে সারেন্ডার করতে, এস-ডি-ও সাহেবের কাছে।

একাওয়ালা চেঁচায়—'এক সওয়ারি! কাছারি! চার-আনা!' পাঞ্জাবী বাস-ওয়ালা চেঁচায়—'কচহরি! শহর! তিন আনা! তিন আনা! কচহরি!'

এস-ডি-ও সাহেব এজলাস থেকে উঠে গেলে আজ হয়তো জেলে নিয়ে যাবে না; থানা হাজতেই রেখে দেবে রাতটা। ঢোঁড়াই বাসে চড়ে বসে। তাকে তাড়াতাড়ি পেঁছতে হবে এস-ডি-ও সাহেবের কাছে।···

এণ্টনির মা হয়তো এখন বলছে—'এটা কীরে কম্বল জড়ানো? লোকটা ফেলে গেল। রামায়ণ? লোকটা তাহলে কিরিস্তান নয়? তালঝাড়ি মিশন থেকে এসেছিল বলে আমি ভাবলুম বুঝি কিরিস্তান। তাই এখানে না খেয়ে চলে গেল। আসবেখুনি বাজার থেকে খেয়ে এগুলো নিতে।'

ক্রান্তিদালর লোকেরা বলবে, 'কাংগ্রেসের বড় নেতাদের সরকার ছাড়ছে বলে সুযোগ বুঝে সলণ্ডর করেছে 'কায়েরটা'।১

বুড়ো এতোয়ারী ধাঙড় থাকলে ফোঁকলা দাঁতে হেসে বলত, 'ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতই খাবলাক, ছোবল মারুক, তড়পাক, এক মরলে যদি ওদের বিষদাঁত গজায়।'

———

১ কাপুরুষ।

# চিত্রগুপ্তের ফাইল

তাঁর দপ্তরের আত্মহত্যা বিভাগ থেকে জরুরি ফাইল টেনে নিয়ে বসেন চিত্রগুপ্ত; মিনাকুমারীর ঘটনাবহুল জীবনের ফাইল। আত্মহত্যায় মরতে হবে মিনা কুমারীকে—এ তাঁর প্রাথমিক নির্দেশ। তার জীবনের নাট্য আরম্ভ হওয়ার আগেই এই অমোঘ নির্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এর আর নড়চড় হওয়ার জো নেই। মিনাকুমারীদের জীবনের পুতুলনাচের সুতোটা তাঁর হাতে। চিত্রগুপ্তের নির্লিপ্ত চোখে মানুষগুলো তাঁর নির্দেশ পূরণ করবার মশলা, তার বেশি কিছু নয়। লোকে ভুল ভাবছে যে তাঁর দেখানো পুতুলনাচের উপকরণ - রক্ত-মাংসে গড়া, সুখে-দুঃখে ভরা মানুষ। লোকে ভাবছে যে ঘটনাচক্রই জীবনের কাহিনী গড়ে তুলছে; বুঝছে না যে এ চাকা ঘোরাচ্ছেন চিত্রগুপ্ত। পুতুলের উপর মিনা করে কারিগর; আর জীবনের উপর মিনা করেন তিনি।

লাইন দিয়ে বাঁধা মিনাকুমারীর জীবন। বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর রিপোর্ট, বিভিন্ন মানচিত্রের নকল, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের বিবরণ—সব প্রমাণের উদ্যত সূচিমুখ ঐ আত্মঘাতিনীর অন্তিম মুহূর্তের দিকে কেন্দ্রিত হয়েছে কি না তাই দেখছেন চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্তের কথাই ভাবছিল শিউচন্দ্রিকা, অভিমন্যুর চিতার পাশে বসে। তার মতো যুক্তিবাদী লোকেরও শ্মশান-বৈরাগ্য এসেছে এখন মনে। অদ্ভুত ভাবে জট পাকিয়ে যাচ্ছে তার চিন্তাগুলো। চেষ্টা করেছিল প্রথমটায় যুক্তির শলাকা দিয়ে এর গ্রন্থি আলগা করতে। পারেনি। ইউনিয়ন অফিসে আবার ফিরে যাওয়ার আগে পারবেও না। সে আবছা ভাবে বুঝছে যে তার মন এখন স্বাভাবিক নেই। তাই সে এই শ্মশান-বৈরাগীর রুগ্ন মনটার বাঁধন আলগা করে দিয়েছে; যাক যেদিকে যেতে চায়।

১৯৪৮ সালের একত্রিশে জানুয়ারি আজ। মহাত্মাজীর তিরোধানের পরদিন।

শীতের সন্ধ্যার রূপসী অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসছে নদীর ধারের কুয়াশার জন্য। কালো জলে চিতার আগুনের আলো পড়ছে; বৈতরণীর উপর গড়ে উঠেছে গলানো সোনার সেতু। চারিদিকে অগণিত লোকের মেলা। নির্বাক নিশ্চল জনতার ভিড়টা চিতার তিন দিকে জমে চাপ বেঁধে গিয়েছে। একটা ছোট্ট দলের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে রামধুনের গান। শোকাতুর লোকগুলোর তার সঙ্গে ক্ষীণ সুরের যোগান দেওয়ারও উৎসাহ নেই।

কার প্রাপ্য কে পায়। মহাত্মাজী পরলোকে যাবার পরও যে তাঁর বিভূতিঁধার দিয়ে যেতে পারেন অভিমন্যুকে, সে কথা 'বলীরামপুর জুট মিলু'-এর ম্যানেজার ম্যাকনীল সাহেব ভাবতেও পারে নি। মহাত্মাজীর ছবিওয়ালা মিছিল দেখে সে এসেছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে। তারপর, সকলের সঙ্গে এসেছে শ্মশানে। তার দেখাদেখি কারখানার সব অফিসাররাও জুতো খুলে মাটিতে বসেছে; কিন্তু কারও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকা পড়েনি শিষ্টাচারে।

তাদের কাছাকাছিই বসেছে মেয়ের দল—মিনাকুমারী, রুক্মণী, বলীরামপুরের আরও কত অজানা মেয়ে, কত মিলের মজুরণীরা। ঐ তো মিনাকুমারী কাঁদছে ফুঁপিয়ে

ফুঁফিয়ে ;—রজনীগন্ধার ডাঁটা মুচড়ে মুচড়ে ভাঙছে কে যেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার অশ্রু বাধা মানছে না। চোখের জল যদি শুকিয়ে না গিয়ে থাকে তাহলে এই তো সময় চোখের জল ফেলবার। তার ইচ্ছা হয় চিতার আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, চিতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতগুলো চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে কি না, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। কান্না চাপবার চেষ্টায়, ঝড়ে তোলপাড় খাওয়া বুকটা ফেটে যাবে বুঝি এইবার। রুকণী তাকে ধরে রেখেছে। সে বুঝেছে তার বন্ধুর মনের ব্যথা।

পৃথিবীসুদ্ধ লোকে আজ নিজেকে দোষী মনে করছে। দোষী মনে করছে নিজেকে ম্যাকনিল সাহেব, দোষী মনে করছে নিজেকে শিউচন্দ্রিকা, দোষী মনে করছে নিজেকে মিনাকুমারী ; দোষী মনে করছে নিজেদের রুকণী, রহমতের বিবি, সরযু সিং, প্রতিটি মজুর-মজুরণী, এমন কি মিলের এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ পর্যন্ত। যা ঘটেছে তা বন্ধ করার কি কোনো পথ ছিল না ? নানা রকমের অতি সোজা উপায় এখন সকলের মনে পড়ছে। সকলে ভাবতে চেষ্টা করছে যে, সে নিজে এই অঘটনের জন্য কতটুকু দায়ী ? এত দুঃখের মধ্যেও শিউচন্দ্রিকা এই ভেবে স্বস্তি পায় যে পুলিশে পোস্টমর্টেম করেনি দেহটাকে।

বড় আগুনটা কাছে থাকায় চারিদিক থেকে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া এদিকে—একটু গরম হয়ে নেওয়ার জন্য। সঙ্গে করে নিয়ে আসছে অসংখ্য শীর্ণ শুকনো ঝরা পাতা। কতক চিতার বুকে দপ করে জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে ; কোনো কোনোটা ছুটে যাচ্ছে নদীর বুকে, তারপর ভেসে চলে যাচ্ছে আঁধার বিস্মৃতির স্রোতে। বিচ্ছিন্ন চিন্তার টুকরোগুলোও শুকনো পাতার মতো মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উড়ে চলে যায়, যে-ঝড় মনের মধ্যে দিয়ে বইছে তারই ঝাপটায়।...

শিউচন্দ্রিকার জ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে চিতার আলোর ঝলকানি লাগছে। এই আলো-আঁধারের মধ্যে মানুষের জীবন-মৃত্যুর কত নতুন কথা সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।...

—কপালের লেখা···সপ্তরথীতে ঘিরে ধরেছিল অভিমন্যুকে। নিস্তার ছিল না তার তাদের হাত থেকে।···

চিতার আলোতে মনে হচ্ছে যে একটা ফাইলের পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে। চোখের সামনে ফুটে উঠেছে এক-একটি দলিল। জীবনের ছক কি আগে থেকে কাটা থাকে ? চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানায় কি বাঁচবার দাবির ফাইল রাখা থাকে সকলেরই ? রায় বেরিয়ে যায় কি জন্মানোর মুহূর্তেই ? রায় ঠিক হয়ে যাওয়ার পরই কি চিত্রগুপ্ত তাঁর নথি-পত্র, সাক্ষীসাবুদ, বেঁচে থাকার ছোট-খাটো খুঁটিনাটিগুলো সংগ্রহ করে ফাইলে রেখে দেন ? ঠিক বোমার মামলার রায়গুলোর মতো জীবনের রায়ও কি আগেই ঠিক হয়ে যায়—তারপর চলে প্রমাণ সংগ্রহের কাজ ? এত ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধ-পথ্য, ব্যায়াম-শরীরচর্চা, হাওয়া-বদল, সবই কি—জীবনের প্রহসনের এক একটি দৃশ্য —নিরর্থক, অসার্থক, উদ্দেশ্যহীন ? অদ্ভুত প্রমাণ সাজানোর ক্ষমতা—চিত্রগুপ্তের। দূর-দূরান্তরের বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সময় সময়ান্তরের অসংলগ্ন দলিল, চিতার আগুনের ঝিকমিকে রাংঝাল দিয়ে জুড়ে যাচ্ছে। মাঝের অন্ধকার গলি-ঘুঁজিগুলির উপরও চিতার ঝলকানি মশাল তুলে ধরেছে।

তবে কেন মানুষের এত চেষ্টা বেঁচে থাকবার ? নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়বার এ অদম্য ইচ্ছা কেন ? বেঁচে থাকবার অধিকারটা একটা মোকদ্দমার জুয়ো-খেলা হলেও খেলে দেখা চলে ; কিন্তু পরাজয় সম্বন্ধে যখন কোনো অনিশ্চয়তাই নেই, তবু

কি নিজের ঘুঁটি চালাতেই হবে ? লোকে নেশায় মামলা লড়ে, জিদে পড়ে লড়ে, কু-পরামর্শ পেয়ে লড়ে। জীবন-যুদ্ধেও কি লোকে নামে ঐ সব কারণেই ? লোকে বুঝতে পারে না—কিন্তু প্রত্যেকটি দলিলের, প্রত্যেকটি ঘটনার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কশাঘাতে। এক অদৃশ্য হাত দৃঢ় লাগাম ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বিজয়-রথ এক চক্রব্যূহের কেন্দ্রের দিকে। কোনো শক্তি নেই যা তার গতিরোধ করতে পারে, কোনো ঘটনা নেই যা তার গতিপথে দাঁড়াতে পারে। রথের অক্ষের সঙ্গে লাগানো আছে ক্ষুরধার ধাতুফলক—ঠিক যেমন একটা শিউচান্দ্রিকা মিউজিয়মে দেখেছে ;—তার কাছে যায় কার সাধ্য।...

তুরুপের তাস অপর পক্ষের হাতে। পারবে না, মাথা কুটে মরে গেলেও পারবে না।...

আলেখাইন আর কাপাব্লাঙ্কার ফটো ধার কর তোমরা কাগজে। কিন্তু দেখছ না, একসঙ্গে কোটি কোটি দাবার ছকে প্রতিটি চাল কেটে, কুট গৈবী চাল পড়ছে। সামলাতে চায় মানুষ, বেশি থেকে বেশি একশ' বছর পরমায়ুর গণ্ডীর মধ্যে জোটানো অভিজ্ঞতা যার পুঁজি, মাত্র ছয় হাজার বৎসরের সভ্যতা যার গর্ব, দশ হাজার বছরের অলিখিত ইতিহাস যার জ্ঞানের সম্বল। এ সৃষ্টি মানুষের জন্য নয়। নীহারিকার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য জিনিসের মতো, সৃষ্টির অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের সে একটা উপকরণ মাত্র। কাকতালীয় বলে পৃথিবীতে কোনো জিনিস নেই। যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটে থাকে।

...অভিমন্যুর চিতার সম্মুখে বসে শ্মশান-বৈরাগ্যের এই দর্শন সত্য বলে মনে হচ্ছে শিউচান্দ্রিকার। অভিমন্যু সম্পত্তির মধ্যে রেখে গিয়েছে এই খদ্দরের আধছেঁড়া আধময়লা ঝোলাটা। শিউচান্দ্রিকা এটাকে সঙ্গে এনেছিল চিতায় ফেলে দেবে বলে। অতি পরিচিত এই ঝোলাটার মধ্যে কী কী আছে সে সম্বন্ধে আগে থেকেই একটা আন্দাজ করে নিয়েছে ; কী আর থাকবে—পাজামা, একখানা ধুতি হয়তো, আর খুচরো টুকিটাকি জিনিস যা সফরের সময় প্রত্যহ কাজে লাগে। তবু একবার দেখে নেওয়া ভাল।...ঠিক তাই। ঠিক শিউচান্দ্রিকা যা ভেবেছিল। এতকাল অভিমন্যুর সঙ্গে একসঙ্গে থেকেছে, আর এটুকু জানবে না সে ! ছেঁড়া কাগজপত্রগুলোই একটু ভাল করে দেখা দরকার। গ্রামের চাষাদের দরখাস্ত আঙুলের ছাপ দেওয়া। চিতার অস্থির আলোতে কালো দাগগুলোকে বুড়ো আঙুলের ছাপ বলে বুঝবার জো নেই ; মনে হচ্ছে যে ছেঁকা লেগে পুড়ে পুড়ে গিয়েছে ঐ জায়গাগুলো। এমন অগোছাল স্বভাব অভিমন্যুর যে, দরখাস্ত, কাগজ-পত্র, তার সারা অফিসটি ভরে নিয়েছে ঐ ঝোলার মধ্যে। এ বদ অভ্যাস তার শেষ দিন পর্যন্ত গেল না। যাক, সব তো শেষই হয়ে গিয়েছে ; আজকের দিনে তার স্বভাবের ঢিলেমির কথা ভেবে আর তার স্মৃতিতে কলুষ আনতে চায় না শিউচান্দ্রিকা। দাড়ি কামানোর ক্ষুরের বাক্সটা খুলেই নজরে পড়ে দুখানি কাগজ, সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা। প্রথমখানি ভৃগুর গণনা, এ কাগজখানিকে বহু বার দেখেছে শিউচান্দ্রিকা এর আগে। দ্বিতীয়খানি একটি চিঠি, মিনাকুমারী লিখেছে অভিমন্যুকে। আশ্চর্য হয়ে যায় সে। এর কথা অভিমন্যু ঘুনাক্ষরেও জানায়নি কাউকে কোনো দিন। ঠিক মিনাকুমারীরই লেখা তো ? শিউ-চান্দ্রিকার দৃষ্টি আপনা হতে গিয়ে পড়ে মিনাকুমারীরা যে দিকে বসে আছে সেই দিকে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে মিনাকুমারী এখন বসে আছে। রুক্মিণীর হাত তার পিঠের উপর। খানিক আগেও একবার শিউচান্দ্রিকা দেখেছিল মিনাকুমারী কাঁদছে। লোক-

দেখানি দুঃখ নয় তো তার ?

ঝোলাটাকে আগুনে ফেলতে তার মন সরে না। অভিমন্যুর শেষ স্মৃতিটুকু তবু তো থাকবে একই সঙ্গে মিশে।

…'জন্ম ১৩২৫, ঊনিশে ভাদ্র, শুক্লা অষ্টমী, প্রাতে…তুলা লগ্ন, ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ প্রজাপতি…জাতক বাল্যে মাতৃহীন, বুদ্ধিমূল দৃঢ় নহে ; বাল্যে উদরপীড়া ; পল্লবগ্রাহী ; চিত্ত দুর্বল ; সপ্তদশ বর্ষে পিতৃভয় ; অপঘাত ; দেবরক্ষা ; জাতকের কর্মের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ থাকিবে ; জাতক সাধারণত আনন্দপ্রিয়, নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হইতে পারেন, রুদ্র ও মঙ্গলই জাতকের প্রবল মারক, উনত্রিশ বৎসর বয়সে মহারিষ্ট, রিষ্টান্তে বাঁচিলে পূর্ণায়ু ষাট বৎসর ; আয়ুরক্ষার্থ প্রয়োজন আয়ুদযন্ত্র অথবা সন্ন্যাস ; রাজভয় ; বন্ধুস্থানে সুখ, শেষ বয়সে বন্ধুকৃত ঋণমুক্ত ; পূর্বজন্মে যোগী, গুরুর সহিত বিরোধবশত পুনর্জন্ম।'…

অনেকগুলো সম্ভাব্য গণনা জ্যোতিষী পড়ে শুনিয়েছিলেন—তার মধ্যে এইটাই অভিমন্যুর ঠিক বলে মনে হয়েছিল। গণক ঠাকুর পড়ে গিয়েছিলেন, আর সে লিখে নিয়েছিল একখানা কাগজে। সবটা লেখেওনি। যেটুকু লিখেছিল, তাড়াতাড়িতে সেটুকুও নির্ভুলভাবে লিখতে পারেনি।

আসামী অভিমন্যুর বিরুদ্ধে, চিত্রগুপ্তর প্রথম দলিল ভৃগুর গণনার ঐ কাগজখান। কাশীর ভৃগু চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানার রেকর্ডকীপার কি না জানি না, যদি না হন তাহলে নিশ্চয়ই সেই দপ্তর থেকে দলিলের নকল আনবার তাঁর সুবিধা আছে।

তাই কাশী থেকে গণিয়ে এনেছিল অভিমন্যু। তার হাত-দেখানর বাতিক চিরকালের। তার দোষই ছিল যে সে সকলকে বিশ্বাস করত—কেবল হাত-দেখানোর ব্যাপারে নয়, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি বিষয়ে। এর জন্য কত বার তাকে কত বিপদ, কত অসুবিধাতে পড়তে হয়েছে। শিউচান্দ্রকা আর অন্য বন্ধুরা কতবার তাকে সাবধান করে দিয়েছে, কিন্তু কারও কথা কি সে গাহ্য করত ? কত সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরকে দিয়ে যে সে হাত গণিয়েছে তার ঠিক নেই। কেউ বলেছে যে সে রাজা হবে, কেউ বলেছে যে সে সুখে ঘর-সংসার করবে নাতিপুতি নিয়ে, কেউ বা তার চেহারা দেখেই বুঝেছে যে সে খুব দানশীল লোক। সে শুনে গিয়েছে সব। পুরো দক্ষিণা দিয়েছে বেশ সন্তুষ্ট চিত্তেই। এ সব শুনতে ভাল লাগে তার, কিন্তু যতক্ষণ না জ্যোতিষী ঠাকুর খারাপ কিছু বলেছেন, ততক্ষণ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। আবার খারাপ লাগবার পর মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করলে মনকে বুঝোয়,—জ্যোতিষীর কথায় আবার ঠিক-ঠিকানা, এক-একজন এক এক রকম কথা বলে।

অনেকদিন আগে সেই যে-বার লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস হয়, সেইবার রাণীপত্রার পত্তনিদার তালেবর মণ্ডল খরচ দিয়েছিলেন অভিমন্যুকে কংগ্রেস অধিবেশন দেখবার জন্য। তাঁর ছেলেও ছিল অভিমন্যুর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে পৌঁছুতেই পারেনি অভিমন্যু। কাশীতেই সে নেমে গিয়েছিল, আর সেইখানেই তার দেরি হয়ে যায়। এই কথা নিয়ে জেলার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়ে যায়। সকলেই এ নিয়ে অভিমন্যুকে ঠাট্টা করত। অভিমন্যু সে সব কথা গায়েও মাখত না। হেসে জবাব দিত, আমার প্রিয়ার অম্বলের ব্যায়রাম হবে কি না তাই গুণিয়ে নিতে গিয়েছিলাম ; খবদ্দার অম্বুলে রুগীর সঙ্গে প্রেমে পড়ো না। আর যখন মনের ভাব এতটা হালকা থাকত না তখন বলত—'রাজনীতিতে আমাদের চলছে জন্মগত দারিদ্র

কথা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কথা। আর আমি আনতে গিয়েছিলাম, চিত্রগুপ্ত দ্বারা স্বীকৃত আমার অধিকারটুকুর একখান লিখিত দলিল। জীবনের দাবির মামলায় তাঁর দেওয়া রোয়েদাদ। আমার কাছে আমার জীবনের 'চার্টার'-এর মূল্য কি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের 'চার্টার,-এর চাইতে কম ?

সেই থেকে সকলেই অভিমন্যুর এই ভৃগুর গণনার কাগজখানার কথা জানে।

আর দশ জন বিহারের রাজনৈতিক কর্মীর মতো সে-ও মুরত খাদি-ভাণ্ডারের পেটেণ্ট মার্কা একটা খদ্দরের ঝোলা নিয়ে। অন্য সকলের মতই ঝুলিটা রাখত হাতে চব্বিশ ঘণ্টা, কেবল রাতে শোবার সময় সেটা হয়ে যেত বালিশ। সেই ঝোলাটার মধ্যে কি থাকত আর কি থাকত না। পাজামা, গামছা, পার্টির চাঁদা তুলবার রসিদ বই, রঙ-বেরঙের ইস্তাহার, কত রকমের দরখাস্তের আর প্রতিজ্ঞাপত্রের ফর্ম, নিমের দাঁতন, কাপড়কাচা সাবান, আরও কত কী ; এরই মধ্যে জায়গা পেয়ে গিয়েছিল ভৃগুর ঐ লম্বা কাগজখানিও। উনত্রিশ বছর বয়সে তার মস্ত ফাঁড়া আছে, লাল পেন্সিল দিয়ে ঐ জায়গাটার নিচে দাগ দেওয়া ছিল। ঐ লেখাটির সে অর্থ করে নিয়েছিল যে সে উনত্রিশ বছরই বাঁচবে, তার বেশি নয়। বাকি কথাগুলো তাকে প্রবোধ দেবার জন্য জ্যোতিষী ঠাকুর লিখে দিয়েছেন, এইটাই তার ছিল আন্তরিক ধারণা। আসল ভৃগু সে দেখেছিল সংস্কৃততে লেখা। এই জন্যই কাগজখানার কালির আঁচড়গুলোর উপর তার বিশ্বাস ছিল এত বেশি। নিরিবিলি থাকলে বারবার পড়ে ঐ কথাগুলো থেকে আর কোনো নতুন অর্থ বার করা যায় কি না, তারই চেষ্টা করত। বন্ধুদের কাছে ঐ কথার মানে জিজ্ঞাসা করত, অভিধান পেলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

রাজনৈতিক কর্মীর জীবন সে নিয়েছিল, ঐ জীবন সে ভালবাসে বলে নয়। অধিকাংশ লোকের মতো তার কৈশোরের ভাবপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করেছিল রোমাঞ্চকর রাজনীতির স্বপ্ন উন্মাদনা। প্রথম নেশা কাটবার পর এর দুর্বার আকর্ষণ শিথিল হয়ে এলেও অধিকাংশের মতো সেও থেকে গিয়েছিল গতানুগতিকতার চাপে, অলস মনের স্বাভাবিক ঔদাসীন্যে, কর্মী বন্ধুদের সঙ্গলিপ্সায়। এ ছাড়া আছে গাঁদা ফুলের মালার উপর লোভ ; জনপ্রিয়তা এত সস্তা আর কোথাও নয়। আর এই রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়ার প্রাথমিক সংকোচ, ছেড়ে যাওয়ার পথে সেটাও কম বড় বাধা নয়। বিহারে এই রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়াকে বলে 'বসে যাওয়া'—মাঝ-পথে গাড়ির বলদের বসে পড়ার মতো, হাজার চাবুক মারো নড়বার নামটি নেই,—সেই রকম আর কী।

হয়তো এই রকম আরও অনেক কারণ ছিল অভিমন্যুর রাজনীতি ক্ষেত্রে থেকে যাওয়ার ; জটিল মনের গোপন গ্রন্থিগুলির খবর অনেক সময় নিজেই জানা যায় না।

সুন্দর চেহারা ছিল তার। রঙটা ফুটফুটে ফরসা নয়। তবে তার নিখুঁত মুখশ্রী, আর ছয় ফুট লম্বা ঋজু অথচ নমনীয় দেহ, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। অনেক দিন আগে, সেই প্রথম যেবার এই মজুর ইউনিয়নটি খোলা হয়,—তখনও রেজিস্টারি করা হয়নি, সেই সময় একজন মজুরের তিনটে আঙুল কেটে গিয়েছিল কলে। তারই ক্ষতিপূরণের সম্বন্ধে কথা বলবার জন্য ম্যাকনীল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল ইউনিয়নের সেক্রেটারি শিউচন্দ্রকাকে। সঙ্গে ছিল অভিমন্যু। ম্যাকনীল সাহেব তখন সবে নতুন এসেছে এদেশে। তা না হলে কখনও কি কোনো ম্যানেজার একটা বিনা রেজিস্টারি করা, বিনা স্বীকার করা ইউনিয়নের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে ?

সেদিন ম্যাকলীন সাহেব অভিমন্যুকে সেক্রেটারি মনে করে তারই সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছিল। বেঁটে, কালো শিউচন্দ্রিকার উপর সাহেবের নজরই পড়েনি। শিউ-চন্দ্রিকার কালো মুখখানা বেগুনী রঙের হয়ে উঠেছিল। অভিমন্যু অপ্রস্তুত হয়ে সাহেবকে আসল সেক্রেটারির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সাহেব বোধ হয় ভাবল যে শিউচন্দ্রিকা মজদুরদের মধ্যে থেকেই উঠেছে, আর অভিমন্যু অভিজাত বংশের ছেলে বলেই মজুররা তাকে সেক্রেটারি করেনি ইউনিয়নের। মনগড়া এই ধরনের একটা কিছু ভেবে নিয়েছিল। শিষ্টাচারের খাতিরে জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে 'আমি দুঃখিত' বলে শিউচন্দ্রিকার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করে। চেহারা দেখেই কারও সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া ঠিক নয়, এ কথা সাহেব কিছুক্ষণ শিউচন্দ্রিকার সঙ্গে কথা বলবার পরই বোঝে। শক্ত চোয়াল, আর বুলডগের মতো চওড়া থুতনিওয়ালা কালো লোকটি চমৎকার ইংরাজি বলে। অদ্ভুত উজ্জ্বল তার ছোট ছোট চোখ দুটো ; নির্ভীক, তীক্ষ্ন, আর গভীর তার দৃষ্টি। সাহেবের মনের মধ্যে অস্বস্তি জাগছিল যে লোকটা নিশ্চয়ই তার মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে। সে বোঝে যে আর যাই করো, এ লোকটিকে তাচ্ছিল্য করবার উপায় নেই। সময় হয়েছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ভদ্রতার খাতিরে মণিবন্ধের ঘড়ি দেখল ; ঐ চোখ দুটোতে মুহূর্তের মধ্যে একটি আগুনের ঝিলিক জ্বলে ওঠে—ঘড়ি কিনবার সংগতি আছে বলেই কি কাজের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘড়ি দেখবার অধিকার পেয়েছ না কি ? আর সে শিষ্টাচারের ধার ধারে না। টেবিল চাপড়ে শিউচন্দ্রিকা তার বাকী কথাগুলো এই আনকোরা নতুন সাহেবটার গোবরভরা মাথায় ঢুকোতে চায়। যেই আসুক তার সম্মুখে, শিউ-চন্দ্রিকার থেকে সে বড় এ ভাব নিয়ে তাকে ফিরতে হবে না। এ কথাটা সেদিন বুঝেছিল ম্যাকনীল সাহেব। অভিমন্যুর মন ততক্ষণ উড়ে কোথায় চলে গিয়েছে,··· অদ্ভুত আইনের এই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচগুলো—ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক হয় আঙুল দিয়ে মেপে ; বুড়ো আঙুল কাটলে এত টাকা, কড়ে আঙুল কাটা গেলে এত টাকা, ডান হাত কাটলে এত ; বাঁ হত কাটলে এত ; আশ্চর্য !...

কেন জানি না, এই শিউচন্দ্রিকার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার মর্যাদা পেয়েছিল অভিমন্যু। বয়সে সে শিউচন্দ্রিকার থেকে ছোট। কোনো বিষয়ে দুজনের চরিত্রে মিল নেই। রাজনীতি আর পার্টির কাজই শিউচন্দ্রিকার জীবন ; আর কিছু সে জানে না ; অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোকেও সে একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা বলে মনে করে। এই একমুখী চিন্তা তার সারা জীবনকে চালিত করে নিয়ে বেড়ায়। যে কোনো প্রশ্ন তার সম্মুখে আসুক, সে তার পার্টির সুবিধা-অসুবিধার মাপকাঠি দিয়ে সেটাকে মাপবে। অদ্ভুত তার কর্ম-প্রেরণা, আশ্চর্য তার নিষ্ঠা। তার কর্ম-জীবনের সম্মুখে যে কোনো বাধাই আসুক তাকে আটকাতে পারবে না। তার স্বভাবটা এমনই যে সে ঐ বাধাটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবে না। সে খুশী হবে যদি সেটাকে ভেঙে চুরে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে রুদ্ধ পথ পরিষ্কার করে নিতে পারে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সে অন্তত পক্ষে চাইবে সেটার উপর দিয়ে ডিঙিয়ে যেতে।

এক একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ সেবার জন্য মজুররা তাকে ভালবাসে। তার মধ্যের সংসার-ছাড়া সন্ন্যাসীটিকে বলীরামপুরের গেরস্থরা শ্রদ্ধা করে ; তাদের বাড়ির মেয়েরা করে ভক্তি। তার অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা আর দূরদৃষ্টির জন্য তার পার্টির লোকের সে আস্থাভাজন। আর কারখানার মালিকের দিকের লোকেরা তাকে ভয় করে, যত্নে

থেকে তারা জেনেছে যে এই লোকটার অনমনীয় বিবেক পয়সা দিয়েও কেনা যায় না।

বিনা যুক্তিতে শিউচন্দ্রিকার মন কোনো জিনিস নেয় না, কিন্তু তার যুক্তির স্রোত চলে বাঁধা খাতে। তার প্রতিবেশের প্রত্যেক জিনিস, প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক লোক, তার পার্টির ভাল কিংবা মন্দ করবার; সুবিধা কিংবা অসুবিধা করবার উপকরণ মাত্র। তা ছাড়া তাদের আর কোনো নিজস্ব সত্তা নেই। তার চিন্তার বাঁধা লাইনে পার্টির সুবিধা-অসুবিধা আর জনতার ভাল-মন্দর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। জন-সাধারণের যথার্থ মঙ্গল করবার একচেটিয়া অধিকার শিউচন্দ্রিকা মতে আছে কেবল তার পার্টির। এই সোজা কথাটা যারা স্বীকার না করে নেয়, তারা জনতার শত্রু। তাদের সঙ্গে অযথা কথা খরচ করবার সময় শিউচন্দ্রিকার নেই।

সত্যিই এক মিনিটও তার সময় নেই। রাতে ডায়েরি লিখবার সময় একখানা কাগজে লিখে রাখে কালকের কাজগুলো। একটুও নড়চড় হওয়ার জো নেই তাতে, একথা তার বন্ধু-বান্ধব সকলেই জানে। ঘড়ির কাঁটার মতো দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কাজে সে বিরামহীন, আর ক্লান্তিহীন। তার পরিচিত সকলের কাছেই সে আশা রাখে তার নিজেরই মতো নিয়মানুবর্তিতার।

শিউচন্দ্রিকার ব্যবহারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় অভিমন্যুর বেলায়। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কারও একথা অজানা ছিল না। পার্টির সদস্যরা এই নিয়ে ঠাট্টা করলে শিউচন্দ্রিকা হেসে বলত,—'অনেক চেষ্টা করবার পর আমি হাল ছেড়েছি। এ জীবনে ও এক চুলও বদলাবে না, যা আছে তাই থাকবে। মইয়ের সব চাইতে নিচের ধাপে যে বসে আছে তাকে আর নাবাবে কোথায়?'

অভিমন্যু গম্ভীর হয়ে পাল্‌টা জবাব দিত—'বা রে! তোমার কোন্ কথাটা শুনি না, বলো? আচ্ছা ধরো, শুনিই না। আমার মাথার কাছে কালিপড়া রূপসী কেরোসিনের আলোটা রেখে, রোজ রাতে পরের দিনের কাজের ফিরিস্তি লিখতে যে বারণ করি তোমাকে, সে কথায় তুমি কান দাও কোনো দিন? তুমিও আমার কথা শোনো না, আমিও তোমার কথা শুনি না। দুজনেই সমানে সমানে আছি দাঁড়ি-পাল্লার ওজনে।'

যত গুরুত্বপূর্ণ কথাই হোক না কেন, অভিমন্যু হেসে সেটাকে হালকা করে দেবেই।

হালকাই তার স্বভাব। হেসেই কাটিয়ে দিতে চায় জীবনের পথটাকে। চেষ্টা করে অভিমন্যুকে গম্ভীর হতে হয়, দরকার পড়লে। কোনো জিনিস তলিয়ে সে ভাবে না। কোনো একটা বিষয়ে বেশিক্ষণ লেগে থাকতে হলে তার মন হাঁফিয়ে ওঠে।

যাচ্ছে-যেতে দাও গোছের শান্ত মন্থর জীবনে, মধ্যে মধ্যে দু'কুল ভাঙা প্লাবন আসবে, আর সেই সময় বানের মুখে গা এলিয়ে দেবে দ্বিধাহীন মনে, এই রকম জীবনই তার খেয়ালের সঙ্গে খাপ খায়। তার ভাবপ্রবণতার মধ্যে কৃত্রিমতার ভেজাল নেই; যে ভাবের বন্যায় সে যখন ভাসে, তখন তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। জীবনের উপর তার মায়া নেই, সারা জগৎকে সে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে—কাল কী হবে সে কথা নিয়ে আজ মাথা ঘামাতে চায় না। তবু তার হাত-গোনানোর বাতিক যে কেন তা ভেবে পাওয়া যায় না। তার প্রাণখোলা আপনভোলা ভাবটার জন্যই বোধ হয় আর সকলের মতো শিউচন্দ্রিকাও তাকে ভালবাসত। শিউচন্দ্রিকা আরও হিসাব করে নিয়েছিল যে ইউনিয়নের কাজ

নিয়মিত সুচারুভাবে না করতে পারলেও, অভিমন্যুর মতো মজুরদের সঙ্গে মিশতে আর কেউ পারবে না। পয়সার লোভ দেখিয়ে কারখানার মালিক তাকে কিনে নিতেও কোনো দিন পারবে না। সে আরও জানে যে ঠিক ভাবে তাতাতে পারলে অভিমন্যু বন্দুকের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না। পার্টির অন্য সদস্যরা না বুঝুক, শিউচান্দ্রিকা জানে যে, একসঙ্গে এতগুলো গুণ অভিমন্যু ছাড়া, স্থানীয় পার্টি-সদস্যদের মধ্যে কম লোকেরই আছে। বেশির ভাগই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর পর্যন্ত নিজের দিকেই তাকায়।

প্রিয় শিউচান্দ্রিকা বাবু,

ডাকবাংলাতে এখনই আমার সহিত দেখা করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। অভিমন্যু-বাবুকেও সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

কে. প্রসাদ<br>
এস. ডি. ও সদর

২৮. ৯. ৪৬

এস. ডি. ও সাহেবের তকমা-আঁটা আরদালি চিঠিখানা বন্দীরামপুর মজদুর ইউনিয়ন অফিসে, শিউচান্দ্রিকার হাতে দেয়। ঝুঁকে আদব করে বলে, এস. ডি. ও সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

'অভিমন্যু! অভিমন্যু কোথায় গেল, দেখেছ না কি রহমৎ?'

রহমৎ আর রহমতের বিবি দুজনেই মিলে কাজ করে। রহমতের স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা জানতে পেরেই মিল-কর্তৃপক্ষ তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন। এ আজ মাস-খানেক আগেকার কথা। সে সময়েই সে তার পাওনা সাপ্তাহিক মজুরি নিয়ে নিয়েছে মিল থেকে। এত দিনে সেই কথা জানাতে এসেছে ইউনিয়ন অফিসে। সাপ্তাহিক মজুরি তুলে নেওয়ার আগে এলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে লড়াবার সুযোগ হয়। 'যখন বরখাস্ত করেছিল তখন আসতে কী হয়েছিল?'—চটে আগুন হয়ে উঠেছিল শিউ-চান্দ্রিকা। তারপর একখানা দরখাস্ত লিখতে বসে।

এইখানটায় তোমার বিবির বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে এসো। বুঝলে?...কোন ডিপার্টমেন্ট?—সেলাই ডিপার্টমেন্ট বললে না?...'এ সব করাচ্ছে হুজুর রামভরোসা সর্দার। আমি জানি ওকে ইটাগড় মিল থেকে। ও ছিল সেখানকার একজন নাম-জাদা গুণ্ডা। মাইনে দিয়ে রেখেছিল মালিক তাকে। আবার এখানে এসে জুটেছে আমাদের জ্বালাতন করতে। বোধ হয় বেশি মাইনে পেয়েছে এখানকার মালিকের কাজ থেকে ·'

অনর্গল বকে যাচ্ছে রহমৎ।

এস. ডি. ও সাহেবের চাপরাশি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এখন জিজ্ঞাসা করে, হুজুর জবাব লিখে দেবেন না কি?

ও? তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ না কি! এস. ডি. ও সাহেবকে বলে দিও এখনি আসছি আমরা। রহমৎ, তুমি ততক্ষণ দেখো তো অভিমন্যু কোথায়? ডেকে নিয়ে এসো তাকে। বোলো, আমি ডাকছি। শীগ্গিরই। সাহু-ব্যারাকে দেখো। নিশ্চয়ই ওখানে ছেলেদের কোরাস গান শেখাচ্ছে।

রহমৎ অভিমন্যুকে খুঁজতে বার হয়। রহমতের বিবির দরখাস্ত লিখতে লিখতেও

অভিমন্যুর কথাই ভাবে শিউচন্দ্রিকা।…যত বাজে কাজেই মন বসে অভিমন্যুর। কোনো কাজ দায়িত্ব নিয়ে নিয়মিত করবে না।…

শিউচন্দ্রিকা উঁকি মেরে ইউনিয়ন অফিসের বাইরে টাঙানো ব্ল্যাকবোর্ডটা দেখে। তার উপর রোজ সকালে খড়ি দিয়ে খবর লিখে রাখবার ভার অভিমন্যুর উপর। এই ধরনের কাজ দিয়ে অভিমন্যুর আলগা কর্মজীবনকে বাঁধাধরার মধ্যে ফেলতে চায় শিউচন্দ্রিকা।…ছোটখাটো একটা দু'মিনিটের তো কাজ। এটুকুও করে উঠতে পারে না। হাতের কাজ রইল পড়ে, গিয়েছেন ছেলেদের গান শেখাতে!

বিরক্ত হয়ে শিউচন্দ্রিকা ব্ল্যাকবোর্ডটাকে টেনে নিয়ে তার উপর বড় বড় অক্ষরে খবর লিখতে বসে।

'অভিমন্যু!' রাস্তা থেকে কে একজন যেন অভিমন্যুকে ডাকছে। গলা শুনে মনে হচ্ছে সরযূ সিং। একবার এলে সে ঘণ্টাখানের আগে ওঠে না। শিউচন্দ্রিকা তার ডাকের জবাব দেয় না।

সব মজুর অভিমন্যুকে নাম ধরেই ডাকে, কিন্তু শিউচন্দ্রিকাকে নাম ধরে ডাকার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। তাকে ডাকে 'মন্ত্রীজী' বলে। এ দেশের ভাষায় মন্ত্রীজীর মানে সেক্রেটারি সাহেব। অভিমন্যুকে মজুররা যত আপন বলে ভাবতে পারে, শিউচন্দ্রিকার বেলায় তা পারে না। শিউচন্দ্রিকা মজুরদের অন্তরের থেকে ভালবাসে, তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে; কিন্তু একটা মজুরের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে নিছক মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাক তো! সে পারে অভিমন্যু।

যে সরযূ সিং এখন অভিমন্যুকে ডাকছে সে ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। বছর দুই আগে তার গাঁয়ের ঘিনাওন সিং কলে কাটা পড়ে। দুজনে একসঙ্গে এসেছিল বলীরামপুরে কাজ করতে। মজদুর ইউনিয়নের চেষ্টায় ঘিনাওন সিংয়ের স্ত্রী মিল থেকে সাড়ে আটশো টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায়। বিধবা স্ত্রীলোকটি ঐ টাকা শিউচন্দ্রিকার কাছে রেখে যায়; বলে যে অত টাকা একসঙ্গে নিয়ে গেলে শ্বশুরবাড়ির লোকরা কেড়ে নেবে। ঐ টাকা থেকে মাসে মাসে শিউচন্দ্রিকা দশ টাকা করে ঐ স্ত্রীলোকটিকে পাঠায়। সরযূ সিং ঐ বিধবা মেয়েটির একজন সত্যিকার হিতৈষী। মনি-অর্ডারের রসিদ এসেছে কি না সেই কথাটা জানবার জন্য প্রায়ই ইউনিয়ন অফিসে আসে। অভিমন্যুর কাছে সে স্বীকার করেছে যে ঐ মেয়েটির সঙ্গে তার এক রকম বিয়ের ঠিকই ছিল। হঠাৎ ঘিনাওন সিং-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। অভিমন্যু তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে যে সে তার পুরনো প্রিয়ার আঙুলের ছাপ দেখতে এসেছে। মনিঅর্ডার পাওয়ার রসিদ তারপর হাতে দিয়ে হেসে বলে দু'দিন তুমি রাখতে পার এখানা তোমার কাছে, তার পর ফেরত দিয়ে যেও। শিউচন্দ্রিকা সে সময় উপস্থিত থাকলে সরযূ সিং ইশারা করে অভিমন্যুকে চুপ করতে বলে। হাত জোড় করে ফিস ফিস করে বলে, দোহাই তোমার, মন্ত্রীজী শুনছে। আর শিউচন্দ্রিকা না থাকলে হেসে অভিমন্যুর কথা স্বীকার করে নিয়ে রসিদখানা বটুয়াতে পুরে নেয়। তারপর গলা-জড়াজড়ি করে ধরে অভিমন্যুকে চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। এই ছিল মজুরদের সঙ্গের সম্পর্কে শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুর তফাত।

সরযূ সিং শিউচন্দ্রিকাকে কাজ করতে দেখে আর অভিমন্যুর সাড়া না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু খানিক পরেই হাসির শব্দ পেয়ে শিউচন্দ্রিকা বুঝতে পারে যে অভিমন্যু সরযূ সিংকে আবার ধরে নিয়ে আসছে।

কোথায় শিউচন্দ্রিকাকে ব্ল্যাকবোর্ডে খবর লিখতে দেখে একটু অপ্রস্তুত হবে, তা নয়, অভিমন্যু ক্রমেই একমুখ হাসি নিয়ে বলে—'চাবিটা দাও তো আলমারির। মনি-অর্ডারের রসিদটা বের করি। সরযূ সিং বলছে যে একবার হাত বুলিয়ে নেবে আঙুলের ছাপটার উপর।

'ধেৎ!'—সরযূ সিং শিউচন্দ্রিকার সম্মুখে এ-রকম কথায় লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি অফিস ছেড়ে পালিয়ে যায়। বলে যায়, ও-বেলা আসব।

অভিমন্যু হেসে বলে, 'যাক, আজকের ব্ল্যাকবোর্ডের খবরটা লোকে তবু পড়তে পারবে। লক্ষ্য করে থাকবে শিউচন্দ্রিকা যে যারা পড়তে জানে, তারাও আজকাল খবর পড়তে আসে না। আমার শ্রীহস্তের লেখা দেখে ভড়কে গিয়েছে তারা, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। তোমার আর কী, রোজ রাতে যখন পরের দিনের কাজের ফিরিস্তি লেখো, সেই সময় এই কাজের কথাটাও নোট করে নিলেই আপনা থেকে নিয়মিত এ কাজ হয়ে যাবে।'

শিউচন্দ্রিকা হেসে ফেলে। 'নিজের ডিউটি করতে ভুলে গিয়েছ, কোথায় একটু লজ্জা পাবে, তা নয়, আমাকেই এসে উপদেশ দিতে বসলে?'

'আমার ভৃগুখানা আবার বের করাবে না কি? তিনি কোথাও লিখে দেননি যে, আমি কোনো দিন লজ্জা পাব।'

'আচ্ছা হয়েছে, এখন থামো। এই চিঠি দেখ এস. ডি. ও সাহেবের। চলো, যেতে হবে ডাকবাংলা।'

'তাই বল। রহমৎটা গিয়ে আমাকে খবর দিল একেবারে ফাঁসির আসামী তলব করবার মতো করে। দাঁড়াও, দাড়িটা কামিয়ে নিই। এস. ডি. ও সাহেব ডাকল কেন? লেবার কমিশনারের কাছে যে টেলিগ্রাম আর চিঠিগুলো গিয়েছিল তার ফল ধরেছে বোধ হয় এতদিনে।'

'রহমৎ মিঞা, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ডাকবাংলাতে।'

এস. ডি. ও সাহেবই এখানকার ফ্যাক্টরি ইন্‌স্পেক্টর, আলাদা ফ্যাক্টরি ইন্‌স্পেক্টর এ সাব-ডিভিশনে নেই। তাই এখানকার মিল মালিকরা নূতন এস. ডি. ও এলেই তাঁকে প্রথম হাত করবার চেষ্টা করে, কাউকে মদ খাইয়ে, কাউকে টাকা দিয়ে, কারও বা অন্য দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। যা চাও সব জিনিসই ইশারা করা মাত্র পেঁছে যাবে ডাকবাংলাতে।

সেই জন্য বলীরামপুর ডাকবাংলাটি নিত্য তিরিশ দিন সরগরম থাকে ছোট বড় রঙ-বেরঙের হাকিমের ভিড়ে। পদ অনুযায়ী মর্যাদা দেখানো হয় প্রত্যেককে। এস. ডি. ও সাহেব আর তাঁর উপরের অফিসারদের বিকালে আমন্ত্রণ আসে ম্যানেজার সাহেবের কুঠির 'লন'-এ টেনিস খেলার জন্য। তার নিচের হাকিমদের নিমন্ত্রণ দেন মিলের সর্বেসর্বা এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ। আর চুনোপুঁটি—সরকারী কর্মচারী যাঁদের ডাকবাংলাতে উঠবার অধিকারই নেই, তাঁদের খাওয়া-দাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে মিলের তরফ থেকে। এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট; বেশি ঘাঁটানো ঠিক নয় উপরওয়ালার আলাপী লোকদের।

বর্তমানে এস. ডি. ও সাহেবের কিছু দিন থেকে বলীরামপুর ডাকবাংলাতে আসা খুব বেড়ে গিয়েছে। মজুররা না কি ভারি 'trouble' দিচ্ছে, তারই অজুহাতে। দিনটা না হোক অন্তত রাতটা এখানকার ডাকবাংলাতে কাটানোর লোভ তিনি সামলাতে পারেন না। এই নিয়ে জেলাসুদ্ধ লোক কানাঘুষো করে, এখানকার

মজদুরদের তো কথাই নাই। কটাক্ষের লক্ষ্য বলীরামপুরের অনাথালয়ের মেয়েদের উপর। মিলের এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ এই অনাথালয়ের 'প্রেসিডেণ্ট'।

এই সব নিয়ে এস. ডি. ও আর অন্যান্য হাকিমদের বিরুদ্ধে প্রচুর বেনামী চিঠি গিয়েছে পাটনার উপরওয়ালাদের কাছে। আর মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পাটনার লেবার কমিশনারের কাছে গিয়ে শিউচন্দ্রিকা বলে এসেছে যে, এই এস. ডি. ও-র কাছ থেকে বলীরামপুরের মজদুররা ন্যায়বিচার পেতে পারে না। ইঙ্গিতে কারণটাও বলেছিল। আর দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে মজদুরদের সস্তায় খাওয়ার 'ক্যাণ্টিন', আর মেয়ে মজদুরদের কাজের সময় ছোট ছেলেপিলেদের রাখবার স্থান (ক্রেশে) মিলের তরফ থেকে খুলবার জন্য লেবার কমিশনার সাহেব হুকুম দিয়েছিলেন, গতবার যখন আসেন বলীরামপুরে তখন। আদেশ ছিল ছয় মাসের মধ্যে যেন খোলা হয়; তা আজ পর্যন্ত হয়নি। তাঁরই অফিসের ফাইলের চিঠি শিউচন্দ্রিকা লেবার কমিশনার সাহেবকে দেখিয়ে দিয়েছিল,—মিল-ম্যানেজার ম্যাকনীল সাহেব লিখেছে যে 'সিমেণ্ট, লোহার শিক, ইট ইত্যাদি বাড়ি তৈয়ারি করিবার মাল না পাওয়ায় আপনার হুকুম তামিল করা সম্ভব হইতেছে না। ঐ সকল জিনিস পাওয়া গেলে বাড়ি তৈয়ারির কাজ আরম্ভ করিতে এক মুহূর্তও দেরি করা হইবে না।' এর পর শিউচন্দ্রিকা দেখিয়ে দেয় কাগজে-কলমে যে এস. ডি. ও সাহেবের সাহায্যে গত বছরে বাড়ি তৈরি করবার মাল-মশলা মিল ম্যানেজার কত পেয়েছে? ম্যানেজার সাহেবের নূতন টেনিস কোর্ট হল কোথা থেকে? এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের একটা নূতন কোয়ার্টার আর অন্য অফিসারদের আর তিনটে কোয়ার্টার তৈরি করবার জিনিস-পত্র সে পেল কোথা থেকে? এ ছাড়াও আরও কিছু অবশিষ্ট লোহার শিক আর সিমেণ্ট ব্ল্যাকমার্কেটে বেচেছে এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার।

লেবার কমিশনার সংযত ভাষায় শিউচন্দ্রিকাকে বারণ করে দেন এ সব কথা বলতে—যা প্রমাণ করতে পারবেন না সে সব কথা বলে লাভ কি? তাতে কি আপনার কাজ এগোবে?

নিশ্চয়ই প্রমাণ করব স্যার। প্রতিটি কথার পুরো দায়িত্ব নিয়ে আমি বলেছি! এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদের শালার দোকান আছে সদরে। কবে কোন গাড়োয়ান কী কী মাল নিয়ে গিয়েছে মিল থেকে সেই দোকানে, সব হিসাব দিতে পারি আপনাকে। তিন জন লোক যারা ঐ দোকান থেকে বেশি দাম দিয়ে সিমেণ্ট কিনেছে, তাদের দিয়ে দরকার হলে আপনার সম্মুখে বলাতেও পারি। এ সব ব্যাপার এস. ডি. ও সাহেব জানেন স্যার। তিনি কড়া হলে কি আর আপনার হুকুম তামিল করে না একটা মিল-ম্যানেজার? এই হত ডিভিসনাল কমিশনার সাহেবের হুকুম, দেখতাম এস. ডি. ও সাহেব কী রকম করে সেটাকে অমান্য করতেন।

লেবার কমিশনার সাহেবের আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছিল।

তার পরই এস. ডি. ও সাহেব বলীরামপুর ডাকবাংলাতে এসে শিউচন্দ্রিকাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তারা যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। উপরের কড়া চিঠি পেঁছেছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এস. ডি. ও সাহেবের সম্বন্ধে।

ডাকবাংলাতে গিয়ে দেখে যে এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদও চা খাচ্ছেন বসে, এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে। রহমৎ ডাকবাংলার সিঁড়ির উপর বসে থাকে।

এই যে সেক্রেটারি সাহেব, আসুন! ভাল তো অভিমন্যু বাবুজি? বেয়ারা, আর

দু'কাপ চা। দেখা যাক, এক টেবিলের চায়ের ধোঁয়ায় আপনাদের দু'পক্ষের সাপে-নেউলের সম্বন্ধ ঢাকতে পারে কি না, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।' এস. ডি. ও সাহেব নিজের রসিকতায় নিজে হাসতে আরম্ভ করায় জয়নারায়ণ প্রসাদও ভদ্রতার খাতিরে সে হাসিতে যোগ দেয়।

'না, না, চায়ের দরকার নেই। আমরা চা খাই না।' শিউচন্দ্রিকার গলার স্বর এত দৃঢ় যে এস. ডি. ও আর তাকে অনুরোধ করতে ভরসা পান না।

তবু বলেন, 'আমরা বলছেন কেন, আমি বলুন। অভিমন্যুজী, আপনি নিশ্চয় খাবেন এক কাপ?'

জয়নারায়ণ টিপ্পনী কাটে, 'মিল-মালিক খাওয়ালেও আপনাদের মতো লোকের আপত্তি না করে খেয়ে নেওয়া উচিত, অবশ্য যদি পেটের গোলমাল না থাকে। এক পেট খাইয়ে যদি আপনাদের কিনে নিতে পারত, তাহলে নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ ছিল খাওয়ার। আর এ খাওয়াচ্ছেন আপনাকে এস. ডি. ও. সাহেব, মিল-মালিক নয়। তাও আবার কেবল এক কাপ চা। আমরা চাকর মানুষ, এ-আপত্তির কারণ আমরা বুঝতে পারি না সেক্রেটারি সাহেব।'

সাপ আর নেউল দুজনেই মেজাজে আছে আজ। কিন্তু এস. ডি. ও সাহেব আজ অন্য চাল চালবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছেন।

অভিমন্যুর মনে হয়, জয়নারায়ণ প্রসাদ ঠিক কথাই বলছেন। শিউচন্দ্রিকার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। একে শুচিবাই ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না সে। শিউচন্দ্রিকা কি রহমৎ বাইরে সিঁড়িতে বসে আছে বলে চা খেতে অস্বীকার করছে? না সেখান থেকে তো ঘরের ভিতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। ...তিলকে তাল করা অভ্যাস শিউচন্দ্রিকার। শীতকালের দিনে এক কাপ চা খাবে, তাই নিয়ে একটা হৈ-চৈ করা, অনুনয়-বিনয়ের পালার সুযোগ দেওয়ার কী দরকার ছিল? চটুক শিউচন্দ্রিকা। তার খেয়াল মিটোবার জন্য অভিমন্যু সম্ভাব্য শিষ্টাচার ছাড়তে পারে না।...

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকার মুখ চোখ লক্ষ্য করে, তারা চা খাওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে গেল না তো? শিউচন্দ্রিকার চোখে মুখে কোনো বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায় না। 'যাক! অভিমন্যু নিশ্চিন্ত হয়,—তার সঙ্গে থেকে থেকে তার বন্ধু তাহলে এ ভদ্রতাটুকু শিখেছে।

হাকিম জিজ্ঞাসা করেন, 'চিনি ঠিক আছে? না আর একটু দেব, অভিমন্যুজী?'

'আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক। তাতে আবার কাজ করি মজুরদের মধ্যে। চা খাই খানিকটা চিনি আর দুধের লোভে। দিন, আর এক চামচ।'

'আর এই চিনির উপর এত লোভ বলেই তো দেখতে পাই যে আপনার ওখান থেকে এক বস্তার পারমিট প্রতি মাসে পাওয়া সত্ত্বেও গুড় মিলিয়ে 'কেশরপাক' তৈরি করতে হয় অভিমন্যুজীকে'—রসিকতার ছলে জয়নারায়ণ প্রসাদ আজকের এই ব্রহ্মাস্ত্র শত্রুর অন্তর্কি'তে প্রথমেই ছুঁড়ে মারেন।

এর একটা ইতিহাস আছে। বলীরামপুরের অধিকাংশ মজুর এখনও ইউনিয়নের চাঁদা দিতে চায় না, অথচ তাদের শিউচন্দ্রিকার উপর অগাধ বিশ্বাস। ১৯৩৭ সালে এখানে যখন প্রথম ইউনিয়ন হয়, তখন অনেক টাকা চাঁদা উঠেছিল। তারপর একটা মেয়ে সংক্রান্ত গোলমালে পড়ে সেই ইউনিয়নের সেক্রেটারি ইসরাইল মিয়াকে মার খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে যেতে হয়। তিনি যাবার সময় টাকাগুলো সঙ্গে নিয়েই গিয়ে-ছিলেন। এরপর দ্বিতীয় মজুর ইউনিয়ন করেছিল আমীরচন্দ। বেশ চলছিল

ইউনিয়ন। কিছু দিন পর মজুরদের মধ্যে কানাঘুষো শোনা যায় যে সে মিল মালিকদের কাছ থেকে টাকা খেতে আরম্ভ করেছে। একটি মিটিং-এ মজুররা প্রকাশ্যে তাকে 'ভাড়াটে দালাল' বলে গালাগালি দেয়, আর মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে বলে ভয় দেখায়। সেই রাতেই সে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। এই সব নানা কারণে এখানকার বর্তমান ইউনিয়নটি শক্তিশালী হলেও তার অর্থবল কম ; খরচ চলে না। শিউচাঁদ্রকার মত যে, আরও কিছু দিন মজুরদের উপর চাপ না দেওয়া ভাল ; এমনিই তো মিল-মালিকের দালালরা চব্বিশ ঘণ্টা বলে বেড়াচ্ছে যে, মজুরদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা পয়সা ভাঁওতা মেরে লুঠে নেওয়ার জন্য এসেছে এই ইউনিয়নওয়ালারা। বিশ্বাসপ্রবণ মজুরদের মনে এ কথা যে একটুও সাড়া দেয় না তা নয়। তাই শিউচাঁদ্রকার এত সতর্কতা। কিন্তু মজুরদের উপর চাপ না দিলে ইউনিয়নের খরচ চলবে কী করে? শিউচাঁদ্রকা গুছিয়ে আইন বাঁচিয়ে হিসাবপত্র লেখে বলেই রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের নিয়ম-কানুন বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে আজ পর্যন্ত। প্রথম প্রথম যখন খরচের টাকা জুটোনোর কথা ওঠে, তখন অভিমন্যুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে। তার কাকা ছিলেন, 'বৈদ' অর্থাৎ গাঁয়ের হাতুড়ে বদ্যি। তাঁর কাছেই অভিমন্যু 'কেসরপাক' নামের জিনিসটা তৈরি করতে শেখে। 'কেসর' মানে জাফরান। লোকে ভাবে জাফরান দিয়ে তৈরি হয় 'কেসরপাক' অথচ এতে জাফরানের নাম গন্ধও নেই। চিনি কিংবা গুড়, চীনাবাদামের কুচি, ছোলার বেসম, কপূর, ছোট এলাচ, খয়ের আর দুই একটি কিসের যেন শিকড় না ছাল দিয়ে এক রকম হালুয়ার মতো জিনিস তৈরী করা হয়। এরই নাম 'কেসরপাক'। খুব শক্তিবর্ধক জিনিস বলে এর নাম আছে। অভিমন্যু প্রতি সপ্তাহে এক দিন করে কেসরপাক তৈরি করা আরম্ভ করল ইউনিয়ন অফিসের উঠোনে। এগুলো দিয়ে আসে স্থানীয় অনাথালয়ে। অনাথালয়ের হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলেরা এ লাইনের প্রতি ট্রেনে তালা দেওয়া চাঁদার বাক্স, কোন এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দেওয়া প্রশংসাপত্র আর চাঁদা-সংগ্রহের রসিদ বই নিয়ে মুখস্থ করা লেকচার দিত। এরপর থেকে তারা প্যাকেটে করা 'কেসরপাক' এর বরফিও বিক্রি করতে আরম্ভ করে। এর আয়টা নিয়ে আসে অভিমন্যু ইউনিয়ন অফিসে। অনাথালয় বিক্রির উপর কিছু কমিশন পায়। অনাথালয়েরও টাকার দরকার, তাই অনাথালয়ের প্রেসিডেন্ট জয়নারায়ণ প্রসাদ বারণ করতে পারেনি এ জিনিস বেচা। এ রকম করে ইউনিয়নের জন্য টাকা যোগাড় করা, না শিউচাঁদ্রকা, না অভিমন্যু, কেউই পছন্দ করত না। কিন্তু উপায় কি? অফিস চালাতে হবে। পার্টি টাকা দেবে না। লোকে চাঁদা দেবে না। কেবল বললেই তো হল না। এই 'কেসরপাক' তৈরি করার জন্য প্রতি মাসে এক বস্তা করে চিনির 'পারমিট্' নিয়ে আসে অভিমন্যু, এস. ডি. ও সাহেবের কাছ থেকে। কী করে আনে, কোথা থেকে আনে, এসব অবশ্য শিউচাঁদ্রকা কোনো দিন অভিমন্যুকে জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করেনি।

এই চিনির কথাই তুলেছিলেন জয়নারায়ণ প্রসাদ ডাকবাংলার চায়ের টেবিলে। সাপ আর নেউল এস. ডি. ও সাহেবের ফরমাশ সত্ত্বেও নিজের নিজের স্বভাব ভুলতে পারেনি। এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের কথার ইঙ্গিত ছিল যে চিনিটা এনে ব্ল্যাকমার্কেট করা হয়, আর গুড় দিয়ে 'কেসরপাক'-এর কাজ সারা হয়। দ্বিতীয়ত তিনি মনে করিয়ে দিতে চান দাম্ভিক শিউচাঁদ্রাটাকে যে, যে অনাথালয়ের মেয়েদের নিয়ে তোমাদের মধ্যে এত কানাঘুষো, এত হাকিমদের বিরুদ্ধে কেচ্ছা, এত বেনামী চিঠি, তোমরাও তো বাপু এর সঙ্গে জড়িয়ে ন্যাজে-গোবরে হয়ে রয়েছ।

এই 'কেসরপাক'-এর ব্যাপারটাই বর্তমান ইউনিয়নের কার্যকলাপের একমাত্র অশোভন অধ্যায়। এইটারই সুযোগ নিতে চায় এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

কথাটা শুনেই শিউচন্দ্রিকার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে। অভিমন্যু ভয়ে তটস্থ হয়ে যায়—এই বুঝি শিউচন্দ্রিকা চিৎকার করে বলে ওঠে যে, ম্যাকনীল সাহেবের পা-চাটা রোজগারের চেয়ে এ অনেক সম্মানজনক। শিউচন্দ্রিকা অতটা বোকা নয়। সে বোঝে যে জয়নারায়ণের কথাটার মধ্যেও ইঙ্গিত এত সূক্ষ্ম যে, গায়ে পড়ে জবাব দেওয়া ভাল দেখায় না।

এস. ডি. ও সাহেব এ কথায় খুশী কি দুঃখিত ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো আগে থেকেই জয়নারায়ণ প্রসাদের সঙ্গে এ সব কথা হয়ে থাকবে। তবে তিনি এখন আর ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ করছেন না। ছা-পোষা মানুষ তিনি, চাকরি-অন্ত প্রাণ। এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক কর্মীগুলো, তোমার চাকরিতে ভাল করতে না পারুক, মন্দ করতে পারে ঠিকই। তাই কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্য বলেন, 'চলুন সেক্রেটারী সাহেব, আজ মিলের ভিতর। আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। যে 'ক্যান্টিন' আর 'ক্রেশে'র (শিশুদের যে স্থানে রেখে সযত্নে দেখাশুনা করা হয়) দাবি ছিল আপনাদের, তার জন্য লোক নেওয়া হবে আজ। তাছাড়া কোথায় হবে, কেমন ভাবে চালানো হবে সব আপনারা সলা-পরামর্শ দেবেন; যাতে এই একই বিষয় নিয়ে বেশি বার দৌড়াদৌড়ি করতে না হয় আমাদের। বলীরামপুরের মজুরদের ছাড়াও আমার সাব-ডিভিশনে অনেক কাজ আছে।'

শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যু দুজনেই বোঝে যে উপরওয়ালার গুঁতো খেয়েছেন হাকিম সাহেব।

'একজন মিলের মজুর বাইরে বসে আছে। সে-ও সঙ্গে যাবে তাহলে আমাদের।' —এই বিষয়টায় শিউচন্দ্রিকার স্থির মত আছে। কোনো ইউনিয়নের কর্মী মিলের ভিতর গেলেই এক-আধ জন মিল-মজুরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এই অলিখিত নিয়ম শিউচন্দ্রিকা নিজেই জারী করেছে তার সাথীদের মধ্যে। তা না হলে মজুরদের সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মন, কোন কর্মীর সম্বন্ধে কখন কী ভেবে নেয় বলা যায় না! আমীরচন্দের কথা মজুররা আজও ভোলেনি। যে শিউচন্দ্রিকাকে আজ মজুররা মাথায় করে রেখেছে, একটা কোনো গুজব রটলেই কাল তাকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দিতে তারা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না।

এস. ডি. ও সাহেবের গাড়িতে করেই তারা সকলে মিলের ভিতরে যায়।

জনকয়েক দাই (ঝি) ছাড়া আরও দুজন মহিলাকে চাকরিতে নেওয়া হবে; একজন থাকবেন 'ক্যান্টিন'-এর মেয়ে-মজুরদের খাওয়ার চার্জে, একজন 'ক্রেশে'র ছেলে-পিলেদের চার্জে। তাদের জন্য নতুন কোয়ার্টার তৈরি হয়ে গিয়েছে, এস. ডি. ও সাহেবকে দেখানো হল। আসলে দেখানো হল শিউচন্দ্রিকাকে; সে যে পাটনার উপরওয়ালাদের খবর দিয়েছিল যে মিল-মালিক বাড়ি তৈরী করবার মাল-মশলা নিয়ে ব্ল্যাকমার্কেট করেছে, সে খবরও তাহলে এদের কানে গিয়েছে। আশ্চর্য!

—হাসপাতালের বাইরের টিনের শেডটাতেই তাহলে এখন ছেলেপিলেদের জন্য 'ক্রেশে' হোক, কী বলেন? গরম হবে বলছেন? আচ্ছা এখন তো শীতকাল আছে। ভত দিনে দেখুন না নতুন ঘর তোলার ব্যবস্থা করা যায় কি না। 'ক্যান্টিন'-এর শেডটা একটু পায়খানার কাছে হয়ে যাচ্ছে না? ক্যান্টিন-এর ঠাকুরগুলো জুটোলেন কোথা থেকে ম্যানেজার সাহেব? আজকাল ঠাকুর-চাকর পাওয়া যা শক্ত হয়ে

দাঁড়িয়েছে আর বলবেন না। এমন মাস নেই যে মাসে একবার করে ঠাকুর পালায় না।···

যাক, এ সব পর্ব কোনো রকমে শেষ হয়। শিউচন্দ্রিকা মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে।—তবু এটুকুও তো হল এখনকার মতো। কিছু দিন যেতে দাও, তারপর আবার এগুলোর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে হৈ-চৈ আরম্ভ করলেই হবে।

সকলে মিলে এসে অফিসঘরে বসে। ম্যাকনীল সাহেব গিয়েছে কলকাতায়, শনিবারের রেস খেলতে। আজ জয়নারায়ণ প্রসাদই মিলের একচ্ছত্রাধিপতি।

'এইবার ঐ চাকরি দুটো সম্বন্ধে আপনারা আপনাদের মতামত দেন।'

'ওর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গিয়েছিল না কি?'

'আমরা কি আর বসে আছি'—জয়নারায়ণ প্রসাদ একখানা ফাইল খুলে সকলের সম্মুখে রাখে, দেওয়ানী আদালতের নীলামি ইস্তাহার ছাপানোর একখানা চার পাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'এই দেখুন লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া জায়গাটা। পর-পর দু'সপ্তাহের কাগজে বেরিয়েছে এই বিজ্ঞাপন'···

'হাঁ, দুখানি আবেদন পত্র এসেছে এই চাকরি দুটির জন্য। আজকে তাদের 'ইন্টারভিউ' এর জন্য ডাকাও হয়েছে। তাঁরা পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের ডাকি? কিছু বলবার আছে না কি মন্ত্রীজী!'

'না। আর যখন কোনো দরখাস্তই নেই···'

'চাকরিতে কর্মচারীকে নিযুক্ত করবার সম্পূর্ণ অধিকার মিল-কর্তৃপক্ষের। কিন্তু আমরা একে অধিকার বলে মনে করি না, দায়িত্ব বলে মনে করি। ম্যাকনীল সাহেব কলকাতায় যাওয়ার সময়ও বলে গিয়েছে যে কই সব মজুরদের 'ওয়েলফেয়ার সার্ভিস' সংক্রান্ত ব্যাপারে, সেওচন্দ্রিকাকে কনসাল্ট করতে। আপত্তি থাকে তো বলবেন।'

শিউচন্দ্রিকার মাথায় তখন ঘুরছে রহমতের বিবির কথাটা। রহমৎটা এখনও বাইরে বসে রয়েছে। ক্রেশে কিংবা ক্যান্টিনে তারা যাকে ইচ্ছা চাকরি দিক। কিন্তু সন্তান-সম্ভবা মজুরণীকে বরখাস্ত করে দেবে, সেটি হতে দিচ্ছি না। এ একটা মৌলিক দাবির প্রশ্ন। দু'মাসের মজুরি পুরো আদায় করতে হবে এদের কাছ থেকে। ইউনিয়ন অফিসে সে দরখাস্ত দিয়েছে।

বেয়ারা একজন ভদ্রমহিলাকে পথ দেখিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে।

'নমস্কার!'

'নাম কী?'

'মিনাকুমারী।'

'লেখা-পড়া কত দূর করেছেন?'

'হিন্দীতে সব কাজই চালাতে পারি।'

'হিসাব লিখতে পারেন? এক সের চাল রাঁধলে কতখানি আন্দাজ ডাল রাঁধবেন?'

সব প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়। 'আচ্ছা বসুন আপনি। এইবার ক্রেশের চাকরিটার জন্য আবেদন-পত্র নেওয়া যাক, কী বলেন? বেয়ারা!'

আর একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢোকে। 'নাম?'

'রুক্মিণীদেবী'

'থার্মমিটার দেখতে জানেন? এরারুট কি করে তৈরি করবেন বলুন তো?'

'দুজনই যোগ্য, কী বলেন সেক্রেটারি সাহেব?'

শিউচন্দ্রিকা দেখে যে দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল। ভদ্রঘরের মেয়ের মতোই সাজ-পোশাক। কথাবার্তাও বেশ ভাল। সে কেবল জিজ্ঞাসা করে, 'কবে থেকে এঁরা জয়েন করবেন ?'

'এই পয়লা থেকে। পারবেন তো আপনারা ? আচ্ছা তাহলে যান আপনারা। পয়লা থেকে, বুঝলেন ? কালই চিঠি চলে যাবে আপনাদের নামে। হাঁ একটা কথা, বিজ্ঞাপনের সর্ত ভাল করে দেখে নিয়েছেন তো ? মিল-কম্পাউণ্ডের ভিতর একই কোয়ার্টারে দুজনকে থাকতে হবে। যত দিন চাকরি করবেন বিয়ে করা চলবে না। যদিই বা বিয়ে করেন, স্বামী কিংবা ছেলেপিলে নিয়ে মিলের ভিতর থাকতে দেব না আমরা। বুঝলেন ?'

ভদ্রমহিলা দুজন ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দেন যে কথাটা তাদের হৃদয়ংগম হয়েছে। তারপর উপস্থিত সকলকে নমস্কার করে তাঁরা বেরিয়ে যান ঘর থেকে। শিউচন্দ্রিকার মতো লোকেরও নজর এড়ায় না যে মিনাকুমরী নামের মেয়েটার তনু দেহ দৃঢ় অথচ নমনীয়—ঠিক বেতের মতো। আর রুকণী বলে মেয়েটার চোখের কোলে মোটা করে সুর্মা দেওয়া ; চলে যাওয়ার সময় মেয়েটা যখন এস. ডি. ও সাহেবের দিকে তাকিয়ে-ছিল তখন লক্ষ্য করেছিল শিউচন্দ্রিকা।

অভিমন্যু একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ। সে জানে যে তাকে এখানে ডাকা হয়েছে ভদ্রতার খাতিরে—শিউচন্দ্রিকার লেজুড় হিসাবে। তার মতামতের জন্য এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বা এস. ডি. ও সাহেব কেউই বিশেষ উদ্‌গ্রীব নন। হয়তো তাকে ডাকা হয়েছিল, তাকে উপলক্ষ করে 'কেসরপাক'-এর চিনির কথাটা পেড়ে প্রথমেই শিউচন্দ্রিকাকে মুষড়ে দেওয়ার জন্যে।

প্রথমটায় তার এই ধারণাই হয়েছিল। মিনাকুমরী আর রুকণীকে দেখবার পর সে আসল কারণটা বুঝতে পারে। দুটি মেয়েই এখানকার অনাথালয়ের। 'কেসর-পাক' দিতে গিয়ে কত দিন দেখেছে তাদের অভিমন্যু। এরাই অনাথালয়ের সারা গেরস্থালির কাজ দেখাশুনো করে। মিনাকুমারী 'কেসরপাক'-এর হিসাব রাখে। এই রুকণী আর জয়নারায়ণ প্রসাদের সম্বন্ধে হাসি-মস্করা করতে শুনেছে সে অনাথালয়ের অকালপক্ক ছেলেদের,—ঐ যেগুলো হাফপ্যাণ্ট পরে ট্রেনে-ট্রেনে 'কেসরপাক' বিক্রি করে বেড়ায় ! অথচ এস. ডি. ও সাহেব কিংবা এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার কেউই এমন ভাব দেখাল না যে এরা তাদের কারও পরিচিত ! আহা, বেচারিরা চাকরি দুটো পেলেই অভিমন্যু সন্তুষ্ট হয়। তাহলেই এক এদের অনাথালয়ের জীবন শেষ হতে পারে।...অনাথালয়ের নাম শুনলেই তো এখনই শিউচন্দ্রিকা আপত্তি করবে এদের নিযুক্তির সম্বন্ধে—যতই কেসরপাক বিক্রির বিষয় নিয়ে উপকৃত থাক না কেন ইউ-নিয়ন অনাথালয়ের কাছে। শিউচন্দ্রিকার মুখ বন্ধ করবার জন্যই বোধ হয় জয়নারায়ণ প্রসাদ ডাকবাংলাতে চিনির কথাটা তুলেছিল।...এই বুঝি শিউচন্দ্রিকা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি কোথায়।

...যাক, শিউচন্দ্রিকা সে কথা জিজ্ঞাসা করেনি। অভিমন্যু নিশ্চিন্ত হয়। অনাথালয়ের মেয়েদের খারাপ বলে লোকে, কিন্তু সে তো এত দিন কেসরপাক নিয়ে যাতায়াত করছে অনাথালয়ে, কোনো দিন কিছু খারাপ তো তার নজরে পড়েনি। 'কেসরপাক'-এর সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশ করবার সময় নম্র সংযত ব্যবহার দেখেছে মিনাকুমারীর।...

ঘর থেকে যাওয়ার সময় মিনাকুমারীর দৃষ্টিতে সাফল্যের উল্লাসের মধ্যেও

অভিমন্যুর প্রতি ধন্যবাদ যেন ফুটে উঠেছিল ; অন্তত সেইরকমই অভিমন্যুর মনে হয়।
এতক্ষণে শিউচান্দ্রিকা তার আসল কাজের কথা পাড়ে ; রহমতের বিবির দরখাস্তের কথা। এই কথাটাই তার মনের মধ্যে ঘুরছে সকাল থেকে।

আজ জয়নারায়ণ প্রসাদ উদারতায় মুক্তহস্ত। শিউচান্দ্রিকা আজ যা বলে তাতেই তিনি রাজী। 'বিশ্বাস করুন মন্ত্রীজী, আমরা জানতাম না যে সে সন্তানসম্ভবা। বোধ হয় সর্দার টের্দারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকবে। রামভরোসা সর্দার বলছেন যে ওর পিছনে লেগেছে ? না না, সে ও-ধরনের লোক নয়। নিশ্চয়ই অন্য কিছু ব্যাপার ঘটে থাকবে। যাক গে, দু'মাসের মজুরির কথা বলছেন তো ? আর তো কিছু নয় ? লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করে আপনাদের এই মিল। রহমতের বিবির দু-মাসের মজুরি দিতে আর ক'টাকা খরচ ? বলেন তো মন্ত্রীজী তাকে এই 'ক্রেশে'তে দাইয়ের কাজ দিয়ে দিই। তার জন্যও তো লোক লাগবে। আরামের কাজ, বাঁধা মাইনে, ভাল চাকরি।'...

শিউচান্দ্রিকা মনে মনে হিসাব খতিয়ে দেখে। রহমতের বিবিকে এই চাকরীতে না ঢুকিয়ে বাকি মজুরি পাইয়ে দিলে ভবিষ্যতে সে মজুরণীদের মধ্যে ইউনিয়নের কাজে সাহায্য করতে পারে। আর যদি এই চাকরিতে ঢোকানো যায় তাহলে তার কাছ থেকে 'ক্রেশে' আর 'ক্যান্টিন'-এর কাজের আর চুরির অনেক খবরাখবর সব সময়েই পাওয়া যাবে।

'আচ্ছা স্যার, রহমতের বিবিকে জিজ্ঞাসা করে তারপর আপনাকে খবর দেব।'

শিউচান্দ্রিকা, অভিমন্যু, আর রহমৎ তিন জনই সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরা মন নিয়ে মিল গেটের বাইরে আসে। এস. ডি. ও সাহেব টেনিস খেলবার জন্য ভিতরেই থেকে যান। সে সম্বন্ধে মন্তব্য করাও আজ আর কেউ প্রয়োজন মনে করে না।

'তোমার চিঠি পেয়েছি। আজ সন্ধ্যার পর অনাথালয়ে যাব হেঁটে। রুকণী আগেই চলে যাবে রিক্‌শ্যাতে। দেখা করো।

'তোমার মিনাকুমারী
১৯-২-৪৭

এ দলিলখানা শিউচান্দ্রিকা পেয়েছিল অভিমন্যুর ঝোলার মধ্যে থেকে। প্রথমে বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা।...মেয়েলি হাতের লেখা।

সযত্নে বাঁচিয়ে তুলে রেখেছিল এখানাকে অভিমন্যু। ভৃগুর গণনার কাগজখানার মতোই এখানিরও মূল্য ছিল তার কাছে। অথচ এর কথা ঘুণাক্ষরেও কোনো দিন বলেনি অভিমন্যু কারও কাছে। সময়ে বললে হয়তো তার জীবনের রূপ বদলে যেতে পারত। আগে এটা ছিল তার গোপন কথা ; একান্ত আপন কথা ; যার চিঠি তাকে ছাড়া আর বলা চলে না। পরে যেদিন এই মধুর গোপন কথাটা এক কুৎসিত নগ্ন রূপ নিয়েছিল এক অপ্রত্যাশিত পরিবেশে, সেদিন সে এই চিঠিখানা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাবে দিতে পারত। ঐ অবস্থায় পড়লে ঐ রকম পাল্টা জবাব দিয়ে জয়নারায়ণ প্রসাদের মুখ বন্ধ করতে পারত হয়ত শিউচান্দ্রিকা। কিন্তু অভিমন্যু অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। পার্টির ভাল-মন্দর মানদণ্ড ছাড়াও অন্য মাপকাঠির খোঁজ সে রাখে। তার সূক্ষ্ম শালীনতাবোধ তাকে বিরত করেছিল আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে চিঠিখানা ব্যবহার করা থেকে। সে তখন তার পৌরুষের অপমানে—ভালবাসার অপমানে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল ; উত্তর দিত কী করে ?

শিউচন্দ্রিকা ভাবে যে অভিমন্যু সময়ে বলেনি কেন এ কথা।…শিউচন্দ্রিকার ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে কিন্তু দরদী মন নেই। ক্ষুর দিয়ে চুল চেরা যায়, কিন্তু কুঁচ-বরণ কন্যের মেঘবরণ চুল নজরে পড়বার পর তবে সেটাকে চেরার প্রশ্ন ওঠে।

এখন শিউচন্দ্রিকা সব বোঝে। অভিমন্যুর জীবনের একটা গোপন কথার সন্ধান সে পেয়েছিল। তাও নিজে নয়; যার কাছে থেকে সে আশা করেনি এমন লোক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পর। ক্ষতি তার আগেই হয়ে গিয়েছে; পার্টি'র সম্মান ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। হয়তো তখন এই চিঠিখানার কথা শিউচন্দ্রিকা জানতে পারলে, সেই সময়ের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটাকে একটা চিরাচরিত সামাজিক বন্ধনের পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারত সে। উৎসবের উপহার ছিল যার প্রাপ্য, সে পেয়েছিল নির্বাসনের দণ্ড।

ভাগ্যকে দোষ দেয়নি অভিমন্যু সে সময়ও। অস্পষ্ট ভাবে সে হয়তো বুঝেছিল যে তার জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি যা অনেক কাল আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে, তারই দিকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলেছে সে। এর মধ্যে ভাগ্যের দোষ-গুণের প্রশ্ন অবান্তর। যে জিনিসের যা ধর্ম; তার মধ্যে ভাল মন্দর প্রশ্ন ওঠে কোথায়?

রুকণী আর মিনাকুমারী চাকরিতে ভর্তি হওয়ার দিন কয়েক পর শিউচন্দ্রিকা জানতে পারে যে তারা অনাথালয়ের মেয়ে। তখন আর কিছু করবার ছিল না। সে নিজে সম্মতি দিয়েছে চাকরিতে তাদের নিযুক্ত করতে। ঐ মেয়ে দুটি যদি এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের হাতের মুঠোর লোক না হত, তাহলে হয়তো তাদের ইউনিয়নে টেনে আনা যেত। বিলক্ষণ ভুল করে ফেলেছে সে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মজুররা সকলেই জানে যে এই মেয়েদের নিযুক্তির ব্যাপারে মন্ত্রীজীর মতামত নেওয়া হয়েছে। তারা কি ভাবছে! অনাথালয়টাকে অধিকাংশ মজুর প্রায় গণিকালয় বলেই ভাবে। তাও আবার যে-সে ধরনের নয়,—এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চালায়, ম্যানেজার আর হাকিমদের জন্য; মিলের অন্যান্য বড় চাকুরেরাও পাত-কুড়ুনো এঁটোটা-কাঁটাটা পায়।…দেখিস না, মিলের ভিতর কোয়ার্টার করে দিয়েছে। কেন বাপু অনাথালয় খুলেছ, বর জুটিয়ে দাও মেয়েদের, বিয়ে দিয়ে দাও যেখানে পার। তা নয়! অনাথালয়ের ছোট ছেলেদের বিভাগটা পর্যন্ত অতি বদ্। ঐ এঁচড়ে পাকা ছেলেদের দল, ফৌজের ব্যাণ্ড বাজিয়ে যখন চাঁদা তুলতে যায় সদরে, তখন কঞ্জুস মাড়োয়ারীগুলোও হেসে ঝনাঝন্ টাকা ফেলে শালুর কাপড়খানার উপর। মন্ত্রীজী অনাথালয়ের খেলাপে যেতে পারে না কেন জানিস তো? ঐ ছেলেগুলোই অভিমন্যুর কেসরপাক বিক্রি করে ট্রেনে, তাই। খাসনি 'কেসরপাক'? মোদকের মতো খেতে; নিশ্চয়ই ভাং দেওয়া থাকে ওতে।…আর লক্ষ্য করেছিস, ঐ পটের বিবি দুজনের রোজ মিল থেকে অনাথালয়ে যাওয়া চাই,—সন্ধ্যার পর।…

এ নিয়ে শিউচন্দ্রিকার কথা হয়েছিল অভিমন্যুর সঙ্গে। অভিমন্যু বলে যে রুকণী আর মিনাকুমারী সন্ধ্যা বেলা দু'ঘণ্টা করে অনাথালয়ে কাজ করে। দশ টাকা করে তার জন্য মাইনে পায় অনাথালয় থেকে, আর যাতায়াতের রিকশা-ভাড়া। ছোটবেলা থেকে সেখানে মানুষ। কত ছেলেমেয়ে অনাথালয়ে আসে যায়, ওরা কিন্তু চিরকাল থেকে গিয়েছিল। এখনও রোজ সাঁজে হিসাব লেখে মিনাকুমারী। রুকণী তদারক করে রান্নাবাড়ির ব্যবস্থার আর ছেলেপিলেদের খাওয়া-দাওয়ার। জয়নারায়ণ প্রসাদই করিয়ে দিয়েছে এই কাজ। আহা, করুক বেচারিরা দু'পয়সা উপরি রোজগার।…না, না, শিউচন্দ্রিকা তুমিও সাধারণ বাজারের লোকের মতো অনাথালয়ের মেয়েদের সম্বন্ধে

একটা যা-তা ভেবে নিও না। আমাকে কেশরপাক নিয়ে কত সময় যেতে হয় ওখানে। দেখছি তো! তোমার-আমারই মতো তাদেরও আত্মমর্যাদা-বোধ আছে। রক্ত-মাংসের শরীর; ভুল-ত্রুটি সকলেরই হতে পারে। তোমারও হতে পারে, আমারও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে একেবারে ঢালা রায় দিয়ে দেওয়া যে অনাথালয়ের সব মেয়েই খারাপ, এ তোমার মতো লোকের শোভা পায় না। একটা সাধারণ লোকের মতো রটানো কথায় হুজুগে পড়ে সায় দিও না।

এমন করে শিউচাঁদ্রকাকে হক কথা শোনাবার সাহস এক অভিমন্যুরই আছে। একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লে সে নিজের কথার মধ্যে একেবারে নিজেকে ঢেলে দেয়।

শিউচাঁদ্রকা ভাবে যে এত উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন অভিমন্যু, একটা সামান্য অনাথালয়ের কথায়। নিশ্চয়ই তার মনের কোনো স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত লেগেছে। এ তো আগে ছিল না। পূর্বে কত সময় নিজেই অনাথালয় নিয়ে ঠাট্টা করেছে, বলেছে কেশরপাক নিয়ে ওখানে যেতে লজ্জা করে। মনে হয়, পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাকিয়ে দেখছে তার দিকে।

পরিবর্তনটা এসেছিল ইদানীং।

অভিমন্যুর দৃষ্টি ছিল ভাবুকের, মন ছিল কবির। তার ব্যবহারে ছিল খানিকটা খামখেয়ালী ভাব। বেলা বাড়ার সঙ্গে কোনো সময় যেন নিখুঁত সাদা স্থলপদ্মে গোলাপী রঙের আভা লেগেছে। দৃষ্টি হয়ে এসেছে গভীর। একটা কিসের যেন ভার পড়েছে হালকা মনটার উপর। মেপে কথা সে কোনো দিন বলতে পারে না বলেই হঠাৎ ভারিক্কি হয়ে ওঠেনি সে। তবে তার মন বলে, সে এত দিনে এমন একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছে, যা আঁকড়ে তার উড়নচড়ে মন চিরকাল ঠিক থাকতে পারে। অভিমন্যু বোকা নয়; এর আগেও যখনই সে এক-একটা নতুন হুজুগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখনই তার মনে হয়েছে যে, সে ঐ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মন হাঁফিয়ে উঠেছে। তার মনের এই ধারাটা তার চাইতে কেউ বেশি জানে না। তবু অভিমন্যুর মনে হয়েছে যে এবারকার জিনিসটা কেবল একটা সাময়িক হুজুগমাত্র নয়। এর মাদকতা অনেক মধুর, আকর্ষণ অনেক তীব্র, আর নেশা বোধ হয় চিরস্থায়ী। সে আশ্চর্য হয়নি। ফাল্গুনেও ভাদরে বাণ ডাকে তা সে জানে।

সেই 'ইন্টারভিউ' এর পর কত দিন তার দেখা হয়েছে মিনাকুমারী আর রুকণীর সঙ্গে অনাথালয়ে। লোকে যতই নিন্দা করুক, অনাথালয়ের ছেলেমেয়েদের উপর অভিমন্যুর ছিল এক সহজাত সহানুভূতি। সেইটাই যেন একটু বেশি ভাবে অনুভব করেছিল মিনাকুমারীর বেলা। বেশ শান্ত সংযত ভাব মেয়েটির। ভারি গোছাল; 'কেসরপাক'-এর হিসাব-নিকাশ করবার সময় এর মনে মনে প্রশংসা করত অভিমন্যু প্রতি সপ্তাহে। অভিমন্যুর বোধ হয় মিনাকুমারীকে বেশি ভাল লেগেছিল পাশাপাশি তার বন্ধু রুকণীর সঙ্গে তুলনা করবার সুযোগ পেয়ে। রুকণী ছিল চটুলা, আর হয়তো একটু গায়েপড়া গায়েপড়া ভাবের। চঞ্চল কর্মব্যস্ততার মধ্যে খিল-খিল করে হেসে ফেটে পড়ত কথায়-কথায়।

রুকণী ভালবসত ক্ষমতা, আর অন্যকে একেবারে হাতের মুঠোর রাখার আনন্দ। মিনাকুমারী ছিল তার অনুগত। সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসে। ঠিক লতাগাছের মতো তারও দাঁড়াতে হলে একটা আশ্রয়ের দরকার হয়। রুকণীর তাঁবেদারি সে দ্বিধাহীন অন্তরে মেনে নিয়েছিল। তাই সে হতে পেরেছিল রুকণীর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

রুকণীর সঙ্গে কেসরপাকের সূত্রে দেখা হওয়ার কথা নয়; কেননা, সন্ধ্যার পর দু' ঘণ্টার মধ্যে তাকে অনেক কাজ করতে হয় অনাথালয়ের। তবু রুকণী এর মধ্যেও সময় করে নিয়ে এসে, দুটো হাসির কথা বলে যেতে ছাড়ত না অভিমন্যুর সঙ্গে, যেদিন সে যেত কেসরপাকের হিসাব করাতে।

মিলে চাকর নেওয়ার আগে অভিমন্যুর সঙ্গে কথাবার্তায় মিনাকুমারীর ছিল একটা স্বাভাবিক সংকোচের বাধা। কবে সে বাধা কেটে গিয়ে একটা সহজ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা তারা বুঝতেও পারে না। আঁকড়ে ধরতে চায় মেয়েটি একটি আশ্রয়। তার মা বাপের পরিচয় সে জানে না। অনাথালয়ের পুরনো খাতায় সে দেখেছে যে, তাকে পাওয়া গিয়েছিল বলীরামপুর-জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। সেই যে এসে পড়েছিল এখানকার অনাথালয়ে, আর কোথাও যেতে পারেনি। কেউ তার খোঁজ নিতে আসেনি। শুকনো রুটিন-বাঁধা জীবন এখানকার, থাকতে থাকতে সয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকই মনে হত এটাকে। সে কম দিনের কথা হল না, তখনও অনাথালয়ের উত্তরের দালানটা তৈরি হয়নি। তার পর কত লোক এল গেল। কত মেয়ের বিয়ের যোগাড় করে দেওয়া হল। ঐ তো মিলের গেনা সর্দারের স্ত্রী, সে তো অনাথালয়ের মেয়ে। কত মেয়ের পাঞ্জাবে বিয়ে দিয়ে হাজার-হাজার টাকা রোজগার করল জয়-নারায়ণ প্রসাদ। সব খবরই রাখে মিনাকুমারী! এখানকার একঘেঁয়ে জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনে নিত্য-নতুন ছেলে-মেয়ে-যুবতীর দল, যারা এখানে আসে, আবার চলে যায়। তারাই থাকে উত্তরের দালানে। বিচিত্র তাদের অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত তাদের জীবনের পিছল পথের কাহিনী।

অনাথালয়ের কর্তৃপক্ষ যে তার আর রুকণীর বিয়ে দেওয়ানোর চেষ্টা করেন নি, বাইরের লোকে তার নানা রকম কদর্থ করে। এ কথা মিনাকুমারী বা রুকণী কেউ বোধ হয় হলফ নিয়ে বলতে পারবে না যে পাবলিকের তাদের সম্বন্ধে সন্দেহের কোন ভিত্তিই নেই। এখানকার পরিবেশে কারও সে কথা বলার সাহস থাকতেই পারে না। এক-আধ বার এরই মধ্যে তারাও দমকা হাওয়ার ঝাপটার মধ্যে পড়ে গিয়েছে জীবনে। তবে তার জন্য দায়ী তারা নিজেরাই; অনাথালয়ের কর্তৃপক্ষের কোনো হাত ছিল না তার মধ্যে। লোকে যা বলে বলুক। তাদের চাইতে বেশি তো আর কেউ জানে না। তবে তারা আসল কথাটা জানে, তাদের বিয়ের সম্বন্ধে অনাথালয়ের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার। জয় নারায়ণ প্রসাদরা এ কথা বোঝে যে মিনাকুমারী আর রুকণী চলে গেলে অনাথালয়ের কাজ সুশৃংখল ভাবে চলা সম্ভব নয়। ঝানু লোক জয়নারায়ণ প্রসাদ। সে জানে যে অনাথালয়ের হাড়-বজ্জাত মুনীমজী, দরোয়ান, দারোয়ানের স্ত্রী আর ঐ ব্যান্ড-মাস্টারটা মিলে সব চুরি করে ফতুর করে দেবে যদি রুকণী আর মিনাকুমারী দেখাশুনো না করে। তাহলে আর চাঁদার পয়সা হিসাবের খাতায় উঠবে না, চালের বস্তা চালান হয়ে যাবে রান্নাঘরের পিছনের খিড়কির দুয়োর দিয়ে। অনাথালয়ের যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্যই এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার সাহেব জুট-মিলে মিনাকুমারীদের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন। একবার করে সন্ধ্যার সময় এসে দেখাশুনো করে গেলেই, মুনীমজীর দলটা একটু রয়ে-সয়ে চলবে। এই মেয়ে দুটিকে পঙ্কিল পথে নিয়ে যাওয়ার আস্কারা দেওয়া অনাথালয়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে। সেই জন্য অনাথালয়ের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারা সকলেই জানে, এখানকার কার্যকলাপের আঁধার অধ্যায়ের নায়িকা, যারা দু'চার দিনের জন্য আসে তারাই; এখানকার স্থায়ী অধিবাসীরা কোনো কালেই নয়।

শিউচন্দ্রিকার মতো অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এ কথা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে অভিমন্যু, কিন্তু সাধারণ মজুরদের এ কথা কে বিশ্বাস করাতে পারবে ?

বড় হওয়ার পর মিনাকুমারী প্রতিদিন অনুভব করেছে যে অনাথালয়ে থাকলে পরিচয় হয় কেবল জগতের আঁধার আর ঊষর পিঠটার সঙ্গে। স্নেহ ভালবাসা, আদর-আবদার এ সবের জায়গা কোথায় এখানকার আবহাওয়ায় ? স্বার্থের রুক্ষ তার ছোঁয়াচ লেগে সব শুকিয়ে যায় এখানে। নিজের মা-বাবা যে মেয়েদের ভালবাসতে ভুলেছে, তাদের মনের স্নেহ পাওয়ার জায়গাটুকু থেকে যায় একেবারে খালি। আপন বলতে যাদের জগতে কিছু নেই, কেউ নেই,বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা চায় একজন জীবনের সাথী। তাই চেয়েছিল মিনাকুমারী। এ পৃথিবীর উপর তার বিশ্বাস নেই। এর ঝড়-ঝাপটা যাকে অনাথালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে, তার সে বিশ্বাস থাকতে পারে না। তার বুভুক্ষু মন চায় তার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে গভীর ভালবাসা, এত গভীর যে তার রুক্ষ বাল্য জীবনের সব বাকি-বকেয়া উশুল করে নেওয়ার পরও যেন পুঁজিতে হাত না পড়ে। সে চায় একটা নিখুঁত জীবন। বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একখানি নিকানো অঙ্গন; উঠোনের তুলসীমঞ্চটার পাশে একটা উলঙ্গ শিশু খেলা করছে। অঙ্গনটা হবে তার একান্ত আপন ; নিজেকে নিঃশেষ করা দরদ দিয়ে সে গড়ে তুলবে এই নীড়। সে নিত্য-নূতন চমক চায় না, চায় গেরস্থালির জীবনের নিবিড় সুখ। তার সাথী নিজেদের দেহের প্রাচীর আর বাহুর শক্তি দিয়ে আগলে থাকবে তাকে বাইরের ঝড়ঝাপটা থেকে। অধিকাংশ মেয়ের মতো এই ছিল তার কাম্য। সাধারণ মেয়েছেলের মতো মিনাকুমারীর মনটাও ছিল কিন্তু অতিমাত্রায় হিসাবী। অনাথা-লয়ের হিসাবের খাতা লিখত বলে নয় ; স্বভাব থেকেই। ভারী সাবধানী মানুষ সে। না ভেবে-চিন্তে এক পা এগোয় না। নিছক ভাবের আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দিত পারে না। এটুকু সাংসারিক জ্ঞান তার হয়েছে।

এরই মধ্যে তার জীবনে এল আপনভোলা অভিমন্যু। মিলে চাকরি নেবার আগেই মিনাকুমারীর ভাল লেগেছিল এই লোকটির অকৃত্রিম সৌজন্য। এই ছোট শহরের প্রতিটি লোক, এমন কি বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুর নাম শুনেছে। বলীরামপুরের লোকের গল্পের বিষয়-বস্তু মাত্র দুটি—মিল আর অনাথালয়। রসের খোরাক যোগায় অনাথালয়ের মেয়েরা, আর উদ্দীপনার যোগান দেয় মিলের মজুররা। প্রত্যহ লেগে আছে তাদের মিটিং ; ময়দানের বড় মিটিং,ভাঙা হাটের খুচরো মিটিং; ছুটির সময়ের 'মিল গেট'-এর ছোট মিটিং। এ ছাড়া কারণে অকারণে মিছিল, কত রকমের দিবস পালন, হরতালের হিড়িক, মজুরদের ড্রিলের ক্লাস, তাড়ির দোকানের কোলাহল, মজুর-ব্যারাকের কীর্তন আর রক্ত গরম-করা গানের সমারোহ, থানা-পুলিশ, নিত্য-নূতন চাঞ্চল্যের অহোরাত্র উৎসব। তাই মিনাকুমারীও চিনত শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুকে। অনাথালয়ের মুনীমজী আর জয়নারায়ণ প্রসাদের কাছে কত দিন শুনেছে যে এরা দুজন মজুরদের ঠকিয়ে, নিজেদের পকেট ভরবার জন্য এখানে এসে জুটেছে ; তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু টাকা রোজ-গারের পর এক দিন উড়ে যাবে ফুড়ুৎ করে।

এ কথায় মিনাকুমারী বিশ্বাস করেনি কোনো দিন। বলীরামপুরের আর দশ জন লোকের মতো মিনাকুমারীও এদের শ্রদ্ধা করত, মনে মনে প্রশংসা করত। তখনও ভালবাসার প্রশ্ন ওঠেনি তার মনে। সেটা উঠল কেসরপাক নিয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক পর। মিনাকুমারী আর রুকণীর মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা

ছিল যে, এই সব সন্ন্যাসী গোছের লোকদের শিষ্যরা ছাড়া আর কেউ নাগাল পায় না ; সব কিছুর মধ্যে থাকলেও না কি শিউচাঁন্দ্রকা আর অভিমন্যুর এমন একটা আলগা আলগা ভাব আছে, যার জন্য কেউ তাদের মনের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। কিন্তু কাজের সূত্রে অভিমন্যুর সান্নিধ্যে এসে মিনাকুমারীর ভুল ভাঙে। ভয় আর সংকোচ কেটে যায়। অভিমন্যুর সহজ প্রাণখোলা ব্যবহারে প্রতিবেশীর উপর ঔদাসীন্য নেই, অনাবিল উৎসাহের অভাব নেই তার কোনো বিষয়ে। সে হেসে কথা বলতেও জানে ; মধুর ব্যবহারে পরকে আপন করে নিতে অভিমন্যুর এক মুহূর্তও দেরি লাগে না ; প্রথমটায় মিনাকুমারী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ত্যাগী সন্ন্যাসীটির মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সব দেখে। আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে সে ক্রমে জানতে পারে যে অভিমন্যু কোনো লোককেই দূরে ঠেলে দেয় না, দরদী মনকে তো নয়ই।

যে তার সম্পর্কে আসে তারই উপর অভিমন্যুর মন হালকা পরশ রেখে যায়। মিনাকুমারীর উপর রঙের পরশ এত হালকা ভাবে লাগেনি। অনেককে কেবল দূরে থেকেই ভাল লাগে ; কিন্তু মিনাকুমারী বুঝেছিল যে অভিমন্যুকে দূর থেকে তো ভাল লাগেই, কাছ থেকে আরও ভাল লাগে।

এই ভাল লাগালাগির পথে, অন্য লোক যেখানে হেঁটে চলে, অভিমন্যু সেখানে ছুটে চলে, চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে যে রাজপুত্তুর মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে, তার কি মাটিতে হোঁচট খাওয়ার কথা মনে আসে ? মনের নদীতে বান ডেকেছে ; দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। তাতে বাধা দেবার কে মনের রাজ্যের বাইরের লোকরা ? আর বাইরের লোকরা এ নিয়ে মাথা ঘামায়ওনি।

শিউচাঁন্দ্রকা পার্টির ভাল-মন্দর ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে পারে না। সেই যেদিন এস. ডি. ও. সাহেবের সম্মুখে এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার খোঁটা দিয়েছিল তাদের কেসরপাকের চিনির সম্বন্ধে সেই সেদিন থেকেই শিউচাঁন্দ্রকা ঠিক করে নিয়েছিল যে এই পর্ব যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করতে হবে। মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে স্থানীয় অনাথালয়ের ব্যবসায়িক সম্বন্ধ মজুররা কী চোখে দেখে তা শিউচাঁন্দ্রকা বেশ বোঝে ! সে জানে যে তার ব্যক্তিত্বের জোরেই মজুরদের মধ্যে এই বিষয়ের কানাঘুষোটা একটু কম আছে।

সেইজন্য শিউচাঁন্দ্রকা উঠে-পড়ে লাগে ইউনিয়নের আয় বাড়ানোর জন্য। ইউনিয়নের কিছু কাজ চোখে আঙুল দিয়ে মজুরদের দেখাতে পারলে তবে না এর উপর মজুরদের আস্থা বাড়বে। এবার তোমাদের দু-দুটো দাবি মিল কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে—'ক্রেশ' আর 'ক্যান্‌টিন'। তোমাদের ইউনিয়ন না থাকলে কোনো দিন হত ? ছেলেপিলে হওয়ার আগে এক মাস আর পরে একমাস বসে মজুরি দেওয়াচ্ছে তোমাদের এই ইউনিয়ন।

ও তো মন্ত্রীজী সমস্তিপুর মিলেও হয়েছে !

ভাল করে খোঁজ নিয়ো। হয়েছে ঐ নামেই। কাজে কত দূর কী হচ্ছে তাই দিয়ে না মিলমালিকের শয়তানির যাচাই করতে হবে তোমাদের।

ঠিক বলছে মন্ত্রীজী। রহমতের বিবিকে ভাল কাজ পাইয়ে দিয়েছে। দাইয়ের কাজ মিলে।

আরও অনেক দাবির দরখাস্ত গিয়েছে পাটনায়। কেবল দরখাস্ত নয়, সঙ্গে সঙ্গে কড়া করে লিখে দেওয়া হয়েছে, দাবি না মেনে নেওয়া হলে কী করা হবে। বেশী মেম্বার না হলে সরকার তোমাদের কথা শুনবেই না, তোমাদের দরখাস্ত পড়বেই না ; আর শুনেছ তো, দালালদের দিয়ে আর একটা লোক দেখানো ইউনিয়ন খোলাবার

চেষ্টা করছে জয়নারায়ণ প্রসাদ ? এই বলে দিলাম, তোমরা যদি নিজেদের ইউনিয়নের চাঁদা দেওয়া মেম্বর না হও, তাহলে একদিন কালেক্টর সাহেবকে দিয়ে বলিয়ে দেবে ম্যাকনীল সাহেব যে, ঐ দালাল ইউনিয়নটারই মেম্বর বেশি, সেইটাই আসল ইউনিয়ন। শীগগিরই ঝটপট সবাই মেম্বর হয়ে যাও। নিয়ে যাও কালু সর্দার মেম্বর করবার রসিদ বই। তাঁত-ঘরের প্রত্যেকটি লোককে মেম্বর করা চাই। আলবৎ দেবে যেতে মিলের মধ্যে রসিদ-বই নিয়ে। তাঁত-ঘরের অধিকাংশ মজুর মুসলমান বলে তুমি বেশি মেম্বর করতে পারবে না বলছ। বাজে হুজ্জতো দেখিও না ! রহমৎ তো আছে তোমার সঙ্গে। না, না, কোনো ওজর শোনা হবে না কালু সর্দার। এই রাখ চারখানা মেম্বারী রসিদ-বই। এখানে দস্তখত কর, এই ডান দিকে। কেউ চাঁদা বলে আলাদা কিছু দিলে নেবে বৈকি। তার জন্য কিন্তু আলাদা চাঁদার রসিদ দেবে।

ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

শিউচন্দ্রিকা মনে মনে হিসাব করে কেসরপাক তৈরি করা তুলে দিলে অভিমন্যু সপ্তাহে পুরো একদিন করে সময় বেশি পাবে পার্টির কাগজ আর বই-টই বেচবার জন্য ! তার জন্যও কিছু আয় বাড়বে। চলে যাবে এক রকম করে ইউনিয়নের খরচ। যেমন করে হোক চালিয়ে দেবে সে···আর গোটা কয়েক ইউনিয়নের দরকারী জিনিস কিনবার পরই, শিউচন্দ্রিকা তুলে দেবে কেসরপাকের পাট। কত জিনিসের তাদের দরকার এখনও,—মিটিংয়ের জন্য সতরঞ্চি, একটা বড় লণ্ঠন, অফিস-ঘরের জন্য আলমারি, একটা বড় সাইনবোর্ড, গোটা কয়েক টিনের ভেঁপু, ফ্যাক্টরি আইন সংক্রান্ত দুখান দরকারী বই, আরও কত কী। ছেড়ে দেবে বললেই কি অমনি ছেড়ে দেওয়া যায় কেসরপাক তৈরি ? অনেক হিসাব করে চলতে হয় শিউচন্দ্রিকাকে।

হাত-করতে বছরখানেক কেটে যায়।

তার পর একদিন শিউচন্দ্রিকা হুকুম দিয়ে দেয়, অভিমন্যু আর এ মাস থেকে চিনি এনো না—কেসরপাক-এর জন্যে।

এ দুর্দিন অভিমন্যুর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। তবু হতাশায় তার মন মুষড়ে পড়ে। সাজা প্রত্যাশিত বলে কি ফাঁসির রায় বেরুবার পর খুনী আসামী হাসে ? প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সে যায় অনাথালয়ে, আসামী সপ্তাহের কেসরপাক দিতে, আর গত সপ্তাহের দেওয়া কেসরপাকের দামটা আনতে। শনিবারটা আর আসতেই চায় না। ঐ দিনের ঐ সময়টুকুর প্রতীক্ষায় সারা সপ্তাহের দিন গোনা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, গত দেড় বছরের মধ্যে। এই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা তার মনে জুগিয়েছে একটা মধুর উত্তেজনার রস, জ্বালিয়েছে তার মন্থর জীবনে অনভ্যস্ত উৎসাহের আগুন, রঙিন করে তুলেছে তার কুশ্রী কোলাহলমুখর আবেষ্টনী। এই মিষ্টি আলো-আঁধারি প্রতীক্ষার উপর শিউচন্দ্রিকা হঠাৎ রূঢ় হাতে যবনিকা টেনে দিচ্ছে !

অভিমন্যুর সন্দেহ হয়,—শিউচন্দ্রিকা তাহলে বোধ হয় তার মনের মধুর গোপন কথাটার সন্ধান পেয়ে গিয়েছে। সেই জন্যই বোধ হয় সে এই অধ্যায় শেষ করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। জ্ঞানী-মূর্খ শিউচন্দ্রিকা। মনের সূক্ষ্ম জটিল গ্রন্থির বালাই নেই তার। তাই সে জানে যে এ গ্রন্থি যত জোর করে খুলতে যাবে, তত আরও জট পাকিয়ে যাবে। গুড়ের মধ্যে মাছি আরও জড়িয়ে পড়বে।···

এই জন্যই এই কেসরপাক তৈরি বন্ধ করার অনুরোধকেও অতি আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল অভিমন্যুর।

অনুরোধ? না আদেশ? তার মনটা কি বলীরামপুর মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারির হাতের একতাল কাদা না কি? সেটাকে দিয়ে যেমন ইচ্ছে পুতুল তৈরি করবার অধিকার মন্ত্রীজীকে কে দিয়েছে?

এ খবরে অভিমন্যুর চাইতেও অভিভূত হয়ে পড়ে বেশি মিনাকুমারী। এমনিই সে কম কথা বলে। সেদিন নিজেকে নিজের মধ্যে আরও গুটিয়ে নেয় শামুকের মতো। কেসরপাকের শেষ হিসাবে ভুল করে ফেলে। কানে ভেসে আসে অভিমন্যুর ভাঙা-ভাঙা স্বরের টুকরোগুলো। শেষ পর্যন্ত চোখের জলে হিসাবের খাতার কালির আঁচড়গুলো আর দেখা যায় না।...মিলের মধ্যে তোমাদের কোয়ার্টার। সেখানে তো আমরা যেতে পারি না।...দেখা না হলেও এক জায়গাতেই আমরা আছি! রহমতের বিবিই তো 'ক্রেশে'র দাই। তারই মারফত খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া চলবে। কিন্তু রহমতের বিবিকে বলে দেবে যে, খবন্দার! শিউচন্দ্রিকা যেন ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানতে না পারে।...লক্ষ্য করেছ মিনা, ছেলের আর মেয়ের মনের মধ্যে কত তফাত! আমি এ সব কথা ইঙ্গিতেও জানাইনি শিউচন্দ্রিকাকে; কিন্তু তোমার বন্ধু রুকণীকে মনের সব কথাই তুমি বলেছ।...তোমরা দুই বন্ধুতে রিকশা চড়ে রোজ যখন আসবে অনাথালয়ে সেই সময় চোখের দেখা দেখে নেওয়া যাবে মাঝে-মাঝে।...

অভিমন্যুর গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। জোর করে মুখে হাসি এনে, পুরুষের মনের জোর মেয়েদের চেয়ে কত বেশি তাই দেখাতে চেষ্টা করে। কখন যেন মিনা-কুমারীর নরম আঙুল কটা এসে পড়ে অভিমন্যুর শক্ত মুঠোর মধ্যে!

হঠাৎ রুকণী এসে পড়ায় দুজনেই হাত সরিয়ে নেয়। রুকণী দেখেও দেখে না; —এত লুকোচুরির কি দরকার ছিল তার কাছে? অন্য দিনের মতো আজও সে ক্ষণিকের উচ্ছল হাসিতে ঘর মাতিয়ে তখনই বেরিয়ে যায়—'ভাঁড়ারের ছিষ্টি কাজ বলে আমার পড়ে রয়েছে এখনও।'...

তারপর মাঝে-মাঝে রহমতের বিবির মারফত খবরাখবরের আদান-প্রদান চালিয়েছে মিনাকুমারী আর অভিমন্যু ভাবপ্রবণ অভিমন্যু কত সময় তার মনের ব্যথা ঢেলে উজাড় করে দিয়েছে চিঠির কাগজের উপর। দেখাও হয়েছে তার মিনাকুমারীর সঙ্গে দিন কয়েক! অনাথালয়ে যাওয়ার পথে রুকণীই বোধ হয় ইচ্ছে করে ঘটিয়ে দিয়ে থাকবে। মিল থেকে বলীরামপুর বাজারের অনাথালয় আড়াই মাইল দূর হবে। পথের দুধারে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল আমবাগান। বাজারের কাছাকাছি গিয়ে ঘন বসতি আরম্ভ হয়েছে।

এই পথের ধারের দীক্ষিতদের আমবাগানে দেখা হয়েছিল তাদের মিনাকুমারীর কাছ থেকে চিঠিখানা পাওয়ার পর।

মিনাকুমারী বড় সাবধানী বেশী। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও গভীর আবর্তের দিকে যাতে সে না চলে যায়, সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি আছে। তাই সে সাধারণত রহমতের বিবিকে মুখে মুখেই খবর পাঠাত দরকার হলে। মিনাকুমারীর অভিমন্যুকে দেওয়া চিঠি, এই খানাই প্রথম, আর বোধ হয় এই শেষ। তাই এই চিঠিখানিকে যখের ধনের মতো আগলে ঝোলার মধ্যে রেখেছিল অভিমন্যু।

সেদিন দেখা হয়েছিল তাদের, অনেক দিনের পর। যত দিন অভিমন্যুর সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত দেখা হত অনাথালয়ে ততদিন মিনাকুমারী বেশি ভাববার সময় পায়নি; দুর্নিবার স্রোতে গা এলিয়ে দিয়েছিল। তারপর এতদিনের অদর্শনের ছুটিতে, তার হিসাবী মন সমস্ত ব্যাপারটা সুস্থির হয়ে ভাববার সময় পায়। মনের

তুলাদণ্ডে সে ওজন করে দেখতে চেষ্টা করে, জীবনের সাথীরূপে অভিমন্যুকে নেওয়ার লাভ-লোকসান। অভিমন্যুর বাড়িতে আর কে আছে, বাড়ির অবস্থা কেমন, জমি-জমা আছে কি না, কত কথা তার জানতে ইচ্ছা করে। মিনাকুমারী বোঝে মনে মনে যে, টাকা আনা পাইয়ের হিসাব খতিয়ে জীবনের সাথী বাছবার কথা শুনলে অভিমন্যু হাসবে। সে জানে দুদিনের ভালবাসার বেলা এ প্রশ্ন অবান্তর হতে পারে কিন্তু সারা জীবনের সঙ্গী যাকে করতে হবে, তার সম্বন্ধে এ সব খোঁজ নেওয়া অনুচিত নয়। চোখ বুজে সে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।···ইউনিয়নের কাজ থেকে নিশ্চয়ই কিছু রোজগার আছে অভিমন্যুর। না থাকলে খাওয়া-পরা চলে কি করে? একেবারে বিনা মাইনেতে লোকে সারাজীবন কাজ করতে পারে এ কথা মিনাকুমারী ভাবতে পারে না।···

যে নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিময় জীবন সে চায়, তা অভিমন্যুকে পেলে পূর্ণ হবে তো? অভিমন্যু যদি রাজনীতির কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো চাকরি-বাকরি বা রোজগার করে তাহলে বড় ভাল হয়। থানাপুলিশ, জেল, অভাব-অনটন, অনিশ্চয়তা, নিত্য-নূতন ঝঞ্ঝাট রাজনীতিক কর্মীর জীবনে। মিনাকুমারীর জন্য, আর গার্হস্থ্য জীবনের লোভে অভিমন্যু কি কোনো দিন ছাড়তে পারবে এই জীবন? রুকণীর কাছেও সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করে। রুকণীরও তাই মত।—সব খবর ভাল ভাবে না জেনে ফাঁদে পা দেওয়া ঠিক নয়। তুই বড় লোক স্বামী চাস না। অতি সামান্য তোর প্রার্থনা। তাও যদি না পাস অভিমন্যুর কাছ থেকে তাহলে খবরদার, ও-পথ মাড়াস না। না হলে সারা জীবন কেঁদে মরবি। তার চাইতে এখানকার জীবন অনেক ভাল। সুখ না থাকুক আরাম তো আছে। আবার ভাবিস না যেন, তুই চলে গেলে আমাকে একলা থাকতে হবে বলে আমি ভাঙচি দিচ্ছি! আমি হিংসায়ও ফেটে পড়ছি না বুঝলি! ঐ কুলী-মজুরদের সর্দারদের উপর আমার লোভ নেই তোর মতো।···

তারপরই মিনাকুমারী লিখেছিল ঐ চিঠিখানা অভিমন্যুকে। মনে মনে ভেবেছিল অভিমন্যুর জীবনের সব দরকারী খবর আজ কোনো রকমে জেনে নিতেই হবে। এর জন্য বেশি চেষ্টা করতে হয়নি। এতদিনের মনের রুদ্ধ স্রোত ছাড়া পাওয়ার আবেগে অনর্গল কথা বলে যায় অভিমন্যু। বাড়িতে কেই বা আছে তার। থাকার মধ্যে আছেন তো কাকা আর কাকীমা। তবে বুঝলে মিনা, সেদিকে যাওয়ার পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার জরিমানার টাকা সেবার কাকা দিয়েছিলেন। তারপর কাকা কাকী দিন-রাত আমাকে গালাগালি। আমি বলি যে, আমি কদিন বাড়িতে থাকি? আমার জমির ফসল তো কখনও খেতে আসি না। তা এত রাগারাগির দরকার কী, ও জমি ক'বিঘা তোমার নামেই লিখে দিচ্ছি ঐ জরিমানার টাকার বদলে। আমাদের বাড়ি দেখতে যাবে বলছ? সে গুড়ে বালি। গেলেই কাকীমা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে আসবে। ওদেরই বা দোষ দিই কী করে। একবার যখন ফেরার ছিলাম, তখন পুলিশে কাকার গরুর গাড়ি নীলাম করবে বলে নিয়ে গিয়েছিল কাছারিতে। এখন তাদের ইচ্ছে যে আমি গ্রামে বসে হাতুড়ে বদ্যির কাজ করি, বংশলোচন আর সোনাই-পাতা বেচি আমার বাবার কাকার মতো। তবেই আমাদের বংশের নাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আরও সব এলোমেলো কথা এক জায়গায় করে মিনাকুমারী ধরে নেয় যে অভিমন্যু যে ভবিষ্যত জীবনের রূপরেখা এঁকেছে মনে মনে, তাতে রাজনৈতিক কর্মজীবন

ছাড়বার কোনো কথাই তার মনে ওঠেনি। তা হলে কি মিনাকুমারীকেও তার কর্ম-জীবনের সঙ্গিনী হতে হবে? রাজনৈতিক জীবনের বিশ্রী কর্মব্যস্ততা আর অনিশ্চয়তা তার সত্যি খারাপ লাগে। যদি তাকে অভিমন্যু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করতেও নাও বলে, তা হলেও সংসারের খরচ চালাবার জন্য চাকরি করতেই হবে। এ মিলের চাকরি কিন্তু থাকবে না। করতে হবে অন্য চাকরি। সে কাজ আবার কেমন হবে তা কে জানে! মিনাকুমারী হিসাব করে দেখে। এর বদলে সে পাবে অভিমন্যুকে। সে লাভটা অনেকখানি! তার লোভ কম নয়। তবুও খানিকটা দোল খাওয়ার পর মনের দাঁড়িপাল্লায় লোকসানের দিকটা ঝুঁকে পড়ে নিচে। ঘরপোড়া গরু সে। অনিশ্চিত জীবনের ঝক্কি পোয়াতে সে রাজী নয়।

অথচ সত্যি ভাল লাগে তার অভিমন্যুকে। এ ভাল লাগার মধ্যে ভেজাল নেই। তার মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলেও, আজকের মনের ভাব সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেবে না অভিমন্যুকে।

খানিক আগের দাঁড়িপাল্লার হিসাবটা ছিল পাইকারী, সারা জীবনের পণ্যের। খুচরো হিসাবের দাঁড়িপাল্লা আলাদা। এ হিসাবের অভিমন্যু, তার ভালবাসার অভিমন্যু, সেই অনাথালয়ের 'কেশরপাক'-এর অভিমন্যু। এতদিনের অদর্শনের পর দেখা মানে একেবারে নতুন করে পাওয়া। সেই অভিমন্যুর কথা মনে করে সে হিসাব খতিয়ে বেহিসাবী হতে পারে;—সারা জীবনের জন্য, খুচরো এক দিনের জন্য। কেবল আজকের দিনটার জন্য।

সারা জগৎ আজ বেহিসাবী হয়ে উঠেছে। দীক্ষিতদের আমবাগানে আমের মুকুলের হিসাব নেই, মৌমাছির গুঞ্জনের বিরাম নেই, পশ্চিমে বাতাসে পাতা-ঝরার শেষ নেই। আজকের দিনে মিনাকুমারী নিজের ভাণ্ডার উজার করে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করবে না। কিন্তু কেবল আজকের দিনটার জন্য, আঁধারের কাছ থেকে চুরি করা এই সময়-টুকুর জন্য।

এক ঝাঁক ফড়িং-এর মতো ছোট-ছোট পোকা ফড়-ফড় করে উড়ে তাদের জ্বালাতন করে মারল। সত্যিকার বেহিসাবী অভিমন্যুর উষ্ণ নিশ্বাস লাগছে হিসেব করা বে-হিসাবী মিনাকুমারীর সিঁথির চুলে। আমের মুকুল থেকে দুজনের দেহে টপ-টপ করে মধু-ঝরার বিরাম নেই। দুটি দেহের দুয়ারে রসের ফোঁটার টোকা পড়ছে, কিসের যেন সংকেত ক'রে। মধুতে চটচটে হয়ে উঠেছে ঝরাপাতার রাশি। মিনাকুমারীর আর অভিমন্যুর গায়ে, কাপড়ে, সর্বাঙ্গে যেখানে লাগছে এঁটে যাচ্ছে।...

মিনা,

তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবে না একদিনও? তুমি এমন কেন? সব কাজের মধ্যেও চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার কথা মনে হয়। লক্ষ্মীটি, আমার মনের অবস্থা জেনে দেরি কোরো না।

তোমারই
অভিমন্যু
১৩-৬-৪৭

মিনাকুমারী আর অভিমন্যুর জীবনের মামলায়, চিত্রগুপ্তের হাতের সবচেয়ে মারাত্মক দস্তাবেজ এইখানা। এক অদ্ভুত কলহোন্মুখ পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ নাটকীয়

ভাবে চিঠিখান বের করে দিয়েছিল এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ, ট্রাউজারের পকেট থেকে।

গত কয়েক মাসে ইউনিয়নের শক্তি বাড়ায় মজুরদের বুকের পাটা বেড়েছে, আর শিউচন্দ্রিকার কাজের সুবিধা হয়েছে। কেসরপাকের পাট শেষ হওয়ার পর আর অনাথালয়ের সঙ্গে কোন বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ নেই। হাকিম-হুকুমদের ডাকবাংলায় থাকা নিয়ে আর রেখে-ঢেকে কথা বলে না শিউচন্দ্রিকা।

কালেক্টর সাহেব এসেছিলেন এক দিন ম্যাকনীলের কুঠিতে টেনিস খেলতে। মজুররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে আজ নিশ্চয়ই ম্যানেজার সাহেব দালাল ইউনিয়নটা কায়েম করবার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবে।

মিল-গেট থেকে বেরুনোর সময় কালেক্টর সাহেবের গাড়ি ঘিরে ফেলেছিল মজুরের দল। বলেছিল একটু বেশি রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এখানে ;—দেখবেন হুজুর কত রাত পর্যন্ত মেয়েরা কাজ করে এই মিলে। আপনার সম্মুখে সব অস্বীকার করে দেয় ; আজ অন্য তিনটে গেট বন্ধ করে দিয়ে গেটে যদি দাঁড়ান, হুজুর, তাহলে নিজের চোখে হুজুর দেখে যেতে পারবেন। আর দেখুন মিলের 'গ্রেনশপ'-এর চালের নমুনা। চাল বেশি কি কাঁকর বেশি আপনিই বলুন হুজুর। এ সস্তা চাল নিয়ে লাভ কী ?

'তা তোমরা দুপুরের খাওয়াটা মিলের ক্যানটিনে খেলেই পার।'

সে আর বলবেন না হুজুর। সরকারী গুদামের পচা আটা বাংলা সরকার 'গরুর খাবার যোগ্য' বলে গত বছর নিলাম করেছিল। তাই এরা ক'হাজার বস্তা নিয়ে এসেছিল নৌকায় করে, গঙ্গা দিয়ে। সকালে সেই আটার রুটি দেয় হুজুর ক্যানটিনে। একেবারে তেতো বিষ ; খেলে পেট খারাপ হয়। হুজুর, একবার সস্তা 'গ্রেনশপ'-এ এই আটাটাও দেখে নেবেন। এখনই না দেখলে হুজুর দেখা আর না-দেখা সমান !

'না, না, এখন আমার একটু কাজ আছে ডাকবাংলাতে। আমি কথা দিচ্ছি, কাল সকালে নিশ্চয়ই দেখব।'

হলও তাই। পরদিন সকালে কালেক্টর সাহেব এসেছিলেন 'গ্রেনশপ'-এ। অভিমন্যু আর মজুররা সেখানে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। কালেক্টর সাহেব মোটর গাড়িতে বসে বসেই অভিমন্যুর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করেন।

অভিমন্যু হাসতে হাসতে তাঁকে 'গ্রেনশপ'-এর আটাটার অদ্ভুত রং আর তার ভিতরের শান্তিপ্রিয় কীটগুলোর বিবরণ শোনায়।—আর স্যার, বাংলাদেশে যত হাজার বস্তা এসেছিল তার অর্ধেক গিয়েছে স্টেশনের কাছের ফ্লাওয়ার মিলে। সেখানকার মজুরদের, স্যার, ভারি সুবিধা হয়েছে। ভাল আটার সঙ্গে কতটা পর্যন্ত এই আটা মিশোলে খেতে তেতো লাগে না, আর খেলে পেটের অসুখ করে না তারই পরীক্ষা করবার জন্যে, রোজ বিনা পয়সায় কচুরি খেতে পাচ্ছে সেখানকার মজুররা। এখানকার 'গ্রেনশপ'-এর আটার বস্তাগুলোর উপর, স্যার দেখবেন এখনও সি. এফ. অর্থাৎ Cattle Fodder ছাপ মারা আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও অভিমন্যুর বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারেন না। 'গ্রেনশপ'-এ কিন্তু এক বস্তাও সে আটা পাওয়া গেল না। জয়নারায়ণ প্রসাদ বলে—দেখলেন তো স্যার, ইউনিয়নের লোকদের সত্যি কথার একটা নমুনা।

'সব সরিয়ে ফেলেছে ; কাল রাতে এলে ধরতে পারতেন, স্যার। অপ্রস্তুত অভিমন্যু কথার খেই হারিয়ে ফেলছে। তার দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কালেক্টর

সাহেব গাড়িতে গিয়ে বসেন।

'ইউনিয়নের কর্মীর মিল-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।'

গাড়ি স্টার্ট দেয়।

যত দিন মজুররা ভালভাবে সংগঠিত হতে পারেনি, ততদিন মিল কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নটাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন না। মিটিং-এ একটা-দুটো জোর গলায় বক্তৃতা দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিতে চায় শিউচন্দ্রিকা তো করুক, তাতে কোম্পানীর কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

সে ভাব আর রাখা চলে না। জয়নারায়ণ প্রসাদ ম্যাকনীল সাহেবকে বুঝায়: আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়ে গিয়েছে শিউচন্দ্রিকা, আর ঐ স্কাউন্ড্রেল অভিমন্যুটা। দিন রাত মজুরদের উস্কানি দিচ্ছে। এ কি ছেলেখেলা পেয়েছে? মজুরদের সহজদাহ্য মন বেশ তেতে উঠেছে এরই মধ্যে, তার লক্ষণ কি দেখতে পাচ্ছেন না স্যার? আর ইউনিয়নের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে না। এখনও পিষে ফেলা যেতে পারে, পরে আর পারবেন না, স্যার।...

ম্যাকনীল সাহেবকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় জয়নারায়ণ প্রসাদ।

এইবার ইউনিয়নের সঙ্গে খোলাখুলি সংঘর্ষে এগিয়ে আসে ম্যানেজার আর এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার!

খবর চাপা থাকে না। ম্যানেজারের অফিসে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তার অধিকাংশ গন্ধ পায় মজুররা। দুপক্ষই সচেতন হয়ে ওঠে। সুবিধা পেলে কেউ কাউকে ছাড়বে না।

মজুরদের দশ দফা দাবির ফিরিস্তি ম্যাকনীল সাহেব পান। সাহু-ব্যারাকের মাঠে শিউচন্দ্রিকার সভাপতিত্বে যে মিটিং হয়, তার প্রস্তাবগুলো বেরোয় পার্টির কাগজে।—এই মিটিং বলীরামপুর জুট মিলের মজুরদের ন্যূনতম মজুরি সপ্তাহে আরও দুই টাকা তিন আনা করিয়া বাড়াইবার দাবি করিতেছে।···ক্যানটিনের অব্যবস্থার ঘোর নিন্দা করিতেছে।—ক্যানটিনের তৈয়ারি করা ঝুড়ি-ভরা জলখাবার ৩০।৫।৪৭ তারিখে সন্ধ্যার পর রিকশায় করিয়া অনাথালয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করিতেছে।...মিলের 'ক্রেশে'র নাম করিয়া যে দুধ আসে তাহার সমস্তটাই ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের কুঠিতে চলিয়া যায়, এবং 'ক্রেশে'র অল্পবয়স্ক শিশুদের কেবল ভাতের মাড় খাওয়ান হয় কি না, এ বিষয়ে পাবলিকের সম্মুখে তদন্ত করা হউক।···সরকারী কর্মচারীরা বলীরাম পুরে আসিয়া কোথায় ভোজন করেন, এবং টুরে আসিয়া কে কী কাজ করেন তাহার তদন্ত করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে।

এ ছাড়া আরও অনেক খুচরা দাবির প্রস্তাব বিশদভাবে পার্টির কাগজে দিয়াছে। সবই ম্যানেজার সাহেবের নজরে পড়ে।

অভিমন্যু প্রত্যহ ছুটির সময় মিল-গেটে বক্তৃতা করে, আর সন্ধ্যার পর সাহু-ব্যারাকে ভজনের দলে গান গায়।

ইউনিয়নের অফিসঘরের বাড়িওয়ালা হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিস দেয়, সে নিজেই না কী ঐ বাড়িতে থাকবে। এক নম্বর গেটের পাশের এতকালের তালা দেওয়া গুদামটার উপর একদিন হঠাৎ একটা নিশান ওড়ে। রামভরোসা সর্দারের নতুন ইউনিয়ন খুলেছে সেখানে। সিরিয়া নামের একটি অল্পবয়সী নতুন মজুরণী সাহু-

ব্যারাকে এক দিন রাতদুপুরে চেঁচিয়ে উঠে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়। এরই জন্য কালু সর্দারকে পুলিশ গ্রেফতার করে সদরে নিয়ে যায়। এস. ডি. ও সাহেব তার জামিনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

মিলের প্রায় অর্ধেক মজুর থাকে মিলের ব্যারাকে। আর বাকি সকলে থাকে বাইরের লোকদের অন্য সব ব্যারাকে, ঘর ভাড়া নিয়ে। মিলের ব্যারাকের সাপ্তাহিক ভাড়া আদায় করে দুজন ষণ্ডা ভোজপুরী দারোয়ান। তারা হঠাৎ একদিন ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মজুরের ঘরে তালা দিয়ে দেয়। তারা না কি সময়মতো ভাড়া দেয় না।

শিউচন্দ্রিকার কাছে ছাপরার উকিলের নোটিস আসে—ঘিণাওন সিং-এর বিধবা স্ত্রী তাহার স্বামীর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা শিউচন্দ্রিকাবাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। সে টাকার হিসাব একমাসের মধ্যে যেন শিউচন্দ্রিকাবাবু দিয়া দেন। নচেৎ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আইনের অপ্রিয় পথ লইতে হইবে।

রহমৎ বলে, এ সব করাচ্ছে সরযু সিং, অভিমন্যুর পেয়ারের দোস্ত। রামভরোসা সর্দার, আর জয়নারায়ণ প্রসাদের সঙ্গে ওটাকে গুজগুজ করতে দেখেছি। মণিঅর্ডারের রসিদগুলো তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে অভিমন্যু ভুলে গিয়েছিল।

শত্রু-শিবির একেবারে তছনছ করে দিতে চায় জয়নারায়ণ প্রসাদ। আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ কৌশল তা সে জানে।

অপর পক্ষও বসে থাকে না চুপটি করে। লুম-ডিপার্টমেন্টেই ইউনিয়নের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এই তাঁত-ঘরের মজুররা কালু সর্দারের গ্রেফ্‌তারের প্রতিবাদে একদিন কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

মিল আর রেল লাইনের মধ্যে যে জলা জমিটা আছে সেখানে চরতে গিয়েছিল ধনীরাম ব্যারাকের মালিকের মোষদুটো। সেদিন কালেক্টর সাহেব এসেছিলেন সেদিন ঐখানেই রাতারাতি ফেলা হয়েছিল বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের 'পশুর খাদ্য' ছাপ দেওয়া আটার বস্তাগুলো। তার পরের দিনই ধনিরামের মোষদুটো—চরতে গিয়ে ঐ 'পশুর খাদ্য' আটা খায়। তার দুদিনের মধ্যে রক্ত-আমাশার মতো একটা ব্যাররামে দুটোই মরে যায়। ধনিরাম সেই কথা বলতে আসে শিউচন্দ্রিকাকে। তাকে দিয়ে শিউচন্দ্রিকা মিলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনায়। সে জানে যে, এ মোকদ্দমা চলবে না। কিন্তু কাগজে-কলমে একটা প্রমাণ থেকে যাবে, ম্যাকলীন সাহেব আর জয়নারায়ণ প্রসাদের বিরুদ্ধে ; কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তাদের গিয়ে ; ধনিরাম খরচ করে ভাল উকিল রাখবে তাদের জেরা করবার জন্য।···

মজুরদের উপর জুলুমের প্রতিবাদের জন্য টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম যায় পাটনায়। ধর্মঘটের চরম-পত্রের নকল যায় লেবার কমিশনার সাহেবের কাছে। শিউচন্দ্রিকা নিজে পাটনা যায় মজুর বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অনেক কাজ ; এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা-ঘামানোর সময় নেই। তবে তিনি শিউচন্দ্রিকার দরখাস্ত পাঠিয়ে দেন লেবার কমিশনারের কাছে আর তাঁকে লিখে দেন, যত শীঘ্র সম্ভব বলীরামপুর যেতে।

লেবার কমিশনার সাহেব দুই পক্ষকেই ডাকেন ডাক-বাংলাতে।

শিউচন্দ্রিকা গেলে তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, সন্ধ্যার পর তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে চান একান্তে, কর্মচারীদের সম্বন্ধে। আর পনের মিনিট পর

থেকে মজুরদের দাবির তদন্ত আরম্ভ হবে। বসুন ততক্ষণ আপনারা ঐ ঘরে।

ডাক-বাংলায় একটা টেবিলের চার দিকে সবাই বসে। মধ্যেখানে লেবার কমিশনার। তাঁর এক দিকে ম্যাকনীল সাহেব আর জয়নারায়ণ প্রসাদ। অন্য দিকে শিউচন্দ্রিকার আর অভিমন্যু। এক দিককার লোকেরা অন্য দিকের লোকেদের দিকে তাকায় না। সকলেই যেন লেবার কমিশনারের সঙ্গে গল্প করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ম্যাকনীল সাহেবের মতো কেতা-দুরস্ত লোকও আজ শিউচন্দ্রিকাকে অভিবাদন করে না। ম্যানেজার সাহেব মনে করে যে, আজ শিউচন্দ্রিকার প্রতি শিষ্টাচার দেখালে, যে কয়জন মজুরদের দিকে সাক্ষী বাইরে বসে রয়েছে তারা ভুল ভাববার সুযোগ পাবে যে, সাহেব শিউচন্দ্রিকার খোসামোদ করেছে। আর শিউচন্দ্রিকারও ভয় ভয় করে যে আজ জয়নারায়ণ প্রসাদকে সাধারণ সৌজন্য দেখালেও, মজুররা আবার তাকে সুদ্ধ 'দালাল' না বলে বসে।

মিছিল করে নানা রকম ধ্বনি দিতে দিতে কয়েক হাজার মজুর এসে ঢোকে ডাক-বাংলার হাতার। লেবার কমিশনার সাহেব বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

'এদের আবার কেন আনিয়াছেন শিউচন্দ্রিকাবাবু? এদের তো আসবার কথা ছিল না?'

'না স্যার, আমি আসতে বলিনি। আপনি এসেছেন শুনতে পেয়ে ওরা এসেছে আপনার কাছে। এ বিষয়ে ওরা আমার কথাও শুনবে না।'

'তাহলে আবার আপনার মজুরদের উপর প্রভাব কী আছে?'

লেবার কমিশনার সাহেব নিজে গিয়ে তাদের ফিরে যেতে বলেন।

'না হুজুর, আমরা একটুও গোলমাল করব না।

কী আর করেন কমিশনার সাহেব। হয়তো এগুলো একটা গোলমাল বাধাবে বলেই এসেছে। বারণ করলেও শুনবে না। জোর-জার করতে গেলে এখনই হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেখে একটা। আজকাল আর সম্মানের সঙ্গে চাকরি-বাকরি করবার উপায় নেই। 'আচ্ছা তোমরা তাহলে বসে পড় যে যেখানে আছ। চেঁচামেচি করলে কিন্তু তোমাদের এখানে থাকতে দেব না।

হঠাৎ ডি, এস, পি, আর এস, ডি, ও সাহেব মোটরে এসে হাজির হয় ডাক-বাংলাতে।

'আপনাদের কে খবর দিল আসতে?' কে যে খবর দিয়েছে, তা আর কমিশনার সাহেবের বুঝতে বাকি নেই।

অভিমন্যুর জবাব দেয়, 'এখানে আসবার জন্য খবর পাবার দরকার হয় না ওঁদের প্রায় রোজই আসেন ওঁরা এখানে।'

তার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানে জয়নারায়ণ প্রসাদ আর ডি, এস, পি।

শিউচন্দ্রিকা অভিমন্যুকে কোনো কথা বলতে বারণ করে; হাওয়া এখন আমাদের দিকে। দুটো সস্তা ঠাট্টা করে সেটাকে নষ্ট হতে দিও না। শিউচন্দ্রিকা মনে মনে বোঝে যে, আজ আবহাওয়া ভাল। লেবার কমিশনার মজুরদের উপর একটু প্রসন্ন আছেন কেন যেন। ইনি ন্যায় বিচার করবার চেষ্টা করবেন আজ! 'আচ্ছা, এবার কাজের কথা আরম্ভ হোক।'—বাইরে মজুরদের গুঞ্জনধ্বনি থেমে যায়।

'—আমার, থ্যাঙ্কলেস' কাজ, আপনাদের দুই পক্ষের সহযোগিতা বিনা অসম্ভব। আমি যতদূর বুঝেছি, বর্তমানে মজুর ও মিল-মালিক দুই পার্টিরই শান্তিপূর্ণ ভাবে আপোষ করবার মনোভাব নেই। কিন্তু এই মনের ভাব কারও পক্ষেই ভাল নয়।

সব দায়িত্বশীল লোকই বুঝবেন যে, দেশের পক্ষেও জিনিসটা ক্ষতিকর...'

কোন পক্ষই লম্বা লেকচার শুনতে তৈরি নয়। কাজের কথা চায় তারা।

ম্যাকনীল সাহেবই প্রথম কথা বলে;—আমরা আপোষ করতে চাই মজুরদের সঙ্গে, তাদের নেতাদের সঙ্গে নয়।

শিউচান্দ্রিকা বলে—আমরা তো স্যার সদ্ভাব চাই বলেই আপনাকে খবর দিয়েছি।

তারপর আরম্ভ হয় উভয় পক্ষের শুনানি। শুনানি মানে বাক্-বিতণ্ডা, কথা কাটাকাটি; কখনও নরম তর্ক, আবার কখনও বা হাতাহাতি হবার উপক্রম। জয়নারায়ণ প্রসাদ কথায় কথায় স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে। হাত-পা নেড়ে মাথা মুণ্ডু নেই কত কী বলে যায়। ম্যাকনীল সাহেবের সম্মুখে আরও বেশি করে সে নিজের কর্মনিষ্ঠা দেখাতে চায়।

শিউচান্দ্রিকা বাজে কথা বলে না একটিও। মজুররা ভাবে এত বহস্ করছে এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, ওরই বুঝি জিত হবে। কিন্তু শিউচান্দ্রিকার প্রতিটি যুক্তি অকাট্য। কাগজ-পত্র, ফাইল, তারিখ, সব তার তৈরি। কলকাতার কোন জুট মিল কী মজুরি দেয় বিভিন্ন বিভাগে, সব তার মুখস্থ। কলকাতার প্রতিটি জিনিসের দাম এখানকার সরকারী গেজেটের বাজার দর, মুনাফার হার, আবশ্যক জিনিসের দরের প্রতি মাসের সূচক-সংখ্যা তার নখদর্পণে। বলীরামপুর জুট মিলের গত দশ বৎসরের লাভের এবং মজুরদের আয়ের পাশাপাশি 'গ্রাফ' এঁকে রেখেছে সে। কমিশনার কেন, ম্যাকনীল সাহেব পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন জয়নারায়ণ প্রসাদের উপর।—কাগজ-পত্র আঁক-জোখ, হিসাব, সংখ্যা, কিছু নিয়েই সে তৈরি নেই; নিশ্চিতভাবে শিউচান্দ্রিকার একটা যুক্তিরও সে খণ্ডন করতে পারছে না; কেবল বাজে চেঁচামেচি করছে।

তবে এই মজুরির বিষয়ে ঝট করে কিছু করতে চান না লেবার কমিশনার। মিল কর্তৃপক্ষও কাগজ-পত্র নিয়ে ভাল ভাবে তৈরি হলে মাসখানেক পর এর বিচার করতে আবার আমি আসব। কলকাতার রেট আপনারাও আনবেন মিস্টার ম্যাকনীল। আর সব দরকারী হিসাব-পত্র...

'হিসাবের কোন খাতাটা হুজুর? ইনকাম-ট্যাক্সেরটা না আসলটা? মজুরদের হাজির বই পর্যন্ত দুসেট আছে স্যার।

অভিমন্যু আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল। শিউচান্দ্রিকা তাকে থামিয়ে দেয়। বাইরের মজুরদের গুঞ্জন ধ্বনিতে বোঝা যায় যে, অভিমন্যু কথাটা তাদের বেশ মনের মত হয়েছে।

'আচ্ছা, এই দুই নম্বরের আইটেম 'ক্যানটিন'-এর সম্বন্ধে অভিযোগ, আর তিন নম্বরের আইটেম, 'ক্রেশে'র সম্বন্ধে অভিযোগে আসা যাক। দেখুন মিস্টার ম্যাকনীল মজুরদের সুখ-সুবিধা দেবার বিষয়গুলিতে আমি খুব গুরুত্ব দিই। এ সব বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটি দেখতে পেলে আমি আপনাদের ছাড়ব না।'

শিউচান্দ্রিকা বোঝে যে, আসল মজুরী বাড়ানোর দাবিটা কমিশনার এখনকার মতো চাপা দিয়ে দিলেন। এখন এই সব ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে নিজের পক্ষপাতহীনতা দেখাবেন।

'হুজুর রামপীরিত আহির সাক্ষী দেবে 'ক্রেশে'র দুধটা কার কার বাড়ি যায়; আর ক্যান্‌টিনের ব্যাপারটায়...'

কথাটা শেষ হবার আগেই লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে জয়নারায়ণ প্রসাদ।—'কাদের

সঙ্গে কথা বলছেন হুজুর, কতকগুলো চরিত্রহীন ছোটলোকের দল, যারা মজুরদের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের পেট চালায়…'

হাঁ-হাঁ করে উঠে দাঁড়িয়েছে বাইরের লুম্-ডিপার্টমেন্টের মজুররা ; তার পর তাদের দেখা দেখি অন্য সব মজুররা। তাদের মন্ত্রীজীর সম্বন্ধে এই কথা বলতে সাহস করছে এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, তাদেরই সম্মুখে ! আশ্চর্য বুকের পাটা লোকটার ! দু-দুটো অনাথালয়ের মেয়েকে এখনও ঢুকিয়ে রেখেছে মিলের মধ্যের কোয়ার্টারে ; অনাথালয়ের মেয়ে পাঞ্জাবে বেচে যার রোজগার মিলের রোজগারের চাইতে বেশি, সেই লোকটাই অভিমন্যু আর শিউচন্দ্রিকাকে লম্পট বলে ! জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব ।

এগিয়ে আসে রহমৎ, তার বিবির চাকরির কথা ভুলে। এগিয়ে আসে ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টের বচ্চন সর্দার। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তারা জয়নারায়ণ প্রসাদের উপর।

ম্যাকনীল আর এস. ডি. ও. সাহেব মজুরদের হাব-ভাব দেখে ভয় পেয়ে যান। লেবার কমিশনার শিউচন্দ্রিকার দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করে,—এই জন্য মজুরদের এখানে আসতে দিতে আমার আপত্তি ছিল—তা তো আপনারা শুনলেন না। এখন যে রকম দেখছি, কাজ স্থগিত করে দিতে হয়।

শিউচন্দ্রিকা বলে—'অভিমন্যু গিয়েছে বাইরে ! এক মিনিটের মধ্যে মজুররা ঠাণ্ডা হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসবে।

হলও তাই। অভিমন্যু ফিরে এসে বসল নিজের চেয়ারে। ডি. এস. পি আরদালির মারফৎ কী যেন একখানা চিঠি পাঠালেন থানার দারোগার কাছে।

চারিদিক নিস্তব্ধ হলেও ঘরের সকলেই বোঝে যে, জয়নারায়ণ প্রসাদের আর একটি অসাবধান কথার ফুলকি, দপ করে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে এই বারুদের স্তূপে। তখন আর হাজারটা অভিমন্যু এলেও তাদের থামাতে পারবে না !

চতুর্দিকের এই থমথমে ভাবটা কিন্তু একটুও দমাতে পারে না জয়নারায়ণ প্রসাদকে। এই অগাধ আত্মপ্রত্যয়ই তার জীবনের সাফল্যের মূলে।

'উভয় পক্ষের সম্বন্ধ যথেষ্ট তেতো হয়েছে। অযথা তা আর বাড়িয়ে লাভ কী ? লেবার কমিশনার জয়নারায়ণ প্রসাদকে আর একটু বুঝে-সুঝে কথা বলতে বলেন ইউ-নিয়নের কর্মীদের সম্বন্ধে।

'প্রত্যেকটি কথা আমি আগে ওজন করে নিয়ে তবে বলেছি। সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই না। আপনি স্যার এই ইউনিয়নের গুণ্ডাদের চেনেন না।'

অবাক হয়ে যায় শিউচন্দ্রিকা। এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে সে ভাল ভাবেই জানে। তার মতো কুটবুদ্ধি লোক হঠাৎ গায়ে পড়ে এত গালাগালি দিতে আরম্ভ করল কেন তাদের ? আর কিছু কি বলবার নেই মিল-মালিকের পক্ষ থেকে ? দিক, প্রাণ ভরে গালাগালি দিক জয়নারায়ণ। গালাগালির জবাবে শিউচন্দ্রিকা দেবে নথি প্রমাণ, কাগজ। মাথা গরম করলে, ইউনিয়নের দাবি পূরণের দিক থেকে কিছু সুবিধা হবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা যে, লেবার কমিশনার এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের এই অসংযত কথাবার্তা পছন্দ করছেন না। জয়নারায়ণের কথা যে একটাও তার কানে যায়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে, শিউচন্দ্রিকা ফাইল থেকে বার করে ধনিরামের মোষ মারার মোকদ্দমার কাগজপত্র।

অভিমন্যু চিৎকার করে ওঠে হঠাৎ : মুখ সামলে কথা বলবেন জয়নারায়ণবাবু।

কমিশনারসাহেব, আপনিই জিজ্ঞাসা করুন জয়নারায়ণবাবুকে, ডাক-বাংলার এই ঘরখানাকে এক দিন পাড়ার লোকে অর্ধেক রাত্রে ঘিরে ফেলেছিল।

এস. ডি. ও. সাহেবের মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে। লেবার কমিশনারের মুখে একটু যেন কৌতুহল প্রকাশ পায়। বাইরের মজুরদের মৃদু স্বরে রুক্ষতার আভাস পাওয়া যায়। তারা অভিমন্যুর তারিফ করছে,—বলবার মতো যা কিছু বলছে তো অভিমন্যুই; মন্ত্রীজীর আজকে কী যেন হয়েছে; কাগজের লেখা তো হাকিম যখন ইচ্ছে পড়ে নিতে পারবে; কিন্তু তার সম্মুখে জবাব দেবার সুবিধা তো আর পরে পাবে না।...

'ডাক-বাংলতে কবে কী হয়েছিল না হয়েছিল, আজকের তদন্তের সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। কেবল অনর্থক আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবার নতুন নতুন রাস্তা বার করছে এরা।' এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল মাকনীল সাহেব।

'দুটোর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই বলছি, না হলে বলতাম না।' রুক্ষ স্বরে জবাব দেয় অভিমন্যু।

বাইরে মজুরদের কথাবার্তাও বেশ তীব্র ঝাঁজালো হয়ে এসেছে। আর বোধ হয় তাদের সংযত করে রাখা যাবে না।...

এই দেখুন স্যার এই ত্যাগী সন্ন্যাসীদেয় নৈতিক চরিত্রের একখানা প্রমাণ-পত্র। নাটকীয় ভাবে ট্রাউজারের পকেট থেকে বার করে, একটি-একটি করে ভাঁজ খুলে জয়নারায়ণ প্রসাদ চিঠিখানি দেয় লেবার কমিশনারের হাতে। তার মুখে বিজয়ীর দীপ্তি, অঙ্গভঙ্গিতে সাফল্যের ব্যঞ্জনা। মরা বাঘের দেহটার উপর এক পা তুলে দিয়ে বন্দুকধারী শিকারী ফটো তোলাতে দাঁড়ালে ঠিক এমনি দেখায়।

লেবার কমিশনার চিঠিখানা পড়েন। 'ব্যাপারটা কী পরিষ্কার করে বলুন তবে তো বুঝি।'

শিউচান্দ্রকা আর অভিমন্যু ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা দেখবার জন্যে; কমিশনার-সাহেব চিঠিটা দেন শিউচান্দ্রকাকে। উদগ্র কৌতুহলে দশ হাজার মজুরের কান খাড়া হয়ে ওঠে।

অভিমন্যুর ক্রোধের আগুন দপ করে নিবে যায়। মুখখানা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ধরা পড়ে গিয়েছে সে হাতে-নাতে। রহমতের বিবির মারফত পাঠানো এই চিঠিখানা কী করে এল জয়নারায়ণ প্রসাদের হাতে? মিনাকুমারীর বাক্স থেকে নিশ্চয়ই কোনো রকমে চুরি করিয়েছে জয়নারায়ণ। চিঠিখানা সযত্নে বোধ হয় তুলে রেখেছিল মিনাকুমারী বিছানার নিচে। চিঠিখানা পড়ে তখনই যদি ছিঁড়ে ফেলে দেয় মীনাকুমারী, তাহলে আর এ বিপদে পড়তে হয় না। ছেঁড়া বললেই ছেঁড়া যায় এ সব চিঠি। অভিমন্যু নিজেও তো জানে! কত বার হয়তো পড়েছে মিনাকুমারী এই চিঠিখানা—কত রাত পর্যন্ত।...

বর্তমান আবেষ্টনীতে এ চিঠির গুরুত্ব সে যথেষ্ট বোঝে। এতগুলো মজুরের চোখে সে মুহূর্তের মধ্যে এস. ডি. ও. সাহেবের চাইতেও হেয় হয়ে যাবে। আর সব-চাইতে বড় কথা যে, শিউচান্দ্রকার কাছে সে অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে। এর পর জয়-নারায়ণকে হয়তো বা শিউচান্দ্রকা বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু তাকে কোনো দিনই পারবে না। আর সময় নেই ভাববার। কোণঠাসা জানোয়ারের মতো সে মরিয়া হয়ে ওঠে।...সে নিজের কথাই ভাবছে এতক্ষণ। আর মিনাকুমারীর দিকটা সে ভাবছেই

না ; অনুশোচনায় তার মন ভরে ওঠে। তার নামেও কলঙ্ক লাগিয়েছে সে।...ইউ-নিয়নের স্বার্থে আঘাত লাগবে বলে অভিমন্যু তার জীবনের স্বপ্ন-সাধ মুছে ফেলে দিতে পারে না। কারও মুখ চেয়ে সে কথা বলবে না। সে সর্বসমক্ষে পরিষ্কার ভাবে তার প্রাণের কথা বলবে। বলবে যে, সে চায় মিনাকুমারীকে, আর মিনাকুমারী চায় তাকে। তারা চায় বাসা বাঁধতে। এর মধ্যে অসম্মানজনক কিছুই নেই ; কারো কাছে লুকোবার কিছু নেই।

শিউচন্দ্রিকাও অবাক হয়ে গিয়েছে চিঠিখানা দেখে। জাল নয় তো। হাতের লেখা অভিমন্যুর মতোই মনে হচ্ছে! অভিমন্যু! অভিমন্যুর মুখের দিকে তাকিয়েই সে সমস্ত ব্যাপারটার একটা ধারণা করে নেয়। শিউচন্দ্রিকা স্থিতধী লোক। অভিমন্যুর উপর চটবার সে অনেক সময় পাবে পরে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই চিঠিখানি প্রকাশ হয়ে যাবার ফলাফল—মজুরদের দাবির উপর, লেবার কমিশনারের মনের উপর, ইউ-নিয়নের সংগঠনের উপর, আর তার পার্টির সুনামের উপর কী হবে, সেইটাই সে মনে মনে হিসাব করছে। সেই বুঝেই এখানকার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে এখনই। অভিমন্যুর কথা কানে আসে—'হাঁ স্যার, এ চিঠি আমারই লেখা'

জয়নারায়ণ প্রসাদ তার মুখের কথা ছেড়ে নিয়ে বলে, 'তবু ভাল যে আপনারা চিঠিখানাকে জাল বলেন নি।'

তারপর কমিশনারসাহেবকে আদ্যন্ত ঘটনাটা শোনায়—'মিনাকুমারী মিলের ক্যানুটিনে মেয়েদের বিভাগের সুপারভাইজার। তাঁর কোয়ার্টার মিলের ভিতর। তাঁর কাছে এই মহাত্মাটি এই অভদ্র চিঠিখানা পাঠিয়েছিলেন। ভদ্র মহিলা তো এই চিঠি পেয়ে রাগে অপমানের কেঁদে-কেটে আকুল। তারপর তিনি এই চিঠিখানা ম্যানেজার সাহেবকে দেন এই অপমানের প্রতিকারের জন্য। বোঝেনই তো স্যার, এক জন অবিবাহিতা ভদ্র-মহিলার এই সব বিষয় নিয়ে কোর্টে যাওয়াও কতটা বিপজ্জনক। আমি খালি এই স্কাউন্ড্রেলটার আসল রূপ আপনার কাছে ধরে দেওয়ার জন্য এই চিঠি সকলের সমক্ষে আনলাম। ক্যানুটিন আর ক্রেশের সুপারভাইজার দুইজনকেই এই ইউনিয়নের মহাত্মাদের তদ্বিরে আমরা বহাল করি। সেই মহিলারা যে নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হতে পারেন, এটা বোধ হয় এঁরা আশা করেননি। আমার শালীনতাবোধ এর চাইতে পরিষ্কার করে কথাটা আমাকে বলতে দিচ্ছে না। অল্প কথায়,—প্রেমে হতাশ না হলে ক্যানুটিন আর ক্রেশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসত না, এ আমি জোর গলায় বলতে পারি।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঘটেছিল অন্য রকম। জয়নারায়ণ যখন আক্রমণের নীতি নেয়, তখন আট-ঘাট বেঁধেই কাজ করে। চোখ রাখে সজাগ, কান রাখে খাড়া করে। সব সময় অস্ত্র শাণ দিয়ে ঝকঝকে করে রাখে, কখন কোনটার দরকার পড়বে কিছু বলা যায় না। জলের মতো বইয়ে দেয় টাকা। উপরের সরকারী অফিসার থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়নের নিম্নতম কর্মী পর্যন্ত সকলকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করে টাকা দিয়ে। যাদের লোভ দেখিয়ে হাত করতে পারে না, তাদের জন্য তৈরি হয় কড়া ওষুধ।

অভিমন্যু চিঠিখান দিয়েছিল ঠিকই রহমতের বিবির হাতে। টাকার খেলাতেই চিঠিখানা মিনাকুমারীর হাতে না পড়ে, পড়ে রুকণীর হাতে। রুকণীই চিঠিখানা দেয় জয়নারায়ণকে। রুকণীর সঙ্গে জয়নারায়ণ প্রসাদের সম্বন্ধটা ঠিক আলাপ-পরিচয়ের পর্যায়ে পড়ে না। একটু হয়তো বাড়িয়ে বললেও অনাথালয়ে ডেঁপো ছেলেরা মোটামুটি ঠিকই বলত।

জয়নারায়ণ টাকা ঢালতে রাজী ছিল অভিমন্যুর চিঠির জন্যে। অনাথালয়ে মানুষ হওয়া মেয়ের পক্ষে টাকার লোভ সামলানো শক্ত, এ কথা জয়নারায়ণ প্রসাদ বোঝে। তাই রুকণী যখন চিঠিখান নিয়ে গিয়ে তার হাতে দিল, তখন সে আশ্চর্য হয়নি।

কিন্তু একটা কথা রুকণী ছাড়া আর কেউ জানে না। এই চিঠির ব্যাপারে জয়-নারায়ণের দেওয়া টাকার কথাটাই তার কাছে সব ছিল না। এ ছাড়া আরও কয়েকটা জিনিস তার মনের মধ্যে কাজ করেছে। হয়তো একটা ঈর্ষার ছোঁয়াচ ছিল এর মধ্যে। সে মিনাকুমারীর থেকে সুন্দরী ; তার কথাবার্তার একটা আকর্ষণ আছে, সে কথাও সে জানে। তবু সে অভিমন্যুর মনে সাড়া জাগাতে পারেনি। মীনাকুমারীর কাছে এই প্রথম পরাজয়ের গ্লানিটা, সে বোধ হয় মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি একেবারে। মিনাকুমারীর সব মনের কথা সে শুনেছে। কিন্তু নিজের মনের গোপন কোণের এই খবরটা সে মিনাকুমারীকে জানতে দেয়নি কোনো দিন। কত কথা মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারে, সব কি বলা যায় ? আর অভিমন্যুর কথা কি কখনো বলা যায় মিনা-কুমারীর কাছে ?...মিনাকুমারী বিয়ে করে এখান থেকে চলে যায়, তাও রুকণী চায় না। দুজন একসঙ্গে থাকলে তবু লোকের মুখ কতকটা বন্ধ করা যায়।...আজ-কালকার চাকরির জীবনও রুকণীর খারাপ লাগে না। বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই। তবে সে বিবাহিত জীবনে চায় স্বাচ্ছল্য আর সমৃদ্ধি ; আর বিবাহের পরও সে চায় উচ্ছল জীবনের স্পন্দনের নিত্য-নূতন উদ্দীপনা। বোধ হয় অনাথালয়ের মেয়ের পক্ষে অমন বিবাহ সম্ভব নয়! সেই জন্য সে জোর করে নিজের বিয়ের কথা ভাবতে ভুলেছে। তবু মাঝে-মাঝে বার্ধক্যের কথা মনে হলে ভয় হয়। এখনও রক্তের জোর আছে, যখন সেটা থাকবে না, তখন কী হবে ? বিয়ে করতে হলে এখনই করা ভাল, কত দিন এ কথা তাকে বুঝিয়েছে মিনাকুমারী।

এ সব সত্ত্বেও হয়তো রুকণী অমন সুশ্রী হাসিমুখ ছেলেটাকে বিপদে ফেলবার জন্যে এমন ষড়যন্ত্র করত না এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের সঙ্গে মিলে। কিন্তু যখন তার কাজের সম্বন্ধে, তার 'ক্রেশে'র সম্বন্ধে অভিযোগ অভিমন্যুরা কাগজ ছাপিয়ে বার করতে লাগল, তখন আর সে নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারল না। একজন তার অনিষ্ট করে যাবে, আর সে নির্বিবাদে সয়ে যাবে, তেমন মেয়ে রুকণী নয়। একটা স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে সে উঠে পড়ে লাগতে জানে ; আঘাত ফিরিয়ে দিতে জানে।

আর মিনাকুমারী এখনও জানতে পারেনি, অভিমন্যুর এই চিঠিখানির কথা। সেই দিনকার সন্ধ্যার স্মৃতির পরশ এখনও লেগে আছে তার মনে ; খালি মনে কেন, সারা দেহে। অভিমন্যুকে সে ভালবাসে বলেই তার মন নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে চায় না আর। তাই সে অভিমন্যুর চিঠির জবাব দেয় না আজকাল। আর সে অভিমন্যুর ব্যথার আগুন বাড়তে দেবে না নিজে ইচ্ছা করে। সে তো বেশি কিছু আশা করেনি অভিমন্যুর কাছে। চেয়েছিল মাত্র একখানা বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট আঙিনা। এই সামান্য আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করতে পারল না অভিমন্যু।...অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা-শোনা বন্ধ করা যায় ; কিন্তু তার কথা ভাবা কি কখনও বন্ধ করা যায় ? ভেবে ফুরোনো যায় না অভিমন্যুকে। তার জীবনটা ভরে আছে অভিমন্যুতে, অথচ সারা জীবন কাটাতে হবে তাকে না পেয়ে। রহমৎ বিবির অভিমন্যুর সংবাদ আনবার বিরাম নেই। মিনাকুমারীরও তার জন্য উৎকণ্ঠার সীমা নেই। কাকে সে দোষ দেবে এর জন্য নিজেকে ছাড়া।

রুকণী এসে তাকে কাগজ দেখায়।—এই দ্যাখো অভিমন্যুদের প্রস্তাব, ক্যান-

টিনের খাবার আমরা নিয়ে গিয়েছি অনাথালয়ে। মিনাকুমারী জানে যে খবরটা সত্যি, কিন্তু এ ও জানে যে অভিমন্যু তার বিরুদ্ধে কিছুতেই যেতে পারে না, যতই কাগজে কিছু লিখুক না কেন। এ হচ্ছে ঐ শিউচন্দ্রিকার কাজ। 'নেই কাজ তো খই ভাজ' —আর কিছু পেলে না তো আমাদের পেছনেই লাগো। তুই যাই বলিস, অভিমন্যু আমার বিরুদ্ধে লিখেছে, এ কথা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করি না।

রুকণী তাকে ঠাট্টা করে—'দীক্ষিতদের আমবাগানের কথাটা আজও ভুলতে পারিসনি তুই দেখছি। তুই মেম্বর হয়ে যা ইউনিয়নের।'

এ কথায় মিনাকুমারীর হাসি আসে না। সে জানে যে, সে কাঁদাতে পারে অভিমন্যুকে। সেই রুদ্ধ কান্নার ঢেউই এসে লাগছে তার মনে অষ্টপ্রহর। সে নিজেকে অপরাধী মনে করছে চব্বিশ ঘণ্টা; কিন্তু উপায় নেই। বর্তমানের আনন্দটুকু সব নয়। আমের মুকুলের মধু কদিন ঝরে বছরে!...

চিঠি তো নয়—একটা যেন বোমা পড়ছে লেবার কমিশনারের টেবিলের উপর। কথার খই ফুটছে জয়নারায়ণ প্রসাদের মুখে। নুইয়ে পড়ছে অভিমন্যুর মাথা। হতবাক্ হয়ে গিয়েছে বাইরে মজুরের দল; এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের গর্বোদ্ধত মুখের দিকে তাকানোর সাহস হারিয়েছে শিউচন্দ্রিকা। লেবার কমিশনার একটু নড়ে চড়ে বসেন তাঁর মেদবহুল শরীরটাকে চেয়ারখানা ভরে খাপে-খাপে বসিয়ে নেওয়ার জন্য। পেটের খোলা বোতামটা এঁটে, চশমার কাচ রুমাল দিয়ে মুছে, এক চুমুক জল খেয়ে, একবার গলা-খাঁকার দিয়ে তিনি যেন আবার নতুন করে তৈরি হয়ে নেন। শিউচন্দ্রিকা বোঝে যে, এ কমিশনার নতুন মানুষ। আর ইউনিয়নের পক্ষের কথা তাঁর মনে দাগ কাটতে পারবে না। রঙের তাস খেলেছে এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে সে শত্রুপক্ষকে; ছনছ করে দিয়েছে এতক্ষণের শিউচন্দ্রিকার জমানো পুঁজি।

অভিমন্যু এখনও বার করে দিতে পারে তার ঝোলার মধ্যে থেকে মিনাকুমারীর চিঠিখানা। তাতে হয়তো তার সম্বন্ধে কমিশনারসাহেবের একটা ভুল ধারণা কেটে যেতে পারে। মিনাকুমারী নিজে দিয়েছে এই চিঠি ম্যানেজারের কাছে। বিশ্বাস করতে মন চায় না; কিন্তু রূঢ় প্রমাণিত বাস্তবের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। কোনো সন্দেহ করবার কারণ নেই জয়নারায়ণের কথায়। মিনাকুমারী বদলেছে। আগেও বোধ হয় এই রকমই ছিল; অন্য রকম থাকলে তবে তো বদলাবার কথা ওঠে। না, না, তা হতে পারে না। এত দিনের এত কথা, চোখের জল, আদর-অনুযোগ, চিঠির উপরের কালির আঁচড়গুলো, দীক্ষিতদের বাগানের আমের মুকুলের সৌরভ, সবই কি মিথ্যে? প্রতি পদে-পদে সে কি ভুল বুঝে এসেছে? অসম্ভব! হতে পারে না তা। সে নিজেকে যত দিয়েছে, বোধ তার চাইতেও বেশি করে মিনাকুমারী পেয়েছে। কোনো দিন তার রেশ যাবার নয়। সাফাই গাইবার জন্য সেই মিনাকুমারীকে কি অভিমন্যু নিচু করে দিতে পারে? জয়নারায়ণ প্রসাদকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করবার জন্য সে কি বার করে দেবে মিনাকুমারীর চিঠিখানা, সেই রকমই নাটকীয় ভাবে ভাঁজ খুলে-খুলে? অতটা অমানুষ সে নয়! ...অভিমন্যুর ভালবাসার ভেতরে যে অনাবশ্যক পৌরুষের গর্বটুকু মেশানো ছিল, সেইটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এতক্ষণে। সেইটাতে আঘাত দিয়েছে মিনাকুমারী, মনের উপর আঘাতের চাইতেও জোরে। অপমান করছে তার ভালবাসার। এই কথা মিনাকুমারী এত দিন খবর দেয়নি। বাস্তবের রুক্ষ আলোতে তার রঙিন স্বপ্ন-সাধ মুছে দিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। তার নিজের হাতে কাটা ঐ কটা কালির আঁচড়ের ধাক্কায় তার মনের ভিত্তি নড়ে গিয়েছে। এখানকার নথিপত্র, কথার

ফুলঝুরি সব নিরর্থক মনে হচ্ছে এখন তার কাছে।...তবু মিনাকুমারী, সেই মিনাকুমারীই থাকবে তার কাছে। তার নিজের জগৎ মুহূর্তের মধ্যে তছনছ হয়ে গিয়েছে বলে সে সেই মিনাকুমারী নামে কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগতে দিতে পারে না। এর ফল যাই হোক, লোকে ওকে যা ইচ্ছে মনে করুক, তার সম্মান পথের ধুলোয় লুটিয়ে যাক, সে আর বাইরেরর জগতের তোয়াক্কা রাখে না তবুও তার মনের কাছে, তার মিনাকুমারী একান্তভাবে তারই থাকবে চিরকাল। এতগুলি সান্দিগ্ধ নগ্ন দৃষ্টির সম্মুখে, তার একান্ত আপন জিনিসটা সে আনতে পারে না, কিছুতেই।

সকলের হাব ভাব লক্ষ্য করছে বাইরের মজুররা। প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির মনগড়া অর্থ করে নিলেও মোটামুটি তারা ঠিকই বুঝেছে যে, হাকিমের মন ঝুঁকেছে মিল মালিকের দিকে। তারা চেঁচামেচি আরম্ভ করে। হাওয়া দিক বদলেছে। তেতে উঠেছে বারুদের স্তূপ। সবাই জানতে চাইছে সারা ব্যাপারটা। আর বোধ হয় তাদের থামিয়ে রাখা গেল না।

জয়নারায়ণ প্রসাদ ঘরের ভেতর থেকে হাত তুলে মজুরদের শান্ত হয়ে বসবার জন্যে অনুরোধ করেন। গত কয়েক মিনিটে তিনি এই ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস অর্জন করেছেন।

মজুরের দিকে তাকাতে শিউচান্দ্রকা সংকোচ বোধ করে। তবু জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দেয় মজুরদের দাবির বহস্, যেখান থেকে বাধা পড়েছিল, ঠিক তার পর থেকে। কাগজ-পত্র সব সে একের পর এক দেখিয়ে যায়। তার শাণিত যুক্তির আগের থেকে একটুও ভোঁতা হয়নি এখন, তবু যেন তা লেবার কমিশনারের মনে একটা আঁচড়ও কাটতে পারছে না। অভিমন্যুর চিঠি কমিশনার সাহেবের মনের সম্মুখে যে বাধার প্রাচীরটা তুলে দিয়েছে, তাতে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে আসছে কথাগুলো। শিউচান্দ্রকা নিজেই মনে মনে অনুভব করে যে, একটা সংকোচের শৈত্যে তার কথার মধ্যে আবেগের উষ্ণতা একটু কমে এসেছে বোধ হয়। মজুরের দাবির ন্যায্যতার সঙ্গে এক জন ইউনিয়নের কর্মীর প্রেমপত্রের কোনোই সম্বন্ধ নেই, এ কথা সে বোঝে। তবু যে সত্যনিষ্ঠার বলে সে কারও কাছে মাথা নোয়ায়নি কোনো দিন, তারই ভিত্তি যেন দুর্বল করে দিয়েছে অভিমন্যুর চিঠিখানা। ত্রুটিহীন নিষ্ঠার সঙ্গে সে দাবি পেশ করে চলেছে কমিশনারসাহেবের কাছে, কিন্তু তিনি শুনছেন দায়সারা ভাবে, কর্তব্যের খাতিরে। আঙুল মটকে, টেবিলের উপর হাবিজাবি নক্সা এঁকে, হাই তুলে, নখ খুঁটে, তিনি তার অধৈর্যতা চাপবার চেষ্টা করছেন। কথার তুবড়ি জয়নারায়ণ শান্ত হয়ে বসেছে, আর এখন তার হৈ-চৈ করবার দরকার নেই। ম্যাকনীলসাহেবের মুখে ফুটে উঠেছে প্রসন্নতার আভাস। অভিমন্যু ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের উপর মুখ গুঁজে।

বাইরে ক্ষেপে উঠেছে মজুরের দল। জেতবার হাত পেয়েও আজ তারা হেরে যাচ্ছে। আর সব ঐ লক্ষ্মীছাড়া অভিমন্যুটার জন্য। আবার মুখ লুকোচ্ছে। আসতে দে শালাকে বাইরে একবার। তারপর দেখে নেব ঐ ভিজে বেড়ালটাকে!...হিংস্র জন্তুর মতো তারা এখনই অভিমন্যুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ঐ মিটমিটে শয়তানটাকে এখনই ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলতে চায়।

আস্ফালন সব চেয়ে বেশি করছে ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টের সরযু সিং, অর্ডারের রসিদে আঙুলের উপর যে হাত বুলোত।

শিউচান্দ্রকার বলা শেষ হওয়ার পর, লেবার কমিশনার উভয় পক্ষকে ধন্যবাদ দেন।

বিজয়ী বীরের মতো ম্যাকনীলসাহেব, আর জয়নারায়ণ প্রসাদ গট-গট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। মজুররা ঝুঁকে আদাব করে, তাদের মোটরে পেঁছুবার পথ করে দেয়।

কমিশনারসাহেব শিউচাঁদ্রিকাকে বলে দেন যে, সন্ধ্যার পর তাদের যে দেখা করতে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে, সেটা আর হয়ে উঠবে না; তাঁর শরীরটা একটু খারাপ-খারাপ লাগছে।

অজস্র হাসি-টিটকারীর মধ্যে থানার কনস্টেবলরা অভিমন্যুকে কর্ডন করে ঘিরে ইউনিয়ন অফিসে পেঁছে দিয়ে আসে।

ডি. এস. পি. আর এস. ডি. ও. সাহেব শিউচাঁদ্রিকাকে চিন্তিত হতে বারণ করেন—'দুজন পুলিশ রাতে ইউনিয়ন অফিস পাহারা দেওয়ার জন্য থাকবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

'এই কমিটি বিশেষ মনোযোগ ও সহানুভূতির সহিত কমরেড অভিমন্যুর দেওয়া কৈফিয়ৎ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতেছে যে, তাঁহার বালক-সুলভ লঘুচিত্ততা বলীরামপুরের মজুরদের স্বার্থের হানি করিয়াছে, বলীরামপুর-মজদুর-ইউনিয়নকে দুর্বল করিতে সাহায্য করিয়াছে, পার্টির সুনামে কলঙ্ক আনিয়াছে। এই দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার জন্য পার্টি তাঁহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। তিনি পার্টির একজন পুরাতন সদস্য এবং পার্টির প্রতি আনুগত্যে আজ পর্যন্ত তাঁহার কোনো স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। এই কথা মনে রাখিয়া এই কমিটি তাঁহাকে পার্টি সদস্যতা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে না। তবে তিনি মজুরদের মধ্যে কাজের অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছেন। তাঁহাকে মজদুর ফ্রন্ট হইতে কিষাণ ফ্রন্ট-এ বদলি করিয়া দেওয়া হউক এবং শিরনিয়া গ্রামে পার্টির পক্ষ হইতে যে 'বকাশৎ' আন্দোলন চালাইবার কথা হইয়াছে, সত্বর কমরেড অভিমন্যুকে সেইখানে কাজ করিতে পাঠানো হউক। সঙ্গে সঙ্গে এই কমিটি প্রাদেশিক কমিটিকে অনুরোধ করিতেছে যে, সম্ভব হইলে তাঁহারা যেন কমরেড অভিমন্যু সিং এর কার্যক্ষেত্র কয়েক মাস পর অন্য জেলায় বদলাইয়া দেন।'

৭-৭ ৪৭ তারিখে পার্টির জেলা কমিটির একটি বৈঠক হয় সদরে। তারই এই চার নম্বরের প্রস্তাবটার কপি এসেছে। শিউচাঁদ্রিকার সঙ্গে এই প্রস্তাবটার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে; সেই জন্যেই এখানা তার কাছে পাঠিয়েছে, কেতাদুরস্ত পার্টি অফিস। নিচে একটা ছাপ মেরে দিয়েছে রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে; তাতে লেখা ইংরাজীতে—'সংবাদ জ্ঞাপনার্থ।' এ নিয়ম রক্ষা না করলেও কোনো ক্ষতি হত না। কেন না, শিউচাঁদ্রিকাই মূল প্রস্তাবটা এনেছিল পার্টি মিটিং-এ। কেবল প্রস্তাবটা আনা কেন, মিটিং-এর আগেই অভিমন্যুর কাণ্ড নিয়ে পার্টির মধ্যে তোলপাড় করা, তার কাজ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করা, সব জিনিসের মূলে ছিল শিউচাঁদ্রিকা।

শিউচাঁদ্রিকার আনার মূল প্রস্তাবটা পার্টির মিটিং-এ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। তারপর পাশ করা হয় উপরের ঐ চার নম্বরের প্রস্তাব।

এই নরম প্রস্তাবে খুশী হয়নি শিউচাঁদ্রিকা। সে চেয়েছিল অভিমন্যুকে পার্টি থেকে বার করে দিতে। সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ এক অদ্ভুত কাণ্ড! অভিমন্যুর হালকা স্বভাবের যেমন দুর্নামও ছিল পার্টির ভেতর, তেমনি আবার ঐ হালকা স্বভাবের জন্যই সকলে তাকে ভালও বাসত খুব। তার কথায় কোনো পার্টি সদস্য বিশেষ গুরুত্ব দিত না কোনো দিনই, কিন্তু সকলেই তার কথা শুনতে ভালবাসত। সে কোনো কথা বলতে আরম্ভ করবার বোধ হয় আগেই সকলে হাসতে

আরম্ভ করে দিত—এইবার হাসির কথা আসছে জেনে।

না হলে কি আর শিউচন্দ্রিকার মতো কড়াপাকের পার্টি মেম্বরেও এই খাম-খেয়ালী অভিমন্যুটার উপর এত টান ছিল? পার্টির সকলে ধরে নিত ওটাকে শিউচন্দ্রিকার একটা দুর্বলতা বলে। পার্টি-মিটিং-এ রসিক মেম্বররা শিউচন্দ্রিকাকে চটাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে গম্ভীর প্রস্তাব আনত···অভিমন্যু অন্য কোথাও কাজ করতে দেওয়া হোক। পার্টির কাজ বাড়ানো দরকার অন্যান্য জায়গায়। বলীরামপুর-মজদুর-ইউনিয়ন শিউচন্দ্রিকা একাই সামলে নিতে পারবে।...শেষ করবার আগেই হাসির ধুম পড়ে যেত মিটিং-এ। সভাপতি মশাই পর্যন্ত অতি কষ্টে হাসি চাপতে চাপতে সকলকে সভায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য অনুরোধ করতেন।···সেই শিউচন্দ্রিকা একেবারে বদলে গিয়েছে। অক্লান্ত নিষ্ঠায় তিল তিল করে গড়ে তোলা তার এত সাধের বলীরামপুর মজদুর-ইউনিয়ন। অভিমন্যু এই ইউনিয়নের ভিত্তি নড়বড়ে করে দিয়েছে। আর একমুহূর্তও সে অভিমন্যুকে ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে দিতে পারে না।···এরকম লোকের জন্য সহানুভূতির প্রশ্ন তোলা উচিত হয়নি আপনাদের। ওর জন্য বলীরামপুরে পার্টির নাম ধুলোয় লুটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই পার্টি-সদস্যপদ থেকে সাসপেণ্ড করা উচিত ছিল। আমার সে অনুরোধ পার্টি সেক্রেটারি রাখেননি। যাক, সে তো যা হবার হয়েছে। এখন ওকে পার্টি থেকে বার করে দেওয়া হোক।

মেম্বররা প্রথমটায় হাসি-মস্করা করে—চিঠির নায়িকার সঙ্গে তোমার কিছু সম্বন্ধ নেই তো শিউচন্দ্রিকা?

শিউচন্দ্রিকা রাগে জ্বলে ওঠে—ইউনিয়নের জীবন-মরণের প্রশ্ন, পার্টির-সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন, তোমাদের হাসিও আসছে এই সময়? এখানে সকলে মিটিং করতে এসেছে না ছেলেখেলা করতে এসেছে?···

···তবু অন্য মেম্বররা তার অনুরোধ রাখেনি। অভিমন্যুকে পার্টি থেকে বার করে না দিয়ে, তারা অভিমন্যুকে শিরনিয়ায় পাঠাবার প্রস্তাব পাস করেছে।···

যাক, তবু মন্দের ভাল বলতে হবে। শিউচন্দ্রিকা এখন আবার গিয়ে বলীরামপুরের মজুরদের কাছে বলতে পারবে যে অভিমন্যুকে ইউনিয়ন থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নে অমন লোকের স্থান নেই।···তারপর একটা দুটো গরম বক্তৃতা জয়নারায়ণের বিরুদ্ধে দিতে পারলেই, আবার মজুররা আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে।

তার বিরুদ্ধে অভিযানে শিউচন্দ্রিকার এই অহেতুক উৎসাহে অভিমন্যু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এতটা সে আশা করেনি।

শিউচন্দ্রিকা অবশ্য অভিমন্যুর সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবহারে গত কয়দিন কোনো বৈলক্ষণ্য দেখায়নি। বরঞ্চ তার সুখ-সুবিধে খাওয়া-দাওয়ার দিকে বেশি করে দৃষ্টি রেখেছে। সে অভিমন্যুকে যতটা ভালভাবে চেনে অতটা বোধ হয় আর কেউ চেনে না। পৃথিবীতে অত ভাল তার আর কাউকে লাগে না। সে অভিমন্যুর সঙ্গ চায় কিন্তু ইউনিয়নের মঙ্গল চায় তার চাইতেও তীব্র ভাবে। রাজনৈতিক সহকর্মী হিসাবে সে আর অভিমন্যুকে বিশ্বাস করতে পারে না। তবে পার্টি থেকে বেরিয়ে যাবার পর সে যদি কোনো কাজকর্ম করে, তাহলে তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বর সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। তাকে পার্টিতে রাখলে, এখন পার্টির লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। পরিষ্কার ভাবে যদি শিউচন্দ্রিকা অভিমন্যুকে বুঝিয়ে দেয় যে তার এখন পার্টি থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যাওয়াই ভাল, তাহলে হয়তো অভিমন্যু

হাসিমুখেই বেরিয়ে যেত পার্টি থেকে ; কিন্তু কেউ কাউকে নিজের মনের কথা বলে না, তাই না এত কাণ্ড ! একদিন অভিমন্যুও বলেনি শিউচন্দ্রিকাকে মিনাকুমারীর চিঠির কথা। মিনাকুমারীও বলেনি অভিমন্যুকে যে, সে চায় অভিমন্যু রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ করুক। বললে হয়তো অভিমন্যু তার কথা রাখত। তিনজনের কেউ কারও কাছে নিজের নিজের মনের কথাটা বলবার সুযোগ পায়নি। তাই এই ভুল বোঝাগুলো জট পাকিয়ে গিয়েছে এমনভাবে যে কিছুতেই আর এখন খোলবার উপায় নেই।

অদ্ভুত স্বভাব অভিমন্যুর। শিউচন্দ্রিকার উপর তার রাগ হয় না, হয় অভিমান। একেবারে কোমর বেঁধে লেগেছে তার পেছনে ; তার উপর একটুও কি সহানুভূতির স্থান নেই শিউচন্দ্রিকার মনে ? সে কারও সহানুভূতি চায় না।—ভৃগুতে লিখেছিল যে ঊনত্রিশ বছর বয়সে তার কাছে মহারিষ্টি। সে তো ঘটে গিয়েছে। এর চাইতে মহারিষ্টি আর তার কী হতে পারে ? বলীরামপুরে আর সে নিজেও থাকতে চায় না। মিনাকুমারীর অত কাছাকাছি সে আর থাকতে সাহস করে না। তাই কি ভৃগুতে লিখেছে যে তাঁকে প্রাণে বাঁচতে হলে সন্ন্যাস নিতে হবে। না, না, মিনাকুমারীই ছিল তার জীবনের গ্রহ ; ঊনত্রিশ বছর বয়সের ফাঁড়াটা বিনা চেষ্টায় কেটে গিয়েছে।—অসম্ভব ! লোহার বাঁধন হয়তো চেষ্টা করলে ছিঁড়ে ফেলা যায় ; কিন্তু মাকড়সার জালের সূক্ষ্ম তন্তু যত ছিঁড়তে যাও, ততই আরও জড়িয়ে ধরে সারা দেহে।—কী অন্যায় করেছে সে !—কেবল একটানা কথার কচকচি ! পার্টি, পার্টি, পার্টি ! পৃথিবীসুদ্ধ সকলকে অপমানিত করবার জন্য না কি সে দায়ী ! কিন্তু একটা লোকও তার লোকসানের কথা ভাবছে না, তার ভালবাসার যে কত বড় অপমান হয়ে গেল সে কথা ভাবছে না। কথাসর্বস্ব সবজান্তার দল ! পাঁজরার হাড় গুনতে পারে এরা, কিন্তু মনের জগতের খোঁজ রাখে না। যার মনের জগৎ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে ভেঙে, বাইরের জগতের কী হল না হল, তা দিয়ে তার কী আসে যায় ! বলীরামপুরের মজুররা তার নামে গান বেঁধেছে। তারা আর কতটুকু অপমান করতে পারে অভিমন্যুর ? ও-সব তার কানেও ঢোকে না। একটা একরত্তি মেয়ে, এর আগেই চরম অমর্যাদা দেখিয়েছে তার নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া দানের।—অভিমন্যুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় শিউচন্দ্রিকার সেই আটপৌরে কথাটা, যে লোকটা মইয়ের সব চেয়ে নিচের ধাপে বসে আছে তাকে আর নামাবে কোথায় বলো ?—

মিটিং শেষ হওয়ার পর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি সেখানে অভিমন্যু। গরমের দিনে রাতের সফরই ভাল,—এই বলে রাতারাতি বেরিয়ে পড়েছিল শিরনিয়ার দিকে। হাতে ছিল সেই খদ্দরের ঝোলাটা, সম্বল ছিল মিনাকুমারীর সেই চিঠিখানা। আর মনের জমানো পুঁজিতে ছিল, সেই—সেই দিনকার আমের মুকুলের মাদকতাভরা সুবাস।

গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা

মঘেলী থানার পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরকে এতদ্বারা আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে,

যেহেতু মঘেলী থানার শিরনিয়া গ্রামের অভিমন্যু সিং লুঠতরাজ, ডাকাতি, অবৈধ জনতার নেতৃত্ব করা প্রভৃতি ফৌজদারী আইনের ধারায় অভিযুক্ত,

সেই জন্য সত্বর তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ৮।২।৪৮ তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত

করা হউক। ইহার অন্যথা যেন না হয়।

স্বাক্ষর…দত্তপাঠ্য
ম্যাজিস্ট্রেট।

সরকারবাহাদুর বনাম অভিমন্যু সিং প্রভৃতির মোকদ্দমার ফাইলের এই কাগজখানায় যে দিন ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব দস্তখত করেন, সে দিন তিনি জানতেও পারেননি যে, এখানার জায়গা রাখা আছে চিত্রগুপ্তের ফাইলে।

অভিমন্যুর শিরনিয়ায় চলে যাবার পর, এই ক'মাসে কত কী ঘটে গিয়েছে এই ছোট্ট দুনিয়াটার উপর। লেবার কমিশনার যাবার পরই মিনাকুমারী আর রুকণীর মাইনে বেড়েছিল পাঁচ টাকা করে; হিন্দুস্থান আজাদ হয়েছিল পনেরই আগস্ট; কালু সর্দারের জেল হয়েছিল ছয় মাসের; ম্যাকনীল সাহেবের একবার খুব সর্দি হয়েছিল; এস. ডি. ও. সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন টেলিগ্রাফের অর্ডারে; শিউচন্দ্রিকা আবার মজুরদের হাত করে ফেলেছিল, পুরো মজুরিতে বছরে পনের দিন ছুটি দেওয়ানোর ব্যাপার নিয়ে; আরও কত কাণ্ড হয়তো ঘটে থাকবে পৃথিবীটার উপর।

রুকণী মিনাকুমারীকে বুঝিয়েছিল যে, তুই আর অভিমন্যুকে আমল দিস না বলে সে মনের দুঃখে বলীরামপুর ছেড়ে চলে গিয়েছে। তুইও আবার মনের দুঃখে একটা কাণ্ড-টাণ্ড করে ফেলিস না যেন—হেসে ফেটে পড়ে রুকণী। শুনে মিনাকুমারী চোখের জল চাপতে পারেনি।

হিন্দুস্থান আজাদ হবার পর ক'মাসই বা গিয়েছে; এই আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, আর এখন এই জানুয়ারি চলছে; মাত্র তো এই পাঁচটি মাস!

শিরনিয়া গ্রামে আজাদী পেয়েছে কেবল অযোধিয়া চৌধুরী।

সরকারের মাথায় এখন রাজ্যের ঝঞ্ঝাটের বোঝে। পড়ে পাওয়া আজাদীর নানা রকম ফ্যাকড়া। কিন্তু এই ক'মাসের রাজ্যের ঝঞ্ঝাটের বাধা না মেনে, এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে পোঁতা শ্যামল ধানের চারাগুলো সোনার বোঝার ভারে এলিয়ে পড়েছে আলের উপর। ধানের ধর্ম ধান মেনেছে।

আর জমিদারও তার ধর্ম ভোলেনি। এ পাঁচ মাস অযোধিয়া চৌধুরীর লেঠেলরা লাঠিতে তেল দিতে ভোলেনি। অযোধিয়া চৌধুরী নিজে মঘেলী থানার দারোগাসাহেবকে ভেট পাঠাতে ভোলেনি একদিনও। পুলিশ নিমকহারাম নয়;—যার নুন খায় তার গুণ গায়। সেই ভরসাতেই অযোধিয়া চৌধুরী জমি থেকে বেদখল করতে সাহস করেছে অগণিত রায়তদের। যারা বংশ-পরম্পরায় এই জমিতে অশ্রু আর ঘামের রস জুগিয়ে এসেছে, নির্মম হাতে তাদের উপড়ে ফেলে দিতে চায় শিরনিয়ার জমিদারবাবু,—স্বাধীন ভারতের রসের মধু যেন সে শেকড় না পায়। অযোধিয়া চৌধুরী জানে যে তার এই পাঁচ মাসের আজাদী, ফাঁসির আগের মিষ্টি খেতে পাওয়ার আজাদী, জমিদারী প্রথা লোপের আগে তাই তার এই মরণ-কামড়। কচ্ছপের মরণ-কামড়ও না কি মেঘের ডাকে আলগা হয়ে আসে। অজস্র শেকড়-ছেঁড়া রায়তদের কাতর আর্তনাদ জমিদার কানেও তোলেনি। এই অসহায় আর্তনাদকে তাই বজ্রের নির্ঘোষের রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিল অভিমন্যুর দল। আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল শিরানিয়ায় 'বকাশ্‌ত্‌ আন্দোলন'।

এই কাজেই অভিমন্যুকে পাঠিয়েছিল তার পার্টি।

দশ বছরের মধ্যে এমন ধান আর কখনও হয়নি এদিকে। যারা নিজে হাতে এই

ধান পইতোছিল, তারা কি এর লোভ সামলাতে পারে? তাদের দাবি সামান্য। বাপ-ঠাকুরদার যুগ থেকে তারা যেমন ফসল ভাগ করে দিয়ে এসেছে জমিদারকে, এবারেও তাই দিতে চায়। তারা বোঝে না যে, দেশ আজাদ হয়েছে বলে এবার থেকে কেন অযোধিয়া চৌধুরী পুরো ফসলটাই নিতে চায়। তাদের না কি একটা খুদও নেবার অধিকার নেই, যদি নিতে চাও তো সেলামি দাও বিঘাপিছু দুশো। এখন ফসলের ভাগ নিতে দিয়ে এই শয়তানের জমির উপর কায়েমী দখল প্রমাণ করতে দেবে, এত বোকা অযোধিয়া চৌধুরীকে পাওনি!

কোর্টে হাকিমের কাছে যাওয়ার নোটিস পেয়েছে রায়তরা। পুলিশ মোতায়েন হয়েছে ক্ষেতে ক্ষেতে। সঙ্গে আছে জমিদারের লাঠিয়ালরা। শিরনিয়া উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের বাড়টায় পুলিশরা ক্যাম্প করেছে। পাঁঠা-কাটা হচ্ছে সেখানে।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া যায় যে, একজন হাকিম আসছেন সদর থেকে, ধান কাটাতে। এখন ধান কাটিয়ে রেখে দেবেন অযোধিয়া চৌধুরীর খামারে। পরে কাছারিতে জমির দখলের আর স্বত্বের বিচার হবে।

খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাস্তে নিয়ে জড়ো হয় হাড় জিলজিলে রায়তের দল। তারা বেশি আইন-কানুন বোঝে না, কেবল এটুকু জানে যে কাটা ধান যার খামারে উঠবে তারই থেকে যাবে। অযোধিয়া চৌধুরীর খামারে একবার উঠলে, আর মাথা কুটে মরে গেলেও, একটা বের করতে পারবে না তার কাছ থেকে। দারোগা পুলিশ হাকিম-হুকিম—সকলকেই ও কিনে নেবে। তুমি জানো না অভিমন্যু ওকে, তাই তুমি মানা করছ আমাদের ধান কাটতে। তোমার নিজের হাতে পোঁতা হত, তবে না তুমি বুঝতে ক্ষেতের ধানের মায়া।...পুলিশের ভয় লাগছে অভিমন্যু তোমার?

চোখের জল রায়তদের শুকিয়ে গিয়েছে। শাণ দেওয়া কাস্তের উপর চোখের আগুনের ঝিলিক খেলছে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সকলের। মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা।...

এগিয়ে যায় অভিমন্যু সকলের চেয়ে আগে। না হলে তাকে ফেলে রেখেই এরা চলে যেত! সোনার খনির খোঁজ পেয়েছে তারা। কে কত আগে যেতে পারে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে।...এই আগে চলার প্রেরণা ছাড়া আর সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে মুছে যায় অভিমন্যুর মন থেকে,—মিনাকুমারীর ছবি পর্যন্ত।

পুলিশ আর অযোধিয়া চৌধুরীর লেঠেলদের লাঠির সম্মুখে সেদিন দাঁড়াতে পারেনি তারা। ঝাণ্ডা হাতে অভিমন্যুর উপরই তাদের আক্রোশ ছিল সবচাইতে বেশি। লাঠি পড়েও ছিল অনেক তার উপর; বুকে, পিঠে, মাথায়।—নে! এই নে! আর একটা নে! আর এক বোঝা না পিঠে! আর একটা ধানের বোঝা নে মাথায়! হারামজাদা!

অজ্ঞান হয়ে ক্ষেতের আলের উপর পড়ে গিয়েছিল অভিমন্যু। বিরিঞ্চি, আর শিরনিয়ার আর কয়েক জন মিলে তাকে ধারাধরি করে নিয়ে এসেছিল, গাঁয়ের মধ্যে শুখানু মণ্ডলের বাড়িতে!

সেখানেই তার হয় জ্বর, আর বুকে পিঠে অসহ্য বেদনা। এরই মধ্যে গাঁয়ের চৌকিদার এক দিন চুপি চুপি খবর দিয়ে যায় যে, ভোর রাত্রে দারোগা-পুলিশ আসবে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা নিয়ে অভিমন্যুকে গ্রেপ্তার করতে; যা ভাল বোঝো করো।

বুঝবে আর কী ছাই। বিরিঞ্চি রাতারাতি শুখানু মণ্ডলের গরুর গাড়িতে করে অভিমন্যুকে নিয়ে আসে বলীরামপুর-মজদুর-ইউনিয়ন অফিসে। আর যেতই বা

কোথায় ? এক নিয়ে যেতে পারত তার কাকার বাড়িতে। হয়তো তিনি জায়গা দিতেন না। আর পুলিশও সবচেয়ে আগে সেখানেই খোঁজ করবে। অনেক ভেবে-চিন্তেই বিরিঞ্চি অভিমন্যুকে ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে এসেছিল। অভিমন্যুর বুকের আর গলার ঘড়ঘড়ানির শব্দটা তার ভাল ঠেকেনি।—ডাক্তার আছে বলিরামপুরে; ভাল করে চিকিৎসা হতে পারবে। পার্টির লোকের সেবা শুশ্রূষা পার্টির ইউনিয়ন অফিস থেকে যত ভাল ভাবে হতে পারবে, তেমন আর কোথাও হবে না।...তার উপর সেখানে আছে শিউচান্দ্রকা, অভিমন্যুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে বিরিঞ্চি নিয়ে এসেছিল অভিমন্যুকে বলীরামপুর মজদুর ইউনিয়নের অফিসে।...

মিল কম্পাউন্ড আর ইউনিয়ন অফিসের মধ্যে মাত্র একটা চওড়া পাকা রাস্তার ব্যবধান। অফিসঘরটায় চব্বিশ ঘণ্টাই লোক যাতায়াত করে। তাই অভিমন্যুর স্থান হয়েছে তার পাশের কামরায়। এই ঘরেই তারা আগেও শুত। ঘরখানা ভাল; বেশ একটা বড় জানলা আছে পথের দিকে। তবে জানলার কাচের শার্সি অধিকাংশ সময়ই বন্ধ রাখতে হয় কারখানার ধোঁয়ার ভয়ে। কাচের শার্সিটার মধ্য দিয়ে দেখা যায় কারখানার উঁচু দেওয়াল; উপরে খুঁটির সঙ্গে কাঁটা তার দেওয়া—মজুররা বলে যে তারের মধ্যে বিজলী দেওয়া আছে; ছুঁলেই লোক মরে যাবে। তারও উপর দিয়ে দেখা যায়, কালি-ঝুলমাখা কারখানার চিমনিটা। তার মুখ দিয়ে অষ্টপ্রহর মিশকালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে পাক খেয়ে খেয়ে। মৃদু পশ্চিমে বাতাসে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর শুঁড়টা এই জানালার দিকে ছুটে আসছে।

বন্ধুর চিকিৎসা করবার পয়সা পাবে কোথায় শিউচান্দ্রকা। কিষাণ-ফ্রন্টের কর্মীদের তবু খাওয়া-দাওয়াটা জুটে যায় গাঁয়ের ভেতরে, কিন্তু এখানে তো সেটা পাওয়াও শক্ত। ওষুধ-বিষুধ ইনজেকশন, ডাক্তারের ফি, পথ্য, এ সব সে পাবে কোথা থেকে? টাকা জুটোতে পারলেও হয়তো ভাল করে চিকিৎসা সম্ভব ছিল না। বেশি লোক জানাজানি হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত হয়তো পুলিশে তাদের শিকারের সন্ধান পেয়ে যেত।

মিলের ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিল শিউচান্দ্রকা সেই দিনই রাত্রিবেলা। ছা-পোষা মানুষ তিনি; চাকরির ভয়ে আসতে রাজী হননি। তাঁকে দোষ দেয় নি শিউচান্দ্রকা।...মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মজুরদের ঝগড়া চরমে উঠেছে দিনকয়েক থেকে! মন-কষাকষি চিরকালই থাকে, কিন্তু এখন আবহাওয়া হয়ে উঠেছে একেবারে তেতো! নিত্য-নতুন কাণ্ড হচ্ছে, মিল-এলাকায়। মজুরদের রুদ্ধ আক্রোশ অতর্কিত ভাবে বেরিয়ে আসছে নিত্য-নতুন খাতে। কোনো দিন রামভরোসা সর্দারের মাথা ফাটছে রাতের অন্ধকারে, কোনো দিন বা ম্যাকনীল সাহেবের গাড়ি ঘিরে ধরছে তারা, তার কথা আদায় করবার জন্য। লাল-পাগড়ি ভরা ভ্যান মধ্যে মধ্যে টহল দেয় ইউনিয়ন অফিসের ধারের পাকা রাস্তাটিতে। সেই দিনেই আবার একটা নতুন হুজুগ উঠেছিল; কর্তৃপক্ষ চার নম্বরের গেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটা ইউনিয়ন অফিসের দিকের গেট; মিলের তাঁত-ঘরটাও এই দিকেই পড়ে। সেই জন্য এদিক দিয়ে মজুরদের বেশি যাতায়াত জয়নারায়ণ প্রসাদ পছন্দ করছিল না। সব মজুররা সেদিন পুলিশ আর দারোয়ানদের উপেক্ষা করে চার নম্বর গেটের সঙ্গে একখানা মই লাগিয়েছিল। তাই দিয়ে প্রত্যেকটি মজুর চার নম্বরের গেট টপকেই আজ ভিতরে ঢুকেছিল—অন্য তিনটে খোলা গেট দিয়ে কেউ ঢোকেনি। একটুর জন্য একটা বড় রকমের গোলমাল হতে হতে বেঁচে গিয়েছে আজ এই নিয়ে।

এই আবহাওয়ার মধ্যে ডাক্তারবাবু আসতে না চাইলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ...আবার যে ধরনের রুগী !...ফেরারী আসামী শুনেই ডাক্তারবাবুর খুদে খুদে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল ভয়ে। 'অ্যাবস্কণ্ডার' ! সত্যিকারের ফেরাজী রাজনৈতিক আসামী তিনি এর আগে কখনও দেখেননি; বুনো গণ্ডারের গায়ে হাত দেওয়াতে এর চাইতে বিপদ কম। না না, শিউচন্দ্রিকা বাবু, আমাকে মাপ করবেন। সে-রাত্রে শিউচন্দ্রিকা চলে এসেছিল।

কিন্তু এর পরের দুদিনে অভিমন্যুর অসুখ আরও বেড়ে যায়। বুকে-পিঠে অসহ্য ব্যথা; চার ডিগ্রী জ্বর; ব্যঞ্জনাহীন চোখের লাল শিরা-উপশিরাগুলোর প্রত্যেকটা দেখা যাচ্ছে; ভয় হয় গলার ঘড়ঘড় শব্দ, আর অবিশ্রান্ত প্রলাপ, পাকা সড়কের উপর থেকে কেউ আবার শুনে ফেলল না কি !...

আর থাকতে না পেরে শিউচন্দ্রিকা আবার গিয়েছিল ডাক্তারবাবুর কাছে। ডিস্পেন্সারিতে ডাক্তারবাবুর হাত চেপে ধরে একবারটি যাওয়ার জন্য মিনতি জানিয়েছিল আবার। যে শিউচন্দ্রিকার নাম শুনলে দুর্দান্ত ম্যানেজার ম্যাকনীলসাহেবের অফিসঘরের রিভলভিং চেয়ার তাঁর অজ্ঞাতেই ঘুরে যায়, সেই শিউচন্দ্রিকা ভিক্ষা চাইছে ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু সেদিন আর শিউচন্দ্রিকার অনুরোধ ঠেলতে পারেন নি। গভীর রাত্রে চুপি-চুপি এসেছিলেন ইউনিয়ন অফিসে, কম্বল মুড়ি দিয়ে।

'পয়সা নেই আমাদের, ডাক্তারবাবু। সে কথা বুঝে ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থা দেবেন।'—কথা কয়টি বলার সময়, যে শিউচন্দ্রিকা প্রত্যহ নিজেদের নিঃস্বতার গর্ব করে, কুণ্ঠায় তার গলার স্বর প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল।

ডাক্তারের কাছে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। অভিমন্যুর বুকে-পিঠে লাঠির দাগগুলো ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছিল শিউচন্দ্রিকা।

ডাক্তারবাবু দেখে-শুনে বলেন, এ এক রকম নিউমোনিয়া; বুকে পিঠে চোট লাগলে অনেক সময় এমন হয়। কাল জ্বরটা সেরে যাবে বোধ হয়। সে সময়টা একটু বিশেষ সাবধান হয়ে থাকতে হবে। বেশি চেঁচামেচি হট্টগোল যেন না হয় সে সময়টায়। রুগীকে নড়া চড়া করতে দেবেন না তখন।...দেখবেন, যেন উত্তেজিত না হয়ে পড়ে কোনো কারণে। বেশি কথা বললেও ক্লান্ত হয়ে পড়বে রুগী।...দরজা-জানালাগুলো খুব ভালো করে খুলে রেখে দেবেন। খোলা হাওয়ার মতো উপকারী জিনিস নেই এর পক্ষে। এখন থেকে একটু অক্সিজেন দিলে নিশ্বাস ফেলতে এতটা কষ্ট হত না।

অক্সিজেনের কথাটা বলে ফেলেই ডাক্তারবাবু মনে পড়ে যে সেটা সম্ভব নয়,... তাহলে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য একজন ডাক্তারের থাকার দরকার—টাকা খরচের দরকার—

আচ্ছা, আমি একরকম ট্যাবলেট দেব, নিয়ে আসবেন।—কালই বোধ হয় 'ক্রাইসিস'। জ্বরটা ছাড়ার সময়, আর তারপর বেশ সাবধান থাকবেন। ঠিক যেমন যেমন বলে গেলাম—

ডাক্তারবাবু এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন; রাস্তায় আবার কেউ চিনে না ফেলে।'- স্পাই টাই রেখেছে কি না পুলিশ ইউনিয়ন-অফিসের উপর কে জানে'।—

অভিমন্যুর অসুখের জন্য আজ কয়েকদিন থেকে শিউচন্দ্রিকার রুটিন-বাঁধা জীবনে বিশৃঙ্খলা এসেছে। রুগীর শিয়রে বসে বসে সে আকাশ-পাতাল ভাবছে। দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের তারিখটার উপর হঠাৎ নজর পড়ে,—গোলমালে দুদিন থেকে বদলানো

হয়নি তারিখটা। আজ তিরিশে জানুয়ারী, শিউচাঁদ্রকা তারিখটা বদলে দিয়ে আবার এসে বসে। একটা নামজাদা বিলিতী ব্রাণ্ডির বিজ্ঞাপন ক্যালেন্ডারে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন একটু স্টিমুলেন্ট, এনে রাখতে; অভিমন্যুর জ্বর ছাড়বার সময় আজ দরকার হতে পারে। বিজ্ঞাপনের ক্যালেণ্ডার বিনা পয়সায় পাওয়া যায়, কিন্তু বিজ্ঞাপনের ওষুধ?—সেই পয়সার কানাগলিতে ধাক্কা খেয়ে মনটা বার-বার ফিরে আসে।

অদ্ভুত ফরমাশ এই ডাক্তারদের। বলবে অক্সিজেন দাও। অক্সিজেনের দাম কোথা থেকে আসবে তার ঠিকানা নেই।—পয়সা খরচ যাতে না হয়, এমন চিকিৎসার কথা বললাম তো, এমন সব জিনিস করতে বলল যা কোনো দিনই সম্ভব নয়। যাদের জানলা খুললে চিমনির ধোঁয়ায় ঘর ভরে যাবে, তাদেরও বলে, জানলা খুলে রুগীকে তাজা হাওয়া খাওয়াতে।—মিলের 'তাঁত-ঘর'-এর শব্দে যে ঘর অষ্টপ্রহর ভূমিকম্পের মতো থর-থর করে কাঁপছে সে ঘরের রুগীকেও বলবে চুপচাপ নিরিবিলির মধ্যে রাখতে। সম্মুখের রাস্তা দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া লোক-জনের হট্টগোল বন্ধ হবে কী করে? ডাক্তারসাহেব তো হুকুম দিয়েই খালাস!

বিরিঞ্চিকে শিউচাঁদ্রকা বসিয়ে রেখেছে পাশের অফিসঘরে, কেউ এলে খবর দিতে। বলা নেই, কওয়া নেই, কেউ হুট করে এ ঘরে ঢুকে পড়তেও তো পারে।

বন্ধুর শিয়র ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করেছে শিউচাঁদ্রকা। সে কিছুতেই আর নিজের মনকে সংযত করতে পারছে না। অফিসঘরে গিয়ে একবার বিরিঞ্চিকে বলে আসে—কেউ এলে বলবে যে আমার সঙ্গে এখন দেখা হবে না, কিছুতেই না। আর কেউ যেন এখানে চেঁচামেচি না করে।

কী করবে ভেবে পায় না শিউচাঁদ্রকা। লেবার কমিশনারের সম্মুখে মজুরদের হয়ে এক ঘণ্টা অনর্গল বলে যাবার সময় তার কথার খেই হারিয়ে যায় না; কিন্তু ডাক্তারবাবুর নির্দেশের কথা ভাবতে ভাবতে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। চোখের ইশারায় যে এখনি মিলের দশ হাজার মজুরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু সে পারে না তার বন্ধু অভিমন্যুকে মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে। কী করে পারবে? ঐ যে কালো চিমনি-দানবটা নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ জানলাটা লক্ষ্য করে,—ফণাধরা সাপের মুখ থেকে পিচকারির মতো ছুটে আসছে বিষের ধারা শত্রুর চোখের দিকে; তা সে কী করে করবে? চিমনিটার ভিতর যদি সে ঢুকেও বসে থাকে, তাহলেও বন্ধ হবে না তার ধোঁয়ার কুন্ডলী।...সম্মুখেরে রাস্তাটা যদি সে খড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারে, তাহলে হয়তো বন্ধ হতে পারে এক্কার চাকার শব্দ, কারখানার মাল বোঝাই মোটর ট্রাকগুলোর আওয়াজ!...

শিউচাঁদ্রকার হাসি আসে যে ছেলেমানুষী অসম্ভব-অসম্ভব কথা সব সে ভাবছে। ...কী লাভ এ সব কথা ভেবে?...কী করে সে বন্ধ করবে কারখানার অজস্র যন্ত্রের আর সম্মুখের তাঁত-ঘরের বিভিন্ন ধ্বনির ঐকতান? ময়দানবের খোকাদের খেলাঘরের হুটোপুটি কার সাধ্যি থামায়?...কট, কট্... করে দাঁতে দাঁতে শব্দ করতে করতে আগিয়ে আসছে—এই এখানে, মুহূর্তের মধ্যে বেলটিং-এর একটানা ঘুরুনির ঘোড়ায় চড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে!...ঐ বক রাক্ষসের বরাদ্দ কয়লার খোরাক, বয়লারের জঠরে চালাতেই হবে;...এই সব কোনো বাঁধা-রুটিনের কাজে পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই।...উপায় এই; কোনো উপায় নেই অভিমন্যুকে বাঁচাবার।...উপরের হুকুম না এলে ম্যাকনীলসাহেবও মিল বন্ধ করতে পারে না। পারে একমাত্র মজুররা।

এই দশ হাজার মজদুর ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে? তারা যদি কাজে না যায়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে এই বিশ্বকর্মার কামারশালা। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে সত্যিই এর মরণ-কাঠি জিয়ন-কাঠি শিউচন্দ্রিকার হাতে। কিছুদিন থেকে মজুররা এক-পা এগিয়েই আছে ধর্মঘটের দিকে। না বলতেই কত দিন দল বেঁধে কাজ ছেড়ে চলে আসে। শিউচন্দ্রিকা লাগাম টেনে তাদের সামলে রেখেছে বলেই এখনও সত্যিকারের ধর্মঘট আরম্ভ হয়নি। চার নম্বরের গেট বন্ধ করার অজুহাতে দেবে না কী হরতাল করিয়ে সে?···তাহলেই অভিমন্যু বাঁচে, ডাক্তারবাবু জ্বর ছাড়বার পর যা যা করতে বলেছেন সব করা যায়; জানালা খুলে রাখা যায়; ধোঁয়া থাকবে না, সুচেঁাট পড়বার শব্দ হবে না অভিমন্যুর ঘরে।...এর লোভ কম নয়।··· অভিমন্যু যদি না বাঁচে তাহলে এর জন্য দায়ী হবে শিউচন্দ্রিকা নিজের মনের কাছে··· তারই জন্য অভিমন্যুকে চলে যেতে হয়েছিল কিষাণ ফ্রণ্টে কাজ করতে।...প্রথম এই বলীরামপুর-মজদুর-ইউনিয়ন গড়ে তোলবার সময় অভিমন্যু তার চাইতে কম পরিশ্রম করেনি। কতদিন তাদের দুজনের একসঙ্গে না খেয়ে কেটেছে সে সময়। আর আজ অভিমন্যু এখানে আছে চোরের মত লুকিয়ে।···কিন্তু তার বন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে অকারণে মজুরদের হরতাল করতে বলতে পারে না, মজুরদের স্বার্থ, ইউনিয়নের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে পারে না।...সে কর্তৃপক্ষের প্রতিটি চাল বোঝে। জয়নারায়ণ প্রসাদ এখন চায় যে মজুররা একটা গণ্ডলোল করুক। সেই অজুহাতে ইউনিয়নকে দায়ী করে পিষে ফেলে দেবে সে এটাকে। সরকারবাহাদুর আর পুলিশকে দিয়ে তাহলেই সে করাতে পারবে—শিউচন্দ্রিকাকে এ জেলা থেকে 'এক্সটার্ণ' করে দেবার অর্ডার।···মজুরদের চটাবার জন্যেই চার নম্বর গেট বন্ধ করানো হয়েছে, এ কথা বেশ ভাল ভাবেই জানে শিউচন্দ্রিকা।···এখন হরতাল করতে বলা মানে মজুরদের আত্মহত্যা করতে বলা। মজুরদের ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ তার হাতের মুঠোয়। সে কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না তাদের সঙ্গে, তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্য।

'অযোধিয়া চৌধুরী!...ধানের পাহাড়!'...অভিমন্যু প্রলাপ বকছে। শিরনিয়ার অযোধিয়া চৌধুরীর কথা বলছে। মধ্যে মধ্যে মিনাকুমারীর কথাও কী সব বলে—সব কথা বোঝা যায় না।···শিউচন্দ্রিকা অস্থির হয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। অভিমন্যুর হাত-দেখনোর কথা তার মনে পড়ে। কাশীর ভৃগু না কি তাকে বলেছিল যে তার উনত্রিশ বছর পরমায়ু। কোনো দিন সে বিশ্বাস করেনি এ কথায়।··· অভিমন্যুকে বাঁচাতেই হবে, যেমন করে হোক।

বন্ধ জানলার শার্সির ভেতর দিয়ে বাইরের জগৎটার দিকে তাকিয়ে থাকে শিউচন্দ্রিকা। সন্ধ্যা নেমে আসছে। কালো চিমনিটাতেও লালচে আভা লেগেছে। নিরবচ্ছিন্ন ধোঁয়ার অজগরটা যেন এই জানালাকে নিশানা করেই আগিয়ে আসছে—নিশ্চয়ই পশ্চিমে হাওয়া হচ্ছে।···এখন হাওয়ার দিক যদি যায় বদলে, তাহলে এক কেবল ধোঁয়াটা আজ আর কাল এ দিকে না আসতে পারে। শিউচন্দ্রিকা বোঝে যে জানুয়ারির শেষে বলীরামপুরে পশ্চিমে হাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনো হাওয়া বয় না। এ তারা চিরকাল দেখে আসছে। এই হাওয়াই আর দিন কয়েক পর থেকে আরও জোর হবে, আর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিগন্তে উড়িয়ে নিয়ে যাবে রাজ্যের ঝরা পাতা। তবু বলা যায় না···

বিরিঞ্চি, আলো দিয়ে যায় ঘরে।

বিরিঞ্চি আজকের কাগজখানা দিয়ে যেও তো!···কাগজে আবহাওয়ার পৃষ্ঠা

শিউচাঁন্দ্রকা জীবনে কোনো দিন পড়ে না।...এখন সেটাকে একবার দেখে নিতে ইচ্ছা করে—যেন নিজেকে লুকিয়েই সে দেখছে। জানে যে আজ রাতের মধ্যে হাওয়ার দিক বলাতে পারে না, তবুও কাগজখানা খোলবার সময় তার মনে ক্ষীণ আশা জাগে—হতেও তো পারে।...ঝড়, বাদল, এলোমেলো হাওয়া—কত কী।—যা ভেবেছিল ঠিক তাই—কাগজে লিখেছে—কাল বিকালের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না আবহাওয়ার।—অপ্রত্যাশিত নয়। তবু মনটা যেন আরও খারাপ হয়ে যায়

সাঁঝের অন্ধকারের মধ্যে তবু একটা রহস্য আছে, কিন্তু এই হতাশার অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিকট ভবিষ্যের চিত্রের প্রত্যেক রেখা স্পষ্ট মূর্ত হয়ে ওঠে শিউচাঁন্দ্রকার কাছে। সত্যিই মনে বল পাচ্ছে না শিউচাঁন্দ্রকা। অভিমন্যুর অস্থিরতা একটু কমেছে। ঘুমুলো না কি!

কপালে হাত দিয়ে দেখে, জ্বর বোধ হচ্ছে কমের দিকে।

হঠাৎ রাস্তার দিকে একটা কোলাহল শোনা যায়। শিউচাঁন্দ্রকা শার্সির ভেতর দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভিড় ছোট ছোট দল কী নিয়ে যেন জটলা করছে। চার নম্বর গেটের উপরের আলোটা সম্মুখের রাস্তায় এসে পড়েছে। একজন লোক হাত-পা নেড়ে কী সব যেন বোঝাচ্ছে। জয়নারায়ণ প্রসাদ আবার একটা নতুন কিছু কাণ্ড করল না কি কারখানায়, পুলিশ-টুলিশ এনে?

বিরিঞ্চি ছুটে আসে পাশের ঘর থেকে। উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। 'শুনেছ শিউচাঁন্দ্রকা' কী ভয়ানক খবর! রেডিওর খবর, ম্যাকনীলসাহেব বলেছে।'

তারপর সবই শোনে শিউচাঁন্দ্রকা। অসম্ভব! বিশ্বাস হয় না! মহাত্মাজীর উপর চালাবে গুলি! প্রার্থনা-সভায়? মনে পড়ে, ছোটবেলায় তার দুধের মতো সাদা পায়রাটাকে জমিদারবাবুর ছেলে গুলতি দিয়ে মেরেছিল! পায়রা-বোমের উপর থেকে ঝকঝকে নিকোনা উঠানে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়েছিল তার আদরের দুধিয়াটা। লাল হয়ে উঠেছিল বুকের ধবধবে সাদা রেশমের মতো নরম পালকগুলো। স্বচ্ছ লাল ব্যথাকাতর চোখ দুটো আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে এসেছিল—তারই হাতের মধ্যে। এখনও যেন পালকের নিচের গরমটুকু হাতের তেলোয় লেগে রয়েছে।

বিরিঞ্চি, একটু বোসো এ ঘরে।

শিউচাঁন্দ্রকা ছুটে বার হয়ে পড়ে রাস্তায়। এখন তার মাথা ঠিক রাখতে হবে। আবার একটা দাঙ্গা হয়ে যাবে না তো? মজুররা তাকে ঘিরে ধরেছে। খবর শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বেরিয়ে এসেছে কাজ ছেড়ে। কেন, জিজ্ঞাসা করলে কেউ তার উত্তর দিতে পারবে না। সহজাত অনুভূতি কি আর যুক্তি দিয়ে বোঝাবার দরকার হয়? কারখানার এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কি অন্য অফিসাররা, কেউ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনি। কেউ বারণ করেনি তাদের। বাপ মরবার খবর পেলে কি ফোরম্যানসাহেব বসে থাকত কারখানায়?

হাতের কাজ সেরে যখন শিউচাঁন্দ্রকা বাড়ি ফেরে তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে, অভিমন্যু শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। জ্বর এখন খুব কম।

শিউচাঁন্দ্রকার বিষাদের বোঝা যেন একটু হাল্‌কা হাল্‌কা মনে হয়। যতক্ষণ বাইরে ছিল, ততক্ষণ সে ছিল অন্য মানুষ। শোকের বোঝায় বাইরের জগৎটা পিষে যাচ্ছে এখন, কিন্তু রুগীর জগৎই আলাদা। বাইরের পৃথিবীর নাড়ীর স্পন্দন এখানে পৌঁছয় না। এখানে শিউচাঁন্দ্রকাও অন্য মানুষ। ন্যায়নিষ্ঠ ট্রাস্টির মতো, এখানে

সে তার যখের ধন আগলে বসে আছে।

অভিমন্যু তাহলে বাঁচবে। ডাক্তারবাবু যা যা বলেছেন করতে, সবই এখন সম্ভাবনার ভেতরের জিনিস। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ঠিকই—জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে। জ্বর ছাড়বায় পর সে খুলে দেবে জানলাটি। কাল কোনো মজুর যাবে না কাজে। মিল বন্ধ থাকবে। একটুও শব্দ আসবে না 'তাঁত-ঘর' থেকে। সারা শহরে থাকবে হরতাল। গাড়ি ঘোড়া, মোটর-ট্রাক কিছুই চলবে না সম্মুখের রাস্তায়।—ভৃগুর অমোঘ নির্দেশ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে এই কারখানার মজুরের দল। দিল্লীর প্রার্থনা সভার এক অবাঞ্ছিত অপ্রত্যাশিত ঘটনা কী করে এখানকার এক অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে দিয়েছে! যত দিন বেঁচে ছিলে মহাত্মাজী, তোমার আশিস্ দুহাতে বিলিয়েছ; তোমার তিরোধানের পরও কি তাঁর ঢেউ এসে লাগছে এই দূর দূরান্তরে? কৃতজ্ঞতার আবেশে ক্ষণিকের জন্য শিউচাঁদ্রিকার ইচ্ছা করে এই সর্বজ্ঞ অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করতে। নিজেকে মনে পড়তেই সে সামলে নেয়। তার জীবনের ভিত্তি যুক্তির ফ্রেমে গড়ে তোলা। একটা সামান্য কাকতালীয় ঘটনাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অযথা ক্ষণিকের দমকা ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসে, সে এই ভিত্তিতে দুর্বল হতে দিতে পারে না।...

অভিমন্যুর কপালটা ঘামছে।

বিরিঞ্চি, একটু জল গরম করে রেখো।

আছে সব ঠিক।

প্রথমটা ভয়ই লেগে গিয়েছিল শিউচাঁদ্রিকার। মাঘের শীতে ভোরবেলা, সে কী ঘাম! বিছানা-বালিশ ভিজে জবজবে হয়ে যাচ্ছে। মিনিটে মিনিটে জ্বর কমে আসছে। ঠান্ডা হয়ে আসছে গা-হাত-পা। ডাক্তার ঠিকই বলেছিল—একটু কিছু ষ্টিমুলেণ্ট এনে রাখা উচিত ছিল।

নেতিয়ে পড়া দেহটার প্রতি রোমকূপ থেকে জীবনের শীর্ণ ধারার শেষ বিন্দু পর্যন্ত বেরিয়ে গেল বুঝি! শিউচাঁদ্রিকার এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সব বুঝি ব্যর্থ হয়। সাতানব্বুই।...ছিয়ানব্বই! পঁচানব্বই পয়েণ্ট ছয়!—ঠান্ডা হিম হয়ে গিয়েছে তার সারা দেহ। বিরিঞ্চি আর শিউচাঁদ্রিকা কেউ কারও দিকে তাকাতে পারে না ভয়ে।—নিখাদ থেকে খাদে নামবার পথে জীবনের স্বর পথ হারালো নিশ্চয়—বিরিঞ্চি ঘসছে অভিমন্যুর পায়ের তলা প্রাণপণ শক্তিতে;—আর শিউচাঁদ্রিকা ঘষছে হাতের তেলো, স্নেহ-ভরা দরদী হাতের স্পর্শ দিয়ে।

কতক্ষণ এভাবে কেটে যায় কে জানে!

শেষ পর্যন্ত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। এযাত্রা তাহলে অভিমন্যু বেঁচে গেল! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শিউচাঁদ্রিকা। জানলার শার্সিগুলো সে খুলে দেয়। এতদিনের বন্ধ গুমোট ভাবটা হালকা হয়ে আসে এক ঝলক ভোরের বাতাস ঢুকে, রুগী রুগী-গন্ধওয়ালা ঘরের আবহাওয়াটাকে বদলে দিয়ে যায়।

জানালার বাইরে শীতের প্রভাতের রোদ্দুর পড়েছে। কন্ধকাটা ভূতের মতো কালো চিমনিটার শিকার আজ একটুর জন্য ফসকে গিয়েছে। আজ শান্ত সমাহিত ভাব জগতের। ময়দানবের খোকারা আজ পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে। না হলে এতক্ষণ গমগম করে উঠত ম্যাকনীলসাহেবের রাজ্য বিভিন্ন ধ্বনির গমকে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়ে তুলত ইউনিয়ন অফিসের এই ঘরখানাকে পর্যন্ত। জানলা দিয়ে বাইরের জগতের খানিকটা বিষাদের পরশ লাগে শিউচাঁদ্রিকা আর বিরিঞ্চির সংবেদনশীল মনে। —প্রতিবেশের উদাস নীরবতা ভঙ্গ করে মোড়ের ইঁদারাতলা থেকে গলার স্বর ভেসে

আসে…'যাওয়ার আগেও গরিবদের কথা ভোলেননি তিনি। কত চেষ্টা করে কাপড়ের কনট্রোল তুলে দিয়ে গিয়েছেন।'—পাড়া-কুঁদলী রামশঙ্কর মা'র গলা।…সেও আজ দেখছি ইঁদারাতলায় ঝগড়া করা ভুলেছে।…

বিরিঞ্চি, বলে এসো যে আজ যেন কেউ ইঁদারাতলায় বেশি চেঁচামেচি না করে। রামশরণার মা একবার আরম্ভ করেছে যখন, তখন আর ও ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে থামবে না।

রুগীর ঘুম ভেঙেছে।

প্রথমে সে তার পরিবেশ বেশ করে ঠাহর করে নেবার চেষ্টা করে।…সেই পেরেকের সঙ্গে টাঙানো ফাইল; কালো ঝুলের মতো মাকড়সার জালগুলো সেই আগেকার মতনই আছে। বিরিঞ্চি! শিউচাঁদ্রকা! তাহলে আবার সেই ইউনিয়ন অফিসে? এখানে আবার কেন?…

তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি গিয়ে পড়ে শিউচাঁদ্রকার মুখের উপর। উৎকণ্ঠার ছায়া পড়েছে সেখানে।…তার কথা তাহলে এখনও শিউচাঁদ্রকা ভাবে।…তবু সে এখানে থাকতে চায় না…মিনাকুমারীর থেকে যত দূরে সম্ভব থাকতে চায় সে।…বুকে জড়ানো আলোয়ানখানার জন্য তার দম আটকে আসছে! খুলে দাও ওখানা; শীগগির খুলে দাও…না, না, কিছুতেই খাব না এখন।…কপালে হাত বুলিয়ে দিতে হবে না।…

তবুও শিউচান্দ্রিকা তার মাথার উস্কো-খুস্কো চুলগুলোর মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে, একটু রুগীকে আরাম দেবার চেষ্টা করে। এই আঙুলের স্পর্শ থেকে অবুঝ রুগীও বুঝতে পারে কী গভীর দরদ এর সঙ্গে মেশানো…

'আচ্ছা, দাও একটু খেতে'—বন্ধুর হাত থেকে খেয়ে অভিমন্যু তাকে কৃতার্থ করতে চায়।

তৃপ্তিতে ভরে ওঠে শিউচাঁদ্রকার মন।

'বেশি কথা বোলো না অভিমন্যু, এই রোগা শরীরে।'

'আমার অসুখ তো সেরে গিয়েছে'—একেবারে ছেলেমানুষের মতো হয়ে গিয়েছে অভিমন্যু।

কত কথা মনে পড়ছে অভিমন্যুর। রুগীর মন এক কথা বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে মন চলে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। তার প্রশ্ন থেকেই শিউচান্দ্রিকা তা বুঝতে পারে।

মধ্যে মধ্যে অভিমন্যু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তখন সে ভাবছে মিনা-কুমারীর কথা। তার চোখ ছলছল করে আসছে হৃদয় মথিত করা এক বেদনায়, যা রোগের ব্যথাটার চাইতেও অনেক তীব্র। দেহের প্রত্যেক স্নায়ু এ বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে, সারা পৃথিবী তার এ ব্যথায় সাড়া দেয়।

কিন্তু রোগীর এ দুর্বল শরীর, তার ততোধিক দুর্বল মন নিয়ে সে শিউচাঁদ্রকার শেন-দৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারে না। সর্বজ্ঞ শিউচাঁদ্রকা ভাবে যে, অভিমন্যুর মনে পড়েছে ইউনিয়ন অফিসের পুরনো স্মৃতিগুলো। তার মনের মধ্যে গুমরে উঠছে নিশ্চয়ই সেইদিনকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা।…

'বড় অস্থির লাগছে নাকি?'

কোনো জবাব দেয় না অভিমন্যু।

'কী কষ্ট হচ্ছে বলো, অভিমন্যু।' আঙুল দিয়ে তার চোখের কোণটা মুছে দেয় শিউচাঁদ্রকা।

রুগী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকে।

হঠাৎ বিরিঞ্চি শিউচান্দ্রিকাকে কী একটা বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শিউচান্দ্রিকা উঠে সম্মুখের জানালার শার্সিটা বন্ধ করে দেয়।

জানালা বন্ধ করছ যে?

হাওয়া একটু জোর মনে হল। আবার তোমার ঠাণ্ডা লেগে যায় যদি,—তাই।

কোথায়, হাওয়া ছিল না তো? এত বেলাতে আবার ঠাণ্ডা কোথা থেকে আসবে।

শিউচান্দ্রিকা দেখে যে তার মিথ্যা ধরা পড়ে গিয়েছে। রুগীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে যে, ডাক্তারবাবু বলেছেন যে কোনো কারণে উত্তেজিত হওয়া আজ তোমার পক্ষে খারাপ। তুমি সেরে ওঠো; কাল সব বলব।

না, বলো, এখনই বলো শিউচান্দ্রিকা।—অভিমন্যুর কথায় আবদারের সুর।

তাড়াতাড়িতে কী বলবে ঠিক পায় না শিউচান্দ্রিকা। মহাত্মাজীর মৃত্যুর খবরটি সে কিছুতেই জানতে দেবে না অভিমন্যুকে। সত্যমিথ্যা মিলিয়ে বলে—'শিরনিয়ার ব্যাপার নিয়ে তোমার উপর ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। তাই তোমাকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। পুলিশ-ভ্যানের হর্ণের শব্দ বলে মনে হয়েছিল; তাই পাঠিয়েছিলাম বিরিঞ্চিকে ব্যাপারটা কী দেখতে। আবার যদি তোমাকে কেউ দেখে-টেখে ফেলে, তাই জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। অসুখের মধ্যে টানাপোড়েন হলে কি আর তোমার হাড়-ক'খান হাজত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারব?

কথাগুলো অভিমন্যু বিশ্বাস করে। তার হাসি আসে শিউচান্দ্রিকার এই অহেতুক চিন্তা দেখে। সারাজীবন জেল আর পুলিশ নিয়েই কেটেছে তাদের; আর আজ ভয় পাচ্ছে পুলিশ দেখে! পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই ছিল ভাল। তাহলে আর ইউ-নিয়ন অফিসে এদের বোঝা হয়ে থাকতে হত না। বলীরামপুরে থাকার চাইতে জেলে থাকা অনেক ভাল! জেলের হাসপাতালে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হত না, তা সে জানে। সেখানে সে থাকত নিজের দাবিতে, কারও করুণায় নয়।—অভিমন্যু চায় মিনাকুমারীকে ভুলতে। যত সে ভুলতে পারছে না মিনাকুমারীকে, ততই তার আক্রোশ গিয়ে পড়ছে অন্যের উপর।

শিউচান্দ্রিকা তার চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারছে যে, সে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'বড় শরীরটা আনচান করছে; না? কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে থাক, ভাল লাগবে। আমি একটু রগের কাছটা আস্তে আস্তে টিপে দি।'

তবু কিছুতেই চোখ বোজে না অভিমন্যু। হঠাৎ গলার স্বর উঁচু করে বলে ওঠে অভিমন্যু—'ও কী? জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কে যেন ঝাণ্ডা নিয়ে চলেছে?'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে শিউচান্দ্রিকার। কী ভুলই না সে করেছে! অভিমন্যুর মুখের কাছে তার দাঁড়ানো উচিত ছিল জানালার দিকটা ঢেকে। মজুরদের শোক-মিছিল বেরুচ্ছে শুনেই সে পাঠিয়েছিল বিরিঞ্চিকে—এই কাজে মজুরদের সাহায্য করতে, আর জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে মহাত্মাজীর হত্যাকাণ্ডের কথা কোনো রকমে রুগী জানতে না পারে সেইজন্য।

'মজুরদের প্রোসেসন বেরিয়েছে। ওটা তারই ঝাণ্ডা।'—আর প্রোসেশনের কথা লুকোনো চলে না অভিমন্যুর কাছে।

'তা ঝাণ্ডাটা বাঁশের ডগায় বাঁধেনি কেন? দেখ তো, কী বিশ্রী দেখাচ্ছে। একেবারে বাঁশের মধ্যেখানটায় বেঁধেছে। তুমি তো কোনোদিনই এই সব ছোট-খাটো জিনিসের উপর নজর দাও না। শিরনিয়ার মতো অজ পাড়াগাঁয়ের চাষারাও এসব

জিনিস এদের চাইতে ভাল জানে।'—অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকাকে শুনিয়ে দিতে চায় যে, সে চলে যাওয়ার পর থেকে এই সব খুঁটিনাটি কাজে ঢিলে পড়েছে ; কেবল লেবর কমিশনারের সঙ্গে দুটো গুছিয়ে কথা বলতে পারলেই মজুর-নেতার কাজ শেষ হয়ে যায় না।

'চুপ করো অভিমন্যু, ডাক্তারবাবু তোমায় কথা বলতে বারণ করেছে।'

'এই মিছিলের জন্যই বুঝি পুলিশ এসেছে? প্রোসেশনের পর এরা নিশ্চয়ই মিটিং করবে। তুমি যাবে না শিউচন্দ্রিকা? তাহলে মিটিং-এ বলবে কে? আমার জন্য তুমি যাচ্ছ না। না না, তুমি যাও। এরা ম্যাকনীল সাহেব মুর্দাবাদ এখনও বলছে না কেন? মজুর-ছেলেদের এত যে মার্চিং-এর গান শিখিয়েছিলাম, এ ক'মাসে কি তাও ভুলে গিয়েছে? কেউ গাইছে না কেন? জানালাটা বন্ধ বলে বোধ হয় কিছু শোনা যাচ্ছে না। একটু জানালাটা খুলে দাও না শিউচন্দ্রিকা।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিউচন্দ্রিকা জানালার শার্সিটা খুলে দেয়। উৎকণ্ঠার আতিশয্যে ছিটকিনিটা খুলবার সময় তার হাত কাঁপে। আবদার না রাখলে, আবার হয়তো এখনই অভিমন্যু কান্নাকাটি আরম্ভ করবে।

জানালা খুলবার পরও কোনো রকম জয়ধ্বনি, বা মজুরদের অন্য কোনো রকম দাবির কথা বলে চেঁচামেচি, অভিমন্যু শুনতে পায় না। এ কী রকম প্রোসেশন! এ ক'মাসে কি মজুরেরা একেবারে বদলে গিয়েছে? অসুখে তার কান খারাপ হয়ে যায়নি তো? তা কী করে হবে? এখনই তো শিউচন্দ্রিকার কথা শুনতে পাচ্ছিল। জানালার নিচের চৌকাঠটার উপর দিয়ে একটা কালো স্রোতের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। অগণিত চলন্ত মানুষের মাথার উপরের সামান্য একটুখানি কেবল দেখা যাচ্ছে! এত লোকের পায়ের শব্দ পর্যন্ত আজ অভিমন্যুর কানে পেঁছুচ্ছে না কেন?

অদম্য কৌতূহলে, আর অভিমন্যু নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না।

'শিউচন্দ্রিকা, আমাকে বালিশে হেলান দিয়ে উঁচু করে বসিয়ে দাও না একটু। শুয়ে শুয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না—একটা লোকও না।

'না না, ডাক্তারবাবু নড়াচড়া করতে বারণ করেছেন। এত অবুঝ হলে কি চলে?'

এবার শিউচন্দ্রিকার কণ্ঠস্বর আগেকার চাইতে দৃঢ়। রুগীর মন রাখতে গিয়ে রুগীর জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে না সে। অনেক আবদার তার সে রেখেছে। আবার এখন নতুন আবদার। রুগীর পক্ষে ভাল হয়েছে যে শোকমিছিলের লোকেরা কেউ চেঁচামেচি করছে না। দুজন দুজন করে লাইন বেঁধে চলেছে। বাবুরা পর্যন্ত খালি পায়ে মিছিলে বেরিয়েছে। শোকের ভারে মাথা নুইয়ে পড়েছে সকলের। এই মজুরদেরই কত শোভাযাত্রার নেতৃত্ব শিউচন্দ্রিকা করেছে; কিন্তু এত সংযত, এত শান্ত তাদের কোনো দিন দেখেনি।...

হঠাৎ নজরে পড়ে যে অভিমন্যু কাঁদছে।

'ছি অভিমন্যু! তুমি একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছ।' মনে হয়, কথাটা একটু রুক্ষ হয়ে গেল এ রকম রুগীর পক্ষে। অনুশোচনায় শিউচন্দ্রিকার মন ভরে যায়। আচ্ছা, একটু সাবধানে আস্তে আস্তে উঠিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে দিলে আর কী হবে? নড়াচড়া বেশি না হলেই হল।

বালিশে হেলান দিয়ে, তাকে আলগা ভাবে ধরে বসায় শিউচন্দ্রিকা।

মুহূর্তের মধ্যে খুশী হয়ে ওঠে অভিমন্যু।...কত লোক চলেছে—কেউ কোনো কথা বলছে না,—আশ্চর্য!—লাল পাগড়িও আছে দেখছি, শিউচন্দ্রিকা মিথ্যা বলেনি।

…মিছিলটা খুব বড় তাই দেখাবার জন্য এরা দুজন দুজন করে করে এক লাইনে চলেছে,…শিউচন্দ্রিকা, বাবুদেরও দেখছি দলে টানতে পেরেছ ! আলবাৎ তোমার ক্ষমতা !…চিরকাল ওরা আলাদা ছিল ইউনিয়ন থেকে ;…মেয়েরাও আছে দেখছি… মেয়েদের দলের আগে কে ঐ ঝাণ্ডা নিয়ে ?…মিনাকুমারী না !…তীব্র উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপছে তার সারা দেহ।

শিউচন্দ্রিকা তাকিয়ে দেখে বাইরে,—মেয়েদের দলের আগে আগে চলেছে মিনা-কুমারী আর রুকণী…জানালা দিয়ে আর দেখা যাচ্ছে না তাদের।

অভিমন্যু নিজের অজ্ঞাতে কখন শিউচন্দ্রিকার হাতখানা চেপে ধরেছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। তীব্র উত্তেজনার ঢেউয়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে তার প্রতিটি স্নায়ু।

এই ভয়ই করেছিল শিউচন্দ্রিকা। এর জন্য দায়ী সে নিজে ; সে যদি আর একটু শক্ত হতে পারত রুগীর উপর, তাহলে বোধ হয় এ কাণ্ড হত না।…একটি পাখা নেই ঘরে যে একটু বাতাস করে অভিমন্যুকে।…তার কপালটা একটু একটু ভিজে-ভিজে লাগছে, শুকনো ঠোঁট দুটো কেঁপে-কেঁপে উঠছে। অভিমন্যু বালিশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল।…একটু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে।…বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হঠাৎ এই উত্তেজনার পর,…যা দুর্বল শরীর !

তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে শিউচন্দ্রিকা।…খানিকটা বিশ্রাম পেলেই রুগীর এ ভাবটা বোধহয় কেটে যাবে।…একটু কিছু খেতে দেওয়া উচিত বোধ হয়,…এই বিরিঞ্চি এল বলে।…

অভিমন্যুর মনের মধ্যে তুফানের তোলপাড় চলেছে।…একবার যেন মনে হল, মিনাকুমারী এদিকেই তাকিয়েছিল। না, না, সেটা বোধ হয় তার মনের ভুল। বাইরের আলো থেকে কি অন্ধকার ঘরের ভিতর কিছু দেখা যায় ?…মিনার মুখ-চোখও মনে হয়েছিল বিষাদে ভরা…কী করে ঐ মিনা অভিমন্যুর জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পেরেছিল !…মিনাকুমারী, মিনাকুমারী, মিনাকুমারী !…যার থেকে দূরে পালাবার সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে…

অভিমন্যু এর মধ্যেও বুঝতে পারছে যে শিউচন্দ্রিকার হাতের মধ্যে, তার হাত-খানা ঠক-ঠক করে কাঁপছে।

হঠাৎ জানালার সম্মুখ দিয়ে খবরের কাগজওয়ালা হেঁকে যায়—তাজা খবর ! তাজা খবর ! মহাত্মাজীর মারহাঠী হত্যাকারী গ্রেপ্তার ! সার্চলাইট, ইন্ডিয়ান নেশন, পত্রিকা, স্ট্যাণ্ডার্ড। প্রার্থনা সভায় তিনবার গুলি ! তাজা খবর !

বাইরে বিরিঞ্চির গলা শোনা যায়,—এখানে চেঁচামেচি কোরো না। ঘরে রুগী আছে।

বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ে শিউচন্দ্রিকা। এত চেষ্টা, সে কি এরই জন্য !

শি-উ-চ-ন্দ্রি-কা ! অভিমন্যুর কথা, কাতর আর্তনাদের মতো শোনায় ! তার কানে গিয়েছে, কাগজওয়ালার চিৎকার।

'ম-হা-ত্মা-জী !'

প্রত্যাশিত প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই, তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর থেমে যায় ! সব শেষ হয়ে যায় একটা অদৃশ্য হাতের এক ঝাঁকানি খেয়ে। তার মাথা বালিশের এক পাশে ঢলে পড়ে।

খট্-খট্ করে অফিস ঘরে কতকগুলো ভারী বুটের শব্দ হয়। জানালার উপর

দিয়ে দু'একটি লাল-পাগড়ি দেখা যায়। আজকের মতো এই শোক-দিবসেও আজাদ ভারতের পুলিশের কর্তব্যনিষ্ঠায় ত্রুটি নেই। দুজন পুলিশ দরজার দুপাশে সোজা হয়ে দাঁড়ায়,—সাবধানের মার নেই। তারপর দারোগা সাহেব ওয়ারেণ্ট হাতে নিয়ে 'ডেঞ্জারাস' ফেরারীর ঘরে ঢোকেন।

সামান্য একটু দেরী করে ফেলেছেন দারোগাবাবু।

শ্রীমিনাকুমারী দেবী সমীপেষু,

এখনই পুলিশের পরোয়ানা পেয়েছি,—এ জেলা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার অর্ডার। জন-নিরাপত্তা অর্ডিনান্সের ধারায় না কি আমি পড়ি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আমি দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি। সরকারের অসীম করুণা, শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁরা মহাত্মাজীর শ্রাদ্ধ-দিবস পর্যন্ত এ পরোয়ানা জারি করেননি। হয়তো এ খবর আপনি আগে থেকেই জানতেন, কেন না সব কিছুই জয়নারায়ণ প্রসাদের করানো। আমাদের ইউনিয়নের কপালে কী আছে, তা পরিষ্কার চোখের সম্মুখে দেখতেই পাচ্ছি। আপনারা তো তাই চাচ্ছিলেন। অভিমন্যু যদি থাকত, তাহলে হয়তো সে এই দুঃসময়ে ইউনিয়নের কাজের ভার আবার নিতে পারত, কিন্তু অভিমন্যুর জীবনের জন্য দায়ী আপনি। পরিষ্কার কথা বলা আমার অভ্যাস। এর জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে অসংগত শিষ্টাচার দেখাব না। অভিমন্যুকে লোকচক্ষে হেয় করবার জন্য, তার লেখা যে চিঠি আপনি ম্যানেজারসাহেবকে দিয়েছিলেন, সে চিঠিখানা এই সঙ্গেই আছে। আপনি বোধ হয় ভেবেছিলেন যে, আপনার লেখা চিঠিখানা সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই বোধ হয় আপনার সাহস হয়েছিল তার চিঠিখানা ম্যানেজার-সাহেবকে দেবার। চিঠিখানা অভিমন্যু শেষ দিন পর্যন্ত বুকে করে রেখেছিল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার জন্য লেবার কমিশনারকে সেখানা দেখায়নি, পাছে আপনি সকলের চোখে ছোট হয়ে যান সেই কথা ভেবে। সে চিঠিখানাও আপনার কাছে ফেরত দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। সঙ্গে অভিমন্যুরই আরও কী কতকগুলো কাগজপত্র আছে; আমি সবগুলোকে একসঙ্গে ক্লিপ দিয়ে এঁটে রেখে দিয়েছিলাম। অভিমন্যুর ঝোলাটা, আর তার মধ্যের এই কাগজপত্রগুলো সেদিন প্রাণে ধরে চিতার মধ্যে ফেলে দিতে পারিনি। এখন আমি কোথায় যাব কিছুই ঠিক করিনি। এর মধ্যে আর লটবহর বাড়াতে চাই না; নিজের জিনিস-পত্রই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না বোঝার ভয়ে।

শেষকালে আসল কথাটা বলে দিই। সেদিন শ্মশানে আপনার চোখে জল দেখে বুঝেছিলাম যে অভিমন্যুর স্মৃতির রেশ আপনার মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। রহমতের বিবির কথায় জানলাম যে, আজ আপনার উপোস। এতে আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। সেই জন্য অভিমন্যুর জিনিসগুলো আপনার কাছে দিতে সাহস করছি। যদি ভুল বুঝে থাকি, ক্ষমা করবেন, আর পুড়িয়ে ফেলবেন এগুলো। নমস্কার।

বিনীত—শিউচান্দ্রিকা

রহমতের বিবির হাতে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছিল শিউচান্দ্রিকা। আর সঙ্গে দিয়েছিল অভিমন্যুর সেই ঝোলাটা।

অভিমন্যুর মারা যাবার দিন শ্মশান ঘাট থেকে আসবার পরই সে লিখতে বসেছিল তার অভ্যাসমতো পরের দিনের কর্মসূচী। শ্মশানের সেই সন্ধ্যার চিন্তাগুলো সে সেইখানেই ছেড়ে এসেছিল। তার দৈনন্দিন কর্মজীবনে কোনো বৈলক্ষণ্য কেউ

দেখতে পায়নি পরের দিন। সে মনে মনে ঠিক করেছে যে, প্রতি বছর অভিমন্যুর নামে, ঐ দিনে মজুররা একটি দিবস পালন করবে। মহাত্মাজীর নামের সঙ্গে অভিমন্যুর নামটা এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, সেই দিবস পালনের মিটিংয়ে নিশ্চয়ই প্রচুর লোক জুটবে। আর এই হিড়িকে অভিমন্যুর স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু চাঁদা তুলে মজুরদের নাইট-স্কুলটার জন্য একটা স্থায়ী ঘর তৈরি করে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

কিন্তু তবু কে বলে যে, শিউচান্দ্রিকা সকল প্রকার ভাবপ্রবণতার বাইরে? তাহলে কি আর অভিমন্যুর ঝোলাটা মিনাকুমারীর কাছে পাঠানো দরকার মনে করত!

মিনাকুমারীর দুদিন থেকে চলছিল উপোস। কাল গিয়েছে মহাত্মাজীর তিরোধানের পর তেরো দিনের দিন! মিল ছিল বন্ধ। রুকণী বোঝে যে, দ্বিতীয় দিনে-উপবাসটা কার জন্য। সে বারণ করেনি।

অভিমন্যুর মারা যাওয়ার দিন থেকেই তার মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে;—তার উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরেই নিশ্চয় অভিমন্যু চলে গিয়েছিল ওখান থেকে। তারপর তাকেই একবার দেখবে বলে বোধহয় ছুটে এসেছিল ইউনিয়ন-অফিসে। তার পর তো সব শেষই হয়ে গেল। সেদিন শ্মশানে যখন চিতার ছাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল সকলে, তখন তাকেও এক মুঠো এনে দিয়েছিল রহমতের বিবি। মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে নিয়েছিল সে। জর্দার কৌটোটা খালি করে তাইতেই এনে রেখেছিল সেটুকুকে। এখনও মাথার কাছে রয়েছে কৌটোটা। পশ্চিমের জানালা দিয়ে রোদ্দুর পড়ে ঝকঝক করছে সেটা। তাকানো যায় না; তাকাতে গেলে চোখে জল আসে। এই শীতের বিকেলেও সেটা গরম আগুন হয়ে উঠেছে; বোধ হয় অভিমন্যুর মনে আগুনের আর্দ্র-উষ্ণতা এখনও লেগে রয়েছে সেটাতে।...দীক্ষিতদের বাগানে একদিন সিঁথির কাছের এক গোছা চুল কেঁপে কেঁপে উঠছিল বার বার, একটা গরম ভিজে নিঃশ্বাস পড়ে। কৌটোতে হয়তো থাকতে পারত সে সিঁথির সিঁদুর।

রুকণীর মিল থেকে ফিরতে এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি। এ কয় দিন সে বন্ধুর খুব দেখাশুনো করেছে। মিনাকুমারী এক রকম নাওয়া খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে সেই দিন থেকে। একটা অনুতাপের গ্লানি এসেছে মিনাকুমারীর মনে, এ কথা রুকণীও বুঝতে পারছে। কিন্তু তার দোষী মন এ কথা তুলতে পারেনি তার বন্ধুর কাছে। মিনাকুমারী বাইরের খবর রাখে কম। মজুরণীদের সঙ্গে ক্যাণ্টিন আর ক্রেশেতে দরকারের চাইতে বেশি কথা বলা তাদের বারণ,—মিল-মালিকের হুকুম। অনাথালয়েও সে মুখ বুজে কাজ করে চলে আসে। তার যা কিছু কথাবার্তা, হয় রুকণী না হয় রহমতের বিবির সঙ্গে। তারা ঘুণাক্ষরেও কেউ কোনো দিন অভিমন্যুর চিঠির কথা তাকে বলেনি।

কাল গিয়েছে গান্ধীজীর শ্রাদ্ধ দিবস। তাই কাল রুকণীরা সকলে খুব ব্যস্ত ছিল। মজুররা অহোরাত্র গেয়েছে রামধুনের গান,—'সবহিকো সম্মতি দে ভগবান' —পাপীদের সুমতি দাও, ম্যাকনীল সাহেবকে সুমতি দাও, জয়নারায়ণকে সুমতি দাও, অফিসারগুলোকে সুমতি দাও, অনাথালয়ের মেয়েদের সুমতি দাও। হে ঈশ্বর, হে আল্লা, হে পতিতপাবন, বলীরামপুরের পাপ কাটিয়ে দাও। গলা ভেঙে গেলেও তারা থামেনি। সারা অন্তর-নিংড়ানো রসে তাদের ভাঙা-গলা ভিজে ছিল। অনাথালয়ের ছোট ছেলেদের একটা ব্যাণ্ড-পার্টি আছে। কাল তারা সারাদিন খঞ্জনী বাজিয়ে রামধুন গেয়ে বেড়িয়েছে। ছেলেদের দলের সংগে মিনাকুমারী আর রুকণীও

ছিল। উপোস করে, রোদ্দুরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে দীক্ষিতদের মুকুল-ভরা আম-বাগানের ছায়ায় মিনাকুমারী তাদের বসিয়েছিল। সেখানেও তাদের রামধুন থামেনি। সে বলেছিল, তাদের সকলকে একটা করে টুপি কিনে দেবে পরের দিন, বিনা টুপিতে তাদের মানায় না। সেবার কমিশনারের রায়ের পরের মাস থেকে পাঁচ টাকা করে মাইনে বেড়েছিল মিনাকুমারীর। এই মাসের মাইনেটি দুই তারিখে পাওয়ার পর থেকে কেন যেন মনে হচ্ছে যে, এর মধ্যে থেকে পাঁচটা টাকা তার ন্যায্য প্রাপ্য নয়। এ সুমতি তার সেদিনের শ্মশানের রামধুন শোনার ফল নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, সেদিনকার চিতার আগুনের আলোতেই নিজের মনটার আসল রূপ ধরা দিয়েছে তার কাছে। মনের আগুন তাতে বেড়েছে বই কমেনি।

কাল দোকান-পাট বন্ধ ছিল। আজ সে আনিয়েছে কতকগুলো গান্ধী-টুপি, ব্যান্ড-পার্টির ছেলেদের জন্য। এই ছেলেরাই ট্রেনে-ট্রেনে কেসরপাক বিক্রি করত আগে। আজকের মতো দিনে, সে এই দান করে নিজের মনের বোঝা হালকা করতে চায়; দোষ-স্খালনের চেষ্টা করে একটু তৃপ্তি পেতে চায়। মহাত্মাজীর স্মৃতি-রক্ষার্থে মিলের তরফ থেকে কী করা যায়, স্থির করার জন্য মিটিং আছে আজ। তাই রুকণী আর আজ অনাথালয়ে যেতে পারবে না। মিনাকুমারী উপোস করে আছে বলে আজ ছুটির দরখাস্ত রুকণীর হাতে অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছে।

অভিমন্যুর কথাই কেবল তার মনে আসছে আজ, আজকে তো সে তাই চায়। ডুবে থাকতে চায় অভিমন্যুর মধ্যে। আজকে সে ভাবতে চায়, আমের বোলের গন্ধ-ভরা বাগানে সে শুয়ে রয়েছে চটচটে মধুলাগা ঝরা-পতার উপর। আমের মুকুলের সুগন্ধ আর অভিমন্যুর স্মৃতির সৌরভ, দুই মিলে এক হয়ে গিয়েছে! অভিমন্যু যেত সেই কেসরপাক নিয়ে অনাথালয়ে।...টানা-টানা চোখের কালো মণির মধ্যে হিসাব-লিখিয়ে মিনাকুমারীর ছবি উঠেছে।...

সে অন্যমনস্ক-ভাবে টুপির মোড়কটা খুলতে বসে।...বেশ টুপিগুলো—অনাথা-লয়ের ছোট ছোট ছেলেদের মুখগুলো টুপি পেয়ে হাসিতে ভরে উঠবে। এই রকম সরল প্রাণ-খোলা হাসি ছিল অভিমন্যুর! তাই ছোট ছেলেদের হাসতে দেখলে তার কথা মনে পড়ে।...

হঠাৎ মিনাকুমারীর নজর পড়ে মোড়কের কাগজখানার উপর।—বলীরামপুর। ...বলীরামপুরের আবার কী খবর কাগজে দিল? কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতার দেওয়া খবর। দুই তারিখের।

'মহাত্মাজীর মৃত্যু-সংবাদ শোনামাত্র স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী শ্রীঅভিমন্যু সিংহের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। অতি সমারোহের সহিত তাঁহার দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানীয় মিল-কর্তৃপক্ষ এবং মিলের প্রত্যেক মজুর গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে শবানুগমন করিয়াছিল।'

পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তারই জিনিসটা দোকানদার এই কাগজের টুকরোটা দিয়ে মুড়ে দেবে কেন? দৈবের কোনো অদৃশ্য সংকেত নয় তো? আবার সে পড়ে খবরটা, এটা যেন একটা নতুন খবর তার কাছে। ছাপার অক্ষরের অভিমন্যু সিংহের নামটুকু মিনাকুমারীর একান্ত আপন জিনিস, একেবারে নিজস্ব। সংবাদ পাঠনোর পর, নিজস্ব সংবাদদাতাটির হয়তো অভিমন্যু সিংহের নামের কথাটা আর কোনো দিন মনেই পড়বে না।...তার কিন্তু থাকবে ঐ নামটির সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। কোনো দিন ঘুচবার নয়।...হাতের মুঠো আলগা করে যে জিনিসটাকে সে নিঃশব্দে

ফেলে দিয়েছিল পথের ধুলোয়, আজ তারই জন্য মিনাকুমারীর মন কেঁদে মরে। এখন এই দুর্বহ জীবনের পুঁজি থেকে গিয়েছে কেবল কতকগুলো হাতের তেলোর রেখা। এই অসার্থক জীবনের গ্লানি তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।...অভিমান করেছিল অভিমন্যু।...তার অভিমন্যুকে সে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল বলে।...মিনাকুমারী মোড়কের কাগজখানা থেকে খবরটুকু ছিঁড়ে নেয়। তারপর ভাঁজ করে রেখে দেয় কৌটোটার ভিতর।—তার স্মৃতির ছাইটুকুর সঙ্গে মিশে থাক্ অভিমন্যুর নামটা।

কৌটোটার উপর থেকে রোদ্দুর সরে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বেলা পড়ে এসেছে।

রহমতের বিবি এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়ায়।

'এই ঝোলাটা দিয়েছে, শিউচান্দ্রিকাবাবা তোমাকে দিতে। চিঠি আছে ভিতরে। আমার মেয়েটার আবার খুব জ্বর এসেছে আজ। যাই আমি এখন। অনাথালয়ে যাবার রিক্সা ডেকে দিয়ে যাব না কি? এই উপোসের উপর আজ আর না যাওয়াই ভাল।'

রহমতের বিবি চলে যায়।

অতি পরিচিত পুরনো ঝোলাটা খুলবার সময় তার হাত থরথর করে কাঁপে।... শিউচান্দ্রিকা কেন তাকে চিঠি দেবে? পাট-করা ধুতিখানা সরাতেই চোখে পড়ে খানকয়েক কাগজ—কোণের দিকটা ক্লিপ দিয়ে আঁটা। শিউচান্দ্রিকার প্রতি কাজে শৃঙ্খলা আছে।

উপরের খানি শিউচান্দ্রিকার চিঠি, মিনাকুমরীকে লিখেছে। যাবার আগে চরম আঘাত দিয়ে গিয়েছে শিউচান্দ্রিকা। চিঠির ছত্রগুলো জাঁতার মতো পিষে ফেলছে মিনাকুমারীকে। এক-একটা কথা তো নয়, যেন কারখানার দাঁতওয়ালা চাকার এক একটা দাঁত। কট্ কট্ করে কেটে ফেলছে তার চক্রবালের মধ্যে পড়া মনটাকে। মোচড় দিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে তার অন্তরের ভিতরটা; নিংড়ানির রসে ঝাপসা হয়ে আসছে চিঠিখানা।...কোন চিঠি অভিমন্যু তাকে লিখেছিল? সে তো কিছুই জানে না। ম্যানেজারের কাছে সে আবার কবে অভিমন্যুর লেখা চিঠি দিয়েছিল? কী সব আবোল তাবোল লিখেছে শিউচান্দ্রিকা?...এখানা আবার কী? ভৃগুর গণনা!...তার পরেরটা! এ তো তারই নিজের হাতের লেখা চিঠি। দীক্ষিতদের বাগানের আমের মুকুলের সুবাস যেদিন তাদের দুজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।... কত বার পড়েছে অভিমন্যু এই ছত্র ক'টিকে। মিনাকুমারীর কম্পিত হাতের এই কালির আঁচড়গুলো চুপসে গিয়েছে দুই তিন জায়গায়,—হয়তো অভিমন্যুর চোখের জলে।...তারই উপর আবার এখন মিনাকুমারীর চোখের জল পড়ছে। বিস্মৃতির শুক্নো শৈবাল আবার সবুজ হয়ে উঠছে নোনা সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে।

আবার পাতা ওলটায় মিনাকুমারী। যখের সিন্দুকের ডালা খুলে যায় তার দৃষ্টির পরশে।...অভিমনুর লেখা চিঠি, অভিমন্যু তাকেই লিখেছে, এ হাতের লেখা কি ভুল হবার জো আছে; কত দিনের দেখা, কেসরপাকের বিলের ভাউচারে। তাকে লেখা চিঠি অথচ তার হাতে পড়ল না কেন? কী করে ম্যানেজারসাহেবের হাতে গেল? মিথ্যাবাদীর দল! অভিমন্যু চিঠি লিখেছে তার মিনকুমারীর কাছে; সে চিঠি পেল অন্য লোক! কার হাতে চিঠি দিয়েছিল সে খবর যে বলতে পারত, সে তো আজ আর নেই।...

রাগে-দুঃখে নিজেকে কুটি-কুটি করে ফেলতে ইচ্ছা করে তার। এ চিঠিখানা সে

সময় পেলে হয়তো ছোট্ট এক টুকরো জগতের কাহিনী বদলে যেতে পারত। আজকের এ অশ্রু সেদিন বইলে হয়তো ধুয়ে মুছে ফেলতে পারত ভৃগুর লেখার আঁচড়গুলো।···

···যাবে না কি সে এখনই ম্যাকনীল সাহেবের কাছে এর সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করতে ?···

এর পরের খানা এস. ডি. ও. সাহেবের চিঠি। 'অভিমন্যুকেও সঙ্গে লইয়া আসিবেন।'···সাপের চোখের মতো চোখ দুটো ছিল এস. ডি. ও. সাহেবের। সূচ ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে সে দুটোর মধ্যে। ডাক-বাংলার নরকে অভিমন্যুকেও ডেকেছিল।···পার্টি-মিটিংয়ের চার নম্বর প্রস্তাব।···অভিমন্যুর নাম ডাক, সম্মান-প্রতিপত্তি সব সে পায়ের নীচে পিষে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তারই চিঠিখানার দাম দিচ্ছে জয়নারায়ণ প্রসাদ, কিস্তিবন্দীতে মাসে পাঁচ টাকা করে।···

শুকনো ঘা আবার তাজা দগদগে হ'য়ে উঠেছে, নোনা জল পড়ছে তাতে ফোটা ফোটা করে।···আরও কী কতকগুলো হাবিজাবি কাগজ। আমের মুকুলের সুগন্ধ আসছে ঘরে অভিমন্যুর বারতা নিয়ে।

বাইরে রিক্‌শাওয়ালা ডাকে, "মাইজী!"

'আজ আমি হেঁটেই যাব। তুমি যাও।'

কাগজের লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের জলে।—

ঝাপসা হয়ে এসেছে ঘর-দুয়ার। ওঃ! সন্ধ্যা হয়ে গেল কখন! মিনাকুমারী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়, টুপির মোড়কটা নিয়ে।...

···আকাশ, মাঠ, পথঘাট সব ঢেকে গিয়েছে অন্ধকারে, সেই সেইদিনকার সাঁঝের মতো। গ্লানির অন্ধকার হঠাৎ ঢেকে ফেলেছে বলীরামপুরের নিরর্থক জগৎটাকে।

সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হাতের মোড়কটিকে, অনাথালয়ের পথের ধারের নালীটার মধ্যে।

···ছুটে চলেছে মিনাকুমারী। অভিমন্যু ডেকেছিল মিনাকুমারীকে; চিঠি দিয়েছিল, এখনও ডাকছে তাকে অন্ধকারের মধ্যে, দীক্ষিতদের আম-বাগানে।···টপটপ করে মধু ঝরছে শুক্‌নো পাতার উপর; ঝরা-পাতার দরজায় টোকা মারছে গাছ-ভরা আমের মুকুল।···দীক্ষিতদের আম-বাগান এক দুর্বার আকর্ষণে তাকে টানছে। মৃগনাভীর গন্ধ লক্ষ্য করে পাগল হয়ে মৃগী ছুটেছে। আম-বাগানের দিক থেকে কন-কনে পশ্চিমে হাওয়া লাগছে তার সর্বাঙ্গে। গলায় পাক দিয়ে জড়ানো স্কার্ফটার প্রান্ত দুটো এই হাওয়াতে উড়ছে। সেই আমগাছটার মুকুল-ভরা নিচু ডালটা দুলে দুলে উঠছে। ডাকছে তাকে হাতছানি দিয়ে। এখানেই আজ সে ফিরে পাবে তার অভিমন্যুকে। তার কণ্ঠাশ্লেষের মাদকতায় অবসন্ন হয়ে আসছে তার দেহ।··· যন্ত্রণার তীব্র মধুরতার মধ্যে দিয়ে সে কাছে পাচ্ছে তার অভিমন্যুকে,—আরও কাছে, আরও···পিষে যাক সে; যাক, যদি শ্বাসরোধ হয়ে যায় তার নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে···

প্রসন্নতার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চিত্রগুপ্তের মুখ।'···মিনাকুমারীর দেহের ময়না তদন্তের রিপোর্টখানা এরপর দিলে ফাইলটায় আর খুঁত থাকত না কিছু। যাক গে!···শেষ যখন হয়েই গিয়েছে, তখন আর মৃত্যুর পরের দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে কেবল

কাগজের বোঝা বাড়ানো ছাড়া তো আর কিছু নয়।···কাগজ-পত্র, ঘটনার পারম্পর্য; কয়েকটি মনের ঘাত-প্রতিঘাত, সাজানো হয়েছে ঠিক যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন, সেই রকম! এখনই এই ফাইলটাকে শেষ করে তুলে রাখতে হবে। এরপর তিনি নেবেন একখানা 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র ফাইল। অসংখ্য ফাইল সম্মুখে,—নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত কোথায় তাঁর!

তিনি কলম নিয়ে বসেন তাঁর মন্তব্য আর উপদেশ লেখককে জানাতে।

চিত্রগুপ্ত তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক। সাহিত্য-সমালোচনায় পয়সা নাই। সেইজন্য লেটারহেড ছাপিয়ে একটা নূতন ব্যবসা খুলে বসেছেন,—ডাকযোগে গল্প লেখা শেখানো। নূতন লেখকদের লেখার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া, আর তাঁর বিজ্ঞাপন যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে পনেরটি মাত্র পাঠে পুরোদস্তুর লেখক তৈরি করে দেওয়া—'ইহাই চিত্রগুপ্ত-বাণী-প্রতিষ্ঠান'-এর উদ্দেশ্য। যে কোনো কাগজ খুললেই নজরে পড়ে—'আপনি যদি বাড়িতে বসিয়া মাসিক দুই শত টাকা রোজগার করিতে চান, আর যদি লেখার একটুও শখ থাকে, তাহা হইলে 'চিত্রগুপ্ত-বাণী-প্রতিষ্ঠান'-এর নিকট বিশদ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।'

পূর্ণ পাঠক্রম সাড়ে তিনশ' টাকায় হয়ে যায়। মফস্বলের উদীয়মান লেখকদের সুবর্ণ সুযোগ। আর সব চাইতে বড় সুবিধা যে, এই সকল নবীন যশোলিপ্সু লেখকদের লেখা, চিত্রগুপ্ত তদ্‌বির করে মাসিক পত্রিকাদিতে ছাপিয়ে দিতেও চেষ্টা করেন।

আজকাল মিলন, বিরহ, স্বাভাবিক মৃত্যু, আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি পনেরটি পাঠে তিনি পনেরটি প্লটের সংকেত দিয়ে দেন। ঐ সংকেতের আধারে গল্প লিখে এলে সেগুলির সম্বন্ধে নিজের মন্তব্য আবার লিখে পাঠান লেখককে।

সেই চিঠিই তিনি এখন লিখতে বসেছেন। আর আগের লেখা চিঠিপত্রগুলো দেখে তবে তিনি জবাব দেবেন।—

আত্মহত্যা পড়ে ৩নং পাঠে।

'চিত্রগুপ্ত-বাণী-প্রতিষ্ঠান' থেকে প্রেরিত, চার নম্বর পাঠের গল্পের খসড়াটা তিনি পড়েন।—

(১) মিনাকুমারীর চিঠি; (২) অভিমন্যুর চিঠি; (৩) নায়কের মৃত্যু সম্বন্ধে জ্যোতিষীর গণনা; (৪) অনাথা নায়িকা; (৫) নায়কের মৃত্যু; (৬) নায়িকার আত্মহত্যা...

এর পরের কাগজখানাও পড়েন চিত্রগুপ্ত। চার নম্বর পাঠের সঙ্গে এখানাও পাঠানো হয়েছিল।—

( বিশেষ গোপনীয় )

লেখার জনপ্রিয়তা বাড়াইবার জন্য কী কী করিবেন।*

(ক) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনা গল্পের ভিতরে ঢুকাইয়া দিবেন।

(খ) খানিকটা রাজনীতি ( ফিকা গোছের ) গল্পের ভিতর যেন স্থান পায়।

(গ) সাধারণ-বুদ্ধিতে অবিশ্বাস্য বা অসম্ভাব্য মনে হইলে স্থূল নাটকীয় উপাদান বহুল পরিমাণে গল্পের ভিতর দিতে ভুলিবেন না।

(ঘ) শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিবেন।

'চিত্রগুপ্ত-বাণী-প্রতিষ্ঠানের ছাপমারা লেটার-প্যাডে, গল্পের লেখককে চিঠি লিখতে আরম্ভ করেন চিত্রগুপ্ত ঃ

—'প্রিয় মহাশয়'—

---

০ এই নির্দেশগুলি ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্য। প্রতি বৎসর প্রয়োজন মতো ইহার পরিবর্তন করা হয়। বার্ষিক দশ টাকা করিয়া দিলে, আমাদের পুরাতন ছাত্রদের নূতন নির্দেশ ( ছাপানো ) প্রতি বৎসর পাঠাইয়া দিই ॥ চিত্রগুপ্ত

# সতীনাথ

# ভাদুড়ীর

# শ্রেষ্ঠ গল্প

# শ্রেষ্ঠ গল্প

## সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| প্রাক্‌কথন | ১ |
| গণনায়ক | ৯ |
| বন্যা | ২৪ |
| আণ্টা-বাংলা | ৩৯ |
| ষড়যন্ত্র মামলার রায় | ৫০ |
| চকাচকী | ৬২ |
| বৈয়াকরণ | ৭০ |
| ডাকাতের মা | ৮২ |
| মুনাফা ঠাকরুণ | ৮৮ |
| পত্রলেখার বাবা | ৯৪ |
| বাহাত্তুরে | ১০৫ |
| অভিজ্ঞতা | ১১৯ |
| চরণদাস এম. এল. এ | ১৩২ |
| দাম্পত্য সীমান্তে | ১৪৬ |
| অলোকদৃষ্টি | ১৫৪ |
| জোড়-কলম | ১৬১ |
| বয়োকার্ম | ১৬৯ |
| জামাইবাবু | ১৭৮ |
| ওয়ার কোয়ালিটি | ১৮০ |
| দিগ্‌ভ্রান্ত | ১৮৪ |
| বমি-কপালিয়া | ১৯২ |

# প্রাক্-কথন

ভূয়োদর্শী সেই প্রবাদটির কথা স্মরণে রেখে সতীনাথ ভাদুড়ির শ্রেষ্ঠগল্প সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছি—'যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে চায়, সে কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না।' যে কোনো নির্বাচনে থেকে যায় কিছুটা দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, যেহেতু ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি মাত্রেরই তা বৈশিষ্ট্য। একের দৃষ্টিতে যা শ্রেষ্ঠ, অন্যের দৃষ্টিতে তা হয়তো ভাল—শ্রেষ্ঠ নয়। সেজন্যেই বুঝি প্র. না. বি. তাঁর গল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছিলেন নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতরতায় আপেক্ষিকতায়। তবুও যেহেতু নির্বাচকও মূলতঃ একজন পাঠক, সেহেতু পাঠকের সাধর্ম্যের একটা সাধারণ ভূমিতে তাঁকে হতে হয় স্থিতিবান। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে একবুক সাহস নিয়ে উচ্চারণ করা যায়—এই সংকলনের অন্ততঃ অধিকাংশ গল্পই শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং লেখকেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠগল্প নির্বাচন করতে গিয়ে পাঠকের চেয়েও বেশি হন বিপন্ন এই কারণে যে স্রষ্টা এবং তাঁর আস্বাদকারীর মনোভূমি একসমতলে বিন্যস্ত নাও হতে পারে।

সতীনাথের গল্পসংখ্যা ষাটকে অতিক্রম করে গেছে। সমস্ত গল্পগুলি একত্র সংকলন করলে বিপুলকায় গ্রন্থ কিছু হয় না। তবুও নির্বাচনের প্রয়োজন এই ভেবে যে সতীনাথও অন্য অনেক লেখকদের মতো তাঁর সব গল্পকেই কালোত্তীর্ণ ভাবতেন না। সেজন্যে তাঁর ভাবনার বিশিষ্টতাদ্যোতক অধিকাংশ গল্প এতে সংকলিত হল। "ভালো হত আরো ভালো হ'লে" নিশ্চয়ই —কারণ পাঠকের রুচির চাহিদা হয়তো আরও দু'একটি গল্পের জন্যেও।

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথের আগমন গল্পের পূর্ণ মঞ্জুষা নিয়ে নয়, উপন্যাসের বৃহত্তর সৃষ্টি নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। 'জাগরী' একই কালে তাঁর জন্যে অর্জন করেছিল অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা এবং অপরিমেয় জনপ্রিয়তা। অবশ্য জনপ্রিয়তাই নয় সাহিত্যের একমাত্র মানদণ্ড। সতীনাথ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত নন তাঁর ভূরি পরিমাণ রচনার জন্যে। মাত্র ছ'টি উপন্যাস এবং এর দশগুণ গল্পসংখ্যা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ। 'জাগরী' তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যদিও সতীনাথ নিজে ভাবতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা চিরস্থায়ী আসন পেয়েছেন—তা তাঁরা অর্জন করেছেন তাঁদের উপন্যাস দিয়ে নয়, ছোটগল্প দিয়ে। বস্তুতপক্ষে বাংলায় উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পই বুঝি অধিকতর সার্থক। সে অবশ্য সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে, বিক্রয়ের দিক থেকে এটা সত্য নয় সর্বাংশে। সতীনাথের ক্ষেত্রে বুঝিবা এটা নিঃশেষে সত্য, সেজন্যে তাঁর ভাল গল্পগুলির সঙ্গে একালের পাঠকদের পরিচয়ের প্রয়োজন। প্রয়োজন এজন্যেই যে প্রতিটি গল্পে স্বতন্ত্র চিন্তা, স্বতন্ত্র বিন্যাসের পরিচয় ক'জন গল্পকারই বা সার্থকভাবে উপহার দিতে পেরেছেন আমাদের। এ বিষয়ে

সতীনাথ বাস্তবিকই স্বতন্ত্র। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য বিধৃত আছে তাঁর অভিজ্ঞতায় —যা ছিল বিচিত্রচারী, যা ছিল তাঁর জীবনের অতি-সংলগ্ন। তাঁর জীবনের সেইটুকু অংশ, যা তাঁর সাহিত্যদৃষ্টির সন্নিকৃষ্ট। আমরা আলোচনা করছি নিতান্ত সংক্ষেপে। যদিও আক্ষেপ আমাদের আছে সতীনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সমন্বিত তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীর জন্যে।

প্রায় ছিয়াত্তর বছর আগে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের সমাসন্ন সন্ধ্যায় ( ১১ আশ্বিন ১৩১৩ সাল ) সতীনাথের জন্ম। বাংলাদেশের পূজোমণ্ডপে তখন বিজয়াদশমীর ঢাকে বিসর্জনের বাজনা। কিন্তু সতীনাথ জন্মেছিলেন দূর পূর্ণিয়া জেলার ভাট্টাবাজারে। পূর্ণিয়া অবশ্য প্রচুর বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চল। অনেক বাঙালীর মতোই তাঁর বাবা ইন্দুভূষণ সতীনাথের জন্মের এগারো বছর আগে থেকে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের আদিবাসভূমি ছেড়ে পূর্ণিয়ায় বসবাস করতে থাকেন আইন-ব্যবসায়ের সূত্রে। মূলতঃ অধ্যাপকবংশের সন্তান সতীনাথের পড়াশুনো আরম্ভ হল পূর্ণিয়াতেই। বাড়ি আর স্কুলের চারপাশের অশথ, তেঁতুল, বট, সেগুন তাঁকে টানে নাড়ীর টানে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় সতীনাথ এম. এ. আর ল'এর চৌকাঠ পার হয়ে এলেন যথাক্রমে ১৯৩০ এবং ৩১-এ— পঁচিশ বছরের পূর্ণবয়স্কতায়।

বাবার মতো তাঁকেও আসতে হল আইন-ব্যবসায়। বলাবাহুল্য, কিছুমাত্র আকর্ষণ এতে অনুভব না করেই। বাবার সঙ্গে সম্পর্কে একটা দূরত্ব ছিল বরাবরই। তাই অবসরগুলি কাটতো হয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দের সাহিত্যিক আড্ডায়, নয় টেনিসকোর্টের চৌহদ্দীতে।

বাবা দূরে। মা এবং দিদি আরও দূরে—চিরদিনের নাগালের বাইরে, সেই ছাত্রাবস্থাতেই। একটা অনাসক্তি, একটা detachment সতীনাথের চিরসঙ্গী হয়ে গেল, যা তাঁর সাহিত্যের অন্যতম উপকরণ। এবং একটু গৃহিণীপনাতেও ছিল মনঃসংযোগ। অনাসক্তির সঙ্গে জুটল আত্মনির্ভরতা। এই আত্মনির্ভরতা শেষ অবধি তাঁকে টেনে নিয়ে গেল রাজনীতির গভীর স্রোতের বর্তুলতায়। সতীনাথ ঠিক তখন তেত্রিশ।

অথচ সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের পশ্চাদ্‌পট দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ছিল না সারগর্ভ। তবুও গায়ে তুলে নিলেন চিরদিনের জন্যে খদ্দর এবং পায়ে চপ্পল—কংগ্রেসে যোগদান করেছেন সতীনাথ। সভাসমিতি আর বক্তৃতায় কবে তিনি লোকচক্ষে হয়ে গেছেন সম্মানিত 'ভাদুড়ীজী'। এবং পরম বিস্ময়ের বিষয় প্রায়—ইন্দুভূষণ নিত্য প্রার্থনা করতে লাগলেন পুত্রের রাজনৈতিক জীবনের অভিপ্রেত সাফল্য।

তখনকার কংগ্রেসে যোগ দিয়ে প্রথম সারিতে যাবার স্বীকৃতিপত্র আসতো কারাবরণের ওয়ারেন্টের মধ্যে দিয়ে। এবং এই কারাবরণ (১৯৪০-৪৪) চলতে থাকলো বিভিন্ন পর্যায়ে হাজারিবাগ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলের সেগ্রিগেশন ওয়ার্ড আর 'টি' সেলের চার নম্বর সেলে।

একথা বলা কতখানি সংগত হবে জানি না ( কারণ জেলের জীবন কোনো পর্যায়েই প্রার্থিত নয় ) যে, সতীনাথ যদি জীবনের একটা পর্যায় জেলে না কাটাতেন তাহ'লে হয়তো উকিল অথবা রাজনীতিক সতীনাথকে আমরা

পেতাম। সাহিত্যিক সতীনাথকে সম্ভবত নয়। তাঁর পছন্দসই সেলে বসে তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন পড়াশুনো করার। 'তাঁর প্রথম প্রবল সাহিত্য রচনা' 'জাগরী'র রচনাস্থান এই জেলকক্ষ এবং উপকরণ এই জেলেরই অভিজ্ঞতা। এই জেলের আবদ্ধতার মধ্যেই ফণীশ্বরনাথ রেণুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় সৃষ্টি করেছে মনের মুক্তাকাশ। দু'জনেই দু'জনের লেখা পড়তেন এবং হয়ে উঠতেন ক্রমশ সমৃদ্ধ। 'ময়লা আঁচল' আর 'জাগরী'র সম্পর্ক নিয়ে যে হীন ইঙ্গিতই করা হোক না—মানসিকতায় সাধর্ম্য রেণুজী অর্জন করেছিলেন এই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ভাদুড়ীজীর সান্নিধ্যে।

জেল থেকে বেরিয়েও সতীনাথ কংগ্রেসে। তাঁর কাছে আসেন জয়প্রকাশ, কখনো বা রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তারও পরে এসেছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-উত্তর নেতাদের চেহারাটা তাঁর কাছে অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে অনতিবিলম্বে। তিনি বুঝতে পেরেছেন—'কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল। সে কাজ তো হাসিল হয়ে গেছে। এখন রাজকাজ ছাড়া কোনো কাজ নেই আর।' ১৯৪৮-এর সূচনাতেই কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। হলেন সি. এস. পি-এর সদস্য। স্বস্তি নেই এখানেও। 'ক্ষুরধার intellect-এর ছেলে, সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, sincere' সতীনাথ কি পারেন 'মূর্খ', মিথ্যাভাষীর সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকতে?' অতএব রাজনীতির স্থায়ী ফসল ফলল সাহিত্যে—তাঁর 'গণনায়ক' ছোটগল্পে, স্বাধীনতা লাভের ঠিক অব্যবহিত পরেই।

সতীনাথ এতোদিনে খুঁজে পেলেন তাঁর অভীষ্ট পথ। সাহিত্য হ'ল তাঁর আত্মপ্রকাশ এবং মতপ্রকাশের বাহন। প্রাক্-স্বাধীন নিপীড়ন যুগের 'জাগরী' (১৯৪৫)-কে বাদ দিলে 'গণনায়ক' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এর প্রথম চরণ ও 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিদেশযাত্রার পূর্বেই। লন্ডন হয়ে যেদিন প্যারিসে পেঁছলেন, সেদিন তাঁর ৪৪তম জন্ম-দিবস। প্যারিসে গিয়ে তাঁর মিশবার মতো আপনজন খুঁজে পেলেন গ্রামের লোকজনদের মাঝেই। জার্মান, অস্ট্রিয়া, জুরিখ, ইটালি, লন্ডন হয়ে ফিরে এলেন ভারতে পুনশ্চ। হৃদয় তখন বেদনায় বিধুর। চিরাকাঙ্ক্ষিত রুশ দেশে যাবেন বলে রুশ ভাষাকে করেছেন আয়ত্ত অথচ রুশ দেশে ভ্রমণের অনুমতি পেলেন না। তাঁর বিশ বছরের স্বপ্ন-শিশুটি পঙ্গু হয়ে ফিরে এল দেশের মাটিতেই।

রবীন্দ্র পুরস্কারের টেলিগ্রামটি প্যারিসে থাকতেই সতীনাথকে করেছিল নন্দিত-অভিনন্দিত। অথচ 'জাগরী' আর 'গণনায়ক' গল্প প্রকাশের মধ্যে, পাঠক মনোনিবেশ করলেই লক্ষ্য করবেন, প্রায় দু'টি বছরের ফারাক। অর্থাৎ সতীনাথকে সাহিত্য এখনও নিঃশেষে টেনে নিতে পারেনি তার সাংস্কৃতিক অঞ্চলের আশ্রয়ে। বাগান—যা ছিল এই অকৃতদার সাহিত্যসেবকটির প্রথম প্রেম—তাই তখন তাঁকে রেখেছে অধিকতর সংশ্লিষ্ট। এবং বলা বাহুল্য অশেষ পুস্তকরাজিও।

লম্বা দোহারা বলিষ্ঠ-গঠন মানুষটির দেহে পুরনো নিউমোনিয়া ব্যাধিটি পুনশ্চ ফিরে এসেছিল তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নে। চিকিৎসায় গররাজি হলেন সতীনাথ। অনেকটা ইচ্ছে করেই। বরং রাজি হলেন উইল সম্পাদনা করতে। করলেনও তাই। তারপর সেই আদি প্রেম আদি প্রাণ বৃক্ষরাজির মধ্যে

বিচরণশীল বহুরূপী মানুষটির চিউমারটি যখন ফেটে গেল নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্যে, তখন কিছু রক্তের মধ্যে প্রাণটিকে বিস্তার করে বিদায় নিয়েছেন সতীনাথ। হাতে কি বইটি তখনও ছিল অনিঃশেষে ধরা ?

'জাগরী', 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' ( দুটি চরণ ), 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'অচিন রাগিনী', 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসাবলী ও ভ্রমণমূলক রচনা 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' বাদ দিলে সতীনাথের ছোটগল্পগুলির সংকলনগুলি হ'ল— 'গণনায়ক' ১৯৪৮, 'অপরিচিতা' ১৯৫৪, 'চকাচকী' ১৯৫৬, 'পত্রলেখার বাবা' ১৯৬০, 'জলভ্রমি' ১৯৬২ এবং 'অলোকদৃষ্টি' ১৯৬২। ৩০ মার্চ ১৯৬৫ মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই, এছাড়া প্রকাশিত হয় 'সতীনাথ-বিচিত্রা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ। অর্থাৎ শেষ বইটি ধরে সতীনাথের গল্পগ্রন্থ সংখ্যা সাত। এই সাতটি বইয়ে যথাক্রমে, ৫, ৭, ৮, ৯, ৯, ১০ এবং ১৪—মোট ৬২টি গল্প সংকলিত আছে। গ্রন্থপ্রকাশ অনুসারে এদের প্রকাশকাল এবং প্রকাশস্থলের একটি তালিকা নিবদ্ধ হল সতীনাথের গল্পরচনার ইতিবৃত্ত-সন্ধানীদের জন্যে।

| গ্রন্থনাম / প্রকাশকাল ॥ | গ্রন্থভুক্ত গল্প ও | তার প্রকাশপরিচয় |
|---|---|---|
| গণনায়ক : ১৩৫৫ | গণনায়ক | দৈনিক কৃষক \| শারদীয় ১৩৫৪ |
| | বন্যা | বিশ্বভারতী পত্রিকা \| মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩ |
| | আন্টা-বাংলা | দেশ \| শারদীয় ১৩৫৪ |
| অপরিচিতা : ১৩৬১ | অপরিচিতা | দেশ \| শারদীয় ১৩৬০ |
| | ফেরবার পথ | দেশ \| শারদীয় ১৩৫৮ |
| | রথের তলে | দেশ \| শারদীয় ১৩৫৫ |
| | ষড়যন্ত্র মামলার রায় | উত্তরা \| অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ |
| | অনাবশ্যক | দেশ \| ৫ মাঘ ১৩৫৮ |
| | ঈর্ষা | দেশ \| শারদীয় ১৩৫৯ |
| | পরিচিতা | স্বাধীনতা \| শারদীয় ১৩৬০ |
| চকাচকী : ১৩৬৩ | চকাচকী | দেশ \| ১৫ শ্রাবণ ১৩৬১ |
| | বৈয়াকরণ | দেশ \| ২৯ পৌষ ১৩৬২ |
| | ডাকাতের মা | যুগান্তর \| শারদীয় ১৩৬১ |
| | বিবেকের গণ্ডি | পূর্বাশা \| আশ্বিন ১৩৬১ |
| | মুষ্টিযোগ | দেশ \| শারদীয় ১৩৬১ |
| | রাজকবি | চতুরঙ্গ \| মাঘ-চৈত্র ১৩৬২ |
| | তবে কি | দেশ \| ১৬ আষাঢ় ১৩৬৩ |
| পত্রলেখার বাবা : ১৩৬৬ | পত্রলেখার বাবা | দেশ \| ১৪ আষাঢ় ১৩৬৪ |
| | কমাণ্ডার-ইন-চীফ | দেশ \| শারদীয় ১৩৬৫ |
| | বাহাত্তুরে | দেশ \| শারদীয় ১৩৬৬ |

| | | |
|---|---|---|
| | কণ্ঠকণ্ডূতি | আনন্দবাজার \| শারদীয় ১৩৬৬ |
| | সাঁঝের শীতল | দেশ \| শারদীয় ১৩৬৪ |
| | একটি কিংবদন্তীর জন্ম | যুগান্তর \| শারদীয় ১৩৬৪ |
| | পুতিগন্ধ | যুগান্তর \| শারদীয় ১৩৬৬ |
| | অভিজ্ঞতা | যুগান্তর \| শারদীয় ১৩৬৩ |
| | ধ্বস | দেশ \| ১০ মাঘ ১৩৬৫ |
| জলভ্রমি : ১৩৬৯ | মহিলা-ইন-চার্জ | যুগান্তর \| শারদীয় ১৩৬৭ |
| | জলভ্রমি | আনন্দবাজার \| শারদীয় ১৩৬৭ |
| | স্বর্গের স্বাদ | আনন্দবাজার \| শারদীয় ১৩৬৮ |
| | চরণ দাস এম. এল. এ. | দেশ \| শারদীয় ১৩৬৮ |
| | দাম্পত্য সীমান্তে | দেশ \| শারদীয় ১৩৬৭ |
| | দুই অপরাধী | পরিচয় \| ভাদ্র ১৩৬৪ |
| | পদাঙ্ক | দেশ \| ২৮ পৌষ ১৩৬৮ |
| অলোকদৃষ্টি : ১৩৭০ | হিসাব নিকাশ | আনন্দবাজার \| বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬৮ |
| | জাদুগণ্ডি | আনন্দবাজার \| শারদীয় ১৩৬৯ |
| | ব্যর্থ তপস্যা | অমৃত \| শারদীয় ১৩৬৯ |
| | পরকীয় সন-ইন-ল | দেশ \| শারদীয় ১৩৬৯ |
| | তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ | আনন্দবাজার \| বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬৯ |
| | জোড়-কলম | আনন্দবাজার \| শারদীয় ১৩৭০ |
| | বয়োকর্মি | দেশ \| শারদীয় ১৩৭০ |
| | গোঁজ | অমৃত \| শারদীয় ১৩৭০ |
| | সরমা | দেশ \| ২৬ মাঘ ১৩৬৯ |
| সতীনাথ-বিচিত্রা : ১৩৭২ | জামাইবাবু | বিচিত্রা \| অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ |
| | ওয়ার কোয়ালিটি | পরিচয় \| বৈশাখ ১৩৫৪ |
| | আন্তর্জাতিক | বিশ্বভারতী পত্রিকা \| পৌষ ১৩৫৪ |
| | তলানির স্বাদ | দেশ \| ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ |
| | অজা-গড় | আনন্দবাজার \| বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭০ |
| | রোগী | অমৃত \| ৮ ফাল্গুন ১৩৭০ |
| | দিগ্‌ভ্রান্ত | আনন্দবাজার \| শারদীয় ১৩৭১ |
| | মা আম্রফলেষু | দেশ \| শারদীয় ১৩৭১ |

| | |
|---|---|
| ব্লড প্রেসার | অমৃত \| শারদীয় ১৩৭১ |
| এক ঘণ্টার রাজা | দেশ \| ৯ মাঘ ১৩৭১ |
| করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ | আনন্দবাজার \| বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭১ |

ভূত, পংক্তিলক, মুনাফাঠাকরুণ—এদের প্রকাশ-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তালিকা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে সতীনাথের অধিকাংশ গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল অভিজাত পত্রিকাগুলোতে।

সতীনাথের গল্পগুলির উৎসভূমি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। 'গণনায়ক'-এর গ্রন্থ-সূচনায় লেখক মন্তব্য করেছিলেন—'লেখাগুলি বিবরণমূলক। বিবরণের যথাতথ্য সামান্য পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছি,—পাছে প্রাণহীন প্রতিলিপি হইয়া দাঁড়ায়, সেই ভয়ে এবং আরও কয়েকটি কারণে।' এই 'প্রাণহীন প্রতিলিপি'গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সতীনাথের ডায়েরিসমূহে প্রথম স্থান পেতো, পরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। সতীনাথের গল্পসমূহের পটভূমি তাঁর চেনা পরিবেশ—পূর্নিয়ার মানুষ, পূর্নিয়ার মাটি। সে কারণে তাঁর সাহিত্যচর্চাকে কেউ কেউ বলেছেন আঞ্চলিক। বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রতিটি গল্পে জীবনের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত, তার আধার হয়েছিল তাঁর এই আঞ্চলিক মানসিকতা। কিন্তু যেখানে তাঁর সৃষ্টি এই মানসিকতা ছাড়িয়ে নির্বিশেষ হয়ে উঠতে পেরেছে তাঁর সতর্কতা, আত্মসমালোচনা, মার্জিত এবং পর্যবেক্ষণের নিপুণতায়, সেখানে তিনি কালোত্তীর্ণ রচনার স্রষ্টা। সতীনাথ তা বলে শরৎচন্দ্র নন, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কি সরোজকুমার রায় চৌধুরীও নন। এর প্রধানতম লক্ষণ হল সতীনাথ কখনো এক গল্প দু'বার লেখেন নি।

সতীনাথের গল্পের আরেক লক্ষণীয় গুণ এর ব্যঙ্গপ্রবণ চরিত্র—যদিও তা সর্বাঙ্গে জড়িত নয়। এই রহস্যপ্রবণতা যেমন আপাত অসংগতি—যার সঙ্গে তাঁর আপোষ-মীমাংসার প্রশ্ন ছিল না—তা থেকে জাত, তেমনি সম্ভবতঃ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্যের কারণেও।

সতীনাথের একটি গল্পের নাম 'অপরিচিতা'। এটি সতীনাথের একমাত্র প্রেমের গল্প সম্ভবতঃ। এ থেকে বোঝা যায় 'প্রেম' সতীনাথের গল্পে উপকরণ জোগাতে সমর্থ হয়নি। সতীনাথের মনের কাঠামো ছিল না এর অনুকূল।

তবে সতীনাথের গল্পে কি আছে আর? সতীনাথের গল্প প্রবল humanistic. এরই প্রতি পরতে প্রবেশ করতে গিয়েই সতীনাথ বদলে গেছেন অনবরত। অথচ পরিবর্তনে পরীক্ষার ছাপ নেই। ফরাসী সাহিত্য পড়েছেন—গল্পের আঙ্গিকে তাকে করেছেন স্বীকারও, অথচ তার শরীরসর্বস্বতাকে বর্জন করলেন—এ অল্প সামর্থ্যের পরিচয় নয়! আসলে স্বাধীনোত্তর দেশের বিশৃংখলা, আমলাতন্ত্র এবং নানা অব্যবস্থা তাঁর মনকে করে তুলেছিল চিন্তাখিন্ন। অথচ আশ্চর্য স্থৈর্যের সঙ্গে সেই অব্যবস্থাকে মোকাবিলায় গেছেন এগিয়ে। সেজন্যেই তাঁর ছোটগল্পের অঙ্গীরস হয়ে উঠেছে সুস্নিগ্ধতা। এটাই সর্বব্যাপী শিল্পের একটা আবশ্যিক ধর্ম।

এই সংকলনে ধৃত সমস্ত গল্পগুলির টীকারচনা আমাদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হওয়া উচিতও নয়। বিশাল পাঠকমণ্ডলী তাকে বিচার করবেন

তাঁদের রুচির বিভিন্নতায়, দৃষ্টিভঙ্গির বিচিত্রতায়। কেউ তুষ্ট হবেন গল্পে নিরাসক্তি লক্ষ্য করে, কেউ বা খুশী হবেন তার হাস্যরসের স্নিগ্ধতায়, কেউ বা শুচিস্মাত বোধ করবেন এর মননশীলতায়। এমন ক'টি লক্ষণ তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গল্পে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

'গণনায়ক' গল্পটি তাঁর উক্ত-নামধেয় গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প—যদিও তাঁর লেখা প্রথম গল্প নয় (তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি শ্রেষ্ঠ হয়তো নয়, তবে প্রথম গল্পের মর্যাদার কারণে 'জামাইবাবু' এই সংকলনে স্থান পেয়েছে)। দেশ-বিভাগের সমসাময়িককালে 'গণনায়ক' রচিত হয়েছিল বলে আবশ্যিকভাবে তখনকার অনুভূতি এই গল্পে উচ্চারিত। দেশবিভাগের 'মওকা' লুটেছিল যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তথাকথিত 'দেশপ্রেমিকেরা' তাদের যথার্থ স্বরূপটি এই গল্পে ধরা পড়ে আছে। 'গান্ধীটুপি' এই ব্যবসায়ের প্রথম মূলধন। নির্লজ্জতারও তো একটা সীমা থাকে।

এই একই অত্যাচার-অবিচার এবং অন্যায়ের পাহাড়কে 'বন্যা' ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে কিনা জানিনা, কিন্তু তার স্রোতে রিলিফ ক্যাম্পের যথাযথ ক্রিয়াবারিধি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এটা গল্পের আপাত একটা দিক। মনুষ্যচরিত্রের সেই চিরন্তন দিকটা—অসহায় মুহূর্তে ঐক্যবোধে জেগে উঠে পুনশ্চ সংকটান্তে বিভেদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ—এই গল্পে পরিগ্রহ করেছে চিরন্তনী বাণীরূপ।

কিন্তু 'আণ্টা বাংলা' তুলনাহীন। বরেন বসুর 'রিক্রুট' যেমন 'রঙরুটে' পরিণত হয়েছিল, তেমনি প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব হয়েছে এখানে লোকমুখে আণ্টা বাংলা। পূর্ণিয়ার নীলকরদের সেই ব্যভিচার ও ঐশ্বর্য বুঝি নীলদর্পণকেও হার মানায়। বাঙালীর 'লো-এশিট্র' ক্লাবে আসতে পেতো বিরসা ওঁরাওদের মতো খ্রীষ্টান বেয়ারারা, তবু বিরসারাও বাঁচতে পারে না। নীলকরদের আভিজাত্যে ভাঁটা পড়লেও বিরসার নাতি বোটরা ছাড়তে চায় না সেই ক্লাব অসীম মোহে। শেষে এক দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে তাকেও মৃত্যুবরণে হতে হল প্রস্তুত। তবুও তার মোহাচ্ছন্ন চোখে জেগে ওঠে আণ্টাবাংলার মহিমা। উপন্যাসের এক বিস্তৃত মহত্তায় পরিস্থাপিত এই গল্পে দাসেদের দাসজীবন প্রার্থনার পটভূমিকায় প্রভুত্ববাদী শোষণবাদিতার একটা উলঙ্গরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ গল্পে পরিণত করেছে এর কাহিনীকে।

'চকাচকী' গল্পে এক প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিতের মিলন ঘটেছে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। 'জাগরী'র হরদাহাটের দুবে-দুবেনী 'চকাচকী' গল্পে এসে প্রেমের ভিড় জমিয়েছে। বাস্তব এই চরিত্র দুটি যে বিবাহিত নয় সামাজিকভাবে তা কে জানতো। সবাই যখন ভাবছে দুবে দুবেনীর প্রেম বিচ্ছিন্ন হবার নয়, তখন হঠাৎ দেখা গেল মৃত্যুশয্যায় শায়িত দুবেকে ফেলে দুবেনী গেছে পালিয়ে। দেশ থেকে দুবের ছেলে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করল। কিন্তু হঠাৎ কেন আমরা দেখলাম সৎকারক্রিয়া যখন সম্পন্ন প্রায়, তখন শ্মশানের 'ওপারের কাশবন নড়ে' উঠেছে। 'না কিছু নয়, শেয়াল বোধহয়।'

পুরুষের প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'বৈয়াকরণ' গল্পের দেহ। শুদ্ধাচারী পণ্ডিতের চোখে রূপহীনা ছাত্রীর দোষ প্রতিপদে, অথচ রূপসী ছাত্রী পায় দোষেও মুক্তি। ইন্দ্রিয়াসক্তির এই বৈষম্য এক সময়ে পণ্ডিতের মনে জাগায়

আত্মবিচারণীয় প্রশ্ন। স্থূলে প্রবৃত্তির স্থূলতাকে অতিক্রম করে গেছে শেষ অবধি এই গল্পের সূক্ষ্মতা।

এমনি চরণ দাস এম. এল. এ., মুনাফা ঠাকরুণ, পত্রলেখার বাবা, ডাকাতের মা প্রভৃতি গল্পে নির্মম সত্য, পরিহাসের কাঠিন্য এমন নিপুণভাবে উচ্চারিত যে সতীনাথ যে কি চান তা বুঝতে পারি না। এজন্যেই কি তিনি 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের কপালকুটুকিতে ঐ শ্লোক দুটি উচ্চারণ করেছিলেন—'কালির লেখন সবাই পড়ে, কালের লেখন গুমরে মরে।'

সতীনাথ যতই বলুন কালের লেখন তাঁর গল্পে অন্ততঃ গুমরে মরে না।

একথা বুঝতে পেরেছেন বলেই সতীনাথের জীবিতকালের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স সতীনাথের 'কালির লিখন'কে এমন সম্ভারে সজ্জিত করায় হয়েছেন সানন্দপ্রয়াসী। আমার মতো অকৃতজনকে এই দায়িত্বদানের মধ্যে তাঁর ব্যবসায়িক মনের সবুজভাব যে হরিদ্রাভ হয়নি এখনো, তা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। ময়ূখবাবুর বাবা আমাকে অশেষ স্নেহে সিক্ত রেখেছেন দীর্ঘকাল—তিনি তারই পুত্রকৃত্য করলেন কিনা জানিনা। এই নির্বাচনে স্বভাবতই বিভিন্ন গল্পসংকলন, সতীনাথ গ্রন্থাবলীর সম্পাদকযুগল, শ্রীগোপাল হালদারের চমৎকার বইখানি, শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সতীনাথ স্মরণে' এবং অন্যান্য নানা টুকরো রচনার সাহায্য পেয়েছি। এ সব ঋণ স্বীকারের আনন্দ তখনই কূল ছাপিয়ে উঠবে, যখন বাঙালী পাঠক এই শ্রেষ্ঠ গল্পকে বরণ করে নেবেন তাঁদের সহজ আনন্দে।

শ্রীননীগোপাল আইচ এবং শ্রীমতী সুব্রতা ঘোষ গ্রন্থ প্রকাশের নানা পরতে বিজড়িত—সে কথা স্বীকার না করলে 'হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ'।

বারিদবরণ ঘোষ

রোজভিলা
বর্ধমান
২রা জুন, ১৯৮২

পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা, আর দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যের সীমারেখা 'নাগর' নদী। পার্বত্য 'নাগর' এখানে খুব খামখেয়ালী নয়। তাই তার সোহাগের অজস্রতার উপর রূঢ় ঔদাসীন্য দেখিয়ে আজও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, কাঠের নড়বড়ে পুলটি। আগেকার যুগে উত্তর বাংলা থেকে উত্তর বিহারে ফৌজ পাঠাবার যে পথ ছিল, তারই উপর ছিল, এই সেতু। সেই রাস্তা এখনও পুলের দু'দিকেই আছে কিন্তু তার সে জলুস আর নেই। কেবল গত বছর কয়েক থেকে গোপালপুর থানার আরুয়াখোয়ার হাট জমে উঠেছে যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দৌলতে—বিহার আর বাংলার মধ্যের বে-আইনী জিনিসের কেনা-বেচায়। পুলের পশ্চিমেই আরুয়াখোয়ার হাট। এই হাটের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে আর একটা রাস্তা, মালদা জেলা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে একেবারে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। অগণিত মাল বোঝাই গরুর গাড়ি মালদা, দিনাজপুর, আর জলপাইগুড়ি তিনদিক থেকে পুলের সম্মুখে এসে মিলিত হয়। গত বছর হাটের ইজারাদারের কাছ থেকে, বকরিদের আগে শান্তিরক্ষার মুচলেকা নেওয়ার জন্য এসে, এস ডি ও সাহেবের মোটরকার যায় পথে আটকে। তারপর থেকে পথের গর্তগুলো বুজেছে।

বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ষোল মাইল দূরের সুধানী স্টেশন থেকে। চোরাকারবারের কেন্দ্র আরুয়াখোয়া বাজার থেকে পুল পার হয়ে যায় গরু, মোষ, চিনি, ঘি, আর বাংলাদেশ থেকে আসে চাল আর ধান।

হিন্দু মুসলমানের মিশ্রিত জনসংখ্যা। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী। গত বছরের কলকাতা, নোয়াখালি আর বিহারের নানা প্রকার বিকৃত খবর, তাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল ঠিকই; কিন্তু এর চিড়খাওয়া মনও কয়েক দিনের মধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছিল। গতানুগতিকতার তাগিদে, পেটের ধান্দায় জোড়াতালি দেওয়া জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই পুরনো ফাটল দিয়ে ভাঙন ধরল হঠাৎ।

সুধানী-গোলার জহুরমল ভোকানিয়ার 'মুনীম' (গোমস্তা) এক শনিবারের রাতে আরুয়াখোয়া হাটে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। চিনির বস্তাগুলির উপর ত্রিপল বিছানো। রাতে খেয়ে-দেয়ে গাড়ি চড়লে আরুয়াখোয়ায় গাড়ি পৌঁছুবে কাল সকালে। বিড়িটায় শেষ টান মেরে ছোট অবশিষ্টটুকু গাড়োয়ানকে দেয়। বিলটু গাড়োয়ান খুশী হয়ে ওঠে।

'গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন মুনীমজী। একেবারে আরুয়াখোয়ায় উঠবেন। ঘণ্টায় কোশ যায় গরুর গাড়ি, দূরের সফরে। আর ধরুন রাতবিরাতের জন্য এক ঘণ্টা ফাজিল রাখলাম। সকাল এক প্রহরের সময়, আরুয়াখোয়ায় গিয়ে দাঁতন করবেন।'

মুনীমজী আজকে খুব খুশী আছেন। তিনি যাওয়ামাত্র সকলেই তাঁর কাছে দেশের 'হালচাল' জিজ্ঞাসা করে। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, এমন কি কন্সী এল পি স্কুলের গুরুজী পর্যন্ত তাঁর কাছে খবর জিজ্ঞাসা করে। একে

অতবড় গোলার লেখাপড়া জানা মুনীম ; তার উপর তাঁর মালিকের বাড়িতে 'বিজলী'তে খবর আনাবার কল আছে। সেই কলে লাটসাহেব পর্যন্ত ডোকানিয়াজীর সঙ্গে কথা বলেন, কত লোক কত খবর সেখানে দেয়, কত আওরৎ তাঁকে খুশী করবার জন্য গানবাজনা শোনায়। কাজেই মুনীমজীর কথার গুরুত্ব স্থানীয় লোকদের কাছে অনেকখানি।

'দেখিস রাতে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কী নিয়ে যাচ্ছিস, তাহলে বলিস, আলু ; আলুর বোরাটা সম্মুখে আছে তো ?'

'জী'।

'আমি পিছনেই শুই চিনির বস্তাগুলোর উপর। সম্মুখের দিকে চিনির বস্তাগুলো রাখতে পারলে একটু আরামে শোয়া যেত, ঝাঁকানি কম লাগত।'

'জী'।

'মীরপুরে একটু সাবধানে থাকিস। ওখানকার গ্রাম এডভাইজরি কমিটির সেক্রেটারি ভারি বজ্জাত। তার উপর আজকাল দুনিয়াসুদ্ধ সকলে সেক্রেটারি হয়ে উঠেছে, দেখিস না ? ওখানে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমাকে ডেকে দিবি। ও' গাঁখানা দিয়ে যাবার সময় চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে যাস্ ; চুপচাপ গেলেই সন্দেহ করবে। অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ। গাঁয়ের সেক্রেটারির দাম গড়ে টাকা দশেক। মীরপুরেরটাকে কিনতে টাকা পঞ্চাশের কম লাগবে না। সাবধান।'

'সে আর আমায় বলতে হবে না হুজুর। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি খুব হেপাজৎ করে চালাব ; খানা-গর্ত বাঁচিয়ে।'

মুনীমজীর ঘুম আর আসে না। যে খবর তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, তা শুনলে হাটসুদ্ধ লোক চমকে যাবে। এমন জবর খবর বহুকাল এ মুলুকের লোক শোনেনি।—না, চিনির বস্তার পিঁপড়েগুলো আর ঘুমোতে দেবে না। ঐ হাঁদা-গঙ্গারাম বিলটুটা কি বস্তাগুলো তুলবার সময় ঝেড়েও তোলেনি।

'এই বিলটু ঢুলছিস না কি ?'

'না, এই একটু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল হুজুর।' মুনীমজী জানেন যে এইবার বিলটু আমতা আমতা করে বিড়ি চাইবে ঘুম ভাঙানোর জন্য। আর করেই বা কী বেচারি—সারারাত জাগতে হবে তো ?—বিলটু আবার ঐ ভাসাভাসা শোনা খবরটা পথের লোকদের দিতে দিতে না যায়।

'এই বিলটা। এই নে, দেশলাই রাখ্। আর আজকের সুখানীতে শোনা খবরটা কাউকে বলিস না যেন!' বিলটু এতক্ষণ খবরটি সম্বন্ধে কিছুই ভাবেনি। মুনীজীর কথার পর খবরটা মনে করবার চেষ্টা করে।—

'না, না, মুনীমসাহেব, সে আর আমায় বলতে হবে না। এতকাল আপনাদের নুন খাচ্ছি, কোনোদিন খবর বলতে শুনেছেন ? গরীব মানুষ, আমাদের খবর দিয়ে দরকার কী ?'

প্রসন্নমনে সে বিড়ি আর দেশলাই নেয়। তারপর বাঁয়ের বলদের লেজ মুড়তে মুড়তে তার নিকট আত্মীয়ার উদ্দেশ্যে গালি দিতে আরম্ভ করে।

মুসহর সাওয়ের দোকানের সম্মুখে গাড়ি পৌঁছায় প্রায় বেলা দশটার সময়।

'রাম রাম মুনীমজী।'

'জয়গোপাল ! জয়গোপাল।'

মুসহর সাও আর তার ছেলে, গাড়ি থামাবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির বস্তাগুলি বাড়ির আঙিনার ভিতর নিয়ে রাখে,—এখনি আবার অন্য লোকেরা এসে পড়বে।—

'চার বোরা মোটে ?'

'কত ধানে কত চাল, তার তো হিসাব রাখো না ! ঐ আনতেই হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে, মিলের ছাপমারা বোরার উপর অন্য বোরা ঢুকিয়ে, ডবল বস্তার মধ্যে কোনোরকমে আনা।'

আলুর বোরাটা দোকানের সম্মুখেই নামিয়ে রেখে, সাওজী বলে, 'এবার বলুন হালচাল।'

মুনীমজী গম্ভীর হয়ে যায় ; প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দাঁতন আনতে বলেন। সাওজী বোঝে, আজ কিছু জবর খবর আছে। একে একে লোক জমতে আরম্ভ করে। বেশির ভাগই দোকানদার ; দুচারজন দূর গাঁয়ের লোক, যারা চালের গাড়ি নিয়ে এসেছে হাটে। অজস্র 'রাম রাম মুনীমজী'র প্রত্যাভিবাদন ইঙ্গিতে সেরে মুনীমজী একমনে দাঁতন করতে থাকেন ; ভাবে মনে হয়, সংসারে তাঁর দিকদারি ধরে গিয়েছে ! সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে,—কতক্ষণে তাঁর মুখধোয়া শেষ হবে, কতক্ষণে তাঁর মুখের দুটো কথা শুনতে পাবে।—এইবার গামছা দিয়ে মুখ মুছছেন ; আবার স্নানের জন্য তেল চাইবেন না তো—।

অন্যদিন হলে সাওজী স্নানের কথা তুলত ; এখন ইচ্ছা করেই খবর শোনবার লোভে সে কথা ওঠায় না। মুনীমজী বিলট্ গাড়োয়ানকে দুইজনের জন্য দই-চিঁড়ে কিনবার পয়সা দেন।

'ভাল দেখে গুড়ও কিছু আনিস ; চিনি তো আর পাওয়ার জো নেই এক চিমটি, এই যবে থেকে কংগ্রেস মিনিস্ট্রি হয়েছে।

তারপর মুনীমজী সমবেত লোকদের দিকে না তাকিয়ে, ট্যাঁকে কয়েকটি অবশিষ্ট খুচরো পয়সা গুঁজতে গুঁজতে বলেন, 'আর কী, দিনাজপুর জেলা তো পাকিস্তান হয়ে গেল।' কথার সুরে মনে হয় এ একটা সাধারণ খবর, হামেশাই এ রকম বহু জেলা পাকিস্তান হয়ে থাকে। এতক্ষণে তাঁর সম্মুখের লোকদের দিকে তাকাবার অবকাশ হয়। ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয় ফুটে বেরুচ্ছে, কোনো বিশ্ববিশ্রুত দেশনায়ক সাংবাদিকদের বৈঠক ডেকেছেন যেন।

মুহূর্তের জন্য সকলে নীরব হয়ে যায়। শ্রীপুরের রাজবংশী দর্পণ সিং-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আর সকলের বুক ঢিপ ঢিপ করে—না জানি তার জেলার কী হয়েছে ; এইবার বুঝি মুনীমজী তাঁর গাঁয়ের কথা বলবে। সাওজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ভয়ে ;—তার দোকান, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ! সে সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞাসা করে—'আর আমাদের আরয়াখোরা ?

'আরয়াখোরা তো পূর্ণিয়া জেলা, হিন্দুস্থানে। এ তো আর বাংলামুলুক নয়,—এ হচ্ছে বিহার। এখানে আর কারও টুঁ ফ্যাঁ চলবে না।'

হাটের দোকানদাররা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। মুনীমজী একসঙ্গে খবর বলে ফেলেন না,—আস্তে আস্তে টিপে টিপে খবর ছাড়েন। এতগুলি লোক উদগ্র উৎকণ্ঠায় তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে, লাটসাহেবের বেতার-বক্তৃতার মতো তাঁর কথার দাম আছে এখানে। এই সময়টুকুকে যত টেনে বড় করা যায়,—এই মানসিক বিলাসের মোহ কম নয়।

দূরের হাটুরেরা চালের গাড়ি নিয়ে সকলের চেয়ে আগে আসে। তাদের মধ্যে থেকেও অনেকে এসে জমেছে এখানে।

অছিমদ্দী জিজ্ঞাসা করে, 'মীরপুর কোথায় পড়ল হুজুর ?'

'মীরপুর কোন জেলায় ?'

কাঁদো কাঁদো হয়ে অছিমদ্দী বলে, 'হরিশচন্দ্রপুর থানা।'

সাওজী বলে দেয়—'ও হল মালদা জেলা।'

'মালদা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে।'

আল্লার এই অসীম করুণায় অছিমদ্দী এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে আর কোনো কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না।

বজরগাঁর পোড়াগোঁসাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন। ইনি রাজবংশীদের পুরোহিত। এই এলাকায় এঁর অনেক যজমান আছে। সাওজী উঠে এঁকে খাটিয়ায় বসতে দেন। তাঁর কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। একেবারে মুনীমজীর সম্মুখে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন—'আর বজরগাঁ ? তিতলিয়া থানা, জলপাইগুড়ি জেলা ?'

'বাবাজী, আপনি জলপাইগুড়ি জেলার জন্য চিন্তা করবেন না। রামজীর আশীর্বাদে ওটা হিন্দুস্থানেই পড়েছে।'

'পড়বে না ? বাপ-পিতাম'র আমল থেকে আমরা রয়েছি বজরগাঁয়। পাকিস্তানে চলে গেলেই হল ! জল্পেশ্বরের এলাকা, মহাকালের রাজ্য, চলে যাবে পাকিস্তানে ? বড়লাট ভারি সমজদার লোক। নারায়ণ ! নারায়ণ !'

নারায়ণকে প্রণাম করবার সময় আছিমদ্দীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কৌতূহল ও উদ্‌বেগের মধ্যে এতক্ষণ সকলে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন সকলেই তার দিকে তাকানোয়, সে সংকুচিত হয়ে পড়ে।—এক কাসেম ছাড়া আর সকলেই তাকে অপরাধী মনে করছে। তার গাঁয়ের আসগর আলী পত্তনিদারই নিশ্চয় চেষ্টা করে তার গাঁ'কে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে !—

খবরটায় তার আনন্দ হয়েছে এইটুকু তার অপরাধ। তবুও সে বোঝে যে সে এখানে অবাঞ্ছিত। সে কাসেমকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে যায়। দূরে তাদের গাড়ীর কাছে গিয়ে অছিমদ্দী একগাল হেসে বলে, 'বাপকা বেটা আসগর আলী পত্তনিদার ; কথা রেখেছে। চল্, তাড়াতাড়ি ধান বেচে—যা দাম পাওয়া যায়। গাঁয়ে গিয়ে পত্তনিদারের সঙ্গে দেখা করে শোক্‌রিয়া জানাতে হবে।'

কাসেম বলে, 'এখনই ফিরে চল ; ভয় করে হাটে আজ এদের মধ্যে।'

'ধান না বেচলে ওষুধ কিনবি কি দিয়ে ? একবার খরচ করে দু'জেলার চাল ধরার পুলিশদের মণ পিছু দুটাকা করে দিয়েছিস। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলে আবার ঐ খরচ করতে হবে। এদিকে রোজগারের নামে খোঁজ নেই। এখানে হাজীসাহেব হাটের ইজারাদার। ভয়টা কিসের শুনি ? গোলমাল হলে লেঠেল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে না !'

কাসেম সাহসে ভর করে ইজারাদারের কাছারিতে যায়—হাজার হোক মুসলমান তো ইজারাদার সাহেব ! আগে হ'লে কাসেমের এ সাহস হ'তো না, কিন্তু গত বছর বিহারের কাণ্ডের পর মুসলমান আর মুসলমানের কাছে যেতে ভয় পায় না। কাসেম দেখে যে সেখানে আরও অনেকে বসে রয়েছে। সকলেই ইজারাদারকে শাসাচ্ছে। ইজারাদার সাহেব সকলকে শান্ত করেন।

দূরের লোকদের তখনই বাড়ী ফিরতে বলেন। 'চারিদিকে হিন্দু বস্তি। সকলে খুব সাবধানে থাকবে। রাতে পালা করে জাগবে। কিষাণগঞ্জ সাবডিভিসন হিন্দুস্থানে গেলেই হ'লো! এর আমি বিহিত করছি। খবর এখনও সঠিক পাওয়া যায়নি। ঐ মুনীমটার কথায় বিশ্বাস কি?'

কাসেম আর অছিমদ্দীর মনে শেষের কথাটা ছাঁৎ করে লাগে। দুজনেই একসঙ্গে কথাটার প্রতিবাদ করে ওঠে। উপস্থিত সকলে কটমট করে তাদের দিকে তাকায়। তা'রা তাড়াতাড়ি ইজারাদার সাহেবকে তাদের ধানটা কিনে নিতে বলে—যে কোন দামে হোক। নিজের 'মক্তবে'র লোকের জন্য ইজারাদার সাহেব দরকার না থাকলেও তাদের ধানটা কিনে নিতে কর্মচারীকে আদেশ দেন। 'দরটা ঠিক করে নিও, মাসুম, বুঝলে।' মাসুম পুরোনো কর্মচারী—সে মনিবের ইঙ্গিত ঠিক বোঝে।

ইজারাদার সাহেব সকলকে বোঝান। 'আরে মিয়া, লাটসাহেবের কথাও বদলায়—ঠেলায় ফেলতে পারলে। আমি আজ রাতেই যাচ্ছি সদরে। পাঁচশ টাকা চাঁদা নিয়ে গেল জেলা পাকিস্তান কনফারেন্স—সদর সাহেব কত রকমের কথা বললেন, আর চলে গেলেই হলো এ জেলা হিন্দুস্থানে! কেবল কতগুলো টাকা অনর্থক খরচ হবে এই যা।'

হাট আর আজ জমলো না। লোকের মুখে মুখে মুনীমজীর খবর হাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাওজীর দোকান লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যায়। সকলেই মুনীমজীর নিজের মুখ থেকে খবর শুনতে চায়। নানা প্রশ্নে সকলে তাঁকে উদ্ব্যস্ত করে তোলে। দিনাজপুর আর মালদার হিন্দু হাটুরেরা দলবেঁধে আসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মুনীমজী বাইরের অন্য লোকদের সরিয়ে দিতে বলেন সাওজীকে—কি জানি কোন মুসলমান যদি থেকে যায় ভিড়ের মধ্যে। মালদা, দিনাজপুরের হিন্দুদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ একান্তে কথাবার্তা বলেন। এই বিপত্তির সময় মুনীমজীর স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতিতে তারা মনে বল পায়। ওদেশে থাকা আর নিরাপদ নয়; আত্মীয়-পরিজনদের বাড়ি থেকে সরাতে হবে। তারা আর অপেক্ষা না করে হাট ভালভাবে বসবার আগেই ফিরে যেতে চায়। আদ্রস্বরে মুনীমজী তাদের বলেন যে, তাদের এক মুহূর্ত দেরী করা উচিত নয়। তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাদের সব চাল কিনে নেন—ষোল টাকা দরে। গত হাটে চালের দাম ছিল উনিশ, কাল সুধানীর বাজারে ছিল বাইশ।

খানিক পরে ইজারাদার সাহেবের সেপাই খবর দেয় যে, তিনি মুনীমজীকে ডেকেছেন। তিনি যেতেই তাঁকে এক আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান ইজারাদার সাহেব। বেতারের খবর সম্বন্ধে কথাবার্তা হওয়ার পর ইজারাদার সাহেব বলেন 'আমার এ হাট এবার গেল। যাক, সে তো বরাতে যা আছে হবেই। এসব তো এখনো অনেককাল চলবে, এখন কাজের কথা হোক। আজ ক' বোরা চিনি এনেছো?'

'এনেছি চার বোরা। এক বোরা সাওজীকে দিতে হবে। তোমার তিন বোরা। এবার কিন্তু সত্তর টাকা মণ।'

'তাজ্জব কথা! এতদিন ছিল ষাট টাকা, আজ হঠাৎ দাম বাড়ালে চলবে কেন? আর সাওজীকে আধবস্তা দাও—আমাকে সাড়ে তিন বস্তা। গতবারে যে চিনি দিয়েছিলে, তা ছিল একেবারে ভিজে।'

'সাওজীর তো মোটে এক বস্তা—তার মধ্যেও তোমার পাকিস্তানের দাবি। সে হয় না ; ওকে এক বস্তা পুরো দিতেই হবে ; কথার খেলাপ যেতে পারে না। আর চিনি ভিজবে কি করে? ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আনা। হ্যাঁ, আর দুটো করে পাটের বস্তা যে বিনা পয়সায় পাচ্ছ, তার দাম কি আমি ঘর থেকে দেবো নাকি? বললেই হলো, ভিজে! তার উপর মালদা আর দিনাজপুর এখন তো পাকিস্তান হ'লো। সেখানে এখন তো খুব ক'দিন মোফিল চলবে। ঈদের জন্য চিনিও লোকে এখন থেকেই যোগাড় করবে ; আড়াই টাকা সের অনায়াসে তুমি পাবে।' মুনীম সাহেবের কথার বন্যায় ইজারাদার সাহেবের যুক্তিস্রোত ঘুলিয়ে যায় ; থই না পেয়ে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। 'কি যে বলো মুনীমজী ; মুসলমানের হাতে পয়সা কোথায়?'

'আচ্ছা যাও, দু' টাকা কম দিও। হ্যাঁ, তবে আর একটা কাজ করতে হবে ইজারাদার সাহেব, আমাকে খানকয়েক গরুর গাড়ী ঠিক করে দিতে হবে। সুধানীর গোলায় চাল নিয়ে যাবে। এখানে অত রাখবার জায়গা নেই। বর্ষার দিন, বাইরে পড়ে রয়েছে। তোমার হাতে আছে অনেক গাড়োয়ান।'

'আচ্ছা সে হয়ে যাবে সব ঠিক। ভোর রাত্রে গেলেই হবে তো?'

মাসুম এসে খবর দেয় যে, হাটের লোকরা ক্ষেপে গিয়েছে। তারা দল বেঁধে কাছারীবাড়ীর মাঠে ঢুকছে। তারা মুনীমজীকে ফেরত চায়—আপনি নাকি তাঁকে আর জিন্দা ফিরতে দেবেন না।

বাইরে তুমুল কোলাহল শোনা যায়।

'লোকগুলো পাগল হলো নাকি!'—ভয়ে ইজারাদার সাহেবের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

দু'জনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাজারের স্থায়ী দোকানদাররা ইজারাদার সাহেবকে দেখে, হাটুরেদের সম্মুখে আগিয়ে দেয়, হাজার হোক তাদের জমিদার তো। মুনীম সাহেব এসে ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করেন। স্বর নামিয়ে সম্মুখের লোকদের বলেন, 'ওর সাধ্যি কি আমাকে কিছু করার। তোমরা এখনও বাড়ি ফেরনি? আজকালকার দিনে বাড়ি-ঘর ছেড়ে যত কম থাকা যায় ততই ভাল। তোমরা তো সব বোঝই। আমি আর কি সলা দেবো! নিজের নিজের গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা ভাল হয় ক'রো।—মেয়েছেলেদের নিয়েই বিপদ। একটু হুঁসিয়ার থাকবে। আমরা তো সুধানী বাজারেও জানানাদের রাখতে সাহস পাইনি—সব রাজপুতানায় রেখে এসেছি এই মাসে। যন্ত্রপাতির কর্ম, বলা তো যায় না, কি বলতে কি বলে। শালা লাটসাহেবের মুখ ফসকে পূর্ণিয়াটা বেরুলেই তো সব চৌপট হয়েছিল—সাবধানের মার নেই।'

রাজবংশীদের সরু সরু চোখগুলি ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'পোলিয়া' মেয়েরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে।

'আর এখন নুন কিনতে হবে না'? 'ওরে বাচ্চিদাই, কোন দিকে গেলি, শীগ্‌গীর আয় না', 'ওঠ নবাব পুত্তুর, এখনও জাবর কাটছে!' 'আজ দাম চাই না, খালি তুমি ওজন করে নিয়ে রাখো'—'এই টাকাটা মুনীমজী আমানত রাখবেন গোলায়, কাছে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না'—

আতঙ্কমুখর পরিবেশ সুস্থ মনকেও দুর্বল করে তোলে। অল্পক্ষণের

অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার পরই হাট নীরব হয়ে আসে।

পরের দিন থেকেই আরুয়াখোয়ার রূপ যায় বদলে। আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসতো—এখন অহোরাত্র ভয়ার্ত নরনারীর নিরানন্দ মেলা। গাড়ীর পর গাড়ী আসছে পুল পার হয়ে শ্রীপুরের দিক থেকে। হেঁটে চলে আসছে দলে দলে মেয়ে, ছেলে, গরু, ছাগল। ছোট ছেলেটির মাথায় পর্যন্ত হাঁড়িকুড়ির বোঝা চাপানো। ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে হাড়-জিরজিরে কালাজ্বরের রুগী, একটা বিড়াল কোলে নিয়ে। কাশতে কাশতে চলেছে হেঁপো বুড়ী—পাকিস্তান থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণটা বেরোয় বুঝি! এতদিন ছোট্টো ছিল এদের জগৎ। আজ হাটে বিশ্রাম করে কতক যাবে এগিয়ে, শিকারের খেদানো হরিণের মত, অনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। কতক যাবে থেকে; যদি ক্ষেতের কাজ পায়, এই আশায়। পথে খাওয়ার অভাব কি—এখন তাল পাকার সময়।

পূর্ণিয়া আর দিনাজপুর দুটো ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের মধ্যে কোনটাই 'নাগরে'র উপরে পুলের জন্য খরচের দায়িত্ব স্বীকার করে না। নড়বড়ে পুলটার উপর খুব ধকল চলেছে আজ ক'দিন থেকে। পুলের দু'দিকে ক্যাম্প পড়েছে। মুনীমজী কলকাতার এক রিলিফ সোসাইটিকে বলে-ক'য়ে শরণার্থীদের সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য আরুয়াখোয়ায় একটি ক্যাম্প খুলিয়েছেন। লোকাল বোর্ডে খবর দিয়ে ডাক্তার আনিয়েছেন। সব কাজ হ'চ্ছে মুনীমজীর সহযোগিতায়।

কতলোক মুনীম সাহেবের ক্যাম্পে সুখ-দুঃখের কথা বলতে আসে। তিনি কাউকে আশ্বাস দেন, কাউকে রামজীর শরণ নিতে অনুরোধ করেন, কাউকে ধৈর্য ধরতে বলেন; কারও কাছে বা কংগ্রেস সরকারের দুর্বলনীতির নিন্দা করেন। তারপর রিলিফ কমিটির চিঁড়ে-দইয়ের স্লিপ কাটতে কাটতে বলেন 'ক'জন? পাঁচ; এক বাচ্চা? আচ্ছা ঐ ঝাণ্ডাওয়ালা তাঁবুতে মোহর করিয়ে সাওজীর দোকানে নিয়ে যাও। সব ঠিক হয় যাবে।' কৃতজ্ঞতায় শরণার্থীর মন ভরে ওঠে—এই বিপদের সময় মিষ্টি কথাই বা ক'জন লোক বলে!

পুলের ওপারে রেলিঙের উপর লাগানো হ'য়েছে সবুজের উপর চাঁদতারা দেওয়া লীগের ঝাণ্ডা; পুলের এদিকে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসী তিনরঙা পতাকা। ওদিকে একদল চীৎকার করে, 'লে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান,' 'বাঁটগেয়া হ্যায় হিন্দুস্তান'; এদিকের দল চ্যাঁচায়, 'বন্দে মাতরম্,' 'জয়হিন্দ্'।

তিক্ত উত্তেজনাময় আবহাওয়া সৃষ্টি হতে দেরী লাগে না। এই বুঝি কোন কাণ্ড হয়, হয়! এদিকে গুজব ওঠে যে ওরা পুলে আগুন লাগিয়ে দেবে—যাতে জিনিসপত্র নিয়ে ওদিক থেকে আর কেউ না আসতে পারে। অমনি এদিককার লোক গর্জে ওঠে, 'এদিকের গরু মোষ আর যেতে দেবো? আমরাই আগে পুলে আগুন ধরাবো।' এপারের লোকদের মুনীমজী ঠাণ্ডা করে; ওপারের লোকদের করে ইজারাদার সাহেব—পুল গেলে হাট থাকবে কোথায়—

মুনীমজী তাদের বোঝায়, দুদিন সবুর করতো। দেখোনা কি হয়। মহাত্মাজী কি আর চুপ করে বসে আছেন? লাটসাহেবকে দিয়ে 'কমিশন' বসিয়েছেন। হেঁজিপেঁজি লাট নয়, খানদানী লোক, রাজার বাড়ির ছেলে।'

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে যাও সকলের মুখেই ঐ একই কথা, 'কমিশন,' 'কমিশন'।

শ্রীপুরের চুন্নালাল রাজবংশীর বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি আছে। মুনীমজী সব

খবর বলেনা না কি ; তাই তাকে সকলে চালের গাড়ীর উপর বসিয়ে সুধানী ইস্টিশনে পাঠায় 'কমিশনে'র খবর আনতে। চুন্নালাল ভয় পাবার ছেলে নয় ; সে সোজা পয়েণ্টসম্যান সাহেবকে 'কমিশনে'র খবর জিজ্ঞাসা করে। পয়েণ্টসম্যান বলেছিল যে কমিশনের খবর তো বেরিয়েছে। তাদের মাইনে আর ভাতা বাড়বে ! শ্রীপুরের লোকেরা এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেনি।

কমিশন ! ইজারাদার সাহেবের পুরোনো সেপাই ইসরাইল লাঠি ঠুকে বলে 'কমিশন নেওয়া হয় গোড়াতে, পাট খরিদের উপর 'ধর্মদায়' ব'লে। কোন মুসলমান আজ থেকে আর এ দিচ্ছে না। বের করাচ্ছি কমিশন। আরুয়াখোয়া হাটিয়া হিন্দুস্তানে এলেই হলো !

দর্পণ সিং-এর বুড়ো বাবা শুকনো উরুতে তাল ঠুকে বলে 'এই হাটের তোলা মুসলমান ইজারাদারকে কোন লোক দিও না। ঘর দোর জমি জিরেৎ ছেড়ে হিন্দুস্তানে এসেছি কি এমনি। সেখানে হিন্দুকে মেয়ে-বেটী নিয়ে থাকতে দেবে না শুনেছি। এখানেও আবার মুসলমানকে তোলা দিতে হবে ?' —সে আরও কত কি বলতে যাচ্ছিল, দর্পণের মা তার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে যায়—বদলোকদের চটিয়ে লাভ কি ?

হাটের তোলা দেওয়া সেইদিন থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

মুনীমজী সাওজীকে বলে, 'দেখছো, ইজারাদার সাহেব আর রাতে এ পারে থাকে না। ওদিককার ক্যাম্পের খরচ কি ওই চালাচ্ছে নাকি ?'

'না, চাঁদা তুলে চালাচ্ছে ইজারাদার সাহেব। গোপালপুর থানাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কলকাতায় কমিশনকে টাকা খাওয়াতে হবে বলে, ও আরও অনেক টাকা চাঁদা তুলছে।'

মুনীমজীর চোখ দু'টি জ্বল জ্বল করে ওঠে ; ইজারাদার সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় না ঈর্ষায়, ঠিক বোঝা যায় না।

সাওজী আবার বলে 'তা মুনীমজী, আমরাও হাট থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে দিতে পারি, গোপালপুর থানাকে পাকিস্তান থেকে বাঁচানোর জন্য। ইজারাদার ভারি ফন্দিবাজ লোক—কমিশনকে আবার ট্যকা দিয়ে হাত না করে নেয়। আপনি একটু চেষ্টা করলেই আমাদের প্রাণটা বাঁচে পূর্ণিয়া জেলাটাও বাঁচে।'

মুনীমজী এই হিসাবই এতক্ষণ মনে মনে খতিয়ে দেখছিলেন। তাঁর হিসাবে ভুল হয় না। এখন চাঁদা তুলে যা লাভের সম্ভাবনা, তার অনুপাতে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশী। এক করলে হয় একটি জিনিস—চাঁদা তুলে চুপচাপ থাকো, যদি পাকিস্তানে যায় জায়গাটা তা'হলে টাকা ফেরৎ দেওয়া যাবে, বলা যাবে যে হাকিমদের ঘুষ খাওয়ানো গেল না ; আর যদি পাকিস্তানে না যায়, তা হ'লে টাকাটা নিয়ে বললেই হবে যে কমিশনকে খাইয়েছিলাম।—না, দরকার কি ঝঞ্ঝাটে। যা রয় সয় তাই ভাল।—

'না না সাওজী, ওসব হাঙ্গামায় আমি পড়তে চাই না। ওর জন্য কংগ্রেস সরকার রয়েছে, মহাত্মাজী রয়েছেন, আমার মালিক রয়েছেন। কিন্তু পুলের দুদিকেই যে মাল আটকাচ্ছে, তার কি উপায় করা যায় বল। বর্ষার নদী। অন্য সময় হলেও না হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করা যেত।

'দুদিককার ধান চালের পুলিশও দেখছি, আজ কদিন থেকে যুধিষ্ঠিরের

বাচ্চা হয়ে উঠেছে। আজ দেড়শো টাকার লোভ ছেড়েচে—দেড়শো মোষ যাচ্ছিল মজঃফরপুর থেকে মৈমনসিং। ওপারের চালের অফিসারও ক'দিন থেকে টাকা নিচ্ছে না, এ হাটতো উঠে যাবে দেখছি। সাধে কি আর ইজারাদার হাটে থাকার অভ্যাস কাটাচ্ছে।'

'হাকিম-টাকিম আসতে পারে, এই ভয়ে নিচ্ছে না বোধ হয়। দু'চার দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়ো না। এত ভাবনা কিসের? রিলিফের কাজ তো তোমার দোকান থেকে চলছেই। এত এখন ভাববার দরকার কি তোমার? কারবারী লোক আমরা, কোন রকমে দু'পয়সা রোজগার করবই।'

সাওজী এ কথায় সায় দেয় বটে, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় যে সে বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না—রিলিফের জিনিসের লাভের থেকে টাকার চার আনা দিতে হবে, মুন্সীজীকে—কত আর থাকবে।—

'এক মানুষ হয়েছিলো পাটের গাছগুলো,' 'গোয়ারগোবিন্দ জামাই এলো না, মেয়েটার কপালে অনেক খোয়ার আছে,' 'ওলাউঠায় গাঁ যখন উজাড় হ'য়ে গিয়েছিল তখনও গাঁ ছাড়িনি—নিত্যনূতন স্বরে, নূতন ভাষায় শোনা যায়,—একই দুঃখগীতির পুনরাবৃত্তি।

দর্পণ সিং বাবাকে সান্ত্বনা দেয়, যাক, মেয়েদের ইজ্জৎ বেঁচেছে। বৃদ্ধ কেঁদে ফেলে, 'আমার চাকর এরফান আমার ষাট বিঘা জমি পেয়ে যাবে। এই হ'লো ভগবানের বিচার!'

ইজারাদার সাহেব দিনের বেলায় কাছারি-ঘর থেকে দেখে তিনরঙা ঝাণ্ডাটি—হাওয়ায় উড়ছে আর ঐ সঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে নৈরাশ্য, বিদ্বেষ, আর আতঙ্কের বিষ—যার প্রতীক ঐ তিনটি রং—ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে ওপারের সবুজ পতাকার কাছের ক্যাম্পে চলে যাই। এতটুকুর মাত্র ব্যবধান; কিন্তু এরই মধ্যে কত পার্থক্য। একটি তার নিজের। এর নীচে আছে শান্তি, সুখ, অনাবিল আনন্দ, 'অর্ধ হিলালে'র ছায়ার তলের নিরাপত্তা।—কিন্তু এই রাজবংশীগুলোর ভয়ে, নিজের জমিদারি ছেড়ে পালালে আর কখনও ভবিষ্যতে এ হাট থেকে, এক পয়সাও তোলা উসুল করা যাবে? কমিশনের রায় কি হবে বলা যায় না—সবই খোদার মর্জি!—

দর্পণ সিং-এর স্ত্রীকে সাওজীর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'তোমরা তো পুলের ওপারে পাকিস্তান হওয়ার পর এতদিন ছিলে। হাওয়াতে কি রসুন ফোড়নের দুর্গন্ধ নাকি? লোকগুলো শাক ডাঁটা সে রাতে কাউকে খেতে দিয়েছিল? বজ্জাতি আরম্ভ করেছিল বুঝি?'

প্রশ্নের বাণে জর্জরিত হয়ে সে কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আপন মনে বকে চলে—'লকলকে কুমড়ো গাছটা থেকে প্রাণে ধরে একদিন একটা ডগা, ডাঁটা খাওয়ার জন্য কাটতে পারেনি! সেটাকে দিয়ে এলাম গোড়া থেকে কেটে বঁটি দিয়ে। বলদ জোড়াও ভয় পেয়েছিল না কি, কুমড়োর ডগা এগিয়ে দিতে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল।—চ্যালাকাঠ দিয়ে আসবার সময়, উনুনটা ভেঙ্গে দিয়ে এলাম,—কি সুন্দর করে ঝকঝকে তকতকে উনুনটা তুলেছিলাম,—তাতে রাঁধবে কিনা এরফানের চাচা,—আর যে জিনিস রাঁধবার নয় সেই সব জিনিস!—বিপদ হ'য়েছে ঠাকুরের মূর্তিটিকে নিয়ে। ঐ জন্যই ছিল ভয়। ঠাকুরের অসীম কৃপা।—আমরা বোকা মুর্খ মানুষ, তাই তাঁর ভাবনা

অভাবে মরি। দেখি আবার পুরুত মশাই ও সম্বন্ধে কি বিধান দেন। এখানে ছত্রিশ জাতের মধ্যে ভাল করে যে দুটো ভোগ দেবো সে উপায়ও রাখলে না ঠাকুর,—'

দর্পণের স্ত্রী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করবার জন্য হাত তুলতে গিয়ে বোঝে যে দু'জনেরই অজ্ঞাতে কখন সাওজীর স্ত্রী তার বেনে-সুলভ হিসাবনিকাশের মন ভুলে গিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে। দরদী হাতের স্পর্শ ছাড়িয়ে ঠাকুরকে যুক্তকরে প্রণাম করতেও মন চায় না।—মাত্র তিন দিনের পরিচয়—কোন দূর দেশ সেই বালিয়া—সেখানকার বেনে-বৌ;—তার বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে দর্পণের স্ত্রী নিজের মনের গুরুভার লাঘব করার চেষ্টা করে।—

দুরদৃষ্টের আকস্মিকতা লোকদের এ কয়দিন অভিভূত করে ফেলেছিল। দিন কয়েকের মধ্যে বিপদ গা সওয়া হ'য়ে যায়, আতঙ্কের তীক্ষ্ণ অনুভূতি আসে ভোঁতা হয়ে। গরুর গাড়ীর ভাড়া আর খাবারের দাম যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল, আবার কমে আসে। চালের পুলিশদের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ায় তিন দিনের ব্যতিক সেরে যায়। গাড়ী গাড়ী চাল পুল পার হ'য়ে আসতে আরম্ভ করে, হাজারে হাজারে গরু মোষ ওপারে যায়।

সব কাজের মধ্যেও লোক কমিশনের খবরের জন্য ব্যস্ত। মুনীমজী প্রথম হিঁড়কেই যত চাল কিনেছেন, সব পাঠাচ্ছেন সুধানীতে; প্রত্যহ অজস্র গাড়ীতে বোঝাই করে। মুনীমজীর কথা স্বতন্ত্র, তাই তাঁর ভাড়া কম লাগে। লোক তাঁর কাছে এত কৃতজ্ঞ যে তিনি যদি বিনা পয়সায়ও গাড়ী নিয়ে যেতে বলেন,—তাহ'লেও গাড়োয়ানরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করতো হয়তো।—

'কিন্তু মুনীমজী সাচ্চা আদমী;—হিঁদুর ছেলে, আর এদিককার মছলী খাওয়া হিঁদু নয়। রাজপুতানা, বীরের দেশ,—রাজা আর শেঠের দেশ,—তারা মুসলমানদের কাছে একদিনের জন্যও মাথা নীচু করে নি। তিনি মাগনা তোমাদের গাড়ী নেবেন না; বেগার গাড়ী নিতে পারে মুসলমান ইজারাদার। মুনীমজী ওয়াজিব ভাড়া দেবেন তোমাদের।'

'সে কথা আর বলতে হবে না সাওজী। কমিশনের খবর কবে বেরোবে?'

'কে জানে। শুনছিতো দু এক দিনের মধ্যে। মুনীমজী বলছিল যে মুসলমানরা আবার এতেও বখেরা লাগিয়েছে।'

'সাওজী, মুনীম সাহেবের চিঠি আজ আমার হাতে দিও।'

'তুই তো পরশু নিয়েছিলি শুকদেব। আজ আমাকে দিও।'

'আমাকে' 'আমাকে'—কমিশনের খবরের জন্য মুনীম সাহেব প্রত্যহ সুধানী গোলাতে যে চিঠি দেন, সব চালের গাড়ীর গাড়োয়ানই, তা নিয়ে যাবার সৌভাগ্য পেতে চায়।

সিরিলাল সাওজীকে জিজ্ঞাসা করে, 'সুধানী গোলায় যে লাটসাহেবের খবর দেওয়ার কল আছে, তাতে যত খবর আসে সব কি দোকানের লম্বা খাতায় লেখা হয় না কি? সেদিন মুনীমজীর চিঠি গোলায় দেওয়ার পর সেটা তারা খাতায় লিখে নিল; আর খাতা থেকে দেখে দেখেই জবাবের চিঠি দিল।'

'হবে!' ওসব বড় বড় গোলার কাণ্ডকারখানা। আমরা আদার ব্যাপারী—ওসব খোঁজও রাখি না। রামজীর কৃপায় আর তোমাদের সেবা করে বালবাচ্চাকে দুটো খেতে দিই। মিশ্রিলাল আজ চিঠি নিয়ে যাবে। আর সিরিলাল, কাল মুনীমজী নিজেই যাবে সুধানীতে। তোর গাড়ীতে একটা টপর দিয়ে নিতে

পারবি না? আচ্ছা, আমি যোগাড় করে দেবো। ইজারাদার সাহেবতো তার উপর দেওয়া গাড়ী মুনীম সাহেবকে দিতে পারলে বর্তে যায়। কিন্তু মুনীমজী সে বান্দাই নয়। ও মরদ কা বেটা। ইজারাদারের কাছ থেকে এক কানাকড়ির উপকার নিতেও রাজী নয়। কাল চাই একজন বিশ্বাসী গাড়োয়ান। লোকের আমানতী টাকা চাল কেনার পরেও কিছু বেঁচেছে মুনীমজীর কাছে। সেই সব পাবলিকের টাকা গোলায় রাখতে হবে। চোর-ছ্যাঁচড় ভরা হাটের মধ্যে কি অত টাকা রাখা যায়? গোলা থেকে পরে, গোলমাল মিটলে এই পুরো টাকা ফেরৎ দেবে সকলকে; এক পয়সাও কেটে নেবে না। তেমন চোর গোলাই নয়; ডোকানিয়াজীর গোলা লাটসাহেব পর্যন্ত জানে।'

'মুনীমজী!' 'মুনীমজী!' যেখানে যাও কেবল মুনীমজীর গল্প।

তাঁর স্নানাহারের পর্যন্ত সময় নেই। দিন-রাত কাজ করছেন, কি করলে শরণার্থীদের একটু সুখ-সুবিধা হয় কেবল তারই চেষ্টা!

দর্পণ সিং-এর বাবাকে তিনি আগাম টাকা দেবেন বলেছেন। বুড়ো চেয়েছিল এরফানকে ঠাণ্ডা করতে সে কিনা রাজবংশীর মেয়েকে বিয়ে করবে বলে। সব বিপদ তুচ্ছ করেও মুনীম সাহেব এরফানকে সায়েস্তা করবার জন্য, দর্পণের ষাট বিঘা জমি কিনে নেবেন কথা দিয়েছেন। আর গোলার জোতের অধীনে পনের বিঘা বন্দোবস্ত দেবেন বলেছেন দর্পণকে—অবিশ্যি কমিশনের রায়ের পর।

মুনীম সাহেবের কর্মক্ষমতায় বিহার বাংলা দুই দিককার সরকারী কর্মচারীরাই সন্তুষ্ট, কলকাতার রিলিফ সোসাইটি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ; হিন্দুরা সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, মুসলমানরা তাঁর উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ নয়।

'পনেরই আগষ্ট, হিন্দুস্থান আজাদ হবে'—মুনীমজী সব দোকানদারকে খবর দেন।

'আর পাকিস্তান?'

'হ্যাঁ, পাকিস্তানকেও আজাদী দিতে হবে ঐ দিন।'

সমবেত শত শত লোক প্রশ্ন করতে চায়—'ওটা কি আর কিছুতেই আটকানো যায় না?' যেন এই নীরব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে বাধ্য হয়ে মুনীমজী জবাব দেন, 'এই নিয়েই যদি খুসী হ'স তো নে।' মুসলমানদের প্রতি একটা দমকা উদারতার ঝাপটায়—'দিন কয়েক পরেই ঠেলা বুঝবি'—কথা কয়টা জিভে আটকে যায়।

দিনাজপুর আর মালদার শরণার্থীদের ভীতিবিহ্বল মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া ঘনিয়ে আসে। এক সঙ্গে সকলেই প্রশ্ন করে—'কমিশন' 'আর কমিশনের রায়?'

'ও বেরোবে দিন কয়েক পর। তবে পূর্ণিয়া জেলা, মানে এই আরুয়াখোয়া পাকিস্তানে যাবে না একথা ঠিক হয়ে গিয়েছে।' পূর্ণিয়া জেলার লোকরা, বিশেষ করে আরুয়াখোয়া বাজারের দোকানদাররা চীৎকার করে ওঠে, 'গান্ধীজি কী জয়!' ছাতা, খড়ম, গামছা উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। যদু পানওয়ালা আনন্দে নাচতে নাচতে, তার সমস্ত পানের খিলি হরিরলুঠ দিয়ে দেয়।

মালদা, দিনাজপুরের অনেক লোক পূর্ণিয়া জেলায় মুনীমজীর কাছ থেকে জমি দেওয়ার কথাটা আবার তোলে।

পূর্ণিয়া জেলার এদিকটা ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের এলাকা। পড়তি জমি পড়ে আছে কোশের পর কোশ···অভাব পয়সার, অভাব চাষ করবার লোকের।

—এত সিকমীদার পাওয়া যাবে।—তার উপর প্রচুর সেলামী। অধিকাংশই জোত আর রায়তী জমি। ভাগ্য ভাল—না হ'লে আবার মিনিস্ট্রি জমিদার ওঠাচ্ছে, কি হ'ত বলা যায় না।—ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির ছবি মুনীমজীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সকলের অনুনয়ের কোন উত্তর না দিয়ে তিনি বুঝিয়ে চান—নেওয়া না নেওয়া তোমাদের ইচ্ছে, আমার ওতে কোন আগ্রহ নেই।

'তবে একটা কথা! জমি বিলি ব্যবস্থার কথা আসবে পরে। এখন যে এই সব শরণার্থীরা এত যে গরু-মোষ নিয়ে এসেছে, এ তো যেখানে সেখানে চিরকাল চরতে পারে না। গেরস্তরা তা চরতে দেবেই বা কেন? এদের চরবার জন্য আমি মাসিক হারে জমি ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি—সস্তায়; কিন্তু দেওয়া চাই নগদ।'

সকলেই একটা সমস্যার সুরাহা পেয়ে তাঁর চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। কার কাজ আগে হবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

এদিককার এই জয়ধ্বনি পুলের ওপারেও চাঞ্চল্য জাগায়। 'কী! কী ব্যাপার! নিশ্চয়ই কিছু ঘটে থাকবে। ঘাবড়াস্ না।'

টিনের চোঙটা হাতে নিয়ে এক্‌বাল চিৎকার করে 'নারে তকদীর।' অপর সকলে বলে 'আল্লাহো আকবর'—'মুর্দা না কি? জোরে বলতে পারিস না? ওপারের আওয়াজকে ডুবিয়ে দিতে হবে।'—হানিফ, এক্‌বাল, আরও কয়েকজন জয়ধ্বনির কারণ জানতে বেরোয়।—

'তোরা ততক্ষণ থামিস না যেন বুঝলি।'

'কে যায় গাড়িতে?'

'শ্রীপুরের দর্পণ সিং-এর জামাই আর মেয়ে।'

'সার্চ কর গাড়ি, পাকিস্তান থেকে আবার কিছু মাল নিয়ে যাচ্ছে না তো।'

সঙ্গে সঙ্গে এরফান এসে পড়ে।—কে, দিদিমণি? জামাইবাবু?—যেতে দাও গাড়ি। পালিয়ে যাচ্ছ কেন? আমরা থাকতে তোমাদের ভয় কী দিদিমণি? খোকাবাবু কত বড়টা হয়েছে দেখি। ভয় পাচ্ছে আমাকে দেখে। কিছু ভয় নেই দিদিমণি। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আবার এসো। তোমাকে তো জামাইবাবু, ভেবেছিলাম মরদ। তুমি আবার পালাও কেন?'

জামাইবাবু আমতা আমতা করে। এরফান খোকার হাতে একখানা কাগজের তৈরি লীগের ঝাণ্ডা দেয়—'কেমন সুন্দর দেখতে, না খোকাবাবু?'

তারপর সঙ্গে গিয়ে গাড়িখানা পুল পার করে দিয়ে আসে। বিদায় নেওয়ার আগে জামাইবাবুর সঙ্গে রসিকতা করে—'রাজা হেঁটে, আর পেরজা (প্রজা) গাড়িতে।'

খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিয়া জেলার যেসব মুসলমান এক্‌বালের সঙ্গে ছিল, তারা ইজারাদারের উপর চটে আগুন হয়ে ওঠে।—ওটা চাঁদার টাকা নিশ্চয় খেয়েছে। আজকে ওটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে—এখন আরুয়াখোয়া কাছারিতেই আছে বোধ হয়। হিঁদুদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে, ওদের দিকে রায় করে দিল না তো? আজ রাত্রে এদিকে আসতে দে না।—

মুনীম সাহেবের খবরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় দুই পাড়ের লোকের মধ্যে। দর্পণ সিং-এর বুড়ো বাবাও জোর করে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে—শ্রীপুরে হিন্দুস্থানে আসবে এ দুরাশা যে কদিন জীইয়ে রাখা যায়।

তার পরই তো সম্মুখে পড়ে আছে দুঃখ-বেদনাময় জীবন—যার সূচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেই পুল পার হওয়ার দিন থেকেই। দীর্ঘ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির স্মৃতি, সব সেই দিন ওপারে রেখে এসেছে। এই বুড়ো বয়সে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করা কি সম্ভব? আর, এই দেশে? এতটা বয়স হল—'নাগর' নদীর পশ্চিমের দেশকে তারা জহুরের দেশ বলেই জেনে এসেছে। আজ একে সোনার হিন্দুস্থান বলে জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ করে নাচার অসংগতি বৃদ্ধের সংসারাভিজ্ঞ মনে খচখচ করে বেঁধে। কেন এমন হল তা সে ভেবে কূলকিনারা পায় না।

সেবার 'নাগর' যখন ঘর-দোর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তখনও মাচা বেঁধে বাঁধের রাস্তার উপর কতদিন কাটাতে হয়েছে; এপারে আসবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।—কিছুক্ষণ ভাববার পর যেই এরফানের কথা মনে পড়ে, অমনি ব্যর্থ আক্রোশের বেড়াজালে, সকল যুক্তিতর্কের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই উত্তেজনার মধ্যে মুনীমজী ছ'খানা গাড়ি বোঝাই করে কী সব জিনিস এনেছে, সে কথা সকলে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যায়।

মুনীমজীর হুকুম, আর পুলের এপার-ওপারের লোকের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি নয়। পনেরই দুই দিকেই প্রাণখোলা উৎসব করতে হবে, যা হওয়ার হয়েছে।

নিজে এগিয়ে ওপারের লোকের সঙ্গে মুনীমজী যেচে আলাপ করতে যান। এতদিন তিনি যেতেন পুলের মধ্যখানের 'নো ম্যানস্ ল্যান্ড' পর্যন্ত। এখন যান একেবারে ওপারের ক্যাম্পে। সকলে বলাবলি করে আলবৎ হিম্মৎদার লোক।

মুনীমজীর মধ্যস্থতায় দুদিককার লোকের মধ্যে প্যাক্ট হয়, কোনো দলই কারও সম্বন্ধে 'মুর্দাবাদ' বলতে পারবে না—'আর পাকিস্তানের নতুন ঝাণ্ডা পেয়েছ তোমরা? না না, এ নয়। এ তো পুরনো, লীগের ঝাণ্ডা। নতুন ফ্ল্যাগের খবর রাখো না বুঝি? দরকার থাকে তো আমাকে বলো যত লাগে। সবরকম দামের আছে।

এপারের লোকদেরও মুনীমজী হিন্দুস্থানের নতুন ঝাণ্ডার কথা এতদিনে বলেন।

'সে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'সে কি আর আমি ব্যবস্থা করিনি? সবরকম দামের পাবে।'

সাধে কি আর লোক 'মুনীমজী' করে অস্থির হয়! যখন যেখানে যে জিনিসটার দরকার, মুনীমজীর তা নখদর্পণে।

উৎসব লেগে গিয়েছে রিলিফ ক্যাম্পের কাছে। কলকাতায় বিলট গাড়োয়ানের ভাই কাজ করত পাটের কলে। সেখানে নাকি পনেরই আগস্ট খুব দাঙ্গা লাগবে, তাই সে বছর দশেকের ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বাপ বেটায় দুদিন থেকে রিলিফ সোসাইটির ক্যাম্পে কাজ করে। কলকাতা-ফেরত ছোকরা—অজ-পাড়াগাঁয়ের নিরীহ ছেলেদের উপর খুব মোড়লি করছে। ছেলেদের সে নতুন ভূত-ভূত খেলা শিখিয়েছে—অবিশ্যি, আসলে খেলাটা শিখিয়েছে রিলিফের বাবুরা।—একদল হয়েছে বেহ্মদাত্যি, একদল হয়েছে মামদো ভূত। একদিককার নাম বেলগাছের দিক, আর একটা কবরের দিক; মধ্যেখান দিয়ে একটা কাঞ্চির দাগের লাইন টানা। নোয়াখালিতে মরলে হবে বেহ্মদাত্যি, বিহারে মরলে হবে মামদো! কবরের দিকে নতুন কোনো খেলোয়াড় এলেই মামদোরা উল্লাসে নাকিসুরে চিৎকার করে 'বিহার থেকে

এসেছে রে' ; আর বেলগাছের দিকে কেউ এলেই সকলে জিজ্ঞাসা করে 'নোয়াখালি নাকি ?' জবাব দিতে হবে, 'না, চিৎপুর'—

ছেলেরা বিকৃত উচ্চারণে জায়গাগুলোর নাম নেয়। বড়রা সকলেই এই তামাসা দেখে, আর ছেলেদের এই কাণ্ড দেখে হেসে আকুল হয়।

মুনীমজী এসে সকলকে তাড়া দেয়, 'এ সব কী হচ্ছে ? আবার একটা গোলমাল পাকাবে নাকি ? পালাও সব ছোকরারা, ফের যদি আমি এই দেখি, তাহলে তোমাদের সব কটাকে পুলের থেকে 'নাগরে'র মধ্যে ফেলে দেব।'

তারপর রিলিফের বাবুদের বলেন, 'আপনাদের কাছ থেকে আর একটু দায়িত্বশীলতার আশা রেখেছিলাম।' তারা অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

দুদিনের মধ্যে সব ঝাণ্ডা চড়া দামে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। স্বজাতির লোকের ভয়ে ইজারাদার কোথায় যেন গিয়েছে—তার সেপাই বলে পাটনায়।

নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পুলের এপারে হিন্দুস্থানের পতাকা, ওপারে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা। আতর গোলাপের ছড়াছড়ির মধ্যে পুলটি কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়—খানিকটা পাকিস্তানে, খানিকটা হিন্দুস্থানে, খানিকটা শূন্যে—। উৎসবের মধ্যেও এই পুলটির কথাই দর্পন সিং-এর মনে হয়। সে-ও থাকে আনমোখোয়ায়, মন পড়ে থাকে শ্রীপুরের জমির উপর। এই পুলটিই তার দেহ ও মনের সংযোগের সূত্র। এরই জন্য সময়মতো এদিকে পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে ; ভগবান যদি সুদিন দেন তাহলে এই দিয়েই আবার নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে। না ভগবান কেন, কমিশন। কমিশন কি ভগবানের চাইতেও বড় ?—

দুই দিকের লোকের সম্মতি নিয়ে রিলিফের বাবুরা পুলের মধ্যেখানে ঝাণ্ডাভূতের খেলা দেখায়। ইংরাজের মড়াঝাণ্ডা জড়ানো ছেলের দল প্রথমে চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় মাতুমের গান গেয়ে। তারপর হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের নূতন জিন্দা ঝাণ্ডা নিয়ে দু'-দল ছেলে কোলাকুলি করে,—দর্পণ সিং-এর বাবার মন একটু যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

শরণার্থীর দল ছাড়া আর সকলে বোধ হয় যখন কমিশনের কথা ভুলেছে, তখন হঠাৎ মুনীমজী খবর দেন, 'কমিশনের রায় বেরিয়েছে।' সকলে মুনীম সাহেবের কাছে ছোটে।

'শ্রীপুর এসেছে হিন্দুস্থানে।'

দর্পণ সিং মুনীম সাহেবকে জড়িয়ে ধরে। তার মা কি বোঝে, হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে। তার বাবা ভগবানকে আর কমিশনকে প্রণাম করে।—কমিশন তাহলে তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।—

'হরিপুর থানা পড়েছে পাকিস্তানে।'

'আর মালদা ?'

'তোমাদের দিকটা এসেছে হিন্দুস্থানে, শুকদেব। আর কি, মেরে দিয়েছ।

কপালে তিলক কাটা পোড়াগোঁসাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। এসেই প্রথমে রসিকতা করেন, 'এই আসছি। গরুর গাড়ি থেকে নামবার সময় দেখি সিরি সাওয়ের দোকানের দেওয়ালে রং দিয়ে 'কাপস্টান' লেখা। ভয়ে বুক

শুকিয়ে গেল। ছ্যাঁৎ করে মনে হল লিখেছে পাকিস্তান,—উদুর উচ্চারণে উলটে। ভাবলাম তাহলে আরুয়াখোয়া নিশ্চয়ই গিয়েছে পাকিস্তানে। তারপর শুনলাম ওটা এক রকম সিগারেট। এখন আমার খবর বলুন মুনীমজী।'

মুনীমজী তার কথার জবাব ইচ্ছা করেই দেয় না। রাজবংশীরা তাদের গুরুদেবের উপর মুনীমজীর এই ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্যে আশ্চর্য হয়।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে কুসংবাদ জানাতেই হয়। 'জলপাইগুড়ি জেলার তিতলিয়া থানা চলে গিয়েছে পাকিস্তানে।'

'বললেই হল? চলে গেলেই হল আর কি।'

পরে তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে খাটিয়ার উপর বসে পড়েন।—ভগবান এ তুমি আমার কী করলে -শেষকালে মরলে কবরে যেতে হবে।—মন্দিরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এও কি আমার কপালে ছিল।—

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার স্বস্তি পায় অধিকাংশ শরণার্থীরা। আবার সেই পুরাতন দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। একদিনের মধ্যে শরণার্থীদের ক্যাম্প ভেঙে যায়। দূর দূর থেকে ফিরে আসে গাড়ি, মানুষ, গরু, মোষের মিছিল। গাড়িগুলির উপর তিনরঙা ঝাণ্ডা লাগানো। মিছিলের লোকদের মধ্যে কারও কারও হাতে হিন্দুস্থানের পতাকা, মুখে রাজ্য জয় করে ফিরবার দীপ্তি। বাঘের মুখ থেকে বাঁচবার আনন্দে মেয়েরা মশগুল।—

—দ্রুতগতিতে চলছে দুনিয়া। এতকাল যাঁরা সৃষ্টি সংসার চালিয়েছেন, তাঁরা এত দ্রুত তালের কল্পনাও করতে পারেননি। এত লোকের মন নিয়ে এমনভাবে ছিনিমিনি খেলতে সাহসও করেননি।—সেই কথাই ভাবছে এক্‌বাল পুলের উপর থেকে পাকিস্তান ঝাণ্ডাটা নামাবার সময়।—দরকার কি ছিল কদিনের এই রাজত্বের? খাবার দিয়ে কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল? দুশো বছর লেগে গেল ইংরেজের পতাকা সরাতে, আর তার ঝাণ্ডা সরাতে তিনদিনও সময় লাগল না! মানসিক দুঃখ বেদনা তো এতে আছেই; কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে যে এ অপমান রাখবার জায়গা নেই। পুলের উপর, পথের উপর শরণার্থীর সারি, ওপারে হাটসুদ্ধ লোক দেখছে।—মাথা কাটা যায় অপমানে, নদীতীরের বালির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে করে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কত উৎসাহের সঙ্গে এই ঝাণ্ডা সে তুলেছিল। 'তিনদিনের ভিস্তির বাদশাগিরি শেষ হল'—রামজী সাওয়ের এ টিপ্‌পনি তার প্রাণের মধ্যে গিয়ে বেঁধে। এইখানেই এখনই ওরা ওড়াবে হিন্দুস্থানের ঝাণ্ডা। কিন্তু 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে যে এই ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছিলাম সে কি এইজন্য? কালই হয়তো শ্রীপুরের ছেলেরা এই ঝাণ্ডা নিয়ে এই পুলের উপর মড়াঝাণ্ডার ভূতের খেলা করবে। কার উপর অভিমান করবে—দুনিয়া যখন তার পিছনে লেগেছে—

কোনো দিকে না তাকিয়ে এক্‌বাল ঝাণ্ডাটি নামিয়ে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যায়—উত্তরের দিকে—যেখানে এ ঝাণ্ডা এখনও মরেনি।

হানিফ নিজের নির্লিপ্ততা দেখানোর জন্য বিড়ি ধরিয়েছিল। সে খাওয়ার আগে আধ খাওয়া বিড়িটা পুলের ওপর ফেলে যায় আর ভাবে এটা দিয়ে পুলটায় আগুন লেগে গেলে বেশ হয়।—আরুয়াখোয়া আর শ্রীপুর আলাদা হয়ে যাবে

তাহলে।—সে জানে যে এ থেকে ঐ কাঠে আগুন লাগা সম্ভব নয়, তবু এটুকু ভেবেও আনন্দ পায়।

মুনীমসাহেব ওপারে ইজারাদার সাহেবের ক্যাম্প দখল করেন।

ছেলেরা পাটের ক্ষেত থেকে একটি পরিবারকে ধরে নিয়ে আসে,—কী মতলবে লুকিয়েছিল,—আগুন লাগাবে বলে মনে হয়—

'আরে অছিমদ্দী যে।'

অছিমদ্দী কেঁদে পড়ে।—'গাঁ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম হরিপুরের দিকে। মীরপুর হিন্দুস্থান হয়ে গিয়েছে পরশু থেকে। শুনেছি পুবদিকে মুখ করিয়ে নামাজ পড়াবে। মুরগী জবাই করতে দেবে না। তাই এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ভাবলাম দিনমানটা পাটের ক্ষেতে থেকে, সাঁঝ হতে চলতে শুরু করব'—সে কাঁদতে কাঁদতে মুনীম সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে।

'ছেড়ে দাও একে। এরা আমার চেনা লোক।'

'দয়ার শরীর হুজুরের।'

'মুনীম সাহেব কী জয়।' 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!'—জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।

মুনীমজী ওপারে সকল লোককে বলেন যে, 'সকলে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিয়ে দিও। আমি গভর্ণমেণ্টের কাছে জমা করে দেব। হিন্দুস্থানে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ রাখা বারণ।'

তাঁরই দেওয়া পাকিস্তান নিশানগুলি আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে।

তিনি মনে মনে ভাবেন—এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। পোড়া-গোঁসাইয়ের খালি বাড়িতে উঠবেন, তাঁর জমিটমিগুলো একবার দেখেও আসবেন, সেখানে বেচতে হবে এই পাকিস্তান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে যোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি। একই জিনিস দু' দুবার করে বেচবেন। তিনি হিসেব করেন সব মিলিয়ে তাঁর কত হল। 'কমিশন' অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু এই কমিশনের রায়ের, কমিশন বাবদ তাঁর প্রাপ্য তিনি পেয়ে গিয়েছেন। হিসেবে কোথাও ভুল হয়নি।—

ক্যাম্পের বাইরে থেকে ভেসে আসছে 'মুনীম সাহেব কী জয়!'—একটু সন্দেহ মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে—একটি খদ্দরের টুপি আগেই কিনে রাখলে, বোধ হয় আর একটু সুবিধে হত—হয়তো হিসেবে একটু সুবিধে হত—হয়তো হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। যাকগে, রামজী যাকে যা দেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।—

মুনীমজী কুঠিয়ালী ভাষায় পকেটবুকে হিসাব লিখতে বসেন।

## বন্যা

কুশীতে বান আসিয়াছে; একরকম নোটিস না দিয়াই। নেপালে কোন্ পর্বত-শিখরের বরফ গলিয়াছে, হিমালয়ের কোন্ অরণ্যময় উপত্যকায় বারিপাত হইয়াছে, তাহার খবর কুশীর তীরের লোকরা রাখে না। তাহারা খুঁজিতে আরম্ভ করে, কোন্ পাপে ভগবান তাহাদের ওই শাস্তি দিতেছেন।

রহিকপুরা গ্রামের নিয়মানুসারে মেয়েরা সকলেই শেষরাত্রেই ওঠে। তাহারা কেহই আঙিনার বাহিরে যাইতে পারে নাই ; কেহ কেহ আঙিনাতেও নামিতে পারে নাই।

তাহাদের চিৎকারে পুরুষেরা জাগে। কেহ লাঠি লইয়া ওঠে। কেহ বর্শা লইয়া আসে। সাপ বাঘ চোর, কত কী হইতে পারে। চোখের জড়তা ভাঙিবার পূর্বেই চন্দ্রগ্রহণের মতো, ঢাক, ঢোল শাঁক-ঘন্টা বাজিয়া ওঠে। দর্শন মড়র[1] চৌকিদারের মতো হাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে বিপদ-আপদের সময়, গাঁয়ের মোড়লদের প্রথমের মোহন্ত রাঘোদাসের আস্তানের সম্মুখের আখড়ায় বিরাট লোহার গদাটি ঘুরিয়া বসিবার কথা।

কেরোসিন তেলের অভাব। কোনো বাড়িতে আলো ছিল না। কেবল একটি দুইটি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে। মড়রের এতটা অভাব নাই। আখড়ায় পৌঁছানো শক্ত। রাস্তা দিয়া জলের স্রোত বহিতেছে। খুঁটিতে বাঁধা গরুগুলি চিৎকার করিতেছে।

মেয়েরা আঙিনায় বলে, 'ওমা, জল যে বারান্দায় উঠে আসছে।' চোখের উপর দেখিতেছে এই দাওয়ায় উঠিবার দ্বিতীয় সিঁড়ি ডুবিল। আরও এক আঙুল বাড়িয়াছে।

'মজা দেখছিস কী ! ঘুঁটে কখানা তোল্। কাঠগুলো উপরে ওঠা।'

ভুখির জালাগুলো কী করিয়া সরানো যায়। কাঁচা মাটির বিরাট বিরাট জালা। জল লাগিলেই গলিয়া যাইবে।

'ছাগলটি কোথায় ?'

'গে মাই ! তুলসী গাছটি যে এরই মধ্যে ডুবে গেল।

'রান্না ঘরের উনুন যে গেল ডুবে। উখলিটি[2] ভেসে চলল। কি হবে গো !'

'আঃ ! কী হল্লা করো। যত মেয়েছেলের কাণ্ড ! সরো। মাচা বাঁধতে দাও। তিন হাতের খুঁটি কাটবি। বেশি হলে ক্ষতি নেই—কম যেন না হয়।'

'কৌশিকীমাঈকি জয় !' মোহন্তজী প্রত্যহই প্রত্যুষে দুইবার এই জয়ধ্বনি করেন পূর্বাকাশের দিকে তাকাইয়া। খলিফা[3] আর গ্রামের জোয়ানেরা ল্যাঙোটা পরিয়া আখড়ায় আসিবার জন্য তৈরি হয়। আজ কাহারও উৎসাহ বা সময় নাই ; কিন্তু এই জয়ধ্বনি আজ নূতন ঝংকারে সকলের কানে বাজে। ক্রুদ্ধা কৌশিকী-মাতাকে শান্ত করিবার জন্য মোহন্তজী যেন মন্ত্র পড়িতেছেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলে এই সুরে সুর মিলায়।—'কে অস্বীকার করছে মা, তোমার ক্ষমতা। আমাদের উপর সদয় থেকো মা।'

কোনো বিশাল নৈসর্গিক বিপদের সময় ছাড়া রহিকপুরা গ্রামের সকলে একমত কখনও হয় নাই। একখানা ঢোল বাজিতেছে মোহন্তের আস্তানে। দুলহা মাঝির ছেলে সাঁওতালটোলায় একখানা কড়া বাজাইতেছে—ডুম্ ডুম্ ডুম্। মহরমের ঢোলের মতো ফৌজী তাল। জাগো, জাগো, কেবল তাতেই চলবে না ; সাজো সাজো ; আর এক মুহূর্তও দেরি করা নয়। চলে এসো ঘরে, মকাই ক্ষেতের মাচার উপর থেকে ; চলে এসো ঘরে, বাঁচদরিয়ার ভিঙির উপর থেকে। গরু মোষ শুয়োর ছাগল লইয়াই মুশকিল। জানের আগে মাল সামলাও।

১. মোড়ল ২. উদুখল ৩. পালোয়ান

একেবারে তছনছ কাণ্ড। এক মুহূর্তে এই জগৎটির উপর কী করিয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া গেল !

সবাই উঁচুতে থাকিতে চায়। আরও উঁচুতে উঠিতে চায়। উঁচুতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। আকাশে যদি শিকে ঝুলানো যাইত !

গ্রামে কাহারও নৌকা নাই। এইরূপ বান এদিকে নিয়মিত হয় না। তাই কেহই ইহার জন্য তৈরি নয়। সামুরতি তিয়রের কেবল একখানি ডিঙি আছে—ওপারের চর ও ভুখনাহা দিয়ারা হইতে গরুর খাইবার ঘাস আনিবার জন্য।

মুসহরটোলা গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে নিচু জায়গায়। মুসহরটোলার কুটিরগুলি প্রায় ডুবিল বলিয়া। তাহারা অন্য পাড়ায় এক এক করিয়া আসিয়া জোটে। মাচা তৈরি করা সেখানে বৃথা। একটি ছাগল স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল। ধর্ ধর্ ! তাহাকে কোলপাঁজা করিয়া গেনুয়া মুসহর আগাইয়া আসে। তাহাদের জিনিসপত্রের মধ্যে হাঁড়িকুঁড়ি, উখলি সামাট্। কোন স্থানেই বা তাহারা এক নাগাড়ে বেশিদিন থাকে ? কোনো রকমে মাথা গুঁজিবার স্থান সেদিনটার মতো হইলেই হইল। কথায় বলে, 'এক কাঠা ভুট্টার দানায় মুসহর রাজা।'

কতক লোক উঠিয়াছে নৌখে ঝার উঁচু দাওয়ায় ; কতক সুমৃৎ তিয়রের বৈঠকে। গেনুয়া মুসহরের স্ত্রী চিৎকার করিয়া উঠে, তাহার পঙ্গু ছেলেটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গেনুয়া আবার এক কোমর জলে নামিয়া পড়ে ছেলে খুঁজিতে। বারান্দার অন্যান্য মুসহরেরা ভাবে, যাক ছাগলটা ভালয় ভালয় গেনুয়া আনিয়া পোঁছাইয়াছে।

একে একে দুইটি বাড়িই ভরিয়া গেল। তিল ধরানোর স্থান নাই। নৌখে ঝা আর সুমৃৎ তিয়রের পরিবারের মধ্যে রেষারেষি, ঝগড়া, ফৌজদারি নিত্য লাগিয়াই আছে। প্রথমে ছিল দুই জনের পিতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত, পরে হইয়া দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ ও তিয়র দুই জাতির মধ্যে কলহ।

বহু বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুমৃতের পিতা তাহার এক মৃগীরোগগ্রস্ত আধিয়াদারকে সামান্য প্রহার করিবার পর সে অজ্ঞান হইয়া যায়। তাহার মূর্ছাভঙ্গ হয় নাই। নৌখের বাবা থানায় খবর দিয়া নাকি আসামীকে ফাঁসি দেওয়াইবার চেষ্টা করে। দুই বৎসরের সাজা হয়। সেই সময় নৌখের বাবা যখনই সদরে যাইত, তখনই ভাঁড়ে করিয়া তাজা সরিষার তেল লইয়া আসিত। বলিত, 'জেলখানার তেল।' গ্রামের লোকের সম্মুখে তেল মাখিবার পূর্বে, তিনবার অশ্বত্থামার নাম লইয়া শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিত আর বলিত, 'বড় বাড় বেড়েছিল ; তাই একটু একটু করে তেল বের করছি।'

সেই হইতে আরম্ভ ; এখনও চলিতেছে। এখনও দুই পরিবারের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলে না। সুমৃৎকে দেখিলে নৌখে ঝা শব্দ করিয়া থুতু ফেলিয়া অন্য পথে চলিয়া যায়। সুমৃৎ দাঁত কড় কড় করিয়া নিকটস্থ মহিষের পিঠে জোরে লাঠি দিয়া মারে—'শালা পথ জুড়ে বসে আছে।'

কুশীর দুইকূলভাঙা প্লাবনের মুখেও মাতব্বরদের কর্তব্য তো করতেই হইবে। তাই নৌখে ঝা পুরুবটোলায় লোকেদের অবস্থা তদারক করিতে গিয়াছেন—কোনো কাজের শৃঙ্খলা যদি থাকে এই পাড়ার লোকেদের ! তুরিয়া বাঁতার এই সময়েও মোটা সুতায় বাঁধা বঁড়শির সহিত প্রকাণ্ড ছাল-ছাড়ানো সোনা ব্যাঙ গাঁথিতেছে। নৌখে ঝা জিজ্ঞাসা করে, 'কিরে তোরা জিনিসপত্র সামলেছিস?'

'আমার পুতহু[১] আছে সেয়ানা।' সে আর বেশি কথা খরচ না করিয়া সুতাটিকে একটি বাঁখারির সহিত বাঁধিতে থাকে।

পচ্ছিমটোলায় সুমুৎ তিয়র এক বুক জলে দাঁড়াইয়া চিৎকার করে— 'মাল গেলে মাল আবার হবে ; জান গেলে কিন্তু জান আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ওরে পাতরঙ্গী, তুই আবার চালের উপর উঠছিস কেন ? লাউ কটা পাড়বি ? এখন আর লোভ করিস না। ও কী। আবার পুঁটুলি ওঠাচ্ছিস যে চালের উপর। ছাগলটাকেও যে টেনে তুললি। মরবি, মরবি!'

পাতরঙ্গী জবাব দেয় না। শতছিন্ন শাড়িটি মাথার উপর একটু টানিয়া দিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসে। ভাদ্দরের রোদবৃষ্টির মধ্যে, কী করিয়া চালের উপর তাহার দিন কাটিবে, সে-কথা সে ভাবে না। তাহার বাড়ি ছাড়িয়া সে এক পাও নড়িবে না।

'যা, সব গরু মোষগুলো নিয়ে রেল-লাইনের উপর যা। রেল-লাইনটা উঁচু আছে, এখনও ডোবেনি।'

সকলে একে একে গ্রামের উঁচু স্থানগুলিতে আসিয়া জুটে। উচ্চবর্ণেরা উঠিয়াছে নৌখে ঝার বাড়িতে। নিম্নবর্ণেরা উঠিয়াছে সুমুৎ তিয়রের বাড়ি। মুসলমানরা উঠিয়াছে মসজিদের বারান্দায়। বহুকালের পুরানো পাথরের মসজিদ, আগে নদীর ওপারে ছিল। নদী সরিয়া যাওয়ায়, এখন এপারে হইয়া গিয়াছে।

প্রথম আলোড়নের পর পরিস্থিতি থিতাইয়া আসিয়াছে। প্রাণে সকলেই বাঁচিয়া গিয়াছে। এখন থাকিয়া গেল প্রাণধারণ করিবার প্রশ্ন। তিয়রের বাড়ির মেয়েরা, অন্য ভদ্রপরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য উঠানে ভাত রাঁধিতেছেন। এক প্রতিবেশিনী সাহায্য করিতেছে। আঙিনার আর-এক স্থানে দুইটি মুসহর স্ত্রীলোক ইট দিয়া তৈরি উনুন ধরাইতেছে। তাহারা আজ আবার ঘোমটা দিয়াছে। তিয়র-গিন্নী এক ঝুড়ি ভুট্টা আনিয়া সেখানে দিলেন। মুসহর মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, 'আমরাও বাড়িতে ভাত খাই। এখন ও চাল বাঁচাচ্ছে কার জন্যে বুঝি না। বাড়ির আঙিনায় যখন পেয়েছ, যত ইচ্ছে অপমান করে নাও। নিজেদের কথা হলে ভাবতামও না। ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খাই খাই ক'রে জ্বালাতন করে, আর ঐ বেচারারাই বা করবে কী ? পাশেই গেরস্তদের ছেলেদের ভাত খেতে দেখলে, তারা কি চুপ করে থাকতে পারে ?'

ধাঙর, মুসহর, বাঁতার, সকলেরই আলাদা আলাদা 'চৌকা' হইল। গেরস্ত-বাড়ির লোকেরা খাইতে বসিল বাড়ির আঙিনায় ; মুসহর, ধাঙর, বাঁতার, তাৎমারা বাহিরের বৈঠকখানায়।

বেশ একটা চড়াইভাতির মনোভাব। তাহার পর চলে একটানা কুশীর বান দেখা। কালো জল—গঙ্গার জলের মতো ঘোলাটে সাদা নয়। হুড়াহুড়ি করিয়া একসারি ঢেউ, আর এক সারিকে তাড়া করিয়াছে। তীব্রগতির তোড়ে একটি বিরাট গাছের গুঁড়ি উষ্ট্রারোহীর মতো সামনে পিছনে দুলিতে দুলিতে, চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গরু ভাসিয়া যাইতেছে—মরা না জ্যান্ত ? নামব নাকি—জয় কৌশিকীমাঈকী জয়। না, নামা বৃথা। ওটি বোধ হয় নীলগাই।

১. পুত্রবধূ

কুমীরে প্রকাণ্ড একটি মাছ ধরিয়াছে। জলের উপর হুটোপুটি করিতেছে। যাক মাছটি পলাইয়াছে। ওটি কিন্তু আর বাঁচিবে না—ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাপটায় নিশ্চয়ই ওটির হাড়টাড় ভাঙিয়া দিয়াছে।

বন্যার জলের উত্তাল কল্লোলধ্বনি সকলেরই কানে সহিয়া গিয়াছে। সূর্যের কিরণ ঢেউয়ের উপর পড়ায় সে দিকে তাকান যায় না। একটি চালা ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার উপর তিনজন লোক পরিত্রাহি চিৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে কি বলিতেছে বুঝা যায় না ; না বুঝা গেলেও আন্দাজ করা যায়। চালার চতুর্দিকে সর্পিল ঢেউয়ের রাশি আছাড় খাইয়া পড়িতেছে ; ফণা তুলিয়া সহস্রমুখ বাসুকি শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একরাশ সাদা আলোকময় বারিকণা চালাটিকে ভিজাইয়া দিল।

পিছনে একটি শবদেহ আসিতেছে তীব্র গতিতে। একটি কাক চোখ-মুখের উপর ঠুকরাইতেছে।

সমুৎ তিয়রের দাওয়ার নিচেও ঢেউ লাগিতেছে—ছলাৎ-ছল্ ছলাৎ-ছল্ মধুর মনোরম ছন্দে। এ আঘাতে প্রচণ্ডতা নাই, মাটির চাপ ভাঙিয়া ফেলিবার, অশথগাছ ভাসাইয়া লইবার উগ্র উদ্দণ্ডতা নাই। কৌশিকীমাঈ, অভয়হস্ত বুলাইয়া তিয়র-শিশুকে ঘুম পাড়াইতেছেন। ওপারে ভুখনাহা দিয়ারার দক্ষিণের পাহাড় অল্প অল্প দেখা যাইতেছে! এর মধ্যেও 'আধেঙ্গা' হাঁসের দল পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। এখানে বৌনী বাঁতারের আর মসজিদের বারান্দায় কুদরতি মিঞার শিকারের হাত একই সঙ্গে নিশপিশ করিয়া উঠে।

দিনের পর রাত আসে, আর রাতের পর দিন।

একগলা জল বহিয়া পশ্চিমের উঁচু ঘরের বারান্দা হইতে আধশুকনো মকাই লইয়া আসা হয়।

'দেবীস্থানের পশ্চিমের নিচু জমিটায় এবার সাড়ে তিন বিঘা অঘানী ধান লাগিয়েছিলাম। এই এক-এক হাত হইয়াছিল।'

'আমি তো বাঁতারটোলার পাশের দহের ধারের ধান, তৈরি ভাদই ধান, তুলতেই পারলাম না। সারাবছর বালবাচ্চারা কী যে খাবে।'

'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাওয়াবেন।' সকলেই শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলে ; কিন্তু কথাটি যেন অন্তরের ভিতর হইতে আসে না ; মন মানিতে চায় না।

'সমুতের সাতশো বিঘা ধানের ক্ষেত ডুবেছে, পাঁচশো বিঘা ভুট্টার ক্ষেত।'

'নৌখে ঝার বারোশো বিঘা ধানের ক্ষেত, আর সাতশো বিঘা মকাইয়ের ক্ষেত।' 'নৌখের বেলায় ছোটকী বিঘা দিয়ে মাপছিস নাকি—সাড়ে-চারহাতের লগার বিঘা ?'

'প্রায় অর্ধেক মকাই কিন্তু আগেই ঘরে তোলা হয়েছিল।'

'তোলা হয়েছিল তো তোলাই থাকল।' সকলে হাসিয়া উঠে। 'মকাই হয়েওছিল তো ভারি। বর্ষাতে জল বসে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিলাম গাছগুলো কুটি-কেটে গরুকে খাওয়াব ; তাও কৌশিকীমাঈয়ের দয়ায় হল না।' সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। কেহ বাধা দেয় না, বারণ করে না। একই ব্যথা সকলের। একজনের অশ্রুর ভিতর দিয়া সকলের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ পাইতে চায়।

জল কমিবার নাম নাই। এরূপ করিয়া আর কতদিন চলে। তিনদিন তো হইয়া গেল। আজ জেলে-ডিঙিতে করিয়া পাতরঙ্গী ও তাহার ছাগলটিকে এখানে আনা হইয়াছে। সেই চালার উপর দুইটি সাপ উঠিয়াছিল। তাহারা মানুষ দেখিয়া নড়ে না; তাড়া দাও, হাততালি দাও, সরে না—কেবল পিট্ পিট্ করিয়া তাকায়। ভয়ে পাতরঙ্গী চিৎকার করে।

ছেলেপিলের চ্যাঁ ভ্যাঁ। নোখে ঝার বারান্দা ও আশেপাশের সব জায়গাই নরক হইয়া উঠিয়াছে। ঘাসপাতা পচার গন্ধও আকাশে বাতাসে সর্বত্র।

নদী দিয়া কোনো নৌকা গেলেই বারান্দার লোকেরা তাহাদের ডাকে চিৎকার করিয়া, হাতছানি দিয়া, গামছা উড়াইয়া। কিন্তু গরু ছাগল ধান ছেলেমেয়ে ভরা নৌকাগুলি ফিরিয়াও তাকায় না। কোনোটিতেই তিল-ধারণের স্থান নাই।

হতাশায় গ্লানিতে যখন লোকের মন ভরিয়া গিয়াছে সেই সময় হঠাৎ দেখা যায় একখানি হাজারমনী নৌকা। 'এই দিকেই তো আসিতেছে।' তাহা হইলে কি শেষ পর্যন্ত কৌশিকীমাঈয়ের দয়া হইল! জয় কৌশিকীমাঈকি জয়! ছেলে-বুড়ো সকলে উঠিয়া দাঁড়ায়। নৌকা হইতে গান্ধীটুপি-পরা ছেলে চ্যাঁচায়—'আগে বাচ্চারা আর মায়েরা। পরের দলে আসবে পুরুষেরা। যাবে গঞ্জের বাজারে। সেখানে আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। বানের জল আবার বাড়বে। কাদার দেওয়াল ধ্বসে পড়বে। তার আগেই সকলে চলে এসো, চলে এসো,—দেরি কোরো না।'

মেয়েরা বলে, 'আমরা একা যাব নাকি? তার চেয়ে এখানে মরা ভাল।' বলে, আর যে যার আমসি আচার আর বড়ির পুঁটুলি গুছায়।

'আচ্ছা, তাহলে একজন দুজন বেটাছেলে আসুন।' একে একে নৌকায় লোক উঠে। ছোট ছেলেরা মুখে আঙুল দিয়া হাসে। মেয়েরা চোখে আঙুল দিয়া জল মুছে। পুরুষেরা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকায় আর বলে, 'ভাবিস না, আমরাও আসছি।'

'এটা নোখে ঝার বাড়ি না? আসুন, আপনারাও আসুন।' 'নৌকায় কারা? মুসহর ধাঙড়ের মেয়েরা? সুমুতের লোকেরা? আমাদের ব্রাহ্মণ মেয়েরা পরের নৌকায় যাবে। না, না, ভয় পাচ্ছি না। আপনারা মহাত্মা। আপনাদের সঙ্গে পাঠানোতে আবার ভয় কিসের? কথাটা অন্য।' গান্ধীটুপি-পরা ছেলেরা তাড়া দেয়, বচসা চলে. তাহার পর ব্রাহ্মণবাড়ির মেয়েরা একে একে নৌকায় ওঠে, মুসহর মেয়েরা সরিয়া তাহাদের জন্য আলাদা জায়গা করিয়া দেয়, সুমুতের বাড়ির মেয়েরা কুশীর অন্য পাড়ের পাহাড়ের গাছগুলি গুণিবার চেষ্টা করে।

'পুরুষদের মধ্যে থেকেও দু-একজন আসতে পারেন; পরের ব্যাচে বাকি সকলে যাবেন। ততক্ষণ কিছু ভুট্টার ছাতু দিয়ে যাব নাকি?'

'চাল আছে নাকি? ভুট্টার দরকার নেই। কেরোসিন তেল আছে? পোকা-মাকড়ের মধ্যে রাত-বিরেতে দরকার হয়। সরষের তেল? নুন? দেশলাই? পাঁকুই-এর ওষুধ? কিছুই নেই?'

'না, আমরা রিলিফ পার্টির লোক না—রক্ষা-পার্টির লোক। রিলিফ দিতে আসিনি, লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এসেছি।'

'না না, ভুট্টার কথা বললেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চলে। চলিতে আর চায় না—হাওয়া থাকিলেও, না হয় পাল তুলিয়া দেওয়া যাইত।

'হরিণকোল সড়কের পাশ দিয়ে নিয়ে যাবি।' হরিণকোল সড়ক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, হরিণকোল পর্যন্ত গিয়েছে। রাস্তা কোথায় ছিল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কেবল রহিকপুরার পশ্চিমে যেখানে ভীষণার নালী আসিয়া কুশীতে পড়িয়াছে, সেইখানে ভীষণার উপর একটি পুল ছিল। পুলের রেলিঙের উত্তরাংশ দেখা যাইতেছে।

গোবরাহার নিকট পৌঁছিতেই সাড়ে চার ঘণ্টা লাগিয়া গেল। এখানে জলে একটি প্রকাণ্ড ঘূর্ণী; বিরাট পরিধি লইয়া সাদা ফেনিল আবর্ত। নাম কালভৈরোকা কুণ্ডী। কালভৈরব দুধ দিয়া সিদ্ধির সরবৎ তৈয়ারি করিতেছেন; আঙুল দিয়া নিচের থিতানো চিনি, সিদ্ধিবাঁটা দুধের সহিত মিশাইতেছেন। নৌকার সকলেই তাহা জানে এবং সেইজন্য এখানে প্রণাম করে—রক্ষা করো আমাদের কালভৈরব! এই জলের নাগরদোলায় অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে একটি কলাগাছের ডোঙা, কয়েকটি পোড়াকাঠ, একটি কলসী, আর ফেনার সহিত রাশীকৃত আবর্জনা।

'সামাহালকে! বাঁয়ে দাব্ কর্ চলো।' হঠাৎ নৌকাটি অসম্ভব দুলিয়া উঠে। একদিকে কাৎ হইয়া যায়; মেয়েরা আর ছেলেপিলেরা চিৎকার করিয়া এ ওর গায়ে গিয়া পড়ে। তাহার পরই নৌকাটি অন্যদিকে কাৎ হয়। নৌকার ভিতর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মায়েরা ছেলেদের বুকে চাপিয়া ধরে। নৌখে ঝার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সুমৃৎ তিয়রের স্ত্রী ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ব্রাহ্মণদলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে হঠাৎ নৌখে ঝার পুত্রবধূকে কাঁধ ধরিয়া বসায়। শাশুড়ী বৌ দুইজনকেই বলে, 'ভয় কী! কৌশিকীমায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।' সেও পাশে বসিয়া নৌখের পুত্রবধূকে ধরিয়া থাকে—আহা, বৌটি এখনো ভয়ে কাঁপিতেছে। মাঝিরা চিৎকার করে, 'কালভৈরো কী জয়!'

'নৌকার একদিকে সবাই কেন? মেয়েদের কি কোনোকালে আক্কেল হবে!'

আর-একজন মাঝি বলে, 'হাজারমনী নৌকা বলে বেঁচেছে। না হলে এখনই কালভৈরোর ভাঙের গোলমরিচ হয়ে যেত।'

'আর খানিকটা!' 'জোরে!' 'দাঁড় বন্ধ কোরো না ভাইয়ো!' 'ব্যস! আর এক কোশ!'

গঞ্জের বাজার। সেদিকটা উঁচু। তাই সেইখানে জল পৌঁছায় নাই। সেইখানে আশ্রয়-প্রার্থীদের একটি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। চৌবেদের আমবাগানে বার্মা ইভ্যাকুয়ীদের জন্য যে ক্যাম্প হইয়াছিল, তাহারই অবশেষ এখনও সেখানে নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে। এক কোণে একটি কুষ্ঠরোগীর কালো ঝুলমাখা মাটির হাঁড়ি বাঁশের সহিত ঝুলিত; আর রাজ্যের গরু ছাগল এখানে থাকিত। তাহাই এই চার বৎসর লোকে দেখিয়া আসিতেছিল। আজ হঠাৎ ইহার গালভরা নাম দেওয়া হইয়াছে—'রিফিউজি ক্যাম্প'।

মেয়েদের আনিয়া এখানে নামানো হইল। আর দূরদূরান্তর থেকে লোক

আসিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন কোনো যোগের সময়ের গঙ্গার ঘাটে ভিড় —'বান তো সোজা হয়নি। ফুলকাহা থেকে বাঘডোবরা—সাতাশ মাইল। কত গাঁ যে ভেসেছে তার কি ঠিক আছে।' তাই এই ভিড়। তবু তো কত লোক ধর্মশালায় আছে ; কত লোক এখানে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে।

এখানে এক-এক গাঁয়ের লোক, এক-একদিকে জায়গা দখল করিয়াছে!

'আপনারা কোথাকার—ফুলকাহার নাকি ? আপনারা ? আর আপনারা ?'

মোটামুটি আলাপ-পরিচয় জমিয়া ওঠে। তাহা কেবল মৌখিক। হাজার হইলেও তাহারা ভিন্‌গাঁয়ের লোক, নিজের গাঁয়ের লোক হইল আপনার জন।

'আরও চাটাই চাই এখানে—চাটাই !'

ভলাণ্টিয়ররা চেঁচায়, 'কটা উনুন হবে ? চারটে ? স্লিপ নেন। রিলিফ আপিসে যান। ঐ যে নিশান টাঙানো—গেটের পাশে গরু শুয়ে রয়েছে—ঐ বাড়িটা। ঐখানে ইট পাবেন।'

'কে কে যাবে ভাই, ইট আনতে ?' ঝা-গিন্নী, তিয়র-গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুসহরনীরা বলে, 'আমরা আনবো' ; সাঁওতালনীরা বলে, 'আমরা আনবো।'

'তোমরা কি মা এসব কাজ করতে পার, না কোনদিন করেছ। আমাদের গাঁয়ের ইজ্জৎ খ্যাতি আমাদের হাতে। তোমাদের কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।'

সব দরকারী জিনিসই বাহির হইত—মায় শিলনোড়া পর্যন্ত। সাঁওতালনীরা ছাড়া আর সকলেই বলে, আমরা বামুনের পেসাদ পাবো। ব্রাহ্মণীরা হাসিয়া উনানের দিকে যান। তিয়র-মহিলারা মশলা বাটিতে বসে।

ছোট ছেলেদের আগে খাওয়াইয়া দেওয়া হইবে। দিয়াছে ভুট্টার ছাতু। তিয়র-মেয়েরা ছাতু মাখে, ব্রাহ্মণীরা রুটি সেঁকেন।

সুমুতের স্ত্রী লোখের স্ত্রীকে বলেন, 'দিদি ঐ কচি পোয়াতি বৌটাকেও এখনি বাচ্চাদের সঙ্গে খাইয়ে দাও। কম ঝক্কি তো গেল না ওর ওপর আজ। এখন সবই ভগবানের কৃপা।'

বৌ ঘাড় নাড়িয়া এখন খাইতে আপত্তি জানায়। ঝি-গিন্নী হাসিয়া বলেন, 'দেখলে তো আমার বৌয়ের ঘাড় নাড়া। আর একবার ঘাড় নেড়েছে, আর ওকে 'হাঁ' বলাও তো।'

তিয়র-গিন্নী বলেন, 'এই জিনিসই তো ভালবাসি না বৌমা। যা বলি তাই শোনো, 'না' কোরো না। তাহলে বড্ড রাগ করব কিন্তু, মা।'

বৌ শালপাতা লইয়া বসে।

শাশুড়ী একগাল হাসি মুখে লইয়া বলেন, 'এ আজ আজব কাণ্ড দেখালে বহিন।'

বড়দের খাওয়া-দাওয়া চলিতেছে। ইতিমধ্যে আর দুখানি নৌকায়, গ্রামের পুরুষেরা ও মসজিদের বারান্দার লোকেরা আসিয়া পড়ে। ছেলেদের অধিকাংশই শুইয়া পড়িয়াছে। যাহারা জাগিয়াছিল তাহারাই পেট্রোম্যাক্সের আলোতে প্রথম চিনিয়াছে আত্মীয়-পরিজনকে।

ব্রাহ্মণ মেয়েরা থালা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। অন্য জাতের মেয়েরা ঘোমটা

টানিয়া হাত গুটাইয়া বসে। সাঁওতালনীরা সাঁওতালদের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে দুই হাত দিয়া মকাইয়ের রুটি খায়।

মসজিদের দলের লোকদের মধ্যে অধিকাংশই শীর্ষাবাদিয়া মুসলমান—এদেশে বলে 'বাখিয়া'। ইহাদের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। মাছের মতোই যেন ইহারা জলের জীব। গঙ্গাতে যেখানে চড়া পড়ে সেখানে তাহারা হানা দেয়। এমনি করিয়া দলে দলে রাজমহলের গঙ্গার পথে বিহারে আসিয়া এ অঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহারা নাকি মুর্শিদাবাদের নবাবের হাবসী সৈন্যদের বংশধর। তাই জলের ধারে থাকিলেও ইহাদের রক্ত এখনও গরম। হাসিমস্করা করিতে করিতে হঠাৎ চটিয়া রামদা লইয়া মারিতে যায়। এদের মোড়ল মনিরুদ্দিন শীর্ষাবাদিয়া সঙ্গের মেয়েদের একদিকে জায়গা দেখাইয়া দেয়। তাহার পর ব্রাহ্মণ আর তিয়রদের বলে, 'চলুন, আমরা বেটাছেলেরা সব একটু বাইরে ঘুরে আসি। দেখছেন না, নইলে মাঠাকরেনদের খাওয়া হবে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো' বলিয়া নোখে ঝার সহিত সকলে বাহির হইয়া যায়। মেয়েরা আবার খাইতে আরম্ভ করে। ভিনগাঁয়ের বেটাছেলের সম্মুখে খাইতে আবার লজ্জা কী? তাড়াতাড়ি সকলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লয়। আবার উনুনে ফুঁ-দেওয়া আরম্ভ হয়।

ফুলকাহার দলের এক বর্ষীয়সী মহিলা বলেন, 'এদের রান্নাবাড়ার কি আর বিরাম নেই?'

রহিকপুরার ব্রাহ্মণ, তিয়র, শীর্ষাবাদিয়া, বাঁতার সব মহিলাই এক সঙ্গে বলিয়া উঠে—'তাতে আপনার কী হচ্ছে', 'আমরা সারারাত রাঁধব', 'বাড়িতে আমরা খেতে পাই না, এখানে এসে দুটি পাচ্ছি। না ভাই, তাই না?' আরও কত মন্তব্য তাহারা বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে। বৃদ্ধা ঘুমাইয়া পড়িবার ভান করে।

'নিশ্চয়ই গোবরাহায় বাড়ি।' রহিকপুরার সব মেয়েরা একসঙ্গে হাসিয়া উঠে। এই অঞ্চলে গোবরাহার লোকদের বোকা বলিয়া দুর্নাম আছে।

পরের দিন।

সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। ক্ষতির পরিমাণ এই কয়দিন কেহই ভাবিবার সময় পায় নাই। নদীরও কূল-কিনারা নাই; দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়াও কূলকিনারা পাওয়া যায় না। বাড়িটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে কিনা কে জানে।

ডাকবাংলাতে জেলা হইতে হাকিম আসিয়াছেন। কোথাকার এক ছোকরা কুশী নদীর ভয়ানক বানের কথা কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছে। সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরা। আবার লিখিয়াছে, 'নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র'। একখানি রদ্দী কাগজ—তাহাতেই আবার লিখা 'জাতীয় দৈনিক পত্র'। উহা দেখিয়াই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে এইখানে পাঠাইয়াছেন। এতক্ষণে হয়তো জেলা-কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার খবর-দেওয়া কাগজের কাটিং সেক্রেটারিয়েট হইতে কৈফিয়ত তলব করিয়া কালেক্টরীতে আসিয়া যাইবে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া চাকরি করিবার কপাল আর আজকাল নাই।

কেরানীবাবু আসিয়া খবর দেন, 'কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে; এ অঞ্চলের 'রইস' এঁরা।'

'আচ্ছা, আসতে বলুন।'

'হে' হে' হে'—এই আপনার সঙ্গে ফ্লড সম্বন্ধে কথা বলতে এলাম। আপনি এসেছেন শুনেই ছুটে এসেছি। একটা আলাদা ফ্লড-রিলিফ-কমিটি কায়েম করা যায় না?'

'একটা আছে না?'

'ওটা কংগ্রেসীদের ঘরোয়া। সেবার কাজ তো কেবল খদ্দরধারীদের একচেটিয়া নয়।'

'আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে কথাবার্তা হবে। এখন একটু অন্য কাজ আছে।'

'হে' হে', আচ্ছা, তাহলে পরে আবার দেখা করব'—কয়েকপাটি পান-খাওয়া দাঁতের সমাহার।

'বোর্‌স্‌!' কম্পমান দরজার পর্দায় এখনও তিনটি ছায়া দেখা যাইতেছে।

ক্রীং ক্রীং।

'হুজৌর।'

'ওভারসিয়ার বাবুকো সেলাম দেও।'

'হুজৌর।'

'ওভারসিয়ারবাবু, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নৌকা নেই?'

'১৯৩৭-এর গত ফ্লড-এর পর আটখানা নৌকা এখানে রাখবার ব্যবস্থা হয়। এতদিন এখানে পড়েছিল। এ কয় বছর কোনো কাজে আসেনি। এইসব 'রইস'রা নিজেদের বাড়ির কাজে লাগাতেন। ব্যবহারের অযোগ্য বলে এ বছর চেয়ারম্যান সাহেব নিলাম করে দিয়েছেন।'

'কিনেছে কে?'

'এই খানিক আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাই।'

'তাঁরা ব্যবহারের অযোগ্য নৌকা নিয়ে কী করবেন? ব্যবহারের অযোগ্য রিপোর্ট দিয়েছিল কে? আপনি? ব্যবহারের অযোগ্য—ননসেন্স। ঐ নৌকায় বেঙ্গলে নুন 'স্মাগল' করা হবে। সব খবর আমরা রাখি। কেরানীবাবু লিখুন। টু দি চেয়ারম্যান। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জন্য কখানি নৌকা দিতে পারেন? টু দি কালেক্টর—আজকের রিপোর্ট ভোরের ট্রেনে যেন চলে যায়, কেরানীবাবু।'

'নিরঞ্জনবাবুকে ডাকো—রিলিফ কমিটির সেক্রেটারিকে। চাই ফিগার্‌স। কত গ্রাম অ্যাফেক্‌টেড, লোক মরছে কি? গরু বাছুর? কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম একেবারে ভেসে গিয়েছে? কত নৌকা দরকার? ভেটারিনারি ডাক্তারকে নিশ্চয়ই সপ্তাহে একদিন এখানে সেন্টার খুলতে হবে। আরও কত লেখাপড়ার কাজ আছে। স্টেনোকে নিয়ে এলাম না, বড় ভুল হয়ে গেল।'

দিনরাত লেখাপড়ার কাজ চলিতেছে; আর চলিতেছে সোডা আর রম্‌।

'মেডিকাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে লেখাপড়া। ভেসেলিন লাগবে বললেন না ডাক্তারবাবু পাঁকুইয়ের জন্যে? আর সালফানিলামাইড্‌। কলেরা ইনক্যুলেশন, সে তো পরে হলেও চলবে। কুইনিন, মেপাক্রিন। ডি. এ. দিন হেলথ্‌ অফিসারের কাছে। আর—একখানা দিন রিজিওনাল গ্রেন সাপ্লাই অফিসারের কাছে—দু' ওয়াগন ভুট্টার জন্যে তাগাদা। কালেক্টরের কাছে চিঠি দিন—জল সরলেই বীজ লাগবে। হাজার মন কলাই, হাজার মন কুর্থী।'

'স্ট্যাটিস্‌টিক্স যোগাড় করুন, কত বাড়ি ভেঙে পড়ে গিয়েছে। তাদের জন্যে

পড়ে দেড়শো টাকা করে বাড়ি তৈরির হারে গ্রাটুইটাস রিলিফ দেওয়া হবে। হিসেবের ফর্দ করে পাঠিয়ে দিন নেক্‌স্‌ট ডাকে। হ্যাঁ আর একটা লিস্ট করতে হবে 'তাকাভি' লোনের। লোনে বীজ দেওয়াই ভাল ; টাকা পেলে তারা অন্য কাজে খরচ করে ফেলবে।'

'টু দি কালেক্টর—এ অঞ্চলের গরু মহিষ যে সকল নির্বিঘ্ন স্থানে পাঠানো হইয়াছে সেখানকার জমিদারেরা, অথবা তাহাদের কর্মচারীরা গরু চরার জন্য মোটা টাকা আদায় করিতেছে। সমাজের 'পেস্ট' এরা। তাদের কাছে চিঠি দিন, এই টাকা লওয়া বন্ধ করিতে। আরোগ্যের পথের রুগীর জন্য চাই মিছরি। সরকারী জেলা ফ্লাড কমিটির যে আটখানা নৌকা ছিল তাহার কী হইল ?'

'এখানকার রিলিফ কমিটিতে কংগ্রেসী আর অকংগ্রেসী দলে বিশাল মতদ্বৈধতা আছে। নির্দেশ দিন কী করি।'

'একটা স্কীম এসেছে—পাট দেওয়া হবে বন্যাপীড়িত লোকদের। নেওয়া হবে তাদের কাছ থেকে পাটের দড়ি। মজুরি তারা পাবে। মজুরির কিছু অংশ গভর্ণমেণ্টের ঘর থেকে দিতে হবে। এর নাম সুৎরী সেণ্টার স্কীম।'

লেফাফা, চিঠি, টেলিগ্রাম, সার্ভিস মার্কা ডাকটিকিট, দিস্তা দিস্তা কাগজ, কলিং বেল্—'অতবড় কাগজে লিখবেন না। অর্ধেক করে নিন।' কেরানীবাবুর নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই। লেখাপড়ার কাজ বাড়ে, কাজ এগোয় না। কাগজের চাপে আসল কাজের দম বন্ধ হইয়া আসে।

উত্তর আসা আরম্ভ হইয়াছে। ফাইল বাড়িতে থাকে।

'জেলায় অধিক বীজ না থাকায়, কৃষি বিভাগকে লেখা হইয়াছে। তাঁহারা দিতে পারিবেন কি না আশ্বাস এখনও পাওয়া যায় নাই। অসুবিধা হইতেছে যে, কণ্ট্রোল দাম বাজার-দরের অর্ধেক।'

'রেললাইনে গরু চরা বারণ। উহার উপরের ঘাস কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যাহারা ঐ ঘাস রেল-কোম্পানীর নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছে, তাহাদের কী হইবে। যাহা হউক, রেলওয়ে এস. ডি. ও-কে এ বিষয়ে লিখিতেছি।'

'সুৎরী সেণ্টার স্কীম অসম্ভব। যাহা হউক আমি লোকাল গভর্ণমেণ্টকে রেফার করিতেছি।'

'বার্লি লোকাল মার্কেট হইতে যোগাড় করিবার চেষ্টা করিবেন।'

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড লিখিতেছে যে, বন্যাপীড়িত লোকদের নৌকা সাপ্লাই করিবার নৈতিক অথবা কানুনী দায়িত্ব তাহাদের নাই। তাহাদের এই জবাবের জন্য শিক্ষা দেওয়া উচিত।'

'গ্রাটুইটাস রিলিফের জন্য পাঁচশো টিন কেরোসিন তেল চাহিয়াছেন। আজকাল কণ্ট্রোলের বাজারে ইহা অসম্ভব। পনের টিন লোকাল মার্কেট হইতে লইবেন। আমি পরে রিপ্লেস করিব।'

'ডিস্ট্রিক্ট ফ্লাড কমিটির সরকারী নৌকাগুলির কোনো হদিস পাওয়া যাইতেছে না। যে অফিসারের দায়িত্ব তাঁহার কাছে কৈফিয়ত তলব করিয়া চিঠি দিয়াছি।'

চারিদিকে প্লাবনের জলের ফেনা, এখানে কেবল কথা আর কথা—কথার ফেনা! লাল ফিতার নাগপাশ আষ্টেপৃষ্ঠে বর্তমান সমস্যাটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে অজগরের নিষ্পেষণে হরিণ-শিশুর মতো।

'এদিকে সমুৎ নোখেকে জিজ্ঞাসা করে, ও কী করছে মহাত্মাজীর চেলারা ?'

'আঁসশেওড়ার জঙ্গলে গন্ধওয়ালা দাওয়াই দিচ্ছে। সাপের ওষুধ।'

'এদিকে এত জাঁতা কেন ?'

জবাব দেয় ভলান্টিয়র, 'বসে বসে ভুট্টা পেষো। অর্ধেক তোমাদের। অর্ধেক আমাদের ফেরত দেবে। বসে খাবে কেন ? ভিক্ষে নেবে কেন ? নিজের রোজগার নিজে খাও।'

নোখে আর সমুৎ দুজনে বলাবলি করে, 'কথাটি বলেছে মার্কার কথা, দামী কথা।'

সারঙ্গীলাল 'রইস' হাকিম সাহেবকে লইয়া বজরায় উঠিতেছে ; সাহেবকে বন্যাপীড়িত এলাকা দেখাইতে হইবে। সঙ্গে লইয়াছে কলের গান, থার্মোফ্লাস্ক, টিফিন-ক্যারিয়র, সোডার বোতল, আরও কত কী।

সমুৎ আর নোখে বোতলের দিকে ইশারা করিয়া চোখ টেপাটেপি করে।

রাত্রে হঠাৎ নোখে ঝা'র পুত্রবধূর প্রসব বেদনা উঠিয়াছে। সমুতের স্ত্রী উৎকণ্ঠা চাপিয়া বলে, 'এ আমি আগেই ভেবেছি। এ শরীরের অবস্থায় কি এত টানাপোড়েন সয়।' সমুৎ দৌড়িয়া রিলিফ কমিটিতে খবর দিতে যায়। শীর্ষাবাদিয়া মনিরুদ্দি আর তাহার ভাই দলিমুদ্দি ক্যাম্পের কোণায় নিজেদের চাটাইগুলি ঘিরিয়া আবরু করিয়া দেয়। কানী মুসহরনী মালসাতে করিয়া কাঠের আগুন লইয়া আসে। সমুতের স্ত্রীর সহিত অনেকেই সেই চাটাই ঘেরা স্থানে সারারাত চেঁচামেচি করে। ঘেরা পর্দার মধ্য হইতে শোনা যায় ঝা-গিন্নী বলিতেছেন, 'এতটা বয়স হল ; কিন্তু এখনও আমি এসবে একেবারে হকচকিয়ে যাই। ভাগ্যি তুমি ছিলে বহিন। না হলে বিদেশে বিভুঁয়ে কি দশা যে হত এখন, তাই ভাবি।'

বাড়ি ছাড়িয়া কাহারও মন টিকে না। মৈনা বলদজোড়ার সোজা শিং দুটিতে কতদিন তেল দেওয়া হয় নাই। লালিয়া গরুটি আবার জোলো ঘাস খায় না। হরখু চরবাহা গরুগুলিকে ভোখনাহার মাঠে কী অবস্থায় রাখিয়াছে, কে জানে। গোলার মকাইগুলি পচিয়া উঠিল। পশ্চিমের ঘরের দেওয়াল বোধহয় এতদিনে পড়িয়া গিয়াছে। পাৎরঙ্গীর লাউগাছটি বোধহয় এত জলে মরিয়া গেল। আলিজানের বড় বলদটার আবার ঘাড়ের ঘা শুকোইতেছিল না। গাঁয়ে বলদের ঘায়ের জন্য একটুও ফিনাইল পাওয়া যায় না। আর এখানে নালীর মধ্য দিয়া ফিনাইলের নদী বহিতেছে। কবে যে আবার ওপারের সবুজ মখমলে ঢাকা পাহাড়ের নিচেটা আবার দিনকয়েক আগের মতো সাদা হইয়া যাইবে, কোশের পর কোশ সাদা কাশের চুনকামে। দিনরাত গল্পগুজব। কাপড়, চিনি, কেরোসিন তেলের অভাবের সেই একই কথা একঘেয়ে লাগিতেছে। রিলিফের বাবুদের আজব চালচলনের কথা, আর কতদিন বলা যায়। একটু প্রাণভরে নদীর জল খেতে দেবে না, এরা। কি যেন একটা বদ গন্ধওয়ালা ওষুধ মিলাইয়া দিবে। এখানে খয়নির থুতু ফেলতে দেবে না। থুতু আবার গিয়ে ফেলে আসতে হবে কোথায় ?

নিরবচ্ছিন্ন অবসরের একঘেয়েমির এইসব বাধানিষেধগুলি আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। নোখে, সমুৎ আর মনিরুদ্দি প্রত্যহ বহু রাত পর্যন্ত জাগিয়া

গল্প করে। ভিন্ন গাঁয়ের নানারকম লোক—বলা তো যায় না। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে কেউ যদি রাতে ভয়ডর পাইয়া চিৎকার করিয়া ওঠে।

ঘুম ভাঙিলেই প্রত্যেকেরই মনে পড়ে—জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে কি? ভোর হইতেই প্রত্যহ সকলে ছুটিয়া দেখিয়া যায় জলের অবস্থা। স্টীমারঘাটের পাশে ময়দার দোকানের নিচে ছিল একটি টিউবওয়েল। এখন আর তাহা ব্যবহার করা হয় না; কিন্তু এখন সেটি হইয়াছে কত জল বাড়িয়াছে তাহা মাপিবার যন্ত্র

'আজ যেন কলের উপরের খাঁজটি দেখা যাচ্ছে।' 'দূর, ও তো হাওয়ায় জলে ঢেউ লেগেছে, তাই।'

সেদিন প্রত্যুষে নোখে ঝা নদীতে মুখ হাত ধুইতে গিয়াছে। হঠাৎ সে উত্তেজিতভাবে দৌড়াইয়া ফিরিয়া আসে। হঠাৎ চিৎকার করিতে করিতে আসে, 'জল কমছে, জল কমছে সুমুৎ—'

'সত্যি?' যেন বিশ্বাস হইতে চায় না।

'তা না তো কি মিথ্যে বলছি? দু আঙুল নয়—আধ হাত কমেছে।'

'চুপচাপ থাক্, আর বলিস না। আবার হয়তো বেড়ে যাবে।' সকলে ধড়্মড় করিয়া উঠে, ছেলেরা কাঁদে। মায়েরা ছেলে ফেলিয়া জল দেখিতে যায়। লোকে লোকারণ্য, টিউবওয়েলের ত্রিশ গজের মধ্যে যে পেঁছিতে পারে সেই ভাগ্যবান।

'পুবে হাওয়া দিচ্ছে। আর জল বাড়বে না।'

'কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।'

'আবার আশ্বিনে আর-এক ঝোঁক আছে।'

'আর এখনই একটু গরম পড়লে আজই আবার জল বেড়ে যাবে।'

হট্টগোলে হাকিম সাহেবের ঘুম ভাঙে, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট পরিয়া এদিকে আসেন। কেরানীবাবু, ওভারসিয়ারবাবু আগাইয়া আসে। 'জল তাহলে সত্যিই কমল। কালকের স্টেট্‌সম্যানে দেখছিলাম যে এলাহাবাদে গঙ্গার ম্যাক্সিমাম জল বাড়বার রেকর্ড পেঁছুতে আর মাত্র এক ফুট বাকি।' ওভারসিয়ারবাবু এই অভাবনীয় সংবাদের আরও বিস্তৃত খবর জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করেন।

'হটো, হটো, রাস্তা ছাড়ো।' হাকিম ডাকবাংলাতে ফিরিয়া যান।

হু হু করিয়া জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেরূপ গতিতে বান আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা তীব্রতর গতিতে জল শুকাইতেছে।

দলে দলে লোক প্রতি ঘণ্টায় জলের মাপ দেখিতে আসে।

এ কয়দিন বন্যার স্রোতে গ্রামের কলহ, মনের পঙ্কিলতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্লাবনের বিশালতার মধ্যে গ্রামীণ মনের সংকীর্ণতার স্থান ছিল না পরের দিন গোবরাহা দিয়ারার কালো মাটি জলের মধ্য হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিনের অবচেতন স্বার্থলোলুপ কিষাণ মন আবার চেতন হইয়া উঠে। অস্বাভাবিক পরিবেশের সমাপ্তির সহিত স্বাভাবিক গ্রামীণ মনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

কালো, ভিজা, আঠালো পলিমাটি। কলাই কুথী ফেলিয়া দাও, কোঁচড়ের মধ্য হইতে কেবল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও। জমি তৈয়ারি করিবার দরকার নাই,

কেবল ফেলিবার মেহনত। নরম পাঁকের মধ্যে পা বসিয়া যায়, সেই পা কাদা ঠেলিয়া তোলার মেহনত। নিড়ানোর দরকার নাই, মজুরের খরচ নাই ; সোনার ফসল ফলিবে।

যাহা পাও নিজস্ব করিয়া লও। সব জিনিস ব্যক্তিগত করিয়া লইতে চেষ্টা কর ; নিঙড়াইয়া লও, শুষিয়া লও। চুরি করিয়া লও, লাঠির জোরে লও।

জমি, পলিমাটি-পড়া কালো জমি দেখিয়া, আদিম লোভাতুর কিষাণ মন চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে ? বন্যার জল সরিতেছে—রাখিয়া যাইতেছে কুটিল সংকীর্ণ মনের ঈর্ষাদ্বন্দ্বের উর্বর ভূমি ; কলাইয়ের ও কলহের ফসলের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

নাম লেখাও, কণ্ট্রোল দরে কলাই কুথীর বীজের জন্য। সুমৃৎ নিজের জমি লেখায় তিন হাজার বিঘা, নৌখে লেখায় চার হাজার বিঘা।

সুমৃৎ অন্য তিয়রদের নাম লেখায়। হাকিম বলেন, 'গেনা তিয়র, কত বিঘা জমি, কত টাকা তাকাভি চাই ? এক সঙ্গে সকলে কথা বলবেন না ; আপনি কেন ওর হয়ে বলছেন ? যার জমি, সেই বলবে।'

সুমৃৎ বলে, 'ও জাতে তিয়র, নিরক্ষর অন্ধ, তাই আমি বলে দিচ্ছিলাম।'

'অন্ধ ?'

'লেখাপড়া জানে না তাই বলছিলাম, দৃষ্টি নেই।'

'নৌখে ঝা ব্রাহ্মণদলের নেতৃত্ব করে। বলে, 'ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গতি ; একে হুজুরের বিনা পয়সার বীজ দিতে হবে, এর জমি নেই এক ধুরও।'

সুমৃৎ বলিয়া উঠে, 'না হুজুর, এর পনের-ষোলো বিঘা জমি আছে।'

বচসা জমিয়া উঠে। হাকিম অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওভারসিয়ারবাবু, আপনিই তাহলে লিস্টটা করুন। আমি একটু আসছি।' যে যাহা পারে সঞ্চয় করিতেছে। সাঁওতালদের জন্য বীজের কথা, না নৌখে ঝা, না সুমৃতের মনে আসে। বিরসা মাঝি গরুর জন্য ফিনাইল চুরি করিয়া মাটির গেলাসে রাখে। মঙ্গল মুসহর রিলিফের বাবুদের কাছে চুপি চুপি ইহার খবর দিয়া আসে। পাৎরঙ্গীর ছাগলটা শুকনো শালপাতা চিবাইতেছিল। গোকুল তিয়র এদিক ওদিক তাকাইয়া তাহার পেটে সজোরে এক লাথি মারে। তুরিয়া বাঁতারের পুত্রবধূ কাপড়ের আঁচলে আধসেরটাক নুন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহা ভিজিয়া উঠিয়াছে। কানী মুসহরনী ভয় দেখায়, আমি হাকিমকে বলিয়া দিব। সাঁওতালেরা শুকনো শালপাতার বোঝা বাঁধে, বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য।

সুমৃতের স্ত্রীর কাপড়খানি শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল, হঠাৎ সেখানিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'যত চোরের আড্ডা' বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ মহিলাদের ভিতর দিয়া চলিয়া যান।

কাহারা কত তাড়াতাড়ি এখান হইতে বাহির হইতে পারে, তাহারই জন্য বাঁধাছাঁদা চলিতেছে। কয়দিনের মেলা ভাঙিয়া গেল। গনুয়া মুসহর বলে, 'বাধিয়ারা যাবে না ?'

'মুখ সামলে কথা বলিস। 'শীর্ষাবাদিয়া' না বলে ফের যদি 'বাধিয়া' বলিস, তা হলে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব—বলে রাখলাম।'

মুসহর আর সাঁওতালেরা বাহির হইয়া পড়ে, এ কয়দিনের হাসিখুশি আলাপ নাই। সকলের মনের মধ্যে আগামী সমৃদ্ধির ছবি ; বাড়ি গিয়া কী দেখিব, এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও অতীতের ক্ষতি অনায়াসে ভুলিবার প্রয়াস।

তুচ্ছ জিনিস লইয়া ছোটখাটো ঝগড়া লাগিয়াই আছে। হাতগজ, চেন, লগা, বিঘা কাঠার দ্বারা সীমায়িত, সংকীর্ণ জমির মালিক। উদারতা আসিবে কোথা হইতে? শীর্ষবাদিয়া, মুসহর ও সাঁওতালদের নৌকার দরকার নাই। মধ্যের কোশখানেক একবুক জল তাহারা হাঁটিয়া চলিয়া যাইবে। কিছু কষ্টই নাই। কতটুকুই বা বোঝা—কত কটা বীজই বা পাইয়াছে। মুসহর ছেলেপিলেরা এখনই বীজের কলাই চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মনিরুদ্দিন বলে, 'ছোটলোক কোথাকার, গায়ে কাদা ছিটোচ্ছে?'

'আমি কি ইচ্ছা করে দিচ্ছি নাকি'—বিরসা সাঁওতাল জবাব দেয়।

গেনুয়া মুসহর ফিস ফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'সেদিন ইস্কুলের কাছে বানে একটা হরিণ ভেসে এসেছিল। সেটাকে আমি আর হরিয়া প্রথমে ছুঁয়েছিলাম। ঐ শালা বাধিয়া মনিরুদ্দিন কোথা থেকে এসে খচ করে ছুরি দিয়ে হরিণটিকে জবাই করে। আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণটার গায়ে থুতু দিয়ে দেয়—যাতে আর কেউ ঐ মাংস না খায়। একেবারে পাষণ্ড। কি দিয়েই যে ভগবান এদের সৃষ্টি করেছিলেন! হরিণটার পেটে আবার বাচ্চা ছিল। 'বাধিয়া' বলবে না, ও'কে গুরুঠাকুর বলবে।'

তিয়রদের মধ্যে একা সুমৎ নৌকা আনাইয়াছে, অনুরূপ ঝা তাহাতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। সুমৎ বলে, 'সরিয়ে নাও, নামিয়ে নাও বস্তা, জায়গা নেই।' অনুরূপ ঝা কাকুতি মিনতি করে।—নৌখের পুত্রবধূ আর একটু ভাল না হইলে, নৌখে ঝা যাইতে পারে না; ব্রাহ্মণদের মধ্যে, আর কাহারও নৌকা করিবার সংগতি নাই, আর তাহা হইলেই তাহার কলাই বুনিবার দেরি হইয়া যাইবে। শীত পড়িলে আর কলাই বুনিয়া কী হইবে? পাঁক শুকাইলে, কলাই বোনা না-বোনা সমান।

'ও সব আবদার তোমার গুরু নৌখে ঝার কাছে গিয়ে করোগে যাও। শীগগির নামো বলছি।'

'আচ্ছা, ভগবান আছেন।'

'শাপ দেওয়া হচ্ছে! রহিকপুরার বামুনের দেওয়া শাপ সুমৎ তিয়র এই—' ফুঃ ফুঃ বলিয়া হাতের তেলোয় ফুঁ দিয়া নদীর দিকে উড়াইয়া দেয়।

সুমৎ মেয়েকে বলে, 'মাকে ডাক্। এখনও সেখানে কী হচ্ছে?'

সুমতের স্ত্রী নিজের কাপড়খানি তখনও খুঁজিতেছিলেন—'থাক্, ও আর পাওয়া যাবে না। কোন মুসহরনী নিয়ে গিয়েছে কে জানে। একবার আঁতুড়ঘরে কচি বৌটিকে দেখে আসা যাক—যতই ঝগড়া থাক্ বৌটি একদিন তো মা বলেছিল। বড় ভাল মেয়েটি, হাজার হলেও রহিকপুরার বামুনের ঝাড় তো নয়। এখনও সঙ্গদোষে খারাপ হতে পারেনি!'

হঠাৎ আঁতুড়ঘরে ঢুকিতেই দেখেন, নৌখে ঝার স্ত্রী তাড়াতাড়ি একখানি তাঁহারই শাড়ির মতো আধময়লা শাড়ি প্রসূতির বালিশের নিচে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। তিয়রগিন্নির মাথায় রক্ত চড়িয়া যায়। বৌটির সহিত দেখা করিবার কথা আর মনে থাকে না। বন্যার স্রোতের মতো গালির স্রোত বহিতে থাকে। একজন সাঁওতালনী, ঠেলিয়া দুইজনকে আলাদা করিয়া দিতে দিতে, নির্বিকারভাবে সঙ্গিনীকে বলে, 'বিদেশে বিভুঁয়ে আজকালকার দিনে আঁতুড়ের কাপড় জোটানো যে কি ব্যাপার, তা কেউ ভাববে না।'

ভলাণ্টিয়াররা কর্ডন করিয়া বামুনের দলকে ঘিরিয়া রাখে। তিয়রেরা নৌকা হইতে চিৎকার করে 'চোট্টা ভণ্ডের দল।' কর্ডনের ভিতর হইতে বামুনেরা বলে, 'ছোটজাতের পয়সার গরম শীগগিরই বেরবে।'

নৌকা ছাড়িয়া দেয়। পাৎরঙ্গী আবার কখন তাহার ছাগলটিকে চড়াইয়া দিয়াছে নৌকার উপর। সুমৃৎ তিয়র ছুঁড়িয়া ছাগলটিকে নদীর তীরের দিকে ফেলে, আর সেটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, 'তোর জাতভাইদের এখানে ছেড়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে আসিস।'

পাৎরঙ্গী চিৎকার করিয়া এককোমর জলে নামিয়া পড়ে, ছাগলটিকে বাঁচাইবার জন্য।

## আণ্টা বাংলা

তরাইয়ের বন্য প্রকৃতির ও নিরীহ প্রকৃতিকে মানুষদের আয়ত্তে আনিয়া যে সময় নীলকর সাহেবেরা একচ্ছত্র আধিপত্য করিত, সেই সময়ের কথা। মানুষদের কথাই বলি; সমুদ্রের নীল রং দেখিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই, আকাশের নীলের দিকে তাহারা কোনোদিন তাকাইয়া দেখে নাই; কুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় তাহারা দেখিয়াছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয়স্বজনের দেহে দেখিয়াছে নীল কালশিরার দাগ।

নীলের বিচ্ছুরিত আলোকে প্রতিফলিত বুদ্বুদের কেন্দ্র ছিল 'প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব'—জেলার লোক বলিত 'আণ্টা-বাংলা'। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভার্নেডি সাহেব শীতে ও গ্রীষ্মে ঘোড়ায় চড়িয়া মফস্বলে টুরে বাহির হইতেন, আর সারা বর্ষাকালটা আণ্টা-বাংলায় বসিয়া মদ খাইতেন।

একটি বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিলাতী কটেজের ধরনের একটি বাড়ি। ধবধবে চুনকাম করা দেওয়ালের উপর সোনালী খড় দিয়া ছাওয়া—জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে শ্বেতহস্তীর মতো। ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়ার উপর দিয়া বহুদূর হইতে লোকে দেখিত ভীতি, কৌতূহল ও সম্ভ্রমের সহিত। তর্জনীসংকেতে সঙ্গীকে দেখাইয়া পর্যন্ত দিত—'ঐ দ্যাখ আণ্টা-বাংলা'। সাহেবদের কুকুরগুলি ছিল বিলাতী। ক্লাবের মেথর, 'দুসাধ' চাকরগুলো আর কেরানীবাবু ছাড়া কোনো নেটিভ দেখে নাই বারান্দায় পাতা সারি সারি চেয়ারগুলি, ছাতার মতো গুগ্‌গুল গাছটার তলায় পাতা চেয়ার, টেবিল, টিপয়। কোনো ইণ্ডিয়ানের কানে পোঁছায় নাই, ঘরের ভিতরের বিলিয়ার্ড বলের শব্দ, কাচের গ্লাসের নিক্কণ; সাহেবদের কোচম্যান সহিসগুলোও পর্যন্ত নয়। তাদের গাড়ি দাঁড় করাইতে হইত ফটকের বাইরে, অশত্থ গাছের তলায়। চীনের প্রাচীরের মতো রহস্যভরা ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়া—এমন সমান করিয়া ছাঁটা যে, মনে হয় বুঝি-বা উহার উপর শোয়া যায়—ভিজা মেঝে এমন কি পেট-নিচু খাটিয়ার চাইতেও আরামে শোয়া যায়।

নীলকর সাহেবরা 'প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব' বলিত না! 'খ্লাব' না হয় 'ইরপিয়ন খ্লাব'।

সব সাহেব কালেক্টারই ইহার মেম্বার হইতেন। কেবল এক হর্নসাহেব ইহার মেম্বার হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন যে, তিনি সত্যিকারের

ইউরোপীয়ান ক্লাবের সদস্য হইতে পারেন, এ ক্লাবের নয়। নীলকরেরা এই অপমান মাথা পাতিয়া লয় নাই। দিন কয়েকের মধ্যে হন্‌সাহেব বদলি হইয়া যান। এই প্ল্যান্টাররাই তখন আসল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কেবল নিজের কুঠির কাছের এলাকায় নয়, সরকারী দপ্তরও তখন ইহাদের কথায় উঠে, বসে। এ জেলা ছিল সাহেব অফিসারদের স্বর্গরাজ্য। ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাহারা প্রথমে আসিতে চাহিত না। এখানে বদলি হইলেই বলিত, 'কালাপানির' সাজা হইয়াছে। ট্রান্সফার নাকচ করিবার জন্য সেক্রেটারিয়েটে দৌড়াদৌড়ি করিত। পরে একবার আসিয়া পড়িলে আর ফিরিয়া যাইবার নাম করিত না। এমন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সঙ্গসুখ, নেপাল তরায়ের এমন শিকারের প্রাচুর্য, আর কোথায় পাওয়া যাইবে। 'কালাপানির' একটি আগুলফে গাউন পরিহিতা স্বর্ণকমলের সঙ্গে টমটমে চড়িয়া কুলের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাওয়া, স্বপ্নরাজ্যের মতই মধুর। এই ভুজ-মৃণালের বন্ধন, কখন যে বৈধতার শৃঙ্খলে পরিণত হইত, তাহা অনেকে বুঝিতেও পারিত না।

সেই যুগের রবিবার।

সকাল হইতেই মফস্বলের বহু দূর দূর হইতে সাহেব মেমের দল শহরে আসিতেছে।

কালো টমটমে মিস্টার আর মিসেস মোবার্লি। গাড়ির চাকাগুলি লাল। দেওনন্দন মোক্তার হাকিমদের বাড়িতে সাপ্তাহিক তীর্থ পরিক্রমা করিতে বাহির হইয়াছেন—সাদা টমটম। সাহেবদের টমটম পাস করাইবার জন্য, নিজে পাশ কাটাইয়া রাস্তার কাঁচা অংশটির উপর গাড়ি থামাইলেন। মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করিয়া মোক্তার সাহেব সাহেবকে সেলাম করিলেন। মোবার্লি বোধ হয় দেখিতে পাইলেন না। নেটিভদের গাড়ি পাশ করিলেই তখন মেম সাহেবরা গাউনের ধুলো ঝাড়িতে অভ্যস্ত। সেই প্রত্যাশিত ধুলো ঝাড়িবার সময় মিসেস মোবার্লি মোক্তার সাহেবের গাড়ির দিকে এমন ভ্রূকুটি হানিলেন যে, তিনি সংকুচিত হইয়া যেন নিজের ঐ সময়ের গাড়ি চালানোর ধৃষ্টতায় নিজের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

কালো রঙের ঘোড়ায় বেলি সাহেব। এমন জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছেন যে, এই ভোর বেলাতেও ঘোড়ার মুখ দিয়া গ্যাঁজলা বাহির হইতেছে। ঘোড়াটি প্রোটেস্টান্ট গির্জার য়্যালোর (aloe) বেড়া লাফাইয়া পার হইয়া গির্জার হাতায় ঢোকে। ঘোড়ার জন্য পাগল সাহেবটা। অস্ট্রেলিয়া হইতে ঘাস আনায়।

শ্যাম্পানিতে ঠুকুর ঠুকুর করিয়া আসিতেছেন টমসন সাহেবের মেয়ে ফেলিসিয়া টমসন—কালাবালুয়া কুঠি থেকে। তেরো মাইল দূরে কালাবালুয়া কুঠি। বুড়ো বাপ সঙ্গে আসে নাই; না বাপকে ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে কে জানে। আয়নার মত চকচকে বার্নিশ করা শ্যাম্পানিতে মুখ দেখা যায়। বলদজোড়ার গলায় ঘণ্টা বাজিতেছে, 'বিগবেনে'র ধ্বনিতে। শ্যাম্পানিটি ঢুকিল বেঞ্জামিন সাহেবের বাংলায়। গির্জার কাজ সারিয়া আসিয়া এইখানেই সারাদিন থাকিবে। বিকালে ছোট বেঞ্জামিনের সহিত ক্লাবে যাইবে। স্যাবাথের দিনেও নাচিবে; যে যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। ডাইনী বুড়ির মতো দেখিতে, মিসেস জনস্টনের খোঁটার তোয়াক্কা রাখিলে দুনিয়ায় বাঁচা শক্ত···

রবিবার তিনটি গির্জাই লোকে লোকারণ্য; না, সাহেবদের 'লোকে' বলিয়া হয়তো বা তাহাদের ছোট করা হইল। আজ সারাদিন রামবাগের সাহেবদের

বাংলাগুলি অতিথিদের কলকাকলিতে সরগরম থাকিবে, আর বিকালে আণ্টা-বাংলার বাহিরের অশথ গাছের নিচে বসিবে রঙ-বেরঙের গাড়ি-ঘোড়া বলদের মেলা।

ছোট বেঞ্জামিন ক্লাবের সেক্রেটারি। 'প্ল্যাণ্টার্স ক্লাবে'র সেক্রেটারি সোজা পদ নয়। যে সে হইতে পারে না। অন্তত চিঠিপত্র লিখিতে জানা চাই; 'ডাহজিলং' (Darjeeling) অথবা 'ডাইনাপোর, খুর্জি' (Dinapore, Kurji) স্কুলে একবার ঘুরিয়া আসা চাই; পুরাতন নীলকর সাহেবের বংশের ছেলে হওয়া চাই; ক্লাবের দুই চার মাইলের মধ্যে বাড়ি হওয়া চাই। সাধে কি আর হাকিমরা ভয় করে, মেয়েরা তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি করে, বুড়ী মেয়েরা তাহাদের নিজের হাতের তৈয়ারি কেক খাওয়ায়, লাট সাহেব শিকারে আসিলে তাঁহার সহিত খানা খাইবার নিমন্ত্রণ হয়।

এই রবিবারের দিনটির অপেক্ষা করিয়াই বেঞ্জামিন শুক্রবার হইতে ক্লাবের 'বার রুম'টি নূতন করিয়া তৈয়ারি করাইবার কাজে হাত দিয়াছে। এতদিন অফিস ঘরেই 'বার রুমে'র কাজ চলিতেছিল। দুপুরে বাড়ির ভিড়ে আর বুড়ো বাবা মা'র কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ফেলিয়া টমসনকে লইয়া একটু সুস্থির হইয়া দুই দণ্ড গল্প করিবার জো নাই। তাই একটু নিরালায় ক্লাবে আসা—ঘরটির নির্মাণকার্য তদারক করিবার অছিলায়। তিনদিন হইতে কাজ চলিতেছে। ইটের দেওয়াল, কাদার গাঁথুনি। গুল্‌টেন রাজমিস্ত্রী গাঁথে, বিরসা ওরাওঁ মিস্ত্রীকে ইট কাদার যোগান দেয়, বিরসার পুত্রবধূ মাটির ঢেলা বাঁশ দিয়া পিটাইয়া কুশের শিকড় আলাদা করে, কোদাল দিয়া গুঁড়া মাটির মন্দির তৈয়ারি করে; মন্দিরের চূড়ায় গর্ত করিয়া জল দিয়া কাদা গোলে। ছোট বেঞ্জামিন গরমের মধ্যে সারাদিন কেবল গেঞ্জির আণ্ডারওয়ার পরিয়া ইহাদের কাজের তদারক করে। নেটিভদের সম্মুখে আবার লজ্জা কী? গরমের দিনে ইহাও ভারি সুবিধা। দুপুরবেলায় ক্লাবে কোনো শিষ্টাচারের প্রয়োজন নাই। বারে বারে স্যাণ্ডউইচ খাও, বিয়ার টানো, মার্কারের সহিত বিলিয়ার্ড খেলো, বাথরুমের জানালা হইতে বিরসাকে তাড়া দাও।

বিরসা ওরাওঁ বেঞ্জামিনদের তিন পুরুষের 'আধিয়াদার'। তিন পুরুষ হইতে তাহারা বেঞ্জামিন পরিবারের 'তসিলদারের' নিকট হইতে দাদন হিসাবে ধান লয়, চার বিঘা 'বটাই' জমির তিন বিঘায় নীলের চাষ করে। ছোট বেঞ্জামিনের ঠাকুর্দা কালো ঘোড়ায় চড়িয়া ক্ষেত দেখিতে আসিলে বিরসার ঠাকুর্দা সেলাম করিত। 'কিছুই মেহনত করো না। তোমার মেয়েকেও তো ক্ষেতে কাজ করতে দেখছি না' বলিয়া চোখের ইশারা করিয়া চাবুক ঘুরাইলে সে 'হুজুর মা-বাপ' বলিয়া আরও ঝুঁকিয়া সেলাম করিত। 'আমি বাপও না মাও না' বলিয়া ঘোড়া ছুটাইতে আরম্ভ করিলে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বটুয়া খুলিয়া খয়নি ডলিতে বসিত।

এইরূপই পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। রবিবার গির্জা হইতে ক্লাবে আসিয়া ছোট বেঞ্জামিন দেখে যে গুল্‌টেন রাজমিস্ত্রী গেটের নিকট 'কর্ণিক' হাতে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

গুল্‌টেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেলাম করে।

'এখনও বসে যে? গরমের দিনে সকালের দিকে কাজ বেশি হয়, তোমাদের অদ্ভুত অভ্যাস।'

'না হুজুর মা-বাপ। মজুর এখনও আসেনি তাই…'

'বিরসা আসেনি? এখনও আসেনি! সে রাস্কেল বোধ হয় ক্ষেতে কাজ

করতে গিয়েছে।' বিরক্ত হইয়া সে পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখে। 'ভ্লাডী !'

তাহার পর ভাবে যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক। কিছুক্ষণ সুরকি বিছানো রাস্তায় মস্ মস্ করিয়া পায়চারি করে, শিস দেয়, ফেলিসিয়া টমসনের কথা ভাবে···গির্জায় টমসন পরিবারের 'পিউ'টিতে খানিক আগের দেখা ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানি ; ইচ্ছা করে পা দুখানিকে মুঠার মধ্যে লইয়া পিষিয়া ফেলিতে ; আশ্চর্য ! গির্জার দেবী অপেক্ষাও স্বর্গীয় ! তাহার পর উপমার অশোভনতার কথা মনে পড়ে। দুই হাত 'ক্রস' করিয়া পরম-পিতার নিকট মনে মনে ক্ষমা চায়।···ফেলিসিয়া বোধহয় এতক্ষণ মা'র নিকট তাহার নতুন বাবুর্চি'র নিন্দা করিতেছে। শীতকালে লাটসাহেব যখন তাহার টেনিস খেলার প্রশংসা করিতেছিলেন, '—ঠিক ডোহার্টি'র মতো স্টাইল কোথা হইতে পাইলেন—' সেই সময় ফেলিসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া— ।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। সূর্যের তেজ বাড়িতেছে। বেঞ্জামিনের গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছে। আবহাওয়া ও বিরক্তিকর স্থিতি দুই 'নুইসেন্সে'র কথা মনে করিয়াই আবার বলিয়া উঠে, 'ভ্লাডী'। আর তাহার বিরসার জন্য প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য নাই। রাগের জ্বালায় জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে ফটকের বাহির হইয়া পড়ে, বিরসার বাড়ির দিকে ; কাছে পাইলে এখনই তাহাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। মারগামায় বিরসার বাড়ির দিকে ; মেঠো পথে কিছুদূর যাইতেই ধুরী গয়লার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়। ধুরী ঝুঁকিয়া সেলাম করে। ভালই হইল—আর এই কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে বেশিদূর যাইতে হইল না। ঝোঁকের মাথায় এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

'ধুরী, বিরসাকে দেখেছিস ?'

'হুজুর সে ক্ষেতের দিকে গিয়েছে হালবলদ নিয়ে—'

'বদমাসটাকে সায়েস্তা করতে হবে। তাকে আণ্টা-বাংলায় আসতে বলবি, জলদি, এখনই। বলবি আমি ডেকেছি।'

পূর্বাপেক্ষা বড় বড় পা ফেলিয়া বেঞ্জামিন ক্লাবে ফিরিয়া আসে। আবার গুলমোহর গাছটির নিচে অধৈর্য হইয়া তাহার প্রজা বিরসার ধৃষ্টতার কথা ভাবে ; এত সাহস ! একথা তাহারা কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। নীলের 'বটাইদার' ( বর্গাদার ) 'মালিকের' জন্য কাজ করিতে গাফিলতি দেখাইয়াছে, এমন কথা তাহারা কোনো দিন শোনে নাই। প্রত্যহই তো আর তাহাকে 'মালিকের' জন্য কাজ করিতে বলা হইতেছে না। আজ অন্য বটাইদারকে জমি দিয়া দিলে কাল ইঁদুরের মতো না খাইয়া মরিবে, দু'দশদিন মালিকের জন্য কাজ করিয়া দিতেই যত আপত্তি। এ অবাধ্যতা আমাকে অপমান করিবার জন্য। বিশেষ করিয়া ক্লাবের কাজে, পাবলিকের কাজে, এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অসহ্য ! 'কালে কালে হইল কি !' বিরসার পুত্রবধূ যে কাদা-মাটির যোগান দিতেছিল, সেই বা আসিল না কেন ? নিশ্চয়ই সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া আসে নাই। ইহার বিহিত করিতেই হয়। ইহাদের মধ্যে একজন আসিলেও কাজ চালানো যাইত।

ফোর্ট উইলিয়মের ভিতরের দোকান হইতে কেনা বুটের আঘাতে তরাইয়ের নরম মাটি খাবলা খাবলা উঠিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে বুটের টো দিয়া সে এক-আধটি দূর্বার গুচ্ছ, একেবারে খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইতেছে ;

কিন্তু এ শিকড়ের কি আর শেষ আছে—হাড়বজ্জাত নোটিভগুলোর মতো। এখনও আসিল না! ধুরী গয়লা আবার তাহাকে খবর দিল কিনা কে জানে? যদি না দেয়, তাহা হইলে আজ বিকালে ঘোড়ার চাবুক দিয়া তাহার হাড়মাস আলাদা করিতে হইবে। বার রুমটির চার হাত উঁচু দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে। সকাল হইতে কাজ আরম্ভ করিলে হয়তো বিকাল পর্যন্ত গাঁথুনীর কাজ শেষ হইয়া যাইতে পারিত।

খবর পাইয়া বিরসা ক্ষেত হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কয়েক গজ পিছনে আসিতেছে তাহার পুত্রবধূ। গেটের উপর বসিয়া ছিল গুল্‌টেন রাজমিস্ত্রী। সে তাহাদের শঙ্কাবিহ্বল জিজ্ঞাসুদৃষ্টির উত্তরে, ভিতরের গুগ্‌গুল গাছটির দিকে আঙুল দিয়া ইশারা করে। না জানি কি হইবে ভাবিয়া তাহারই বুক ঢিপ ঢিপ করে। নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্য, এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির গুরুত্ব হাল্কা করিবার চেষ্টা করিয়া একটি রসিকতা করে; 'বজ্ঞমন সাহেব রাগে পায়জামা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।' সে নিজেই এই কাষ্ঠ-রসিকতার সময়োপযোগিতায় সন্দিহান; বিরসার ইহা শুনিবার মতো মনের অবস্থা থাকিবার কথা নয়। গুল্‌টেন আগত বিপদের কথা মনে করিয়া বিরসার পুত্রবধূকে বলে, 'বোটরার মা, তুই আর ভিতরে যাস না।' বোটরার মা তাহার কথায় কান না দিয়া গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। যাই কি না যাই করিয়া গুল্‌টেনও অবশেষে কৌতূহল চাপিতে পারে না। কর্ণিক, সুতা, মাপকাঠি লইয়া পিছনে ঢোকে। সাহেব বাঘের মতো তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। প্রত্যাশিত আতংকে বিরসা থমকিয়া দাঁড়ায়—হাতজোড় করিয়া। সাহেব কোনো কথা না বলিয়া বেগুনী বোগনভিলার একটি ফুলভরা ডাল হেঁচকা টানে ভাঙিয়া নেয়। ডালের গায়ে বেলের কাঁটার মতো বড় বড় কাঁটা। তাহার পর বিরসার উপর যাহা চলে, বোটরার মা আর নিজের চোখে তাহা দেখিতে পারে না, হাউ-মাউ করিয়া সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিতে যায়। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সাহেবকে অসম্বদ্ধ কথায় বুঝাইয়া যায়, 'পাদরী সাহেব রবিবারে কাজ করতে বারণ করেছিলেন। তাই আমরা আসিনি। এমন জানলে কি পাদ্রীর কথা আমরা শুনি!' সে সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিতে যায়।

'হঠো, হঠ্ যাও।'

'এই বছর এই প্রথম জল হল কাল রাতে। তাই শ্বশুর হাল নিয়ে বেরিয়েছিল।'

'ওকালতি করতে কে বলচে? বাগো। অভী যাও।'

তাহার পর হাতকে বিশ্রাম দিবার জন্য থামে।

'কোন পাদ্রী সাহেব বলেছে? কালা পাদ্রী সাহেব বুঝি? রেভারেণ্ড টুডু? সে আমি আগেই বুঝেচি। বডম্যাস কাঁহাকা, দাঁড়াও সোজা হয়ে। গুল্‌টেন নিয়ে আয় খানকয়েক ইট। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়া। গুল্‌টেন, দে ওর মাথায় ইট ক'খান চাপিয়ে। স্যাবাথ ডে-তে ক্ষেতে কাজ করলে দোষ হয় না। পাদ্রী সাহেব বলেছিল। পাদ্রী সাহেব! মোটে ছয়খানা ইট?'

গুল্‌টেন চমকিয়া উঠে।

'এই আওরৎ, আরও দুখানা ইট নিয়ে আয়।'

বোটরার মা শ্বশুরের মুখের দিকে তাকায় না। তাকাইলেও প্রবহমান

অশ্রুর ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাইত না। ইট দুইখানি যখন তাহার শ্বশুর তাহার হাত হইতে নেয়, তখন দুইজনেরই হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

বিরসা ইট দুইখানিকে আগেকার ছয়খানি ইটের উপর সোজা করিয়া বসাইতে পারে নাই। সাহেব ইংরাজিতে অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে সেগুলি নিজ হাতে ঠিক করিয়া সাজাইয়া দেয়। তাহার পর ফুঁ দিয়া হাতের সুরকি উড়াইয়া রুমালে হাত মোছে। বোটরার মা আর গুল্‌টেনকে বলে, 'যাও, আজ আর কাজ হবে না।' বোটরার মা ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া আঙুল দিয়া গেট দেখাইয়া দেয়।

'ঝাও। ঝলডী!'

এ আদেশ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তরাইয়ের লোকের নাই।

তাহার পর বেঞ্জামিন বাড়ি যাইবার সময় মুনিলাল মার্কারিকে বলিয়া যায় যে, সে দুইটার সময় খাইয়া দাইয়া আসিবে। বিরসাকে দেখাইয়া বলে, 'এই কুকুরীর বাচ্চাটির উপর নজর রাখিও।'

গেট হইতে বাহির হইয়া পথে তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়। ফেলিসিয়ার স্মৃতি রাগের আগুনে ছাই হইয়া গিয়াছিল। ফিনিক্সের মতো তাহার আমেজ আবার জাগিয়া উঠে। হঠাৎ দেখে জামগাছটার নিচে বিরসার পুত্রবধু। শ্বশুরকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া তাহার বাড়ি ফিরিতে মন সরে নাই। গায়ের কাপড় সামলাইয়া বোটরার মা গাছের গুঁড়ির আড়ালে যাইতে চেষ্টা করে। বেঞ্জামিনও এমনভাবে চলিয়া যায় যে সে যেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই। বেঞ্জামিন বোঝে যে এখনই হয়তো বোটরার মা আবার ক্লাবের গেটে পেঁৗছিবে। বেশ বাঁধুনি তাহার শরীরের। ঘর্মমসৃণ দেহে কালো মার্বেলের কাঠিন্য। ফেলিসিয়ার দেহে স্বাস্থ্যের এ প্রাচুর্য কোথায়; কিন্তু ফেলিসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া কি হইবে। ফেলিসিয়া ফেলিসিয়া। আবলুস ভাল নয় তাহা কে বলিবে, কিন্তু আইভরি অন্য জিনিস; অন্য শ্রেণীর জিনিস। ইহা রাত্রি ও দিনের মধ্যের তফাত, অন্তর ও বাহিরের মধ্যের পার্থক্য।...

বুধনগড়ের রাজাসাহেবের কুকুরের খুব শখ। সম্প্রতি বিলাত হইতে একটি চালান আসিয়াছিল। কয়দিন হইল গরমের জন্য তাহাদের দার্জিলিং পাঠানো হইয়াছে। কুকুরের দেখাশুনা করিবার জন্য রাজাসাহেব বিলাত হইতে লোক আনিয়াছেন। সেই টার্নার সাহেব আর রাজাসাহেব দার্জিলিং যাইতেছেন। এখান হইতে দার্জিলিং যাইবার পথে রাজাসাহেবের কয়েকটি নিজস্ব ডাকবাংলো আছে। সেখানে গাড়ির ঘোড়া বদল করা হয়। বুধনগড় হইতে এখানে আসিয়া প্রথম ঘোড়া বদল করা হইয়াছে। পথের দুধারে জঙ্গল বলিয়া রাজাসাহেব বলেন যে, দিনে দিনেই যাওয়া ভাল। সন্ধ্যার সময় ডিংরার কাছের কুঠিতে থাকা যাইবে। হঠাৎ সংগীতজ্ঞ মোসাহেব বলদেও ঝা আসিয়া খবর দেয় যে, 'জনি ওয়াকার' শহরে পাওয়া গেল না। রাজাসাহেব অন্য কোনো ব্রাণ্ড পছন্দ করেন না। তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠে। তাহা হইলে রওনা হওয়া চলে না।

'বলদেও, যাও তুমি ভাগলপুর, এখনই। সেখান থেকে নিয়ে এসো, তারপর রওনা হওয়া যাবে।'

টার্নারকে এ কথা জানানো হয়।

'এর অজস্র বোতল আমি ইউরোপীয়ান ক্লাবে দেখেছি। ডোণ্ট ওয়্যারি র‍্যাজা সাহাব। চলুন, এখুনি রওনা হওয়া যাক। পথে ক্লাব থেকে দু-চার বোতল নিয়ে নিলেই হবে।' রাজাসাহেব মুখে পান জর্দা গুঁজিয়া, চাকরকে কুলকুচা করিবার জল আনিতে বলেন। কুঠিতে আবার যাত্রার আয়োজনের সাড়া পড়িয়া যায়।

বোটরার মা শ্বশুরের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাহেব চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে গেটের নিকটের কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসিয়া রহিয়াছে। গেটের গায়ের বোগনভিলার লতাটি ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়ার উপর দিয়া দেখা যাইতেছে। কি চণ্ডাল এই লতার কাঁটাভরা ডালগুলি। কি যে না দেখিতে ফুলগুলি! কি জন্য যে সাহেবরা এ গাছ পোঁতে বোঝা দায়। ওদের ধরনই বোঝা শক্ত। কি মারই সাহেব বিরসাকে মারিয়াছে। ভুট্টা পেটায় না। সাহেবরা এ ফুলের গাছ পোঁতে বোধহয় বটাইদারদের মারিবার চাবুক তৈয়ারি করিবার জন্য। এ কথা তাহার মনে এতদিন উঠে নাই কেন, তাহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য হয়।

ক্লাবের ঝাড়ুদার ঝুড়িতে করিয়া কম্পাউণ্ডের ভিতর হইতে আবর্জনার রাশি আনিয়া কিছু দূরের একটি গর্তে ফেলিতেছে। গর্তের ভিতর হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। বোটরার মা প্রতিবারেই ঝাড়ুদারের নিকট হইতে শ্বশুরের সম্বন্ধে দুই একটি খবর লইবার কথা ভাবে। সাহসে আর কুলায় না। একবার জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিল।

'এই আস্তে কথা বল। ঐ আগুনের কাছে বোস'—ঝাড়ুদারের কথায় সহানুভূতির আভাস পাইয়া বোটরার মা নিশ্চিন্ত হইয়া পাতাপোড়ানোর গর্তের ধারে বসে। প্রতিবার আবর্জনার ঝুড়ি লইয়া আসিয়া ঝাড়ুদার দুই চারিটি কথা বলিয়া যায়, একসঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলিবার সাহস নাই।

'ঐ মুনীলাল জানতে পারলে রক্ষা নেই। সাহেবকে বলে দেবে যে আমিই তোকে এখানে বসতে দিয়েছিলাম। ও শালা সাহেবের সঙ্গে খেলে কি না, তাই নিজেকে লাটসাহেব মনে করে। ওকে মুনীলাল বললে চটে যায়। এই 'দুসাধীনে'র বেটাকে আবার মার্কার বলতে হবে।'

একবার আসিয়া বলে, 'বিরসাকে বললাম যে, দে চারখানা ইট নামিয়ে রেখে দি; মার্কার সাহেব বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল শনিবারের রাতে সাহেবদের খুব প্রসাদ পেয়েছে কিনা খেলার সময়। ওর ঘুম ভাঙলে ফের উঠিয়ে দেবো'খন। তা সে রাজী হল না। বললো, সাহেব সাজা দিয়েছে, তার নিমক খাই। ইমানের কাছে ঝুঠা হতে পারব না। সুরুজ মহারাজ দেখছেন, ঝুঠা হলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে না। নে যা ইচ্ছে কর। ঘামের তো নদী বইছে। চোখ দুটোও তো এত লাল হয়েছে যে, এক পোয়া ভাং খেলেও অমন হয় না।'

'আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করছিল নাকি। আমার কথা, বোটরার কথা?'

'না!'

'আমাকে একবার ভেতরে যেতে দেবে? মার্কার সাহেব ঘুমুচ্ছে।'

'সাধ দেখে আর বাঁচি না। আমার এই চাকরি করে বালবাচ্চাকে খাওয়াতে হবে কি না? তোকে এখানে বসতে দেখেও বারণ করিনি এই খবর জানতে পারলেই তো সাহেব আমাকে বরখাস্ত করবে।'

তাহার পর কৃত্রিম কঠোরতার মুখোস ফেলিয়া বলে, চল্ ভেতরে। কয়েক ঝুড়ি মাটির ঢেলা নিয়ে আসবি। আর আনবি টিনটা। এই বাইরে বসে মাটি ভাঙার কাজ কর। কাদা করে রাখ। দুপুরে সাহেব এসে খুশি হবে। ও দেখিস দুপুরে নিশ্চয়ই আবার গুলটেনকে ডেকে কাজে লাগাবে, তোরও এখানে থাকার অছিলা থাকবে। আমাদেরও ভয়ের কিছু থাকবে না।'

বোটরার মা কয়েকবার ভিতরে গিয়া মাটির চাঙড় ঝুড়িতে করিয়া লইয়া আসে। কাজের অছিলায় বারে বারে যায়, একবার টিন আনিতে, একবার মাটি ভাঙিবার জন্য বাঁশের ডাণ্ডা আনিতে। বহু দূরে দেখে বিরসা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পিছনদিক দেখা যায়। সূর্য মাথার উপর হইতে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে; সেও সেইজন্য ওই দিকে মুখ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দিকে ফিরিয়া থাকিলে হয়তো ইশারায় কিছু কথা বলা যাইত। ইটের বোঝার ভারে, সাদাচুলে ভরা বিরসার মাথা মনে হইতেছে কাঁধের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

বোটরার মা গেটের বাহিরে আসিয়া মাটির ঢেলা ভাঙিতে বসে। বোটরাটাই বা এতক্ষণ কি করিতেছে কে জানে। সে বুড়োর এই অবস্থার কথা জানিতে পারিলে কাঁদিয়া-কাটিয়া আকুল হইবে। সে তাহার বাবাকে দেখে নাই। বোটরা যেবার হয়, সেইবারই তাহার বাবা সেই যে বেলী সাহেবের আসামের চা-বাগানে চলিয়া যায় আর ফেরে নাই। লোকে বলে বোখারে মরিয়া গিয়াছে, না হয় সে দেশের মেয়েরা যাদু করিয়া তাহাকে ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। শ্বশুর তাহাকে বলিয়াছিল---ও হারামজাদার কথা ভাবিস না। তারপর হইতে সে তাহার মৃতদার শ্বশুরের সংসার করিয়া আসিতেছে। কত স্থান হইতে কত খৃষ্টান 'ওরাওঁ' ছেলে, তাহার পুনর্বিবাহের প্রস্তাব আনিয়াছে। নীলগঞ্জ হইতে তাহার বাপের বাড়ির লোকেরা এই বিষয় লইয়া কত আনাগোনা করিয়াছে। কিন্তু বুড়োর ও বোটরার কথা মনে করিয়া সে তাহাদের সমাজের রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস করিয়াছিল।—নিজের খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা আছে। বুড়ো আর দশ বছর বাঁচিলেই ততদিনে বোটরা হাল ধরিতে শিখিয়া যাইবে। ভারি বুদ্ধি ছেলেটার। এখন থেকে রোজগারের দিকে ঝোঁক। এখনও বুঝি লাল গির্জা হইতে ফেরে নাই। প্রতি রবিবার সকালে সেখানে বেলী সাহেবের ঘোড়া পাহারা দেয়। বেলী সাহেব প্রতি সপ্তাহে তাহাকে এইজন্য চারিটা করিয়া পয়সা দেয়। সে তাই দিয়া খুকশীবাগের হাটের দিন কত খাবার জিনিস কেনে। মা'র আর ঠাকুর্দার জন্য কিন্তু আলাদা করিয়া রাখা চাই। বেলী সাহেব যদি কয়েক বছর পরে বোটরাকে নিজের নীলকুঠিতে কাজ দেয়।···বঞ্জমন সাহেব যাইতে দিলে তবে তো।--

ঐ বোটরা আসিতেছে। কি করিয়া খবর পাইল। ধুরী কিম্বা গুলটেন বলিয়াছে বোধহয়। গাঁয়ে কি কোনো খবর চাপা থেকে—খবর হাওয়ায় ওড়ে। আমরা এখানে আসিবার আগেই দেখি সকলে জানে যে, সাহেব আজ চটিয়াছে।

বোটরা আসিয়া বিরসার কথা জিজ্ঞাসা করে।

'ভিতরে কাজ করছে।'

'তুমি বাইরে কাজ করছ কেন?'

'চুপ করে থাক্। সব খোঁজে দরকার এতটুকু ছেলের।'

বোটরা চুপ হইয়া যায়। গর্ত হইতে যেখানে ধোঁয়া উঠিতেছে, সেখানে গিয়া বসে। একটি সুন্দর কাঁটাওয়ালা লতার ডাল আবর্জনার উপর রহিয়াছে। তাহাতে এখনও আগুন লাগে নাই। অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া উহাকে টানিয়া বাহির করে।

মা দেখিয়া বলে—'ওটা আবার নিয়েছিস কেন? ফেলে দে আগুনে।'

'চাবুক করব এ দিয়ে!'

'কাঁটাওয়ালা চাবুক করে নাকি?'

'ঘোড়া তো আর মারব না এ দিয়ে।'

কে এই ছেলের সহিত বসিয়া তর্ক করে। ভাগ্য ভাল যে এখনও খাওয়ার কথা মনে পড়ে নাই। তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল। সবুজ রঙের 'বেলা বাড়ার পাখিগুলি' একঘেয়ে হুক হুক শব্দ করিয়া চলিয়াছে। নিশ্চয়ই বেলা অনেক হইয়াছে। বুড়োর অবস্থা ভাবিয়া তাহার চোখে জল আসিয়া যায়।

ক্লাবের সম্মুখে রাজা সাহেবের প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়িটি আসিয়া দাঁড়ায়। বোটরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখে; কি তেজী ঘোড়া! বেলী সাহেবের ঘোড়ার চাইতেও ভাল।

অদ্ভুত মুখ কালো কুকুরটির; বাঁদরের মতো নাক থ্যাবড়া। কেমন সুন্দর লাল পোশাক—কোচম্যান, সহিসের। দেখিলে ভয় করে। সে যদি ঐ কোচম্যানের মতো জোরে, খুব জোরে অনেক দূরে ঘোড়া চালাইতে পারিত। একেবারে উড়িয়া চলিয়াছে ঘোড়া কেবল চাবুকের শব্দে, চাবুক মারিবার দরকার হইবে না···। কিন্তু সাহেব যদি রাগ করে—

রাজাসাহেব গাড়িতেই বসিয়া রহিলেন। ক্লাবের ভিতর যাওয়া বারণ না হইলেও হয়তো এইরূপেই বসিয়া থাকিতেন। টার্নার সাহেব গাড়ি হইতে নামে। বোটরার মা এক মনে কাজ করিতেছে; কোন্ সাহেব কে জানে। গুঁড়ো মাটির মন্দিরের চূড়ায় হাত দিয়া গর্ত করিয়া টিন হইতে জল ঢালিয়া দেয়। টার্নার সাহেব দেখিতে দেখিতে যায়। মাটির ঢিবির উপরটা জল ঢালিবার পর আগ্নেয়-গিরির ক্রেটারের মতো লাগিতেছে। funny! বসুন রাজাসাহেব, আমি এক মিনিটের মধ্যে আপনার জিনিস নিয়ে এলাম বলে; কাম অন জিমি। সাহেব শিস দিতে দিতে কুকুরটিকে লইয়া ক্লাবের গেটের ভিতরে ঢোকেন।

রাজাসাহেব কাশীর পান-জর্দা মুখে ফেলিয়া আবার নড়িয়া চড়িয়া বসেন। রাজ্যের ভাবনা চিন্তা তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে—বলদেও আবার সাহেবকে দাম দিতে ভুলিয়া যায় নাই তো—

হুড়মুড় করিয়া কি যেন পড়ার শব্দ হয়।

টার্নার সাহেব আর কেরানীবাবু ক্লাবের অফিস ঘরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে। একজন লোক মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে; একরাশ ইটের বোঝা ইতস্ততঃ ছড়ানো। মুনীলাল মার্কার চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দৌড়িয়া আসে। ঝাড়ুদার আসিয়া চেঁচামেচি আরম্ভ করে—'বিরসা, এই বিরসা'। বিরসা সাড়া দেয় না। 'আচ্ছা লোক তো।' অচৈতন্য বিরসার নাক দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া একখানি ইটের নিচে জমিতেছে। ইটখানির গায়ে রক্ত চাপ বাঁধিয়া কালো হইয়া উঠিল।

টার্নার সাহেব, কেরানীবাবু, মার্কার মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বিরসাকে সারি

সারি ইজি-চেয়ার পাতা বারান্দায় তোলে। কালেক্টর ভার্নেডি সাহেব নিশ্চয়ই সদরে নাই—থাকিলে এতক্ষণ ক্লাবে আসিত, বিয়ার টানিবার জন্য। টার্নার সাহেব ঝাড়ুদারকে পাঠায়—সিভিল সার্জন ও ছোট বেঞ্জামিনকে ডাকিতে। মার্কারিকে চোখে মুখে জল দিতে বলে। তাহার পর ক্লাবে নগদ দিয়া কয়েকটি বোতল লইয়া কেরানীবাবুকে গাড়িতে পেঁছাইয়া দিতে হুকুম করে।

'কাম অন জিমি!'

বিরসার আর জ্ঞান হয় নাই।

রেভারেণ্ড টুডুর অনুরোধে বুড়ী বেঞ্জামিন বিরসার কবরের উপরের প্রস্তরফলকের খরচ দেন। যত দোষই থাকুক না কেন, আফটার অল বিরসা ছিল ক্রিস্টিয়ান। তাহার নাতি বোটরার হাতে মেমসাহেব একটি টাকা গুঁজিয়া দেন মিঠাই খাইবার জন্য। কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বোটরার মা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

বুড়ী মেম তাহাদের কুঠির আউটহাউসে বোটরা আর বোটরার মা'র থাকিবার জায়গা করিয়া দেয়। সেখানে সারি সারি ঘর ধোপা, আর্দালী, বাবুর্চি সহিস, কোচম্যানের জন্য। তাহারই মধ্যের একটি ঘর বোটরার মা পায়। কেই বা তাহাদের জমি দেখিবে; তাই সাহেব তাহাদের জমি দুল্লা মাঝিকে দিয়া দেয়।

মানুষ বদলায়। ফেলিসিয়া টমসন পাথর নয়। তাই বদলাইয়াছে। টার্নার সাহেবের খাস বিলেতে বাড়ি। তাহার সহিত বেঞ্জামিনের তুলনা! কোথায় ব্রিস্টল শহর, আর কোথায় মারগামা কুঠি।

বোটরার মা ছিল পাথর। সেও বদলাইয়াছে। সময়ে কিনা হয়। বুড়ো বেঞ্জামিন মারা যাইবার পর ছোট বেঞ্জামিন বোটারকে বলে 'নোকরী করোগে, রোজগার?'

বোটরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়। সাহেব বলে—'চালাক ছোকরা। ক্লাবে টেনিস বল কুড়াইবার ও ছোটখাটো কাজকর্ম করিবার চাকরি সে পাইয়া যায়। সেখানেই থাকিবার ব্যবস্থা হয়! ইহা লইয়া ক্লাবের সহকর্মীদের ঠাট্টার অর্থ সে বুঝিতে পারে না। কেবল এটুকু বোঝে যে, সাহেব কোনো মতলবে তাহাকে কুঠির ঘর হইতে সরাইয়া এখানে স্থান দিয়াছে, ইহাই বিদ্রুপের ইঙ্গিত।

এরূপ কত নীরব আর্তির বিচ্ছিন্ন কাহিনী, কত জলুসের নাগরদোলার আবর্ত মিলাইয়া ইহার পরের আণ্টা-বাংলার ইতিহাস। তরাইয়ের ভিজামাটির কালা আদমীর এ সবই সহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রতিবাদ জানাইল কালো কয়লা—তাও এখানের নয়, জার্মানীর। তাহার পর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। এই প্রতিবাদের সংঘাতে নীল কাচের জার হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়ে অজ্ঞাত-জগতের একখণ্ড,—উদার উন্মুক্ত আলোকে।

দুষ্টক্ষত শুখাইলে কি আর মাটি সেখানে থাকে? ঘোড়াপাগল বেলী সাহেব কুঠি বেচিয়া অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া যায়। তামাকখোর লিউইস সাহেব যায় কুমায়ুনে—ফুলের বাগান করিতে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগে শ্রীরামপুরের যে পামার্স ব্যাংকের নোট

চলিত, তাহাদের বংশের টেডি পামার্স সরসোনীবিজনিয়ার কুঠি নিকাশ করে। তাহার পর যে গয়লার মেয়েকে ক্রীশ্চান করিয়া বিবাহ করিয়াছিল, তাহাকে লইয়া কলকাতায় চলিয়া যায়। আরও কে কোথায় চলিয়া যায়, কে তাহার হিসাব রাখে। তাঁহাদেরই হিসাব রাখা যায়, চলিয়া যাইবার পূর্বে যাঁহারা ঘটা করিয়া টিকিট মারিয়া কুঠির জিনিসপত্র, ছবি নিলাম করিয়া যান।

গীর্জাগুলির সম্পত্তি বাড়িয়া ওঠে। জেলার উকিল মোক্তারের গৃহে সাহেবদের কুঠি হইতে কেনা, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবর্জনা জমিয়া উঠে। আণ্টা-বাংলা অনাবশ্যক ফার্নিচারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

এই অর্থহীন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে বোটরা বড় হইয়া উঠে। প্রত্যহ সকালে ফাদার টুডুর কাছে যায়। পাদরী সাহেবের স্ত্রী তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন—'বোটরা তোর মা'র কাছে যাস না ?'

'সাহেবের কুঠিতে তো আণ্টা-বাংলার কাজে হরহামেশা যেতে হয়।'

পাদরী সাহেব চোখ টিপিয়া স্ত্রীকে ইশারা করেন—এ প্রসঙ্গ থামাইয়া দিতে।

বলেন—'আজ মে মাসের হল তিন তারিখ। তোমার ঠাকুরদার মরার তারিখ আঠারই, না ? ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। আর মাত্র পনের দিন বাকি। সেদিন সকালে কিছু খেয়ো না। পবিত্র মনে বিরসার কবরের উপর ফুল দিতে হবে। আর প্রার্থনা করতে হবে।'

বোটরা বোঝে যে, ফাদার তাহার মা'র প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন, তা-ও সে জানে। রাজ্যসুদ্ধ সবাই জানে, আর সে জানিবে না ? তবে তাহার সঙ্গীদের মধ্যে, আর কেহ ইহা লইয়া মাথা ঘামায় না। পাদরীগিন্নীর এ বিষয়ে এখনও এত কৌতূহলে সে সংকুচিত হইয়া যায়। মা'র সহিত দেখা তাহার আর হয় না বলিলেই হয়। দুই একদিন দেখা হইলে তাহার মাথায় তেল এবং পরনে রঙিন শাড়ি দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে, সে বেশ সুখেই আছে।

নীল চশমা খোলার পরও চোখে অনেকক্ষণ রঙের রেশ থাকে। মোবার্লি, বেটিস, জনস্টন কীভের দল গ্রামের কুঠি ছাড়িয়া সদরে আসিয়া বাসা বাঁধে, কিন্তু চোখে তাহাদের তখনও পুরাতনেরই আমেজ। নীলের চাষ গিয়াছে, কিন্তু জমি তো যায় নাই। রাতারাতি তাহারা পাইতে চায় বনেদী জমিদারের আভিজাত্য। টমটমে চড়া মোবার্লি সাহেব নিজেদের পরিবারকে গড়মোগলাহার কুমার সাহেবের পরিবারের সমান মনে করে। বুধনগড়ের রাজাসাহেবকে নেপাল সরকারের মোরঙ্গের রিজার্ভ ফরেস্টে প্রতি বৎসর শিকারের অনুমতি দেওয়া আছে। বেটিস সাহেবেরও এ অধিকার চাই। মোরঙ্গ জেলার বড়াহাকিমের নিকট হইতে তাঁহার দরখাস্তের জবাব আসে না। রামবাগের রাস্তার সারি সারি নূতন বাংলো ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠে; আর নূতন ধনীর উদ্দণ্ডতা লইয়া বাড়িয়া উঠে। চিরনবীন আণ্টা-বাংলা ক্লাবে জমিয়া উঠে অহোরাত্র উৎসব। সময় নাই, অসময় নাই, অষ্টপ্রহর ভিড় লাগিয়াই আছে। নীলের কাজ বন্ধ, কিন্তু কাহারও এক মিনিট নিঃশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই! ক্লাবের মিনাবাজারে স্টল খুলিবার ব্যবস্থা, বলনাচের পোশাক তৈয়ারি, নাচের মহলা, চাকাওয়ালা জুতা পরিয়া বায়ুগতিতে ছুটিবার অভ্যাস, কাজের কি অন্ত আছে ? আণ্টা-বাংলার পিছনের মাঠের মধ্যে উঁচু করিয়া মাটির ঢিবি প্রস্তুত হইয়াছে;

এই চাঁদমারীতে বন্দুকের নিশানায় হাত মক্স করা হয়। তালের ডেঙ্গার একদিক সরু করিয়া বোটরা মাঠের মধ্যে হাতুড়ি দিয়া ঠুকিয়া খোঁড়া কবরের সিঁড়ির ধাপে-ধাপে, নিজের ট্রাকে করিয়া আনা ইঁটের পথে, সে আগাইয়া চলিবে—'বোখারে'র রাজ্যে, বেলী সাহেবের চা বাগানের রাজ্যে, যাদুকরীদের স্বপ্নরাজ্যে। বর্ষায় পোড়া ঘাসগুলির গোড়া হইতে আবার শ্যামল সতেজ ঘাস বাহির হইবে। কিন্তু সে তখন কোথায়! আজ তো সে নেশা করে নাই। তবে এত বাজে কথা কেন মনে আসিতেছে। তাহার সর্বশরীর থর থর কাঁপিতেছে। সব পেশী ও শিরা দব্ দব্ করিতেছে। কাপ্তেন পুলের রেলিং মনে হইতেছে, পলায়মান সাপের তীব্র বিসর্পিল গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাকুড়গাছের পাতা অজস্র সাপের জিভের ন্যায় লিক্‌লিক্ করিয়া কাঁপিতেছে। পিচগলানোর চুল্লীটিও সজীব হইয়া চোখের সম্মুখে নাচিতেছে। ঘোড়ায় চড়া বেলী সাহেব, চশমাপরা ফাদার টুডু, ঠাকুর্দা বিরসা, ছোট বেঞ্জামিন, মার্কার সাহেব, কেরানীবাবু, আণ্টা-বাংলার ভাঙা দেওয়াল, বোগনভিলির গাছ, অজস্র স্মৃতির প্রেতাত্মা তাহার স্টিয়ারিং হুইলের ভিতর দিয়া ঘূর্ণবাত্যার মতো চলিয়া যাইতেছে। অসংখ্য জোনাকির অস্থির দীপালী, স্বচ্ছনীল জ্যোৎস্নার রাজ্য পিছনে ফেলিয়া সে চলিয়াছে। পথের লাল-কালো, রৌদ্রের ঝলক, পাকুড়গাছের সবুজ, অসংখ্য জোনাকির ঝিকিমিকি, ঘুরপাক খাইয়া কেমন যেন সব জট পাকাইয়া যায়। স্টিয়ারিং হুইলের উপর তাহার মাথা ঢলিয়া পড়ে। ক্লীনার চিৎকার করে 'সমহালকে ভাইয়া, মদ না খেয়ে ঢুলুনি আসছে নাকি? এই এই ঠিক করে ধর।' আট-টান রোলার, মড়মড় করিয়া ইঁটের বর্ডার চূর্ণ করিয়া, সজোরে পথের ধারে পাকুড়গাছটিতে ধাক্কা দেয়। বোটরার স্পন্দনহীন দেহ ছিটকাইয়া পথের উপর পড়ে।

পশ্চিমা হাওয়ায় আণ্টা-বাংলার ইঁটের গুঁড়া উড়িয়া দিগন্তে মিশিয়া যায়। সঙ্গে উড়াইয়া লইয়া যায় ইগুয়ানোডনের যুগের মতো এক যুগের স্মৃতির অবশেষ। রাখিয়া যায় তরাইয়ের নূতন জীবনের জয়যাত্রার রাজপথ—মসৃণ কালো দেহে; নবপ্রসূতের রক্তলেখা। গত যুগের সাক্ষী পাকুড়গাছটির কাণ্ডের ক্ষত হইতে রস ঝরিয়া পড়ে, নূতন মাঙ্গলিক বসুধারার মতো।

পীরুমল কণ্ট্রাক্টর গোনে 'এক, দো, তিন, চার, পান, ছে, সাত, আঠ।'—আটখানি ইঁট বদলাইয়া নূতন করিয়া গাঁথিতে হইবে।

## ষড়যন্ত্র মামলার রায়

সরকার বাহাদুর

বনাম—

(১) অরুণকুমার দে
(২) ভুবনেশ্বর প্রসাদ
(৩) কর্তার সিং
অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ (৪) শেখ ইদ্রিস
(৫) ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী
(৬) কপিলেশ্বর মাথুর
(৭) মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদা

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের ধারা, সরকার বাহাদুরের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের ভিতর অসন্তোষ প্রচারের ধারা, সশস্ত্র ও হিংসাপূর্ণ উপায়ে বর্তমান সরকারের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টার ধারা, প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইনের শান্তিভঙ্গের প্রচেষ্টার ধারা এবং ডাকাতির ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে, অভিযুক্ত হইয়াছেন।

এই রোমাঞ্চকর মোকদ্দমা ইতিমধ্যেই আন্তপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রমামলা নামে প্রেস ও পাবলিকের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সারা দেশ ইহার রায় শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে। ফাটকা বাজারে ভদ্র জুয়াড়ীরা মামলার ফলাফলের উপর বাজি রাখিয়াছে, এরূপ খবরও 'দৈনিক দেশবার্তা'র সম্পাদকের ( সরকারী সাক্ষী নং ৪৭ ) জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ণ ছেষট্টি কার্যদিবস এই মোকদ্দমা চলিয়াছে। একশ তেরোজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের কৌঁসিলিগণই যোগ্যতা ও পদোচিত নিষ্ঠার সহিত কোর্টকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অকুণ্ঠ পরিশ্রমের জন্যই এই মামলা এত সত্বর শেষ করা সম্ভব হইয়াছে।

কোর্টের নথীতে প্রাপ্ত উপকরণ হইতে অবান্তর প্রসঙ্গাদি বাদ দিলে সরকারের কেস সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়।—

অভিযুক্তরা সকলেই 'অগ্রণী রক্তবিপ্লব দল' নামক একটি রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই দলের উদ্দেশ্য সশস্ত্র আক্রমণ দ্বারা গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করা। এই দুর্বৃত্তদের বর্তমান কার্যসূচী, দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর শান্তিকামী নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও ঘৃণার ভাব উদ্দীপ্ত করা, কপর্দকহীন ভিক্ষুকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করা, অপরিণতবয়স্ক সরলমতি বালকবালিকাদিগকেও রোমাঞ্চকর পুস্তিকাদি পড়িতে দিয়া কুপথে লইয়া যাওয়া। এই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নারীর সম্মান রাখিতে জানে না, আমাদের নিজস্ব প্রতিভা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সকলপ্রকার নৈতিক মানের মূলোচ্ছেদ করিতে চায়। স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ অফিসারের ( সরকারী সাক্ষী নং ১৩ ) বহুল তথ্যপূর্ণ সাক্ষ্য এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ গত ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় 'টাউন হল'-এ সশস্ত্র বিপ্লব করিয়া, গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। পরে আন্দাজ সাড়ে ছয়টার সময় সম্মুখস্থ পার্কে ষড়যন্ত্র কার্যান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে বিপদ কূটচক্রান্তে যোগদান করে।

ফার্স্ট-ইনফরমেশন-রিপোর্ট দায়ের করিয়াছিলেন মৌলবী নবী বক্স, জেলা-খাসমহল-অফিসার ( সরকারী সাক্ষী নং ১ )। তাঁহার সাক্ষ্যে প্রকাশ যে গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার পত্নী সমভিব্যাহারে পার্কে বেড়াইতে আসিয়াছেন। মেদবাহুল্য রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ডাক্তার তাঁহার স্ত্রীকে উন্মুক্ত বায়ুসেবন করিতে বলিয়াছেন। সেইজন্য সন্ধ্যার অন্ধকারের পর তিনি ঐ পর্দানশীন ভদ্রমহিলাকে পার্কে আনিয়া ছিলেন। তাঁহারা পার্কে ঢুকিতেই, কয়েকজন লোক প্যার্কের গেট হইতে বাহির হইয়া সম্মুখের টাউন হলে প্রবেশ করে। টাউন হলের দরজাগুলি বন্ধ ছিল। দরজা খুলিয়া তাহারা ভিতরে ঢোকে। লোকগুলি অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশই বা করিল কেন, আর ভিতর হইতে দরজা বন্ধই বা করিয়া দিল কেন, তাহা এই

দম্পতিকে বিশেষ সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে। স্বতঃই তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে ইহারা কোনো গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতেছে না তো? তাহার উপর আবার শীঘ্রই একটি তছনছ কাণ্ড ঘটিবে, এইরূপ আভাস এতদিনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ স্পেশাল-ব্রাঞ্চ-বিভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়াছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ গোপনীয় ছাপ দেওয়া চিঠিতে, জেলার সব অফিসারদের চোখ ও কান খুলিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে লোকগুলি টাউন হলে ঢুকিয়াছিল, পথের আবছা আলোতে দূর হইতে তাহাদিগকে স্কুল-কলেজের ছাত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল। মুহূর্তমধ্যে তাঁহারা বুঝিয়া গেলেন যে ইহা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান মহবুবের জন্য তাহার মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন;—সে আবার ঐ দলের মধ্যে নাই তো? কিছুদিন হইতে তাহারও রকম-সকম ভাল বলিয়া মনে হইতেছিল না। ইনকিলাব, বিপ্লব, সংঘর্ষ, লড়াই প্রভৃতি কথায় ভরা কতকগুলি চোতা কাগজ-পত্রিকাদি তাহার পড়ার টেবিলের উপর কিছুদিন হইতে দেখা যাইতেছিল! মহবুবের মাতার আগ্রহাতিশয্যে সাক্ষী নবী বক্‌সকে তখনই পুত্রের খোঁজে টাউন হলে যাইতে হয়। একদল গুপ্তচক্রান্তকারীদের মধ্যে যাইতে তাঁহার বেশ ভয় ভয় করিতেছিল, কিন্তু পত্নীর সম্মুখে তিনি তাঁহার এই মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা টিপিয়া টিপিয়া টাউন হলের বারান্দায় উঠেন। সেদিন কনকনে উত্তরে বাতাস বহিতেছিল। পার্কের দিকে মহবুবের মাতা ছাড়া জনপ্রাণীও আছে বলিয়া মনে হইতেছিল না। নবী বক্‌সের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল,—শীতে নয়; বিপদে পড়িয়া চিৎকার করিলেও কেহ সাহায্য করিতে আসিবে না এই ভাবিয়া। সাবধানের মার নাই; তিনি মাথা ও কান ঢাকিয়া মাফলারটি গালপাট্টার মতো করিয়া জড়াইলেন। দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল না। দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরের ব্যাপারটি কি তাহা দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

—অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না; একজন প্রাণের আবেগে ওজস্বিনী ভাষায় কি সব যেন বলিতেছে; বোধ হয় দলের পাণ্ডা হইবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কান পাতিয়া কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিলেন। সব পরিষ্কার শোনা যায় না। তবু যেটুকু শোনা গেল…

'এদের জাতকে নির্মূল করে দিতে হবে। এই রক্ত-শোষকের দল তিলে তিলে আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এই রক্তবীজের ঝাড় কবে, কি করে বিতাড়িত হবে! আপনারা বোধ হয় জানেন যে পৃথিবীর কতকাংশ থেকে এদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে সেখানকার লোকের চেষ্টায়। তারা এই ঘৃণ্য পরভুকদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কোনো বাধা তাদের সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে টিঁকতে পারেনি। কিন্তু আমাদের দেশে কি তা সম্ভব হবে? কেন হবে না! 'পারিব না' এ কথাটি কেবল কাপুরুষদের অভিধানেই পাওয়া যায়। অপরেও যা পেরেছে, আমরাও তা পারব না কেন। এ কাজের জন্য চাই ত্যাগ, চাই সংগঠন, চাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, চাই প্রচার, চাই অর্থ,—আর চাই সমাজের মণি, নির্ভীক অক্লান্তকর্মী তরুণের দল, যারা মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছে। এ সংঘর্ষে অহিংসার স্থান নেই। চিরবৈরী রক্ত-শোষকদের রুধিরে আপনার হাত রক্তরঞ্জিত

হয়ে যাক ; প্রধূমিত গন্ধকের ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠুক ; তাতে পশ্চাদপদ হলে চলবে না। দেশমাতৃকা এই রক্তপাতে, বহুৎসবে সন্তুষ্টই হবেন। আপনারা বোধ হয় জানেন যে রোমের ক্যাপিটলের ভিত্তিপ্রস্তর নরবলির রক্ত দিয়েই স্থাপিত হয়েছিল সেটাকে বেশি মজবুত করবার জন্য। আমাদের রাষ্ট্রীয় ইমারতের ভিত্তিও প্রাণীহিংসার উপরেই স্থাপিত করতে হবে। চতুর্দিকের এই অনাহারক্লিষ্ট পাণ্ডুর শীর্ণ নরকঙ্কালগুলি কি আপনাদের কারও মনে সাড়া জাগায় না ? আপনারাও তো ভুক্তভোগী, তবু কি আপনারা এরূপ উদাসীন থাকবেন ? দরখাস্ত, কাকুতি-মিনতি, খোসামোদ আমরা বহুকাল করেছি। ওতে কিছু ফল হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন 'দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া'। সবল, সতেজ, বলদৃপ্ত কণ্ঠে বলতে হবে— 'আমরা আসমুদ্র-হিমাচল প্রতি গ্রামে গ্রামে সংগঠন করব। আমাদের সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে যেই 'সূর্য গেল অস্তাচলে' অমনি আরম্ভ হল এদের রাজত্ব ! কোথায় সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি, আর কোথায় এই পরভুকদের রণ-ঐক্যতান বাদন ! উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত !...'

সাক্ষী নবী বক্স ভাবিলেন, এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া তাঁদের মহবুব কি আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিবে ? কি যে দিনকাল পড়িয়াছে ! ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের যুগের ছেলেদের নেশাভাঙ করিয়া বখাটে হইয়া যাওয়া অনেক ভাল ছিল। তিনি হলের দরজা সামান্য ফাঁক করিতেই, একটি উজ্জ্বল সাদা আলোর ঝলক, ঘরের জমাট অন্ধকারের বুক চিরিয়া চলিয়া গেল। এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হইয়া গেল ;—ইহারা কি জানিতে পারিয়াছে যে কোনো অনাহূত, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তাহাদের গুপ্ত বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছে, আর তাহাদের কথাবার্তা আড়ি-পাতিয়া শুনিতেছে ?—এই বুঝি তাঁহারই দিকে সার্চলাইটের মতো আলোটি জেলে—তারপর ব্রেনগানের গুটিকয়েক কট্‌কট্‌ শব্দ মাত্র অপেক্ষা !...

মহবুবের চিন্তা মাথায় চড়িল। খোদাতাল্লার নাম লইয়া পলাইবার সময় তাঁহার মনে হইল যে হাঁটু দুইটি অবশ হইয়া গিয়াছে, পা দুমড়াইয়া আসিতেছে। কিছুদূরে আসিয়া তাঁহার মহবুবের মায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁহার কথা সাক্ষী এতক্ষণ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পার্কে ফিরিয়া গিয়া দেখেন যে তিনি অঝোরে কাঁদিতেছেন। ভয়ের কোনো কারণ নাই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার সাহস পর্যন্ত তখন সাক্ষীর ছিল না। তাঁহারা বাড়ি পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরই মহবুবকে বাড়িতে ঢুকিতে দেখিয়া নবী বক্স নিশ্চিন্ত হন। জিজ্ঞাসা করায় মহবুব বলে যে সে একজন বন্ধুকে তুলিয়া দিতে স্টেশনে গিয়াছিল। এতক্ষণে সাক্ষী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। তখন হঠাৎ সরকারী অফিসার হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মনে পড়িয়া যায়। গাড়ি বাহির করিয়া তখনই তিনি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট ছোটেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এস. ডি. ও সাহেব ও নবী বক্স কিছুক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সঙ্গে করিয়া দুইটি পুলিশভ্যানে টাউন হলের নিকট গমন করেন। টাউনহলটি পুলিশবাহিনী ঘেরাও করে। পুলিশেরা বন্দুক ও অফিসার কয়জন রিভলভার লইয়া, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক হলের ভিতর প্রবেশ করেন। প্রতিমুহূর্তে তাঁহারা আততায়ীদের আক্রমণের আশঙ্কা করিতে ছিলেন। একটি কিসের যেন

শব্দ হয় !…'যে কেহ থাক, নড়াচড়া না করিয়া হাত উঁচু কর, নতুবা গুলি করা হইবে',—এই কথা বলিয়া পুলিশসাহেব হলের ভিতর টর্চ ফেলেন। একটি শীর্ণ শীতার্ত কুকুর সাক্ষী নবী বক্সের হৃৎকম্প বর্ধিত করিয়া, তাঁহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে পলাইল। এই কুকুরটি ব্যতীত ঘরে আর কেহ ছিল কিনা ? পুলিশসাহেব তখন নবী বক্সের দিকে হাতের আলো কেন্দ্রস্থ করিলেন। নবী বক্স ভয়ে ঘামিতে আরম্ভ করিতেছেন। সাহেব আলো ফেলিয়া দেখিতেছিলেন যে খবর দিবার সময় খাসমহল-অফিসার অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন কিনা। সাহেবের দোষ নাই। খাসমহল-অফিসারের নিজেরই ক্ষণিকের জন্য নিজের উপর সন্দেহ উপস্থিত হইল।

সকলে টাউন হলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই,'একজন পুলিশ খবর দিল যে পার্কের ভিতর ষড়যন্ত্রকারীর দল তখনও বসিয়া সলা-পরামর্শ করিতেছে। নবী বক্স এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন ;—আর পুলিশসাহেবের তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কিংবা কল্পনাপ্রবণ বলিয়া ভাবিবার অধিকার নাই।—

সকলে মিলিয়া পার্কের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্কের পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে যে পাবলিকের বসিবার বেঞ্চগুলি আছে, ঐদিক হইতেই মানুষের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল। পিছন হইতে নিঃশব্দে নিকটে গিয়া ইঁহারা তাহাদের কথাবার্তা শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গলার স্বরে বুঝা গেল যে তাহারা বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। টাউনহলের সেই জ্বালাময়ী ভাষণকে একটি বিশেষক্ষেত্রে কি করিয়া কার্যকরী করিতে হইবে তাহারই বিশদ আলোচনা চলিতেছে। শীতের রাত্রের অন্ধকার ও নির্জনতার সুযোগ পাইয়া তাহারা কূট-চক্রান্তে মশগুল হইয়া পড়িয়াছে। কানে আসিল—'এজেণ্টটা কি আমাদের একেবারে ভেড়া ভাবে নাকি ? নিজে করিস ভুল, আর আমাদের ভয় দেখাস 'ফায়ার' করবি বলে। I don't care if I am fired। ও বেটার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। কালকে ক্যাশ মিলানোর পর ও যখন গাড়িতে চড়ছে যাবে সেই সময় বুঝলে ? আর সেক্রেটারিকে ব্যাপারটা আজ জানিয়ে রেখেছি। এসব ঐ রাস্কেল স্পাইটার কাজ।'

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বোঝেন যে একজন সরকারী agent provocateur-এর অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর দেরি না করিয়া তিনি ষড়যন্ত্রকারী-দিগকে গ্রেপ্তারের হুকুম দেন। অরুণকুমার দে, ভুবনেশ্বর প্রসাদ, কর্তার সিং ও শেখ ইদ্রিসকে এই স্থানে গ্রেপ্তার করা হয়। শেখ ইদ্রিস পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হইতে পারে নাই। অরুণকুমার দে-র পকেটে একটি কাগজমোড়া গোলাকার বোমার মতো জিনিস পাওয়া যায়।

ইহাদের পুলিশভ্যানে পেঁাছাইয়া, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দল পুষ্করিণীর অপর পারের দিকে অগ্রসর হয়েন। সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী ও কপিলেশ্বর মাথুর ( আসামী নং ৫ ও ৬ ) পুষ্করিণীর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তাহারা বলাবলি করিতেছিল যে একখানি জাল টেলিগ্রাম পাঠাইতে পারিলে হাতের কাজটি অতি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। সরকারী পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে, উপরোক্ত আসামী দুইজন নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছিল যে মাড়োয়ারীর বাচ্চা পাঁচ লক্ষ টাকার শোক সহ্য করিতে পারিবে না বোধ হয়। গদীর ম্যানেজারকে সাজসে আনিবার সম্বন্ধে যে সময় তাহারা

সলাপরামর্শ করিতেছিল, সেই সময় তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। একদল পুলিশ ইহাদেরও পুলিশভ্যানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।

তাহার পর পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিক হইতে লোকজনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পার্টি সেইদিকে অগ্রসর হয়। সেখানকার ষড়যন্ত্রকারীরা বোধ হয় দূর হইতেই ইহাদের দেখিয়া ফেলিয়াছিল। নবী বক্সের সাক্ষ্যে প্রকাশ যে চক্রান্তকারীদের মধ্যে একজন লোক আবৃত্তির মতো স্বরে –'যায় যাবে যাক্ প্রাণ' বলিয়া ঘাটের চাতালের উপর হইতে জলে ঝাঁপ দিল। তাহার তিন-চারজন সঙ্গী, দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। আগের আসামীদ্বয়কে ভ্যানে পৌঁছাইয়া দিয়া পুলিশেরা তখনও ফেরে নাই। তাই পুলিশসাহেবের দল, ঐ তিন-চারজন পলায়মান চক্রান্তকারীদের তখন অনুসরণ করা সমীচীন মনে করিলেন না। জলের ভিতরের ঐ বিপজ্জনক বিপ্লবীটিকে কি করিয়া ধরা যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না জানা নাই। তবে সে এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে নিশ্চয়ই। কেহই এই অন্ধকারে এই মারাত্মক আসামীটিকে ধরিবার জন্য জলে নামিতে রাজী নয়। হঠাৎ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মাথায় এক বুদ্ধির ঢেউ খেলিয়া যায়। তিনি পুষ্করিণীর চারিদিকে সকলকে ছড়াইয়া পড়িতে বলেন। শীতের মধ্যে লোকটি কয় ঘণ্টা আর জলে থাকিতে পারিবে? লোকটিও বোধ হয় গতিক ভাল নয় বুঝিয়া আর একটুও দেরি করিল না। 'তোর গায়ের কাপড়খানাই এখন পরতে হবে রে দেখছি, ঘ্যাণ্টা' এই বলিতে বলিতে সে সেই ঘাটের সিঁড়ির উপরই ওঠে। তখন সে পুলিশ দেখিয়া সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় বিস্মিত হইবার ভান দেখায়। পুলিশ আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই যুবকটিই অভিযুক্ত নং ৭, মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদা।

নবী বক্সের আসামীদের গ্রেপ্তারের সম্বন্ধে উপরোক্ত সাক্ষ্য, পুলিশ সাহেব (সরকারী সাক্ষ্য নং ৬৮) এবং পুলিশ সাবইন্সপেক্টর (সরকারী সাক্ষী নং ৬৯)-এর জবানবন্দী দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।

ইহাই সংক্ষেপে সরকার পক্ষের কেস।

আসামীরা বলে যে তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আসামী পক্ষের কৌঁসিলি প্রথমেই আপত্তি জানান যে, বিভিন্ন আসামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে; এগুলির একত্রে বিচার আইনসঙ্গত নয় এবং ইহা অভিযুক্তদের ন্যায়বিচার পাইবার পক্ষে হানিকারক হইবে। আমার মতে এ আপত্তির কোনো সারবত্তা নাই। যে মূল তথাকথিত ষড়যন্ত্র, টাউন হলে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই এই মামলার ভিত্তি। বলা হইতেছে যে পার্কের ছোট ছোট উপদলীয় খণ্ডচক্রান্তগুলি উহারই কার্যকরী অঙ্গমাত্র।

এইবার এক এক করিয়া অভিযুক্তদের কেস লওয়া যাউক।

একই আইনজীবী, অরুণকুমার দে, ভুবনেশ্বরপ্রসাদ ও কর্তার সিং এই তিনজন অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। অরুণকুমার দে-র বাড়ি চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে। ভুবনেশ্বরপ্রসাদের দেশ সাহাবাদ জেলায় এবং কর্তার সিং সিয়ালকোটের লোক। ইহারা তিনজনই স্থানীয় ব্যাঙ্কের কেরানী। কর্তার সিং অল্প কিছুদিন মাত্র এখানে আসিয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গার সময় সে ব্যাঙ্কের সিয়ালকোট শাখাতে কাজ করিত।

আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী প্রভাস পালের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্থানীয় ব্যাংকের কেরানীদের একটি ইউনিয়ন আছে। তিনি উহার সেক্রেটারি। গত বৎসর পূর্বভারতের ব্যাংকগুলির কেরানীরা ধর্মঘট করিয়াছিল। সেই হইতে এখানকার ব্যাংকের 'এজেণ্ট'র সহিত কেরানীদের ঠিক বনিবনা হইতেছে না। ব্যাংকের স্থানীয় বড় সাহেবকে 'এজেণ্ট' বলে। কেরানীদের মধ্যে একজন, যে পূর্বোক্ত ধর্মঘটে যোগ দেয় নাই, তাহাকে অন্য কেরানীরা 'স্পাই' বলে। এই 'স্পাই'টি যে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় 'এজেণ্ট'র বাড়িতে যায় এবং অন্য কেরানীদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার সংবাদ তাঁহাকে দেয়, তাহার প্রমাণ সেক্রেটারির কাছে আছে। 'এজেণ্ট' সাহেব ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে কিছু বলিতে সাহস করেন না, কিন্তু অন্য কেরানীদের সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন। সময়ে অসময়ে 'ফায়ার' করিব অর্থাৎ চাকরি খাইব বলিয়া ভয় দেখান। এখানে ব্যাংকই সরকারী ট্রেজারির কাজ করে। কালেক্টরের অফিস হইতে প্রতি সপ্তাহে ছাপা-ফর্মে ফসল ও চাষের অবস্থা, বারিপাত, গো-মড়ক প্রভৃতি নানা তথ্যপূর্ণ একটি রিপোর্ট পাঠায়। 'এজেণ্ট' সাহেব স্বহস্তে এই পাক্ষিক রিপোর্ট লেখেন।

সাক্ষী প্রভাস পাল আরও বলে যে গভর্ণমেণ্টের ফর্মগুলির একপিঠ সাদা থাকে। কেরানীরা নিয়মিত বাজে কাগজে চিঠি-পত্রাদির খসড়া লিখিয়া, এজেণ্টের ঘরে অনুমোদনের জন্য পাঠায়। সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়া আসিলে তবে উহা ভাল কাগজে টাইপ করা হয়। উক্ত ৫ই জানুয়ারী তারিখেও একটি বহু পুরাতন কালেক্টরের অফিসের রিপোর্টটির উল্টা পিঠে, একখানি জরুরী চিঠির নকল লিখিয়া, কর্তার সিং 'এজেণ্টের' কামরায় পাঠাইয়াছিল। 'এজেণ্ট' ফসল ও চাষবাসের রিপোর্ট দেখিয়াই হেড অফিসে পাঠানোর জন্য পাক্ষিক রিপোর্ট লিখিতে বসিয়া যান। তাড়াতাড়িতে তিনি কালেক্টর অফিসের রিপোর্টের তারিখটি লক্ষ্য করেন নাই। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া 'এজেণ্ট' সাহেব তাঁহার পাক্ষিক রিপোর্টটি তৈয়ারি করেন। দিনান্তে রিপোর্টটি কর্তার সিং-এর হাতে ফিরিয়া আসিলে, সে হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক করিতে পারে না। সে সাতিশয় নম্রতার সহিত, 'এজেণ্ট' সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার ভুলটি দেখাইয়া দেয়। ইহার জন্য কোথায় 'এজেণ্ট' সাহেব কর্তার সিং-এর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন তাহা নয়, তিনি এইসব অকর্মণ্য উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীদের চাকরি হইতে 'ফায়ার' করিবার ভয় দেখান। এই দুর্ব্যবহারে ব্যাংক কর্মচারীরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। একপিঠে অন্য চিঠি লেখা কালেক্টরের অফিসের উল্লিখিত রিপোর্ট, এবং উহারই আধারে এজেণ্ট দ্বারা লিখিত ভুল পাক্ষিক রিপোর্টটি, এই সাক্ষী দাখিল করিয়াছেন। ঐ কাগজগুলি সময়ে এজেণ্টের বিরুদ্ধে কখনও কাজে লাগিতে পারে বলিয়া, ইউনিয়নের সুযোগ্য সেক্রেটারি ওগুলিকে বাজে কাগজের ঝুড়ি হইতে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রভাস পালের সাক্ষ্যের আলোকে, ফার্স্ট-ইনফরমেশন রিপোর্টে উল্লিখিত প্রথম তিনজন আসামীর মধ্যের কথাবার্তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এই আসামীদের কৌঁসিলির জেরার উত্তরে, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বীকার করেন যে, আসামী অরুণ দে-র পকেট হইতে যে সন্দেহজনক গোলাকার পদার্থটি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা গভর্ণমেণ্টের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের নিকট

পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার পরীক্ষার রিপোর্টটি বোধ হয় ভুলক্রমে নথীতে দাখিল করা হয় নাই। তাঁহার যতদূর স্মরণ হয়, বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছিলেন যে ঐ গোলাকার পদার্থটির উপকরণ বিজ্ঞানের পরিচিত কোনো বিস্ফোরক নয়। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেরায় আরও স্বীকার করেন যে ঐ দ্রব্যটি সরকারী কেমিক্যাল এনালিস্টের নিকটও রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তাঁহার পরীক্ষার রিপোর্টটিও বোধ হয় ভুলক্রমে কোর্টে দাখিল করা হয় নাই। তাঁহার রিপোর্টে কি লেখা ছিল তাহা সাক্ষীর স্মরণ নাই। ঐ কাগজখানি এত তাড়াতাড়িতে পুলিশ অফিসে খুঁজিয়া পাওয়াও শক্ত।

বহুক্ষণ জেরার পর আসামী পক্ষের উকিল তাঁহাকে মনে করাইয়া দিল পুলিশ সাহেবের আবছা আবছা মনে পড়ে যে ঐ রিপোর্টে লিখিত ছিল, গোলাকার বস্তুটিতে কাপড়কাচা সাবানের উপকরণ ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় নাই। উহাতে আরও লিখিত ছিল যে বস্তুটি বহুকালের প্রাচীন হওয়ায় উহার রং কালচে হইয়া গিয়াছে। কেরানীরা অফিস হইতে ফিরিবার পথে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া যায় কিনা সে খবর সাক্ষী জানেন না। কাপড়কাচা সাবান কোনো কেরানী পরিবারের আবশ্যক দ্রব্যাদির মধ্যে পড়ে কিনা তাহাও তিনি বলিতে পারেন না।

এইবার আসামী নং ৪ শেখ ইদ্রিসের কেস লওয়া যাউক। পার্কে ঐ সময় প্রথম তিনজন আসামীর নিকটবর্তী বেঞ্চে বসিয়া থাকা এবং পলাইবার চেষ্টা করা ছাড়া, তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আর কোনো প্রমাণ নাই। তাহার উকিল স্বীকার করেন যে ইদ্রিসের আদি বাড়ি ফারজাবাদে; সে একজন পেশাদার পকেটমার এবং ইতঃপূর্বে পকেট মারিবার অপরাধে তাহার পাঁচবার সাজা হইয়াছে। আমাদের এতকালের জজিয়তীর জীবনে আসামী পক্ষের উকিলের এইরূপ ডিফেন্স লওয়া, সত্যই এক নূতন অভিজ্ঞতা। গ্রেপ্তারের সময় তাহার পকেট হইতে একটি ক্ষুরের ব্লেড পাওয়া যায়, যাহা কোর্টে দাখিল করা হইয়াছে। তাহার উকিল বলেন যে গত হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গার পর হইতে গাঁটকাটার পেশা আর খুব অর্থকরী নাই। নিজের ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ব্যতীত অপরের পকেট মারিবার পূর্বে ইদ্রিসকে আজকাল তিনবার ভাবিয়া লইতে হয়। এই ব্যবসায়িক মন্দার সহিত ইদ্রিস বীরের মতো লড়িতেছে। বিনা পুঁজিতে অর্থোপার্জনের সে নানাপ্রকার উপায় আবিষ্কার করিয়াছে এবং এইগুলি দিয়াই সে তাহার খানদানী পেশার সংকুচিত আয় পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে।

ঘটনার তারিখে সে বিকাল তিনটা হইতেই রেল স্টেশনে 'চন্দৌসী মেল'-এর একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্টের বাঙ্কের উপর শুইয়াছিল। মেল ট্রেনটি এখান হইতে বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ছাড়ে। ঐ ট্রেনটিতে অসম্ভব ভিড় হয়। ইদ্রিস প্রত্যহই আগে হইতে বাঙ্কের উপর শুইয়া থাকে। কোনো প্যাসেঞ্জারের নিকট হইতে দুই এক টাকা যাহা পাওয়া যায় লইয়া, তাহাকে ঐ বাঙ্কের উপর শুইবার স্থান করিয়া দেওয়া, ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। উপরোক্ত 'অকুর' দিবস তাহার পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ছিল। তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে ঐদিন তাহাকে একটি শক্ত পাল্লায় পড়িতে হইয়াছিল। মুসলমানী টুপি পরিহিত একটি যুবক, আর একটি যুবককে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল। বাঙ্কের স্থান এতক্ষণ আগলাইয়া রাখিবার পরিশ্রম বাবদ

একটি টাকা প্রথমোক্ত যুবকটির নিকট চাহিবামাত্র সে কামরার ভিতর ভীষণ হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দেয়। শীর্ণকায় ইদ্রিসকে বেশ কয়েক ঘা উত্তম-মধ্যম প্রহার দিবার পর সে তাহাকে টানিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নামায়। তাহার পর যুবকটি ইদ্রিসকে রেলওয়ে পুলিশের হাতে সঁপিয়া দিয়া যায়। স্টেশনের পুলিশ কনস্টেবলদের সহিত ইদ্রিসের বহুকালের পরিচয়। বাঙ্কের দরুন এক টাকা প্রাপ্যের মধ্যে, দুই আনা করিয়া রেল পুলিসকে ইদ্রিস নিয়মিত দিত। কাজেই যুবকটি চলিয়া যাইবার পরই পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। সে মনের দুঃখে আন্দাজ ছয় ঘটিকার সময় পার্কের বেঞ্চিতে আসিয়া বসে।

আপাতদৃষ্টিতে ইদ্রিসের এই 'মোরগ ও ষণ্ডের কাহিনী' অবিশ্বাস্য মনে হইলেও ইহার সমর্থনে আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী পাওয়া গিয়াছে। আসামী পক্ষের দুই নম্বর সাক্ষী শেখ মহবুব, সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী নবী বক্সের পুত্র। যেদিন তাহার পিতাকে জেরা করা হইতেছিল, সেদিন শেখ মহবুব কলেজ কামাই করিয়া কোর্টে আসিয়াছিল, উকিলরা কি করিয়া তাহার পিতাকে নাজেহাল করে তাহা দেখিবার জন্য। সেই সময় হঠাৎ আসামী ইদ্রিস চিৎকার করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইদ্রিসের উকিল তাহাকে থামাইয়া আমাদের নিকট নিবেদন করেন যে, তাঁহার মক্কেল মৌলভী নবী বক্সের ছেলেকে দেখাইয়া বলিতেছে যে ঐ বাবুসাহেবই সেদিন স্টেশনে তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তখন আমি উক্ত আইনজীবীকে মহবুবকে সমন করিবার জন্য লিখিত দরখাস্ত দিতে বলি। পরে মহবুবের সাক্ষ্যে ইদ্রিসের বক্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। মহবুব ঘটনার তারিখে প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময়, ঐ লুঙ্গি পরিহিত আসামীটির ন্যায় এক ব্যক্তিকে বাঙ্ক হইতে নামাইয়া সামান্য কয়েকটি চপেটাঘাত করিয়াছিল। সাক্ষী আরও বলে যে সে তাহার এক বন্ধুকে চন্দৌসী মেল-এ তুলিয়া দিতে গিয়াছিল।

এই সাক্ষীর ইদ্রিসের সহিত কোনো পূর্বসম্বন্ধ নাই। আসামী ইদ্রিসের সহিত তাহার স্বার্থ কোনো প্রকারে জড়িত, এরূপ ইঙ্গিতও সরকারী পক্ষ হইতে করা হয় নাই। আমরা এই সত্যভাষী ও 'উজ্জ্বল' যুবকের সাক্ষ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

এইবার ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী ও কপিলেশ্বর মাথুর এই দু'জনের কেস লওয়া যাইতেছে।

এই দুইজন আসামীই এই শহরে ডাক্তারি করেন। পূর্বে বিবৃত প্রমাণ ছাড়া আসামী ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে আরও একটি প্রমাণ আছে। তাঁহার বাড়ি সার্চ করিবার সময় 'অগ্রণী রক্তবিপ্লব দল'-এর সাপ্তাহিক মুখপত্র 'রক্তাম্বর' বাহান্ন কপি পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে গত বৎসর, কিংবা তাহার আগের বৎসর, তাঁহার পাড়ার কোনো যুবক, কি যেন বলিয়া কয়েকটি টাকা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিল। তাহার পরই তাঁহার নিকট এই কাগজখানি প্রতি সপ্তাহে আসিতে আরম্ভ করে। তাহার পর কবে যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আসামীর উকিলের জেরায় সার্চ ও তদন্তকারী পুলিশ দারোগা (সরকারী সাক্ষী নং ৬৯) স্বীকার করেন যে সার্চের সময় প্রাপ্ত 'রক্তাম্বর'-এর কপিগুলির উপরের মোড়কগুলি তখনও একখানিও খোলা হয় নাই। পুলিশের হাতে আসিবার পর পোস্টার প্যাকেটগুলি সুযোগ্য

স্পেশাল ব্রাঞ্চের তত্ত্বাবধানে খোলা হয়, তাহার ভিতর কি সব লেখা আছে তাহা দেখিবার জন্য। সাক্ষী নং ৬৯ আরও বলেন যে কাগজখানি এখনও বে-আইনী করা হয় নাই।

এই পোস্টাল মোড়ক না খুলিবার সম্বন্ধে সরকারী উকিলের যুক্তি বেশ মনে রাখিবার মতো। তিনি সন্দেহ করেন যে ঐ সাপ্তাহিকগুলি পাঠ করিবার পর, আসামী ক্ষিতীশ নন্দী, যেরূপ সন্তর্পণে কাগজখানিকে মোড়কের বাহির করিয়া লওয়া হইত, সেই সাবধানতার সহিতই পুনরায় উহার ভিতর ঢুকাইয়া রাখিতেন। সত্য হইলে, ইহা আসামীর পক্ষে কম দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

আসামী ক্ষিতীশ নন্দী ও কাপিলেশ্বর মাথুরের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ঘটনার তারিখে সন্ধ্যা আন্দাজ ছয়টার সময়, তাঁহারা শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীপুনমচন্দ মাড়োয়ারীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আসামী কাপিলেশ্বর মাথুর, উপরোক্ত শ্রীপুনমচন্দ মাড়োয়ারীর পরিবারের চিকিৎসক। দুইদিন হইতে বহু ঔষধপথ্যাদি সত্ত্বেও তাঁহার হিক্কা বন্ধ হইতেছিল না। ডাক্তার কাপিলেশ্বর মাথুর তাঁহার রুগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য সিনিয়র ডাক্তার ক্ষিতীশ নন্দীকে 'কল' দেন। শ্রীপুনমচন্দের গৃহ হইতে ফিরিবার সময়, আসামী ক্ষিতীশ নন্দী তাঁহার সান্ধ্য ভ্রমণ সারিয়া লইবার জন্য, নিজের গাড়িখানি খালিই বাড়ি পাঠাইয়া দেন এবং দুই ডাক্তার পদব্রজে পার্কে আসেন। এখানে তাঁহারা রুগীকে হঠাৎ একটি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত দিয়া, তাঁহার হিক্কা বন্ধ করিবার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। এইজন্য শ্রীপুনমচন্দজীকে পাঁচ লাখ টাকা ব্যবসায়িক ক্ষতির সংবাদ দিয়া একখানি জাল টেলিগ্রাম দিবার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।

এই সম্পর্কে আসামী পক্ষের সাত নম্বর সাক্ষী পুনমচন্দ মাড়োয়ারীর সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। এই সাক্ষ্যের সমর্থনে পুনমচন্দের ব্যবহৃত ঔষধের প্রেসকৃপশন-গুলির নকল ওরিয়েন্টাল-মেডিক্যাল হলের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে ( এক্‌জিবিট্‌ ঘ ১ হইতে ঘ ৭ পর্যন্ত )।

ডাক্তার ঘোড়পাড়ে আসামী পক্ষের ছয় নম্বর সাক্ষী। ইনি বোম্বাই শহরের হিক্কা রোগের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন এ কথা সরকারী উকিলও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সরকারী উকিলের জেরার উত্তরে ইনি বলেন যে, তাঁহার ডাক্তারী আয়ের উপর এই বৎসর চোদ্দ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধার্য হইয়াছে। এই সাক্ষীর কোনো কথা অবিশ্বাস করিবার প্রশ্ন উঠে না। এই সাক্ষীর মতে, কঠিন হিক্কা কেসগুলিতে যখন ঔষধপথ্যে কোনো উপকার পরিলক্ষিত হয় না, তখন কড়া গোছের মানসিক আঘাতই একমাত্র ফলপ্রসূ চিকিৎসা। সরকার পক্ষ হইতে ইঁহাকে লম্বা জেরা করা হইয়াছে। জেরায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে বার্ধক্যে লোকের মন শিশুর মতো দুর্বল হইয়া যায়। সত্তর বৎসর বয়সকে এদেশে বার্ধক্য নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। একটি ছোট ছেলের হেঁচকি বন্ধ করিতে হইলে, সে চুরি করিয়া খাইয়াছে কিনা এই প্রশ্নাঘাতই যথেষ্ট।

বিশেষজ্ঞের এই কথাগুলির ভিত্তিতেই সরকারী উকিল আমাদের সম্মুখে বহস করিয়াছেন যে শ্রীপুনমচন্দ মাড়োয়ারীর ন্যায় বৃদ্ধের পক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতির সংবাদ সহ্য করা অসম্ভব। রুগী মারিয়া রোগ সারাইবার কথা নিশ্চয়ই

আসামী ডাক্তারদ্বয় ভাবিতেছিলেন না। সেইজন্য সরকারী উকিলের মতে, আসামী পক্ষের বিবৃতি অবিশ্বাস্য।

আমরা অবশ্য এ বিষয়ে সরকারী উকিলের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। এ বিষয়ে আমাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত মত এই যে হিক্কার তীব্রতার উপরও, আবশ্যক মানসিক আঘাতের তীব্রতা নির্ভর করিবে। আর পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতির আঘাতকে সরকারী উকিল মহাশয় যতটা বড় করিয়া ভাবিতেছিলেন, শ্রীপূনমচন্দজীর মতো ব্যবসায়ীর পক্ষে উহা সত্যসত্যই ততটা বড় কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

এইবার আমরা আসামী মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদার কেস লইতেছি। সে প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র।

আসামী পক্ষের সাক্ষী নং ১২ তড়িৎ মুখার্জীর সাক্ষ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে বলে যে তাহার ডাকনাম ঘ্যাণ্টা। ঘটনার তারিখে তাহারা পার্কের পুকুরধারে বসিয়াছিল। সে, ট্যাপা, ভোঁদা, আর বিশে এই কয়জন বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহারা সকলেই স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র। আসামী মিহিরবরণ ওরফে ভোঁদা একটু গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের ছেলে। ভোঁদার বিশ্বাস যে সে থিয়েটার ও আবৃত্তি ভাল করিতে পারে। সে অল্পতেই চটিয়া যায় বলিয়া তাহার বন্ধুরা তাহার পিছনে লাগিতে ভালবাসে। উক্ত ঘটনার দিন সাক্ষীরা তাহাকে এই বলিয়া খেপাইতেছিল যে সে এই শীতের রাত্রে কিছুতেই স্নান করিতে পারিবে না। দুই একবার উসকানি দিবার পরই ভোঁদা তাহাদের বাজি রাখিতে বলে। দুই আনার চানাচুর বাজি রাখা হয়। সাক্ষীরা মতলব আঁটিয়াছিল যে ভোঁদা জলে নামিলেই তাহারা তাহার জামা লইয়া পলাইবে, সে যাহাতে স্নান সারিয়া ডাঙায় উঠিবার পর আর কাহাকেও দেখিতে না পায়। সাক্ষী বলে যে, আসামী মিহিরবরণ অতঃপর জামাটি খুলিয়া ঘাটের চাতালের উপর রাখে এবং আবৃত্তির স্বরে বলে, 'নিশ্চয়ই করিব স্নান।' তাহার পর মিনিটখানেক মনে মনে ভাবিয়া ইহার সহিত আর একটি লাইন মিলাইয়া আবৃত্তি করে—'যায় যাবে যাক প্রাণ।' এই বলিয়া আসামী মিহিরবরণ ওরফে ভোঁদা জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

সরকারী উকিলের জেরার উত্তরে সাক্ষী অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করে যে আসামী মিহিরবরণ রায় তাহাদের ক্লাসের ছেলেদের নেতা। গতবার অংকের প্রশ্ন কঠিন আসিলে, পরীক্ষার পর, তাহারই নেতৃত্বে ক্লাসের প্রত্যেক ছেলে এক এক করিয়া গিয়া অংকের শিক্ষককে মোগলাই কায়দায় কুর্নিস করিয়া আসে।

এইবার আমরা এই মামলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাক্ষী, রেবতী সেনের সাক্ষ্যের বিষয় আলোচনা করিব। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে এই সাক্ষীকে সরকারী পক্ষ বা আসামী পক্ষ কেহই সমন করেন নাই। সরকারী উকিলের নির্দয় জেরার ফলে, সাক্ষী তড়িৎ মুখার্জী ওরফে ঘ্যাণ্টার চোখে যখন প্রায় জল আসিয়া গিয়াছে, তখন তিনি হঠাৎ ধমক দিবার মতো করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে সে রাত্রিতে পড়িতে বসে কি-না? তবে সে অত রাত্রে পার্কে বসিয়া ছিল কি করিয়া? সন্ধ্যার সময় বাড়িতে না ফিরিলে তাহার মা বাবা বকেন কি না? প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতেই সাক্ষী জবাব দেয় যে, সে সেদিন মাকে বলিয়া আসিয়াছিল যে রেবতীবাবুর ছবি দেখিতে যাইতেছে।

তখন আমরা এই রেবতীবাবুকে কোর্টের সাক্ষীরূপে ডাকি।

কোর্ট-সাক্ষী রেবতী সেন নিজের সাক্ষ্যে বলেন যে তাঁহার আদি নিবাস বরিশালে। তাঁহার বয়স চুয়ান্ন বৎসর। তিনি জেলার স্যানিটারি বিভাগে কাজ করেন। সেকালে ফোর্থক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাহার পর 'স্বদেশী'র হুজুগে মাতিয়া মুকুন্দদাসের যাত্রার দলে ঢোকেন। তাহার পর বাখরগঞ্জ জেলায় কয়েক বৎসর নেতাদের মিটিং-এ চেয়ার সতরঞ্চি সামিয়ানা ইত্যাদির ব্যবস্থার গুরুভার নিজের উপর লইয়া, বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত কালাতিপাত করেন! সেই সময়ে তাঁহার মেশোমশাই তাঁহাকে এখানে আনিয়া এই চাকরি করিয়া দেন। বেতন বর্তমানে ডিয়ারনেস এলাওয়েন্স সমেত বিরাশি টাকা। তাঁহার ডিউটি স্বাস্থ্যবিদ্যা ও রোগের প্রতিষেধক ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রচারের কার্য করা। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় পানীয় জলের কুয়ায় ওষুধ দেওয়া, ম্যালেরিয়ায় সময় কুইনাইন, প্যালুড্রিন ট্যাবলেট বিলি করাও তাঁহার কাজ। প্রতি মাসে তাঁহাকে চারিটি প্রচার বক্তৃতা দিবার ডায়েরি উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হয়। তাঁহার বিশ্বাস তিনি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন। সরকারী উকিল এই সম্বন্ধে তাঁহাকে জেরা করিলে, তিনি উষ্মা প্রকাশ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তিনি ছোট কাজ করেন বলিয়া তাঁহাকে সরকারী উকিল ব্যঙ্গ করিতে সাহস করিতেছেন, অথচ এক মিটিং-এ কমিশনার সাহেব একটি লিখিত বক্তৃতা বারংবার জলপান করিতে করিতে পাঠ করিলেও, তিনি সরকারী উকিল মহাশয়কে নিরবচ্ছিন্ন করতালি দিতে দেখিয়াছেন। জেরায় সাক্ষী স্বীকার করেন যে স্যানিটারি বিভাগের কাজ চালানোর জন্য তাঁহার নিম্নলিখিত ছয়টি বক্তৃতা মুখস্থ আছে ঃ—কি করিয়া কলেরা রোগ ছড়াইয়া পড়ে ; বসন্তের টীকা ; ম্যালেরিয়ার মশা ; আদর্শ পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী ; খাদ্য ও পানীয় ; রুগীর পথ্য ও শুশ্রূষা। এই ছয়টি বিষয়ের উপর ম্যাজিক-লণ্ঠন স্লাইডও আছে। একটি প্রাথমিক বক্তৃতার পর ম্যাজিক-লণ্ঠনে সেই বিষয়ের ছবিগুলি দেখান হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আজকালকার টকির যুগে, আর তাঁহার ম্যাজিক-লণ্ঠন মিটিংগুলিতে সেকালের মতো লোক হয় না। চাকরি বাঁচাইবার জন্য অনেক সময়ই খোসামোদ করিয়া শ্রোতা জুটাইতে হয়। তিনি তাঁহার কাজের ডায়েরি কোর্টে দাখিল করিয়া বলেন যে, গত ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা আন্দাজ সাড়ে পাঁচটার সময় স্থানীয় টাউন হলে তিনি ম্যালেরিয়ার মশার উপর বক্তৃতা দেন। তিনি আরও বলেন যে, বাড়ি বাড়ি গিয়া, তিনি পাড়ার ছেলেদের ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখিতে আসিবার জন্য বলিয়া আসিয়াছিলেন। আজকালকার ছেলেরাও আবার এইরূপ বদ হইয়া উঠিয়াছে যে বাড়িতে তাহাদের পিতামাতাকে বলিয়া যদিই বা তাহাদের রাত্রে ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখিতে আসিবার অনুমতি করাইয়া দিই, তথাপি তাহারা মিটিং-এ উপস্থিত হয় না। অথচ ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখিতে যাইতেছি বলিয়া বাড়ি হইতে কিন্তু বাহির হয় ঠিকই। উহাদেরই বা দোষ কি? একই বক্তৃতা কতবার শুনিবে, একই ছবি আর কতবার দেখিবে?

এই বাক্‌পটু সাক্ষীটিকে তখন আমরা ম্যালেরিয়ার মশা'র উপর বক্তৃতাটি আমাদের শুনাইতে বলি। প্রথমে সাক্ষী মৃদু আপত্তি জানান। বলেন যে ম্যাজিক-লণ্ঠন স্লাইড সঙ্গে না থাকিলে তিনি ভাল বক্তৃতা দিবার মানসিক

প্রেরণা পান না। তৎপরে আমাদের আগ্রহাতিশয্যে, গভীর অনুভূতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যঞ্জনার সহিত বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

…'এদের জাতকে নির্মূল করে দিতে হবে। এই রক্তশোষকের দল তিলে তিলে আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে।' ইত্যাদি…

অনেকক্ষণ ধরিয়া একটানা বক্তৃতা চলে। সাক্ষী মৌলভী নবী বক্স যে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের বক্তৃতা টাউন হলে শুনিয়াছিলেন, হুবহু সেই বক্তৃতাটি।

'এই দেখুন এনোফিলিস মশার ছবি' বলিয়া সাক্ষী রেবতী সেন নিজের বক্তৃতাটি শেষ করেন। বক্তৃতা শেষ হইবার পর ঐ বাক্‌সংযমহীন সাক্ষীটি সরকারী উকিলকে উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করেন—'কি আমার বক্তৃতা শুনে একেবারে মুষড়ে পড়লেন কেন? ঢকঢক করে জল খাইনি বলে ভাল লাগল না বুঝি?'

তাঁহার পুরাতন রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস, এবং কোর্টের মধ্যের দুর্বিনীত আচরণ সত্ত্বেও আমরা রেবতী সেনের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি না।

ইহার পর ষড়যন্ত্রের কাহিনী আর দাঁড়াইতে পারে না। এইজন্য আমি আসামীদিগকে বেকসুর খালাস দিবার হুকুম দিতেছি।

স্বাক্ষর…
বিচারক
তাং ২৫. ৮…

## চকাচকী

এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি।

ধামদাহা-হাটের 'চকাচকী'। চকাচকী নামটি আমারই দেওয়া—যদিও সে নাম পরে জেলাসুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটি। ঠাট্টা করে নয়; ভালবেসে। হয়তো একটু ঈর্ষাও মেশানো ছিল ঐ নামকরণের সঙ্গে। অদ্ভুত অবস্থায়, তাদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমার সহকর্মী কানা মুসাফিরলালের সঙ্গে তখন আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই রাজনীতিক কাজের সূত্রে। মুসাফিরলালই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ধামদাহা-হাটের দুবে-দুবেনীর কুটিরে। তখন সেখানে ঘোড়ার দড়ি নিয়ে, হাসি চেঁচামেচির মধ্যে, পুরোদমে টাগ-অব-ওয়র খেলা চলছে। দড়ির একদিকে দুবেজী, অন্যদিকে দুবেনী আর অবাধ্য ঘোড়াটি। হেঁইও জোয়ান!—বলেই দুবেজী হঠাৎ দড়ি ছেড়ে দিল। দুবেনী একেবারে চিৎপাত। তবু হাসি থামে না।

—দুবেজী নির্দোষিতার ভান করে।—'জানোয়ারেরা সুদ্ধ তোর দিকে, তোর সঙ্গে কি আমি পারি। তাই হার মেনে ছেড়ে দিলাম।'…

'দাঁড়াও না! তোমার জানোয়ারগিরি বার করছি!'

এর জের আরও চলত কিনা জানি না। আমরা গিয়ে পড়ায় তখনকার মতো বন্ধ হয়ে গেল। ছারপোকাভরা দড়ির খাটিয়াটি, আমাদের জন্য বার করতে ছোটে তারা দুজনে।…

দুবেনীর বয়স তখনই বছর ষাটেক। তবু কী সুন্দর দেবীপ্রতিমার মতো চেহারা! যেমন রূপ, তেমনি গায়ের রঙ।...আর কী আপন-করে নেওয়া ব্যবহার! আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছিল বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি, বিয়ের সময়ের মনের উপছে-পড়া ভাব বজায় রেখেছে দেখে।

তাই নাম দিয়েছিলাম চকাচকী।

বিশ্বনিন্দুক মুসাফিরলালের পছন্দ হয়নি নামটি। কুটিল.তায় ভরা তার ভাল চোখটি একটু টিপে, ঠোঁটের কোণে একটা ইঙ্গিতের ছাপ ফুটিয়ে তুলে সে বলেছিল, 'চকাচকী না বলে, চড়ুই-চড়ুইনী বলুন এদের। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ির, এখনও কী ঠমক! ছেঁদো কথার কী বাঁধুনি! দেখেন না নেচে চলে! ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াতে চায় চড়ুইপাখির মতো! এ গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে একটা লোটা আর এই দুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে, দুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল—শুধু দুবেনীর কোমরের লচক দেখে। সে বয়সে দুবেনী...'

মুসাফিরলালকে থামিয়ে দিই। জানি তো তাকে। দুবেনীর সম্বন্ধে ও সুরে কথা বলা আমার খারাপ লাগছিল। সব জিনিসে সে খারাপের গন্ধ পায়!...

এর পর কতবার যে তাদের বাড়িতে গিয়েছি তার ঠিক নেই। না গিয়ে কি নিস্তার ছিল? ওদিকে গিয়েও তাদের বাড়িতে যাইনি জানতে পারলে চকাচকী দুঃখিত হত। শুধু আমি নই, এ অঞ্চলের প্রত্যেক রাজনীতিক কর্মীর বেলায়ই ঐ এক নিয়ম। দল-নিরপেক্ষভাবে। তার কুঁড়েতে যা জুটবে, চারটি না খেলে রক্ষা নেই। না-খাওয়ার রকম-সকম দেখলে, অতিথির কাপড়-গামছার ঝুলিটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে দুবেনী রাখবে রান্নাঘরে। যদি কোনোদিন বলেছি, অমুক গ্রাম থেকে এখনই খেয়ে আসছি—আজ আর খাব না', অমনি দুবেজী অভিমান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু দুবেনী চুপ করে থাকবার পাত্রী নয়। বেতো টাট্টু ঘোড়াটার পিঠ থেকে চটের বোরাটা সে নেয় বাঁ হাতে; আর ডান হাত দিয়ে আমাকে ধরে টানতে টানতে উঠোনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হুকুম করে, 'বোসো এই বোরাটার উপর। বসে বসে দেখো, আমি কেমন করে রুটি সেঁকি।' তারপর দুবেজীকে লক্ষ্য করে বলে, 'মরদ দেখো! মান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন! থাকো! সবাই কি আর দুবেনী, যে তোমার মানের কদর দেবে!'

কতক্ষণ আর কথা না বলে থাকে দুবেজী। রাঁধবার সময় মেলা বকিস না, বুঝলি! মুখের থুতু ছিটকে অতিথের রুটির উপর পড়বে।'

'থামো থামো! অত আর থুতু ছিটকোয় না! এ কি তোমাদের মতো খয়নিগোঁজা মুখ, যে কথা বললে থুতুর ভয়ে বাঘ পালাবে। বুঝলে বাবুজী, আমি এক-এক সময় বুড়োকে বলি যে, আমার সুমুখে বসে বাজে বকবক না করে যদি সে হাটের মালিকের তরকারি ক্ষেতে বসে আকাশের সঙ্গে কথা বলে তাহলে শাকসবজির পোকামাকড় দু-চারটে মরে তামাক-গোলা থুতুতে। তা কি শুনবে! যত গল্প ওর আমারই কাছে।'—

নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়াতে দেখে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তারা এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের জন্য?

জবাব দিয়েছিল—আপনাদের সেবা করলে রামজী খুশী হবেন। তাঁকে খুশী করতে না পারলে আমাদের পাপ খণ্ডন হবে কী করে ?

এমন সরল নিষ্পাপ দম্পতিও পাপের ভয়ে আকুল ! তাই রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও রাজনীতিক কর্মীদের জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব খরচ করে দেয় ! শুনে আমার আশ্চর্য লেগেছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রইল না, যখন চকাচকী জেলে যাবার হুজুগ তুলল। তখন একটি রাজনীতিক আন্দোলনে জেলে যাবার হিড়িক উঠেছে দেশে। ঠাট্টা করে তাদের বলি, 'ভেবেছ যে জেলে গিয়েও তোমরা একসঙ্গে থাকবে ? সে গুড়ে বালি। দুবেনীকে যে পাঠিয়ে দেবে মতিহারীর মেয়েদের জেলে !'

'রামজীর মনে যা আছে, তা তো হবেই।'—একগাল হেসে জবাব দিয়েছিল দুবেজী।

রামজীর মনে কী ছিল তিনিই জানেন ; হিসাব গুলিয়ে দিল থানার দারোগা। দুবেনীকে যথাসময়ে পুলিশ জেলে ধরে নিয়ে গেল ; কিন্তু বাহাত্তুরে বুড়ো বলে দুবেকে গ্রেপ্তার করতে বারণ করলেন দারোগাসাহেব। সে পরিচিত প্রত্যেকের দুয়োরে গিয়ে মাথা কোটে, দারোগাসাহেবের কাছে একটু তদ্‌বির করে, তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবার জন্য।

কিছুতেই কিছু হল না।

দিনকয়েক পর দেখা গেল দুবেনী গভর্ণমেণ্টের কাছে মাফ চেয়ে মুচলেকা লিখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এ নিয়ে একেবারে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল। চড়ুইনীর বেহায়াপনায় সবচেয়ে মর্মাহত হল কানা মুসাফিরলাল। তার বিশ্বাস দুবেনী দুবেজীকে ছেড়ে না থাকতে পেরেই বেরিয়ে এসেছে।—এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও ?

দুবেনী কারও ঠাট্টা-বিদ্রুপের একটি কথারও জবাব দেয়নি। শুধু তার দৈনিক রামজীর পুজো আগের চেয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর দুবেজী ছেড়ে ছিল লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা।

আমার সঙ্গে দুবেজীর অন্তরঙ্গতা ছিল সবচেয়ে বেশি। 'নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি'—বাঙালী কবির এই পদটির মানে তাকে বুঝিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করি, 'দুবেনীরও কি তাই ?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে পালটা প্রশ্ন করে—'রামজীরও কি সীতাজীর জন্য এমনি হত নাকি ?'

'সে কথা তো বলতে পারি না ; তবে শ্রীকৃষ্ণের হত রাধিকার জন্য।'

'আরে কিষুণজী-ভগবানও যা, রামজীও তাই।'

আমি নাছোড়বান্দা ! আবারও জিজ্ঞাসা করলাম—জেলে এঁটোকাঁটার বাছবিচার নেই বলেই কি দুবেনী থাকতে পারল না সেখানে ?'

এত অপ্রতিভ দুবেজীকে এর আগে কখনও হতে দেখিনি। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কাঁচুমাচু মুখে উত্তর দেয়—'আপনার কাছে বলেই বলছি আসল কথাটা। জেলে গেলে পাপ-মোচন হয় রামজীর চোখে। সেই জন্যই আমাদের জেলে যাবার এত আকাঙ্ক্ষা। দুবেনী বলে যে, জেলে গিয়ে পাপ খণ্ডন করতে হত আমাদের দুজনকেই ; কিন্তু তোমার কপালে যে রামজী তা লেখেননি। আমাদের জীবন যখন একসঙ্গে গাঁথা, তখন আমার একার পাপ-মোচনের চেষ্টায় কী হবে ? তাই দুবেনী মাপ চেয়ে বেরিয়ে এসেছে।'

দুবেজীর চোখ ছলছল করছে ! হতাশার ছাপ চোখেমুখে সুস্পষ্ট ! যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে। গলার স্বর অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।—রামচন্দ্রজী যে কিছুতেই তাদের দোষ ক্ষমা করবেন না !—

তাদের মনের এক অজ্ঞাত দুয়ার খুলে গেল আমার কাছে। পুণ্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা নেই অথচ রামচন্দ্রজীকে খুশী করে পাপমুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল।—আবার পাপমোচনের অনুষ্ঠানটি হওয়া চাই দুজনের একসঙ্গে ; একার চেষ্টা নিস্ফল হবে ! অদ্ভুত ! আমাদের জটিল মন দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় না তাদের সরল মনের যুক্তির ধারা। তবে তার বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

দুবেজীর মনমরা ভাব দিন দিনই বেড়ে চলে এর পর থেকে। বয়সের জন্য শরীর ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছিল আগে থেকেই। এখন যেন আরও তাড়াতাড়ি খারাপ হতে লাগল। রোজগারের কাজে কোনোদিনই বিশেষ মন ছিল না। তার পেটচালানোর জন্য যেটুকুনি ছাড়া। বেতো টাট্টু ঘোড়াটার পিঠে চড়ে কাছাকাছি গ্রামের চাষাদের কাছ থেকে ভ্যারেণ্ডার বিচি, ছোলা, তামাক, সরষে কিনে এনে হাটের গোলাদারের কাছে বিক্রি করা, এই ছিল তার এতকাল পেশা। এখন সে বাড়ি থেকে বার হওয়া বন্ধ করে দেয়। গোলাদারকে বলে দিল যে, এই বয়সে ঘোড়ায় চড়ে বেরুনো আমার সামর্থ্যে কুলোয় না। গোলাদার জিজ্ঞাসা করে—'তবে খাবে কী ?'

দুবেজী উত্তর দেয় না। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুশকিল হল দুবেনীরই। দুটি পেটের অন্ন যোগানো সোজা নয়। সে দূরে গ্রাম থেকে মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে আসে, আমাদের কাছে দু-চারটে টাকার জন্য। আমরা সাধ্যমতো দিই। যখন নিজেদের সাধ্যে কুলোয় না, তখন চকাচকীর জন্য অন্য লোকের কাছেও হাত পাতি। আমাদের জন্য তারা অনেক করেছে এক সময়ে, তাদের অসময়ে একটুও করব না ?'—

কিন্তু এ মনের ভাব বেশিদিন রাখা গেল না—তাদের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও। পরের জন্য লোকের কাছে হাত পাততে কতদিন আর ভাল লাগে। কিছুদিন পর এমন হল যে, দুবেনীকে দূর থেকে দেখলেই আমরা পাশ কাটাবার চেষ্টা করি। কানা মুসাফিরলাল একদিন বলেই ফেলল তাকে—'এখানে কি টাকার গাছ আছে ? আমরা নিজেরাই বলে চেয়েচিন্তে কোনোরকমে কাজ চালাই—তোমাদের দেশ কোন্ জেলায় ? কখন বলো বালিয়া, কখন বলো সারন, কখনও বলো ভোজপুর ! কিছু বুঝেও তো পাই না। নিজেদের দেশে চিঠি লেখ না কেন টাকার জন্য ? তিনকুলে কেউ নেই, এমন লোকও হয় নাকি পৃথিবীতে ?'

দুবেনী শুনেও শোনে না মুসাফিরলালের কথা। আমাকে বলে—'আপনাদের দুবেজী কী মানুষ ছিল, কী হয়ে গিয়েছে। আমার কথারও জবাব দেয় না আজ ক'দিন থেকে। কী সব বিড়বিড় করে বকে। মাঝে মাঝে টিনের চালের উপর উঠে বসে থাকে হাতুড়ি পেরেক নিয়ে। বলে, বর্ষা আসছে। চাল মেরামত করছি।'—

দুবের চেয়ে দুবেনীর কথাই আমার বেশি মনে হয়, তার বিষাদে ভরা মুখখানি দেখে। তাকানো আর যায় না সেদিকে ! বাহাত্তুরে-ধরা বুড়োর জন্য দুটো টাকা দিয়ে তখনকার মতো নিস্কৃতি পাই।

তারপর মাসখানেক আর দেখা নেই দুবেনীর। টাকা নিতে আসে না

দেখে অস্বস্তিই লাগে। প্রত্যাশিত বিপদ না ঘটতে দেখলে হয় না একরকম? মুসাফিরলাল সন্দেহ করল যে, হাটের বুড়ো জমিদারবাবু নিশ্চয়ই টাকা দিচ্ছে ওকে—পুরনো দিনের কথা মনে করে। ভাল চোখটি কৌতুকে ভরা।—তোমরা শুধু দেশ দেশ করেই মরলে—আশপাশে দুনিয়ার পুরনো ইতিহাসের কতটুকু খবর রাখ।—

একদিন দুবেনী এল, চোখে জল নিয়ে।

—দুবেজীর খুব অসুখ। কিছুদিন আগে হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে, দুবেনী বড়ো রোগা হয়ে গিয়েছে।…তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর উঠে এসে এই কবজিটি আঙুলের বেড় দিয়ে মেপে বলল—তুই দেড় আঙুল রোগা হয়ে গিয়েছিস! দাঁড়া, দেখিয়ে দিচ্ছি পয়সা রোজগার করতে পারি কি না।… ঘোড়ার পিঠে বোরা চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। কত মানা করলাম। মাথা কুটলাম পায়ে। শুনল না। সে বুঝ কি এখন আর আছে?…বেশি দূর যেতে হয়নি। পারবে কেন! ঘোড়াটাকে সন্ধ্যার সময় খালিপিঠে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে ফিরে আসতে দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠেছে। গোলাদারের কাছে কেঁদে পড়ি। সে লোক পাঠাল চারিদিকে! কিছুক্ষণ পরেই পুরানদাহার লোকেরা গোরুর গাড়িতে করে দুবেজীকে পেঁছে দিয়ে গেল আমার কাছে। তখন বেহুঁশ একেবারে! ঘোড়া থেকে পড়ে, মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা তখনই আপনাদের এখানে নিয়ে আসি। কিন্তু গোলাদার বিসারিয়ার ডাক্তারকে ডেকে পাঠালে। ডাক্তারবাবু বললেন, এখন নড়াচড়া করলে রুগী বাঁচবে না।… তারপর থেকে তো চলছেই। চোখ খুলল তিন দিন পরে। জ্ঞানও তেমনি জ্ঞান! ঐ এক রকমের জবুথবু অবস্থা! না পারে লোক চিনতে, না পারে কিছু বলতে। শুধু তাকায়। আমার দিকে তাকায় কিন্তু আমাকেও চিনতে পারে না। মুখে দুধ দিলে বেশ ঢুকঢুক করে খায়।…ডাক্তার বলেছে খাওয়াতে বেশি করে। ঘোড়াটাকে বিক্রি করে তো এতদিন ওষুধপথ্য চলল।…আপনাদের কাছে আসবার ফুরসতই পাই না রুগী ফেলে।—আজ মুদীর ছেলেটাকে বাবা-বাছা বলে বসিয়ে এসেছি। কে জানে থাকবে কিনা এতক্ষণ।—সেইজন্যই বাস-এ এলাম এক টাকা খরচ করে।'

দুবেনীর দুঃখের কাহিনী আর শেষ হয় না। বুঝলাম এখন দরকার টাকার। বেশি টাকার। মেয়েমানুষের চোখে জল দেখলেই আমি কী রকম অভিভূত গোছের যেন হয়ে যাই। দুঃস্থ রাজনীতিক কর্মীদের সাহায্যের জন্য আমার কাছে একটি 'ফাণ্ড' ছিল। তার থেকে দু'শ টাকা আমি দুবেনীকে দিলাম। তাকে বাস-এ চড়িয়ে দিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন মুসাফিরলাল সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে।—পাবলিকের টাকা এরকম না-হক খরচ করা, আর যে-কেউ বরদাস্ত করুক, সে করবে না। দুবে জেলে যায়নি, তার স্ত্রী মাপ চেয়ে বেরিয়েছে জেল থেকে—ওরা আবার রাজনীতিক কর্মী হল কবে থেকে?—

মুসাফিরলাল আমায় শাসিয়ে দিল যে, আসছে মিটিঙে সে এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না।

দিন দুই-তিন পরে দুবেজীকে দেখতে গেলাম তাদের বাড়িতে। বাড়ি মানে তো একখানি ঘর—ঘরের দেওয়াল, চাল সব কেরোসিন তেলের টিন কেটে, দুবে-

দুবেনীর নিজ হাতে তৈরি করা। দোকান বলো, শোবার ঘর বলো, অতিথিশালা, ঠাকুরঘর বলো, সব এরই মধ্যে। সেই ঘরখানিকে ঘিরে কুতূহলী দর্শকের ভিড় জমেছে। ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি, ঘরের যে কোণায় রঙিন কাগজের রথের মধ্যে রামজীর মূর্তি আছে, তারই সম্মুখে একটি গোরু দাঁড়িয়ে। সুন্দর নধর গাইটি। ঘরের মধ্যে খাটিয়ায় দুবেজী শুয়ে। চোখ বোজা। দুবেনী খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে দুবের একখান হাত ছুঁয়ে রয়েছে; ডান হাত গোরুটির গায়ে। পুরুত মন্ত্র পড়ছে। গোদান করছে দুবেনী। দুবেজীকে ছুঁয়ে থেকে রামচন্দ্রজীকে বুঝোবার প্রয়াস পাচ্ছে যে, গোদান করছে তারা দুজনে মিলে।

পুরুত চলে গেলে দুবেনীর কথা বলবার সময় হল।

—'দুবেজীর আজ দুদিন থেকে কোনো সাড়া নেই। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গোদান করবার। তাই আপনার দেওয়া দু'শ টাকা দিয়ে গোরু কিনেছিলাম! জানি না এতেও রামজী আমাদের মতো পাপীদের উপর কৃপাদৃষ্টি করবেন কিনা। ওই মুখে আগেও যেমন হাসি দেখেছি, এখনও তেমনি। মুচকে হাসছেন। ও হাসি দেখলেই আমার ভয়-ভয় করে—বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। আমাদের দুজনের পাপমোচনের দরখাস্ত উনি নামঞ্জুর করেছেন বলেই বোধ হয় এই দুষ্টুমির হাসি মুখে! বলছেন—পাপীর মুক্তি কি অত সোজা!'—

—দুবেনীরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাপমোচনের চেষ্টা এদের একটা বাতিকের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে! টাকা দিলাম ওষুধ-পথ্যর জন্য, খরচ করে দিল গোদানে! আমারই ভুল। নগদ টাকা না দিয়ে ওষুধ-পথ্য কিনে দেওয়া উচিত ছিল! এদের মনের নাগাল পাওয়া দায়!—

দুবেজীকে ঐ অবস্থায় ফেলে চলে আসতে মন সরল না। থেকে গেলাম সেখানে সেদিন! বুঝলাম যে, দুবেজীর আর দেরি নেই।

সে রাত্রে আমি দুবেজীর মাথার কাছে পাখা হাতে বসে ঢুলছি। আমি থাকায় দুবেনী একটু মনে বল পেয়েছে। সে হাত জোড় করে বসে আছে রামজীর রথের সম্মুখে। ধ্যান করছে চোখ বুঁজে। পাপীদের দরখাস্ত-নামঞ্জুর-করা হাসিটি পাছে চোখে পড়বে ভেবে, চোখ খুলতে সাহস পায় না। নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ হল, কেরোসিন টিন দিয়ে তৈরী ছাপ্পরের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দতে। রামজীকে প্রণাম করে দুবেনী উঠে এল, খাটিয়ার উপর জল পড়ছে কিনা দেখতে।—বৃষ্টি পড়বার সময় খাটিয়া মধ্যে মধ্যে সরাতে হয়। এখন বাবুজী আছে। দুজন লোক না হলে খাটিয়া সরানো যায় না। তখন মাটির ভাঁড় রাখতে হয় খাটিয়ার উপর। ভাগ্যিস ও পাগল কদিন থেকে বেহুঁশ হয়ে আছে, নইলে এই রাত দুপুরেই হয়তো বাতিক উঠত, হাতুড়ি পেরেক নিয়ে চালের উপর উঠবার!—

খাটিয়া সরানো হল। কুপীর মৃদু আলোতেও বোঝা গেল দুবেনী কাঁদছে।

'বাবুজী, বিপদের সময় তুমি যা করেছ, সে ঋণ আমাদের গায়ের চামড়া দিয়ে তোমার পায়ের জুতো তয়ের করে দিলেও শোধ হবার নয়।'—

আচমকা এই অলংকারবহুল কৃতজ্ঞতা নিবেদনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এ তো দুবেনীর স্বাভাবিক ভাষা নয়। অথচ কান্নার ফাঁক দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা কথা! এতক্ষণ ধরে জপে বসেও সে নিজের মনকে শান্ত করতে

পারেনি। ঝড় বয়ে চলেছে মনের মধ্যে তার। 'আমাদের গায়ের চামড়া'—'আমাদের পাপ'!—'আমার' না বলে 'আমাদের' বলা তাদের চিরকালের অভ্যাস। এখনকার এই বিহ্বলতার মধ্যেও সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয়নি!—খাটিয়ার ওদিক থেকে আমারই দিকে আসছে দুবেনী! শঙ্কা, দ্বিধা চোখের জলেও ঢাকা পড়েনি। আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।—দ্বিধা কাটিয়ে, চোখের জল ছাপিয়ে, আকুল মিনতি ফুটে উঠল সে চাউনিতে!—বলতে চায় কিছু—অনুরোধ জানাতে চায়।

বলো, বলো, ভয় কী।

আশ্বাসের ইঙ্গিত জানাই। তবু বলতে কি পারে! সব কথা কি বলা যায় সকলকে! অচৈতন্য দুবের দিকে আবার একবার দেখে নিল দুবেনী—কে জানে যদি তার কথা বুঝতে পারে!—পাখাসুদ্ধ আমার হাতখানি সে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে।

'এ কি কাউকে বলবার কথা। তবু বলছি। তোমাকে ছাড়া আর তো কাউকে দেখি না বলবার মতো। একজন কাউকে যে বলতেই হবে। চল্লিশ বছর ধরে চেপে চেপে কথাটা একেবারে জমে পাথর হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে! তবু রামজী ক্ষমা করেননি আমাদের।—ডাক্তারবাবু পরিষ্কার না বললেও ঘুরিয়ে বলেছেন যে, রুগী আর দু-চার দিনের বেশি বাঁচবে না। আমিও সে কথা বুঝতে পেরেছি।—সেইজন্য একটা কথা বলার দরকার হয়েছে তোমার কাছে। শুনে আমাদের কী মনে করবে তাও জানি। তবু বলছি।—আমার কথা রাখতে হবে একটা। রাখবে? আগে কথা দাও, তবে বলব।'—

কথা দিলাম।

'শোনো তবে বলি। যে কথা বলিনি চল্লিশ বছর থেকে। পোড়া মুখ! আমি দুবেজীর নিকট-আত্মীয়া। দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক। ফিরবার পথ জন্মের মতো বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম। যাক, সেসব ছেড়ে এসেছিলাম বলে দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও! কিন্তু নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে দুবেজী চলে যাবে, তা কি হয়? মুখে আগুনটুকু পাবে না? তবে আর লোকের ছেলে হয় কিসের জন্য? ছেলের হাতের জল পেলে সে পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যেতে পারে। আমার মন যে তাই বলছে। নিজের জন্য ভাবি না; আমার বরাতে যা লেখা আছে তাই হবে। কিন্তু ওর যে রাস্তা রয়েছে পাপ খণ্ডাবার। তুমি বাবুজী, ওর ছেলেকে যেমন করে হোক নিয়ে এস বাড়ি থেকে। সাহাবাদ জেলা,—সাসারাম থানা—হরকতমাহী গ্রামের পচ্ছিমটোলা। চিঠি দিলে আসবে না। ধরে আনতে হবে। আমি আছি জানলে আসবে না; বলে দিও মরে গিয়েছে; তাহলে এক যদি আসে!···না কোরো না বাবুজী। আমাকে কথা দিয়েছ!···

সাংসারিক জীবনের সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না। তবু জড়িয়ে পড়লাম এদের নিভৃত পারিবারিক জীবনের সঙ্গে। দিন তিনেক পর সাহাবাদ জেলার এক গ্রামে গিয়ে দুবেজীর ছেলের সঙ্গে দেখা করলাম। নাতিপুতিওয়ালা ঘোর সংসারী লোক। বাবা মৃত্যুশয্যায় শুনেও আমলই দিতে চায় না প্রথমটায়। রুক্ষ মেজাজ। তার মা বেঁচে আছেন কি না, জিজ্ঞেস করায় রুক্ষ স্বরে জানিয়ে দিল যে, তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্বর্গে গিয়েছেন। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে,

তাদের বাড়ির জেনানাদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের কৌতূহল সে পছন্দ করে না। বাবার কথা তার মনে নেই, তাই তাকে নিয়েও মাথা ঘামাতে চায় না। বুঝলাম যে, এতদিনকার ভুলে-যাওয়া পারিবারিক কলঙ্কটাকে নিয়ে সে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাচ্ছে না। তাদের সেই আত্মীয়টি মারা গিয়েছে, এই মিথ্যা সংবাদটি পেয়েও তার মন ভিজল না। তখন আমি অন্য রাস্তা নিলাম। দুবেজী সেখানে একজন মস্ত লীডার, এ খবর শুনে একটু যেন তার উদাসীনতা কাটল। তখন ছাড়লাম ব্রহ্মাস্ত্র।—'দুবেজী সেখানে বাড়িঘরদোর করেছে। বাজারের উপর দোকান। তুমি না গেলে সেসব সাতভূতে লুটেপুটে খাবে। সেগুলো বিক্রি করে আসবার জন্যও তো তোমার যাওয়া দরকার।'

'বাড়ি কি খাপরার?'

'না। টিনের।'

মিথ্যা বলিনি। বাড়ি যে কেরোসিনের টিন দিয়ে তৈরি, শুধু সেই কথাটি খুলে বললাম না। এই ওষুধেই কাজ হল।

তাকে সঙ্গে নিয়ে এক সন্ধ্যায় যখন ধামদাহা-হাটে পৌঁছলাম, তখন দুবেজীর শবদেহ বার হচ্ছে। কানা মুসাফিরলালের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। আশপাশের গ্রামের রাজনৈতিক কর্মীদের সে ডাকিয়ে এনেছে। বিস্তর লোক জমেছে। নিশান, শোভাযাত্রা, অ্যাসিটিলিন আলো,—যেমন হওয়া উচিত, তার চেয়েও অনেক বেশি।

আমাদের দেখেই মুসাফিরলাল এগিয়ে এল। তাকে আলাদা দূরে নিয়ে গিয়ে বলে দিলাম যে, এ হচ্ছে দুবেজীর ছেলে,—তাকে যেন কিছু গোলমেলে কথা না জিজ্ঞাসা করা হয়।

'ছেলে?'

মুসাফিরলাল অবাক হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় আমাকে শোনাল দুবেজীর মৃত্যুর চেয়েও চাঞ্চল্যকর খবর।

'দুবেনী পালিয়েছে! আমি এখানে এসেছিলাম পরশু রাতে, তোমার খোঁজে। তখনও দুবেনী ছিল। আমাকে রুগীর কাছে বসিয়ে সে একটা ছুতো করে বাইরে যায়। আর ফেরেনি।—বুঝলে ব্যাপারটা?—বিদেশে এক কানা-কড়িও না নিয়ে যে রোজগারের ধান্দায় আসে, সে কি কখনও বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে প্রথমেই?—এসে, মাথা গুঁজবার মতো একটা জায়গা করে নিয়ে তবে না লোকে বউ আনে? আমি চিরকাল বলেছি—'

তার কথা শেষ পর্যন্ত শোনবার উৎসাহ তখন আমার নেই। বুঝলাম যে, মুসাফিরলাল এখানে আসায় দুবেনী হাতে স্বর্গ পেয়েছিল; সে না এলে রুগীকে একেবারে একা ফেলে বোধ হয় দুবেনী পালাতে পারত না। মুসাফিরলাল এখনও বোধ হয় ভাবছে যে, সে পালিয়েছে রুগীর সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে।—কিন্তু আমি তো জানি!—দুবেকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে চলে যাবার সময় তার বুক ফেটে গিয়েছে। তবু নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়ে, সে দুবের একার পাপমোচনের ব্যবস্থা করে গিয়েছে!—

একটি ছোট্ট নদীর ধারে শ্মশানঘাট। ভাদ্র মাস। শ্মশানঘাটের কাছটুকু ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জলে ভরা। যেখানে জল নেই, সেখানে কাশের বন। চিতা জ্বলছে। আলো পড়ে ওপারের অন্ধকারের বুকে কাশফুলের চুনকাম বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুবেজীর ছেলে একটিও কথা বলেনি এখন পর্যন্ত; বোধ হয়

বাড়ি দেখে হতাশ হয়েছে।—সকলেই চুপচাপ।—হঠাৎ ওপারের কাশবন নড়ে উঠল—চুনকামের মধ্যে যেন একটু ফাঁক—স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই—কাশের সমুদ্রের মধ্যে খসখসানির ঢেউটা মিলিয়ে গেল।—

বুঝলাম।—হয়তো আমার সন্দেহ মাত্র! ভুলেও হতে পারে! কে জানে।

সকলেই সেইদিকে তাকিয়ে। দুবের ছেলেও।

মুসাফিরলাল বলে—'শিয়াল-টিয়াল হবে বোধ হয়।' তাকিয়ে দেখি তার ভাল চোখটির উপর চিতার আলো পড়েছে! দরদে ভরা! তার পরিচিত কুটিল দৃষ্টি গেল কোথায়?

সেও বুঝেছে, আমি যা বুঝেছি। শিয়ালের কথা তুলেছে, যাতে বাকি সকলে আর ও নিয়ে মাথা না ঘামায়—ওদিকে আর না তাকায়।

এই প্রথম কানা মুসাফিরলালকে খুব ভাল লাগল; তার ভাল চোখের চাউনিটিকেও।

## বৈয়াকরণ

—টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে। ক্লাসে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। একটু যেন তেষ্টা পেয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। এখনই আবার ক্লাসে গিয়ে চেঁচাতে হবে—গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া ভাল। টেবিলের উপর মৌলবীসাহেবের পা দুটো নড়ছে। পাশেই পানের কৌটো। কৌটোটার ভিতর থেকে খানিকটা ভিজা খয়েরী নেকড়া বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই গা ঘিনঘিন করে—দিনরাত দাঁত খোঁটেন মৌলবীসাহেব আঙুল দিয়ে—হাত ধোয়া নেই, কিছু না, সেই হাতেই পান বার করে খাবেন। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই। এই সব অনাচারের মধ্যে রাখা জল খেতে মন সরে না। তাঁর দিককার দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো জল-তুলবার দড়িটা পেড়ে নিলেন পণ্ডিতজী। আর এক হাতে লোটা! নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি—পুজো আহ্নিক করেন—শুদ্ধাচারে থাকেন—কুক্কুটাণ্ড দেখলে বমি ঠেলে আসে। ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করতেন, তখন তেওয়ারী চাপরাসীটা জল তুলে এনে দিত। এখানে সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনি; জেলা স্কুলের চাকরি থেকে পেনসন নেবার পর মেয়েস্কুলে চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু ক'টা টাকার জন্য নিজের আচার-বিচার বিসর্জন দিতে আসেননি এখানে। স্কুলের দাইদের হাতের জল কি তিনি খেতে পারেন? লোটা মেজে নিজ হাতে ইঁদারা থেকে জল তুলে, আলগোছে ঢকঢক করে খেয়ে যা তৃপ্তি, তা কি কখনও অপরের এনে দেওয়া জলে পাওয়া যায়?—

আজ মাস দুয়েক থেকে পণ্ডিতজীর মনটা ভাল যাচ্ছে না। একটি মুমূর্ষু মহিলার মুখ থেকে নির্গত একটি বাক্য, তাঁর কর্ণগোচর হবার পর থেকে অষ্টপ্রহর তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। বাক্য নয়, বাক্যের একটি শব্দ। না না, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু নেই; এ হচ্ছে নিছক একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। মনের এই অস্থিরতার জন্য পণ্ডিতজী আজকাল নিজে উপযাচক হয়ে মৌলবীসাহেবের সঙ্গে বেশি করে গল্প করা আরম্ভ করেছেন।

—আর যদি তিনি স্কুলের দাইদের হাতের জল খেতেনও, তাহলেও কি এখান থেকে চেঁচিয়ে দাইকে ডেকে এক গ্লাস জল আনতে বলতে পারতেন?—

'মৌলবীসাহেব, কোনো-একটা কাজে এখান থেকে দাই বলে চিৎকার করতে লজ্জা করে না ?'

'লজ্জা মনে করলেই লজ্জা। দাই বলতে দ্বিধা হয় তো হরখুরমা বলে ডাকলেই পারেন।'

—মৌলবীসাহেব ঠিক বুঝতে পারেননি কেন এই দ্বিধা, কিসের এই লজ্জা। সে দ্বিধাটুকু ও'র মনে জাগে না যে কেন, তাই আশ্চর্য ! দ্বৈ বিধে—দ্বিধা—তদ্ধিতান্ত শব্দ।

'মেয়েস্কুলের পুরুষ শিক্ষক। আমাদের অবস্থাটা এখানে একটু কেমন-কেমন না ?'

আফিংখোর মৌলবীসাহেব এতক্ষণে চোখ খুললেন পণ্ডিতজীর কথার সমর্থনে একটু রসিকতা করবার জন্য।

'আপনাদের সান্‌সকিতে' আছে না—হাংস মধ্যে বগুলা যথা—তেমনি আর কী আমরা এখানে।'

না। ঠিক এই ভাবটার কথা পণ্ডিতজী বলতে চাননি। তবু মৌলবী-সাহেবের কথার প্রতিবাদ সোজাসুজি করতে পারলেন না। স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য ভুলে একটু খোঁচা দিয়ে কথা বললেন।

'আপনাকে আর বক বলি কী করে। বকের পালকের মতো আপনার সাদা চুল আর দাড়ি, আবার ভ্রমরের মতো কালো হয়ে উঠেছে। আপনি বক কেন হতে যাবেন—আপনি হলেন ভ্রমর।'

সম্প্রতি মৌলবীসাহেব আবার আর-একটা নতুন বিবি ঘরে আনবেন ঠিক করেছেন। কালো কুচকুচে দাড়িগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—'হাতি চলে বাজারে, কুকুর ডাকে হাজারে।'

'কিন্তু বুঝলেন কিনা মৌলবীসাহেব—সেই হাতি যখন পাঁকে পড়ে।'

মৌলবীসাহেব কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না।

'আপনি চুল সাদা রেখেছেন বলে বলছেন। না ? বগুলা-ভকত (বকধার্মিক) দেখতে সাদাই হয়।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল মৌলবীসাহেব। সে হাসিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেও পারলেন না পণ্ডিতজী। বকধার্মিক শব্দটা তীরের মতো তাঁর মনের গভীরে গিয়ে বিঁধেছে। আজ দুই মাস থেকে যে কথাটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে, তারই সঙ্গে যেন বকধার্মিক কথাটার সম্বন্ধ আছে। আচমকা একটা স্পর্শকাতর জায়গায় ঘষটানি লেগেছে। মৌলবীসাহেব নিজের খেয়াল-খুশিতেই অষ্টপ্রহর মশগুল। পণ্ডিতজীর মুখ-চোখের চকিতের বৈলক্ষণ্য তাঁর নজরে নড়ল না। তাঁর টেবিলে-তোলা নড়ন্ত পা দুটোকে দেখে হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল পণ্ডিতজীর মন। চাকরি জীবনে অনেক কিছুই গা-সওয়া করে নিতে হয়। এখানে আসা থেকে অনেক কিছুই সইয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে। মেয়েস্কুলে তাঁদের গতিবিধি অবাধ নয় ; সর্বত্র বাঞ্ছিতও নয়। স্কুলঘর থেকে একটু দূরে তাঁদের এই ঘরখানি। আগে ছিল স্কুলের ঝাড়ুদারনীর ঘর। এখন সেই ছোট্‌টো ঘরখানার মধ্যে পাতা হয়েছে একখানা টেবিল, দুপাশে দুখানা চেয়ার। টেবিলখানাকে দিয়ে অলিখিত আইনে তাঁরা ঘরখানাকে হিন্দুস্থান পাকিস্তানে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন ; একদিকে থাকে ঘটি, আর একদিকে থাকে বদনা। নিজের ঘটিটাকে নিয়ে তিনি বার হলেন ঘর থেকে। বহুকাল তিনি আর

মৌলবীসাহেব একসঙ্গে কাজ করেছেন জেলা স্কুলে। কিন্তু তাঁর পা-দোলানো এত খারাপ এর আগে আর কখনও লাগেনি। ক্লাসে গিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পা-দোলানো তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হেডমাস্টারমশায়রা বলে বলে হার মেনে গিয়েছিলেন; মৌলবীসাহেব তাঁদের ধমক পর্যন্ত গায়ে মাখতেন না। এমন একটা খোশমেজাজী লোক হঠাৎ তাঁকে বকধার্মিক বললেন কেন? নিজের জানতে তিনি তো মিথ্যাচার কখনও করেন না। টোলে পড়বার সময় কিশোর বয়সে একবার কৃচ্ছ্রসাধনার বাতিক জেগেছিল। তাঁর জীবন-যাত্রায় আজও তার রেশ রয়ে গিয়েছে। সৎ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক বলে পাড়ায় তাঁর খ্যাতি। তিনি নেপালের মহাকালী দর্শন করে এসেছেন, কলকাত্তাবালী কালীর চরণে জবাপুষ্প দেবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, কামরূপ কামাখ্যায়ও তিনি সস্ত্রীক তীর্থ করে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সদাচারের মধ্যে কোথাও তো একটুও ফাঁকি নেই! তিনি যা নন তা দেখাতে তো কোনোদিন চেষ্টা করেননি! তবে কেন মৌলবীসাহেব তাঁকে বকধার্মিক ভাবলেন? টোলে পড়বার সময় সেখানকার পণ্ডিতমশাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন 'তুরন্ত, তুমি ব্যাকরণ পড়ো। কাব্য পড়ে কী হবে? বড় মনকে চঞ্চল করে ও জিনিস। বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা লতা। ইন্দ্রিয়াসক্তির অবলম্বনেই কাব্যের রস জীবিত থাকে।' সেইজন্য গুরুর আদেশে, লঘু চাপল্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পণ্ডিতজী মেরুদণ্ডহীন কাব্যের বদলে ব্যাকরণ পড়েছিলেন। ব্যাকরণের বিধানগুলোর মতনই আষ্টেপৃষ্ঠে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। তার মধ্যে বিচ্যুতি নেই। তবে কেন মৌলবীসাহেব অমন কথাটা বললেন? না না, ওটা একটা নির্দোষ রসিকতা—কিছু না। ভেবে বলা—ঠাট্টা করে কথার পৃষ্ঠে বলা কথা মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ও বিশেষণটা কখনই তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আর সেই মুমূর্ষুর উক্তির যে শব্দটি দু'মাস থেকে তাঁর মনে কিরকির করে বিঁধছে, সেটা একটা সর্বনাম; তার উপর বহুবচন। দুটোর মধ্যে কোনো মিল নেই, কোনো সম্পর্ক নেই। শব্দটা হচ্ছে 'ওরা কি ওই চায়!' এই 'ওরা' শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল। সঃ তৌ তে—ওরার অর্থ তে।...

হঠাৎ নজরে পড়ল হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি আসছেন। চোখ নামিয়ে নিলেন; চোখোচোখি হয়ে গেলে অপ্রস্তুত হতে হত। হেডমিস্ট্রেস যখন আসছেন, তখন টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে নিশ্চয়। নিজেদের বসবার ঘরে পৌঁছে তবে মাটি থেকে চোখ তুললেন পণ্ডিতজী। অকূল সমুদ্রের মধ্যে নির্বিঘ্ন দ্বীপ এই ঘরখানি। টেবিলের উপর পা-জোড়া নড়ছে। মৌলবীসাহেবের প্রায় সারাদিনই ছুটি, কেননা সব ক্লাসে উর্দু পড়বার মেয়ে নেই। সংস্কৃতের ছাত্রী এ স্কুলে কম নয়। পণ্ডিতজী নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, অভিভাবকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছাত্রী জুটিয়েছেন; নইলে মেয়েরা আবার আজকাল অন্য সব ফাঁকির বিষয় নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে কী করে, নৈতিক অনুশাসন আসবে কোথা থেকে,—এ কথা কেউ বুঝবে না! মৌলবীসাহেবের কিন্তু ছাত্রী জুটল কিনা, সেসব বিষয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

তাঁর সঙ্গে কোনো কথা না বলে ক্লাসে যাওয়া দেখায় খারাপ; ভেবে নিজে

পারেন যে 'বকধার্মিক' বলবার জন্য চটেছেন তিনি। তাই পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন—'ও মৌলবীসাহেব, ক্লাস নেই নাকি ?'

মৌলবীসাহেব চোখ বুঁজেই উত্তর দিলেন—'আমার আবার টিফিনের পরের পিরিয়ডে কোনোদিন ক্লাস থাকে নাকি ?'

'বেশ আছেন মৌলবীসাহেব।'

'যে যেমন নসিব নিয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ ঝিমুতে ঝিমুতে পা দোলান ; আমি ক্লাস ঠেঙিয়ে আসি।'

নিজের অর্তাকর্তে তিনি আজ মৌলবীসাহেবের প্রতি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করছেন বার বার। কিন্তু যাঁকে বলা তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

'আরে ভাই, যে কটা টাকা মাইনে দেয়, তার বদলে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে পা-দোলানোর মেহনতই যথেষ্ট।'

পাটকরা চাদরখান পণ্ডিতজী কাঁধের উপর সাজিয়ে নিলেন। পাকা গোঁফ-জোড়ার উপর হাতের উলটো পিঠটা বুলিয়ে নিলেন একবার। ঠিক আছে সব। হঠাৎ খটকা লাগল মনে—ছেলেদের স্কুলে চাকরি করবার সময়ও ক্লাসে পড়াতে যাবার আগে, চাদর ও গোঁফের বিন্যাস সম্বন্ধে এত সজাগ থাকতেন ? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একটা বিষয় না স্বীকার করে উপায় নেই ; চিরকাল তিনি নিজের জামাকাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিতেন ; ইদানীং ধোপার বাড়িতে দেন। তবে এসবগুলো ঠিক প্রসাধনকর্ম নয়। দাঁত খুঁটে হাত ধোবার মতো, খেয়ে কুলকুচা করবার মতো নির্দোষ অভ্যাস।···

ঘণ্টা পড়ল। পণ্ডিতজী ক্লাসের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর অসাক্ষাতে সবাই তাঁকে তুরন্ত পণ্ডিত বলে ডাকে। কিন্তু তিনি নিজের নাম দস্তখত করবার সময় লেখেন—তুরন্তলাল মিশ্র, ব্যাকরণতীর্থ। বাড়ির চিঠিতে পর্যন্ত। ব্যাকরণ যেমন তাঁর অস্থিমজ্জায় ঢুকে গিয়েছে, ব্যাকরণতীর্থ পদবীটাও তেমনি তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

প্রতি মাসে একবার করে আগে থেকে কোনো সূচনা না দিয়ে, পুরনো পড়ার পরীক্ষা নেন পণ্ডিতজী। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে আজ এই ক্লাসের ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবেন।

এই ক্লাসের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি বকুনি খায় হেডমিস্ট্রেসের কাছে, সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করে বলে।···মহান্-শব্দঃ মহাঙ্গব্দঃ··· । ছেলেদের দুষ্টু বলা চলে, কিন্তু মেয়েদের দুষ্টু বলতে বাধে। অবাধ্য কথাটাও ঠিক হয় না। হ্যাঁ, একটু চঞ্চল বেশি।···নৃত্যন্-চকোরঃ—নৃত্যংশ্চকোরঃ··· । কোনো ক্লাসের শান্ত-অশান্ত হওয়া নির্ভর করে সেই ক্লাসের লীডারদের সাহসের দৌড় কতদূর, তারই উপর। কিন্তু তিনি চিরকাল লক্ষ্য করে আসছেন যে, সব ক্লাসের ছাত্ররাই সংস্কৃত পণ্ডিতের পিছনে লাগতে ভালবাসে। দেবভাষার অনুস্বারে বিসর্গ সংবলিত উচ্চারণগুলোই ছাত্রছাত্রীদের চোখে সংস্কৃত শিক্ষকদের ছোট করে দেয় কিনা কে জানে ! ব্যাকরণের 'ষষ্ঠী চানাদরে' বিধানটি পড়াবার সময় হাসেনি, এমন ক্লাস তিনি দেখেননি। প্রথম যখন চাকরিতে ঢোকেন, তখন ভাবতেন যে ইংরাজী-না-জানা পণ্ডিত বলেই ছেলেরা তাঁকে উপেক্ষা করে। কতকটা এইজন্য, আর কতকটা ক্লাসে পড়ানোর সুবিধার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টা করে সামান্য ইংরাজী

শিখেছিলেন। এর ফল কিন্তু হয়েছিল উলটো ; ছাত্ররা আরও বেশি করে তাঁর পিছনে লাগত। কিন্তু সেই সামান্য ইংরাজীর জ্ঞানটুকু তাঁর অতি গর্বের জিনিস। সুবিধা পেলেই ক্লাসে জানিয়ে দিতে ছাড়েন না যে তিনি ইংরাজী জানেন।...

এই ক্লাসের লীডার মালবিকা। প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি তার প্রতিটি কথা থেকে ঠিকরে পড়ে ; কিন্তু প্রগল্‌ভতা যেন আর-একটু কম হলেই ভাল হত! ক্লাসের সজীব গুঞ্জনধ্বনি কানে আসছে।...

একটি মেয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখেই ক্লাসে খবর দিল—'তুরন্ত পণ্ডিত আসছে রে!' তিনি ক্লাসে ঢুকলেন হনহন করে—যেন এক মিনিটও সময় নষ্ট করতে চান না! ছাত্রীদের মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ। হাসি চাপবার চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। ছেলেদের স্কুল হলে তিনি বেশ কয়েকটি চপেটাঘাত দিয়ে ক্লাস আরম্ভ করতেন ; কিন্তু মেয়ে-স্কুলে তাঁর সেই চিরাচরিত পদ্ধতি অচল। মেয়েদের গায়ে কী হাত তোলা যায়? মায়ের জাত! দেবীর মতো পূজ্যা কুমারীরা। তাঁদের যুগে এই বয়সের মেয়েদের কবে বিয়ে হয়ে যেত।

ক্লাসের উপযুক্ত বাতাবরণ ফিরিয়ে আনবার জন্য তুরন্ত পণ্ডিত চেঁচিয়ে সুর করে বললেন—'বা-আ-আই ইন্‌টেলেকট্‌'। অর্থাৎ মতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কী হয়? খুব সহজ প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ ; এ শুধু গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছেন ; পরে আস্তে আস্তে শক্ত হবে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রীরা বুঝে গেল, আজ গতিক সুবিধার নয়। অমন হনহন করে ঘরে ঢুকতে দেখে আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এতক্ষণে তিনি তাঁর দৃষ্টি কেন্দ্রিত করেছেন লিলির দিকে। ক্লাসের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটির দিকে তাকাতে তাঁর মনে কোনরূপ সংকোচ আসে না। মেয়েটি কুরূপা।

'এসব নামতার মতো কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। ইউ! ইউ বয়! তুমি বলো!'

সারা ক্লাস হেসে ফেটে পড়ল।

··কেন? হঠাৎ এত হাসির কী হল? মালবিকাই নিশ্চয় আরম্ভ করেছে। ওঃ! অভ্যাসবশে ভুলে 'ইউ বয়' বলে ফেলেছেন! এরকম ভুল তাঁর হয় মাঝে মাঝে। আজ দিনটাই খারাপ যাচ্ছে, সকাল থেকে। আর বুঝি ক্লাসকে শাসনে রাখা যাবে না আজ! নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই পণ্ডিতজী চোখ নামিয়ে নিলেন। মালবিকার মুখে কৌতুকের হাসি!

'একটা কথা বলি পণ্ডিতজী, কিছু মনে করবেন না। আপনার পইতাটা কানে জড়ানো রয়েছে।'

...ছি, ছি, ছি! (পশ্যন্‌-চকিতঃ—পশ্যংশ্চকিতঃ) লজ্জায় পণ্ডিতজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পইতাটা জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নেবার জন্য আরও জোরে সুর করে চেঁচালেন—'বা-অ-আই ইন্‌টেলেকট্‌।'

উচ্চ হাসির রোল তাঁর গলার স্বরকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

হাসতে হাসতেই মালবিকা জিজ্ঞাসা করে—'আজ বুঝি ব্যাকরণের পুরনো পড়া ধরবেন পণ্ডিতজী?'

অন্য দিকে তাকিয়েই পণ্ডিতজী বললেন—'আবার ব্যাকরণ শব্দটির ভুল উচ্চারণ করছ? প্রতিদিন কি একবার করে বলে দিতে হবে?'

উপরের ক্লাসগুলোর সব মেয়েই বাঙালী। অবাঙালীদের আগেই বিয়ে হয়ে যায় বলে তারা অতদূর পৌঁছতে পারে না। বড় ভাল লাগে পণ্ডিতজীর, এইসব বাঙালী মেয়েদের? ওরা হাসতে জানে; ওদের কথার ধ্বনি মৈথিলীর মতো মিষ্টি; কিন্তু এক দোষ ওদের—সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ মোটেই করতে পারে না। বকতে গেলে, হেসে ফেলবে; কী করে শেখাবে বলো এদের! কিন্তু ওদের মুখের ভুল উচ্চারণের ধ্বনিটা শুনতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছা করে, অনেকক্ষণ ধরে শোনেন।…;(মহতী ইচ্ছা—মহতীচ্ছা)…। কুক্কুটাণ্ডলোভী বাঙালী পুরুষরা কবে সাহেব হয়ে যেত; শুধু পারেনি এই মেয়েদের জন্য। নিষ্ঠায়, আচার-বিচারে পুরুষদের বিচ্যুতিটুকু মেয়েরাই পুষিয়ে দিয়েছে বলেই ওদের সমাজটা এখনও ঠিক আছে। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর কোনদিন মিটবার নয়।…

কোন্ কথার কী প্রতিক্রিয়া হয় পণ্ডিতজীর উপর, সেসব ছাত্রীদের মুখস্থ।

'কেমনভাবে ব্যাকরণ উচ্চারণ করব পণ্ডিতজী?'

মালবিকার পাতা ফাঁদে ঠিক পা দিলেন তিনি।

'বলো—বিয়াকরণ, বিয়াকরণ।'

'বিয়া-করণ, বিয়া করণ'—বিয়া আর করণ শব্দ দুটিকে ভেঙে আলাদা করে বলছে সে। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হাসছে। সকলেই নিশ্চিন্ত যে পণ্ডিতজীর পরীক্ষা নেবার ঝাঁজ আজকের মতো কমিয়ে দিয়েছে মালবিকা।

'আবার বলো! ত্রিশবার বলো!'

…এই চটুলা মেয়েটিকে শাসনে রাখা শক্ত। কিন্তু মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল।… মাস দুয়েক আগের সেইদিনকার কথা তিনি ভোলেননি। তখন তাঁর মাথায় অত বড় বিপদ। ছোট শালা স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল এখানে বেড়াতে। শৌখিন মানুষ; দিনে তিনবার চা না হলে চলে না। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে স্টোভ। কে বোঝাতে যাবে এইসব ছেলে-ছোকরাদের যে, বাপদাদারা এতকাল যা করে এসেছে তাই করাই ভাল। হলও কি তাই! স্টোভ ধরাতে গিয়ে শালাজের শাড়িতে আগুন লেগে যায়। ভীষণভাবে পুড়ে যান তিনি। জামা-কাপড়ে আগুন লেগেছিল কিনা, তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে বেগুন-পোড়ার মতো পুড়ে থসথসে হয়ে যায়। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য! সে কী অসহ্য যন্ত্রণা! এখনও মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য, মুখখানি একটুও পোড়েনি! গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে কে বলবে যে তিনি পুড়ে গিয়েছেন। প্রথম একদিন তো অজ্ঞান হয়েই ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে তাঁর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা মোটেই ছিল না, যেতে পারলে যেন বাঁচেন।…সেই সময় বোঝা গিয়েছিল, মালবিকা মেয়েটি কত ভাল। এত প্রগল্‌ভতা সত্ত্বেও কত কোমল ওর হৃদয়। সে এসে বলেছিল—'পণ্ডিতজী, সীতাকুণ্ডের সন্ন্যাসীর দেওয়া একটা পোড়ার ওষুধ মা জানেন, লাগাবেন কি? আস্ত ডাব পুড়িয়ে তয়ের করতে হয়। খুব ভাল ওষুধ; পোড়ার দাগ একেবারে থাকে না।'

তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁর শালার অ্যালোপ্যাথিক ছাড়া আর অন্য কোনো ওষুধে বিশ্বাস নেই। মালবিকাকে সে কথা বললেন। তবু সে পরদিন ওষুধ নিয়ে হাজির তাঁর বাড়িতে। কোথা থেকে ডাব যোগাড় করেছে, কখনই বা মাকে

দিয়ে ওষুধ তৈরি করিয়েছে, সে-ই জানে। কিন্তু সে ওষুধ ব্যবহার করা হয়নি—আজও কৌটোয় অমনি পড়ে আছে। ব্যবহার করলে কী হত কে জানে! তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এসে এত বড় অঘটন ঘটেছিল, তাই নিজেকে আজও দোষী মনে হয়; খানিকটা দায়িত্ব ছিল বৈকি। তাঁর ছোট-শালার মুখের দিকে তাকানো আর যেত না, শালাজ স্বর্গে যাবার পর। অনেক মৃতপত্নীক দেখেছেন, কিন্তু অত মুষড়ে ভেঙে পড়তে আর কাউকে দেখেননি। ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল! বড় অনুরাগ ছিল দুজনকার মধ্যে; সচরাচর দেখা যায় না অমন। এত অনুরাগ, তবু কেন স্বামীর সম্বন্ধে ওরকম ধারণা ছিল সেই পতিব্রতার?···

'হয়ে গেল ত্রিশ বার? গুড্। Expound সমাস—অর্ধদগ্ধ শরীরঃ!'

'অর্ধদগ্ধং শরীরং যস্য সঃ—বহুব্রীহি।'

'গুড্। কিন্তু অর্ধদগ্ধটুকু যে বাকি থেকে গেল।'

'অর্ধং যথা তথা দগ্ধম্···সুপসুপেতি সমাস।'

'গুড্। কিন্তু চংড়ী মছলি খাওয়া বাঙালীরা দন্ত্য স উচ্চারণ করতে পারে না। শমাশ নয়, বলো সমাস। দন্ত্য স দিয়ে।'

'ও তো পণ্ডিতজী সামাসা হয়ে যাচ্ছে।'

'ও ঠিক উচ্চারণ। ওই বলো দশবার!'

···কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখের আধো-আধো বুলি যেরকম ভাল লাগে, সেই রকমই ভাল লাগছে এই মেয়েটির শুদ্ধ উচ্চারণ করবার ব্যর্থ চেষ্টার ধ্বনি। সংগীতের ঝংকারের মতো এর মধ্যেও একটা মিষ্টতা আছে।

···মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ—মধুরঝঙ্কারাঃ।···

'হল দশবার? সিট ডাউন! এবার গৌরী, তুমি বলো। Expound সমাস—মৃতপত্নীকঃ। ভেবে বলো, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। ভয় কিসের?—আশ্‌ন-কতে। আশঙ্কতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। গুড্। সিট ডাউন। নেক্সট্। গীতা নম্বর এক, তুমি বলো। আজকাল গীতা নামটা এত বেশি কেন তোমাদের মধ্যে? কিন্তু নামটি বেশ ভাল। ওরকম গ্রন্থ আর নেই পৃথিবীতে।'

···স্ত্রীর অনুরোধে, তিনি শালাজের মৃত্যুশয্যার পাশে গীতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন শেষ সময়। যাঁকে শোনান, তাঁর তখন শোনবার বা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। আগের দিনও শালাজ কথা বলেছেন; জ্ঞান ছিল পুরো মাত্রায়। যে কথাটি তাঁকে গত দু' মাস থেকে পীড়া দিচ্ছে সেটা তো তার আগের দিনই বলা।···তাঁর স্ত্রী ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তখন শালাজের গায়ে। পুরুষমানুষদের সে ঘরে যাবার উপায় ছিল না। তিনি পাশের ঘরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু কোনো ভরসা দেননি রোগিণী সম্বন্ধে। ননদ কত কী বলে চলেছেন···'খুব কষ্ট হচ্ছে? ওষুধ দিতে লাগছে? ভাবনা কী, সেরে যাবে দিন-কয়েকের মধ্যে। না আবার কিসের? সারবে না! কত লোকের কত শক্ত শক্ত রোগ সেরে যাচ্ছে, আর তোমার এই ঘা-ফোসকাটুকু সারবে না!'

'না না, আমার আর বেঁচে দরকার নেই'···'ছি, ও কথা বলতে নেই।' 'আমার মরে যাওয়াই ভাল।'···'কী যে বলো। কেন, হয়েছে কী তোমার?'··· এর পরের কতকগুলি কথা তিনি মাঝের বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে বুঝতে

পারেননি। একটু পরে আবার কানে এল…'না, সেসব ভেবো না তুমি। সর্বাঙ্গ পুড়েছে তোমার কোথায় ? দেখ দিকিনি, এই ব্যথাবিষের মধ্যেও তোমার মুখখানি কী সুন্দর দেখাচ্ছে !' ·'ওরা কি ওই চায়'…যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দটিও তাঁর কানে এল। অন্তরের তাগিদে বেরিয়ে এসেছে হৃদয়-নিঙড়ানো কথা কয়টি। বাক্যটিই তাঁকে অস্থির করে তুলেছে গত দুই মাস থেকে। কথাটিকে মোটেই লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাণিনির সূত্রের মতোই সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ। বহু টীকা ভাষ্য করেও আজও বোঝা গেল না, ঠিক কী মনে করে মহিলাটি ওই ওরা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন…

'পণ্ডিতজী, আমিও কি সমাসের উচ্চারণ অভ্যাস করব নাকি ?'

'ও, তুমি। নো। তুমি বলো সন্ধি—তদ্-ছবিঃ কী হয় ? তচ্ছবিঃ। গুড। সখী-উক্তম—সখ্যুক্তম্। গুড। বাণী ঔচিত্যম্। ঠিক হচ্ছে। বলো। হ্যাঁ। বাণৌচিত্যম্। গুড। সিট ডাউন। কিন্তু মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ হল না। তোমরা যে দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণ-এর একই উচ্চারণ কর। আচ্ছা এবার বাণী উঠবে। বাণী, তোমার নামের উচ্চারণ করো। সংস্কৃত উচ্চারণ। বাংলা নয়। যে নামের উচ্চারণ করতে পারে না, সে নাম রেখে লাভ কী ? দশবার বলো।'

এই চেষ্টায়, হাসির ধুম পড়ে গেল ক্লাসে। হেডমিস্ট্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে, একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলেন। পণ্ডিতজীর ক্লাসের সময় এ তাঁর ডিউটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে ! ক্লাস শান্ত হয়ে গেল। অপ্রতিভ পণ্ডিতজী কথার খেই হারিয়ে ফেললেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য।

…মালবিকা আসছে। কেন তা তিনি জানেন ! ফাঁকি দিতে পারলে ও ছাড়ে না ; কিন্তু কী বুদ্ধিমতী !…ও গন্ধতেল মাখে। পায়ের নখ কাটে না কেন ?…সে এসে টেবিলের উপর থেকে বাইরে যাবার 'পাস'টা নিয়ে গেল। ছেলেদের স্কুলে এ ব্যবস্থা ছিল না। এ স্কুলেও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাসে 'পাস'-এর ব্যবস্থা নেই। এ তিনি নিজে করেছেন, নিজের ক্লাসের জন্য। পকেটে করে নিয়ে যান প্রতি ক্লাসে। প্রথমে গিয়েই টেবিলের উপর রেখে দেন, যাতে মেয়েদের বাইরে যাবার সময় মুখ ফুটে কথাটা বলতে না হয়। শোভন-অশোভন সম্বন্ধে এত সজাগ কেন তিনি মেয়েদের বেলায় ? এত নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার প্রয়াস কেন ? এসব মেয়েরা তাঁর নাতনীর বয়সী ; তবু কেন তিনি এদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারেন না ? ছেলেদের স্কুলের সেই নিঃসংকোচ ভাব এখানে আসে না কেন ?…ক্লাসে এর পরে কী প্রশ্ন করবেন, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হেডমিস্ট্রেস একবার ক্লাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চলে যাবার পর এমনিই হয়।…স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রীপুংসৌ—দ্বন্দ্ব সমাস নিপাতনে সিদ্ধ—তাঁর বড় পছন্দসই প্রশ্ন, ছেলেদের স্কুলে থাকা কালের। নির্দোষ শব্দটি, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করতে বাধল। আবার খটকা লাগল মনে—আচ্ছা, বাঙালী ছেলেদের মুখের ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত বলা, তাঁর কানে কি এত মিষ্টি লাগত ? মনে পড়েছে আর-একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। ছেলেদের ক্লাসে পড়াবার সময় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন… বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কী হয় বলো। বিম্বোষ্ঠী ও বিম্বোষ্ঠা দুই-ই হয়, এই উত্তর তিনি আশা করতেন কিন্তু এ প্রশ্নটি যে মেয়েদের ক্লাসের অনুপযোগী।

এসব. শব্দ ব্যবহার না করেও যদি পারা যায়, তবে দরকার কী ! কে কোন্ মানেতে নেবে কে জানে। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবাদের মতো তাঁকেও যে সব সময় সতর্ক থাকতে হয় ; কে আবার কী কোথা থেকে বলে দেবে। আচ্ছা ব্যাকরণের অমোঘ বিধানগুলি তো স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ। তবে তাঁর পড়ানোর উপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে কেন ? মেয়েদের বেলা একরকম, ছেলেদের বেলা আর একরকম হয়ে যান কেন তিনি ?…দুজনের মনের ভাবই যে আলাদা। আদর্শ ছাত্র শিক্ষককে গুরু বলে ভক্তি করে—সেটা ভয়ের সম্বন্ধ ; ছাত্রীরা শিক্ষয়িত্রীদের দিদি বলে—সেটা ভালবাসার সম্বন্ধ।…কারণটা ঠিক মনের মতো হল না।…

'লিলি ! কাম্ টু দি বোর্ড।'

যখনই দিশেহারা পণ্ডিতজীর মুখে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবার মতো প্রশ্ন জোগায় না, তখনই তিনি লিলিকে ডাকেন। এই রুগ্না কুরূপা মেয়েটিই তাঁর খেই-হারানো নিবারণের ওষুধ।

'লেখো, ওরা শব্দের সংস্কৃত কী। এর মধ্যে আবার ভাবছ কী ?'

'আমি ভাবছিলাম যে আপনি সমাস না-হয় সন্ধি জিজ্ঞাসা করবেন।'

'বাঃ, বেশ জবাব। তাই শব্দরূপ জিজ্ঞাসা করলে পারবে না ? তুমি হচ্ছ বিদুষীকল্পা—অর্থাৎ ঈষদূনা বিদুষী। বুঝেছ ? সম্ভবত বোঝনি। শব্দরূপ যে জানে না, তার পক্ষে তদ্ধিত বোঝা কঠিন। ব্যাড। গো টু ইয়োর সিট।'

অযথা দরকারের চেয়েও চটে উঠেছেন পণ্ডিতজী। লিলির হাত থেকে খড়ি আর ঝাড়ন তিনি টেনে নিলেন। অন্য কোনো সময়ে হলে তিনি অপেক্ষা করতেন তার খড়ি আর ঝাড়ন যথাস্থানে রাখবার ; তারপর নিতেন।

এতক্ষণে নজরে পড়ল। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর আগে থেকেই লেখা আছে—'বিয়াকরণ শব্দটি দিয়া একটি বাক্য রচনা কর। উত্তর ঃ মৌলবীসাহেবের ন্যায় পুনরায় বৃদ্ধবয়সে শ্রীতাড়াতাড়িলাল মিশ্র, বিয়াকরণতীর্থে যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। গুড। সিট ডাউন।'

মৈথিলী আর বাংলার লিপি একই। সেইজন্য পণ্ডিতজীর বাংলা পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। তুরন্ত শব্দটির হিন্দীতে অর্থ তাড়াতাড়ি। তাই তুরন্তলাল নামটা চিরকাল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের হাসির খোরাক জুটিয়ে এসেছে। চটুলা মালবিকা একদিন তাঁকে তুরন্তলাল নামটার মানে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল। দুষ্টু ছেলেরা তো চিরকাল বাইরে যাবার ছুটি নেবার সময় বলত—তুরন্ত ফিরে আসব পণ্ডিতজী। শুনে ক্লাসসুদ্ধ সবাই হাসত, আর তিনি বেশ উত্তম-মধ্যম প্রহার দিতেন তাদের। কিন্তু তিনি এখানে মনে মনে হাসেন ছাত্রীদের এই সমস্ত রসিকতায়। বাঙালী মেয়েদের সূক্ষ্ম মনের অন্ধিসন্ধিগুলোর সম্বন্ধে কৌতূহলের তাঁর সীমা নেই। বোর্ডের লেখাটি নিশ্চয়ই মালবিকার ; হ্রস্ব.ইকারটা রেফের মতো করে লেখা। সেই জন্যই ক্লাস থেকে পালিয়েছে। শব্দবিন্যাসে কিন্তু বেশ রসনিপুণতা আছে। সারা ক্লাস থেকে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে আসছে। মেয়েরা জানে যে হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে এই ভয়ে পণ্ডিতজী কোনদিন নালিশ করতে যাবেন না তাঁর কাছে। তাই তাদের এত সাহস। মেয়েরা যে সব বোঝে। তারা যে সব সময় বলাবলি করে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় পণ্ডিতজী অন্য শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে চোখ বুঁজে আড়ষ্ট হয়ে কেমন

করে বসেছিলেন। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে, ক্লাসের ছাত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এ নিয়ে যে তারা কত সময় হাসিঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে।

পণ্ডিতজী ঝাড়ন দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করে নিয়ে লিখলেন—সঃ তৌ তে। 'তে বহুবচন, তে মানে ওরা। শব্দটির সঙ্গে ইংরাজী they শব্দটির কী রকম মিল লক্ষ্য করেছ লিলি?' তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে মুখ করেই বলছেন। 'তে'র জায়গায় গিয়ে খড়িসুদ্ধ হাত থেমে গিয়েছে।···সেই সতীসাধ্বী মরবার আগের উক্তিতে বহুবচন ব্যবহার করলেন কেন? 'ওরা কি ওই চায়'। 'ওরা' বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন? নিজের স্বামীর কথাই কি তিনি তখন ভাবছিলেন? 'ওরা' বলতে সমগ্র পুরুষ জাতিকে তিনি বোঝেননি তো? তা কী করে হবে। ওরূপ সামান্যীকরণ যে ভুল, সে কথা নিশ্চয়ই তাঁর শালাজও জানতেন। তাঁর জানাশোনা আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই কত নিষ্ঠাবান সংযমী পণ্ডিত তিনি দেখেছিলেন। সকলে সে-রকম হতে যাবে কেন! স্বামীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্যের তীব্রতা বয়স্থা ননদের সম্মুখে কমাবার জন্যই কি তিনি অনিচ্ছায় একবচনের বদলে বহুবচন ব্যবহার করেছিলেন? নিজের স্বামীর সম্বন্ধেই বা ওরকম ধারণা হল কেন সে পতিব্রতার? কী ভেবে সে মহিলা 'ওরা' বলেছিলেন তিনিই জানেন। দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।···আচ্ছা এই ক্লাসের ছাত্রীরা তাঁকে আর মৌলবীসাহেবকে একই শ্রেণীর লোক বলে ভাবে নাকি? ব্ল্যাকবোর্ডের উপরকার লেখাটা দেখে তো তাই মনে হয়। কেন এরকম ভাবে?···কী দেখে তাঁকেও ওই দলে ফেলল?···

স্কুলের দাই চিঠি নিয়ে ক্লাসে এসে ঢুকল। খামে চিঠি এসেছে পণ্ডিতজীর। ডাকপিয়ন হেডমিস্ট্রেসের কাছে স্কুলের ডাক দিয়ে যায়, তিনি তারপর যার যার চিঠি তার তার কাছে পাঠিয়ে দেন। দাই-এর হাত থেকে চিঠিখানা নেবার সময়, খুব সাবধানে নিলেন পণ্ডিতজী, যাতে দাই-এর আঙুলের সঙ্গে তাঁর আঙুল না ঠেকে। এসব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি সদাজাগ্রত। কিন্তু আজ প্রথম খটকা লাগল মনে। প্রশ্ন করলেন নিজেকে—পরস্ত্রীর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার জন্য এই এত শুচিবাই কেন?—কেন স্ত্রীলোকদের সম্মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারেন না তিনি?

পণ্ডিতজী চিঠিখানা খুললেন। বড় শালা লিখছেন তাঁর দিদিকে। এদেশে স্ত্রীর চিঠি স্বামীর নামেই আসে, তাই খামের উপর তাঁর নাম ছিল। ছোট শালার বিয়ে এক সপ্তাহ পরে; তাই বোন আর ভগ্নীপতিকে যেতে লিখেছেন। ছোট শালা কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হচ্ছিল না; অতি কষ্টে ধরে-বেঁধে রাজী করানো গিয়েছে।

চিঠি পড়েই কী জানি কেন পণ্ডিতজীর মেজাজ বিগড়ে গেল ছোট শালার উপর।—দুই মাসও কাটেনি! সবুর সইছে না! আর কিছুদিন পর করলেই তবু কতকটা শোভন হত!—

'লিলি, বুঝেছ—তে হচ্ছে বহুবচন। সাধারণতঃ অনেক লোককে বোঝায়। কিন্তু বলো তো একজন লোকের বেলায় কখন বহুবচন ব্যবহার হয়? জান না? নেক্সট্! নেক্সট্! এনি বডি ইন্ দি ক্লাস? কেউ জান না?—(মালবিকা থাকলে পারত)—। গৌরবে বহুবচন হয় কেউ জান না? স্ত্রীর উক্তিতে পতির সম্বন্ধে উল্লেখের সময়, সম্মানার্থে বহুবচনের ব্যবহার হতে পারে। বুঝেছ?

পণ্ডিতজী ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন—'গৌরবে বহুবচন'। লেখাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, নিজের বিবেককে আশ্বাস দেবার জন্য। এতক্ষণে তাঁর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরাবার সময় হল। নজর পড়ল লিলির দিকে। কাঁদছে তাঁর বকুনি খেয়ে। ছেলেরা বিলক্ষণ প্রহার খেয়েও কাঁদত না; কিন্তু সামান্য কথাতেই মেয়েদের চোখে জল আসে। তিনি এমন কিছু রূঢ় ভর্ৎসনা করেননি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে কেঁদে ভাসাতে হবে!—

'ললিতা, এবার তুমি বলো। সন্ধি। খুব সহজ প্রশ্ন করব তোমাকে। মধু-উৎসবঃ কী হয়? বানান করে বলো। গুড হ্যাঁ, দীর্ঘউকার, মনে করে রেখো। সমাস করো—দ্বিতীয়া ভার্যা যস্য সঃ। হ্যাঁ। গুড। সিট ডাউন। নেক্সট্। গায়ত্রী, তুমি ভ্রম সংশোধন করো এই বাক্যটির—ভ্রমরাঃ পুষ্পমধু পিবতুম্ ধাবন্তি। না। ভেবে বলো। হল না। এনি বডি ইন্ দি ক্লাস; কেউ পার না?—(মালবিকা এখনও ফেরেনি)!—পিবতুম্ ভুল। পাতুম্ হবে। মনে করে রেখো।'

—আজকে মালবিকাকে বেশ করে বকে দিতে হবে। এ কী অন্যায় কথা! গিয়েছে, সে কি এখন! সমস্ত ঘণ্টাটা বাইরে কাটিয়ে সে আসবে! প্রতিদিন সে এই করে! লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়েছে! এতটুকু আক্কেল নেই—অন্য মেয়েদেরও তো ঐ পাসখানা নেবার দরকার হতে পারে!—

মেয়েরা সকলেই জানে যে পণ্ডিতজীর সবচেয়ে কড়া ধমক হচ্ছে 'ব্যাড' শব্দটি।

মালবিকা এসে ক্লাসে ঢুকল। তার মানে ঘণ্টা শেষ হবে। আর দু-চার মিনিট মাত্র দেরি আছে। পাসখানা পণ্ডিতজীর টেবিলের উপর রাখবার জন্য সে এগিয়ে আসছে। তেলের গন্ধটা নাকে এল।

—শোভনঃ গন্ধ শোভনোগন্ধ। পায়ের আঙুলের নখ কাটে না কেন?—

'অনেক দেরি হল তোমার।'

'আমি তো পণ্ডিতজী পরীক্ষা দিয়ে, বিয়াকরণ আর সামাসার উচ্চারণ শিখে, তারপর গিয়েছি।'

মেয়েটি এমন সব কথা বলবে যে না হেসে উপায় নেই। বড় বড় পাকা গোঁফের মধ্যে হাসিটুকু আটকে গেল। ক্লাসের মেয়েরাও হাসছে। পণ্ডিতজী হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'ক্লাস ফাঁকি দেবার শাস্তি হিসাবে তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।'

'উচ্চারণের পরীক্ষা নাকি পণ্ডিতজী?'

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বলেন, 'না না। তুমি বলো তো বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কী হয়?'

এত সহজ প্রশ্ন? মালবিকার মতো ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া মেয়েকে? ক্লাসের মেয়েরা একটু অবাক হল।

'বিম্বোষ্ঠী, বিম্বোষ্ঠা দুই-ই হয়।'

এতক্ষণে পণ্ডিতজী নিজেকে সামলে নিলেন। গুড, সিট্ ডাউন, বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। মালবিকা ফিরে আসবার এক মুহূর্ত আগেই যে উনি ঠিক করেছিলেন, আসামাত্র আগেই ওকে কড়া ধমক দিতে হবে—ব্যাড বলতে হবে! মুহূর্তের অসংযতচিত্ততায় তিনি ব্যাড বলতে ভুলে গিয়েছেন! শুধু

তাই নয়। আজ প্রথম এই স্কুলে বিশেষাঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছেন। ক্লাসের মেয়েরা কি তাঁর এই বিচ্যুতির কথা ধরতে পেরেছে? আতঙ্ক, বিষাদ, আর অনুশোচনার ছায়া পড়ল তাঁর মনে। মনের কুহেলীর মধ্যে শুধু একটা জিনিস তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। 'ওরা' শব্দের অর্থ'। ভদ্রমহিলা কাউকে বাদ দেননি। পক্ককেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পর্যন্ত না। অদ্ভুত অর্থ-বোধিকা শক্তি কথা কয়টির। বৃথাই তিনি গত দুই মাস থেকে একটি অলঘু বিষয়কে লঘু করবার চেষ্টা করছিলেন, গৌরবে-বহুবচন সূত্র দিয়ে। বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিলেন না।

ঝাড়নখানাকে নিয়ে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা 'গৌরবে বহুবচন' কথা কয়টি মুছে দিলেন। মনের মধ্যে এতদিনকার পোষা আত্মগৌরবটুকুও মুছে গেল এরই সঙ্গে।

'এসব তোমাদের দরকার নেই, বুঝলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসব প্রশ্ন কখনও আসে না।'

ঘণ্টা পড়ল ক্লাস শেষ হবার।

খড়ির গুঁড়ো ফুঁ দিয়েছে উড়িয়ে নেবার ছলে, নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাকরণের সমস্যাটা মিটেছে; কিন্তু অঙ্কর উত্তর মিলে যাবার পরিতৃপ্তি নেই এর মধ্যে। নিজের উপর অপ্রসন্নতায় সব-কিছু খারাপ লাগছে। সবাই সমান—তিনি, মৌলবীসাহেব, ছোটশালা,—সবাই!—গতো ঔৎসুক্যম্—শোভন আচরণের পথ দিয়ে তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে বিশ্রামঘরের দিকে চলেছেন।—আকৃষ্—তঃ আকৃষ্টঃ—। সহস্রজোড়া কুতূহলী চোখ নিশ্চয়ই তাঁকে লক্ষ্য করছে,—চিনে গিয়েছে সবাই তাঁকে—বিবস্ত্র, নগ্ন তিনি আজ—লজ্জার ভারে ঝুঁকে পড়েছেন—ঘরে ঢুকবার আগে চৌকাঠে হোঁচট খেলেন।

টেবিলের উপর মৌলবীসাহেবের পা দুটো নড়ছে, অবিরাম গতিতে। এর জ্বালায় টেবিলের উপর একখানা বই পর্যন্ত রাখবার জো নেই!—পুস্তক হলেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। এই বকধার্মিক বলা লোকটা যদি চোখদুটোও খুলে রাখত পা দোলানোর সময়, তাহলে আর তাঁর কানে পইতা জড়ানো অবস্থায় ক্লাসে যেতে হত না আজ।

'ও মৌলবীসাহেব, ঘুমিয়ে নাকি? একটা কথা বলছি—এতদিন বলি-বলি করেও বলিনি—কিছু মনে করবেন না। আপনি যদি আবার বিবাহ করেন, তাহলে হেডমিস্ট্রেস আর স্কুল কমিটির মেম্বররা বিরক্ত হবেন।'

মৌলবীসাহেব চোখ বোঁজা অবস্থাতেই ছড়া আওড়ালেন, 'জো গুল কি জোহিয়া হ্যায়, উসে রেয়া খার কা খট্‌কা? যে গোলাপ তুলতে চায় তার কি কখনও কাঁটার ভয় করলে চলে?'

—বলা বৃথা লোকটাকে। অলঘুম্ লঘুম্ করোতি—লঘু করোতি ঘ-এ দীর্ঘ উ হবে, বুঝলে মালবিকা।—আচ্ছা, আজকের চিঠিখানির কথা স্ত্রীর কাছে চেপে গেলে কেমন হয়? পোস্টঅফিসে কত চিঠিই তো হারিয়ে যায়। তাহলে তাঁকে আর যেতে হয় না ছোটশালার বিয়েতে।—কিন্তু, মেয়েমানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া কি অত সহজ! তারা যে সব ধরে ফেলে। তারা যে পুরুষদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়।—কোনো উপায় নেই।—তবু তিনি চেষ্টা

করে দেখবেন আজ।—আজ প্রথম জেনেশুনে মিথ্যাচার করবেন।—কিন্তু সত্যিই কি বকধার্মিকের এই প্রথম মিথ্যাচার ?

## ডাকাতের মা

আগে সে ছিল ডাকাতের বউ। সোখীর বাপ মরে যাবার পর থেকে তার পরিচয় ডাকাতের মা বলে।—ডাকাতের মায়ের ঘুম কি পাতলা না হলে চলে! রাতবিরাতে কখন দরজায় টোকা পড়বে তার কি ঠিক আছে! টক্‌টক্‌ করে দু' টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে দলের লোক টাকা দিতে এসেছে। তিনবারের পর আরও একবার হলে বুঝতে হবে যে, সোখী নিজে বাড়ি ফিরল। ছেলের আবার কড়া হুকুম—'তখনই দরজা খুলবি না হুট্‌ করে! খবরদার! দশবার নিঃশ্বাস ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবি। তারপর দরজা খুলবি।'—আরও কত রকমের টোকা মারবার রকমফের আছে। কতবার হয়েছে, কতবার বদলেছে। দুনিয়ায় বিশ্বাস করবে কাকে ? পুলিশকে ঠেকানো যায় ; কিন্তু দলের কারও মনে যখন পাপ ঢোকে তখন তাকে ঠেকানো হয় মুশকিল। দিনকালই পড়েছে অন্যরকম! সোখীর বাপের মুখে শোনা যে, সেকালে দলের কে যেন জখম হয়ে ধরা পড়বার পর, নিজের হাতে জিব কেটে ফেলেছিল—পাছে পুলিশের কাছে দলের সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে। আর আজকাল দেখ! সোখী জেলে গিয়েছে আজ পাঁচ বছর ; প্রথম দু' বছর দলের লোক মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেত ; তিন বছর থেকে আর দেয় না। এ কি কখনও হতে পারত আগেকার কালে ? ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের পাটই কি একেবারে উঠে গেল দুনিয়া থেকে ? সোখীর বাপ কতবার জেলে গিয়েছে ; সোখীরও এর আগে দু'বার কয়েদ হয়েছে ; কখনও তো দলের লোকে এর আগে এমন ব্যবহার করেনি। মাস না যেতেই হাতে টাকা এসে পৌঁছেছে—কখনও বা আগাম—তিন-চার মাসের একসঙ্গে। কিন্তু এবার দেখ তো কাণ্ড! একটা সংসার পয়সার অভাবে ভেসে গেল কিনা তা একবার উঁকি মেরে দেখল না দলের লোক! আগের বউমার শরীরটা ছিল ভাল। সোখীর এবারকার বউটা রোগা-রোগা। তার উপর ছেলে হবার পর একেবারে ভেঙে গিয়েছে শরীর। সোখী যখন একবার ধরা পড়ে, তখন বউমার ছেলে পেটে। হ্যাঁ, নাতিটার বয়স চার পাঁচ বছর হল বইকি। কী কপাল নিয়ে এসেছিল! যার বাপের নামে চৌকিদারসাহেব কাঁপে, দারোগাসাহেব পর্যন্ত যার বাপকে তুইতোকারি করতে সাহস করেননি কোনোদিন, তারই কিনা দু'বেলা ভাত জোটে না! হায় রে কপাল! এ বউমা যে খাটতে পারে না ঐ রোগা শরীর নিয়ে। আমি বুড়ো-মানুষ, কোনোরকমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুটো খই-মুড়ি বেচে আসি। তা দিয়ে নিজের পেট চালানোই শক্ত। সাধে কি আর বউমাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হল! তাছাড়া গয়লাবাড়ির মেয়ে। ঝি-চাকরের কাজও তো আমরা করতে পারি না। করলেই বা রাখত কে ? সোখীর মা-বউকে কি কেউ বিশ্বাস পায়! নইলে আমার কি ইচ্ছে করে না যে বউ-নাতিকে নিয়ে ঘর করি! বেয়াইয়ের দুটো মোষ আছে। তবু বউ-নাতিটার পেটে একটু একটু দুধ পড়ছে। ওদের শরীরে

স্বকার দুঃখের। আর বছরখানেক বাদেই তো সোখী ছাড়া পাবে। তখন বউকে নিয়ে এসে রুপোর গয়না দিয়ে মুড়ে দেবে। দেখিয়ে দেব পাড়ার লোকদের যে, সোখীর মায়ের নাতি পথের ভিখারী নয়। আসতে দাও না সোখীকে! দলের ওই বদলোকগুলোকে ঠাণ্ডা করতে হবে। আমি বলি, এসব একলসেঁড়ে লোকদের দলে না নিলেই হয়। ওরা কি ডাকাত নামের যুগ্যি; চোর, ছিঁচকে চোর! ওই যেটা টাকা দিতে আসত, সেটার চেহারা দেখেছ? তালপাতার সেপাই! থুতনির নিচে দুগাছা দাড়ি! কালি-ঝুলিই মাখ, আর মশালই হাতে নাও, ওই রোগা-পটকাকে দেখে কেউ ভয় পাবে কস্মিনকালে?

ঘুম আর আসতে চায় না। রোজ রাতেই এই অবস্থা। মাথা পর্যন্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে না নিলে তার কোনো কালেই ঘুম হয় না শীতের দিনে।··· একবার সোখী কোথা হতে রাতদুপুরে ফিরে এসে টোকার সাড়া না পেয়ে, কী মারই মেরেছিল মাকে! বলে দিয়েছিল যে ফের যদি কোনোদিন নাকমুখ ঢেকে শুতে দেখি, তাহলে খুন করে ফেলে দেব! বাপের বেটা, তাই মেজাজ অমন কড়া। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলেও একটা বকুনি দেবার লোক পর্যন্ত নেই বাড়িতে, গেল পাঁচ বছরের মধ্যে! এ কি কম দুঃখের কথা!—

ঘুমের অসুবিধা হলেও, ছেলের কথা মনে করে সে এক দিনের জন্যও নাকমুখ ঢেকে শোয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে।

—বাইরে নোনা আতা গাছতলায় শুকনো পাতার উপর একটু খড়খড় করে শব্দ হল। গন্ধগোকুল কিংবা শিয়াল-টিয়াল হবে বোধ হয়। কী খেতে যে এরা আসে বোঝা দায়—বুড়ো হয়ে শীত বেড়েছে। আগে একখান কম্বলে কেমন দিব্যি চলে যেত। এ কম্বলখানা হয়েওছে অনেক কালের পুরনো। এর আগের বার সোখী জেল থেকে এনেছিল। সে কি আজকের কথা!

কম্বলখানার বয়স ক' বছর হবে তার হিসাব করতে গিয়ে বাধা পড়ে। টক্‌টক্‌ করে টোকা পড়ার মতো শব্দ যেন কানে এল। টিকটিকির ডাক বোধ হয়! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে! টিকটিকিটা সুদ্ধ খুনসুড়ি আরম্ভ করেছে মজা দেখবার জন্য। করে নে।

টক্‌টক্‌ করে আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল।

--না। তাহলে টিকটিকি না তো। আওয়াজটা খনখনে—টিনের কপাটের উপর টোকা মারবার শব্দ!

বুড়ি উঠে বসে। ঘর গরম করার জন্য সে আগুন করেছিল মেঝেতে, সেটা কখন নিভে গিয়েছে; কিন্তু তার ধোঁয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করে তুলেছে।—এতদিনে কি তাহলে দলের হতভাগাগুলোর মনে পড়েছে সোখীর মায়ের কথা?

আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল। আর সন্দেহ নেই! অনেক দিনের অনভ্যাসের পর এই সামান্য ব্যাপারটা বুড়ির মধ্যে একটু উত্তেজনা এনেছে।

--তবু বলা যায় না।—কে না কে—

সোখীর মা আস্তে আস্তে উঠে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল।—লোকটাও বোধ হয় কপাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করছে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা

যায় না। বিড়ির গন্ধ নাকে আসছে।—আবার টোকা পড়ল দুটো। এবার একেবারে কানের কাছে। এ টোকা পড়বার কথা ছিল না! অবাক কাণ্ড! তাহলে তো লোকটা টাকা দিতে আসেনি! পুলিশের লোকটোক নয় তো? টোকা মারবার নিয়মকানুনগুলো হয়তো ভাল জানে না!—সৌখীর ছাড়া পাবার যে এখনও বহু দেরি!—নিশ্চয়ই পুলিশের লোক! তবে তুমি যে-ই হও, টাকা দিলে নিশ্চয়ই নিয়ে নেব; তার পর অন্য কথা।—কথা বলতে হবে সাবধানে; দলের কারও নামধাম আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে অজানতে।—

হঠাৎ মনে পড়ল, হুড়কো খুলবার আগে দশবার নিঃশ্বাস ফেলবার কথা। মানসিক উত্তেজনায় নিঃশ্বাস পড়ছেই না তা গুনবে কী।—বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি দশবার নিঃশ্বাস ফেলে নিয়মরক্ষা করে নিল।

'কে?'

দরজা খুলে সম্মুখে এক লম্বাচওড়া লোককে দেখে ডাকাতের মায়েরও গা ছমছম করে।

'ঘর যে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঢুকি কী করে?'

'কে, সৌখী। ওমা তুই। আমি ভাবি কে না কে?'

বুড়ি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে।—এ ছেলে বুড়ো হয়েও সেই একই রকম থেকে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়িতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মা'র সঙ্গে খুনসুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ।—এ আনন্দ আর রাখবার জায়গা নেই।—

'লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশী হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। খুশী আর কী। হেড জমাদারসাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সে-ই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলারবাবুর কাছে। তাই বেশি রেমিশন পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তুই কুপিটা জ্বাল তো আগে। তারপর সব কথা হবে।'

দরকারের চাইতেও জোরে কথাগুলো বলল সৌখী যাতে ঘরের অন্য সকলেও শুনতে পায়। তারপর মাকে কেরোসিন তেলের টেমিটাকে খুঁজতে সাহায্য করবার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি জেলে তুলে ধরে।

বুড়ি এতক্ষণে আলোতে মুখ দেখতে পেল ছেলের। চুলে বেশ পাক ধরেছে এবার; তাই বাপের মুখের আদল ধরা পড়ছে ছেলের মুখে। রোগা-রোগা লাগছে যেন। সৌখীটার তো বাপের মতো জেলে গেলে শরীর ভাল হয়। তবে এবার এমন কেন? ছেলের চোখের চাউনি ঘরের দূর দেওয়াল পর্যন্ত কী যেন খুঁজছে। কাদের খুঁজছে সে কথা আর বুড়িকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না।—

'হ্যাঁ রে, জেলে তোর অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?'

সৌখী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না; জিজ্ঞাসা করে, 'এদের কাউকে দেখছি না?'

প্রতি মুহূর্তে বুড়ি এই প্রশ্নের ভয়ই করছিল। জানা কথা যে, জিজ্ঞাসা করবেই;—তবু—

'বউ বাপের বাড়ি গিয়েছে।'

'হঠাৎ বাপের বাড়ি?'

—এতদিন পর বাড়ি ফিরেছে ছেলে। এখনই সব কথা খুলে বলে তার মেজাজ

খারাপ করে দিতে চায় না। মরদের রাগ। শুনেই এখনই হয়তো ছুটবে রাগের মাথায় দলের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।—নাতি আর বউয়ের শরীর খারাপের কথাও এখনই বলে কাজ নেই। ছেলে ছেলে করে মরে সোখী। আগের বউটার ছেলেপিলে হয়নি। এ বউয়ের ওই একটিই তো টিমটিম করছে। তার শরীর খারাপের কথা শুনলে হয়তো সোখী এখানে আর একদিনও থাকবে না। এতদিন পর এল। একদিনও কাছে রাখতে পারব না? খেয়ে-দেয়ে জিরিয়ে সুস্থির হয়ে থাকুক এক-আধদিন। তারপর সব কথা আস্তে আস্তে বলা যাবে।—

'কেন, মেয়েদের কি মা-বাপকে দেখতে ইচ্ছে করে না একবারও?'

'না না, তাই কি বলছি নাকি?' অপ্রতিভের চেয়ে হতাশ হয়েছে বেশি সোখী। তার বাড়ি ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে, তাই নিয়ে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে জেলে বসে বসে। ছেলে কেমন করে গল্প করে মায়ের সঙ্গে তাই শুনবার জন্য টোকা মারবার আগে দরজায় কান ঠেকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল রাত ন'টার মধ্যে দুরন্ত ছেলেটা নিশ্চয়ই ঘুমোবে না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে—কালই সে যাবে শ্বশুরবাড়ি বউছেলেকে নিয়ে আসতে। এ কথা এখনই মাকে বলে ফেলা ভাল দেখায় না; নইলে মা আবার ভাববে যে নতুন বউ এসে ছেলেকে পর করে নিয়েছে। —মা কত কী বলে চলেছে; এতক্ষণে শেষের কথাটা কানে গেল।

'নে, হাতমুখ ধুয়ে নে!'

'না না। আমি খেয়ে এসেছি। এই রাত করে আর তোকে রাঁধতে বসতে হবে না।'

'না, রাঁধছে কে। খইমুড়ি আছে। খেয়ে নে। তুই যে কত খেয়ে এসেছিস, সে আর আমি জানি না!'

ব্যবসার পুঁজি খইমুড়িগুলো শেষ করে শোয়ার সময় তার হঠাৎ নজর গেল মা'র গায়ের ছেঁড়া কম্বলখানার দিকে।

'ওখান আমাকে দে।'

আপত্তি ঠেলে সোখী নিজের গায়ের নতুন কম্বলখানা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিল।

নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বুড়ির ঘুম আর আসতে চায় না। পা কিছুতেই গরম হয় না, রাজ্যের দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। সোখীর নাকডাকানির একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ি এল; কোথায় নিশ্চিন্ত হবে, তা নয়, সোখীকে কী খেতে দেবে কাল সকালে, সেই হয়েছে বুড়ির মস্ত ভাবনা। আজকের রাতটা না হয় বিক্রির খইমুড়ি দিয়ে কোনোরকমে চলে গেল। যদি বলত দুটো ভাত খেতে ইচ্ছে করছে, তাহলেই আর উপায় ছিল না, সব কথা না বলে।—আলুচচ্চড়ি খেতে কী ভালই বাসে সোখীটা! কতকাল হয়তো জেলে খেতে পায়নি। আলু, চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কি ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা যোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেব!

—কাছারির ঘড়িতে দুটো বাজল।—ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

মনে পড়ল যে, পেশকারসাহেবের বাড়ি রাজমিস্ত্রী লেগেছে। আজ যখন মুড়ি বেচতে গিয়েছিল তখন দেখেছে যে, পড়ে-যাওয়ার উত্তরের পাঁচিলটা গাঁথা হচ্ছে। বুড়ি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেরুল ঘর থেকে।

মাতাদীন পেশকারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। পাঁচিল সেদিন হাত দুই-আড়াই উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। মাটি আর ভাঙা ইঁটের পাহাড় নিচে পড়ে থাকায়, সে পাঁচিল ভাঙতে বুড়ির বিশেষ অসুবিধা হল না। বাড়ি নিশুতি!

অন্ধকারে কী কোথায় আছে ঠাহর করা শক্ত। বারান্দায় দোর-গোড়ায় গুছিয়ে রাখা রয়েছে পেশকারসাহেবের খড়মজোড়া, আর জলভরা ঘটি—ভোরে উঠেই দরকার লাগবে বলে। ভয়ে বুড়ি উঠোনের আর কোথায় কী আছে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করল না। ঘটিটা তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জলটুকু পর্যন্ত ফেলেনি। এখন রাতদুপুরে লোটা হাতে যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করবে না।

এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে বারকয়েক লোটা না মাজলে মাতাদীন পেশকারের হাত নিশপিশ করে। সেইজন্য হুলস্থূল পড়ে গেল তাঁর বাড়িতে সকালবেলায়।

খোকার মা নাকে কেঁদে স্বামীকে মনে করিয়ে দিলেন যে, লোটা হল বাড়ির লক্ষ্মী,·· এখনই আর একটি কিনে আনা দরকার বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনতে হলে। কর্তার মেজাজ তখন তিরিক্ষি হয়ে আছে চোরের উপর রাগে।—'বাজে বক্‌বক্ কোরো না। তোমাদের তো কেবল এই! আইনের ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, চুরির খবর পুলিশকে দিলে জেল পর্যন্ত হতে পারে; সে খবর রাখো?'

আইনচঞ্চু মাতাদীন আরও অনেক ঝাঁঝালো কথা খোকার মাকে শোনাতে শোনাতে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেলেন থানায় খবর দেবার জন্য।

ফিরতিমুখো তিনি এলেন বাসনের দোকানে। নানা রকম ঘটি দেখাল দোকানদার; কিন্তু পছন্দসই কিছুতেই পাওয়া যায় না। পেশকারসাহেব বড় খুঁতখুঁতে লোটা সম্বন্ধে। তিনি চান খুরো-দেওয়া লোটা···বুঝলে কিনা— এই এত বড় সাইজের—মুখ হওয়া চাই বেশ ফাঁদালো—যাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের এতখানি মোটা রুপোর কাঁকনসুদ্ধ হাত অনায়াসে ঢোকানো যায়, ভিতরটা মাজবার জন্য।···দোকানদার শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে— 'পুরনো হলে চলবে? নামেই পুরনো। সস্তায় পাবেন। আড়াই টাকায়।'

'পুরনো বাসনও বিক্রি হয় নাকি এখানে? দেখি।'

ঘটি দেখেই তাঁর খটকা লাগল। পকেট থেকে চশমা জোড়া বার করে নাকের ডগায় বসালেন।···খুরোর নিচে ঠিক সেই তারা আঁকা! আর সন্দেহ নেই!···

মাতাদীন পেশকার আইনের ধারা ভুলে গিয়ে দোকানদারের টুঁটি চেপে ধরেন।—বল! এ লোটা কোত্থেকে পেলি? দিনে করিস দোকানদারি—আর রাতে বার হস সিঁধকাঠি নিয়ে!'

একেবারে হই-হই রই-রই কাণ্ড। দোকানে লোক জড় হয়ে গেল। দোকানদার বলে যে, সে কিনেছে এই ঘটি নগদ চোদ্দ আনা পয়সা গুনে, সোঁখীর মায়ের কাছ থেকে—এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে।

'চোদ্দ আনায় এই ঘটি পাওয়া যায়? চোরাই মাল জেনেই কিনেছিস! চোরাই মাল রাখবার ধারা জানিস?'

পেশকারসাহেব থানায় পাঠিয়ে দিলেন একজন ছোকরাকে, দারোগাকে ডেকে আনবার জন্য। চোর ধরা পড়বার পর দারোগাসাহেবের কাজে আর ঢিলেমি নেই। তখনই সাইকেলে এসে হাজির। সব ব্যাপার শুনে তিনি সদলবলে সোঁখীর

বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। সোখীর মা আলুর তরকারি চাড়িয়েছে উনোনে। ছেলে তখনও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। অনেককাল জেলে ঘড়ি ধরে সকাল সকাল উঠতে হয়েছে; নতুন-পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য সোখী মনে মনে ঠিক করেছে যে বেলা বারোটার আগে সে কিছুতেই আজ বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

দারোগা-পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে। পুলিশ দেখে ভয় পাবার লোক সে নয়; এর আগে কতবার সময়ে অসময়ে পুলিশকে তাদের বাড়িতে হানা দিতে দেখেছে। কিন্তু আজ যে ব্যাপার অন্য! মাতাদীন পেশকার আর বাসনওয়ালা যে পুলিশের সঙ্গে রয়েছে। তার যে ধারণা ছিল, বাসনওয়ালারা পুরনো বাসনগুলোকে রং-চং দিয়ে নতুনের মতো না করে নিয়ে বিক্রি করে না… পাঁচ-সাত বছর আগে পুলিশ একবার ভোররাত্রে তাদের বাড়ি ঘেরাও করেছিল, বন্দুকের খোঁজে। তখন তো মাথা হেঁট হয়নি তার। ডাকাতি করা তার স্বামী-পুত্রের হকের পেশা। সে তো মরদের কাজ, গর্বের জিনিস। জেলে যাওয়া সেক্ষেত্রে দুরদৃষ্ট মাত্র—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এ যে চুরি!… ছিঁচকে চোরের কাজ, শেষকালে…

লজ্জায় সোখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে!

দারোগাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন তাকে, 'তুই এই লোটা আজ বাজারের বাসনের দোকানে চৌদ্দ আনায় বিক্রি করেছিস?'

কোনো জবাব বেরুল না বুড়ির মুখ দিয়ে। শুধু একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে সে মাথা হেঁট করে নিল।

এতক্ষণে বোঝে সোখী ব্যাপারটা। চোদ্দ আনা পয়সার জন্য মা শেষকালে একটা ঘটি চুরি করল! কেন মা তাকে বলল না!…এতদিন তার ডিউটি ছিল জেলখানার গুদামে। জেলের ঠিকেদারদের কাছ থেকে সে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে। এখনও সে টাকা তার কোমরের বাটুয়ায় রয়েছে। মা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল না কেন? মেয়েমানুষের আর কত আক্কেল হবে! হয়তো ঘরদোরের দিকে তাকিয়ে এক নজরেই সংসারের দৈন্যদশার কথা আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল তার।—বুঝে, নিজে থেকেই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে সময় পেল কই? রাতে এসে শুয়েছে; এতক্ষণ তো বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি। শেষ পর্যন্ত লোটা চুরি! জেলের মধ্যে ওই সব ছিঁচকে 'কদুচোর'দের সঙ্গে সে যে পারতপক্ষে কথা বলেনি কোনো দিন! ডাকাতরা জেলে আলাপ-সালাপ করে 'লাইফার'দের সঙ্গে, এ কথা তো মায়ের অজানা নয়।—'কদুচোর'দের যে মাত্র দু-মাস তিন মাসের সাজা হয়।—মা কি জানে না যে—

'এই বুড়ি! আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? বল। জবাব দে।'

বুড়ি নির্বাক। দারোগাবাবুর প্রশ্ন কানে গেল কি না, সে কথা বোঝাও যায় না তার মুখ দেখে।

আর থাকতে পারল না সোখী।

'দারোগাসাহেব, মেয়েমানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? আমি ঘটি চুরি করেছি কাল রাত্রে।'

বিজ্ঞ দারোগাবাবু তাঁর অনুচরদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি হেনে ভাব দেখাতে চাইলেন যে, এত বেলা পর্যন্ত সোখীকে ঘুমোতে দেখে, এ তিনি আগেই বুঝেছিলেন; শুধু বুড়ির মুখ দিয়ে কথাটা বার করে নিতে চাচ্ছিলেন এতক্ষণ।

এইবার সৌখীর মা ভেঙে পড়ল। ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে।

'না না দারোগাসাহেব! সৌখী করেনি, আমি করেছি। ওকে ছেড়ে দিন দারোগাসাহেব। এখনও যে বউ-ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর।—'

দারোগাবাবুর পায়ের উপর মাথা কুটছে বুড়ি।

কিন্তু তিনি বাসনওয়ালা কিংবা এই বুড়িটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না; তাঁর দরকার আসল অপরাধীকে নিয়ে।

সৌখী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল খাটিয়ার উপর।

মা তখনও মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উনোনে আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

## মুনাফা ঠাকরুণ

ফণী ইংরাজী বাংলা লিখত ভাল। বাসনা ছিল কাগজ চালাবে ভবিষ্যতে। কিন্তু নিতে হয়েছিল কাজ শেঠজীর গদিতে, মাসিক সত্তর টাকা মাইনেতে। তবে কাজটা নিজের লাইনের—অর্থাৎ লেখাপড়ার কাজ—ইংরাজী আর বাংলায় চিঠিপত্র লেখার কাজ। কলেজে পড়বার সময় সে পলিটিক্স করত। এখানে এসে দেখে যে, গদির পরিবেশ আর মনিব-কর্মচারীর সম্পর্ক ঠিক তার পলিটিক্সের জানা ছকে ফেলা যায় না।—চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নেই; ফরাশে বসে জলচৌকির উপর খাতা রেখে লিখতে হয়। সিঁদুর দিয়ে বড় বড় করে লেখা দেওয়ালের 'মুনাফা' শব্দটিকে ও কুলুঙ্গির গণেশঠাকুরকে প্রধান কর্মচারী টিকমচাঁদ ধূপ-ধুনো দিয়ে প্রত্যহ পুজো করে; অন্য কর্মচারীরা ভক্তিভরে প্রণাম করে। গদির মধ্যে থুতু ফেলা বারণ নয়, কিন্তু চা খাওয়া বারণ। নামমাত্র মাইনেতে গদির এতগুলি কর্মচারী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে; কিন্তু কেউ মাইনে বাড়াবার দাবি করে না। একই ধরনের কাজ করে কেউ কম মাইনে পায়, কেউ বেশি; তবু তা নিয়ে কোনো আন্দোলন নেই। অন্দরমহলের আচার, বড়ি, পাঁপড় শেঠগৃহিণীর সঙ্গে আধাআধি বখরায় গদির কর্মচারীরা লুকিয়ে বিক্রি করে দেন। অদ্ভুত!—মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে যায় এদের ধরন-ধারণ দেখে!—

একদিন বলেই ফেলল। সকালে গদিতে ঢুকেই শোনে যে অন্য কর্মচারীরা কালকের হঠাৎ ফাটকা দরটা নেমে যাবার কথা আলোচনা করেছে। ফণীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—'এক মিনিটও সময় নষ্ট নেই বাবা! যেন এই প্রেমের গল্পটুকু না করতে পেরে রাত্রিতে ঘুম হয়নি ভাল করে! মাসকাবারে মাইনে পাই; ফাটকার দরে আমার আপনার দরকার কী মশাই? সে বুঝুক গিয়ে মালিকরা।'

এই মন্তব্যটা থেকেই বাদানুবাদ আরম্ভ। নির্দোষ হাসিঠাট্টা থেকে অকারণে গরম গরম গরম কথা এসে গেল। গদির লোকেরা 'ফণী' উচ্চারণ করতে পারে না, বলে ফাণী। আজ ফণী তাদের জিভের ডগায় আরও খানিকটা বেশি করে ঘি আর লঙ্কা মালিশ করতে উপদেশ দিল—উচ্চারণ ঠিক করবার জন্য। তারা মিস্টার ফণীর প্যান্টালুন আর থার্মফ্ল্যাস্ক নিয়ে ঠাট্টা করে; ফণী তাদের পাল্টা

উপদেশ দেয় আরও একটু জবজবে করে মাথায় তেল মাখতে ;—তা হলে যদি এক্ষ ওই মরুভূমি-ভরা মগজগুলো, টাকার ঝনঝনানি ছাড়া, আর অন্য কোনো আওয়াজে সাড়া দেয় !—

এই বিমুখ মুহূর্তে গদিতে এসে প্রবেশ করলেন শেঠজী।

প্রথমে দেয়ালের 'মুনাফা' কথাটাকে, তারপর কুলুঙ্গির গণেশঠাকুরকে চোখ বুঁজে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। এর পর তিনি তাকালেন ঘড়িটার দিকে।—'জয় গণেশ ! এখনও তোমরা কাজ আরম্ভ করনি ? পনর মিনিট কাজে ফাঁকি দিলে গদির লোকসান কত হয় হিসাব রাখো ?'

সকলে নিরুত্তর।

'গদি হল মন্দিরের মতো জায়গা। এখানে এসব ঝগড়াঝাঁটি কেন ? দেখি টিকমচাঁদ, চিঠিপত্র কী সব এসেছে। সে-রকম জরুরী কিছু নেই তো ? বাংলা ইংরাজী চিঠিগুলোই আগে দাও। কোথায়, ও মিস্টার ফাণী ! পড় তো এগুলো। বছরে আটশ' চল্লিশ টাকা করে মাইনে দিই তোমাকে ; তবু তোমার কাজে মন নেই !' শেঠজীর মুখে 'মিস্টার ফাণী' শুনে কর্মচারীদের চোখে চোখে হাসি খেলে যায়। দেখে ফণীর মাথা গরম হয়ে ওঠে।

'মাইনে দিচ্ছেন বলে কি যা ইচ্ছে তাই বলবেন ! কর্মচারীকে তুমি না বলে আপনি বলা যায় না ? এদিকে নিজের ছেলেকে তো বিরিজলালবাবু বলে ডাকা হয়। বছরে আটশ' চল্লিশ টাকা দেখাতে এসেছেন ? অমন টাকা— !'

টিকমচাঁদ হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল।

'করলেন কী ফণীবাবু। নিমক খেলে তার দামও দিতে হয়।'

'যথেষ্ট হয়েছে। আপনি থামুন তো ! মাসে সত্তর টাকার নিমকের দাম, আমি তিল তিল করে দিচ্ছি দু' বছর ধরে। দিন আট ঘণ্টা করে এই মুনাফাদেবীর মন্দিরে বসে কাটানোর মজুরিই সত্তর টাকার চাইতে বেশি। আপনার মাসিক ছিয়াশি টাকার নিমকের দাম, আপনি হুজুরের মাথার পাকাচুল তুলে, হুজুরের খয়নির থুতু চেটে, হুজুরের 'মুনাফা'তে ধূপ-ধুনো দিয়ে, যেমন করে ইচ্ছে শোধ করুন না কেন। অন্যের ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে আসেন ?'

ছোট মুখে বড় কথা ! কয়েকজন আমলা এগিয়ে এল বেয়াদব ফাণীটার জিভ ছিঁড়ে নেবার জন্য ! অসীম আত্মপ্রত্যয় আর প্রশান্তির দ্যুতি শেঠজীর মুখচোখে।

'যাও। তোমরা সকলে নিজের নিজের কাজ করোগে যাও ! কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে মিস্টার ফাণীর—তোমাদের কী এর মধ্যে ? হ্যাঁ, শোন‚ মিস্টার ফাণী, নিজের দর নিজে ফেললে সব সময় ভুল হয়। লোকের দর ফেলবার মালিকানী হচ্ছেন ওই মুনাফা ঠাকরুণ। সব করেন উনি ! ঠাকুর দেবতার কাছে এক-চোখামি নেই। তবে আমি বুঝতে পারছি যে তোমার এখানে অসুবিধা। এই নাও তিন মাসের মাইনে। পেণ্টুলুন পরে চেয়ারে বসবার চাকরি তোমার যেন কোথাও জুটে যায় ! জয় গণেশ ! জয় গণেশ !'

মুহূর্তের জন্য ফণী হতভম্ব হয়ে যায়। সে এতটা ভাবেনি। তারপর তার মুখে খই ফুটতে আরম্ভ করে।

'সব জয়-গণেশ আমি বার করছি ! তোমার গদির ওই গণেশকে আমি উলটে ছাড়ব। লালবাতি দেখেছ, লালবাতি ? তোমার দেয়ালের ওই ঠাকরুণকে আমি

লোকসান ঠাকুর করিয়ে ছাড়ব। ভেবেছ কী! তোমার গদির নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা; সব আমি ফাঁস করব। হাটে হাঁড়ি ভাঙব আমি। ফণী চাটুজ্যেকে চেন না।'—

শেঠজী মনে মনে হাসলেন—গণেশ উলটোবার কথা বলে ভয় দেখায় ছোকরা—জানে না যে আসল থাকেন বাড়ির ভিতর—ইনি তো গদির গণেশ—কতবার উলটোন কতবার বসেন মুনাফা ঠাকরুণকে কসরত দেখানোর আনন্দে, তার কি ঠিক আছে!—

এর মাস কয়েক পরের কথা। অন্দরমহলের আসল গণেশঠাকুর আর দেওয়ালের মুনাফা ঠাকরুণকে প্রণাম সেরে, গদিতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন শেঠজী, হঠাৎ নিচে মোটর-হর্ণ-এর শব্দ শোনা গেল।

—বিরজুর গাড়ি না? এই তো খানিক আগে নিজের গদিতে যাবে বলে বেরুল। এখনই ফিরে এল?—

শেঠ-গিন্নী দোতলার জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখলেন। হ্যাঁ বিরজুর তো। কিছু ফেলে-টেলে গিয়েছিল নাকি? হাতে দেখছি একখান বই—রঙিন ছবিওয়ালা মলাট। নিশ্চয়ই বউমার হুকুম ছিল যে এখনই চাই—তাই দিতে এসেছেন বইখান। কী ছাঁদেরই যে বউ হয়েছে। ফরমাশের উপর ফরমাশ চলছে বিরজুর উপর অষ্টপ্রহর। দাই ঠিকই বলে—দিনরাত্রি ফুসলানি দেয় বউ বিরজুকে আলাদা হবার জন্য; ছেলেরও লক্ষণ ভাল না। দেখছি তো। মা-বাপকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ওই দেখ না—বউয়ের জন্য আনা বইখান মা-বাপকে একটু লুকিয়েও তো আনতে পারত।—ও দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুণ। রোজ তোমাকে ঠেকিয়ে একটা করে আধলা আমি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসি; আচার তয়ের করবার আগে তেল দিয়ে হাঁড়ির উপর তোমার অক্ষর মূর্তি এঁকে নিই; হিঙের বড়ি দেবার আগে ছোট ছোট বড়ি সাজিয়ে তোমারই দেবকলেবর লিখে নিই; তবু কেন ঠাকরুণ আমার এমন রোজগেরে ছেলেকে লোকসানের খাতায় ফেলতে দিচ্ছ! কেন একটা পরের বাড়ির মেয়েকে দিয়ে এমন লাখপতি ছেলেকে বেহাত হয়ে যেতে দিচ্ছ!'

বিরিজলাল ঘরে এসে ঢুকল গম্ভীর হয়ে। বইখানাকে লুকোতে ভুলে গিয়েছে ছেলে—বউমার জন্য কেনা বই—ছেলে লজ্জা পেতে পারে ভেবে শেঠজী সেদিকে তাকান না।

'কী বাবা বিরজু, শরীর খারাপ হয়নি তো?'

'না।'

'কোনো লোকসানের খবর নয় তো?'

'না।'

'নতুন কোনো সরকারী কানুন হল নাকি?'

'না।'

'ইনকাম ট্যাক্স?'

'না।'

'তবে?'

'বইখানা কিনে তোমাকে দেখাতে এলাম।'

'বই। আমার জন্য?'

অবাক হয়ে তাকালেন শেঠজী ছেলের দিকে।—খবরের কাগজে তবু না-হয় জারদর আর নতুন কানুনের খবর থাকে। কিন্তু বই তিনি কী করবেন?—

—বইখানা তাহলে বউমার জন্য কেনা নয়।—বিরজুর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, বইখানা স্বামীর হাত থেকে নিলেন।

—বাঃ, মলাটের ছবিটা ভারী মজার তো! একজন পাগড়িবাঁধা, মেরজাইপরা লোক জাঁতা ঘোরাচ্ছে; জাঁতায় দেওয়া হচ্ছে মানুষের কঙ্কাল, আর তার থেকে বেরিয়ে আসছে টাকাকড়ি, সোনারুপো!—

'ওমা! লোকটার মুখে তোর বাপের মুখের আদল আসে—তাই না বিরজু?' শেঠজী ছবিটার দিকে তাকালেন—লোকটার নাক গণেশজীর মতো লম্বা, সম্মুখের দাঁত দুটোও প্রায় তাই। এর সঙ্গে বিরজুর মা তাঁর মিল দেখল কোন্‌খানে? যেমন নিজের চেহারা তেমনি তো দেখবে অন্যকে।—

এতক্ষণে বিরিজলাল কথা বলল। আজ সকালে বেরিয়েই দেখে যে পথের মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজওয়ালারা তার বাবার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে—'শেঠজীর কেচ্ছা! শেঠজীর কেচ্ছা! দাম দু টাকা! দাম দু টাকা!'—বইগুলোর কী বিক্রি! পড়তে পাচ্ছে না। সেও একখানা কিনে নেড়েচেড়ে দেখে। ইন্দ্রাণী পাবলিশার্স' নামের একটা রদ্দি বইয়ের দোকান 'হাটে হাঁড়ি' নামের একটা সিরিজ বার করছে। এখানা সেই সিরিজির প্রথম বই। বিরিজলাল তখনই যায় তার মামা ফেকমলের গদিতে। একটা মোটর-ট্রাকে করে বাজারের সব বইগুলো কিনে আনবার জন্য ফেকমলকে পাঠায়। নিজে তো যেতে পারে না—তাহলে যে বাপের ছেলে বলে সবাই চিনে ফেলবে! মামা কিছুক্ষণের মধ্যেই বইগুলোকে নিয়ে আসবে।—

শেঠজীর মুখের শান্তভাব একটুও ক্ষুন্ন হল না।

'এবার কিনে না-হয় পুড়িয়ে ফেললে। কিন্তু তারপর? আবার যে ওরা ছাপবে? কত টাকা পুঁজির লোক বইয়ের দোকানদাররা? এই লেখা থেকে কত ক্ষতি হতে পারে আমার, সেটা না জানলে, ঠিক করবে কী করে যে কত টাকা আমরা ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সকে খাওয়াতে পারি! বিরজুর মা, তুমি চট করে গিয়ে জাঁতার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখো। ফেকমল বইগুলো নিয়ে এলে ওই ঘরে রাখতে হবে। তারপর খানকয়েক খানকয়েক করে রোজ রান্নাঘরের উনোনে পুড়িয়ে ফেলো।'

গিন্নীকে কোনো রকমে এখান থেকে বিদায় করে, তারপর শেঠজী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে বিরজু, বইখানাতে আমার সব লিখেছে নাকি?'

'সব কি আর লিখতে পেরেছে?'

বইখানাকে ভাল করে পড়ে, আন্দাজ কত টাকার খারাপ বলেছে, সেইটা একবার হিসাব করে নিয়ে আয়।'

বিরিজলাল চটে উঠল, 'এখনও হিসাব? যত টাকা খরচ হয়, ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সকে একবার দেখে নেব! মানহানির মোকদ্দমা আনব তাদের বিরুদ্ধে। পুলিসকে টাকা খাইয়ে আমি ওদের জেরবার করব। বজ্জাত ফণীটার পিছনে আমি গুণ্ডা লাগাব। ভেবেছে কী ওরা!'

'মাথা গরম করিস না বিরজু।'

ধীর পদক্ষেপে শেঠজী বার হলেন গদিতে যাবার জন্য।

সেই সন্ধ্যায়, বিরিজলাল গিয়েছে ফণীর সঙ্গে দেখা করতে। শেঠজীর ঘরে শালা ভগ্নীপতিতে শলাপরামর্শ চলছে।

ফেকমলের মতে ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সদের কারবারটা কিনে, সেটাতে তালা দিয়ে রাখাই হল সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এরই সপক্ষে ও বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোর আলোচনা চলছে। হঠাৎ কথার মধ্যে শেঠজী জিজ্ঞাসা করলেন শালাকে—'আজ কত লাগল, বইগুলো কিনতে? ফেকমল এর জন্য তৈরি ছিল। এক নিঃশ্বাসে গড়গড় করে বলে গেল, 'দু হাজার সাতশ' আটত্রিশ টাকা সাড়ে-ন আনা। ষোলশ' আটানব্বইখানা বই দু টাকা করে; কুড়ি টাকা ট্রাক ভাড়া; দু টাকা সাড়ে-ন আনা কুলি; পাইকারী রেটে কেনা বলে কমিশন পাওয়া গিয়েছে শতকরা কুড়ি টাকা করে!'

শেঠজীকে ঠকাবার ক্ষমতা নেই কোনো শালার। তিনি ফোনে জেনে নিয়েছেন আজ যে, বেশি বই নিলে শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাওয়া যাবে। কথাটার ইশারা দিতেই শালাই সুর বদলাল।

'মারো গোলি! যেতে দাও। একশ' টাকা কমই দিও। আমি না-হয় বুঝব যে ভগ্নীপতির জন্য শতকরা পাঁচ টাকা করে, ঘর থেকে খরচ করলাম।'

শেঠজী চোখ টিপে রসিকতা করলেন, 'শালা কোথাকার! আচ্ছা আমি এখন একবার উঠি। তুমি ততক্ষণ তোমার দিদির সঙ্গে একটু লাভ লোকসানের গল্প করো। আমি একবার চট্ করে গদি থেকে তোমার পাওনা টাকাটা নিয়ে আসি। সেখানে টিকমচাঁদকে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

'তার এখনই কী দরকার ছিল। বাড়ির লোকের সঙ্গে আবার...'

'না না, এসব ব্যাপার নগদনারায়ণ হয়ে যাওয়াই ভাল। জয় গণেশ জয় গণেশ!'

শেঠজী চলে গেলে শেঠ-গিন্নী মুখ খুললেন। 'দ্যাখ ফেক্না, তুই নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করিস,—না? আমার বাপের বংশের মাথা হেঁট হবে বলে আমি বিরজুর বাপের সম্মুখে কথাটা বলিনি। তুই হিসাব দিলি ষোলশ' আটানব্বইখানা বই কিনেছিস। আমি গুনে দেখছি মোট তেরশ' দশখান আছে।'

ফেক্মল দিদির পা জড়িয়ে ধরে—এ কথা যেন ভগ্নীপতিকে বলা না হয়—বাকি বইগুলোর লাভের উপর সে আধাআধি বখরা দিতে রাজী দিদিকে।

ফেকন চলে ডালে ডালে তো দিদি চলেন পাতায় পাতায়। দিদি সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গিয়েছেন যে কাল থেকে এ বইগুলোর বাজারদর চড়বে; লোকে যখন দেখবে যে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন দু টাকার বই পাঁচ টাকা দিয়েও কিনতে পারে। শেষ পর্যন্ত রফা হল, বই-পিছু এক টাকা করে তিনি পাবেন।—তোর ধর্ম তোর কাছে ফেক্না। মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকাস না যেন!—

তারপর তিনি গলা নামিয়ে, ছোট ভাইকে আর-একটা রোজগারের রাস্তা পারেন বললেন—মোটেই গোলমেলে না—শীতকালে তো জলের মতো সোজা—জাঁতার ঘরের বইগুলো উনোনে না ফেলে, খানকয়েক খানকয়েক করে প্রত্যহ আলোয়ানের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া—এইটুকু তো কাজ।—

ফেকমল দিদির কাছে সত্যিই শিশু—দিদি যদি বেটাছেলে হত, তাহলে লাটসাহেব কিংবা ইনকাম ট্যাক্সের হাকিম পর্যন্ত হয়ে যেতে পারত বোধহয়।—কিন্তু ধরা পড়লে যে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে! আজ থাক, দিদি আশ্বাস দিলেন,

'আলোয়ানের মধ্যে করে বই নিয়ে যাওয়া আবার একটা শক্ত কাজ নাকি? ছেলেবেলায় ঠাকুরদাকে দেখেছি, বাজরা ওজন করবার সময়, খদ্দেরের চোখের সম্মুখে সেরে পোয়া সাফ্। তুই বোধ হয় তখন জন্মাসনি। কিন্তু বাবা যখন গুটগুটিয়াদের গদিতে বছরে বাহাত্তর টাকা মাইনেতে চাকরি করতেন, সেই সময়ের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোর? সে সময় আটা আর ডাল কোনো দিন পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়েছে আমাদের? গ্রীষ্মকালেও না। সেই ছেগমলের নাতি, লেখমলের ছেলে তুই! গায়ে আলোয়ান থাকতেও পাবি ভয়? ছি! ছি! ছেলেমানুষেরও অধম তুই! এই নে!'

কুলুঙ্গির গণেশঠাকুরের পিছনের স্তূপীকৃত ফুল সরিয়ে খানকয়েক বই বার করলেন।—প্রণাম গণেশজী! প্রণাম মুনাফা ঠাকরুণ! ফেকনের উপর দৃষ্টি রেখো! ও নেহাত ছেলেমানুষ!—দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুণের দেবাক্ষরা কলেবরে বইগুলো ঠেকিয়ে, তিনি দিলেন ফেকমলের হাতে।

লেখমল-বংশের গৌরবময় ঐতিহ্য আটা ডাল নিয়ে; ছাপা লেখা নিয়ে নয়। তাই ফেকমলের বুক দুরদুর করে।

'দেখ তো দিদি, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না তো?'

'না না! ভয়েই ম'ল! তোর আলোয়ানটা কি কাঁচের, যে বাইরে থেকে দেখা যাবে বইগুলো!'

বাইরে চেঁচামেচি শোনা গেল। বিরিজলাল হাত ধরে টানতে টানতে টিকমচাঁদকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে।

'চোর কোথাকার! আজ আমি মেরে হাড় গুঁড়ো করব তোর! বাবার পেয়ারের পায়রার দেখ কাণ্ড! দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখি যে, এই ধর্মপুত্তুরের বাচ্চা আলোয়ানের নিচে খানকয়েক বই নিয়ে বার হচ্ছেন। যত সব চোরের আড্ডা হয়েছে বাবার গদিটা! বাবা কোথায় মা?'

'এই তো, এখনই গেল গদিতে!'

'গদিতে! গদিতে তো নেই! আমি তো সেখান থেকেই আসছি।

'এই ফেক্‌না, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এদের গদির লোক নিয়ে ব্যাপার—ওরা বাপবেটায় যা মন চায় করবে টিকমচাঁদকে, তোর এর মধ্যে কী? যা, বাড়ি যা!'

'না না মামা, তুমি যেও না। আগে এ বদমাইসটাকে ঠাণ্ডা করে নিতে দাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

এই শীতের মধ্যেও ফেকমলের কপাল তখন ঘেমে উঠেছে।

বিরিজলালের হাতের এক চড় খেয়েই টিকমচাঁদ পরিত্রাহি চিৎকার করতে আরম্ভ করে, 'ও শেঠজী, শিগগির আসুন—এরা আমায় মেরে ফেললে।—'

নিচে থেকে শেঠজী সাড়া দিলেন। বোঝা গেল যে তিনি বাড়িতেই আছেন। আসছেন। এসে দেখেশুনে অবাক! কী ব্যাপার? ছেলে বুঝিয়ে দিল—'বাজারে বইয়ের দর এবেলা চার টাকা হয়েছে। সেই খবর পেয়ে আপনার পেয়ারের টিকমচাঁদ দশখান বই সরাচ্ছিলেন।'

আরও দু-চার ঘা পড়তেই টিকমচাঁদ সব বলে ফেলল—তার কোনো দোষ নেই—শেঠজী নিজে তাকে ওই বইগুলো দিয়েছিলেন জাঁতার ঘর থেকে, বাজারে বিক্রি করবার জন্য—চার টাকা দরে।—প্রত্যহ খানকয়েক করে

জেনেন বলেছিলেন। বিরিজলালবাবুকে আসতে দেখে শেঠজী জাঁতার ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন।—

এর পর আর টিকমচাঁদকে কিছু বলা চলে না। সে চলে গেল। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শেঠজী হুংকার দিলেন, 'কেন? নিজের বাড়ির জাঁতা-ঘরে ঢুকতে হলেও কি আমায় টিকিট কেটে ঢুকতে হবে নাকি? আমি জাঁতার ঘরে চুরি করতে যাইনি—বই গুনতে ঢুকেছিলাম।' শেষের কথাটা বলবার সময় অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানলেন শ্যালকের দিকে। ফেকমলের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে; তার দিদিরও।

বিরিজলালের এখন আর এসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। সে খবর দিল যে ইন্দ্রাণী পাবলিশার্স সে পঁচিশ হাজার টাকায় কিনবে ঠিক করে এসেছে। হাজার ত্রিশেকে টাকা দিয়ে আর-একটা ভাল প্রেস কিনবে। মাসে মাসে 'হাটে হাঁড়ি' সিরিজের বই বার করবে, ইংরাজী, হিন্দী, আর বাংলায়। ছাপার অক্ষরের কারবারে, পয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জত আছে। মিস্টার ফণীর সঙ্গেও সে সব ঠিক করে এসেছে! ছাপা অক্ষরের ব্যবসাতে ওই রকম পেন্টুলুন পরা লোকেরই দরকার। এ তো আর রাম রামে, দুয়ে দু নয়। এ হচ্ছে ছাপার অক্ষরের ব্যবসা। চেয়ার টেবিল বসবে, বন্ধুদের নিয়ে চা সিগারেট ওড়াবে, এই হচ্ছে এ ব্যবসার রীত।—

শেঠগৃহিনী ছেলের এই নূতন ব্যবসা খুলবার সংকল্পের মধ্যে বউমার ফুসলানির গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু প্রশান্ত আনন্দে ভরে উঠেছে শেঠজীর মুখ, ছেলের ব্যাবসায়িক বুদ্ধি দেখে। পারবে। এ ছেলে পারবে বাপের নাম রাখতে! সবচেয়ে আনন্দ যে এই রকম একটা নতুন অজানা ব্যবসাতে তাঁকে টাকা ঢালতে হবে না। ঢালবে বিরজু, তার নিজের টাকা থেকে।—

ও মহামহিম ছেগমলের বংশধর, আলোয়ানের মধ্যে ডান হাতখানা তোমার যে অবশ হয়ে এল। আর কষ্ট করবার দরকার কী! ও সাতখান বই গণেশঠাকুরের ফুলের নিচে আমি আগেই দেখেছিলাম।

নিজের নিজের কাজের জন্য কেউই অপ্রস্তুত নয়। এ সবই মুনাফা ঠাকরুণের রাজ্যের নিয়মের মধ্যে পড়ে। তবু বিরজুর মা কথা পালটাবার জন্য দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুণকে প্রণাম জানাতে জানাতে বললেন, 'যাঁর কৃপায় এত বড় লোকসানটা বদলে লাভের কারবার হয়ে গেল, তাঁর দেবাক্ষরা কলেবর, আজই আমি সেকরা ডেকে রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে দেব।'

এবার মুনাফা ঠাকরুণ ফণীর দর ফেললেন মাসে একশ' পঞ্চাশ টাকা। সে যে রকম কারিতকর্মা লোক তাতে মনে হয় যে দেবীর অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠতে তার আর বেশি দেরি নেই।

## পত্রলেখার বাবা

দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ির আড্ডায় চেঁচামেচি নেই, হৈ-চৈ নেই, কথাকাটাকাটি নেই। কথাবার্তাগুলো হয় থেমে থেমে। অতি সংক্ষেপে। একটু একজন বলে, বাকিটা সবাই বুঝে নেয়। সবটা কোনো কথার বলতে হয় না। যে রকম গল্পের

সবটা করা যায়, সেসব গল্পে এ আসরের লোকের উৎসাহ নেই। রুচির মিলের জন্যই তিন-চারজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই আড্ডাটা টিকে আছে।

রাস্তার ওদিককার বাড়িতে সেতার বাজানো আরম্ভ হল।

'শুরু হল!'

'হ্যা-অ্যা।'

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যেতে দাও। কী দরকার ওসব কথায়।'

ওই বাড়ির কর্তা নতুন বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের বন্ধুবান্ধবরা ওই বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় গানের আসর বসায়, এ জিনিস এঁদের চোখে খারাপ লাগে। সেইটা ওঁরা প্রকাশ করলেন ওই তিনটি বাক্যে।

আবার সবাই নীরব—যতক্ষণ না আর-একটা নূতন বিষয়ের উপর কথা ওঠে।

নীরবতা ভাঙল সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শুনে।

'ন্যাপলা আসছে।'

'হ্যা-অ্যা-অ্যা।'

দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখে একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

'বাড়ির কাছাকাছি এসে ও সাইকেলের ঘণ্টা বাজাবেই বাজাবে।'

'হ্যা-অ্যা।'

ঠিকই নেপাল। সাইকেলখানাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে সে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর। বেরিয়ে এল খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে।

'কাগজে কোনো খবরটবর আছে নাকি হে নেপাল?'

'তাই দেখছি।'

গভীর মনোযোগে সে খবরের কাগজ পড়ছে দেখে সকলে অবাক হয়।— ব্যাপার কী?

দোলগোবিন্দবাবু কিন্তু একবারও নেপালের দিকে তাকাননি।

আবার মিনিট-দুয়েক সকলে চুপচাপ।

রাস্তার দিক থেকে 'টর্চ'-এর আলো পড়ল। কারা যেন আসছে।

'ও আবার কারা?'

'অনুপ আর পত্রলেখা হবে বোধ হয়।'

'পত্রলেখা বাড়িতে ছিল না? তাই বলো!'

মদনবাবু বেফাঁস কথাটাকে সামলে নিলেন, 'তাই আজ চা পাওয়া যায়নি এখনও।

'এত রাত করে গিয়েছিল কোথায়?'

'নীলমণিবাবুর বাড়িতে আটকৌড়ে ছিল যে। ওঁর মেয়ের ছেলে হয়েছে জান না?'

নীলমণিবাবুর বাড়ির চাকর পত্রলেখাদের পৌঁছে দিতে এসেছে। হাতের ধামিতে আটকৌড়ের মুড়িমুড়কি আর জিলিপি।

'আটকৌড়ের খুব ঘটা দেখছি।'

'হ্যা-অ্যা।'

অনুপ দেখাল, তার হাফপ্যান্টের দুই পকেটেই মুড়ি-কড়াই ভাজায় ভরা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরই তো ছিল আসল নেমন্তন্ন। দিদি তো পেটুকের মতো তোরই পিছনে পিছনে গিয়েছে।'

'সে আর বলতে হয় না। আমাকে ডাকতে এসেছে তবে গিয়েছি। নইলে আমার দায় পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করুন বাবাকে।'

'তোকে ডাকতে এসেছিল, সেও ভাইয়েরই খাতিরে। নইলে আটকৌড়ের কুলো পেটাবার জন্য মেয়েদের আবার ডাকে নাকি।'

'আচ্ছা বেশ, আমি পেটুক। হল তো?'

'এই রে, পত্রলেখা চটেছে। আর তোকে চটালে কি আমাদের চলে। এই দ্যাখ্‌না, তুই আজ ছিলি না, তাই আমরা এখনও চা পাইনি।'

'এই নিয়ে এলাম বলে।'

পত্রলেখা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল হাসতে হাসতে।

'এই সেদিন বিয়ে হল না নীলমণিবাবুর মেয়ের?' একটু চাপা গলা মাধববাবুর। নেপাল কাছেই রয়েছে। ছেলেমানুষদের সম্মুখে এসব কথা যত না বলা যায় তত ভাল। তবে হ্যাঁ, নেপাল আর এখন ছেলেমানুষ নেই। এই মাস থেকে কলেক্টরিতে 'কপিস্ট'-এর কাজ পেয়েছে। চাকরি-বাকরিতে ঢুকলেই ছোটরা বড়দের সঙ্গে সমান হবার অধিকার পায়। তবুও প্রথম প্রথম একটু বাধে। কাল প্রথম দোলগোবিন্দবাবু নেপালকে একটা গোপন কাজের ভার দিয়ে, তার বড় হবার অধিকারের সুনিশ্চিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে খবর আড্ডার অন্য বন্ধুদের জানা নেই, তাই তাঁরা গলার স্বর একটু নামিয়ে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ। নেপাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ছে।

'শ্রাবণ মাসে।'

'হ্যা-অ্যা।'

'আর আজকে হল এ মাসের তেইশে।'

'হ্যা।'

আঙুলের কড় গোনা শেষ হলে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যাকগে, যেতে দাও ওসব কথা।'

সকলেই দোলগোবিন্দবাবুর এ স্বভাবের কথা জানে। পরকুৎসা শোনবার আগ্রহ তাঁরই বোধ হয় দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শাঁসটুকু নিয়ে ছিবড়েটাকে যথাসময়ে বাদ দিয়ে দিতে তিনি জানেন। তাই আসল কথাটা শোনা হয়ে গেলে, তিনি মৃদু আপত্তি তুলে বলেন, 'থাক, থাক—কী দরকার আমাদের এইসব পরের কথার মধ্যে থাকবার!'

তাঁর এই বারণ কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবু এই কম কথার আড্ডাটা আপন নিয়মে কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে যায়।

ভিতর থেকে পত্রলেখা সকলের জন্য আটকৌড়ের মুড়ি-কড়াই ভাজা নিয়ে এল।

'দেখুন কাকা, কে পেটুক—আমি না আপনারা।'

'আরে তোকে কি কখনো পেটুক বলতে পারি! তাহলে তো আমাদের চা-ই দিবি না আজ!'

'মা চা ঢালছে; এই এনে দিলাম বলে। নেপালদা, তুমি হুট করে চলে যেয়ো না যেন রাগ করে। তোমার মুড়ি নিয়ে আসছি। হাত তো আমার মোটে দু'খানা। একসঙ্গে কতগুলো বাটি আনব?

'পত্রলেখা, একটি লণ্ঠন আনিস তো মা আসবার সময় ।'

'আচ্ছা, কাকা ।'

তাঁর বন্ধুরা কেমন অনায়াসে মেয়েদের মা বলে সম্বোধন করেন দেখে দোলগোবিন্দবাবু অবাক হয়ে যান। তিনি তো চেষ্টা করেও পারেন না। বাধো-বাধো ঠেকে। একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। পত্রলেখা নামটা যা বড়— অনেক সময় যেন মনেই পড়তে চায় না। মা মা বলে ডাকতে পারলে সুবিধা ছিল। পত্রলেখার অন্য কোনো ডাকনাম দেবারও উপায় নেই; স্ত্রীর কড়া হুকুম মেয়েকে পত্রলেখা বলেই ডাকতে হবে। তিনি নিজে এই পাড়ারই মেয়ে —ডাকনামেই আজও পরিচিত—ভাল নামটা কেউই জানে না—ডাকনামটা আবার বিশেষ ভাল নয়—তাই পত্রলেখার নাম সম্বন্ধে তাঁর এত সতর্কতা। পত্রলেখা নামটায় দোলগোবিন্দবাবুর প্রথম থেকে আপত্তি। বলেছিলেন যে, যদি লেখা দেওয়া নামই রাখতে হয় তবে সুলেখা বা চিত্রলেখা রাখ না কেন? কিন্তু স্ত্রীর কাছে তাঁর কোনো কথা খাটে? যে কথা একবার মুখ থেকে বার হবে, তার আর নড়চড় হবার জো নেই। পাড়ার মেয়ে—ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন তো তাকে। আর নিজের নাম দোলগোবিন্দ যখন, তার কি পত্রলেখা নামটাকে বড় বলবার মুখ আছে?

কথার খই ফুটোতে ফুটোতে পত্রলেখা চা দিয়ে গেল।

'এবার তুমি পড়তে বোসোগে যাও পত্রলেখা।'

'ও কী হে নেপাল, তুমি যে একগাল করে মুড়ির সঙ্গে এক চুমুক করে চা খাচ্ছ! মুড়ির মুচমুচে ভাবটা চা দিয়ে নষ্ট করে লাভ কী?'

'আমার তাই ভাল লাগে।'

'হ্যা-অ্যা! আপরুচি খানা!'

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন পাড়ার ইউনিভার্সাল মাসিমা। এঁর জিভের ধার আছে। আর কোনো খবর ইনি এগারটার সময় শুনলে, সে খবর এগারটা বেজে দশ মিনিটের মধ্যে পাড়ার সব বাড়িতে অবধারিত পৌঁছে যাবে, এইরকম একটা খ্যাতি তাঁর আছে এখানে।

'কিসের গল্প হচ্ছে ছেলেদের?'

'ও, আপনি এখানে ছিলেন? হচ্ছে এইসব হাবিজাবি কথা। আচ্ছা, চা দিয়ে ভিজিয়ে নিলে মুড়ি-চিঁড়েভাজার মুচমুচে ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় না?'

'দাঁতই নেই, তার আবার মুড়ি খাওয়া। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আমার এখন। তবে যেকালে খেতাম তখন মুড়ির সঙ্গে শসা খেতে আমার ভালই লাগত। মুড়ির মুড়মুড়ে ভাবটা শসার জন্য নষ্ট হয়ে যেত বলে তো বোধ হয় না।'

'তাহলে দেখছি নেপালেরই জিত।'

'হ্যা-অ্যা, ওরই জয়জয়কার আজকাল।'

'শুনতে পাচ্ছি তো তাই। আচ্ছা, আমি এখন চলি।'

'বড় তাড়াতাড়ি চললেন?'

'এসেছি কি এখন? জপসন্ধ্যা আমার এখনও বাকি।'

'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান। এই অন্ধকারে একা যাবেন কি! নেপালের চা খাওয়া শেষ হল বলে। ও পৌঁছে দিয়ে আসুক আপনাকে।'

'না না, ও এখন অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে চা খাবে। কী বলিস নেপাল? আমার আবার কোথাও যাবার জন্য লোক লাগে নাকি? কাশী বৃন্দাবন সেরে এলাম একা; এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যেতে লোক লাগবে সঙ্গে?'

'না না। নেপাল সঙ্গে যাক।'

'ও বেচারা এসেছে খবরের কাগজ পড়তে—তোমরা ওকে জোর করে পাঠাবে ফোকলা দিদিমার সঙ্গে।'

'ও কাগজ ওর পড়া। এখন এমনি নাড়াচাড়া করছে।'

'হ্যা-অ্যা, রিভাইজ করছে।'

'ইংরাজী করে আবার কী বলা হল? এসব কী আমরা বুঝি। ওসব বুঝবে পত্রলেখার মতো আজকালকার ইংরাজী-পড়া মেয়েরা! আচ্ছা আমি চলি। নেপাল, তুমি খবরের কাগজ পড়।'

'পড়া না হয়ে থাকে, কাগজখানা বাড়িতেও তো নিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যা-অ্যা।'

এতক্ষণে নেপাল কথা বলল। আর চলে না চুপ করে থাকা।

'আমার কাগজ-পড়া হয়ে গিয়েছে। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই!'

'দাঁড়ান দাঁড়ান মাসিমা। একটা কথা। নীলমণিদার নাতি দেখতে গিয়েছিলেন তো? কেমন হয়েছে?'

'দিব্যি বড়সড় ছেলে।'

প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই চাপা গলায়। দুই-ই অর্থপূর্ণ। এর চেয়ে সংক্ষেপে বলা যেত না।

'থাক্ থাক্, যেতে দাও, দরকার কী ওসব পরের বাড়ির কথায়।'

নেপাল খবরের কাগজখানা সযত্নে ভাঁজ করছে।

বাড়ির ভিতর থেকে দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর চিৎকার শোনা গেল, 'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড় পত্রলেখা! অংক-টংক এখন নয়। ওসব চালাকি আমি ঢের বুঝি, বুঝলি।'

'এতক্ষণে শক্ত পাল্লায় পড়েছে পত্রলেখা।'

'হ্যা-অ্যা।'

পত্রলেখা জোরে জোরে ইতিহাস-পড়া আরম্ভ করেছে।

'বাপের নাম দোলগোবিন্দ, মায়ের নাম খেঁদি, মেয়ের নাম হল কিনা পত্রলেখা! হেসে বাঁচি না। নেপাল, আর [illegible]—চল এবার আমরা যাই। তোর দরকার থাকে তো আবার না হয় ফিরে আ[illegible] [illegible]মাকে পৌঁছে দিয়ে।'

'হ্যা-অ্যা।'

'না না না—আমি আ[illegible]ব না—ওই দিক দিয়েই বাড়ি চলে যাব।'

বেশ জোরের সঙ্গে বল[illegible] [illegible]বোঝা গেল যে এতক্ষণে নেপাল সত্যি সত্যিই মত স্থির করে ফেলেছে।

অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খবরের [illegible]জখানা দোলগোবিন্দবাবুর হাতে দিয়ে নেপাল বারান্দা থেকে নেমে এল। [illegible]িনিও নিস্পৃহভাবে বাঁ-হাত বাড়িয়ে অকিঞ্চিৎকর জিনিসটাকে নিলেন। বুঝে গিয়েছেন তিনি, কাগজখানা বাড়ির ভিতরে না রেখে নেপাল তাঁর হাতে দিল কেন। বুদ্ধিমান ছেলে নেপাল—

কারও মুখে একটাও কথা নেই! মাসিমার গলার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে তারপর আর শোনা গেল না। নির্বাক আড্ডায় একজন পা দোলাচ্ছেন, একজন আঙুলের কর গুনছেন, একজন আঙুল মটকাচ্ছেন। এ সবই প্রত্যাশিত আচরণ, হিসাব করবার সময়ের। গুণে, হিসাব করে একটা সঠিক তারিখ বার করবার গুরু দায়িত্ব এখন এঁদের মাথায়। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের তারিখটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আর এখন এদের উপায় নেই। চুপ করে আছেন বলে যে এঁরা সময় নষ্ট করছেন তা নয়।

'সেটা ছিল উনিশে আগস্ট। ঠিক মনে পড়েছে।' তারিখের হিসাব মদনবাবুর সব সময় নির্ভুল। সেইজন্য কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করল না।

'যেতে দাও ওসব কথা।'

'হ্যা-অ্যা।'

এর চেয়ে বেশি কথা খরচ করতে কেউ রাজী না। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। দোলগোবিন্দবাবু নেপালের দেওয়া খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামাননি তখন থেকে। রোলারের মতো গোল করে পাকিয়ে নিয়েছেন কাগজখানাকে।

মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে মুখে না প্রকাশ পেয়ে যায়, এ সংযম এঁদের প্রত্যেকেরই আছে। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের সঠিক তারিখটা খুঁজে বার করবার মধ্যে অঙ্কের উত্তর মিলবার তৃপ্তি নেই। ওটা শুধু কৌতূহল জাগ্রত করবার প্রথম ধাপ। তার পরের প্রশ্ন ও উত্তরটাই যে আসল। সেইটা আসছে—এইবার আসছে! এই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা অতি সংক্ষিপ্ত সারকথা খোঁজবার পালা এখন চলেছে। কার মুখ থেকে সেই কথার নির্যাসটা বার হবে প্রথম, তার এখনও ঠিক নেই। দোলগোবিন্দবাবু পা নাচাচ্ছেন। তিনি যখনই খুব বিচলিত হয়ে পড়েন তখনই এমনি করে পা নাচান। এইরকম অবস্থায়, তিনি অনেক সময় ভুলে পরনিন্দা করে ফেলেন।

তবে কি ছোট্ট টিপ্পনীটা তাঁর মুখ থেকেই বার হবে? তাঁর অবিরাম পা-নাচানো লক্ষ্য করে বন্ধুরা সেই প্রত্যাশাই করছেন!

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অন্যরকম। অতি পরিচিত ভঙ্গিতে দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কটা বাজল?'

অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ব্যাপার কি? সবে আজকের আড্ডাটা জমে আসছিল। বন্ধুরা জানে যে ওই প্রশ্ন দোলগোবিন্দবাবুর নোটিশ – আড্ডা ভাঙবার। রাত সাড়ে-আটটা পর্যন্তই এ আড্ডার মেয়াদ। দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর হুকুম। স্ত্রীর কথা না শুনে চলবার সাহস তাঁর নেই। শাসন বড় কড়া। পত্রলেখার পড়াশোনায় একটু মন কম; তার লেখাপড়ার একটু দেখাশোনা না করলে গিন্নী রাগারাগি করেন।—'অঙ্ক না-হয় তোমার মাথায় ঢোকে না; অন্য বিষয়গুলো তো পড়াতে পার! আর কিছু না হোক বানান-টানানগুলোও তো একটু দেখিয়ে দিতে পার। না-ও যদি পড়াও, কাছাকাছি একটু বসে থাকলেও তো মেয়েটা নভেল-নাটক না পড়ে, পড়ার বইটই নাড়াচাড়া করে। মেয়েকে ঢুলতে দেখলে চোখে জলের ঝাপটাও তো দিয়ে আসতে বলতে পার। আমি থাকি সে-ই রান্নাঘরে—'

এইসব মুখঝামটার ভয়ে সাড়ে-আটটার সময় আড্ডা ভাঙতে হয় প্রতিদিন।

খাওয়া রাত দশটায়। তার আগে কিছুতেই না—মরে গেলেও না। এই হচ্ছে পত্রলেখার মায়ের ব্যবস্থা।

এইসব ব্যবস্থার কথা দোলগোবিন্দবাবুর বন্ধুদের সকলেরই জানা। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, আজকে যেন সাড়ে-আটটা বড় তাড়াতাড়ি বেজে গেল। অবশ্য তাঁদের কারও কাছেই ঘড়ি নেই—তবে একটা আন্দাজ আছে তো সব জিনিসেরই। দোলগোবিন্দবাবু যেন একটু উসখুস করছেন। এ জিনিস বন্ধুদের নজর এড়ায় না।—কেন?—মেয়ের পরীক্ষার সময় এখন তো নয়। কোনো কথা না বলে বন্ধুরা উঠলেন। যাবার আগে দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখ আর একবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে গেলেন।

'হ্যা-অ্যা।'

শুধু এই কথাটা জুতো পরবার সময় একজনের মুখ থেকে অজানতে বার হয়ে গেল।

এতক্ষণে দোলগোবিন্দবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের খবরের কাগজখানা খুলবার সময় পেলেন!—ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। ছেলেটার বুদ্ধি আছে! পারবে। এ ছেলে পারবে। কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় এসব ছেলেকে! —এদের হাতে রাখতে পারলে লাভ আছে!

খবরের কাগজের ভাঁজের ভিতর, টাইপ-করা চিঠি, আর একখানা খাম। খামের ঠিকানাটাও টাইপ করে লেখা—এত তাড়াতাড়ির মধ্যেও ছেলেটার মাথায় বুদ্ধি খেলেছে খুব!—

টাইপ করবার জন্য কাল রাত্রিতে নিজের লেখা খসড়াটা দিয়েছিলেন নেপালের কাছে। নেপাল ফৌজদারী আদালতে কপিস্ট-এর পদে বহাল হয়েছে নতুন। তার কাছে সব কথা খুলে বলেছিলেন। প্রথমে বুঝতে পারেনি নেপাল ব্যাপারটা। 'দশের উপকার', 'অপ্রিয় কর্তব্য', ইত্যাদি কথাগুলো দোলগোবিন্দবাবুর মতো অল্পকথার মানুষের মুখে শুনে প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা লেগে গিয়েছিল তার। তার উপর আবার ফিসফিস করে বলা। পর মুহূর্তে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আগাগোড়া জিনিসটা। গলা নামিয়ে সে বলে, 'এ আর একটা শক্ত কাজ কী কাকাবাবু। কিছু ভাববেন না। মেসিন বাড়িতেও নিয়ে আসতে পারি যদি দরকার পড়ে তো। যখন যা দরকার লাগবে বলবেন কাকাবাবু।'

'না না, আমার নিজের আবার দরকার কী। পাবলিকের উপকারের জন্যই এ কাজ করা।'

'সে তো বটেই।'

এই হয়েছিল কালকের কথা। নেপাল পত্রলেখার বাবার আস্থাভাজন হতে পারবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সম্বন্ধে বেনামী চিঠি হাতে না লিখে, টাইপ করে পাঠানোই সবদিক বিবেচনা করে যুক্তিযুক্ত। নিজের অফিসের মেসিনে টাইপ করা নিরাপদ নয়। তাই নেপালের সাহায্য নেবার দরকার হয়েছিল।

বেনামী চিঠি পাঠানো দোলগোবিন্দবাবুর পক্ষে নতুন না। এ তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যস্ত বিলাস। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিচারে কত বেনামী চিঠি যে তিনি আজ পর্যন্ত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন

যে তাঁর এই কাজ সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু মনে মনে জানেন কেন লেখেন। এর মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত আনন্দ পান। দুর্বার এর আকর্ষণ। পরকুৎসা করবার বা শোনবার রসটা মিষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু এর তুলনায় পানসে। এটাকে শুধু আড়াল থেকে খুনসুড়ি করে, মজা উপভোগ করা ভাবলে ভুল হবে। এ হচ্ছে ক্ষমতা-সচেতন মেঘনাদের, মেঘের আড়াল থেকে নিজের অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শিকারের উপর বেনামী চিঠির প্রতিক্রিয়ার কথাটা কল্পনা করেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ; সেটা নিজের চোখে দেখতে পেলে তো কথাই নেই। এই ঘন রসের নেশা তাঁর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তিনি। প্রথম বয়সে স্কুলের পায়খানার দেওয়ালে লিখতেন। তারপর আরম্ভ করেছিলেন রাতদুপুরে শহরের দেওয়ালে আর ল্যাম্পপোস্টে কুৎসা-ভরা প্ল্যাকার্ড আঁটা। কিন্তু ওসবের স্বাদ কিছুদিনের মধ্যে ফিকে মনে হয়েছিল। ওর রস প্রচারে; চটকদার কুৎসার কথাটা দশজনে মিলে উপভোগ করে। কিন্তু বেনামী চিঠি দেবার আনন্দের জাত আলাদা; একা উপভোগ করবার অধিকারের আমেজ অনেক বেশি গভীর। তাই তিনি ক্রমে ওসব ছেড়ে এই পথ ধরেন। এ পথে বিপদ-আপদও অপেক্ষাকৃত কম।

এই নিরাপত্তার দিকে চিরকাল তাঁর দৃষ্টি সজাগ। তাঁর বেনামী চিঠি দেবার কোনো কথা বন্ধুরাও জানেন না। কারও সঙ্গে তিনি কখনও আলোচনা করেননি এসব কথা। কাউকে বিশ্বাসী পাননি। ওসব বিষয়ে কখনো কোনো কথা উঠলে, তিনি চিরকাল একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতার ভাব দেখাতে অভ্যস্ত। জানেন এক শুধু তাঁর স্ত্রী—তাও সবটা নয়, কিছু কিছু। যত লুকিয়েই নেশা কর না কেন, স্ত্রীর কাছে কোনো-না-কোনো সময় সেটা ধরা পড়তে বাধ্য। চাবি-দেওয়া দেরাজের মধ্যে চিঠি লিখবার সরঞ্জাম, আর ডাকটিকিটের প্রাচুর্য দেখেই তাঁর স্ত্রীর মতো বুদ্ধিমতী মহিলা হয়তো অন্য একটা মনগড়া মানে করে নিতেন। তাই তিনি তাঁর সমাজসেবার নিজস্ব ধারার কথাটা স্ত্রীকে জানিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন। সে অনেকদিনের কথা হল। বেনামী চিঠিও আবার নানারকমের আছে তো। দরকার পড়েছিল সেদিন একখানা মেয়েমানুষের হাতে-লেখা বেনামী চিঠির। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্ত্রীকে বলতেই দেখা গেল যে এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও তৎপরতা প্রচুর। একবার জিজ্ঞাসাও করেননি এ কাজে কোনো বিপদ আছে কি না। সম্মতিজ্ঞাপক মৃদু আপত্তি জানিয়ে, পরার্থে, গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে, স্বামীর দেওয়া 'ডিক্টেশন' লিখেছিলেন। লেখা শেষ হলে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'পাড়ার মধ্যে হয়েছিল বিয়ে আমাদের। বরের চিঠিও কোনোদিন পাইনি; বরকে চিঠি লেখবার সুযোগও কোনোদিন পাইনি। চিঠি লেখার পাটই আমার নেই। যাক, ফাঁকি দিয়ে সুযোগ পেয়ে গেলাম জীবনে প্রেমপত্র লিখবার।'

আর গুণের মধ্যে বেনামী চিঠির কথা পাড়ার অন্য কারও কাছে বলে না ফেলবার মতো বুদ্ধি আছে তাঁর স্ত্রীর।

এখন কথা হচ্ছে যে, নেপালটারও সে সুবুদ্ধি আছে কি না। নেপালকে বিশ্বাস করে তিনি ভুল করলেন কি না সেই কথাটাই কালকে থেকে তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। তবে আজকে খানিক আগেই নিজের আচরণে নেপাল যা দেখিয়েছে তাতে মনে হয় তাকে বিশ্বাস করতে পারা যায়।

যাক, সেসব যা হবার তা তো হয়েইছে। এখন তাঁর হাতে অনেক কাজ। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত টাইপ করা চিঠিখানা দেখেশুনে এখনই ঠিকঠাক করে রাখতে হবে; নইলে ভোরে উঠে মাইল চারেক দূরের ডাকবাক্সে চিঠিখানা ফেলে আসতে পারবেন কী করে। এ পাড়ার পোস্ট অফিসের ছাপ চিঠিখানার উপর কোনোমতেই পড়তে দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আবার একটা নতুন কাজ হাতে এসে পড়ল হঠাৎ, আজকের সান্ধ্য আড্ডার গল্প থেকে। নীলমণিবাবুর মেয়ের 'কেসটা'। এই রকমই হয়; কোন দিক থেকে যে কখন কাজের বোঝা মাথায় এসে পড়ে তার কি ঠিক আছে! যখন আসে, তখন যেন অনেকগুলো একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে পড়ে—এ তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন। এখন নীলমণিবাবুর নামে একখানা বেনামী চিঠি ছাড়তেই হয়। নতুন জামাইয়ের কাছে এখন নয়। সে সব হবে পরে দরকার বুঝলে—একটা সতর্কবাণীর মধ্যে দিয়ে। এখন শুধু নীলমণিবাবুকে দিতে হবে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত। প্রথম চিঠিতে তার চেয়ে বেশি কিছু দেবার প্রয়োজন হবে না! একসঙ্গে বেশি না। নিংড়ে নিংড়ে একটু একটু করে এসব আনন্দের রস নিতে হয়। কোণঠাসা প্রাণীটা এখন সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। আঘাত খাওয়ার পর আহত শিকারটার চোখের মণিটাকে তাঁর বড় দেখতে ইচ্ছা করে; ভয়ার্ত বুকের অসহায় স্পন্দন আঙুলের ডগায় নিতে ইচ্ছা করে।—জামাইয়ের চিঠিখানাও এখনই দিয়ে দিলে কেমন হয়?—কিন্তু ঠিকানা যে জানা নেই। মদনবাবুর এসব মুখস্থ। কথায় কথায় জেনে নিলেই হত আজ। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।—

দোলগোবিন্দবাবু উঠলেন, ঘরের ভিতর যাবার জন্য। পত্রলেখা ছুটে আসছিল এই দিকেই—হাতে বই।

'নেপালদা। এ কী, নেপালদা চলে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সে তো মাসিমার সঙ্গে গেল। কেন রে?'

'লাইব্রেরির বইখানা আজ ফেরত দেবে বলেছিল!'

নেপালই নিয়মিত লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেয় এ বাড়িতে।

'যাক, কালকে ফেরত দিলেই হবে। বইখানা দে তো দেখি একবার।'

'এ বই তোমার পড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।'

'না, সেজন্য চাচ্ছি না। বইখানা বেশ লম্বা সাইজের আছে। দুচারখানা অফিসের চিঠি লিখতে হবে; ওই বইখানার উপর কাগজ রেখে লিখবার বেশ সুবিধা।'

'দাঁড়াও, আমি বড় প্যাডখানা এনে দিচ্ছি।'

'না না, এতেই হবে। তুই শিগগির পড়তে বসগে যা। নইলে তোর মা এখনই আবার বকাবকি আরম্ভ করবে। চেঁচিয়ে পড়বি, বুঝলি। আর তোর কলমটা দিয়ে যাস তো।'

এসব কাজে নিজের কলম ব্যবহার না করে অপরের কলম ব্যবহার করাই ভাল।

পত্রলেখা কলমটা দিয়ে যাবার সময় একখানা লম্বা গোছের খাতাও আনে।

'লাইব্রেরির বই; ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাবে; তার চেয়ে এই খাতাখানার উপর কাগজ রেখে লেখাপড়া করো।'

'লাইব্রেরির বই ছিঁড়বে কেন। আমি কি বইয়ের সঙ্গে কুস্তি করতে যাব।

যা, পড়তে বসগে যা। তুই দেখছি আমাকেও আজ বকুনি না খাইয়ে ছাড়বি না !'

মেয়ে যেন একটু ক্ষুন্ন হয়ে চলে গেল। কথাগুলো বোধ হয় একটু কড়া হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে তিনি কোনোদিনই বকতে পারেন না। শুধু মেয়েকে কেন, কাউকেই না। বকা, চিৎকার করা এসব তাঁর কোনোকালেই আসে না।

চাবি দিয়ে তাঁর প্রাইভেট দেরাজ খুলে. তিনি লেখাপড়ার কাগজপত্র বার করলেন। একে তাঁর স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, কুনোব্যাঙের দপ্তর খুলে বসা। খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট, কাগজ,—বহুরকমের কালি আরও অনেক দরকারি জিনিসের তাঁর স্টক থাকে, কখন কাজে লাগবে বলা তো যায় না। বেনামী চিঠি পাঠাবার দিনে ওসব কেনা ঠিক না। নেপালের চিঠিখানা তিনি ভাল করে পড়লেন। দু-চারটে বানানে ভুল করলেও মোটামুটি মন্দ টাইপ করেনি নেপাল। ভুলগুলো কালি দিয়ে সংশোধন করা ঠিক হবে না—কে জানে কিসে থেকে কী হয়। খামখানা থুতু দিয়ে আঁটবার সময় চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই সরকারী কর্মচারীটির ছবি। অপ্রত্যাশিত আঘাতে কেমন করে ছটফট করে বেড়াবে, অথচ কাউকে কিছু বলতেও পারবে না—এ কথা ভেবেও আনন্দ। —লোকটার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।—

'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়, পত্রলেখা।'

এইবার দোলগোবিন্দবাবু দ্বিতীয় চিঠিখানা লিখতে বসলেন। অপ্রতিহত তাঁর ক্ষমতা এখন। পুতুলনাচের সুতো তাঁর হাতে ; যেমনভাবে ইচ্ছা নাচাতে পারেন। আজকের হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়া দায়িত্ব ; সর্বাধুনিক কিনা, তাই এইটাই আজকের আসল কাজ। তিনি একখানা খামের উপর খসখস করে বাঁ হাত দিয়ে নীলমণিবাবুর ঠিকানাটা লিখলেন। অভ্যস্ত হাত। তারপর আরম্ভ হল চিঠি লেখা। কলম হাতে ধরলে কখনও কথার জন্য ভাবতে হয় না তাঁকে। কিন্তু আজ প্রথমেই আটকাল একটা বানানে! আরম্ভ করেছিলেন—'আমরা ঘাস খেয়ে থাকি না। লোকের চোখে ধুলো—'

খটকা লাগল ধুলোর বানানে। ধ-এ দীর্ঘউ না ধ-এ হ্রস্বউ? এইটা দেখবার জন্য পত্রলেখার কাছ থেকে বাংলা অভিধানখানা চাইতে একটু সংকোচ বোধ হল। লাইব্রেরির বইয়ের মলাটের উপর ধুলো আর ধূলো দুটো পাশাপাশি লিখে দেখলেন কোনটা দেখায় ভাল। দুটোই সমান যে! যদি ধুলো কথাটা পাওয়া যায় এই ভেবে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাতা ওলটাতে আরম্ভ করলেন। —বঙ্কিম চাটুজ্যে কি আর ধুলোটুলো নিয়ে কারবার করে! গোধূলি, ধূলি, ধূলিকণা এইসব গোটাকয়েক পাওয়া গেল ; কয়েক পৃষ্ঠার পর হাল ছেড়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বইখানা নাড়াচাড়া করছেন—একখানা কাগজ বেরিয়ে এল। কতদূর পর্যন্ত পড়া হল, তারই বোধ হয় চিহ্ন। দিয়েছিল লাইব্রেরীর কোনো পাঠক ওই কাগজখানাকে দিয়ে।—কাগজখানার উপরের লেখাটার দিকে নজর গেল।—এ কী! পত্রলেখার হাতের লেখা না?—লেখাটা পড়লেন। প্রথমটায় একটু গোলমেলে ঠেকে। চিঠিখানার নিচে কোনো নাম নেই। কাকে লেখা তারও কোনো উল্লেখ নেই চিঠির ভিতরে। চিঠিখানা তাড়াতাড়িতে লেখা—মনে হয় খানিক আগেই লেখা হয়েছে।

—সন্ধ্যার সময় বাড়িতে থাকতে পারিনি। ছোট ভাইকে নিয়ে মা'র হুকুমে আটকোড়েতে যেতে হয়েছিল। আমার যেতে একটুও ইচ্ছা ছিল না। রাগ কোরো না লক্ষীটি!—

শেষের শব্দটার ভুল বানান এই মানসিক অবস্থাতেও নজরে পড়ে।—না—অসম্ভব! আবার পড়ে দেখলেন।—রাগে সর্বশরীর রি-রি করে ওঠে। নিজের মেয়ের এই কাজ। ইচ্ছা হয় চুলের ঝুঁটি ধরে এখানে টেনে নিয়ে এসে মেয়ের এই আচরণের জবাবদিহি নেন।

চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে গিয়ে মনে হল যেন হঠাৎ মেয়ের নামটাই মনে পড়ছে না; কেমন যেন গুলিয়ে গেল! পরের মুহূর্তে নামটা খুঁজে পেলেন। তিনি আজ পর্যন্ত কখনো বকেন নি। মারধর বকুনি, ওসব তাঁর আসে না কোনো কালে। বলেছেন ওসব হচ্ছে ওর মায়ের ডিপার্টমেন্ট!—তা ছাড়া মায়ের কাছে কি কখনো ওসব কথা তিনি বলতে পারেন।—

সব রাগ গিয়ে পড়ল ভিজে-বিড়াল ন্যাপলার উপর। ওটার উপর বিশ্বাস করে তিনি কী ভুলই না করেছেন!—মা-বাপেরই বুঝি এসব জিনিস নজরে পড়ে সবচেয়ে শেষে! এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে আজ সন্ধ্যার আড্ডায় বন্ধুদের কথাগুলোর ইঙ্গিত এই দিকেই ছিল। মাসিমা পর্যন্ত নেপালের এত মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার উপর কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। দেখা যাচ্ছে সকলেই জানেন, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন; সকলে ঘুরিয়ে তাঁকেই খোঁটা দিচ্ছিলেন এ নিয়ে। অথচ শুধু তিনিই বুঝতে পারেননি সে সময়। এর আগে ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে।—ছি ছি ছি!—ওই হতভাগাটাকে মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে; ওর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করতে হবে; করতে হবে তো আরও কত কী! কিন্তু তাঁর সে যে ওসব আসে না কোনো কালেই। পৃথিবীর যত ঝঞ্ঝাট কি তাঁরই উপর এসে পড়বে!—ওই বাঁদরটাই নিশ্চয় পত্রলেখাকে বইয়ের মধ্যে রেখে চিঠি পাঠানোর ফন্দিটা শিখিয়েছে। ও চালাকিটা আগে থেকে রপ্ত না থাকলে, কখনও কি অত তাড়াতাড়িতে খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে ভরে চিঠি চালান দেবার কথাটা কারও মাথায় খেলে? ধরে চাবকানো উচিত রাস্কেলটাকে!—কিন্তু মারধোর করলে নেপালটা আবার চটে তাঁর বেনামী চিঠি দেবার অভ্যাসের কথা লোকের কাছে বলে বেড়াবে না তো? তাঁর নিজের হাতের লেখা চিঠির খসড়াটাও যে সেই হতভাগাটার কাছেই থেকে গিয়েছে।—ভয়-ভয় করে।

কী করা উচিত এখন? অনেকক্ষণ ধরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন বিষয়টাকে নানা দিক থেকে। যত ভাবেন তত মাথা গরম হয়ে ওঠে। কোনো কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত পত্রলেখার বাবা তাঁর দেরাজের থেকে একটা পুরনো পেন হোল্ডার বার করলেন। কলমটার নিব নেই। কলমের উলটো দিকটা কালির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তিনি লিখছেন। লিখছেন নতুন একখানা চিঠি। বেনামী চিঠি। পত্রলেখার মায়ের কাছে। জীবনে স্ত্রীর কাছে তাঁর এই প্রথম চিঠি লেখা।

মানহানির মোকদ্দমাটা নিয়ে বেশ খানিকটা মানসিক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটেছে শ্রীদাম সাহার। এই উত্তেজনাটাই তাঁর নেশা! মহাজনী কারবার করেন। কোর্টে মোকদ্দমা লেগেই থাকে। প্রত্যহ নিজে না গেলেও চলে; কিন্তু তিনি না গিয়ে থাকতে পারেন না। এই বাহাত্তর বছর বয়সেও নথিপত্রের পুঁটুলিটা বগলে নিয়ে কি রোদ, কি বৃষ্টি, ঠুকুর ঠুকুর করে হাঁটতে হাঁটতে কোর্টে তাঁর যাওয়া চাই-ই চাই। কাছারির বারান্দায় ছাতা মাথায় দেওয়া অবস্থায় কত সময় তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়; কত সময় দেখা যায় নথিপত্রের পুঁটুলিটাকে বালিশ করে বার-লাইব্রেরির বেঞ্চিতে ঘুমোচ্ছেন। সকলেই তাঁকে চেনে। জাল-জুয়াচুরি না করে, আইন-সংগত উপায়ে তিনি প্রচুর বিষয়সম্পত্তি করেছেন; কিন্তু শহরের লোকে সকালবেলাটায় তাঁর মুখদর্শন বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করে না। স্কুলের ছাত্রদের ধারণা, শ্রীদামবাবুর মুখদর্শনের অমঙ্গল এক শুধু কাটতে পারে তাঁর দাঁত দেখলে।

বার-লাইব্রেরিতে একদিন ব্যারিস্টারসাহেব তাঁকে হাসতে হাসতে বিশ্রীদামবাবু বলে সম্বোধন করেছিলেন। অন্য লোক হলে চেপে যেত; কিন্তু তিনি মানহানির মোকদ্দমা এনেছিলেন কোর্টে। তাঁর বাঁধা উকিল আছেন আদালতে। দু টাকা করে ফি এবং মক্কেলের বলা পয়েন্ট অনুযায়ী বহস্, এই কঠিন শর্তে রাজী বলেই তিনি শ্রীদামবাবুর আস্থাভাজন হতে পেরেছেন। বিবাদী পক্ষ থেকে বলা হয় যে, শহরের বাসিন্দারা সকলেই বাদীর নাম নেবার দরকার পড়লে বিশ্রীদামবাবুই বলে। শ্রীদামবাবুর উকিল বহস্ করেন যে, সকালে অভুক্ত অবস্থায় ছাড়া আর কখনো কেউ তাঁর মক্কেলকে বিশ্রীদামবাবু বলে সম্বোধন করে না; এবং মানহানির কথাটা বলা হয় ব্যারিস্টারসাহেবের মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর।

ওইরকম একটা মোক্ষম পয়েন্ট মাথায় খেলেছিল বলে বেশ খুশী মেজাজে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন শ্রীদামবাবু। এক শুধু দুর্ভাবনা যদি অপরপক্ষ হাকিমকে ঘুষ খাওয়ায়।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মিতব্যয়ী বলে বাইরে তাঁর দুর্নাম আছে; কিন্তু তাঁর বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার দিকটা ভাল। ভালমন্দ খাওয়ার দিকে তাঁর ঝোঁক আছে; এবং এই ঝোঁকটা বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে দিনদিনই বাড়ছে। ভেবেছিলেন যে, আজ জমিয়ে মোকদ্দমার গল্পটা করবেন স্ত্রীর কাছে, কিন্তু জলখাবার খাওয়ার সময় শুনলেন যে, তাঁর হাঁপানির টানটা হঠাৎ বেড়েছে। সৃষ্টিধরের মা বারোমাস এই হাঁপানি রোগে ভোগেন। পঞ্চান্ন বছর আগের সেই বিয়ের আগের দিন থেকেই তিনি দেখছেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে; আঙুলে তুলে নিয়ে একটু পায়েস ছোট নাতনীর মুখে দিয়েছেন; এমন সময় একটা মারাত্মক খবর শুনলেন বড়-বউমার মুখে। আজকাল বাড়ির লোকে তাঁর সঙ্গে একটু সাবধান হয়ে কথা বলে; কোন কথার যে কী মানে করে নেবেন এই ভেবেই সবাই তটস্থ। কাজেই খবরটার মারাত্মকতার দিকটার কিছুমাত্র আঁচ পেলে বড়বউমা কথাটা তুলতেন না শ্বশুরের কাছে। শাশুড়ীর অসুখের আধুনিকতম চিকিৎসার সম্বন্ধে খবর

মজার কথা ভেবেই বলা ; কিন্তু ছেঁকা লাগবার মতো গিয়ে লাগল কথাটা শ্রীদামবাবুর মনে। মনের অস্বাচ্ছন্দ্য চাপা দিয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নরেন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল কেন ?'

জবাব দিলেন মেজবউমা। 'নরেনবাবু নিজে থেকেই এসেছিলেন বন্ধুর খোঁজে ; কী যেন দরকার ছিল। কথাবার্তা হওয়ার পর বুঝি নিজে থেকেই বট্‌ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, মা কোথায়! মা'র তো তখন নিচে নেমে দেখা করবার মতো অবস্থা নেই। তিনি নিজেই উপরে গিয়ে দেখলেন মাকে।'

যতদূর সম্ভব গলার স্বর নরম করে শ্বশুর বড়বউমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিজিটের টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো ?'

সকলেই জানেন যে, নরেন ডাক্তার সৃষ্টিধরের বন্ধু ; এ বাড়ি থেকে ফি নিতে পারেন না। তবু বড়বউমাকে উত্তর দিতে হয়, 'আমরা কী করে বলব ?'

'দেখ বড়বউমা, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে করবার অভ্যাস ছাড়! বলো জানি না—আমি জানি না। আমরা-টামরা নয়! পরিষ্কার কথার পরিষ্কার উত্তর দেবে!'

'আমি জানি না।'

'সৃষ্টিধরের কি এসব খেয়াল আছে! কাল আমাকেই পাঠাতে হবে টাকাটা। কারও ন্যায্য পাওনা, যে-কোনো ছুতোয় তাকে না দেওয়া ঠকামি। চারশ' বিশ দফার নাম শুনেছ তো ? তাই। আমি যা চাই তা কি এরা হতে দেবে!'

হনহন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এখন দেখ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! শ্বশুরের মেজাজ বউরা বোঝে, কিন্তু এই অকস্মাৎ উষ্মার কারণ তারা ঠিক ধরতে পারল না। হিসাবী তিনি ঠিকই। কম্পাউণ্ডারবাবুই এ বাড়ির ডাক্তার, কারণ তিনি ইনজেকশন দিতে এক টাকা করে নেন। শ্রীদামবাবু আরও বলেন যে, আজকালকার ডাক্তাররা যখন শুধু পেটেণ্ট ওষুধই খেতে দেয় রুগীকে, তখন কম্পাউণ্ডার আর ডাক্তারে তফাৎ কী ? তবে শক্ত অসুখে টাকা খরচের ভয়ে বড় ডাক্তারকে ডাকবেন না এমন লোক তিনি নন। এ কথা বাড়ির বউরাও জানে। বিশেষত স্ত্রীর বেলায় তাঁর রাশ যে একটু আলগা, একথা শুধু বাড়ির কেন, বাইরের লোকেও জানে। তবে তিনি এমন চটলেন কেন ? বুঝতে না পেরে পুত্রবধূরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল কথাটা। নরেন ডাক্তারকে ফি না দেওয়ার কথাটা যে তাঁর রাগের আসল কারণ নয়, একথা তারা বুঝতে পেরেছে।

শ্রীদামবাবু খবরটা শুনেই বেশ বিচলিত হয়েছেন। বুঝতে পারছেন যে, আর কেউ ব্যাপারটাকে সে গুরুত্ব দিচ্ছে না।—দেবে না কেন ? উচিত ছিল দেওয়া। তিনি বাড়ির কর্তা। একবার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করল না! এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে! কিন্তু শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পোঁছবার পাত্র তিনি নন। সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য তিনি স্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। সৃষ্টিধরের মা খাটের উপরে বসে। কোলে দুটো বালিশ নিয়ে তিনি হাঁপাচ্ছেন আর কাশছেন তখনও। পাকা চুলের মধ্যে টাকপড়া সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর নজরে না পড়ে পারে না। প্রথম কথাতেই ধরা পড়ে গেল স্ত্রীর মনোভাব! সৃষ্টিধরের মা মানহানির মোকদ্দমার সম্বন্ধে প্রত্যাশিত প্রশ্নটা করলেন না ; পায়েসে মিষ্টি বেশি হয়েছিল কি না কিংবা বউমা খাওয়ার সময় পাখা নিয়ে কাছে বসেছিল কি না, এ কথাও জিজ্ঞাসা করলেন

না ; মুখে একগাল হাসি নিয়ে তিনি তুললেন নরেন ডাক্তারের নূতন প্রেস্‌ক্রিপ্‌-সনটার কথা। হাঁপানির টান সত্ত্বেও যে-রকম উৎসাহের সঙ্গে বলা, তাতে মনে হল যে, ডাক্তারের ব্যবস্থা পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে তাঁর মনের কাছ থেকে।—নরেন ডাক্তার এসেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে কোন্‌ কোন্‌ জিনিস খেলে হাঁপানিটা আরম্ভ হয়। ধোঁয়া নাকে গেলে বাড়ে নাকি, স্নান করলে বাড়ে নাকি, ছেলেবেলায় কবে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল মনে আছে নাকি—আরও কত এইরকমের হাবিজাবি প্রশ্ন। সব শুনে বলল—এক কাজ করে দেখুন। উপকার যে হবেই তা সে ঠিক বলতে পারে না ; তবে চেষ্টা করে দেখা উচিত। এ ঠিক হাঁপানি নয় ; রোগের নাম এ্যালার্জি না কী যেন বললে।—কতরকমের যে নতুন নতুন রোগ হচ্ছে আজকাল !—

হতবাক হয়ে গিয়েছেন শ্রীদামবাবু স্ত্রীর কথার ধরণ দেখে। পুত্রবধূরা যা বলেছিলেন সংক্ষেপে, ইনি সেই কথাই বলছেন বিস্তৃত ভাবে। মা আর ছেলের মধ্যে পরামর্শ হয়েছে ! তাঁকে ধর্তব্যের মধ্যে গোনেনি। এমন মারাত্মক বিষয়টা বিচারের সময়ও ! হাঁ, মারাত্মক বইকি। তাঁকে খবর দিতে যাবে কেন। মনেই পড়েনি তাঁর কথা !

স্ত্রীর কথা কানে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অনর্গল বলে চলেছেন নূতন ওষুধটার কথা।—কতই বা দাম। শস্তার ওষুধ। সারলে পরে অবাক হবার কথা। কিন্তু ও কি আর সারবে ! অত সোজা নয় এ রোগ। কত কিছুই তো করে দেখলাম সারাজীবন। ধরে আরশোলাসেদ্ধ জল খেয়েছি তোমার কথায়। সেবার ওষুধের সিগারেট পর্যন্ত খেতে হয়েছে তোমার পাল্লায় পড়ে।—

শুনছেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। তিনি জানেন যে স্ত্রীর কথাগুলো আন্তরিক নয় ; স্ত্রীর মনে মনে বিশ্বাস ওষুধে আশু ফল পাবেন। নূতন ওষুধের সন্ধান পেয়ে বেশ উৎফুল্লই হয়েছেন তিনি।—ওষুধের শস্তা দামটাই শুধু দেখলে সৃষ্টিধরের মা। ওর দাম কি শুধু ওই কয় আনাই ? আমার দিকটা না-হয় না ভাবলে, নিজের দিক থেকেও ভাবো জিনিসটাকে। তোমার মাছ খাওয়া ঘুচবে, সাদা থান পরতে হবে, আরও কত কী করতে হবে ! ছেলে, ছেলের বউ আজ তোমায় মাথায় করে রেখেছে—তখন কি কেউ পুঁছবে। ওদের সংসারে একবেলা চাউড় আলোচালের ভাত খেয়ে শুধু বেঁচে থাকতে হবে। —যাক, সেসব যার জিনিস সে বুঝবে।—

মুখে বললেন, 'দেখ, কতদূরে কী হয়।'

প্রায় অর্থহীন কথাটা। তারপর শ্রীদামবাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। মৃত্যুভয়টা তাঁর চিরকালের। ইদানীং বেড়েছে। এ নিয়ে উদ্‌বেগ ও দুশ্চিন্তাও বাড়ছে দিন দিন। অনেক বিষয়ে মন খুঁতখুঁত করে। সন্দেহ হয়। পারলে পরে সাবধান হয়ে যান। ছেলেমেয়েরা না জানুক, স্ত্রী তাঁর স্বভাবের এই দিকটার কথা জানেন। সময় সময় স্ত্রীর কাছে বলেও ফেলেন কিনা। এখনও বলতে পারলে হয়তো আসন্ন সংকটের একটা সমাধান হতে পারত। যাঁরা আঘাতটা দিয়েছেন তাঁরা সামলে যেতেন নিশ্চয়ই। অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আসা আঘাতের প্রকৃতিটা আবার অপরের কাছে বলবার মতো নয়। এত ব্যক্তিগত, এমন একটা স্পর্শকাতর জায়গার সঙ্গে সম্বন্ধিত যে বলতে বাধে। সেই হয়েছে মুশকিল। অভিমানের শ্রেণীর মনের ভাবের কোনোই মূল্য থাকে

না, যদি 'ওগো আমি অভিমান করেছি গো' বলে সেটা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়।—তাঁর দিকটা একবার মনেও পড়ল না সৃষ্টিধরের মায়ের!—অমন ওষুধ ব্যবহারের কথা উঠতেই যে মনে পড়া উচিত ছিল। এ দুঃখ তাঁর রাখবার জায়গা নেই।

যে কথাটা ভাবতে চান না, সেই কথাটাই বারবার মনে আসে। যত দুশ্চিন্তাটা মন থেকে দূর করে ফেলতে চান, ততই যেন উদ্‌বেগ বাড়ে। বয়স হয়ে এই হয়েছে মনের অবস্থা! বোঝেন, কিন্তু আবার না করেও পারেন না। একটা উদ্‌বেগ যায় তো আর একটা এসে তার জায়গা নেয়। কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা ছিল যে অপর পক্ষ আবার হাকিমকে ঘুষ খাইয়ে মানহানির মোকদ্দমার রায় পাল্‌টে না দেয়। সেই দুশ্চিন্তার জায়গা নিয়েছে এখন স্ত্রীপুত্রের সৃষ্টি করা অমঙ্গলের অবশ্যম্ভাবিতা। ছেলেরা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করে তাঁকে; কিন্তু এর সবগুলোই কি অকারণ উৎকণ্ঠা? রক্তের গরমে ওরা অনেক জিনিস উড়িয়ে দেয় তুড়ি মেরে। কিন্তু বাহাত্তর বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা তো তাদের নেই। সে কথাটাও ওরা স্বীকার করবে কিনা কে জানে। আরে তোরা বুঝবি কী; এইসব ছোট ছোট জিনিসগুলোর উপর নজর চিরকাল ছিল বলেই তোদের জন্য এতসব টাকাকড়ি সম্পত্তি রেখে যেতে পারব। তোদেরই জন্য এত সব; আর একবার মনেও পড়ল না আমার কথাটা।...

বড় ছেলে বাড়িতে বলে গিয়েছে যে সে রাত ন'টায় ফিরবে ওষুধ নিয়ে। নরেন ডাক্তারের সঙ্গে কোথায় যেন একটা কাজে গিয়েছে। কাজ মানে ইনসিওরের দালালি। সৃষ্টিধর একবার তাঁকেও ঘুরিয়ে বলেছিল লাইফ ইনসিওর করতে। বেশি বয়সেও নাকি ইনসিওর করা যায়। তিনি কানে তোলেননি কথাটা। তার ধারণা ইনসিওর-করা লোক বেশিদিন বাঁচে না। সৃষ্টিধরের মা কিন্তু তখন তাঁকে লাইফ ইনসিওর করতে বারণ করেছিলেন। সেই মানুষের আজ স্বামীর অস্তিত্বের কথাটা মনেই পড়ল না!...এই সেদিনও সৃষ্টিধরের মা সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেছেন; এক গুরুর কাছে থেকে দুইজনে একসঙ্গে দীক্ষা নিয়েছেন; একসঙ্গে তীর্থভ্রমণ করে এসেছেন কিছুদিন আগেও; প্রয়াগসংগমে স্নান করবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের কথায় দুজনের আঁচল একসঙ্গে বেঁধে তারা একসময়ে ডুব দিয়েছিলেন। এ সবই কি লোক দেখানো?

শ্রীদামবাবু ঘড়ি দেখলেন। নটা বাজবার এখনও অনেক দেরি আছে।

...বাড়ির কর্তার দিকটাই তো সবচেয়ে আগে মনে পড়া উচিত বাড়ির লোকের। এ বাড়ির লোকের ওঠা-বসা, কাজ বিশ্রাম সব নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর সুবিধা-অসুবিধার উপর লক্ষ্য রেখে। তিনি যেমন ইচ্ছা চলেছেন; অন্য সকলে অতি সন্তর্পণে তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। কোর্টে যাবার জন্য যত সকাল সকালই খান না কেন তিনি তাঁর প্রিয় পলতার বড়া এবং ছানার ডালনা একদিনও পাননি এ কথা মনে পড়ে না। তাকে ঘিরেই এ সংসারের সব-কিছু। তিনি শুনলে পাশের ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। ছেলেরা বড় হয়ে আজকাল তবু তাঁর সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা বলে; আগে তো সে সাহসও ছিল না। তাঁর ছোট ছেলেটা যখন পাঁচ-ছয় বছরের তখন তিনি বাড়ি ঢুকলেই সে ভয়ে খাটের তলায়

লুকিয়ে বসে থাকত। ঘরের দেওয়ালে সম্মুখে টাঙানো রয়েছে ছোট ছেলের বিয়ের সময়ের তোলা একখানা গ্রুপ ফটো। মাঝখানে বসে রয়েছেন তিনি। ছেলে, মেয়ে, বউ, নাতি, নাতনী—চার সারিতে অতি কষ্টে এঁটেছে ফটোর কাগজে। তাঁকে কেন্দ্র করেই সব···'এক ছেলে ছেলে নয়, এক টাকা টাকা নয়।' তাই তাঁর অনেক সন্তান, অনেক টাকা। এতগুলো প্রাণীর কাছ থেকে তাঁর অবাধ ক্ষমতার স্বীকৃতি পাওয়া, বাড়ির কর্তার এইটুকুই তো তৃপ্তি। তাঁর ধারণা ছিল এরা তাঁকে ভালওবাসে। সবই কি ভুল? সবই কি ফাঁকি? তাঁর দিকটা একবার ভাবলও না এরা!

এরা মানে সৃষ্টিধরের মা।

···নিজের স্বার্থ নিয়েই উন্মত্ত! এগারটি সন্তানের জননী। সংসারের লক্ষ্মী বলেই তাঁকে জানতেন। সেকেলে মানুষ শ্রীরামবাবু। ভাবতেন স্ত্রীভাগ্যেই তাঁর এত ধন জন বিষয়সম্পত্তি! এই পঞ্চান্ন বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে যা-কিছু পেয়েছেন, সবটুকুকে মিথ্যা ছলাকলা বলে ভাবতে বাধে। সেইজন্যই স্ত্রীর তাঁর কথা মনে না পড়াটা তাঁকে ব্যথা দিচ্ছে আরও বেশি করে। ব্যারিস্টারসাহেবকে 'আর্গুমেণ্ট' দিয়ে কাবু করবার উল্লাসে বিকালের আহারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। অম্বলে বুক জ্বালা করছে। দুশ্চিন্তা বাড়লে তাঁর অম্বলও বাড়ে। একটু জল খেলে হয়। কিন্তু তিনি চান না এ বাড়ির কাউকে ডেকে এখন জল আনতে বলতে। কোনো নাতনী হয়তো জল নিয়ে আসবে; এসে দাদুর সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে বকবে কতক্ষণ কে জানে। সে সময় আর সে মনের অবস্থা এখন তাঁর নেই।···ন'টা এখনও বাজেনি। এখনও সময় আছে—স্ত্রীর মনে পড়বার সময়, আর নিজের ভেবে দেখবার সময়।···স্ত্রীকে মুখ ফুটে বলে মনে করিয়ে দিতে হবে স্বামীর অস্তিত্বের কথাটা? কেশে আমি বেঁচে আছি এই কথাটা জানিয়ে দেওয়ার মতোই হাস্যাস্পদ! অমঙ্গলে বলে ছোট করায়, যে লোকটা ব্যারিস্টারসাহেবের সঙ্গে মোকদ্দমা লড়তে পারে, নিজের অমঙ্গলের আশংকায় সে স্ত্রীর কাছে ছোট হতে পারে না। মরে গেলেও না! সৃষ্টিধরের মা'র চোখে তিনি খেলো হতে চান না।···আচ্ছা, হাসিঠাট্টার ছলে কথাটা সৃষ্টিধরের মাকে বলে দিলে কেমন হয়? একটু ঘুরিয়ে বলা। 'ওগো—মাছে আঁশটে গন্ধ লাগতে আরম্ভ করেছে বুঝি আজকাল'—বা ওই গোছের কোনো কথা? ওতেও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। স্ত্রীর অধিকার আছে নিজের অসুখ সারাবার চেষ্টা করবার; ছেলের অধিকার আছে নিজের মায়ের জন্য ওষুধ কিনে আনবার; তাদের অধিকার আছে তাঁর অস্তিত্ব ভুলে যাবার; তিনি তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চান না কোনো কথা বলে। আদালতের কড়া জজসাহেবের মতো পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে তিনি আচরণের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে চান। হয়তো হয়ে ওঠে না সবসময়, কিন্তু সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনেও আইন সঙ্গত অধিকার ও দায়িত্বের পরিমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপে মেপে চলতে চান।

··সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে যাওয়াই তো চিরকাল মেয়েদের কাম্য বলে জানতেন। সৃষ্টিধরের মা'রও আজকালকার মেয়েদের মেমসাহেবী হাওয়া লাগল নাকি? আইন তো হয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদ করে নিলেই তো পারে যদি তার মন চায়!···মানহানির মোকদ্দমায় বড়লোকের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে

বড় ভাবছিলেন তিনি খানিক আগে। কতটুকু মূল্য তার! থেঁতলে চটকে পা মাড়িয়ে চলে যাওয়ার চাইতেও অপমানজনক হচ্ছে চোখের সম্মুখে থেকেও নজরে না পড়া! নিজের কাছে নিজের লজ্জা করে!···কে জানে, হয়তো তাঁর কপালে লেখা আছে যে, তাঁর স্ত্রীই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবেন। সে কথা ভাবলেও ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! কপালের লেখা জিনিসটা কী ধরণের তা ঠিক জানা নেই। আইনের ধারাগুলো যেমনভাবে লেখা হয়, সেই রকমই নাকি? আইনের ধারার মতো কপালের লেখার মধ্যেও ফাঁক ও ফাঁকি খোঁজা চলে নাকি? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করলেও কি কপালের লেখাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না? যাকগে! লোকে শুনলে পাগল ভাববে। এইসব মনের কথা যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায় তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না। এসব চিন্তার কি কোনো মাথামুণ্ডু আছে!·· তবে এ কথা তিনি বলবেন যে, কপালের লেখা খণ্ডানো শক্ত বলে কি তাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনতে হবে? ···মেটে সিঁদুর আবার একটা ওষুধ নাকি! যত ভাবেন, তত মাথা গরম হয়ে ওঠে।—রগের কাছটায় দব্‌দব্‌ করছে। অম্বল হলেই তাঁর এইরকম মাথা দব্‌দব্‌ করে আর বুকের কাছে ব্যথা-ব্যথা করে। দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। ছেলের ফেরবার সময় হল। এখনও ভেবে কিছু কুল-কিনারা পাননি। বড় গরম লাগছে। ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। জিভ গলা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা আনচান ভাব হচ্ছে। ওই! নিচে মোটরগাড়ির শব্দ! শ্রীদামবাবু উঠে একবার বাথরুমের দিকে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সৃষ্টিধরই প্রথম জানতে পারল। তারপরে তো হৈ হৈ পড়ে গেল বাড়িতে। কান্নাকাটি, ডাক্তার, বদ্যি, নার্স, অক্সিজেন আরও কত কী! বড় ভয়ানক রোগ! চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ভাগ্য ভাল যে, ডাক্তার ডাকবার সময় পাওয়া গেল। সেই যে মেঝের উপর এনে শোয়ানো হয়েছিল, তিনদিন সেই একই অবস্থায়। নরেন ডাক্তার বলেছিল নড়াচড়া বারণ।

তারপর আস্তে আস্তে কথা বলবার ক্ষমতা এল, ভাববার শক্তি এল, মনে বল এল। এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে বাড়ির লোকে। সৃষ্টিধরের মা মানতের পুজো দিলেন বুড়োশিবতলায়। ওই বেঁচেই গেলেন; নরেন ডাক্তার বলেছে, এখনও তিন মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, তারপর যতদিন বাঁচবেন, বেশ সাবধানে থাকতে হবে; তেল-ঘি খাওয়া বারণ—যতকাল বাঁচবেন মাখনতোলা দুধ খেতে হবে। কোর্টে যাওয়া আর চলবে না।

ভাববার ক্ষমতা ফিরে পাবার দিন থেকেই শ্রীদামবাবু কত কী ভাবছেন। এ-যাত্রা নিস্তার পেলেন ভেবে আনন্দ আছে; কিন্তু এর চেয়ে বেশি তৃপ্তি যে তাঁর সন্দেহ অমূলক ছিল না। ধরেছিলেন ঠিকই। এসব জিনিসকে বাহাত্তুরে বুড়োর খামখেয়ালী বলে উড়িয়ে দিলেই তো হল না! জন্তু-জানোয়াররা পর্যন্ত বিপদের গন্ধ টের পায়! চিরাচরিত আচার-ব্যবহারগুলো আইনের ধারার মতো জিনিস। মেনে চলতে হবে। সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে তার মানে করতে হবে! লোকাচার যেখানে বলছে—এই করতে হবে, সেখানে তা না করলে কী হবে, সে কথাটা বোঝবার জন্য বি এ, এম এ, পাস করার দরকার নেই। ওসব

আচারের পান থেকে চুন খসলে কী হয়, সেটা খেয়াল হওয়া উচিত ছিল একজন সাতষট্টি বছর বয়সের সধবা স্ত্রীলোকের! হয়তো খেয়াল হয়েছিল ঠিকই। জেনেশুনে যদি সৃষ্টিধরের মা এই কাজ করে থাকেন, তাহলে সে কথার কোনো জবাব নেই। মা-ছেলেতে মিলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে যদি এই কাজ করে থাকে তাহলে তাদের কিছু বলবার নেই···সৃষ্টিধরের মায়ের এই কাণ্ড! বহু নিমকহারাম তিনি সারাজীবন ধরে দেখছেন। বিপদের সময় এসে টাকা ধার নেয়; তারপর তামাতুলসী হাতে নিয়ে হাকিমের সম্মুখে গিয়ে বলে যে, তারা টাকা ধার নেয়নি। এই তো লোকের ধারা! কিন্তু তাঁর স্ত্রী-পুত্রের মতো অকৃতজ্ঞ লোকের কথা তিনি এর আগে কল্পনা করতে পারেননি। বিশ্বাস তিনি কোনোদিনই কাউকে করেন না। টিপসই না নিয়ে তাঁর অতি বড় বন্ধুকেও টাকা ধার দেননি। তবু এতটা আশা করেননি নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে। যাদের তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন তাদের কাছ থেকে।

মেয়েমানুষেরা সব বুজরুক! সুবিধা পেলেই নিজমূর্তি প্রকাশ করে। ভেবে ভেবে তিনি দেখেছেন স্ত্রীর স্বভাবের পরিবর্তনের দিকটা। অল্প বয়সে স্বামীর ভয়ে জুজু হয়ে থাকত। সেকালকার কথা সব মনে আছে। বড় করে কথা বলবার সাহস ছিল না স্বামীর সম্মুখে। ছেলেরা বড় হবার পর থেকেই তিনি প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন সৃষ্টিধরের মায়ের। বাপ যতই করুক ছেলেদের জন্য, তারা সবসময় মায়ের দিকে। মায়েরা সেটা বেশ বোঝে। তাই যত ছেলেরা বড় হয়, তত তাদের বুকের পাটা বাড়ে। শেষে স্বামীকে 'ডোণ্টকেয়ার'। ছেলেরা বড় হবার পর থেকে সত্যিই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটু ভেবেচিন্তে কথা বলেন। কিন্তু এতটা! ঘেন্না ধরে গিয়েছে তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলের উপর! সবাই মিলে পরামর্শ করে এই কাণ্ড করেছে। ওই নরেন ডাক্তারটাও এর মধ্যে আছে। ডাক্তার না ছাই! ইনসিওরের ডাক্তার আবার ডাক্তার নাকি! তার আবার ওষুধ, তার আবার চিকিৎসা! মা-ছেলেতে পরামর্শ করে তাঁর কাঁধেও চাপিয়েছে নরেন ডাক্তারকে। কথা বলাও নাকি তাঁর পক্ষে খারাপ। তাই একটা কলিং বেল রাখা হয়েছিল তার কথামতো তাঁর বালিশের কাছে। কোনো দরকার পড়লে ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাকতে হবে? কেন বাড়ির লোকজন কেউ-না-কেউ চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতে পারে না রোগীর পাশে? আর যেখানে বাড়ির কর্তা নিজে রুগী! টান মেরে ছুঁড়ে তিনি ফেলে দিয়েছেন কলিং বেলটাকে সেইদিনই। ভাবে কি বাড়ির লোকে তাঁকে! যতটা বেকুফ ভাবে, ততটা বেকুফ তিনি নন! সৃষ্টিধরের মা ছুটে এসেছিলেন কলিংবেল মেঝেতে পড়বার শব্দটা শুনে।

'কিছু বলছ? কিছু এনে দেব?'

স্ত্রী আসতেই কেমন যেন শক্ত আড়ষ্ট গোছের হয়ে গিয়েছিল শ্রীদামবাবুর সর্বশরীর। কোনো উত্তর দেননি তিনি। অন্য দিকে তাকিয়েছিলেন। স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে, বালিশের পাশে এসে বসেছিলেন; তিনি জানেন রোগভোগ হলে ছেলেমানুষী রাগ বাড়ে সব মানুষেরই। সেইদিন থেকেই শ্রীদামবাবু লক্ষ্য করলেন যে সৃষ্টিধরের মা কাছে এসে বসলেই তাঁর শরীরে আড়ষ্টতা আসে। আগেকার সেই সহজ ভাবটা আর কিছুতেই আনতে পারেন না। তাঁর মৃত্যুর আশংকটা যে অমূলক ছিল না, সে কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে হাতে-নাতে;

মৃত্যুর পূর্বস্বাদ তিনি পেয়ে গিয়েছেন ; ঠিক যখন সৃষ্টিধরের মা সিঁথির সিঁদুর মুছে ছেলের আনা মেটে সিঁদুর সিঁথিতে দিয়েছেন, তখনই 'করোনারি' রোগটা তাঁকে চেপে ধরে ; এ সম্বন্ধে তাঁর আর কোনো সন্দেহ নেই। যতই চেষ্টা করুন সেই স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ব্যবহারে খানিকটা আড়ষ্টতা আসতে বাধ্য। আর এ-রকম স্ত্রীপুত্রকে খাতির করে চলবার কোনো কারণও থাকতে পারে না ! তাঁর অসুখ ও সৃষ্টিধরের মায়ের আসল-সিঁদুর মোছার মধ্যে সম্পর্কটা সবচেয়ে নির্বুদ্ধি লোকেরও নজরে পড়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি জেগে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে আর ডেকে তুলবে কী করে ! ওরা সব জানে ! সব বোঝে ! বুঝে না বোঝবার ভান দেখায় ! রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে তাঁর।

শ্রীদামবাবু সবসময় চেষ্টা করেন যাতে তাঁর মনের রাগ কথাবার্তায় প্রকাশ না পায়। ফলে অধিকাংশ সময়েই তিনি চুপ করে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকেন। স্ত্রীপুত্রেরা তাঁর এই গাম্ভীর্যকে শারীরিক দুর্বলতা ও বর্তমান রোগের একটা লক্ষণ বলে ভাবে। রুগীর মন ভাল রাখবার জন্য তারা সবসময় অনর্গল গল্প করে যান। নরেন ডাক্তারের সঙ্গে যাতে তিনি কোনোরকম অসদ্-ব্যবহার না করেন, সেই ভেবে সৃষ্টিধর আর সৃষ্টিধরের মা অনেক সময়ই 'অ্যালার্জি' রোগের গল্প এবং নরেন ডাক্তারের অদ্ভুত চিকিৎসার কথা তোলেন। বিচিত্র মতিগতি এ রোগের ! ওষুধও না বিষুধও না ! লাল সিঁদুর মুছে মেটে সিঁদুর দিলাম সিঁথিতে—আর তাতেই সেরে গেল এতকালকার রোগ। এখন মনে হয় কেন পুষে রেখেছিলাম এ রোগ ? এত সোজা যার চিকিৎসা ! শোনেন, আর মাথা থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত রিরি করে ওঠে। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, কিন্তু কান তো বন্ধ করে রাখা যায় না ইচ্ছা করলেও। শুনতেই হয় বাধ্য হয়ে। কেবল নিজের রোগের কথা ! কই, স্বামীর যে ভয়ানক রোগটাকে নিয়ে যমে-মানুষে লড়াই চলল এ কয়দিন, সে কথা তো ভুলেও বলে না !···

মন খারাপ হতে পারে ভেবে স্ত্রীপুত্রেরা তাঁর রোগের কথাটা তোলে না, এ কথা তাঁর খেয়াল হয় না। কেবলই মনে হয় যে স্ত্রীপুত্র যখন শুধু নিজের দিকটা দেখতে পেরেছে, তখন তাঁরও নিজের দিকটা দেখতে পারবার অধিকার আছে। পালটা জবাব তিনিই বা দেবেন না কেন ! যেতে দাও না আর কয়েকটা দিন।···মনে মনে তিনি একটা দিন ঠিক করে নিয়েছেন। যেদিন তাঁর রোগের দুই সপ্তাহ পুরবে, সেই দিনই তিনি নিজ মূর্তি প্রকাশ করবেন এদের কাছে।···কুকুর বিড়ালের মতো ব্যবহার করেছে এরা তাঁর সঙ্গে ! ভাবছে যে 'ফিডিং বটল' এ করে জলো মাখন তোলা দুধ খাওয়াচ্ছে রুগীকে—আর তাতেই ভবী ভুলবে ! ভুলে গিয়েছে যে কুকুরে ফিরে কামড়াতেও জানে। করতে তো তিনি পারেন কত কিছু, নিজের অধিকারের মধ্যে থেকেও। নিজের রক্ত-জল-করা পয়সা—বাপের কাছ থেকে পাওয়া এক পয়সাও নয়—এগুলোকে তিনি যথেচ্ছ দান করে দিয়ে যেতে পারেন—কারও কিছু বলবার নেই। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোর্টে নালিশ করতে পারেন। আবার বিয়ে পর্যন্ত করতে পারেন, এই বুড়ো বয়সেও। কিন্তু অতদূর তিনি যেতে চান না ! অন্যের চোখে ছোট হতে হয় এমন কাজ তিনি করতে চান না—অধিকার থাকলেও। এরা তাঁর কাছে ন্যায় বিচারই পাবে।

নিক্তিতে ওজন করে তিনি ন্যায়বিচার করবেন স্বার্থপর, নাচুনে, হুজুগে-মাতা, নিমকহারাম স্ত্রী-পুত্রদের উপর! তিনি যার উপর যতই বিরক্ত থাকুন, তার জন্য কাউকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না। অত নীচ তাঁর মন নয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ওরাও যেন ভাববার অবকাশ না পায় যে ওদের উপর অবিচার করা হয়েছে। হিসাব করে হাতে-কলমে ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে ওরা প্রত্যেকে তার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছে। বিষয়টা অতি সরল। 'অ্যাকাউন্ট সুট'-এর মতো শুধু হিসাব-নিকাশের ব্যাপার!...

পনের দিনের দিন সকালবেলায় উঠেই তিনি বাড়ির চাকরকে ডাকলেন চিৎকার করে। স্ত্রী জপে বসেছিলেন। উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী? কেন?'

চাকরটাও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীদামবাবু তাকে বললেন, দেওয়ালের খান কয়েক ছবি নামিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে। সাবিত্রী-সত্যবানের ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো সোনার জলে লেখা 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্মঃ' শ্লোকটা, আর গ্রুপ ফটোখানা তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। স্ত্রী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, ছেলেমেয়েরা দোরগোড়া থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রুগীর আবদার রাখতে সকলে উদ্‌গ্রীব! যাতে তাঁর মন ভাল থাকে! তাই তিনি করুন। নরেন ডাক্তার বলে দিয়েছে, এমন কিছু যেন করা না হয়, যাতে রুগীর উদ্‌বেগ দুশ্চিন্তা বাড়ে।

এইবার তিনি ছাতের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একবার যেন কম্পাউণ্ডারবাবুকে খবর দেওয়া হয়। আর নরেনবাবুকে যেন বারণ করে দেওয়া হয় আমাকে দেখবার জন্য আসতে।'

গলার স্বরে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা এনে বলা। বুঝিয়ে দিলেন যে এখন থেকে রাশ নিজের হাতে নিলেন! যতই রুগ্ন ভাবুক এরা তাঁকে, নিজের দায়িত্ব নিজের হাতে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে এখনও। নিজের বাড়িতে নিজের মতো থাকবার অধিকারে কারও হস্তক্ষেপ তিনি আর বরদাস্ত করবেন না।

ইচ্ছা করে অতিরিক্ত খাতির দেখিয়ে, নরেন না বলে নরেনবাবু বলেছেন তিনি। কথার সুর এবং চাউনির ভঙ্গি সৃষ্টিধরের মা'র কাছে একটু দুর্বোধ্য ঠেকল। ছেলের সঙ্গে তিনি গিয়ে পরামর্শ করলেন। নরেন ডাক্তারকে তখনই সব কথা বুঝিয়ে বলা হল। সে ঘরের ছেলের মতো; তার কাছে বাড়ির কথা বলতে কোনো সংকোচ নেই। ঠিক হল সে নিয়মিত আসবে শ্রীদামবাবুর বাড়ি, কিন্তু রুগীর ঘরে ঢুকবে না। রুগীর মন খুশী রাখবার জন্য কম্পাউণ্ডারবাবুই দেখুন। দরকার বুঝলে এবং কম্পাউণ্ডারবাবু তার কথা শুনলে, সে বাইরে থেকে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে দেবে। সে সৃষ্টিধরের মাকে বলে দিল এখন থেকে রুগীকে একটু চোখে চোখে রাখতে।

এইবার শ্রীদামবাবু এক নাতির নাম ধরে ডাকলেন। সৃষ্টিধর গিয়ে দাঁড়াল কাছে।

'বাবা, কিছু বলছেন?'

অন্যদিকে তাকিয়ে শ্রীদামবাবু বললেন, 'নিচের ঘরের আলমারি থেকে পুরনো হিসাবের খাতাগুলো নিয়ে আসা দরকার একবার।'

'এখন কিছুদিন যেতে দিন না ওসব জিনিস! আগে ভাল করে সুস্থ হয়ে নিন। তারপর ওসব আবার করবেন।'

'যার আনবার ইচ্ছা নেই তাকে তো আমি ডাকিনি।'

'কোন্ কোন্ বছরের আনব?'

'যতগুলো আছে সবগুলো। আর একটা পেনসিল।'

মা-ছেলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। এইসব করে আবার অসুখ বাড়িয়ে না ফেলেন বাড়ির কর্তা।

একরাশ খাতাপত্র এল নিচে থেকে।—চাকরের কাঁধে করে উপরে আনিয়েছে সৃষ্টিধর! নিজে আনতে বাধে! বাপের পয়সায় ফুটানি। ধুলো আর মাকড়সার জাল ঝেড়ে আনতে হয় সে কথাটাও কি এদের বলে দিতে হবে!—

সৃষ্টিধর হাসিমুখে একটা সুখবর দিল বাবাকে। মানহানির মোকদ্দমায় তিনি জিতেছেন; হাকিমের রায় বেরিয়েছে; ব্যারিস্টারসাহেবের এক টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে; অর্থদণ্ডের পরিমাণটার কোনো গুরুত্ব নেই; আসল প্রশ্ন হারজিতের।

হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না শ্রীদামবাবু। মানহানির মোকদ্দমার ফলাফলের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

তিনি ভাবছেন যে ছেলে খোশামোদ করে তাঁর মন গলাতে চায়। পুরনো হিসাবের খাতাগুলো আনাতে দেখে একটা কিছু সন্দেহ করে থাকবে। যাক! করে থাকলে করেছে! আপনার লোক সব! আত্মীয়-স্বজন না ছাই! 'কলিং-বেল' দেখাতে এসেছিল আমাকে আমারই পয়সায়! ঘণ্টা বাজিয়ে মন্ত্র পড়ে পুজো করতে হবে, তবে এঁদের আবির্ভাব হবে!—তাঁকে যদি মাখনতোলা দুধ খেয়ে থাকতে হয় সারাজীবন!—গম্ভীরভাবে তিনি কাগজ পেনসিল হিসাবের খাতা বালিশের উপর নিয়ে, চোখে চশমা এঁটে বসলেন। তাঁর প্রতিদিনকার আয়ব্যয়ের হিসাব লেখা আছে এইসব খাতাগুলোতে। সেই হিসাবগুলো থেকে বেছে বেছে কী যেন সব টুকে রাখছেন কাগজে।

কম্পাউন্ডারবাবু আসায় বাধা পড়ল। ইনি নরেন ডাক্তারের কম্পাউন্ডার নয়। এক সময় কোথায় যেন কম্পাউন্ডারি করতেন; এখন স্বাধীন হাতুড়ে ডাক্তার। এসেই প্রথমে জেনে নিলেন, রুগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন কিনা।—যদি সুস্থ বোধ করেন, আর হজম যদি হয়, তবে যা ইচ্ছা খেতে পারেন। কী খেতে ইচ্ছা করছে? লুচি?—

নিজে সম্মুখে বসে, লুচি বেগুনভাজা খাইয়ে তবে তিনি গেলেন। তাঁর এ ব্যবস্থা সৃষ্টিধরের মায়েরও মনঃপুত। কম্পাউন্ডারবাবু চলে যাবার সময় রুগী তাঁকে বলে দিলেন উকিলবাবুকে একটা খবর দিয়ে দিতে। বিকালের দিকে আসবার জন্য। উইল লেখাতে হবে তাঁকে দিয়ে। বাড়ির লোকদের দিয়ে উকিলবাবুকে ডাকতে ভরসা পান না তিনি। আসবার আগে উকিলবাবু যেন আইনের ধারাগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

'উইল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। উইল। অত চোখ বড় বড় করছেন কেন উইল শুনে? কাজটা করতে না পারেন তো বলুন পরিষ্কার করে।'

'না না। আমি উকিলবাবুকে খবর দিতে যাচ্ছি এখনই।'

সেখান থেকে পালাতে পেরে বাঁচলেন কম্পাউন্ডারবাবু।

সৃষ্টিধরের মা নিজে হাতে রেঁধে সেদিন পলতার বড়া, লুচি, আর ছানার

ডালনা স্বামীকে খাওয়ালেন। কর্তা খেলেন; খেতে ভালও লাগল; কিন্তু ভাব দেখালেন যেন শুধু কর্তব্যের খাতিরে খাচ্ছেন। খাওয়াদাওয়ার পর অন্যদিন একটু ঘুমোন। আজ সে ফুরসত নেই। সারাদিন চলল ওই হিসাবপত্র লেখাপড়ার কাজ।

একটাও কথা বলেননি। এক শুধু তিনটে-চারটের সময় একবার চাকরকে ডেকেছিলেন, সৃষ্টিধর সেই ঘরে বসে থাকা সত্ত্বেও। চাকরকে হুকুম দিয়েছিলেন ঘরের মধ্যে একখানা টেবিল ও একখানা চেয়ার এনে রাখতে। বাড়ির লোকে বেশ উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছিল তাঁর রকমসকম দেখে। রুগীর সব খবর খুঁটিয়ে বলবার জন্য সৃষ্টিধর নরেন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। সৃষ্টিধরের মা গিয়ে বসেছিলেন বালিশের পাশে পাখা হাতে নিয়ে। অমনি রুগীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি শুলেন না। আড়ষ্ট হয়ে, পেন্সিল হাতে নিয়ে বসে থাকলেন অন্য দিকে তাকিয়ে। মরে গেলেও তিনি স্ত্রীর দিকে তাকাবেন না, এই তাঁর সংকল্প।

'দাদু। উকিলবাবু এসেছেন।'

ছোট নাতি দোরগোড়া থেকে সংবাদ দিল। নিজের অজ্ঞাতে সৃষ্টিধরের মা মাথার কাপড় টেনে দিলেন, খাট থেকে ধড়মড় করে নামবার আগে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হঠাৎ নজরে পড়ে গেল শ্রীদামবাবুর। কিসের মতো যেন রঙ সিঁথির সিঁদুরটার? ঠিক মনে পড়ছে না। পচা মাংসের মতো কিংবা বুড়ো শকুনের ঘাড়ের ঝুঁটিটার মতো। দেখলে গা ঘিনঘিন করে। শিউরেও ওঠে সর্বশরীর। মুহূর্তের জন্য বুকের ভিতরটা অবশের মতো হয়ে যায়। বালিশে হেলান দিয়ে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন যাতে সৃষ্টিধরের মা বুঝতে পারেন যে স্বামী ইচ্ছা করে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

'উকিলবাবু! এই রোগভোগের মধ্যে আবার উকিলবাবুকে দিয়ে কী হবে? না না, বারণ করে দিগে যা! যা বলবার সৃষ্টিধরকে তুমি ভাল করে বুঝিয়ে দাও! কাছারির মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে যদি কিছু বলবার থাকে তো সে কথাও ছেলেদের কাউকে বলো না কেন!'

অধিকার ফলাতে এসেছে সৃষ্টিধরের মা! স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেবিলের উপর কাগজ-কলম সব ঠিক আছে তো? আর একখানা বড় দেখে বইটই গোছের কিছু রাখতে বলেছিলাম না? আছে সব ঠিক? তাহলে এবার উকিলবাবুকে আসতে বলে দাও।'

সৃষ্টিধরের মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। উকিলবাবুর সঙ্গে নিচে নরেন ডাক্তারের দেখা হয়েছে। তিনি বলে দিয়েছেন রুগীকে যেন বেশি কথা বলানো না হয়। 'এই যে!'

'নমস্কার! মোকদ্দমাটাতে তো আমাদের জিত হয়েছে!'

নাতির সঙ্গে উকিলবাবু ঢুকেছেন ঘরে। এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, সে কথা বোঝবার বয়স এখনও ছেলেটির হয়নি। কিংবা হয়তো বাড়ির লোকেরা তাকে এখানে থাকতে বলেছে, যদি ফাইফরমাশের জন্য দরকার হয় সে কথা ভেবে।

শ্রীদামবাবু নাতিকে চলে যেতে বললেন ঘর থেকে। 'উকিলবাবু দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসুন। কম্পাউন্ডারবাবু নিশ্চয়ই সব কথা বলেছেন আপনাকে। আমি উইল করতে চাই।'

প্রথমেই কাজের কথা পেড়েছেন ; মোকদ্দমায় হার-জিত নিয়ে বাজে কথা বলবার সময় নেই তাঁর এখন ! উকিলবাবু বুঝে গিয়েছেন তাঁর মনের ভাব। কর্মতৎপরতা দেখাবার জন্য কাগজে খসখস করে উইল লিখবার বাঁধা গৎ এক লাইন লিখলেন।

'ও কী লিখলেন, আমি না বলতেই ?'

'লিখলাম, ইহাই আমার শেষ উইল।'

বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পেল বৃদ্ধের চোখমুখে।

'না। আপনি একটা একেবারে—এখন তো একটা মোটামুটি খসড়া লিখতে হবে শুধু। টাইপ করতে হবে, দু'জন সাক্ষীর দরকার হবে, রেজিস্টারসাহেবকে আসবার জন্য খবর দিতে হবে—সেসব এখন শুধু নোট করে দিন মোটামুটি। আমি পয়েণ্ট দিচ্ছি। দশ টাকা দেব আপনাকে, বুঝলেন ? লিখুন। আমার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সৃষ্টিধরের বয়স সর্বাপেক্ষা অধিক। সেইজন্য সে সর্বাপেক্ষা বেশিদিন আমার অন্ন ধ্বংস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। হ্যাঁ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যবহারে কথাটাও লিখে দেবেন। তাহার বয়স আজ সাতচল্লিশ বৎসর সাত মাস পাঁচ দিন। উকিলবাবু, পরে এই দিনটা ঠিক করে বসিয়ে নেবেন। ইহার ভিতর বিশ বৎসর পিতা হিসাবে আমি তাহাকে লালনপালন করিতে বাধ্য। উকিলবাবু, এটাকে বিশেষ জায়গায় বাইশ বছর করে দেওয়া যাক—কী বলেন ? অন্যায় অবিচার আমি কারও উপর করতে চাই না, বুঝলেন। সৃষ্টিধরের যা প্রাপ্য, তার থেকে এই পঁচিশ বছর পাঁচ মাস সাত দিনের খাইখরচা বাবদ পনর হাজার টাকা বাদ যাবে। ওর বিবাহ হয়েছে চব্বিশ বছর হল। স্ত্রীর খাইখরচ বাবদ চৌদ্দ হাজার চারশ টাকা। ওদের বড় ছেলের কলেজে পড়া ও খাইখরচ বাবদ চৌদ্দ হাজার টাকা। ওদের বড় মেয়ের খাইখরচ ও বিবাহাদি বাবদ পঁচিশ হাজার টাকা। ওদের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের খরচ বাবদ সাতাশ হাজার টাকা। বউমার ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ামে চিকিৎসা বাবদ ছয় হাজার টাকা। সব মিলিয়ে হল এক লক্ষ এক হাজার ছয়শ টাকা। এই টাকাটা ওর প্রাপ্য টাকা থেকে বাদ দিতে হবে। আর আমারও কিছু দেনা আছে সৃষ্টিধরের কাছে। এই মাসে ওর মায়ের চিকিৎসার জন্য নরেন ডাক্তারের ফি বারো টাকা। নরেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওর মায়ের মেটে-সিঁদুরের দরুন ছয় আনা। কোর্টে জবর আসায় আমাকে একদিন ও ওর ইন্সিওর কোম্পানির দেওয়া গাড়িতে বাড়ি নিয়ে এসেছিল—তার দরুন গাড়িভাড়া দুই টাকা। মোট এই চৌদ্দ টাকা ছয় আনা আমার দেনা ওর কাছে। এটা যেন ওকে দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এ তো হল। এইবার আমার স্ত্রীরটা লিখে নিন। মাসে ষাট টাকা করে পান এইরকম একটা অ্যানুইটির ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয় তাঁর জন্য। এতেই ওঁর চলে যাওয়া উচিত, কী বলেন ? আচ্ছা না-হয় মেটে-সিঁদুর বাবদ ছয় আনা করে আরও বেশি লিখে রাখুন। ষাট টাকা ছয় আনা করে উনি মাসোহারা পাবেন।'

এতক্ষণে উকিলবাবু কথা বলেন, 'ওঁর তখন তো সিঁদুর লাগবে না।'

চটে উঠেছেন শ্রীদামবাবু, 'আপনার উপদেশ আমি চাইনি। যা বলছি তাই লিখুন। আমি সিঁদুর বলিনি, মেটে-সিঁদুর বলেছি। সিঁদুর আর মেটে-সিঁদুর এক জিনিস নয়। মেটে-সিঁদুর ইচ্ছা করলে বিধবারাও ব্যবহার

করতে পারেন। বিধবা হবার চেষ্টাতেও সধবারা ব্যবহার করতে পারেন—নিজেদের স্বার্থ থাকলে! আসল সিঁদুর ব্যবহার করলে তো কোনো কথাই ছিল না।'

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন শ্রীদামবাবু কথাগুলো বলতে বলতে। বারান্দার জানালার পাশে খুট করে একটা শব্দ হল। উকিলবাবু তাকালেন সেদিকে। বোধ হয় বাড়ির লোকেরা আড়ি পেতে শুনছে।

'দেখুন উকিলবাবু, বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে এত সব কথা বলে। জলের গ্লাসটা দেবেন তো ওখান থেকে। ঘিয়ের জিনিস খেলেই বড় জলতেষ্টা পায়।'

'আচ্ছা থাক এখন তবে। অন্য সময় আসব আবার।'

'সেই ভাল। আচ্ছা, এই কাগজখানা রাখুন। আমার প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের আলাদা আলাদা হিসাব লেখা আছে এতে। আর উলটো পিঠে আমার সম্পত্তির তালিকা নোট করা আছে। বুঝেই তো গেলেন আমি কেমন ভাবে সম্পত্তি ভাগ্ করে দিতে চাই। কালকে এই অনুযায়ী একটা মোটামুটি খসড়া লিখে আনবেন আপনি। তারপর দেখা যাবে।'

দুমদুম করে দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হল। উকিলবাবু কাগজপত্র ফাইলে বেঁধে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। উঠে দরজা খুলে দিলেন।

সৃষ্টিধরের মা।

বাড়ির অন্য লোকেরা দরজা ধাক্কা দেওয়া থেকে তাঁকে বিরত করবার চেষ্টা করছিলেন। বাড়ির মেয়েদের দেখে উকিলবাবু একটু পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়ালেন। হেঁপো রুগীর ছিপছিপে গড়ন সৃষ্টিধরের মায়ের। ছুটে গিয়ে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন স্বামীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টগোছের হয়ে গেল শ্রীদামবাবুর সর্বশরীর।

'এ তুমি কী বলছ! ঘুণাক্ষরেও যদি টের পাই যে এতে তোমার আপত্তি, তাহলে কি আমি মেটে-সিঁদুর ব্যবহার করি।'

আড়িপাতার জন্য কোনোরকম সংকোচ নাই; উইলে কম টাকা পাবার জন্য অনুযোগ নাই, কেবল আছে মেটে-সিঁদুর ব্যবহার করবার জন্য অনুতাপ। এ জিনিস শ্রীদামবাবুর নজর এড়ায় না। কিন্তু এ অনুতাপ পর্যাপ্ত নয়। অনুতাপের কারণ বলছেন, স্বামীর আপত্তির কথা টের পাননি বলে। কিন্তু এ তো শুধু স্বামীর আপত্তির কথা নয়; স্বামীর মারাত্মক অমঙ্গলের আশংকা সত্ত্বেও স্বার্থত্যাগ না করবার জন্য অনুশোচনা হওয়া উচিত ছিল। তবু এতে মনের ক্ষোভ খানিকটা কমে; প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষাটা নরম হয়ে আসে। যেখানে আগে সাবিত্রী-সত্যবানের ছবিটা ছিল সেইখানটাতে তাকিয়ে রয়েছেন শ্রীদামবাবু। বাড়ির সকলেই এসে জুটেছে এই ঘরে; কিন্তু কারও সাহস নাই এর মধ্যে কোনো কথা বলবার। উকিলবাবু চলে যাবার সময় নিচের ঘরে নরেন ডাক্তারকে রুগীর আধুনিকতম সংবাদ দিয়ে গেলেন।

সৃষ্টিধরের মা অঝোরে কেঁদে চলেছেন, 'ওগো তুমি একবার বললে না কেন মুখ ফুটে। আমরা কতটুকু কী বুঝি! পোড়াকপাল, নইলে এই দুবুর্দ্ধি হয়।'

স্ত্রী কী বলছেন, সেটা সম্বন্ধে রুগীর ঔদাসীন্য ক্রমেই কমছে। শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা আস্তে আস্তে কাটছে। ক্ষোভের স্থান নিচ্ছে অভিমান।

'কী কুক্ষণে যে সেদিন নরেন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ! তুমি বলে দিতে যাবে কেন। আমার নিজেরই বোঝা উচিত ছিল। নরেনের কথা শুনে আমার নেচে ওঠা উচিত হয়নি। কপাল। আমি মুখ্যু মানুষ। ভুলে কী করে ফেলেছি। সে কথা কি মনে গিঁট দিয়ে রেখে দিতে হয় চিরকাল ?'

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না শ্রীদামবাবু।

'এ আমার মনে রাখবার বা ভুলে যাবার কথা নয়। এ হচ্ছে আমার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল ; তাতেও তোমাদের নজরে পড়ল না ? যখনই তুমি আসল সিঁদুর ছেড়ে নকল সিঁদুর দিলে সিঁথিতে, তখনই যে আমার হার্টের ব্যথাটা হয়েছিল, এ কথা আমি লাঠি মেরে তোমার গোবরভরা মাথায় ঢুকিয়ে দেব, তবে বুঝবে ?' এতক্ষণে তিনি তাঁর সংকল্প ভুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছেন। দুঃখে, ব্যথায়, অভিমানে বৃদ্ধের চোখে জল এসে গিয়েছে। মানসিক উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছেন। শ্বশুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করেন এক পুত্রবধূ। বড়ছেলে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন সৃষ্টিধরের মা। এত অপ্রস্তুত তিনি জীবনে কখনও হননি এর আগে।

—স্বামীর অমঙ্গলের জন্য দায়ী তিনি ? নিজের কপাল নিজের হাতে পোড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। এ-যাত্রা বুড়োশিব রক্ষা করেছেন ! তাঁর ভুল শোধরাবার জন্য সময় দিয়েছেন ! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল হল যে আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত না। প্রতি মুহূর্তের দাম আছে এখন !—'আমি এখনই এ সিঁদুর মুছে সিঁথিতে আসল সিঁদুর দিয়ে আসছি।'

ছুটে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধা ঘর থেকে। পিছনে পিছনে বড় বউমাও গেলেন বোধহয় শাশুড়ীকে সাহায্য করবার জন্য।

ঘটনার এই তীব্র গতিবেগ বোধ হয় শ্রীদামবাবুরও প্রত্যাশিত ছিল না। তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন দরজার দিকে ; অথচ বোঝা যাচ্ছে যে কিছু দেখছেন না। হঠাৎ একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ল সে চাউনিতে। তাঁরও খেয়াল হয়েছে একটা কথা ! এত রকমের কথা চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে ভাবেন, কিন্তু এ দিকটার কথা তিনি এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত ভাবেননি।—সংকট-মুহূর্ত এগিয়ে আসছে ! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি চোখের সম্মুখে। সাদা চুলের মধ্যে টাকপড়া সিঁথি !—বড় বউমা একখানা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সেই চরম মুহূর্তকে এগিয়ে আনছেন !—ঠিক যে মুহূর্তে মেটে-সিঁদুরের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গিয়ে সিঁথিটা একেবারে সাদা হয়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে !—সেই মুহূর্ত আর সিঁথিতে আসল সিঁদুর দেবার সময়ের মধ্যে যে ক্ষণিকের ব্যবধান সেইটেই তাঁর সংকট-মুহূর্তটার জন্য ওত পেতে রয়েছে ; আড়ালে শত্রু নিঃশব্দ সঞ্চারে অন্ধকারের মধ্যে সেইদিকে এগিয়ে চলেছে ! আর নিস্তার নাই ! ইচ্ছা হল চিৎকার করে ডেকে সৃষ্টিধরের মাকে এখনও একবার বারণ করেন। পারলেন না !—বুঝল না সৃষ্টিধরের মা যে এরকম একটা ব্যাপারে ভাববার জন্য একটু সময় পাওয়ার দরকার ছিল।—ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছেন তিনি। সর্বশরীরে আতঙ্কের সাড়া লেগেছে ! মেজ বউমা পাখা করছেন জোরে জোরে। তবু বড় গরম লাগছে !—সমস্ত শরীরের মধ্যে আনচান করছে কেমন যেন একটা

অস্বস্তি। এই বুঝি বড় বউমা ন্যাকড়া ভিজাল?—এই—এই বুঝি! বুকের কাছটায়—

ভাবলেন আঙুল দিয়ে দেখাবেন বুকের দিকে। হাত তুলতে পারলেন না। —তাহলে—

ভয় পেয়েছে সকলে। মুখ চোখের ভাব দেখে ভয় পেয়েছে সৃষ্টিধর।

নরেন! নরেন! শিগগির!—আর তুই যা দৌড়ে! অক্সিজেনের যন্ত্রটা পাশের ঘরে আছে। ভিড় কোরো না এখানে! জোরে পাখা করো! জানলা-দরজাগুলো সব ভাল করে খুলে দাও!

বাবা! বাবা! কোথায় কষ্ট হচ্ছে? বাবা! ও বাবা!

বাবার বুকের উপর হাত রাখল সৃষ্টিধর।

## অভিজ্ঞতা

তামাকের আমেজ জমে এসেছে। স্ত্রীর হাতে হুঁকোটা দিয়ে এইবার দিবানিদ্রার যোগাড় করবেন থানার দারোগা শ্রীরামভরোসা প্রসাদ। হাই উঠেছে, তুড়ি পড়েছে; শুনে স্ত্রী দাঁড়িয়েছেন; সব ঘড়ির কাঁটার মতো ঠিক চলেছে।

'দারোগাজী!,

মৃদু কুণ্ঠিত গলার স্বর বিরিঞ্চি সিং কনস্টেবলের। বাইরে থেকে ডাকছে, অতি অনিচ্ছা ও দ্বিধার সঙ্গে।

কণ্ঠস্বরের এই দ্বিধাটুকু থেকেই দারোগাজী বুঝে গিয়েছেন কেন ডাকছে। জেলা সদর থেকে কোনো হাকিম এলেও, থানার কনস্টেবল তাঁর 'কোয়ার্টার'-এ তাঁকে ডাকতে আসত ঠিকই; কিন্তু সে ডাক এমন মৃদু কুণ্ঠাজড়িত হত না। আসত ছুটতে ছুটতে, হাঁফাতে হাঁফাতে। উর্দি পরে বার হবার জরুরী তলব—চাপা গলায় অথচ জোরে জোরে—লাউডস্পীকারে চুপিচুপি কথা বললে যেমন শোনায় সেইরকম। সে ডাক সব দারোগার জানা—সাবেক কাল থেকে চলে আসছে, সব থানায়, সব দারোগার বেলায়। কিন্তু এখনকার এই বিরিঞ্চি সিং-এর ডাক হচ্ছে একেবারে অন্য জিনিস। মাস দেড়েক আগে পর্যন্ত, এ সুরের ডাক, তাঁকে কখনও শুনতে হয়নি জীবনে। কোনো কনস্টেবলের সাহস হয়নি কখনও রামভরোসা দারোগার ঘুমের ব্যাঘাত করতে। যখন যেখানে বদলি হয়েছেন, সেখানেই এই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গিয়েছে। আজ সে নিয়ম বদলেছে। তিনি কাউকে বলে দেননি; তবু সবাই জানে যে আগেকার নিয়ম আজ আর নেই।

পুরনো দিনের কথা মনে করেই বিরিঞ্চি সিং-এর এই কুণ্ঠা। হৃতরাজ্য রাজাকে সম্মান দেখাচ্ছে বিশ্বস্ত অনুচর।

'কে? বিরিঞ্চি সিং?'

'হুজুর!'

'কী ব্যাপার?'

'খুনের কেস হুজুর। গ্রামের লোক খবর এনেছে।'

'আচ্ছা চল—যাচ্ছি।'

হুঁকোতে টান মারা বন্ধ না করে, বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, ঘুম তাঁর মাটি হল ঠিকই, তবে এমন একটা কিছু ব্যাপার না যার জন্য তাঁকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে থানার অফিস ঘরে যেতে হবে এই মুহূর্তে।

এইসব সময়ে সান্ত্বনা স্ত্রীর নীরব সহানুভূতিটুকু। চিরকাল ভদ্রমহিলা এ-রকম নীরব ছিলেন না। স্বামীর কথার মিষ্টি করে পাল্টা জবাব তিনি চিরদিন দিয়ে এসেছেন। খেতে বসে চাকরে জীবনের খুঁটিনাটি স্ত্রীর কাছে গল্প করা দারোগাজীর অভ্যাস। ঘুষ নেন না বলে ডিপার্টমেণ্টে তাঁর কত নাম, উপরওয়ালা তাঁকে কত খাতির করেন, এইসব কথাই ছিল গল্পের বিষয়বস্তু। গৃহিণীর এসব মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, একুশ বছর ধরে প্রত্যহ শুনতে শুনতে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করতেন বিরক্ত হয়ে, 'আচ্ছা, এত তো তোমার খাতির, তবে তোমাকে ইন্সপেক্টর করে না কেন?'

নিজের চাকরে জীবনের সততার বড়াই তখনকার মতো বন্ধ হত; কিন্তু পরের দিন আবার যে-কে-সে।

কিংবা হয়তো কোনোদিন দারোগাজী বললেন, 'ঘুষ না নেওয়ার জন্য আর্থিক সাচ্ছল্য আমার কোনদিনও হবে না; কিন্তু এতবড় থানার এলাকার মধ্যে তো আমি রাজা। এখানে দারোগাজীর সম্মুখে সব বাছাধনকে মাথা নোয়াতেই হবে, সে তুমি যে-ই হও না কেন!'

'আচ্ছা, এইবার রাজরানী চলল বাসন মাজতে। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।'

ওইরকম চলত থানার রাজা-রানীতে। কিন্তু দেড় মাস থেকে গল্পের ধারা গিয়েছে একেবারে বদলে। দারোগাজী পারলে পরে চুপ করেই থাকতেন। কিন্তু একজন কারও কাছে দুঃখের কথা না বলতে পারলে, বুকের বোঝা হালকা হয় না যে। এখনকার কথাবার্তার ধুয়ো দারোগাগিরির ঝকমারি। দিকদারি ধরে গিয়েছে তাঁর এ চাকরিতে। প্রথম জীবনেই ভুল করে ফেলেছেন এ লাইনে এসে।—হ্যাঁ-কে না করতে পারতে, দিনকে রাত করতে পারতে, উপরওয়ালার অকাজ-কুকাজে সাহায্য করতে পারতে, সে যদি বলে জল উঁচু তুমিও জলকে উঁচু বলতে পারতে, তবে চাকরিতে তোমার সুনাম হত, উন্নতি হত!—চাকরি ছেড়ে চলে যাবার সাহস যে নেই।—

দারোগা গিন্নী চুপ করে শোনেন। শুনতে শুনতে এক-এক সময় চোখে জল এসে যায় আজকাল।

'ভোখরাহার কেস হুজুর।'

ফিরে যাবার পথে বিরিঞ্চি সিং সতর্কবাণী দিয়ে যাচ্ছে।

ভোখরাহার! চমকে উঠেছেন দারোগাজী। তামাকের ধোঁয়া গলায় লাগল। ভোখরাহা বলল না? কেঁপে উঠেছে বুক রাজরানীর। ওই গ্রামের একটা কাণ্ড নিয়েই থানার রাজা নিজের রাজ্যে ফকিরের অধম হয়ে গিয়েছে দেড় মাস থেকে।

—কে জানে ইনি আবার কে!

ধুতির খুঁট গায়ে দিয়েই দারোগাজী ছুটলেন থানা অফিসে। দারোগা-গিন্নী দেয়ালের মহাবীরজীকে প্রণাম করলেন। আতঙ্ক আসে ভোখরাহা নামটাতে। কে জানে এও আবার সেই রকমই কোনো কিনা। সেদিন তো

চাকরি যাব-যাব হয়েছিল। কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছে। ওই যে সেই চাকরির বই থাকে না—তাতে দারোগাজীর নামে কালো দাগ পড়েছে, ভোখরাহার ব্যাপারটা নিয়ে। জেলার নতুন পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টটা অতি বদ। লোকের চাকরি খাওয়ার জন্য হাঁ করে রয়েছে সবসময়।

স্বামীর কাছে তিনি সব শুনেছেন তো। হেন দিন নেই, যেদিন কারও-না-কারও চাকরি খাচ্ছে। আর মুখ কী খারাপ! থানায় যখন টুর-এ আসে, একেবারে থরহরিকম্প লাগিয়ে দেয়। ছোট নেই বড় নেই, সবার সম্মুখে গালাগালি দেয় থানার দারোগা কনস্টেবলদের।

দারোগাগিন্নীর খাওয়া-দাওয়া মাথায় চড়ল। হুঁকোয় টান মারতে পর্যন্ত ভুলে গেলেন।

মিনিট পনের বিশ পরে দারোগাজী যখন বাসায় ফিরলেন, তখন আর তাঁকে প্রশ্ন করতে হল না। নিজ থেকেই বললেন। এখনই তাঁকে বার হতে হবে, নালিশটার সরেজমিনে তদারক করতে; ধড়াচূড়া পরতে যেটুকু দেরি—ভোখরাহার সাঁওতালটোলায়, একটা বাপ ছেলেকে কেটেছে কুড়ুল দিয়ে।

'অন্য কোনো গণ্ডগোল নেই তো এর মধ্যে?'

'মনে তো হচ্ছে না। তবে এখন কে বলতে পারে! কিছু বিশ্বাস নেই আজকালকার পুলিশসাহেবকে।'

সংক্ষেপে কথা। এঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ বোধ হয় এ কথার মানে ধরতে পারবে না। নূতন পুলিশসাহেব দারোগাদের কর্মতৎপরতা পরীক্ষা করবার জন্য, নানা রকম ব্যবস্থা করছেন, এই রকম একটা গুজব রটেছে পুলিশমহলে।

—নিশ্চিন্দি আর নেই এই পুলিশসুপারের জ্বালায়। আগেকার কালে যখন সদর থেকে থানায় আসবার পথঘাট খারাপ ছিল তখন দারোগাগিরি ছিল আরামের চাকরি। আগে থেকে খবর না দিয়ে সাহেবের আসবার উপায় ছিল না। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। পিচের রাস্তা, মোটরগাড়ি, —মেমসাহেবকে নিয়ে বিকেলে হাওয়া খেতে বার হবার খরচও গভর্নমেন্টের কাছ থেকে নেওয়া যায়, থানা 'ইন্সপেক্‌শন' করে! এ সাহেবটা আবার কাউকে বিশ্বাস করে না। এর বদ্ধমূল ধারণা যে প্রত্যেকটা দারোগা থানায় বসে বসে মিথ্যে ডায়েরি লেখে—পারত পক্ষে সরেজমিনে যেতে চায় না!

'জয় মহাবীরজী!'

'সাইকেল নিয়ে কোয়ার্টার থেকে বার হলেন রামভরোসা প্রসাদ।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, রাতে খাওয়ার আগে তো ফিরবই; সে আর বলতে!'

বাড়ির আরামটুকুর উপর লোভই তাঁর চাকরিতে কাল হয়েছে। স্নানের আগে তেল মাখিয়ে তাঁকে আধ ঘণ্টা ডলাই-মলাই পর্যন্ত করে দেন তাঁর স্ত্রী নিজ হাতে। তাঁর সততার কথাটাও যেমন তাঁর ডিপার্টমেন্ট-এর প্রত্যেকের জানা, তেমনি তাঁর আরামপ্রিয়তার কথাটাও।

গত মাসে পুলিশসুপার যখন তাঁর বিরুদ্ধে 'প্রসিডিংস্' এনেছিল, তখন স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে, কুঁড়ে লোক সে পছন্দ করে না পুলিশ বিভাগে; তার চেয়ে নিজের কাজটি করে দু'পয়সা ঘুষ খাওয়া অনেক ভাল। পুলিশ-সুপার অবশ্য শোনা কথার উপর নির্ভর করে এ মন্তব্য করেনি। তিনি হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন উপরওয়ালার কাছে।

—রাত্রিতে খেয়েদেয়ে শুয়েছেন সেদিনও ; ভোখরাহা থেকে খবর এল খুন-জখমের 'কেস'-এর। খবর এনেছিল সহদেও সিং—ভোখরাহার পুরণ সিং-এর ছেলে। পুরণ সিং-এর নাম সব দারোগার জানা। এক কালের দাগী আসামী—এখন বলে চাষবাস করে খায়—কিন্তু বিশ্বাস হয় না সে-কথা। কেননা খরচ অবস্থা অনুপাতে অনেক বেশি ; আলাপ-পরিচয়ও চোর-ডাকাতের সঙ্গেই। নানারকম গুজব শোনা যায় তার সম্বন্ধে ; কিন্তু খোলাখুলি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে লোকে ভয় পায়। সেই বুড়ো পুরণ সিং জখম হয়েছে—খবর এনেছিল তার ছেলে। কোথায় কোন গ্রামে একজন দাগী চোর জখম হয়েছে ; তার জন্য এই অন্ধকার রাত্রিতে এগার মাইল সাইকেলে যাওয়া—এ জিনিস রামভরোসা দারোগার কোষ্ঠীতে লেখেনি। তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেননি—বলে দিয়েছিলেন, পরের দিন যাবেন তদন্ত করতে। পরের দিন ভোখরাহাতে গিয়ে দেখেন যে, পুলিশসাহেব তাঁর আগেই হাজির হয়েছেন সেখানে। সহদেও সিং রাত্রিতেই থানা হয়ে সাহেবের কাছে গিয়েছিল। শুনে সাহেব নিজে ছুটে এসেছেন। তাঁকে দেখে সাহেব গ্রামের লোকজনের সম্মুখেই স্বাগত সম্ভাষণ করেছিলেন, 'এতক্ষণে নবাবসাহেবের সময় হল ?' তারপর নিজের গাড়িতে করে সংজ্ঞাহীন পুরণ সিংকে নিয়ে গেলেন সদর হাসপাতালে ভরতি করবার জন্য।

এর পরই হয়েছিল দারোগাজীর বিরুদ্ধে 'প্রসিডিংস্'। তখন তিনি জানতে পারেন যে, পুরণ সিং হচ্ছে পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের খাস বহাল করা গুপ্তচর। সব থানায় এ-রকম 'স্পাই' আছে। কী খবর দেয়, কত টাকা পায় সে শুধু জানেন পুলিশসাহেব। থানার দারোগা-পুলিশ এদের নাম পর্যন্ত জানতে পারে না। এরা প্রায়ই চোর-ডাকাতদের দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা লোক। তবে দারোগা-পুলিশের বিরুদ্ধে খবর কিছু কি আর দেয় না পুলিশসাহেবের কাছে ? তাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হয় চোর-ডাকাতের কাছেও আজকাল, —কে জানে, কে আবার কিনি!—সাইকেলে যাবার সময় পথের দু'ধারের লোকরা দারোগাজীকে আদাব করছে ; তিনি তাঁদের মুখের দিকে তাকাতেও পারছেন না ; এরা সবাই জেনে গিয়েছে যে পুলিশসাহেবের চোখে তাঁর কদর কানাকড়িও না। পুরণ সিং-এর পরিবারের খাতির সদরে দারোগাজীর চেয়েও বেশি। যতই ঢাকতে চেষ্টা করুন, একটা কুণ্ঠার ভাব এসে গিয়েছে তাঁর মনে, ওই পুরণ সিং-এর কাণ্ডটার পর থেকে।

ভোখরাহার কাছাকাছি এসে গেলেন এতক্ষণে। সারাটা পথ পুরণ সিং-এর কথা ভাবতে ভাবতেই এসেছেন। গ্রামে ঢুকতে হয় রাজপুতটোলার মধ্যে দিয়ে। সাঁওতালটোলা এখান থেকে মাইল খানেক দূরে—একটা মজা নদীর ধারে। রাজপুতটোলায় বেশ ঘন বসতি। সরু রাস্তার ধারে একটা সরকারী ইঁদারা। ইঁদারার জল পড়ে পড়ে সেখানকার রাস্তায় এক-হাঁটু কাদা-পাঁক জমেছে। এরই এক পাশের সরু শুকনো জায়গাটুকু দিয়ে তিনি সাবধানে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে গেলেন ; ইঁদারাটার অন্যদিকে পুরণ সিং-এর বাড়ি। বাড়ির সম্মুখের অপরিসর জায়গাটাতে মাস-দেড়েক আগে—সেই কাণ্ডটার দিন—পুলিশসাহেব মোড়া পেতে বসেছিলেন। ওই জায়গাটাতেই দারোগাজীর মান-ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়েছে।—প্রাণপণ চেষ্টায় সেদিকে না তাকিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন।

ভোখরাহাতে ঢোকবার মুহূর্ত থেকে তাঁর সংকুচিত ভাবটা আরও বেড়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে 'আদাব হুজুর' করতে করতে।—বিদ্রূপ নয় তো ?

সাঁওতালটুলিতে একটা বাড়িতে ভিড় দেখে সেখানে নামলেন দারোগাজী। সাঁওতালরা তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিরসা মাঝির বউ চিৎকার করে কেঁদে তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে।

'ও দারোগা, দেখ্ একবার কী করেছে! তিন মাসের দুধের ছেলে! আহা রে! কুড়ুল দিয়ে থেঁতলে মাথাটা ভেঙে দিয়েছে। বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে কী মেরেছে দেখ্, জানোয়ারটা!'

ঘর-দুয়োর ঘুরে ঘুরে দেখলেন দারোগাজী। তকতকে নিকানো উঠান। চৌকিদারের কড়া হুকুমে সব যেখানে যেমন ছিল, তেমনি রাখা আছে। বারান্দায় শিশুর মৃতদেহটা! তাকানো যায় না। মাথার ঘিলু বেরিয়ে গিয়েছে, মাছি ভনভন করছে সেদিকে, কালো জমা রক্তের উপর পিঁপড়ের সার। কুড়ুলখানা সেইখানেই পড়ে আছে। বেশ ভারী কুড়ুল। ঝকঝকে ধার। মাথার আঘাতটা কিন্তু কুড়ুলের ধারাল দিক দিয়ে লাগেনি। উঠোনের এক জায়গায় কিছু জ্বালানী কাঠ, কিছু কাঁচা ডালপালা, আর একখানা দা পড়ে রয়েছে। উপস্থিত সাঁওতালরা অতি মনোযোগের সঙ্গে দারোগাজীর গতিবিধি লক্ষ্য করছে। বিরসা মাঝি একদৃষ্টে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে—বেদনাভরা তার করুণ চাউনি। বিরসা আর বিরসার স্ত্রীর বয়স বেশি নয়। এইটিই বোধহয় তাদের প্রথম সন্তান!

পরিবেশের ভয় আর বীভৎসতার গুমোট, খানিকটা কাটছে ছেলের মায়ের একটানা কাঁদুনি আর চিৎকারে।

'ও দারোগা, ঐ খুনেটাকে ধরে নিয়ে যা জেলখানায়। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দে, ওর মতলব খারাপ। এর পর একদিন আমাকেও কাটবে ওই কুড়ুল দিয়ে। নিশ্চয় কাটবে। আমার মন যে তাই বলছে। তখনও সূর্য ওঠেনি, দোয়েল ডেকেছে, কি না ডেকেছে, শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল—কী রে! চমকে উঠেছি। কানের কাছেই! ঘরের বাইরেই! ছেলেটার বাপ দেখি ঘরের পশ্চিমের ময়না গাছটা কাটছে। ওইখানে, ওই দেখ্ না দারোগা, কাটা গাছের গোড়াটা যেখানে রয়েছে। এই ডালপালাগুলো সব ওই গাছের।—দেখেই হাঁ-হাঁ করে উঠেছি আমি। ও গাছটা তোর কী ক্ষতি করেছে? খেতে ভাল না হোক, তবু ময়নার ফল পাকলে খাওয়া তো চলে। বাড়ির একদিকে একটু আবরুও তো দরকার। আমি বলি—তা কাটছিস কেন? বলে—কুড়ুলের বাঁট হবে। বাঁট তয়ের করবি তো একটা মোটা ডালই না-হয় কেটে নে; অত বড় গাছটা কি না কাটলে চলছে না? কে আমার কথায় কান দিচ্ছে! ছেলের বাপ তেড়ে জবাব দিল—উনানের জ্বালানি হবে। সে কী চোখ রাঙিয়ে কথা। ওই রেগে কথা বলা দেখেই আমি ওর মতলব বুঝে গিয়েছি।—'

দারোগাজীর কান খাড়া হয়ে ওঠে!

'ময়না গাছ কাটবার সময় রাগতে দেখে তুই বিরসার মতলব কী বুঝলি?'

একটু কেমন যেন হয় বিরসা মাঝির বউ। কান্না ও কথার স্রোত দুটোই

এতক্ষণ একসঙ্গে সহজ ধারায় বইছিল। দারোগাজীর প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে, সেই কথা খোঁজবার চেষ্টায় কান্নার স্রোতও বাধা পড়ল।

কথা বলে বিরসার শ্বশুর। 'অত বড় বড় কাঁটা ডালে। ময়নার কাঁচা ডাল আবার লোকে কাটে নাকি জ্বালানি করবে বলে?'

'চোপ রও। দারোগাজী যখন তোকে জিজ্ঞাস করবেন, তখন কথা বলিস।'

কনস্টেবলের তাড়া খেয়ে বুড়ো থেমে গেল। কথা খুঁজে পেয়েছে বিরসার বউ। সে আরম্ভ করে অন্য কথা। নদীর বালিতে গর্ত খুঁড়ে খাওয়ার জল নিয়ে আসতে হয়; তাই কলসী ভরতে সময় লাগে অনেকক্ষণ। কচি ছেলেটাকে বারান্দায় শুইয়ে রেখে সে গিয়েছিল জল আনতে। ফিরতি পথে সে বিরসার চিৎকার শুনতে পায়। চেঁচানির ধরণ শুনেই তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে দেখে এই কাণ্ড। অতটুকু বাচ্চা, কী-ই জানে, কী-ই বা বোঝে, ঘুমোচ্ছিল, বাপ হয়ে কী করে পারল! আহা রে! ওরে রাক্ষস, ও ছেলে কি আমার একার—ও ছেলে যে তোরও!…

দারোগাজী স্ত্রীলোকটির কথার স্রোত বন্ধ করতে চান না। এ আর এর স্বামী যা প্রাণে চায়, বলুক। এদের কথা থেকেই তাঁকে বুঝে নিতে হবে আসল ব্যাপারটা। নেশার ঝোঁকে করেনি তো কাণ্ডটা বিরসা মাঝি? তাঁর আগেকার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছে বিরসার স্ত্রী, এ কথা দারোগাজীর খেয়াল আছে।

এতক্ষণে বিরসা মুখ খুলল।

'না না, দারোগা, বিশ্বাস করিস না ওর কথা। আমি ছেলেটিকে মারিনি, অমন সুন্দর ছেলেকে কি মারতে পারা যায়?'

তার গলার স্বর ও কথার ভঙ্গিতে দারোগাজী আশ্চর্য হলেন। একুশ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন, দোষ অস্বীকার করবার সময় অপরাধীর কণ্ঠস্বর কেমন হয়।—এ যে অন্য রকমের! এ যে সত্য কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে! মুখ-চোখের ভাবও মিথ্যা বলবার সময়ের মতো না! বহুবার জেলখাটা গুণ্ডাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সত্য বলবার নিখুঁত ভান করতে পারে; কিন্তু একজন সরল গ্রাম্য সাঁওতাল তা পারবে কী করে?

'না দারোগা, ও মিছে কথা বলছ ফাঁসিকাঠে ঝুলবার ভয়ে। ওই কুড়ুলখানি দিয়ে—' নতুন-আসা কান্নার তোড়ে বিরসার স্ত্রীর বাকি কথাগুলো বোঝা গেল না।

'ফাঁসিতে আমি ভয় পাইনে রে—বুঝলি। মারলে পরে আমি নিজেই স্বীকার করতাম দারোগার কাছে। তোকে বলতে হবে কেন! আমি নিজে থেকে থানায় গিয়ে দারোগাকে বলতাম, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দিয়ে দিতে। মরতে ভয় পাই না রে, মরতে ভয় পাই না। এই কুড়ুল দিয়ে, আমি একা হাতে ভাল্লুকের সঙ্গে লড়েছি—বুঝলি! এ কুড়ুল আমার বাপের কাছ থেকে পাওয়া। বাপের মুখে শুনেছি যে ঠাকুরদা তয়ের করিয়ে এনেছিল জংশন ইস্টিশানের নামকরা কামারের কাছ থেকে, রেল-লাইনের লোহা দিয়ে। এমন কুড়ুল এই ভোখরাহা গ্রামে আর কারও নেই। তিন পুরুষ হয়ে গেল—আজ পর্যন্ত কখনও দাঁত পড়েনি। তেঁতুল কাঠ কাটলেও এর ধার ভোঁতা হয় না। জঙ্গলে কাঠ কাটবার সময় কুড়ুলটা কতবার বাঁচিয়েছে বাপকে, ঠাকুরদাকে, আমাকে—জন্তু-জানোয়ার সাপখোপের হাত থেকে তার কি ঠিকঠিকানা আছে! ওই কুড়ুল দিয়েই যদি

আমি ছেলেটাকে মারব, তবে ঘ্যাচ করে কোপ না বসিয়ে, ভোঁতা দিকটা দিয়ে মাথা থেঁতলে দেব কেন? আরে, ওই একরত্তি বাচ্চাকে মারতে আবার দা-কুড়ুল লাগে নাকি? পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে মরে যাবে, আঙুল দিয়ে টিপে দিলে মরে যাবে, কিন্তু তা কি পারা যায়? ইচ্ছা থাকলেও তা কি পারা যায়?'

'ইচ্ছা থাকলেও' কথাটা কানে লাগে দারোগাজীর। এ কথাটা বলল কেন? এটা কি শুধু কথার মাত্রা?—

'না দারোগা, তুই ওর কথা বিশ্বাস করিস না। ও মেরেছে ঠিকই ছেলেটাকে —নিজ হাতে মেরেছে। ও আমাকেও ওই বাপের কুড়ুল দিয়েই কাটবে। সে আমি ময়না গাছ কাটা দেখেই টের পেয়েছি। ছেলের চেয়ে কখনও বউ আপন হয়? যে লোক ছেলেকে কাটতে পারে, সে কি আর বউকে রাখবে! কুড়ুলের প্রথম কোপটা যে আমার গর্দানে না পড়ে ময়না গাছে পড়েছে, সেই আমার ভাগ্যি!'

'ওর মনে গলদ আছে, তাই ও আমার বিরুদ্ধে বলছে তোর কাছে। নইলে কেউ কি নিজের মরদের বিরুদ্ধে দারোগার কাছে বলে? কুড়ুল গিয়ে লেগে ছেলেটা মরেছে ঠিকই। সে কথা কি আমি অস্বীকার করছি? কিন্তু আমি মারিনি, আমার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে লেগেছে কুড়ুলটা আপনা থেকে। কাঁচা ছালছাড়ানো ময়নাডাল দিয়ে নতুন বাঁট লাগিয়েছিলাম কুড়ুলে। কাঠ কাটবার সময় পিছলে বেরিয়ে গেল হাত থেকে। ছুটে গিয়ে লেগেছে একেবারে ওই কচি মাথাটায়। ময়না গাছটাই বোধ হয় শোধ নিল আমার উপর, অমন করে সেটাকে গোড়া থেকে কাটলাম বলে। গাছ ওরকম শোধ নেয়। গাছ কাটতে কাটতে চাপা পড়ে লোক মরতে দেখিসনি? গাছের ডাল কাটতে কাটতে, গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙতে দেখিসনি? আঁধার রাতে একলা পেলে গাছকে ভয় দেখাতে দেখিসনি? ময়না গাছটা বুঝি আগে থেকেই ছিল আমার বিরুদ্ধে। নইলে ময়নাডালের বাঁটটা অমন পিছল হয়ে উঠবে কেন হঠাৎ আমার হাতের মধ্যে?'

দারোগাজী কাঠ কাটবার জায়গা থেকে ছেলে শোয়াবার জায়গার দূরত্ব ইত্যাদি একটা আন্দাজ করে নিচ্ছেন মনে মনে। মাপজোখ পরে হবে। এখন তিনি এদের কথার মধ্যে বাধা দিতে চান না। বুঝছেন যে, আসল কথাটা এখনও বার হয়নি। বিরসার স্ত্রী বোধ হয় ভাবল যে, তার স্বামীর কথাগুলো দারোগাজীর মনে বসেছে; সেজন্য সে আগের চেয়েও বেশি চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করে, 'না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না। ও আমায় সন্দেহ করে। কিছুদিন থেকে দেখছি সোনাই সা'র দোকানে সওদা করতে গেলে বিরক্ত হয়। বলেনি আমায় কিছু, কিন্তু বোঝা তো যায়। একটু চোখে চোখে রাখছে ও আমায় দিনকতক থেকে। এমন তো ও ছিল না। আমি কি বুঝি না। ছেলেটার রং একটু ফরসা হয়েছে বলে সোনাই সা'র উপর ওর সন্দেহ।'

'এ যদি সত্য না হবে, তবে তুই জানলি কী করে যে আমি সোনাই সা'কে সন্দেহ করি? জবাব দে আমার কথার। শোন্ দারোগা, কোনো কথা আমি তোর কাছে লুকোব না। সোনাই সা লোকটা ভাল না। খুব খারাপ। কাল রাতে শয়তানটাকে আমি খুঁজেছিলাম। ধরতে পারলে আমি ওটাকে এই কুড়ুল দিয়ে সাবাড় করে দিতাম। বংশের ইজ্জত রাখতে গেলে ঠাকুরদার কুড়ুল দিয়ে

ওটাকে খতম করা উচিত। ধরতে পারিনি। ছিল না বাড়িতে। পালিয়ে ছিল। আঁচ পেয়েছিল বুঝি আগে থেকে।'

এতক্ষণে দারোগাজী শাঁসালো খবর পেতে আরম্ভ করেছেন। সফল হয়েছে তাঁর এতক্ষণকার ধৈর্য।

'দারোগা, শুনেছিস তো ওর কথা। কাল রাতে ও গিয়েছিল সোনাই সা'র খোঁজে। কাল সকালেই ও বলেছে যে, যত বড় হচ্ছে ততই বাচ্চাটা দেখতে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কথাটা বাঁকা লাগল। শুনেই বুঝেছি। বোঝা তো যায়!'

'তোর মনে ভয় রয়েছে, তাই তুই বুঝেছিস! আমি ময়না গাছটা কেন কাটলাম তাও তুই না বলতেই বুঝেছিস! ভাবিস যে তোদের শয়তানি আমি ধরতে পারি না! তুই যে খানিক আগে দারোগাকে বললি,—ভোরে গাছ কাটার শব্দে তোর ঘুম ভেঙে গেল,—মিছে কথা—এত মিছে কথাও তয়ের করে বলতে পারিস! ঘুমিয়ে ছিলি না আরও কত! যত বোকা আমাকে ভাবিস, তত বোকা আমি নই, বুঝলি!'

বিরসার বউ চিৎকার করে ওঠে, 'ওরে বাপরে। তুই আমাকে বাঁচা। নইলে ও আমাকে মেরে ফেলে দেবে এখনই! তুই থানার রাজা। তুই আমার মা-বাপ। তুই আমাকে বাঁচা! এখনও খাটিয়ায় বসে বসে দেখছিস কী? ওর মাথায় খুন সওয়ার রয়েছে। হাতকড়ি দিচ্ছিস না কেন এখনও? বাপরে বাপ!—'

বিরসার বউ ছুটে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল এখান থেকে। কনস্টেবল দুজন তাকে ধরে, তাড়া দিয়ে আবার বসাল। 'থানার রাজা' কথাটা দারোগাজীর কানে খুব মিষ্টি লাগে, এই গোলমালের মধ্যেও।

'খুন সওয়ার হয়েছিল কালকে, বুঝলি। কাল যদি তোদের দুজনকে পেতাম তাহলে এই কুড়ুল দিয়ে কাটতাম ঠিকই। বাপের কাছ থেকে পাওয়া কুড়ুল—বাপের বংশের ইজ্জত বাঁচাবার ঠিকা আমারও যেমন, ওই কুড়ুলখানারও তেমনি। আমার চেয়েও বোধ হয় কুড়ুলখানার বেশি। দেখছিস না? নইলে ছিটকে অমন করে হাত থেকে বেরিয়ে যাব কেন নিজের কাজ সারতে? চোখের নিমেষে, বোঝবার আগেই একেবারে উড়ে চলে গেল হাত থেকে, সাপে যেমন করে ছোবল মারে, বাঘে যেমন করে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম করে। সত্যি বলছি দারোগা, বিশ্বাস কর; ছেলেটাকে আমি মারিনি। আমার যে ইচ্ছা হয়নি একবারও তা নয়; মিছে বলব না তোর কাছে—ছেলেটাকে শেষ করে দেবার কথা আমি কালকেও ভেবেছি। আমার বাপ-ঠাকুরদার মুখে কালি দিচ্ছে ওই ছেলেটা এ কথা আজ কাঠ কাটবার সময়েও ভাবছিলাম। আমার বাপ-ঠাকুরদারা উপর থেকে দেখছে, চোখে আঙুল দিয়ে ছেলেটাকে দেখাচ্ছে, ওটাকে শেষ করে দেবার কথা মনে পড়াচ্ছে—এইসব কথা কুড়ুলটা হাত থেকে ফসকে যাবার আগের মুহূর্তেও আমি ভাবছিলাম। কিন্তু আমি মারিনি। এত কথা তোর কাছে স্বীকার করছি, আর মারলে পরে সেই কথাটা তোর কাছে কবুল করতাম না? একেবারে বাচ্চা যে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুন্দর হাসে যে! মায়ের নাক খামচে নেয় যে! ওকে কি মারতে পারা যায়! কী-ই বা জানে, কী-ই বা বোঝে, অতটুকু রক্তের দলাটা! তা কি পারা যায়! কিন্তু আমি না পারলে কী হবে! কুড়ুলটা শুনবে কেন? ওটা যে চলে আমার বাপ-ঠাকুরদার হুকুমে। আমার মনের চেয়েও এগিয়ে চলে। বললে বিশ্বাস

করবি না, হাতের মধ্যে বেঁচে উঠে কুড়ুলটা শিঙ্গি মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল হু-উ-ই দূরে। কাঠ কাটছিলাম উঠোনে ওখানে। ওখান থেকে এখানে ছুটে এল কুড়ুল, কী হচ্ছে বোঝবার আগেই। আমি নিজেই হাঁ-হাঁ করে উঠেছি। এ কী হল! দেখতে না দেখতে! কুড়ুলটা হাত থেকে পালাবার মুহূর্তেই আমি বুঝে গিয়েছি সেটার মতলব। জেনে গিয়েছি সেটা কোথায় যাচ্ছে; কিন্তু জানলে কী হবে! তার উপর আমার যে কোনো হাত নেই। মানুষের সঙ্গে, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করা যায়; কিন্তু জিনিস একবার খেপলে কি তাকে সামলানো যায়! অবিশ্বাস করিস না আমার কথা দারোগা। তীরধনুকে আমার হাতের নিশানা ভাল; কিন্তু হাজার নিশানা করেও ওই কাঠ কাটবার জায়গা থেকে কুড়ুল ছুঁড়ে এই বারান্দার বিড়ালের গায়ে আমি লাগাতে পারব না। আর লাগবি তো লাগ, একেবারে ঠিক মাথায়! একটা কথাও লুকোচ্ছি না রে। সে সাহস আমার ছিল না। বাঘ-ভাল্লুক মারবার চাইতেও অনেক বেশি বুকের পাটার দরকার হয় অতটুকু একটা দুধের বাচ্চাকেও মারতে! সে বুকের পাটা আমার নেই—'

বিরসার বউ সত্যিই খুব ভয় পেয়েছে। যত শুনছে তত তার ভয় বাড়ছে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। ময়না গাছটাকে কাটতে দেখেই বুঝেছিল যে সে ধরা পড়ে গিয়েছে স্বামীর কাছে। কিন্তু এতটা সে ভাবেনি। নিজেকে ভাবত খুব চালাক। বিরসার মাথায় যে খুন চড়ে আছে তা সে আঁচ করতে পারেনি আজ সকালেও।—আর রক্ষা নেই তার বিরসার হাত থেকে! মরা ছেলেটার চেয়েও নিজের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে হঠাৎ। আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা হচ্ছে দারোগার কাছে নিজে সব দোষ স্বীকার করে—সোনাই সা'র সব কথা বলে। কিন্তু সমাজের সব লোক যে সম্মুখে বসে! বাধো-বাধো ঠেকছে। তাছাড়া বিরসা কতটুকু জানে তাদের আশনাই সম্বন্ধে সেটা জানতে পারলে সুবিধা হত। দোষ স্বীকার করবার লোভ ছেড়ে সে তার পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলে।

'না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না। ও আগাগোড়া মিছে কথা বলছে।—'

'থাবড়ে মুখ ভেঙে দেব! বারবার ওই একই কথা, একই কথা কী শোনাচ্ছিস দারোগাকে! মিছে কথা কি? সোনাই সা'র কথাটা মিথ্যা? ময়নাগাছটা কাটলাম মিছামিছি? আমি কি পাগল নাকি? তবে হ্যাঁ, ময়নাগাছটা আমি কেটেছি রাগ করে। মিছে বলব না তোর কাছে দারোগা। নইলে অন্য গাছের ডাল দিয়ে কি আর কুড়ুলের হাতল হত না? বুনো গাছ ঠিকই; কিন্তু ছাগলটা বাঁধতেও তো গাছটা কাজে লাগত! এই যে এতগুলো লোক উঠোনে রোদ্দুরে বসে রয়েছে, ময়নাগাছটা থাকলে এরা কি একটু ছায়া পেত না? বুঝি তো; কিন্তু ও গাছটা না কাটলে যে সত্যিই চলছিল না। আর এখন সে কথা লুকিয়ে কি লাভ, ও ওই গাছটার উপর কাচা কাপড় শুকোতে দিত মাঝে মাঝে। দেখাদেখি একদিন আমিও কাপড় শুকোতে দিলাম ময়না-গাছের উপর। সঙ্গে সঙ্গে দেখি ও আমার ধুতিখানা সেখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় মেলে দিল।

—কেন রে? তুললি কেন? বেশ তো রোদ্দুর আছে এখনও ওখানে!

—পাতায় বড় ধুলো রে আজ। যা জোর হাওয়া গিয়েছে কাল! কাচা কাপড় ময়লা হয়ে যাবে।

নে বাবা, যা ভাল বুঝিস তাই কর!

আবার আর একদিন ওই ব্যাপার।

—কেন রে? তুললি কেন?

—আজ হাওয়া দেখছিস না; যেন ঝড় বইছে। এই হাওয়ার মধ্যে ময়নাগাছের কাঁটায় কি আর তোর ধুতি আস্ত থাকবে!

বেশ। যা বুঝোস তাই বুঝি! ভাবি, মেয়েমানুষের খেয়াল। তখন বুঝতে পারিনি!'

'না না দারোগা, এসব ওর বানানো কথা। আরও কত বলবে বানিয়ে বানিয়ে। বিশ্বাস করিস না একটা কথাও।—'

'দারোগা, তুই আগে সবটুকু শুনে নে। তারপর বুঝে দেখিস, এ আমার বানানো গল্প, না আমি সত্যি কথা বলছি।—আর-এক দিনও দেখি ময়নাগাছের উপর কাপড় শুকোতে দিল। এক প্রহর বেলা তখন—গাছের দিকটায় রোদ্দুর নেই। এখানে-ওখানে, বেড়ার উপর, দাওয়ার বাঁশে, ঘরের ছাঁচতলায়, চারিদিকে ভরা রোদ্দুর। তবু কাপড় শুকোতে দিচ্ছে ছায়ায়। ভাবলাম বলি; কিন্তু বলি-বলি করেও বললাম না। খটকা লাগল। সেই রাত্রেই প্রথম সন্দেহ হয়। সোনাই সা'র সঙ্গে ওর আলাপ দরকারের চেয়েও একটু বেশি, এ কথাটা খেয়াল হল সেদিন। সোনাই সা'টা যে লোক ভাল না; আমাদের টোলার এত লোক তো এখানে রয়েছে; এরা সবাই বলবে এ কথা। এসব গত বছরের কথা। আমি কিন্তু মনে করে রেখেছিলাম। ময়নাগাছে কাপড় শুকোতে রোজ দেয় না। আবার ঝড়ের দিনেও ডালের সঙ্গে গেরো বেঁধে দেয়; পাতায় ধুলো জমে থাকলেও দেয়; রোদ না থাকলেও দেয়। দেখি। ভাবি। বোঝবার চেষ্টা করি। লক্ষ্য রাখি। মনে হয় যেন বুঝতে পারছি, অথচ ধরতে পারি না ঠিক, ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। কালও দেখি কাপড় শুকোতে দিয়েছে, গাছটার উপর অনেক কাল পরে। দিনে কাজে মন বসল না। রাতে ভাবতে ভাবতে ঘুম এল না। সারা রাত জেগে থাকব আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি। চোখ বুঁজে পড়ে আছি। ওটাও বুঝতে পারছি জেগে রয়েছে। পাশে শুয়ে। উশখুশ করছে। একবার আমার নাকের কাছে আঙুল রেখে বোঝবার চেষ্টা করল আমি জেগে আছি কি না। আঙুলে তেলের গন্ধ পেয়েই আমি বুঝেছি সাঁঝের বেলা চুলে তেল মেখেছে। কতবড় শয়তান। মটকা মেরে পড়ে আছি; কিন্তু কান খাড়া রেখেছি।—হঠাৎ ময়নাগাছতলায় শুকনো পাতার উপর শব্দ হল। পায়ের শব্দ। জন্তু-জানোয়ারের নয়। তাহলে খরখর করে শব্দ হত। শুনেই বোঝা যায়। এ শব্দ মানুষের পায়ের—চাপা, কাটা-কাটা শব্দ। সাবধানে টিপে টিপে পা ফেলবার শব্দ। চুলে-তেল-মাখা শয়তানটা তখন পাশে নাক ডাকতে আরম্ভ করে। বেশি চালাক কিনা! বুঝেছে আমি জেগে। নাক ডাকানোর মানে, ও শুনেছে পায়ের শব্দটা। কুড়ুলখানা হাতে নিয়ে ঘরের ঝাঁপ খুলতেই নাকডাকানী মেয়েটা কাশল। বোধহয় সড় ছিল আগে থেকে যে কাশির শব্দ শুনলেই পালাতে হবে; কেননা আমি ঝাঁপ খুলতে না খুলতেই ময়লা তলার লোকটা ছুটে পালাল। অন্ধকারে কাউকে দেখতে

পাইনি! কিন্তু দুড়দুড় করে পায়ের শব্দ হল—স্পষ্ট শুনলাম। আগে থেকে সড় না থাকলে লোকটাই বা অন্ধকারে বুঝল কী করে ঝাঁপ খুলে কে বার হচ্ছে —আমি, না যার বার হবার কথা, সে। আমিও শব্দটার পিছু-পিছু ছুটেছিলাম; কিন্তু সেও ওই শালা ময়নার কাঁটা পায়ে ফোটায় দৌড়ে পারলাম না লোকটার সঙ্গে। এই দেখ, এখনও সেই কাঁটা ফুটে রয়েছে পায়ে। ও গাছের কাঁটাটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে।—সোজা গেলাম মুদির দোকানে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখি, আলো জ্বলছে মিটমিট করে; সোনাই সা' নেই। ফেরেনি। দোকানে সোনাই সা' একাই থাকে কিনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম তার জন্য। শেষকালে ভোর-রাত্রেও ফিরল না দেখে, বাড়ি ফিরি। ঘরের মধ্যে ঢুকিনি। দাওয়ায় বসে বসে কত কী ভাবি। যদি লোকটা সোনাই সা' না হয়!—একটু ফরসা হতেই গেলাম ময়নাগাছতলায়। ঠিক যা ভেবেছি! রবারের জুতোর দাগ! দোকানদার মানুষ; জুতো পরে কিনা—রবারের জুতো। মাথা গরম হয়ে উঠল। দিলাম ময়না-গাছটাকে কেটে সাবাড় করে তখনই! আমাকে জেল দে, ফাঁসি দে, যা ইচ্ছা তাই কর; কিন্তু ছেলেটাকে আমি মারিনি।'

'না-না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না!—'

বিরসার স্ত্রী ওই একই কথা বারবার বলে চলেছে গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো। কিন্তু কথার পিছনে প্রাণ নেই। গলার স্বর মিইয়ে এসেছে; কথার ঝাঁজ মরেছে।

দারোগাজীই পড়েছেন মুশকিলে। তাঁর মনে হচ্ছে যে বিরসা মিথ্যা কথা বলছে না; নিজেকে বাঁচিয়ে কথা বলবার চেষ্টা নেই। তবু মনে খটকা থেকে যাচ্ছে; একটা বিষয়ে; আর সেইটাই এই তদন্তের মুখ্য বিষয়। বিরসা ছেলেটাকে ইচ্ছা করে মেরেছে, না এটা একটা দৈবাৎ-ঘটে-যাওয়া দুর্ঘটনা মাত্র। বিরসার কথার এই অংশটা একটু কেমন-কেমন যেন ঠেকে। এও কি সম্ভব? অসম্ভব অবশ্য পৃথিবীতে কিছু নেই। কিন্তু উপরওয়ালা তো তা শুনবে না। তিনি নিজে চিরকাল এসব ক্ষেত্রে নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করেছেন। পুলিশসাহেব তাঁর উপর যত বিরূপই থাকুক, এখনও তিনি নির্ভীকভাবে নিজের বিবেক অনুযায়ীই কাজ করতে চান। তাঁর মন যা বলছে, যুক্তি বিবেচনা বলছে ঠিক তার উলটো। বিরসার কণ্ঠস্বর আর মুখচোখের ব্যঞ্জনা ছাড়া আর-সব তথ্য-প্রমাণই তার বিরুদ্ধে। ঘটনা পরম্পরা এমনভাবে সাজানো যে, তাকে নির্দোষ বলে ভাবতে বাধে। হাত থেকে কুড়ুল ছিটকে যাওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু সেটা গিয়ে কি একেবারে ওই ছেলেটার মাথাতেই লাগবে! আর ও নিজেই স্বীকার করছে যে, ও ছেলেটাকে মারবার কথা ভাবছিল তখন।··· এতগুলো যোগাযোগ কি সম্ভব?···না-না, লোকটা সত্যি কথা বলছে এই ধারণাটুকু ছাড়া আর-কিছুই নেই তার সপক্ষে। এই ক্ষীণ ধারণাটুকুর উপর নির্ভর করে কি কখনও পরিষ্কার বিবেকে, এটাকে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার কেস বলে রিপোর্ট করা যায়?···

'না-না দারোগা, ওর আজগুবি গল্প একটুও বিশ্বাস করিস না। আগে হাতকড়ি লাগিয়ে দে ওর হাতে, তারপর ওর কথা শুনিস।—'

দারোগাজী মন স্থির করতে পারেন না। চৌকিদারকে হুকুম দিলেন সোনাই

সা'র খোঁজ করতে। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে থেকে কে-একজন যেন বলল যে, সোনাই সা' পালিয়েছে ; আজ ওর মুদিখানার দোকান খোলেনি।

এতক্ষণে দারোগাজী বাইরে লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। রাজপুতটোলার লোকরাও এসে জুটেছে। যে লোকটা কথা বলল, সে পুরণ সিং-এর ছেলে সহদেও সিং। ঝুঁকে নমস্কার করে সে দারোগাজীকে। ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসি! মন খারাপ হয়ে গেল। ওই নমস্কার আর হাসির মধ্যে দিয়ে বোধহয় সহদেও সিং সকলকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে দারোগাজীর নগণ্যতার কথাটা।—লোক-দেখানো নমস্কার! ও বোঝাতে চাচ্ছে যে, পুরণ সিং-এর স্থান থানার মধ্যে দারোগাজীর চেয়েও উঁচুতে!—ঠোঁটের কোণের হাসিটা তাচ্ছিল্যে ভরা!—

বেশ এতক্ষণ কর্তব্যের মধ্যে ডুবে ছিলেন। আর এখন পুরণ সিং-এর কথাটা ভুলে থাকবার জো নেই! হাজার কাজে ডুবে থাকলেও। সহদেও সিং মনে পড়িয়ে দিয়েছে সেইদিনকার অপমানের কথাটা। ভোখরাহা গ্রামের এইসব লোকজনের চোখে সেইদিন থেকে তিনি কত ছোট হয়ে গিয়েছেন। সংকোচে তিনি রাজপুতটোলার লোকের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। গম্ভীর হয়ে তিনি লেখাপড়া, মাপাজোখা, সাক্ষ্যপ্রমাণে মনোনিবেশ করলেন।

তদন্তের কাজ শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল। সাক্ষ্যপ্রমাণ সব বিরসার বিরুদ্ধে। মনের সংশয়টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল। কুড়ুলটা হাত ফসকে অমনভাবে ছেলের মাথায় লাগার কথাটা সত্যি বলে ভাবতে পারলে তিনি তৃপ্তি পেতেন।

এত দেরি হবে এখানে তা তিনি ভাবেননি। এগারো মাইল পথ তাঁকে যেতে হবে সাইকেলে, অন্ধকারের মধ্যে। এই মেদবহুল শরীর নিয়ে, এত পরিশ্রম আর আজকাল পোষায় না ; কিন্তু পরের চাকর যে! যাক, তবু ভাল যে রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার সময়টাতে তিনি বাড়ি পেঁছে যাবেন। এখানে আর তিনি এক মিনিটও দেরি করতে চান না। শবদেহ আর আসামীকে নিয়ে যাবার ভার কনস্টেবলদের ওপর দিয়ে তিনি উঠলেন।

গ্রামের লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে সকলেই তাঁর সান্নিধ্য পেতে চায়। এতক্ষণ তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন—এখন তাঁর অবসর—মাতব্বরেরা সকলেই চায় থানার মালিকের সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত পরিচয় করে নিতে। ঝুঁকে সেলাম করছে ; দারোগাজী শুধু একবার তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের ধন্য করুন! সবচেয়ে আগে দাঁড়িয়ে পুরণ সিং-এর ছেলে সহদেও সিং। গ্রামের লোকে খাতির করে তাকে দারোগাজীর সবচেয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার অধিকার দিয়েছে। পুলিশ-সাহেব যাকে মোটরগাড়িতে নিজের পাশে বসতে দেয়, গ্রামের মধ্যে তার খাতিরই আলাদা। সে হেসে এগিয়ে এল।

'দারোগাজী এখনই চললেন? এই গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দিলে হত না! অনেকটা পথ যেতে হবে ; কখন পেঁছবেন ; যদি একটু জলটল খেয়ে যেতেন—!'

'না-না! এ সময় জল-খাবার খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই!'

'আমার বাবা আপনাকে দেখলে খুশী হতেন। আজ হাসপাতাল থেকে

ফিরে এসেছেন আপনাদের আশীর্বাদে। তবে হাতের ব্যাণ্ডেজটা এখনও খুলে দেয়নি। একটু দেখা করে গেলে হত না?'

পুরণ সিং! ফিরে এসেছে? সহদেও সিং বুক ফুলিয়ে এসে নিমন্ত্রণ করবার ছলে, তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেইদিনকার কথাটা। লোকগুলো নিশ্চয়ই মজা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! এদের সম্মুখে সাহেব সেদিন তাঁকে নবাবসাহেব বলে গালাগালি দিয়েছিল! মনের নিচে থিতিয়ে পড়া অপমানের গ্লানিটুকু ঘেঁটে উঠেছে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করে। এখান থেকে কোনোরকমে বার হতে পারলে তিনি বাঁচেন।—

'না-না! অনর্থক রাত করে লাভ কী?'

দরকারের চেয়েও কড়া হয়ে গেল কথাটা। মনের আলোড়ন চাপবার চেষ্টায় তাঁর খেয়ালও নেই যে অকারণে সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন তিনি। বিরসার স্ত্রীর চিৎকার, এতগুলো লোকের 'আদাব', 'সেলাম', 'প্রণাম', 'নমস্তে'র ঘটা কিছুই কানে যাচ্ছে না তাঁর। পুরণ সিং-এর কথাটাই সারা মন জুড়ে রয়েছে। অন্ধকারে সাইকেলের সম্মুখের তিন-চার হাতের বেশি দূরের কোনো জিনিস দেখা যায় না। একরকম আন্দাজে সাইকেল চালানো। খানা-ডোবায় ভরা গ্রামের রাস্তায় অনবরত হোঁচট খাচ্ছেন। একেবারে প্রাণ হাতে করে চলা। তবু তিনি জোরে জোরে সাইকেল চালাচ্ছেন। দুঃসহ ভোখরাহা গ্রামটাকে তিনি তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে চান। তারপর না-হয় সাইকেলের গতি কমিয়ে দেবেন। পুরণ সিং তাঁর জীবনটাকে দুর্বহ করে তুলেছে। পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার কোন্‌দিন তার আদরের দুলালকে দেখতে না চলে আসে হুট করে। এলে নিশ্চয়ই বিরসা মাঝির কেসটা সম্বন্ধেও খোঁজখবর নিয়ে যাবে; একটু সতর্ক থাকা দরকার। শোনা গিয়েছিল পুরণ সিংকে তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হবে।—এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেল কী করে? কী পরমায়ু বুড়োটার। মরেও না! ওর দলের লোকেই ওকে খুন করতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা এখনও ফেরার রয়েছে, তারা কি আবার একবার ওকে মারবার চেষ্টা করবে না? সুযোগ-সুবিধে পেলে করবে ঠিকই। এবার থেকে সে আর সহদেও সিং পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে থানার দারোগার বিরুদ্ধে কতরকম খবর দেবে, তার ঠিক কী! কিন্তু তাই বলে কি চোর-ডাকাতের মন জুগিয়ে চলতে হবে না কি? তেমন বান্দা রামভরোসা দারোগাকে পাওনি। একবার বাগে পেলে হয় পুরণ সিংকে! তার বিরুদ্ধে কিছু পেলে তিনি ছাড়বেন না! নিচে থেকে জোর কলমে লিখে চালান তো করে দেবেন সদরে; তারপর ওপরওয়ালারা যা ইচ্ছা হয় করুকগে! এ থানা থেকে বদলি হবার আগেই তিনি একবার পুরণ সিংকে দেখে নেবেন।

এ কী! হঠাৎ খেয়াল হল। এতদূর এসে পড়েছেন! রাজপুতটোলার ইঁদারাটাই হবে বোধ হয়! অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না—এক হাঁটু পাঁক রাস্তার ওপর। ডান দিকের অপরিসর শুকনো জায়গাটার ওপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হবে। সাদা-কাপড়-পরা কে যেন সম্মুখে!—দু'জন স্ত্রীলোক—কলসী নিয়ে!—তিনি আগে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাননি। স্ত্রীলোক দু'টির ওখান থেকে সরে যাবার উপায় নেই আর। তিনি এক ঝাঁকি দিয়ে আচমকা বাঁ-দিকে সাইকেল ঘোরালেন। ইঁদারাটার বাঁ-দিক দিয়ে তিনি চলে যেতে চান।

মুহূর্তের মধ্যে কী যেন হয়ে গেল—অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না—কিসের সঙ্গে যেন জোরে ধাক্কা লাগল সাইকেলের। ছিটকে পড়ে গেলেন দারোগাজী সাইকেল থেকে। আরও কী একটা যেন ছিটকে পড়ল মাটিতে। ভারী জিনিস! মানুষ!—

'বাপরে বাপ! মেরে ফেলল রে!'

লোকটা পরিত্রাহি চিৎকার করছে। পূরণ সিংয়ের গলা! আলো নিয়ে কে একজন ছুটে আসছে।—আরও একজন স্ত্রীলোক ছুটে এল!—আরও একজন। চেঁচামেচি।—হট্টগোল। পাড়ার মেয়েরা ভয় পেয়েছে—পূরণ সিংকে দলের লোকেরা আবার জখম করল নাকি?—রাজপুতটোলার পুরুষ-মানুষরা ফিরছিল বিরসা মাঝির বাড়ি থেকে। তারা দূর থেকে সাড়া দিচ্ছে। আসছি, আসছি।—তাদেরই মধ্যে থেকে কেউ বুঝি একটা খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিল। গ্রামে ডাকাত পড়লে এই করাই নিয়ম; দূর গ্রামের লোকেরা জানতে পারে; সারা গ্রাম আলো হয়ে যায়! রাজপুতটোলার লোকদের লাঠির জোর আছে—ডাকাতকে ভয় পায় না! তারা ছুটে আসছে লাঠি বাগিয়ে। ভর সন্ধ্যেবেলা—দারোগা কনস্টেবল গ্রামে—এরই মধ্যে এসেছে পূরণ সিংকে মারতে! —বুকের পাটা কম নয়! তারা যখন এসে পৌঁছল তখন দারোগাজী বুড়ো পূরণ সিংকে কোলপাঁজা করে তুলে, দড়ির খাটিয়াখানার ওপর আবার শুইয়ে দিচ্ছেন। আঘাত গুরুতর নয় তাই রক্ষা। নইলে রাজপুতটোলা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া শক্ত হত।

—কী করে এ জিনিস সম্ভব হল? সেই কুড়ুলখানার মতো তাঁর সাইকেলখানাও কি মনিবের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করল নাকি? কে জানে! ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

—অনেক রাত্রিতে যখন রামভরোসা দারোগা বাড়ি ফিরলেন, তখন তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে, বিরসা মাঝির কেসটাতে আকস্মিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেবেন।

## চরণদাস এম. এল. এ.

মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া নাম চরণ দাস। একসময় লোকে ভালবেসে ডাকত চরণদাসজী বলে। পরিস্থিতি বদলেছে। আজকাল সরকারী দপ্তরে তাঁর নাম শ্রীচরণ দাস, এম-এল-এ। সাধারণ লোকের মধ্যে যারা নিজেদের ইংরাজী জানা ভাবে, তারা আজকাল ডাকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব বলে; আর যাদের ইংরাজী জানবার কোনরকম দাবি নেই তারা ডাকে মায়লে-জী বলে। এই উচ্চারণ-বিকৃতি কোনরকম দুরভিসন্ধিজাত নয়।

সেই মায়লেজী এসেছেন তাঁর পুরনো অফিসে। পার্টি অফিস। তাঁর সেকালকার কর্মকেন্দ্র। বছর চারেক পরে এই এলেন স্টেশন থেকে, রিক্শাতে করে।

ফ্যাসাদ! লটারির টিকিট না কিনলে লটারিতে টাকা পাবার উপায় নেই, ভোটে না দাঁড়ালে এম-এল-এ হবার উপায় নেই!

আর এম-এল-এ না হতে পারলে? সে কথা বলে কাজ কী!

যখন পেঁছিলেন তখন সবে ভোর হয়েছে।

'নমস্তে লখনলালজী!'

'আরে! ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব যে! নমস্তে!'

'সব ভাল তো?'

'হাঁ। আপনার কুশল বলুন! একেবারে কোন খবর না দিয়ে যে!'

'এই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে।'

'তা বেশ করেছেন। আসাই তো উচিত। 'হায়-কমান্ড' হুড়ো দিয়েছে বুঝি?'

এম-এল-এ সাহেব এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। লখনলাল ধরেছে ঠিকই। 'হাইকম্যাণ্ড' নামের এক খামখেয়ালী, সর্বপ্রতাপশালী ভগবানকে তিনি ভয় করেন। সেই 'হাইকম্যাণ্ড' নাকি বলেছেন যে আসল ভগবান হচ্ছেন ভোটার। নারায়ণের চেয়েও বড়, নরনারায়ণ। ভোটারদের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক কম তাঁকে নাকি আসছে বার আর এম-এল-এ করা হবে না। শুনেই ছুটে এসেছেন তিনি নকল ভগবান ছেড়ে আসল ভগবানের শরণে। লখনলাল একসময় ছিল তাঁর শাগরেদ; এখন প্রতি মাসে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশটা করে টাকা নেয় এবং প্রতিদিন তাঁর ইয়েমিয়েলিয়েগিরি ঘোচাবার হুমকি দেখায়। তাঁর অপরাধ তিনি দশ-বারো বছর থেকে সপরিবারে রাজধানীতে থাকেন; এখানে আসেন কম। এখানকার যেসব কর্মীদের তিনি একসময় নিজ হাতে গড়েপিটে মানুষ করে তুলেছিলেন, তাদের সবগুলোর আজ পাখা গজিয়েছে। সবগুলোর ওই একই ধুয়ো—তিনি নাকি এম-এল-এ হবার পর থেকে এখানকার ভোটারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। এরা সবাই মাসে বিশদিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রাজধানীতে 'এম-এল-এ কোয়ার্টার্স''-এ তাঁর অন্ন ধ্বংস করে, হাইকোর্টে নিজেদের মোকদ্দমা তদ্বির করে, আর সরকারী দপ্তর থেকে নানারকম অন্যান্য সুবিধে পাইয়ে দেবার জন্যে তাঁকে জ্বালিয়ে মারে। এর পরিবর্তে পান থেকে চুন খসলে শাসানি তাঁর প্রাপ্য! তাদের মন জুগিয়ে চলতে হয় তাঁকে অষ্টপ্রহর! ঘেন্না ধরে গেল একেবারে! কিন্তু উপায় কি!

এরই নাম পরিস্থিতি। তাঁদের অভিধানের সবচেয়ে বহুল-ব্যবহৃত শব্দ। মত বদলাবার অজুহাত হিসেবে কাজে লাগে কিনা কথাটা।

ঝোলা আর কম্বলটা রিকশা থেকে নামিয়ে, রিকশাওয়ালাকে আট আনা পয়সা দিতেই সে 'জয় গুরু' বলে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। লখনলালজী হাসছেন।

'আর চার আনা পয়সা দিয়ে দেন ওকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব। আজকাল বারো আনা করে রেট হয়ে গিয়েছে। আপনি সেই চার বছর আগেকার রেট্‌ই জানেন কিনা।'

অপ্রস্তুত হয়ে এম-এল-এ সাহেব আর চার আনা পয়সা বার করে দিলেন। পয়সা নিয়ে রিকশাওয়ালা 'জয় গুরু' বলে চলে গেল।

লখনলাল তাঁর ঝোলা আর কম্বল তুলে নিয়ে ঘরে রাখতে যাচ্ছিল।

'আহা করেন কী লখনলালজী! ভারী তো জিনিস।'

এম-এল-এ সাহেব তার হাত থেকে নিজের জিনিসগুলো কেড়ে নিয়ে, ঘরের মধ্যে রাখলেন।

'জন-সম্পর্ক' বাড়াবার প্রোগ্রামে আসবার সময় হোল্ড-অল্ আর স্যুটকেস না এনে ঠিকই করেছেন ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব।'

তার চোখে দুষ্টুমির হাসি। সে বোঝে সব। সাধে কি আর তাকে মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়।

'যে কাজে এসেছি সে কাজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকজনের সম্মুখে আমাকে বারবার এম-এল-এ সাহেব বলে না ডাকাই ভাল, তাই না? আপনাদের কাছে তো আমি সেই পুরনো চরণ দাসই আছি এখনও।'

'শুধু চরণ দাস নয়। আপনি এখন এসেছেন ভোটারদের চরণে আশ্রয় নেবার জন্যে। আপনার নাম এখন হওয়া উচিত ভোটার-চরণ-দাস। বোলো একবার ভোটার-চরণ দাসজীকী জয়!'

চিৎকারে আর উচ্চহাসিতে ঘরের সকলের ঘুম ভাঙ্গল। কে একজন যেন 'জয় গুরু' বলে চোখের পাতা খুলল। পাশের বালিশে লোকটি তার মুখ চেপে ধরেছে—'আমাদের সেক্যুলার সংবিধান'—এই কথা বলে হাসতে হাসতে।

বচ্কন্ মহতো লাফিয়ে উঠেছে খাটিয়া ছেড়ে।

'আরে মায়লেজী যে! নমস্তে! কখন? কবে? কোথায় উঠেছেন? সার্কিট হাউসে না ডাকবাংলায়?'

চরণ দাস ঠিক করে রেখেছেন যে এখানে কারও কথায় বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। এদের বলার উদ্দেশ্য যে তিনি এখানে কখনও এসে ওঠেননি গত কয়েক বছরের মধ্যে। দু'বার মন্ত্রীদের সঙ্গে এসেছিলেন দু'দিনের জন্যে; তখন উঠেছিলেন সার্কিট হাউস-এ। সেই খোঁটাই বোধহয় এরা দিচ্ছে এখন।

বললে, 'এখানেই এসে উঠলাম।'

'কেন? বাড়ী ভাড়া আদায় করতে নাকি?'

খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে জানে না এরা। তাঁর এখানকার পৈতৃক বসতবাড়ীটা তিনি গবর্নমেণ্টকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক হল। এখানকার লোকে ভাল চোখে দেখেনি জিনিসটাকে। কোন জিনিস তলিয়ে দেখে না এরা। রাজধানীতে পরিবার নিয়ে থাকেন; ছেলেমেয়েরা সেখানকার স্কুল-কলেজে ভরতি হয়েছে। যা আয় তাতে দু'জায়গায় বাড়ীর খরচ চালানো শক্ত, সেইজন্যে এখানকার বাড়ী গভর্নমেণ্টকে ভাড়া দিয়ে দিতে হয়েছে। এই সামান্য কথাটা বুঝবে না এরা।

'না, এমনি আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে এলাম।'

'ক' দিনের প্রোগ্রাম মায়লেজীর?'

'দেখি তো।'

'এক আধদিনের বেশী কি আর থাকতে পারবেন এখানে!'

'কি যে বলেন!'

ব্যথা পান এম-এল-এ সাহেব। এরা ভাবে তিনি ইচ্ছে করে এখানে আসেন না। ভুল ধারণা। ইচ্ছে থাকে, কিন্তু হয়ে ওঠে না। কতবার ঠিক করেছেন আসবেন; কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে পড়ায় হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া অন্য কথাও আছে এর মধ্যে। বারো বছর বড় শহরে থাকবার পর ছেলেমেয়েরা আর এখানে ফিরে আসতে চায় না। ছোটছেলেটার জন্ম রাজধানীতে; এখানকার শেয়ালের ডাকে রাত্রিতে ভয় করবে, এই হচ্ছে তার মায়ের ধারণা। স্ত্রীর পুরনো

অম্বলের ব্যাধিটাও রাজধানীতে গিয়ে সেরেছে। এইসব নানা কারণে মিলিয়ে এখানে আসা হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে তাঁর আশ্চর্য লাগে যে সেখানকার শহুরে সমাজের বন্ধুবান্ধবরা আজও তাঁকে পাড়াগেঁয়ে ভাবে, আর এখানকার লোকে অপবাদ দেয় যে তিনি আচারে-ব্যবহারে সম্পূর্ণ শহুরে হয়ে গিয়েছেন ; তাঁর দশ বছরের মেয়েটার পর্যন্ত রাজধানীতে জন্মাবার অধিকারে, বান্ধবীদের সম্মুখে বাবার গ্রাম্য আচরণে, লজ্জা লজ্জা করে।

'আচ্ছা, পরে সব কথা হবে ; এখন মুখ হাত ধুয়ে নিন, মায়লেজী। দাঁতন তো আপনার দরকার নেই ?'

প্রশ্নের উত্তর দিল লখনলাল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁতনের দরকার বইকি। উনি মাজবার ব্রুশ আনলেও এখানে ব্যবহার করবেন না। এ-যাত্রায় উনি একেবারে পুরনো চরণদাসজী সেজেছেন। নিছক ভোটার-চরণ-দাসজী।'

বাগে পেলে, রেখে ঢেকে কথা বলতে এরা জানে না। বাধ্য হয়ে এ রসিকতায় এম-এল-এ সাহেবকেও হাসতে হয় এদের সঙ্গে সঙ্গে।

'আচ্ছা আমি আসছি একটু এদিক ওদিক ঘুরে।'

দাঁতন নিয়ে খালি গায়ে খালি পায়ে তিনি বার হলেন অফিস থেকে।

বচ্‌কন্‌ মহতো রসিকতা করে—'আরম্ভ হয়ে গেল মায়লেজীর জনসম্পর্ক স্থাপনার প্রোগ্রাম।'

লখনলালজী ফোড়ন দেয়—'সে তো আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বোলো একবার ভোটার-চরণ-দাসজী কী জয়।'

ভোরবেলায় দাঁতন করতে করতে এম-এল-এ সাহেব পাড়ার লোকজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ সহজভাবে মেলামেশা করে নিতে চান। ইচ্ছে করলেও কি এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা যায়। নাড়ীর টান যে। গায়ের ময়লা নয় যে ইচ্ছে হলেই জলে ফেলে দেবে !

ও কে আসছে—সুন্‌রা না ? খুব হন হন করে চলছে সে।

'নমস্তে সুন্দরলালজী।'

'জয় গুরু ! আরে আপনি ! আমি চিনতেই পারিনি।'

'খবর সব ভাল ত ?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা চলি। জয় গুরু !'

তেমনি হন হন করেই সুন্‌রা চলে গেল। ব্যস্ত এবং অন্যমনস্ক ভাব তার। এম-এল-এ সাহেব ভেবেছিলেন যে তার কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নেবেন পাড়ায় এখন কে অসুস্থ আছে। তারপর কিছু ভাল পথ্য কিনে নিয়ে অন্য সময় রুগীর বাড়ীতে যাবেন। কিন্তু কথা বলবার সুযোগ পাওয়া গেল না সুন্‌রার সঙ্গে, একটু ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। ঠিক এরকমটা আশা করেন নি। লখনলালের দল রাজধানীতে তাঁর কাছে প্রায়ই বলত যে এখানকার পরিস্থিতি বদলেছে ; রাজনীতিক মিটিং-এ লোকজন হয় না ; লীডাররা গেলে তাঁদের মালার জন্য গৃহস্থবাড়ী থেকে গাঁদা ফুল পাওয়া পর্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এসব কথা বিশ্বাস করতেন না ; ভাবতেন লখনলালরা বোধহয় তাঁকে মোচড় দিয়ে আরও কিছু বেশী টাকা আদায় করতে চায়। সুন্‌রার এখনকার হাবভাবে মনে হ'ল যে কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকতেও পারে।

একটা ছোট ছেলে ছুটছে। মনে মনে ঠিক করা ছিল যে ছোট ছেলে দেখলেই

গাল টিপে আদর করবেন ; আর তার চেয়ে ছোট হলে কোলে নিয়ে লজেনস্ খেতে দেবেন। পকেট ভরতি করে তিনি লজেনস্ টফি নিয়েছেন। হেসে ছেলেটাকে ডাকলেন। সে ফিরেও তাকাল না। ছুটে চলেছে রাস্তা ধরে। একটু হতাশ হলেন।

বারো বছরের অনভ্যাসে, পথের ধুলো-কাঁকরের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। কাঁটার ভয়ে, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোর ভয়ে, একটু সাবধান হয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। আগেকার জীবনের খালি পায়ে চলাফেরার সেই সাবলীলতা আর ফিরে আসবার নয়। 'হুক্-ওঅর্ম'-এর ভয় সেকালে কখনও হয়নি। নিজের অজ্ঞাতে কখন থেকে যেন নাকে কাপড় দিয়ে চলছিলেন। লোটা হাতে একজনকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিলেন। বিরসা আসছে এগিয়ে। তাঁকে চেনবার চেষ্টা করল ; অন্তত চাউনি দেখে তাই মনে হয়। বিড়বিড় করে কি একটা স্তোত্র বলছে সে।

'নমস্তে বৃহস্পতিজী !'

'জয় গুরু ! মাস্‌লেজী ? আমি চিনতেই পারছিলাম না। খালি গায়ে খালি পায়ে আপনাকে দেখব ভাবিনি কি না।'

'খবর ভাল ত সব ?'

'হ্যাঁ ! আচ্ছা এখন আসি ! জয় গুরু !'

বিড় বিড় করে স্তোত্রপাঠ করতে করতে সে চলে গেল। অল্পেতে মুষড়ে পড়বার লোক তিনি নন। তবু বর্তমান পরিস্থিতির খারাপ দিকটা মনে না এনে পারলেন না। এখানকার লোকে তাঁকে চিরকাল কত ভালবাসত। আগেকার জীবনে সেইটাই ছিল তাঁর পুঁজি। পরের জীবনটুকু ভেবেছিলেন সেই পুঁজি ভাঙ্গিয়েই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর বোধহয় তাঁর কপালে নেই ! সন্দেহ হল, লখনলালজীরাই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যে প্রচার করেনি তো, এখানকার লোকজনের মধ্যে ? কিছু বলা যায় না। তার নিজেরই ইচ্ছে থাকতে পারে এই নির্বাচনক্ষেত্র থেকে এম-এল-এ-র জন্যে দাঁড়াবার ! হাইকম্যাণ্ডের কাছেও চুপি চুপি তাঁর বিরুদ্ধে লাগায় নি তো কিছু ? ভগবান জানেন !

একজন বর্ষীয়সী মহিলা হাতে একটা পাতার ঠোঙ্গায় কি যেন নিয়ে ধানের ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে চলেছেন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে।

চরণদাসজী চশমাটা খুলে রেখে এসেছেন ; তাই দূরের জিনিস দেখতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। তিরথোর মা বলেই মনে হচ্ছে যেন ওঁকে। হ্যাঁ ঠিকই তাই।

'ও চাচী ! কোথায় এই সকালে এত তাড়াতাড়ি ?'

বৃদ্ধাটি মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

'ও চাচী ! তীর্থানন্দের খবর ভাল তো ? নাতিপুতিরা সব ভাল তো ? চিনতে পারছেন না ? আমি চরণা।'

কী বুঝলেন, না বুঝলেন তিনিই জানেন। দেখা গেল তাঁর গতি দ্রুততর হয়েছে। পাটের ক্ষেতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে ফুলের সাজি হাতে করে একটি মহিলা 'জয় গুরু' বলে তাঁকে অভিবাদন করায় তিনিও 'জয় গুরু' বলে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালেন। কি যেন কথা হ'ল। দু'জনেই একবার চরণদাসজীর দিকে তাকালেন। তারপর দু'জনেই একই পথে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে সত্যই চিন্তান্বিত হলেন এম-এল-এ সাহেব। জনসম্পর্ক স্থাপনার কাজটা যত সহজ ভেবেছিলেন, তত সহজ নয়।

লাঠিতে ভর দিয়ে চথুরি চলেছে। সে এমনিতেই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক চিরকাল। একটু ইতস্ততঃ করে তাকে ডাকলেন তিনি। ছেলেবেলায় লোকটা তাঁদের বাড়ির মোষ চরাত। সে দাঁড়াল—একটু অবাক হয়ে।

'জয় গুরু! ও আপনি! চিনতে পারিনি। রাজধানীর জল দেখছি খুব ভাল। গুরুদেবের কৃপায় আপনার গায়ে বেশ মাংস লেগেছে। লাগবারই তো কথা। ভোরে উঠে দাঁতন করতে করতে খালি পায়ে বেড়াবার পুরনো অভ্যেস এখনও আপনি রেখেছেন দেখছি। সেও ভাল।'

'আরে চথুরি, মানুষ কি আর বদলায়। যে যেমন ছিল তেমনি থাকে।'

'এ কী কথা বলছেন আপনি মায়লেজী। মানুষ বদলায় না? কত রত্নাকর ডাকাত বদলে মুনি-ঋষি হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, সেই রকম গুরুর মত গুরুর কৃপা চাই। এ কথা আমার গুরুদেবের মুখে কতদিন শুনেছি। আমাদের গুরুদেব তো মানুষ নন—তিনি দেবতা—ঠাকুর—ভগবান! জয় গুরু!'

লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে সে চলে গেল, তাঁকে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে। বোঝা গেল যে গল্প করে নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে তখন নেই। সে দাঁড়িয়েছিল শুধু একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। মানুষ যে বদলায় সে কথা আর এম-এল-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আর যিনি চথুরির মুখে গুরুমাহাত্ম্যের বুলি ফোটাতে পারেন, তিনি যে মূককে বাচাল ও পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি।

আরও যে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হ'ল, সকলেরই হাবভাব এই একই ধরনের। সকলেই ব্যস্ত। কেউ তাঁকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। নিজের সুখদুঃখের কথা, দেশের অবস্থার কথা, পৃথিবীর রাজনীতির কথা, রকেট, অ্যাটম, বোমা, আবহাওয়া, ফসলের অবস্থা—প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপর কোন কথা কেউ তোলেনি। গালাগাল পর্যন্ত কেউ দিল না। কারও কি কিছু চাইবার নেই?—ছেলের চাকরি, 'বাস' চালাবার অনুমতিপত্র, রাস্তার মাটি ফেলবার ঠিকা, সরকারী লোন, সিমেণ্ট, বন্দুকের লাইসেন্স, মেয়ের বৃত্তি? 'ইলেকশন'-এর বছরে নির্বাচন প্রার্থীর কাছ থেকে কিছুই চাইবার নেই? ঠিক করে যে যা চাইবে তাকেই সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে একখানা করে সুপারিশের চিঠি দেবেন, আর আশ্বাস দেবেন প্রাণপণে চেষ্টা করবার। কেউ কিছু চায়নি। তবে কি এরা সবাই বুঝে গিয়েছে যে, তাঁর চিঠিতে সরকারী মহলে কোন ফল হয় না! যাঁদের কাছে তিনি চিঠি দেন তাঁদের সকলের কাছে আগে থেকে বলা আছে যে এসব সুপারিশপত্রের ওপর কোন গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। তাঁর এই চালাকি কি এরা ধরে ফেলেছে? লোকে আজকাল চালাক হয়ে উঠছে। সকলে জেনে গিয়েছে যে সরকারী অফিসাররাও আজকাল এম-এল-এ'দের কথায় কোন গুরুত্ব দেয় না। আশকারা পাচ্ছে ওপর থেকে? গত কয়বছরের মধ্যে সত্যিই এখানকার জীবনের স্বাভাবিক মন্থর গতি, আগেকার তুলনায় দ্রুততর হয়েছে। কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। এইটুকুই আশার কথা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল সম্বন্ধে যারা সন্দিগ্ধ তাদের সম্মুখে সুবিধেমত এই দৃষ্টান্তটা তুলে ধরতে হবে, ভোটের মরশুমের বক্তৃতায়।

নিজের জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্রের লোকজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক অভ্যর্থনা আশানুরূপ না হওয়ায়, একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি অফিসে ফিরে এলেন। নিজের দুশ্চিন্তার কথাটা মুখ ফুটে বলতে বাধে অফিসের কর্মীদের কাছে। না বলতেই বুঝে নিয়েছে, এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লখনলাল আর বচ্‌কন্‌ মহতো।

'ঘাবড়াবার দরকার নাই ইয়েমিয়েলি সাহাব। সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে। জলখাবার খাওয়ার সময় সবাই মিলে বসে কেমনভাবে এগুতে হবে তারই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলতে হবে। আপনি শুধু বার্কারদের (ওয়ার্কার) ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

'আর একটা কথা মায়লেজী—আসরে নেমে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করবেন না। তাহলে আসছে বছর ভূতপূর্ব মায়লে হয়ে যাবেন নির্ঘাত দেখে নেবেন!'

এদের সব কথা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

সেকালকার মত সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি ছোলাভাজা, চিঁড়াভাজা ও পিঁয়াজের বড়ার জলখাবার খেতে বসলেন। আজ তিনি উদার হস্ত; জলখাবারের খরচটা আজ তাঁরই। আরম্ভ হয়ে গেল, খোশগল্পের মধ্যে দিয়ে কাজের কথা।

ভোটার। ভোটার। ভোটার। কেবল ভোটারদের কথা। কটর্‌ মটর করে ছোলা চিবুবার শব্দ এই গল্পের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলেছে। সাব্যস্ত হয়ে গেল—পাবলিক অবুঝ, জনতা খামখেয়ালী, জনসাধারণ নিমকহারাম। ভোটারদের তালিকায় যাদের নাম আছে তারা শুধু মানুষ; বাকি সকলে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছে অন্যায়ভাবে!

স্ত্রী-ভোটারদের লখনলালজী বলে ভোটারী। এই ভোটারীদের নিয়ে তুমুল মতদ্বৈধ বাধল লখনলাল আর বচ্‌কন্‌ মহতোর মধ্যে। বোঝা গেল, জনসম্পর্ক বাড়াবার কার্যপ্রণালী স্থির করবার পথেও বাধা প্রচুর।

এম-এল-এ-সাহেবের ধৈর্যের পুঁজি তার চেয়েও বেশী। কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে তিনি বললেন—

"মোষের গলার ঘণ্টার এই আওয়াজটা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বহু বড় বড় আবিষ্কারের সূচনা ঘটেছিল দৈবক্রমে। এখানকার ভোটার ভোটারীদের মনের চাবিকাঠির সন্ধানও পাওয়া গেল এই অবান্তর প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

"মোষের গলার ঘণ্টার আওয়াজ? বলছেন কী আপনি! দশ বছর রাজধানীতে থেকে আপনি একেবারে পরদেশী হয়ে গিয়েছেন। এ যে কাঁসার ঘন্টার শব্দ ভাল করে শুনুন। বুঝতে পারছেন না?"

"হ্যাঁ, এইবার বুঝতে পারছি। আপনাদের চেঁচামেচির মধ্যে আগে এত ভাল করে শুনতে পাইনি। পুজোটুজো আছে নাকি কোথাও?"

'তা জানেন না?'

'এর কথাই তো আপনাকে বলে আসছি তিন বছর থেকে।'

'সকালের আরতি।'

'অষ্টপ্রহর মচ্ছব। সকাল বিকেল নেই এর মধ্যে।'

'প্র্যাকটিশ বেশ জমিয়ে নিয়েছেন স্বামীজী তিন বছরের মধ্যে।'

যাঁকে দশজনে ভক্তি করে, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক নয়।'

'ঠাট্টা করছি কই? যাঁর গা দিয়ে ভক্তরা জ্যোতি বার হতে দেখে, তাঁকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করতে পারি?'

'তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকেন, দরজা জানলা বন্ধ করে।'

'আর ওপরের গবাক্ষ দিয়ে ধোঁয়া বার হয়।'

'গোলমেলে ধোঁয়া নয়। নির্দোষ ধোঁয়া। অম্বুরী তামাকের গন্ধওয়ালা ধোঁয়া।'

'ভক্তরা সেই ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেবার জন্যে বাইরে কাতারে কাতারে বসে থাকে।'

'সুগন্ধি রেচক ও কুম্ভক। যোগ-সাধনার সৌরভ।'

সহকর্মীদের মধ্যে এই সব কথা-কাটাকাটি চলে অনেকক্ষণ। এম-এল-এ সাহেব একটাও কথা বলেননি এর মধ্যে। শুধু শুনেছেন ও পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করছেন।

সব শুনে মনে হল, এতদিন সহকর্মীরা এখানকার সম্বন্ধে যেসব খবর দিয়েছিল, সেগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। জগদগুরু শ্রীসহস্রানন্দ স্বামী বছর তিনেক থেকে এখানে আশ্রম খুলে বসেছেন। তিনি সিদ্ধ-পুরুষ এবং এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এই জন্যেই সকলে উঠতে বসতে 'জয় গুরু' বলে, এই জন্যেই রাজনৈতিক দলের নেতারা এখানে এসে ফুলের মালা পান না; এই জন্যেই খানিক আগে সকলে তাঁর আশ্রমের দিকে ছুটেছিল। জিলিপির লোভে ছুটেছিল ছেলেপিলেরা, গুরুদেবের দর্শন পাবার লোভে ছুটেছিল বয়স্করা। আশ্রমে দুপুরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয় আর সন্ধ্যেবেলায় হয় কীর্তন। স্বামীজী নিজের সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। তিনি ফল-মূল ছাড়া আর কিছু খান না, এবং টাকা-পয়সা স্পর্শ করেন না। তাঁর নামে সবাই পাগল এবং তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারেন না এমন লোক এখানে নেই। তিনি ছুঁলে রোগ সেরে যায়। তাঁর বাকসিদ্ধির খ্যাতি অন্য জেলাতেও নাকি পোঁছেছে। এ ছাড়া সিদ্ধ-পুরুষের অন্যান্য বিভূতিও তাঁর আছে!

এইসব জ্ঞাতব্য তথ্য একত্র করবার পর চরণদাসজী বসলেন সহকর্মীদের সঙ্গে ভোটারদের স্বপক্ষে টানবার কৌশল ঠিক করবার জন্যে। হঠাৎ জমাট আলোচনায় বাধা পড়ল।

'আসুন মৌলবী-সাহেব।'

'আদাব! আদাব ভাইসাহেব!'

এখানে এই প্রথম লোকের সঙ্গে দেখা হল, যিনি 'জয় গুরু' বললেন না। একটু আশ্বস্ত হলেন চরণদাসজী।

বেশ ভারিক্কে গোছের দাড়ি-সম্বলিত, ভারিক্কে প্রকৃতির লোক মৌলবীসাহেব। চাকরি করেন। এখানে বদলি হয়ে এসেছেন কিছুদিন আগে। থাকেন মৌলবী টোলা নামক পাড়ায়। এখন তিনি এখানে এসেছেন, সামান্য একটু কষ্ট দেবার জন্যে পার্টি অফিসের লোকজনদের।

মৌলবীসাহেবের হাবভাব কথাবার্তা বেশ কেতাদুরস্ত! অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে পার্টি অফিসের লোকজনদের সময়ের মূল্য তিনি জানেন। সেই বহুমূল্য সময় নষ্টের হেতু হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন তিনি সরকারী চাকরির কল্যাণে। তিনি এসেছেন সরকারী লোক-গণনার কাজে।

'না না, চিঁড়েভাজা আনবার দরকার নেই। আপনারা খান। সকালে নাস্তা করে তবে আমি বেরিয়েছি বাসা থেকে।'

এখানকার অফিসের স্থায়ী লোকজনের নাম-ধাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বেশ গুছিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে প্রত্যেক ব্যক্তির খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে ছাপা 'ফর্ম'গুলো ভরলেন। কাজের শৃঙ্খলা আছে তাঁর।

তারপর-এম-এল-এ সাহেবকে অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'হুজুরের নামও কি এখান থেকেই লেখা হবে?'

অতি নির্দোষ প্রশ্ন, কিন্তু চরণদাস এম-এল-এ-র মনের এক অতি স্পর্শাতুর জায়গায় আঘাত লাগে। সহকর্মীদের সহস্র বিদ্রূপ তিনি সহ্য করতে রাজী আছেন, কিন্তু সরকারী কর্মচারীর ধৃষ্টতা বরদাস্ত করবার পাত্র তিনি নন।

'এখানে লেখা হবে না তো, আবার কোথা থেকে লেখা হবে!'

'আপনি এখন আর এখানে থাকেন না তো; সেইজন্য জিজ্ঞাসা করলাম হুজুরের কাছে!'

'আমার ঘর-বাড়ি সব এখানে। আমি এখানকার বাসিন্দা নই?'

'আপনার বাড়িটা ভাড়া দিয়েছেন কিনা; তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কথাটা।'

'বসতবাড়ি ভাড়া দিয়েছি বলে ভোটারতালিকায় নাম থাকবে না আমার?'

'গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর; ভোটার-তালিকার সঙ্গে আদমসুমারির কোন সম্বন্ধ নেই।'

'আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে! আইনচঞ্চুমশাই, এবার থামুন আপনি! সরকারী নিয়ম-কানুন আর শেখাতে হবে না আমাকে, আপনার!'

'তোবা! তোবা! হুজরকে কানুন শেখাব আমি? আমরা হুকুমের চাকর মাত্র; আপনারাই তো কানুন তৈরী করেন। আপনি যদি এখানকার সুমারির মধ্যে নাম দিতে চান, তবে তাই হবে। যেখানে ইচ্ছে আপনি নাম দিতে পারেন।'

এম-এল-এ সাহেবের মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগে। মৌলবীসাহেবটি তাঁর রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর দলের লোক নয়তো!

'তবে এতক্ষণে এত আইন-কানুন ঝাড়ছিলেন কেন! তিন পয়সা মাইনের চাকরি, আর লম্বা লম্বা কথা!'

'আপনি গণ্যমান্য ব্যক্তি। ভদ্রলোকের ভাষায় কথা বলা উচিত আপনার!'

'মুখ সামলে কথা বল বলছি! আমাকে অভদ্র বলা! এখানকার সেন্সাস অফিসার কে? তোমার চাকরি আমি খাব—এই বলে রাখলাম। সরকারী মহলে সে প্রতিপত্তিটুকু আমি রাখি, বুঝলে!'

'সব বুঝেছি; আর বোঝাতে হবে না। এখন বলুন আপনার নাম!'

কলম হাতে নিয়ে 'ফর্ম' সম্মুখে রেখে, উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন মৌলবী-সাহেব। এম-এল-এ সাহেব নিরুত্তর, লোকটির ধৃষ্টতা দেখে। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করছে—যেন জানে না।

'জীবিকা?'

এম-এল-এ নিরুত্তর।

'বিবাহিত না অবিবাহিত?'

উত্তর দিলেন না চরণদাসজী।

'বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নাকি? বৈজ্ঞানিকদের আলাদা কাজ আছে।'

আর থাকতে পারলেন না চরণদাস এম-এল-এ।

'বেয়াদব লোকদের বৈজ্ঞানিকভাবে মেরে শায়েস্তা করতে আমি বিশেষজ্ঞ।'

আস্তিন গুটিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দলের লোকেরা তাঁকে ধরে ফেলল।

মৌলবীসাহেব ধীর কণ্ঠে উপস্থিত অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ইনি আমার লোকগণনার কাজ অসম্ভব করে তুলেছেন; অপমান করেছেন; মারধরের হুমকি দেখিয়েছেন; চাকরী খাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন। শুধু নামধাম বলতেই অস্বীকার করেননি—একজন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর আইন-সঙ্গত সরকারী কাজে বাধা দিয়েছেন। আপনারা সবাই সাক্ষী। আমি আজই এঁর বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করব।'

'নালিশ দায়ের করবার হুমকি দেখায় জনসাধারণের প্রতিনিধিকে! ছাড় তোমরা, ওকে ঘাড় ধরে বার করে দিচ্ছি এখনই!'

তাঁর আস্ফালনে কান না দিয়ে সহকর্মীরা এম-এল-এ সাহেবকে জাপটে ধরে রেখেছে।

মৌলবীসাহেব ধীরেসুস্থে নিজের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চোখমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা বেশ স্পষ্ট।

এম-এল-এ সাহেবের দাপাদাপি তখনও থামেনি। ঘরের মধ্যে থেকেই তিনি চীৎকার করছেন—'ভেবেছেন আমি আপনাকে চিনিনি। পুলিসে খবর দেবো আমিও!'

লখনলাল বলে—'করছেন কি আপনি ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব! সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মেজাজ দেখাচ্ছেন। ভোটার-ভোটারীরা মনে করবে কী!'

দু'একটা চিন্তার রেখা যেন পড়ল তাঁর কপালে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দাপাদাপি সব বন্ধ হয়ে গেল। চাপা গলায় বচ্‌কন্‌ মহতোর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন—'ইলেক্‌শানটা একবার হয়ে যেতে দাও। তারপর এই মৌলবীটাকে নাকখত দিইয়ে ছাড়ব।'

তারপর আবার সকলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন ভোটারদের মন পাবার আশু উপায় সম্বন্ধে। আলোচনা যেখানে স্থগিত করা হয়েছিল, ঠিক তারপর থেকে আরম্ভ হল। অর্থাৎ গুরুদেবের প্রসঙ্গ থেকে। সর্ববাদিসম্মতভাবে স্থির হয়ে গেল যে 'স্লোগান' পালটাতে হবে। স্বামী সহস্রানন্দকে লক্ষ্য করেই এগোতে হবে অতি সতর্কতার সঙ্গে। ভোটার-চরণদাসকে হতে হবে গুরু-চরণদাস। এইবার স্নানাহারের জন্যে উঠতে হয়। লখনলালজী জয়ধ্বনি দিল—'বলো একবার গুরু-চরণদাসজীকী জয়।' সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে—Don't ঘাবড়াও গুরু-চরণদাসজী।'

বিকেলের দিকে এম-এল-এ সাহেব, লখনলাল, আর বচ্‌কন্‌ মহতো, ফলমূল, পেঁড়া, সন্দেশের ভেট নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে গিয়ে হাজির জগদ্‌গুরু শ্রীসহস্রানন্দের আশ্রমে।

আজ বোধহয় আশ্রমে কোন এক বিশেষ পর্বের দিন। গেটের দুইপাশে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। সম্মুখের রাস্তা, কম্পাউণ্ড, বারান্দা লোকে-লোকারণ্য। ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, দর্শক, প্রার্থীর ভিড় ঠেলে ঠেলে ভিতরে ঢোকা

শক্ত ! কিন্তু আনন্দ উৎসবের দিনের লোকজনের সেই প্রাণবন্ত লীলা-চাঞ্চল্য এখানে অনুপস্থিত। গুরুদেবের সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হবে বলে কি এখানে কথাবার্তা বলা বারণ ? প্রশ্নভরা চাউনি নিয়ে এম-এল-এ সাহেব তাকালেন নিজের সঙ্গীদের দিকে। লখনলালজীও তাঁরই মত বিস্মিত হয়েছে। তার কাছেও জিনিসটা অপ্রত্যাশিত। অঘটন কিছু ঘটল নাকি ? বিষাদের ছায়া ? স্বামীজী কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন ? সকলের মুখ-চোখে উৎকণ্ঠার ছাপ কেন ? আজকে এখানে আসাই বুঝি ব্যর্থ হল ! এখানকার প্রাপ্তবয়স্করা সকলেই যে তাঁর ভোটার। সকলেই তাঁর পরিচিত ; তারাও নিশ্চয়ই তাঁকে চেনে ; কারও মুখে পরিচিতির সাড়া নাই। কিছু জানবার কৌতূহলটুকুও যেন এরা হারিয়েছে। এ-রকম পীঠস্থানে কারও কাছ থেকে কোন রকম সম্মান পাবার আশা নিয়ে তিনি আসেননি। তবু হেসে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, নিরুত্তর থেকে শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকানো, এ জিনিস তাঁর কল্পনারও বাইরের। সম্মুখের এই ভদ্রলোকের মেজছেলেটা—তাঁর চেষ্টাতেই গত বছর মেডিকেল কলেজে ভরতি হতে পেরেছে। পাশেই এই যে লোকটা মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, একে দু'বছর আগে তিনি 'কণ্ট্রোল'-এর গমের দোকান পাইয়ে দিয়েছিলেন। যারা চোখ বুঁজে, হাত জোড় করে বসে রয়েছে, তারা না হয় দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এরা তো দেখতে পাচ্ছে তাঁকে। দেখেও না দেখার ভান করছে কেন এরা ? লোক চরিয়েই খান তিনি। রাজনীতিক জীবনে বহু লোকের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয় প্রত্যহ। কেউ হুঁ করবার আগেই তিনি বুঝে যান লোকটা কী বলবে। কিন্তু এখানকার এতগুলো 'ভোটার' ভোটারী'র হঠাৎ কী হল, সেইটা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারছেন না ; সবাই মিলে তাঁকে একঘরে করে, তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করবার পণ করেছে নাকি ? বোঝা যাচ্ছে না কিছু। একটা আচমকা আঘাতে এরা সকলে যেন থ হয়ে গিয়েছে। নইলে এরাও তো দেখা যাচ্ছে তাঁরই মত ফল-মূল মিষ্টির থালা সাজিয়ে এনেছিল ! কারো কারো হাতে আবার টিফিন-কেরিয়ার ! রান্না করা জিনিস নাকি ওর মধ্যে ? স্বামীজী তো শুধু ফল-মূল খান ! ওগুলো বোধহয় তাহলে তাঁর সঙ্গীদের জন্যে।

অবস্থা প্রতিকূল দেখে পিছপা হবার লোক তিনি নন। চোখ বুঁজে দরাজ গলায় 'জয় গুরুদেব' বলে চেঁচিয়ে উঠে, সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল। আচম্বিতে দৈববাণী হলেই এক বোধহয় এখানকার ঝিমিয়ে পড়া পরিবেশ এরকমভাবে হঠাৎ জেগে উঠতে পারত। মূক ভক্তবৃন্দ হঠাৎ যেন তাদের কণ্ঠস্বর আর মনের বল ফিরে পেল। সমবেত কণ্ঠস্বরে গুরুদেবের জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। 'ভোটারী'দের মিহিগলা সুর মেলাচ্ছে 'ভোটার'দের মোটা গলার সঙ্গে। জনতার উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবেশ-লাগা এই সামূহিক কণ্ঠস্বর, এম-এল-এ সাহেবের অতি পরিচিত।

নিদারুণ সংকটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভক্তবৃন্দ হঠাৎ একটা আঁকড়ে ধরবার মত ধ্বনির আশ্রয় পেয়ে বর্তে গিয়েছে।

পবন অনুকূল। ভক্তবৃন্দের সশ্রদ্ধ, সপ্রশংস-দৃষ্টি চরণদাসজী অনুভব করতে পারছেন তাঁর সর্বশরীরে। বিমল আনন্দের উদ্ভাস লেগেছে তাঁর মুখমণ্ডলে। এতক্ষণে তিনি চোখ খুললেন। সত্যিই সবাই তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

সে দৃষ্টিতে পরিচিতির আভাস আবার জেগেছে। সকলে যেন এতক্ষণে চিনতে পারল তাঁকে, এখানকার মহামান্য ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব বলে। তাদের গোষ্ঠীরই একজন। গুরু ভাই। আপনার জন। বড় ভাই। ইয়েমিয়েলিয়ে ভাইয়া। এঁর সঙ্গে প্রাণ-খুলে কথা বলা চলে।

চরণদাসজী বললেন—'জয় গুরু!'

মেডিকেল কলেজের ছাত্রটির পিতা 'জয় গুরু' বলে প্রত্যাভিবাদন করে, আরও কাছে ঘেঁষে এলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে।

চরণদাসজীরা প্রোগ্রাম করেছিলেন যে, এখানে এসেই নাটকীয়ভাবে সহস্রানন্দ স্বামীর পা জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু এখানে পেঁছিবার পর, স্বামীজীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে হতাশ হয়েছিলেন। এখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন।

ভদ্রলোকটি এম-এল-এ সাহেবকে বললেন—'ফল-মূল মিষ্টিগুলো আপনি ওই সম্মুখের বারান্দায় রেখে দিন। কোনও জিনিস গোলমাল হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সে বিষয়ে।'

'দর্শন পাওয়া যাবে না এখন ?'

'সন্দেহ। কথা আছে এর মধ্যে। শোনেননি আপনি এখনও ?'

'না তো।'

কণ্ট্রোলের দোকানধারী লোকটা এরই মধ্যে কখন যেন তাঁর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলতে পাবার লোভে।

'মায়লে-ভাই, বিপদে পড়ে আপনার কথাই আমাদের মনে পড়ছিল এতক্ষণ।'

'আমার কথা ? মায়লে আমি ঠিকই; পথের ময়লা; ড্রেনের ময়লা। অতি নগণ্য মায়লে আমি। আমাকে আপনারা স্মরণ করতে পারেন এতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আদেশ করুন। সামান্য কাঠবেড়ালিও শ্রীরামচন্দ্রজীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল। এই নগণ্য মায়লেও যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ফলাফল গুরুদেবের হাতে। জয় গুরুদেব !'

সকলে বলল, 'জয় গুরুদেব।'

তারপর মায়লে ভাই এঁদের মুখে সব শুনলেন। উৎকট পরিস্থিতি। সমূহ বিপদ। সব বুঝি যায়। ত্রিভুবন রসাতলে গেল বুঝি এইবার ! তাঁর দরকার নেই, দরকার আমাদের। নিজেদের প্রয়োজনেই আমরা ভগবানকে আঁকড়ে থাকি। নররূপ নিয়েছেন বলেই কি আমরা ভগবানকে নিয়ে যা নয় তাই করতে পারি ? আমাদের চোখের সম্মুখে ভগবানকে টেনে পাঁকে ফেলা হবে; আর আমরা তাই প্যটপ্যট করে তাকিয়ে দেখবো কেবল ? যশ, মান, ধর্ম, কর্ম, ভাল মন্দ সব কিছুরই ভার মায়লে-ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে ভেবেছিলাম পাঁচ বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকব, কিন্তু আপনি আমাদের মধ্যে থাকতে এখানে এ কী অনর্থ ! সংকটে পড়লে আমরা সকলে গুরুদেবের স্মরণ নিতে অভ্যস্ত। একমাত্র সেইখানেই প্রাণ খুলে নিজের সব কথা বলা যায়; বলে বুকের বোঝা হাল্কা করা যায়। তারপর তাঁর আদেশ মত চলে, বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে উপায় যে নেই। এ কথা যে তাঁর কাছে তুলতে বাধে। গুরুদেবের কাছে কিছু বলতে বাধা উচিত নয়—তবু বাধে; দুর্বল মানুষ আমরা। অবশ্য তিনি জানতে পারেন সব; হয়ত তিনিই আমাদের দিয়ে এ-কথা আপনাকে বলাচ্ছেন। নিদ্রায় জাগরণে সব সময় যে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে

আমাদের ওপর। এই কৃপাটুকু না থাকলে কি আমরা বাঁচি! আপনি তো শুধু এখানকার মায়লে নন, আপনি যে ব্যথার ব্যথী। আপনি যে ভক্ত লোক, সে কথা আর কে জানে না দাদা!'

'আমাকে আর ভক্ত বলে লজ্জা দিও না ভাই। ভক্ত হওয়া কি চাড্ডিখানি কথা। না আছে সে মন, না আছে সে সময়। সাধে কি লোকে আমাদের মায়লে বলে।'

মায়লে-ভাই তারপর সব শুনলেন। এদের বিপদের যথার্থ প্রকৃতিটা বুঝতে একটু সময় লাগল, তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকেরও। বোঝবার পর স্তম্ভিত হলেন। এ তো শুধু ভক্তের অনুরোধ নয়; এ যে 'ভোটার' 'ভোটারী'দের আদেশ! বললেন—'এ তো কারও একার বিপদ নয়? বিপদ যে সমগ্র গোষ্ঠীর! এ বিপদ আমার, আপনার, সকলকার। সমাজের বিপদ; দেশের বিপদ। আমি তো সমাজের বাইরের লোক নই—আমি যে আপনাদেরই একজন। আমি কি চুপ করে বসে থাকতে পারি, এ-কথা আপনাদের মুখে শোনবার পর?'

স্ত্রী-পুরুষ সকলে মায়লে-ভাইয়ের কাছে আসতে চায়, সকলে তাঁর মুখের আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সকলে এমনভাবে তাঁকে ঘিরে ধরেছে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

তিনি আশ্বাস দিলেন—'চেষ্টার ত্রুটি আমি রাখব না। এর জন্যে দিল্লী পর্যন্ত যদি যেতে হয় তা আমি যাব।'

লখনলাল ভরসা দিল—'সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত আমরা লড়ব।'

বচ্‌কন্‌ মহতো চেঁচিয়ে বলল—'দরকার হলে অনশন করব আমরা সেন্সাস অফিসারের বাড়ির দোরগোড়ায়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করে দেবো সেন্সাস অফিসে। আরও কত কি আমরা করতে পারি। চাই শুধু আপনাদের নৈতিক সমর্থন। আপনাদের চোখে আজ যে আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেই আগুন আমরা ছড়িয়ে দেবো সারা দেশে।'

পায়ের ঠোকর মেরে তাকে থামাতে হয়। বক্তৃতা একবার আরম্ভ করলে সে থামতে জানে না।

লখনলাল জয়ধ্বনি দিল—'বোলো একবার শ্রীসহস্রানন্দ স্বামীজীকী জয়।'

বচ্‌কন্‌ মহতো হাত তুলে লাফিয়ে উঠে ইনকিলাব জিন্দাবাদের ধরনে চেঁচাল—'ঔর ভী একবার বোলো গুরু মহারাজকী জয়!'

লখনলাল বলল, 'এ সম্বন্ধে এখন একটা কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করতে হয়?'

বচ্‌কন্‌ মহতো এ কথায় সায় দিল। 'প্যারে ভাইয়ো আওর বহিনো। আমি প্রস্তাব করছি যে আপনারা সকলে যে যেখানে আছেন বসে পড়ুন। তারপর পাঁচ মিনিট শ্রীগুরুজী ভগবানের ধ্যান করুন, চোখ বুঁজে। আমরা ততক্ষণ একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলি। আপনাদের ধ্যানের একাগ্রতার ওপরই আমাদের প্রোগ্রামের সাফল্য নির্ভর করবে।'

'ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব আর আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।'

'শান্তি! শান্তি!'

সকলে চোখ বুঁজে বসেছে। সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজা মনে হ'ল যেন ইঞ্চিখানেক ফাঁক হ'ল। ধোঁয়া বার হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠেছে। নিমীলিতচক্ষু ভক্তবৃন্দ আসন্ন

সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশ্বাস পাচ্ছে প্রতিবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই সৌরভ বুকে টেনে নেবার সময়।

ফিস ফিস করে পরামর্শ হচ্ছে নূতন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে। পরিস্থিতি বদলেছে সে বিষয়ে কারও মতদ্বৈধ নেই। 'স্লোগান পালটাতে হবে ইয়েমিয়েলিয়েসাহাব।'

চরণদাসজী বললেন—'গুড় দিয়েই যদি মাছি মরে তবে আর তিত ওষুধ ব্যবহার করবার দরকার কি!'

লখনলাল বলে—'গুরুচরণ দাসজীকে এবার হতে হবে মৌলভীচরণ দাস। এ না করে উপায় নাই।' সর্বাদিসম্মতভাবে প্রোগ্রাম স্বীকৃত হয়ে গেল। বচ্‌কন্‌ মহতো চেঁচাল—'বোলো একবার—'।

পাছে আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করে দিল লখনলাল—'গুরু-চরণ-কমলোঁ কী জয়!'

এই জয়ধ্বনি ভক্তদের ধ্যান ভাঙ্গাবার নোটিস। রেডি! আর দেরী করবার সময় নেই মোটেই! সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে! শুধু 'বোলো একবার—সহস্রানন্দ স্বামীজী কী জয়!'

অগণিত নরনারীর মিছিল বার হ'ল সহস্রানন্দ স্বামীর আশ্রমের গেট থেকে। সবচেয়ে আগে আগে চলেছেন চরণদাসজী। সকলেই চিন্তাভারাক্রান্ত; শুধু লখনলালজী ও বচ্‌কন্‌ মহতো বাদে। তাদের আশ্বাসে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাই সকলে গুরুদেবের নাম স্মরণ করতে করতে চলেছে। এ সংসারে তাঁর ইচ্ছে ছাড়া কিছু যে হবার উপায় নেই! আর ভরসা, মায়লে ভাইয়া (মায়লেদা)!

মায়লে-ভাইয়া নিজে কিন্তু মোটেই ভরসা পাচ্ছেন না। মৌলবীটোলার কাছে গিয়ে এক গাছতলায় এই নীরব শোক-মিছিলকে থামতে বলল লখনলাল।

'এখান থেকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব একাই যাবেন সেই বদ মৌলবীটার বাড়িতে।'

'প্যারে ভাইয়ো ঔর বহিনো! মায়লেজীর উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সেজন্য আসুন আমরা সকলে মিলে ততক্ষণ এই গাছতলায় বসে গুরুদেবের নাম জপ করি। জয় গুরু, জয় গুরু; মায়লেজী আর দেরী করবেন না আপনি।'

বহু রকম বিষয়ের তদ্বির এম-এল-এ সাহেব জীবনে করেছেন। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই। চরণদাসজীর পা কাঁপছে। হাইকম্যাণ্ডের নাম স্মরণ করেও মনে বল পাচ্ছেন না তিনি! মৌলবীসাহেব বাড়ির বারান্দায় গড়গড়া টানছিলেন। দা-কাটা তামাকের গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন মৌলবীসাহেব।

'আসুন, আসুন, এম-এল-সাহেব। সেলামালেকুম।'

ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝবার আগেই চরণদাসজী গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের উপর। বেশ করে জড়িয়ে ধরেছেন পাজামা সম্বলিত পা দুখানা। 'করেন কি, করেন কি, এম-এল-এ সাহেব!'

তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না—যতক্ষণ না মৌলবীসাহেব কথা দিচ্ছেন যে তাঁর একটা অনুরোধ রাখবেন।

'না না, আপনি আমার গরীবখানায় পদার্পণ করেছেন, তাতেই হয়ে

গিয়েছে। সে পুরনো কথা আর তোলবার দরকার নেই। ছাড়ুন! উঠুন উঠুন। এই চেয়ারে বসুন!'

'না, আপনি আগে কথা দেন।'

'বলছি তো। আপনি এসেছেন সেই যথেষ্ট। আর মাপ চাইতে হবে না। রাগের মাথায় লোকে কত সময় কত কি বলে ফেলে। সেসব কথা কি ভদ্রলোকে মনের মধ্যে গিঁঠ বেঁধে রাখে চিরকালের জন্য?'

'আপনি কথা দেন, আগে।'

'কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন বারবার। যা হবার হয়ে গিয়েছে। পা ছাড়ুন!'

কথা আদায় করে চরণদাসজী উঠে দাঁড়ালেন। জানালেন—'এখানকার সকলে আজ অতি বিচলিত। এত বড় বিপদ তাদের জীবনে কখনও আসেনি। এ বিপদ থেকে সকলের উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র আপনি। রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন।'

'আমি?' 'হ্যাঁ, আপনি।'

'খোদা, হাফেজ! বলেন কী!'

সন্দিগ্ধ মৌলবীসাহেব জোরে জোরে নিশ্বাস টানলেন দুইবার, এম-এল-এ সাহেবের মুখ থেকে কোনরকম গোলমেলে গন্ধ বার হচ্ছে কিনা তাই পরখ করবার জন্য। না পেয়ে উদ্বিগ্ন হলেন আরও বেশী।

'বলছি। বলবো বলেই তো এসেছি। এক কথায় বলবার মত নয় ব্যাপারটা। খোদা আপনার মঙ্গল করবেন। আজ আপনি সামান্য ব্যক্তি নন। এতগুলি লোকের জীবন-মরণ স্বর্গ-নরক নির্ভর করছে আপনার কলমের এক খোঁচার উপর। সবাই আপনার মুখ চেয়ে রয়েছে।'

'বলুন না, কি করতে হবে।'

এতক্ষণে চরণদাসজী আসল কাজের কথাটা পাড়লেন। গলার স্বর কাঁপছে। মৌলবীসাহেবের বিবেকে বাধতে পারে; সেইটাই তাঁর আসল ভয়।

'মৌলবীসাহেব, আজ সকালে আপনি স্বামী সহস্রানন্দের আশ্রমে গিয়েছিলেন লোক গণনার কাজে। সেই সম্বন্ধেই কথাটা। সেখানে আশ্রমের বাসিন্দাদের গোনবার সময় স্বামীজীকেও গুণে ফেলেছেন। আপনার ফাইলে মানুষদের মধ্যে থেকে তাঁর নামটা কেটে দিতে হবে। তিনি তো মানুষ নন, তিনি যে দেবতা, তিনি যে ভগবান।'

মৌলবীসাহেবের অন্যমনস্কভাবে দাড়ি চুলকানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

## দাম্পত্য সীমান্তে

মাছি ছোটে দূষিত ক্ষতের গন্ধ পেয়ে। নিবারণও চেষ্টা-তদবির করে বদলি হয়েছিল আজবপুর পোস্টাফিসে। ডাক-তার-বিভাগের খবর, সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় পার্সেল, বিলি না হয়ে ফেরত যায়, এই পোস্টাফিস থেকে।

সত্যই আজব জায়গা আজবপুর। আধখানা পড়ে ভারতে, আধখানা নেপালে। নেপালের লোক এই স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে; এখানকার পোস্টাফিসে চিঠি ফেলতে আসতে। এখানকার লোক নেপালে বাজার করতে

যায় ; মদ খেতে যায়। কাজেই এখানকার লোকের চালচলনও অন্যরকমের। এরা ভোজালি দিয়ে তরকারী কোটে, পুলিসের লোক দেখলে ভয় পায় না ; আবগারী-বিভাগের লোক দেখলে হেসে হেসে পানের দোকানে নিয়ে যায়। এইরকম আবহাওয়াই নিবারণ পোস্টমাস্টারের পছন্দ।

অসীমার পছন্দ নয় ; কিন্তু উপায় কি। যেমন মানুষের হাতে মা বাপ তাকে সঁপে দিয়েছে। ছোটবেলায় ঠাকুমা নাতনীকে ঠাট্টা করে বলতেন— দেখিস, তোর সঙ্গে এমন বরের বিয়ে দেবো যে, সে রাতে মদ খেয়ে এসে তোকে লাঠিপেটা করবে। অসীমা বলত—'ইস ! ঝাঁটা মেরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবো না !' তার কপালে ঠাকমার কথাই ফলল শেষ পর্যন্ত ! বিয়ের পর প্রথম যেদিন জানতে পারে স্বামীর নেশা করার কথা, সেদিন খুব কেঁদেছিল। অমন সুন্দর যার চেহারা, সে মানুষ আবার মদ খায় !

তারপর গত সাত বছরে আরও কত কি জেনেছে, কত কি শিখেছে, কত কি করেছে। যার স্বামীর নেশার খরচ মাইনের চেয়েও বেশী, তাকে অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হয়। ইচ্ছা থাক, আর না-ই থাক।

এখানকার লোকে পোস্টমাস্টারকে মাস্টার-সাহাব বলে। সেইজন্যই বোধহয় সে প্রথম রাত্রিতেই স্ত্রীর উপর মাস্টারি ফলিয়েছিল, শিখিয়ে পড়িয়ে তাকে একটু চালাক-চতুর করে নেবার সদুদ্দেশ্যে। বলেছিল, 'হাবাতেদের সঙ্গে খবরদার আলাপ কর না ! আলাপ পরিচয় করতে হয় ত বড়লোকের সঙ্গে। যার হাতে কিছু আছে, তার হাত থেকেই না কিছু আসতে পারে। আমল না পেলেও বড়লোকের বাড়ির আড্ডার এক কোণায় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি প্রত্যহ, খবরের কাগজের উপর মুখ গঁুজে। সময়ে কাজে লেগেছে।'

তখনই অসীমার মনে হয়েছিল—এমন কার্তিকের মত যার চেহারা, স্বভাব তার এমন কেন ? আগে থেকে এত মতলব ফেঁদে কি সবাই কাজ করতে পারে ?

যে স্বামী প্রথম রাত্রিতেই এই কথা বলে, সে যে শুধু মুখের উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত থাকবে না, এ জানা কথা। এখানে আসবার পরই নেপাল বাজারের শেঠজীকে একদিন বাড়ীতে এনে পরিচয় করিয়ে দিল অসীমার সঙ্গে। তারপর একটু চায়ের জল চড়াতে বলে বেরিয়ে গেল থলে নিয়ে বাজার করতে। ফিরল ঘণ্টা দুয়েক পর।

উপরওয়ালা 'ইন্সপেক্‌শন' এ এলে, তার জন্যও হুবহু এই ব্যবস্থা।

এ স্বামীকে চিনতে কি কারও দেরি লাগে। সবচেয়ে খারাপ লাগে তার সম্বন্ধে স্বামীর এই নিস্পৃহতার ভাব। সে দেখতে সুরূপা নয়। সেই জন্যই বোধহয় তার মনের এই দিকটা আরও বেশী স্পর্শাতুর। তবে নিবারণ রাত্রিতে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরে, এত দুঃখের মধ্যেও এইটাই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ হল কি ?

সমীর ঠাকুরপো সেই সাড়ে সাতটা থেকে যাই যাই করছে। সে বলেছে— 'বস না। এত কি বাড়ী যাবার জন্য তাড়া পড়েছে ! তবুতো এখনও বিয়ে করনি। তোমার দাদাকে আসতে দাও, তারপর যেও।'

বেশ লাগে তার সমীর ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করতে। রেলস্টেশনের

মালবাবুর ভাই। আই কম পাস করে চাকরির চেষ্টা করছে। রোজ আসে। রান্নাঘরে বসে বউদির সঙ্গে গল্প করে।

আটটা বাজল, নটা বাজল। তবু নিবারণের ফেরবার নাম নেই। অসীমা জানে যে নিবারণ আজ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আজ কিছু কাঁচা পয়সা সে হাতে পাবে। সেইজন্যই দেরি হচ্ছে না তো? ছ বছরের ছেলে ফনটে; সে অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারবে কেন। খাওয়া হলে, সবাই এল শোবার ঘরে। ঘরের কোণায় স্বামীর খাবার ঢেকে রেখে আবার তারা বসল সুখ দুঃখের গল্প করতে। জিমি কুকুরটা অনবরত ডাকছে।

দশটা বাজল। তবু নিবারণ আসে না। মশারির ভিতর কেন যেন ফনটের ঘুম আসছে না আজ কিছুতেই।

'কটায় খাও তুমি রোজ ঠাকুরপো?'

'ঘরে রুটি ঢাকা থাকে, যখন খুশি খাই।'

'তবে আর এত উসখুস করছ কেন, যাবার জন্য?'

'না অনেক রাত হল। দাদার আজ হল কি?'

'কে জানে! কোথাও কোন ড্রেনেটেনে পড়ে রয়েছে বোধহয়!'

কথার মধ্যে বিরক্তি সুস্পষ্ট। নিবারণের মদ খাওয়ার কথা এখানে সবাই জানে। একথা বলতে সমীর ঠাকুরপোর কাছে লজ্জা নাই। পাছে আবার সমীর নিবারণের বাইরে রাত কাটানোর অন্য অর্থ করে নেয়, সেইজন্যই অসীমা মদ খাওয়ার দিকটার উপর জোর দিয়ে কথাটা বলল। স্বামী বাইরে রাত কাটায়, একথার জামাজানিতে শুধু বাইরের লোকের কাছেই লজ্জা নয়, নিজের কাছেও নিজে ছোট হয়ে যেতে হয়।

হঠাৎ অসীমার খেয়াল হল যে, ফনটের সম্মুখে তার বাপের মদ খাওয়ার গল্প করাটা ঠিক নয়। 'চল ঠাকুরপো, আমরা গিয়ে ও ঘরে বসি। কিরে ফনটে তোর ভয় করবে না তো আমরা ওঘরে গিয়ে বসলে? মাঝের দরজা তো খোলাই থাকল।'

মাঝের দরজা খুলে তারা গিয়ে বসল পোস্টাফিসের ঘরে। 'জিমি! চুপ করলি না! জ্বালাতন!'

এই মানসিক অবস্থা; এমন দরদী শ্রোতা; নিজের দুঃখের কথা বলবার সময় অসীমার চোখের জল বাঁধ মানেনি। এগারটার পর সে নিজে থেকেই সমীরকে চলে যেতে বলেছিল। যাবার সময় সমীর আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল— 'দাদা রাত্রিতে আসবেন ঠিকই। বারোটা, একটা হতে পারে।'

'সে তো নিশ্চয়ই।'

বলেই নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগল কথাটা। এত জোর দিয়ে ওকথা বলবার কোন দরকার ছিল না। শুধু সমীরকে কেন, নিজের মনকেও সে ফাঁকি দিতে চায়। নিজেকে স্তোক দেবার জন্য ঘরের আলোটা শোবার আগে নেবাল না! নেবানর অর্থ হত, নিবারণ যে আজ আসবেও না, খাবেও না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।···খাটের তলায় ইঁদুর খুটখুট করে। ডাকঘরে ঘড়ি বাজে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কত কি ভাবে; আর চোখের জলে বালিশ ভেজে সারারাত। পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত তার কি আর কোন দামই নাই স্বামীর চোখে? স্বামী সব চেয়ে বেশী ভালবাসে মদ। তারপর টাকা। কিন্তু তারপর?

জিমিটারও আজ হল কি ? সেও সারারাত ডেকে ডেকে সারা।

শেষ রাত্রিতে চোখের পাতা কখন যেন বুজে এসেছিল। ঘুম ভাঙ্গল হঠাৎ। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। ফনটে হাত দিয়ে ঠেলছে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মনের তিক্ততা ঘুমিয়েও কাটেনি। কড়ানাড়ার শব্দের অধীর রূঢ়তা, মেজাজ আরও খারাপ করে দেয় অসীমার।

'জেগে রয়েছিস—উঠে দরজাটা খুলে দিতে পারিস না ! বুড়ো ধাড়ি ছেলে !'

চুল ধরে টানাটা এত অপ্রত্যাশিত এই ভোরবেলাতে যে ফনটে কাঁদতে ভুলে গেল।

—রামদেনীর মা কড়া নাড়লে এর আগেও কতদিন মাকে ডেকে তুলে দিয়েছে। তারজন্য কোনদিন তো মাকে রাগ করতে দেখেনি—মশারি থেকে বেরিয়ে, দুমদুম করে পা ফেলে মা দরজা খুলে দিতে গেল। খটাং করে শব্দ হল। রাগ করে খিল খুললে ওই রকম শব্দ হয়। জিমিটা নিশ্চয় ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওকি ! মা এমন দৌড়িয়ে ঘরে ঢুকলো কেন ? বিড়াল আসেনি তো।—মা খপ করে একখানা পুরনো খবরের কাগজ টেনে নিল। ঢাকা তুলে বাবার জন্য রাখা ভাতগুলোকে খবরের কাগজের উপর ঢালছে। খবরের কাগজে আবার ভাত রাখে নাকি লোকে ? জিমির জন্য নিশ্চয়ই। মা আড়চোখে দরজার দিকে তাকাচেছ। মা মিছামিছি ভয় পাচেছ, জিমি বুঝি এখনই ঘরে ঢুকে ওই ভাত খেয়ে নেবে। জিমি যে চলে গিয়েছে বাইরে।

মশারির ভিতর থেকে ফনটে সব দেখছে। যত দেখছে ততই অবাক হচেছ। মার কাণ্ডকারখানা আজ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

—একমুঠো ভাত মা আবার থালায় রাখল। ডাল তরকারী দিয়ে মেখে সেই ভাতের দলাটাকে সারা থালার উপর একবার বুলিয়ে নিচেছ। ডাঁটা চড়চড়িটা থালার একপাশে রেখে আঙ্গুল দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিল। মা দরজার দিকে তাকাচেছ ভয়ে ভয়ে। একবার মশারির দিকেও তাকাল। ওকি ! মা ডাঁটা চিবুচ্ছে ; এই সাতসকালে। বাসিমুখে। ভুল দেখছে নাকি সে ? না, ওই তো ডাঁটার ছিবড়ে বার করে থালার ওপর রাখলে। মা তার মশারির দিকে তাকাচেছ। এরকম সময় মার দিকে তাকাতে নাই ; লজ্জা পাবে। তাই ফনটে চোখ ফেরাল জানলার দিকে। রামদেনীর মা আসছে জানলার দিকে।

অসীমা সত্যিই তাকিয়েছিল মশারির দিকে। সে দেখছিস, বাইরে থেকে বোঝা যায় নাকি, এখন মশারির ভিতর কে আছে, না আছে। না। যাক। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে কোথায় অসীমা ! মুহূর্তের মধ্যে সে কতদিক সামলাবে। তার মত অবস্থায় যে পড়েছে সে-ই জানে। সে বুঝতে পারেনি যে দরজার কড়া নাড়ছিল রামদেনুর মা। ভেবেছিল বুঝি ফনটের বাবা। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গবার পর ঠাহর পায়নি। ভাগ্যে ঠিকেঝি রামদেনীর মা কোনদিনই শোবারঘরে ঢোকে না।

জল খানিকটা মেঝেতে ফেলে, ডালতরকারি-মাখানো হাতটা ডুবিয়ে ধুয়ে নিল গ্লাসের মধ্যে অসীমা। রামদেনীর মা দোর-গোড়ায়। এঁটো থালা-বাসনগুলো তার হাতে দেবার সময় অসীমা চোখ নামিয়ে নেয়। কুয়াতলায়

মুখ ধুতে যাবার আগে শোবার-ঘরের দরজা আবজে দিতে ভোলে না। স্বামী রাত্রিতে ফেরেনি এই কথাটা ঝিকে জানতে দিতে চায় না সে।

বীরবাহাদুর নেপালী বাইরে থেকে ডাকে 'মাইজী!'

এই ডাকঘরের ঠিকানায় নেপাল এলাকার যে সমস্ত চিঠিপত্র আসে, সেগুলোকে ঘরোয়া ব্যবস্থায় বিলি করবার জন্য বীরবাহাদুর প্রত্যহ নিয়ে যায়। তার কাঁধে ডাকের ঝুলি। জিমি লেজ নাড়তে নাড়তে তার গায়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। রামদেনীর মা কাজ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বীরবাহাদুরকে বলে গেল—'আজ বোধহয় একটু দেরি হবে মাস্টারসাহেবের। এখনও ঘুমুচ্ছে। কাল রাতে বোধহয় চলেছে খুব।' বোতল থেকে মদ ঢালবার মুদ্রা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

অসীমা এসে দাঁড়িয়েছে।

'বীরবাহাদুর, তুই একটু ঘুরে ঘেরে আয়।'

ঠোঁটের কোণায় হাসি এনে চোখের ইশারায় বীরবাহাদুর বুঝিয়ে দিল যে রামদেনীর মা বহুদূরে চলে গিয়েছে; অত সাবধান হয়ে কথা বলবার দরকার আর নাই।

'মাষ্টারসাহেব কথাতেই তাড়াতাড়ি এলাম সাইকেলে। তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই পেঁাছে যাবেন। হেঁটে আসছেন কিনা।'

কেন তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছে সেকথার কোন মূল্য নেই অসীমার কাছে।

'দেখা হল কোথায় মাষ্টারসাহেবের সঙ্গে?' জিজ্ঞাসা করবার সময় কুণ্ঠায় বীরবাহাদুরের মুখের দিকে সে তাকাতে পারে না।

'আমার বাড়িতেই তো তিনি সারারাত।'

মনটা হালকা হালকা লাগে।

'সারা-রাত?'

বীরবাহাদুর অধৈর্য হয়ে পড়েছে। মাথায় তার গুরুদায়িত্ব! ডাকের থলে থেকে একটা পার্সেল বার করতে করতে বলে—'এটাকে দেবার জন্য কাল রাতেও একবার এসেছিলাম।'

'রাত্রিতে? ক'টার সময়? কেন খুব দরকারী নাকি?'

'দরকারী না হলে কি আর অত রাতে নিয়ে এসেছিলাম! মাষ্টারসাহেব তখন নেশায় চুর। উনি কি তখন আসতে পারেন।'

'তবে রাত্রিতে দিলি না কেন?'

একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে সে বলল—'দেখলাম ডাকঘরের মধ্যে আপনি আর মালবাবুর ভাই গল্প করছেন। বাইরের লোকের সম্মুখে তো জিনিসটা দিতে পারি না আপনার হাতে। রাতদুপুরে পোস্টাফিসের সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকারও বিপদ আছে। তাই চলে যেতে হল। গিয়ে মাষ্টারসাহেবকে বলতেই তিনি চটে আগুন মালবাবুর ভাইয়ের উপর। ওই নেশার মধ্যেও, জ্ঞান টনটনে। বলে ভোজালি লে আও বীরবাহাদুর। অভী লে আও! খুন করব ছোঁড়াটাকে আমি! কী চীৎকার! সে কি সামলান যায়!'

শিহরন খেলে গেল অসীমার সারা দেহে। বহু আকাঙ্ক্ষিত অথচ অনাস্বাদিত একটা জিনিসের স্বাদ সে পাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে শুনতে। ও থামল কেন। আরও বলুক।

ভয়ের অভিনয় করে সে বলে 'তাই নাকি ! ওরে বাবারে ! তাহলে কী হবে ! তাহলে আমি কী করি ! তখনই আসছিল নাকি ভোজালি নিয়ে ?'

বীরবাহাদুর এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। 'না না, কিছু ভাববেন না, মাইজী। নেশায় যে মানুষ হাঁটতে পারছে না, সে মানুষ তখন আসছে ভোজালি নিয়ে মারতে ! আপনিও যেমন !'

'না না বীরবাহাদুর। যত নেশাই করুক, জ্ঞান মাস্টারসাহেবের টনটনে থাকে। জানিতো তাকে।'

'থাকে তো থাকে !'

তাড়া দিয়ে উঠেছে বীরবাহাদুর। বাড়িতে আগুন লাগলেও বাজে গল্প করা ছাড়বে না এই মেয়েমানুষের জাতটা ! সে কাজের কথা পাড়ে।

'এই নিন মাঈজী পার্সেলটা। সব ঠিক করা আছে। আপনি শুধু সেলাইটা করে রেখে দিন। এখনই। একটুও দেরী করবেন না। মাস্টারসাহেব এই এলেন বলে। এসেই সেলাইয়ের উপরের গালা মোহরগুলো ঠিক করে বসিয়ে দেবেন। শেঠজী রাত দশটার সময় মাস্টারসাহেবের কাছে একটা জরুরী খবর পাঠিয়েছিলেন। সেইজন্যই না এত তাড়া।'

জরুরী খবর ? আর বলতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে অসীমা বুঝে গিয়েছে খবরটা কিসের ! কেনই বা বীরবাহাদুরকে নিবারণ তখনই পাঠিয়েছিল। আসবার মত অবস্থা থাকলে নিজেই আসত। ইনস্‌পেক্‌শন অফিসের ডাকঘর খুলবার সময়ের আগে বোধ হয় আসবেন না। অফিসারদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, সব অসীমার জানা। পার্সেলটা সেলাই করতে আধঘণ্টাও সময় লাগবে না।

'ফনটে, জামাজুতো পরে নে ! বীরবাহাদুর ফনটেকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাতো।'

অসীমা ঘরে ঢুকল চুল আঁচড়ে শাড়ি বদলে নিতে। চায়ের জল একটু পরে চড়ালেই হবে।

কিন্তু সময় আর পাওয়া গেল না। সবে সেলাই করতে বসেছে পার্সেলটা —মোটরগাড়ি এসে থামল পোস্টাফিসের সম্মুখে। একখানা ছোট, একখানা বড় গাড়ি। এতো কেবল 'ইন্সপেকশন'-এর উপরওয়ালা নয়। এ যে অনেক লোক ! ডাকবিভাগের অফিসার ; আবগারী বিভাগের অফিসার , পুলিসের অফিসার ; নিবারণ নিজে ; পুলিশ কনস্টেবল। পথে দেখা হয়ে গিয়ে থাকবে নিবারণের সঙ্গে। তাহলে তো স্বামীর সমূহ বিপদ। এতবড় বিপদের মুখে অসীমা কোনদিন পড়েনি। হে মা কালী, বাঁচাও। ভয়ে কি করবে ঠিক করতে পারে না। পার্সেলের ভিতরের গাঁজার পুঁটলিটাকে সে কয়লাগাদার নীচে রাখে। পার্সেলের উপরের ন্যাকড়ার মোড়কটাকে উনুনের মধ্যে ফেলে দেয়। হে মা কালী, গালা আর ন্যাকড়া পোড়া গন্ধটা যেন হাওয়ায় পোস্টাফিসের উলটো দিকে উড়ে যায় ! এখন একবার নিবারণের সঙ্গে একলা দেখা করতে পারলে সুবিধা হত। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিসে। গুটি গুটি লোক জমতে আরম্ভ হয়েছে। নিবারণ অফিসারদের বলছে—অফিসের চাবি বাড়িতেই আছে ; সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাবার সময় ; বাড়ির ভিতর দিয়েও পোস্টাফিসের ঘরে ঢোকবার আর একটা দরজা আছে ; বাড়িতে আছে

স্ত্রী আর একটি ছয় বছরের ছেলে ; আর বাইরের লোকের মধ্যে আসে ঠিকে ঝি রামদেনীর মা। পুলিশ এখন স্ত্রীর সঙ্গে নিবারণকে দেখা করতে দিতে রাজী নয়। একজন এসে অসীমার কাছ থেকে পোস্টাফিসের চাবি চেয়ে নিয়ে গেল।

ডাক ঘরে টেবিলে দুটি চায়ের কাপ। 'এ আবার এখানে কোত্থেকে এল।' বলেই নিবারণ কাপ দুটোকে টেবিলের নীচে নামিয়ে রাখল। অফিসাররা পার্সেল সংক্রান্ত খাতাপত্র দেখতে চাইলেন।

'কালকের তারিখে, এই যে এত নম্বরের পার্সেল সম্বন্ধে লিখেছেন—এই নামের কোন ব্যক্তি ওখানে নেই—এটা আজ কলকাতায় ফেরত পাঠান হবে প্রেরককে—দেখি সেই পার্সেলটা।'

সিন্দুক থেকে সেটাকে বার করে দিতে গেল নিবারণ। শেষকালে মুখ কাঁচু-মাচু করে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাশের ঘরে থেকে অসীমা সব শুনতে পাচ্ছে। নিবারণ নিজেই প্রথম কথা তুলল—নিশ্চয়ই পার্সেলটা কেউ চুরি করেছে। তার মনে আছে যে সে কাল পার্সেলটা সিন্দুকে রেখেছিল। তারপর সারারাত সে বাড়িতে ছিল না। বাইরের তালা যখন ভাঙ্গা নয়, তখন চোর নিশ্চয়ই ঢুকেছে বাড়ির ভিতর দিক দিয়ে।

বীরবাহাদুরের কাছ থেকে স্বামীর সম্বন্ধে নতুন একটা খবর পাবার পর থেকে, অসীমার মনে নতুন নেশা লেগেছে। আসন্ন বিপদের মুখেও সে নেশার আমেজ কাটেনি। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে নিবারণের চোখ মুখের ভাব সে একবার দেখে নিল। মনে হল যেন ঈর্ষার রেশের সন্ধান পাচ্ছে সেখানে। বাড়ির হাটে তার নিজের মূল্যের প্রথম স্বীকৃতি।

অফিসাররা এইবার বাড়ির ভিতর ঢুকলেন অসীমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য। তার বেশভূষার আড়ম্বর প্রথমেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'কাল বিকালের পর থেকে পোস্টাফিসের ঘরে কেউ ঢুকেছিল ?'

'না।'

স্বামীর চোখের লেখা দেখবার নেশা তখন অসীমাকে পেয়ে বসেছে।

হাঁ হাঁ করে উঠেছে নিবারণ, কি বলতে হবে, স্ত্রীকে তার ইঙ্গিত দেবার জন্য।

'মেয়েমানুষ। ভয়ে মিছে কথা বলছে হুজুর।'

'মিছে কেন হতে যাবে। কেউ ঢোকেনি ওঘরে।'

'কেউ ঢোকেনি তো দুটো চায়ের কাপ কেন ছিল টেবিলের উপর ?'

চটে উঠেছে নিবারণ।

'ও কালকে দুপুরের। তুমি যে দুপেয়ালা চা খেয়েছিলে একসঙ্গে।'

ঘরের বাক্স পেঁটরা সার্চ করা হল। অফিসার শুধু বললেন—'নতুন নতুন জরিদার বেনারসী শাড়ী আপনার অনেকগুলো দেখছি।'

'হ্যাঁ, ওগুলো বিয়ের সময় পাওয়া।'

এ ছাড়া আর কোন কথা বার করা গেল না অসীমার মুখ থেকে। ফনটেকে ডাকা হল।

টফি, লজেঞ্জুস খেয়ে, সে বলল যে সমীর-কাকা কালরাত্রিতে মার সঙ্গে ওঘরে গল্প করছিল, আর মা মাতালের ভয়ে কাঁদছিল। বাসি মুখে ডাঁটা চিবুবার

কথা যে বলতে নেই তা সে জানে। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে রামদেনীর মা বলল যে, কাল রাত্রিতে সমীর এখানে ছিল।

'তাহলে আপনাদের স্বামী স্ত্রী দুজনকেই থানায় যেতে হয় আমাদের সঙ্গে। আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

ফনটেকে অফিসার গাড়ীর সম্মুখে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। অসীমা আর নিবারণ বসল ভ্যানের পিছন দিকে। পথ থেকে পুলিস সমীরকেও ভ্যানে তুলে নিল। সে বসল একা অন্য দিককার বেঞ্চে। সবাই নির্বাক। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। সে ধুলো খেতে খেতে মালবাবু সাইকেল চালিয়ে আসছেন গাড়ির পিছনে পিছনে। সমীর গাড়ীর বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার বেঞ্চের দিকটায় ছায়া ; আর অসীমাদের বেঞ্চের দিকটায় রোদ্দুর পড়ছে। হঠাৎ অসীমা উঠে সেই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসল। ভাবে মনে হল যে সে রোদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। বসবার সময় অসীমা স্থির লক্ষ্য রেখেছে নিবারণের চোখের উপর। নিবারণও তার দিকে তাকিয়ে। যাতে পুলিসরা না দেখতে পায় সেই জন্য সে হাতখানা বেঞ্চের নীচে নামিয়ে স্ত্রীকে ইশারা করল সমীরের দিকে আরও ঘেঁষে বসতে। স্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসাসূচক ব্যঞ্জনাও তার চোখমুখে নির্লজ্জ ছাপ ফেলেছে। ঈর্ষার চিহ্নও নাই সেখানে।

যা ভাবতে ভাল লাগে, সেইটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছিল এতক্ষণ অসীমা। এতক্ষণে মিষ্টিভুলের নেশা কাটে। চূড়ান্ত অপমানে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

কেন, ওর কাছে ঘেঁষে বসব কেন। 'হুকুম?' অসীমা এসে ধপ করে বসল নিবারণের পাশে। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল গাড়ীর পার্টিশনের লোহার জাফরি ধরে।

'শুনছেন পুলিসসাহেব, এই লোকটাই চুরি করেছে—এই ঠগ, জোচ্চোর, মাতালটা। অন্যর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়ে। সব সত্যি কথা বলব আমি। আমার জেল হয় হোক। কলকাতার লোকদের সঙ্গে এর, আর নেপালবাজারের শেঠজীর সাট আছে। যেসব লোক সাত জন্মেও এখানকার নয়, তাদের নামে কলকাতা থেকে পার্সেল আসে। এখানে সে নামের লোক পাওয়া যাবে কোথায়। ফেরত যায় সেসব পার্সেল। পার্সেলে আসে রেশমী শাড়ী, টাকা, আরও কত কি। যেসব এই মাতালটার মজুরি। সেটা বার করে নিয়ে এরা পার্সেলের মধ্যে ভরে দেয় নেপালের সস্তা গাঁজা। যে গাঁজার দাম নেপালে চার পয়সা, তার দাম কলকাতায় দেড় টাকা। কলকাতা থেকে যে মিথ্যা পার্সেল পাঠায় সে-ই আবার গাঁজা ভরা পার্সেল ফেরত পায়। অনেকদিন থেকে এই করে আসছে এরা। আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমাকে দিয়ে গাঁজা ভরা পার্সেল সেলাই করায়। যাদের হাতে এত লোকজন, যারা সিলমোহর বাঁচিয়ে সেলাই কাটতে জানে, তারা কি আর সেলাই করবার একটা লোক পেত না ইচ্ছা করলে। শুধু আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমায় রেশমী শাড়ী দিয়েছে। লোকটা কি কম বদমাইস! তিন বছর পরে কি করবে সেসব ওর আজকে থেকে ছককাটা থাকে। একটা কথাও লুকবো না আমি হুজুর। গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে মা বাপ! বিয়ে না ছাই! ইচ্ছা করে যেখানে দুচোখ যায় চলে যেতে! পারিনি শুধু ফনটেটার মুখ

চেয়ে। জেলে ওকে আমার কাছে থাকতে দেবেন পুলিসসাহেব! তা'হলেই আমি সব সত্যি কথা বলব।'...

এতক্ষণে নিবারণ কথা বলল।

'কি পরিমাণ বদ দেখছেন তো হুজুর মেয়েমানুষটা। নাগরকে বাঁচিয়ে স্বামীকে জেলে পুরতে চায়।' তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

## অলোকদৃষ্টি

'কে? বড় খোকা?' কথাগুলো জড়ানো জড়ানো।

কেউ সাড়া দিল না।

'দরজার আড়ালে কে তুই? সাড়া দিচ্ছিস না যে? জিলিপির গন্ধ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তুই। কি যেন তোর নাম?'

ঠাকুমাকে চটাতে খুব ভাল লাগে অজয়ের। যতক্ষণ তার নাম ধরে না ডাকছেন, ততক্ষণ সে কিছুতেই উত্তর দেবে না।

'এই জিলিপিখেগো! কথা কানে যাচ্ছে না? কি নাম যেন তোর? কিছুতেই মনে থাকে না তোর নামটা।'

অজয়ের মা চেঁচালেন ওঘর থেকে, 'হচ্ছে কি অজয়! তোর ঠাকুমা কি বলছেন শুনতে পাচ্ছিস না? দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে।'

'অজয়, অজয়। এই দেখ মনে পড়ল এতক্ষণে। কেবল ভুলে যাই। পুরনো কালের নাম-ধাম সব কথা মনে থাকে, অথচ আজকালকার কথা ভুলে যাই। হ্যাঁ রে, কিসের জিলিপি? ত্রিকূটের নাকি? ত্রিকূট কাকে বলে জানিস তো? পানিফলের আটা দিয়ে যে জিলিপি তয়ের করা হয়, তাকে বলে ত্রিকূটের জিলিপি।'

'এর চেয়ে আমাদের ওখানকার অমৃতি খেতে অনেক ভাল।'

'বললেই হল আর কি! ত্রিকূটের জিলিপির গন্ধই আলাদা। আমার খুব ভাল লাগে গন্ধটা। হ্যাঁ রে, এই সকালে জিলিপি ভাজছে কে?'

'মা।'

'একটুখানি ভেঙ্গে আমার সম্মুখের জানলার উপরে রাখ্ তো।'

'না, মা বকবে তোমার ঘরে এঁটো জিলিপি নিয়ে গেলে।

'তোর মা বড়, না ঠাকুমা বড়? তোর বাবাকে আমি পেটে ধরেছি বুঝলি! আর আজ তুইও আমাকে হেনস্তা করিস। সবই আমার কপাল! বেশীদিন বাঁচলে এ-ই হয়! মরতে তো আমি চাই। মরবার জন্যই তো ত্রিশ বছর আগে কাশীতে এসেছিলাম। কিন্তু মরণ আমার হয় কই।'...

মরবার কথা একবার আরম্ভ হলে ঠাকুমা থামতে জানে না। এ এখন চলবে বহুক্ষণ; তাই অজয় সেখান থেকে উঠে পালাল।

'ওরে, বড়খোকা উঠেছে?'

কথার কেউ উত্তর না দেওয়ায় বৃদ্ধা মোটা কাচের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখলেন সেদিকে। পালিয়েছে ছোঁড়াটা।

'কি বলছেন মা?'

ছোটবউমা এসে দাঁড়িয়েছেন দোরগোড়ায়।

'বড়খোকা কোথায় ?'

'বঠ্ঠাকুর এখনও ওঠেন নি। তাঁকে ডেকে দিতে বলব ?'

'এখনও ওঠে নি ! আমার গঙ্গাজলের ঘড়ার কাছে রোদ এসে পড়েছে ; এখনও ওঠে নি ? চিরকাল একই রকম থেকে গেল ছেলেটা ! স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধুলে !'

'বঠ্ঠাকুরকে ডেকে দিতে বলব নাকি ?'

'না না, দেখি কতক্ষণ ঘুমোতে পারে !'

'কিছু বলবেন মা ?'

'তোমাকে ? না তোমাকে কি জন্য বলতে যাব ? নিজের পেটের ছেলেদের কাছেই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি ; তার আবার তোমরা ! আর এখন মায়ের কদর নেই। বিয়ে ফুরোলে ছাঁদনায় লাথি, ও হয়েছে তাই। মায়ের কাজ ফুরিয়েছে। যেতে তো চাই ; কিন্তু যমে যে নেয় না। কত লোক দেখি কাশীতে এল আর চোখ বুজল। কত যাত্রী দেখি এখানে কলেরায় মরে, মায়ের কৃপায় মরে, গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ডুবে মরে, আরতির ভিড়ে পিষে মরে, কিন্তু সে কপাল নিয়ে তো আমি আসি নি কাশীতে। তোমরাও চাও আমি যাই ; আমারও আর বাঁচবার সাধ নেই একদিনের জন্যও। কিন্তু যম ফিরে তাকালে তবে তো ! ওকি ছোটবউমা, চলে যাচ্ছ ? শোন। ছোটখোকার চা খাওয়া হয়েছে ?'

'এখনও বেড়িয়ে ফেরেন নি।'

'এখনও ফেরে নি ! দেরি করে বেরিয়েছিল নাকি আজ বাড়ি থেকে ?'

'না।'

'তবে ? তা হলে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কিছু বলে-টলে যায় নি তো ?'

'না, বাড়ি থেকে বার হবার সময় আমি দেখি নি।'

'তা দেখবে কেন ! কোন্ রাজকার্য করছিলে তখন ? তোমার ওই ছেলেটাকে বলো, একবার গলিতে বেরিয়ে দেখুক। বামুনঠাকরুণও যাক না একবার একটু খোঁজ নিতে।'

'বামুনঠাকরুণ স্নান করে এখনও ফেরে নি।'

'এখনও ফেরে নি ? আমার গঙ্গাজলের ঘড়ার উপর রোদ্দুর পড়েছে, এখনও তাঁর ঘাট থেকে ফেরবার সময় হল না ! তোমরা দুই জায়ে রান্নাঘরে ঢোকো বলে সে মাগী হাত-পা এলিয়ে দিয়েছে। দাঁড়াও ; ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবো আজ ! কাজের সময় ডাকলে যে মানুষকে পাওয়া যায় না, তাকে মাইনে দিয়ে রাখব কেন ? ভাবছে যে আমি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছি, কাশীতে থাকতে গেলে ওর উপর নির্ভর করতেই হবে। তাই এত বাড় ! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি ? এখান থেকে এখানে তো ঘাট ! যেতে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে ? আমি নিজে আজ চার বছরের মধ্যে গঙ্গাস্নান করি নি, আর বামুনঠাকরুণ গঙ্গাস্নান করে প্রত্যহ দু-বেলা। কপাল ! যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে ! নইলে আমি না মরে এমন ভাবে অপারগ হয়ে পড়ে থাকব কেন। দুবার তো অসুখে পড়ে মরব মরব হয়েছিলাম। কিন্তু মরণ কপালে থাকে, তবে তো। দুবারই বড়খোকা, ছোটখোকা ছুটি নিয়ে এসেছিল তাদের বউ-ছেলে-পিলেদের সঙ্গে নিয়ে। দুবারই তাদের হতাশ করে অসুখ থেকে সেরে উঠেছিলাম।

মুখ চুন করে তারা ফিরে গিয়েছিল কাশী থেকে। স্বামী স্বর্গে গেছেন ষাট বছর আগে। এই ষাট বছর ধরে বেঁচে রয়েছি শুধু ছেলে-বউদের জ্বালাতন করবার জন্য। মরণ তো কারও হাতধরা নয়। ইচ্ছামৃত্যু হয় শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের। আমি বেঁচে আছি কেবল সকলের অভিসম্পাত কুড়োবার জন্য!'

বৃদ্ধা হাউহাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বিধবা হবার পর, কত কষ্ট করে বড়খোকা আর ছোটখোকাকে মানুষ করেছিলেন। ছেলেরাও চিরদিন মা বলতে পাগল। বউরাও ভাল; কাশীতে আসবার আগে কয়েকবছর তাদের নিয়ে ঘর করেছিলেন তো; ভাল করেই জানেন তাদের। তবে কেন এমন হল? এমন ভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া সহস্রগুণে ভাল!···

ছোটবউমা কখন সেখান থেকে চলে গিয়েছেন সেকথা তাঁর খেয়াল নেই। তিনি আপন মনে বকে চলেছেন।

বউমারা কেউ শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করেন না। তিনি যা মুখে আসে বলে যান; কিন্তু কেউ সে-কথা গায়ে মাখে না। সকলে ভাবে, কী মানুষ ছিলেন—আর কী হয়েছেন আজ! ব্যারামে ভুগে ভুগে ইদানীং মাথায়ও একটু ছিট হয়েছে। বিশ্বাস পান না কাউকে! যাদের সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন তাদেরই উপর অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশী।

'ও কী! কিসের শব্দ? বড় বউমা!'

'কি বলছেন মা?'

'কিছু পড়ল-টড়ল নাকি তোমার ঘরে?'

'না, ও কিছু না।'

'কিছু না আবার কি। শব্দ শুনলাম, তবু বলবে কিছু না! হলেই বা তুমি বাড়ির গিন্নী, আমাকে বললে কি সংসারের গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে? এখনও আমি মরি নি, বুঝলে। মরতে পারলেই তো বাঁচতাম; কিন্তু যমের অরুচি যে আমি।'···

আরম্ভ হয়ে গেল তাঁর বকুনি।

কানের পাশে বাক্সর ডালা পড়বার শব্দতে বড়খোকারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এই সাত-সকালে বাক্স গোছাবার কী দরকার পড়েছিল? মার একটানা বকুনির আওয়াজ কানে আসছে। ওঘরে যাবার আগে একবার চোখেমুখে জল দিয়ে নেওয়া দরকার। নইলে মা বিরক্ত হন।

'কে রে? ছোটখোকা?'

'হ্যাঁ।'

ছোটখোকা এসে দাঁড়ালেন দোরগোড়ায়। মাথার চুল পাকা। দাড়ি-গোঁফ কামানো।

'বেড়িয়ে ফিরছিস? এত দেরি হল কেন রে আজ? রাস্তায় চা-বিস্কুট হেঁকে যাবার আগে থেকে আমি উঠে বসে আছি, তুই কখন বেরিয়ে গেলি বুঝতে পারলাম না তো। হাত-পা ধুয়েছিস? হাতে ও কি রে? কি কিনে আনলি?'

জবাব না দিয়ে উপায় নাই।

'কাঠের খেলনা।'

'খেলনা কি হবে?'

'নাতনীর জন্য কিনে রাখলাম।'

বড়বউমা ডাকলেন ওঘর থেকে, 'ঠাকুরপো, চা খেয়ে যাও।'

'আসছি।'

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ছোটখোকা চলে গেলেন সেখান থেকে।

মা বোঝেন, যে কেউ তাঁর সঙ্গে দরকারের চেয়ে বেশী কথা বলতে চায় না আজকাল। সময়ের অভাব নেই কারও; তবু তাদের কথা বলবার গরজ নেই। রাগও হয়, দুঃখও হয়। ছোটবউমা, বড়বউমা দিনে দুবার করে তাঁর গায়ে মহামাষতেল মালিশ করে দেয়। সে সময় দুটো কথাও তো বলতে পারে। কিন্তু বলবে কেন? আমি যে মরে গিয়েছি! ঘাটের-মড়ার সঙ্গে কেউ কথা বলে?

বড়খোকা এসে ঘরে ঢুকলেন। সৌম্য চেহারা। গোঁফদাড়ি সাদা।

'মা, রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়েছিল?'

'ঘুম হলেই বা কি, না হলেই বা কি।'

'জপ সারা হয়েছে তো?'

'জপতপ সব চুলোর দুয়ারে গিয়েছে।'

'করলে মন ভাল থাকে।'

'সে কি আর আমি জানি না। ও-কথা তুই শেখাবি আমাকে? তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি? কাশীতে আসবার পর পঁচিশ বছর তো বেশ পুজোআর্চা নিয়ে কাটিয়েছিলাম। ভাগবত, কথকতা, যাগ-যজ্ঞ, গঙ্গার ঘাটের ভজন-কীর্তন, কোথায় না আমি যেতাম প্রত্যহ। এই প্রমীলাঠাকরুণ না থাকলে, এখানকার যে কোন ধর্মকর্মের আসর খালিখালি লাগত পাড়ার লোকের। কীর্তনীয়া আমার চোখে জল দেখলে, তবে তার গাওয়া সার্থক মনে করত। কাশীবাস করতে এসে নতুন লোকরা প্রথম এই প্রমীলাঠাকরুণের কাছেই সলাপরামর্শ নিতে আসত। কোন্ পাণ্ডা বদ, কোথাকার ঠাকুর ভাল, কোন্ মহিলার দলের সঙ্গে বদরিকাশ্রম যাওয়া নিরাপদ, কোন্ সত্রে কি খেতে দেয়, এসব খবর জানবার জন্য মেয়েরা চার বছর আগে পর্যন্ত আমার কাছেই ছুটে আসত। এখন আর কেউ এই ঘাটের-মড়ার ছায়াও মাড়ায় না! কী ছিলাম, আর কী হয়েছি! বাবা বিশ্বনাথের কাছে আমি দিনরাত্রি বলি—আমার প্রাণটা তাড়াতাড়ি বার করে দাও ঠাকুর; আর কিছু চাই না তোমার কাছে! কিন্তু সে-কথা কি তাঁর কানে যাচ্ছে? কেন আমাকে বাঁচিয়ে রেখে এ শাস্তি দিচ্ছেন, তিনিই জানেন!'

'মা, মাথায় একটু মধ্যমনারায়ণ তেল দিয়ে দি?'

'দে। তোর মত করে দিতে কেউ পারে না। ছোটখোকাও না, বউমারাও না। তেল দিতে দিতে আরামে একেবারে চোখ বুঁজে আসে।'

বোঁজা চোখ খুলতে হল পায়ের শব্দ পেয়ে।

'কে বামুনঠাকরুণ?'

ধরা পড়ে গেল বামুনঠাকরুণ।

'হ্যাঁ।'

'চৌকাঠে রোদ এসে গেল; এত বেলা হল স্নান করে ফিরতে? হাতে ও কী?'

'বাজার থেকে জিনিস কিনে নিয়ে এলাম।'

'জিনিসটা কী—সেই কথাটাই তো জিজ্ঞাসা করছি!'

বড়খোকা পিছন থেকে ইশারা করছেন বামুনঠাকরুণকে চলে যেতে।

'একটু জর্দা আর পাথরের বাটি গোটাকয়েক!'

'ছোটবউমার বুঝি? পাথরের বাটি আবার কেন?'

বামুনঠাকরুণ কোন উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

'বামুনঠাকরুণ পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না পারত-পক্ষে। বেঁচে থাকতেই এই খোয়ার! মরলে পরে শ্মশানঘাটে না নিয়ে গিয়ে, পথের উপর টেনে ফেলে দেবে নিশ্চয়। তাতে ক্ষতি নেই। মরবার পর যা হয়, তাই করো তোমরা; কিন্তু মরবার আগে যেন আমাকে ব্যাসকাশীতে নিয়ে গিয়ে ফেলো না! তা হলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়! শত্রু, শত্রু! দুধকলা দিয়ে যাদের পুষেছি, তারাই এখন উলটে ছোবল মারতে আসে! এ বাঁচা কি আর বাঁচা! কিন্তু এ বিড়ালের-প্রাণ যায় কই! বেঁচে, বেঁচে, একেবারে ঘেন্না ধরে গেল নিজের উপর। কাশীতে বাস করে চার বছরের মধ্যে একদিন গঙ্গাস্নান করি নি।'···

'মা, গঙ্গাস্নান করতে যাবে?'

'দ্যাখ্ বড়খোকা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে আর দিস না। ঠাট্টা করছিস আমার সঙ্গে?'

'ঠাট্টা কেন হতে যাবে। সত্যি বলছি।'

'আমি নড়ে এঘর থেকে ওঘরে যেতে পারি না, আমি যাব গঙ্গাস্নান করতে! সে যাব একেবারে তোদের কাঁধে চড়ে মণিকর্ণিকা ঘাটে! কিন্তু সেদিন আসছে কোথায়। যমের দয়া হয়, তবে তো।'

'আমি নিয়ে যাব তোমাকে গঙ্গাস্নান করাতে।'

'কাঁধে করে?'

'সে যেমন করেই হোক না; তোমার তা দিয়ে কি দরকার, তোমার তো স্নান করা নিয়ে কথা। ছোটখোকা!'

'কি বলছ দাদা?'

'মাকে একবার গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতে হবে। রিকশায় সুবিধা হবে না, কি বলিস?'

'মা কি পারবে? ডুলি, পালকি যে আজকাল উঠে গিয়েছে।'

বামুনঠাকরুণ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল যে ওই মন্দিরের সম্মুখে ডুলি, পালকি এখনও ভাড়া পাওয়া যায়।

সাড়া পড়ে গেল বাড়িতে। মা গঙ্গাস্নানে যাবেন; যত বেশী লোক সঙ্গে থাকে ততই ভাল। বড়বউ, ছোটবউ সবাইকে যেতে হবে। গঙ্গাস্নানের নামে মা-ও বেশ উত্তেজিত হয়েছেন। অনর্গল অবান্তর কথা বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন পালকি এসেছে শুনে।

তাঁর এই বাকসংযমে সকলে আশ্চর্য হল। চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছে, হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায়। বোধহয় যেতে অনিচ্ছা, কিন্তু এ বোধটুকু এখনও আছে যে পুণ্যসঞ্চয় করতে রাজী না হওয়াটা দেখাবে অত্যন্ত খারাপ।

ছোটখোকা মা'র চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিজের কাছে রাখলেন। কোলপাঁজা করে তুলে তাঁকে পালকিতে শোয়ান হল। চোখ বুঁজে পড়ে থাকলেন তিনি।

'এই যে, নমস্কার !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার। আমরা বড় ব্যস্ত এখন। দেখছেন তো মাকে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছি।'

এমন সময়ে সব আসে ! সকলে বিরক্ত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

বাড়িওয়ালা বললেন, 'এঁদের নিয়ে এসেছিলাম ঘর দেখাবার জন্য।'

ছোটখোকা বললেন, 'আর সময় পেলেন না ?'

বড়খোকা ওষ্ঠের উপর তর্জনী রেখে সকলকে সংকেত করলেন চুপ করবার জন্য।

বাড়িওয়ালা নাছোড়বান্দা। তিনি বড়খোকাকে গলির মধ্যে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকেই যাওয়া ঠিক তো ?'

যাতে ওঁদের কথাবার্তা মায়ের কানে না যায়, সেইজন্য ছোটখোকা পালকি-বেহারাদের সঙ্গে জোরে জোরে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছেন। দুই জায়েও নিজেদের মধ্যে গল্প করছেন কোন্ ঘাটে স্নানের সুবিধা, সেই সম্বন্ধে।

বড়খোকা অনুচ্চ স্বরে বাড়িওয়ালাকে জানালেন যে আজই তাঁদের যাবার ইচ্ছা ; তবে এখনও সঠিক বলা যায় না। এই অনিশ্চয়তার জন্যই পুরো মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হয়েছে।

ঘড়েল বাড়িওয়ালা অপ্রস্তুতের একশেষ হবার ভাব দেখালেন। 'না না, ভাববেন না যে আমার তর সইছে না। বাড়ি খালি করবার জন্য তাগিদ দিতে আমি আসি নি। আমি এসেছিলাম প্রমীলাঠাকরুণের সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য। এতকালকার ভাড়াটে আমাদের।'

'না না, মার সঙ্গে এখন দেখা হবে না। ওঁর শরীরের কথা জানেনই তো।'

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন বাড়িওয়ালা।

'কোন ঘাটে স্নান করবে মা ?'

মা নীরব।

'অহল্যাবাঈ ঘাটে ?'

বৃদ্ধা নিরুত্তর।

'তবে দশাশ্বমেধে যাই ?'

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। চোখ বুঁজে শুয়ে রয়েছেন তিনি। ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সকলে এ ওর দিকে তাকালেন। চোখে প্রশ্ন। মা কেন এমন ভাবে দাঁতে দাঁত চেপে কাঠের তক্তার মত পড়ে রয়েছেন ?

দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির উপর একেবারে জলের কাছে তাঁকে পালকি থেকে বার করা হল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন তখন তিনি। ছেলে আর পুত্রবধূরা মিলে তাঁকে ধরলেন জলে নামাবার জন্য।

এতক্ষণে বৃদ্ধা কথা বলেছেন !

'তোমরা সব সরে যাও ! তোমাদের স্নান করিয়ে দেবার দরকার নেই। স্নান করিয়ে দেবে, যারা পালকি বয়ে এনেছে তারা।'

বিশ্বাস পাচ্ছেন না তিনি ছেলেদের।

ছেলে আর বউরা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্নানপর্ব কোন রকমে শেষ হল।

বাড়িতে ফিরে, বৃদ্ধাকে সবে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, অজয় এসে খবর দিল জ্যাঠামশাইকে দুজন ভদ্রলোক বাইরে ডাকছেন।

নাছোড়বান্দা বাড়িওয়ালা আবার এসেছেন একজন হবুভাড়াটেকে সঙ্গে করে।

'আবার কি ?'

'এই ইনি···'

'একটু আস্তে কথা বলুন !'

'ইনি ছাড়লেন না কিছুতেই। আমি বলছি যে আপনারা এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছেন ; আজ চলে যাবেন কিনা সেকথা জিজ্ঞাসা করবার আমার কোনই অধিকার নেই। তবু উনি শুনবেন না কিছুতেই। আচ্ছা, আজ যাওয়া কি সত্যিই অনিশ্চিত ; না আমি এঁদের কথা দিতে পারি ?'

'বিশ্বাস করুন আমাদের কথা ; আমরা চাই যেতে ; কিন্তু হবে কিনা বলতে পারি না। এই অনিশ্চয়তার উপর আমাদের কোন হাত নাই। এর কারণ আপনাকে বলবার মত নয়। বললেও সেকথা আপনার ওই হিসাবেভরা মাথায় প্রবেশ করবে না। সেইজন্য হাতজোড় করে বলছি যে আর জ্বালাতন করতে আসবেন না আমাদের !'

দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বড়খোকা বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন।

'কে এসেছিল রে বড়খোকা ?'

'ওরাই দুজন আবার এসেছিল।'

আর মিথ্যা না বলে উপায় নাই।

'পাল্কি-বেয়ারারা।'

'কেন ?'

'একটা আধুলি বদলে নিয়ে গেল। মা, এবার তোমার খাওয়ার সময় হয়ে গেল।'

'এখনই ?'

'স্নানের পর তো তুমি না খেয়ে থাকতে পার না আজকাল।'

'কে বলল, পারি না ? বউমারা লাগিয়েছে বুঝি ?'

'না না, বউমারা কেন লাগাবে।'

বৃদ্ধার খাওয়ার উপর লোভ ষোল আনা ; কিন্তু খেতে ভয় পান। বিশ্বাস পান না বাড়ির লোকদের। ত্রিকুটের জিলিপি ভাজবার গন্ধ তাঁর নাকে আসছে। বুঝতে পারছেন তাঁরই জন্য ভাজা হচ্ছে। এইটাই তাঁর সব চেয়ে প্রিয় খাবার ; কিন্তু আজকাল দাঁত না থাকায় চুষে চুষে খেতে হয়।

এখনও ঠাকুরকে উৎসর্গ না করে মা কিছু খান না। তাই সব জিনিস তাঁকে সাজিয়ে দিতে হয় ; বারে বারে দেবার উপায় নেই।

মাকে খেতে দেওয়া হল।

এরপর কি ঘটবে সেকথা সকলের জানা।

আজকাল দুই-বেলা এই কাণ্ড খাওয়ার সময়।

বড়খোকা, ছোটখোকা, বড়বউ, ছোটবউ সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন।

'বড়খোকা, ছোটখোকা তোরা তো খেলি না ?'

'তুমি খেয়ে নাও আগে ; তোমার শরীর খারাপ।'

'তোদের না খাইয়ে কি আমি খেতে পারি। অন্তত একটু একটু খা।'

এর ব্যথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করবার নয়। বাতিক আর পাগলামি বলে মার এই আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় বটে; কিন্তু কথাটা বুকে বাজে ছেলেদের। সেই মা। এখনও সেইরকমই ভালবাসেন ছেলেদের। তবু নিজের খাবার থেকে ছেলেদের একটু একটু খাইয়ে, আগে পরীক্ষা করে নিতে চান, খাবারে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে কিনা। তিনি যে ওদের বোঝা!

এই ব্যথা ছেলেদের গা-সওয়া হয়ে এসেছে। মায়ের জন্য অনেক রুটিন-বাঁধা কাজ করতে হয় প্রত্যহ। তার মধ্যে এটাও একটা।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা আর একটু আলাদা। অষ্টপ্রহর যিনি যমের দুয়ারে মাথা কোটেন, খাবার সময় কেন তিনি মৃত্যুভয়ে পাগল, শাশুড়ীর আচরণের এই অসঙ্গতি নিত্য বউদের হাসির খোরাক জোটাত। আজ তারা গম্ভীর। সাহস নেই শাশুড়ীর ঘোলাটে চোখ দুটোর দিকে তাকাবার।

বড় খোকা, ছোট খোকা দুইজনেই চাকরি থেকে পেন্‌সন্‌ নিয়েছেন। ছেলেমেয়ে অনেক। কাশীতে একটা, আর বাড়িতে একটা, দু জায়গায় দুটো সংসার চালিয়ে যাবার মত আর্থিক সঙ্গতি আর তাঁদের এখন নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকে কাশী থেকে নিয়ে যাবার মনস্থ করেছেন তাঁরা।

'বড় বউমা, পাথরের বাটি দুটো এনেছ? দাও। এদিকে নিয়ে এস। সব জিনিস একটু একটু করে দিই তোদের। বড় খোকা, ছোট খোকা তোরা খা!'

বড়খোকা, ছোটখোকা দুজনই তাকিয়ে মেঝের দিকে। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই বউ। চারজনের মুখচোখেই একটা সন্ত্রস্ত, উদ্বেগবিহ্বল ভাব।

অপরাধ-চেতনার ক্ষীণদীপিকায় একটা জিনিস অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন তাঁরা। যেটাকে নিছক পাগলামি বলে মনে হত, তার মধ্যে সত্যের এক কণা লুকানো ছিল। পাগলামি নয়, অলোকদৃষ্টি।

ঘুমন্ত অবস্থায় ছাড়া, মাকে কাশী থেকে সরানো সম্ভব নয়। আজকের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'খা! খেয়ে নে তাড়াতাড়ি!'

## জোড়-কলম

চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে এই সুভেনির পুস্তিকা ডিরেক্টরগণের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইল।

ইহাকে কেহ যেন ওই কোম্পানীর ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন বলিয়া না ভাবেন। কারণ পুণ্যস্মৃতি স্থাপয়িতাদের স্থায়ী নির্দেশ অনুসারে লিখিত বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করা আমাদের নিয়ম বিরুদ্ধ। লোকের মুখে মুখেই আমাদের সংগ্রহের বিপত্তারিণী লেখনীগুলির অলৌকিক কীর্তিকাহিনী স্বতঃপ্রচারিত। যাঁহাদের দরকার, তাঁহারা ঠিক খোঁজ রাখেন। গত বৎসরের আই. এ. এস পরীক্ষার এক সফল পরীক্ষার্থী দ্বারা ব্যবহৃত যে কলমটি আমরা সম্প্রতি আমাদের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছি, ইহারই মধ্যে ছাত্রমহলে সেটির চাহিদার অন্ত নাই। এই সহযোগিতার জন্য জনসাধারণ আমাদের ধন্যবাদভাজন। তাঁহাদের

আনুকূল্যে আমরা গর্বিত ; কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, আমাদের সাহায্যপ্রার্থীরা এই প্রতিষ্ঠানের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই খবর রাখেন না। ত্রুটি অবশ্য আমাদেরই। এই রজতজয়ন্তী পুস্তিকা আমাদের সেই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস মাত্র।

কোম্পানীর আদি প্রতিষ্ঠাতা দুইজন আজ স্বর্গত। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর বৃদ্ধ বয়সে, অদম্য উৎসাহে নূতন ব্যবসায়ের বন্ধুর ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাহস তাঁহাদের ছিল। ব্যবসায় নির্বাচনের প্রতিভাও ছিল অনন্যসাধারণ। হাতে-কলমে তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন, যে কারবারে পুঁজি কম লাগে, বিপন্নকে সেবার ভাব বজায় থাকে, লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয় না, সেইরূপ কারবারই মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে উপযোগী। পথিকৃৎ হিসাবে 'হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' এবং 'কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়' এই দুই কর্মবীরের নাম বাঙালীর ব্যবসায়িক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

ওই দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তির ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ কি করিয়া একসঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল তাহা এক অতি বিচিত্র কাহিনী। জড়াইবার কথা নয়। দুইজনের নিবাস দুই জায়গায়। সরকারী চাকরি করিতেন বটে দুইজনই, কিন্তু বিভিন্ন বিভাগে। শুধু এক শুভক্ষণে চাকরিতে বদলির ফলে তাঁহারা এই মহকুমা শহরে আসেন। এই সময়েই তাঁহাদের প্রথম পরিচয়। তাঁহাদের জীবন যে একই সূত্রে গাঁথা একথা তাঁহারা তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। হারানচন্দ্র ছিলেন এক্সাইজ্-সাবইন্সপেক্টর, আর কৃষ্ণপদ ছিলেন ক্রিমিন্যাল কোর্টের নাজির। দুইজনেরই বয়স পঞ্চাশোর্ধে। চাকরিতে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ছাপোষা মানুষ। উপরি রোজগার ছিল বলিয়াই কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত।

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তখন অধিকাংশই ইংরাজ। এই মহকুমা শহরটির জল-হাওয়া ভাল। গ্রীষ্মকালে অন্য জায়গার তুলনায় গরম কম। নদীর ধারের ডাকবাংলাটিও সুন্দর। সেজন্য সাহেব অফিসাররা গরমের সময় সরকারী কাজের অজুহাতে যখন-তখন এখানে আসিতেন।

হারানবাবুর বড়সাহেব একসাইজ-কমিশনার একবার এখানে টুরে আসিয়াছিলেন। সেইদিনই ইন্সপেক্শনের অছিলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও এখানে আসিয়া হাজির। দুই সাহেব বিলাতে এক স্কুলে পড়িয়াছিলেন। সেজন্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। গরমের জন্য মেমসাহেবরা তখন শৈলনিবাসে। তাই দুই নামকরা তিরিক্ষি মেজাজের সাহেব আরও বদমেজাজী হইয়া উঠিয়াছেন। দেশীয় হাকিমরা পারতপক্ষে কেহ তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে চাহেন না ; নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেন অধস্তন কর্মচারীদের। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একটু করিতকর্মা, তাঁহারা আবার এই সুযোগে সাহেবকে নিজের নিজের কর্মপটুতা দেখাইতে সচেষ্ট।

হারানবাবুর উপরওয়ালা ইন্সপেক্টরবাবু এই ধরনের অতিমাত্রায় কর্মতৎপর ব্যক্তি। এক্সাইজ-কমিশনার আসিবার দুইদিন আগে তিনি হঠাৎ স্থানীয় দিশী-মদের দোকান ইন্সপেক্শনের ফলে আবিষ্কার করেন যে, সেখানে মদ ছাড়া, চোরাই গাঁজাও বিক্রয় করা হয়। সাংঘাতিক অপরাধ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপরে রিপোর্ট করেন যাহাতে ব্যাপারটা বড়সাহেবের নজরে পড়ে, ঠিক এখানে

আসিবার সময়। শুনিয়া হারানবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; কারণ জবাবদিহি সম্পূর্ণ তাঁহার। সাবইন্সপেক্টরের সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাঁহার নাকের সম্মুখে এরূপ আইনবিরুদ্ধ কার্য হইতে পারে না। কথা মিথ্যা নয়। এজন্য মদের দোকানদারের নিকট হইতে প্রতি মাসে কিছু নজরানা প্রাপ্য ছিল। ইন্সপেক্টরবাবুও এই টাকার অংশীদার ছিলেন। সেই ইন্সপেক্টরবাবু যে এমনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন তাহা হারানবাবু কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ডাকবাংলায় এক্সাইজ-কমিশনার সাহেবের খানা-পিনার ব্যবস্থার ভার সাবইন্সপেক্টরবাবুর উপর। পয়সা অবশ্য খরচ করে মদের দোকানদার। কিন্তু দায়িত্ব সাবইন্সপেক্টরের। মাথার উপর বিপদ; চাকরি লইয়া টানাটানি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এবারের ব্যবস্থা, অন্যবার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। আয়োজনের ভার দেওয়া হইল কলিকাতার সাহেবী হোটেলের উপর। প্রচুর লটবহর লইয়া সেখান হইতে বাবুর্চি আসিল। মাননীয় অতিথি একে সাহেব; তাহার উপর আবার আবগারী-বিভাগের মাথা। সুতরাং আহার্যের চেয়ে পানীয়ের ব্যবস্থা শতগুণ বেশী।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এক্সাইজ-কমিশনার দুইজনের স্থান হইয়াছে ডাকবাংলার দুই পাশাপাশি ঘরে। সকাল হইতে বিয়ার পান চলিতেছে। মধ্যে একবার গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব স্থানীয় নাজিরের অফিস ইন্সপেকশন করিয়া আসিলেন। অফিসের কিছু খাতাপত্র আরদালী আনিয়া রাখিল তাঁহার ঘরের টেবিলের উপর; রাত্রিতে কিংবা সকালে তিনি সময়মত এগুলিকে দেখিবেন। এখন এই নারকীয় গরমে বিয়ারই একমাত্র সান্ত্বনা।

ডাকবাংলায় ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আসিলে তাঁহার দেখাশোনার ভার পড়ে স্থানীয় নাজিরবাবুর উপর। এই সূত্রেই ডাকবাংলা কম্পাউণ্ডে প্রাতঃকালে হারানবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাজিরবাবুর। সাহেবদের কখন কিসের দরকার পড়ে বলা যায় না; সেজন্য উভয়েরই এইস্থান ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। ডাকবাংলার এক মোটর-গ্যারেজে উভয়ে আস্তানা লইয়াছেন। সেখান হইতে দেখা যায় না সাহেবরা ঘরের ভিতর কি করিতেছেন। সে খবর পাওয়া যাইতেছে বেয়ারাদের মারফত। অনবরত নূতন নূতন সমস্যা উঠিতেছে ও তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধানের চেষ্টা করিতে হইতেছে। দশ মিনিট সুস্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই। একসাইজ-কমিশনার সাহেবের খাস আরদালী পাঁচ টাকা লইবার পরও বড় জ্বালাতন করিতেছে। কখনও সে বলিতেছে ডিম তাজা নয়, কখনও বলিতেছে চায়ের দুধে গন্ধ। আরও দশটি টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দেওয়ার পর পচা ডিম তাজা হইয়া উঠিল, নষ্ট দুধ ভাল হইয়া গেল। একবার খবর আসিল সাহেবদের গরম লাগিতেছে। অমনি খসখসের পর্দায় অবিরাম জল ছিটাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে হইল। দুইজন সাহেবের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই বোধ হয় বেশী বদরাগী। কেননা, একবার দুঃসংবাদ পাওয়া গেল, পাংখা-পুলার ঢুলিবার অপরাধে তাঁহার নিকট প্রহার খাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নাজিরবাবু অফিসের দিকে ছুটিলেন, পালা করিয়া পাখা টানিবার জন্য দুইজন অতিরিক্ত লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়া শুনিলেন তাঁহার অনুপস্থিতিতে নাজিরের অফিস ইন্সপেকশন করিয়া গিয়াছেন ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব। লোহার

সিন্দুকের স্টক্ খাতাপত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন এবং কিছু কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়াও গিয়াছেন। সকলের অনুমান, হয়ত তিনি পূর্বেই নাজিরবাবুর বিরুদ্ধে কোন বেনামী চিঠি পাইয়াছিলেন।

শুনিয়া নাজিরবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই আশংকাই তিনি বহুদিন হইতে করিতেছিলেন। নাজারতের সিন্দুকে একটি সোনার গহনা বহুকাল হইতে পড়িয়াছিল। মোদ্দমার সূত্রে হয়ত কোন সময় ইহা কোর্টে দাখিল করা হইয়াছিল। কোন দাবিদার না থাকিলে নাজিরের নিকট জমা করা বাজে জিনিসগুলি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া ফেলা হয়। সোনার গহনা অবশ্য এ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। কন্যার বিবাহের সময় অভাবগ্রস্ত নাজিরবাবু উপরোক্ত গহনার সোনাটুকু কাজে লাগাইয়াছিলেন। এই চুরি ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আজ ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

চিন্তান্বিত হইবারই কথা। ভারাক্রান্ত মনে নাজিরবাবু যখন ডাকবাংলার মোটর গ্যারেজে ফিরিলেন, তখন বেয়ারা সাবইন্সপেক্টরবাবুকে সাহেবদের মানসিক আবহাওয়ার আধুনিকতম অবস্থার কথা জানাইতেছে। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের ওষ্ঠের উপর একটি মাছি বসিয়াছিল। সাবান দিয়া মুখ ধুইবার পর রাগে গরগর করিতেছেন তিনি। হঠাৎ হুংকার শোনা গেল, 'সাবইন্সপেক্টর!' হারানবাবু হন্তদন্ত হইয়া ছুটিলেন। এক্সাইজ-কমিশনার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ।

'মাছি মারবার ওষুধ একটু জোগাড় করতে পার?'

'ইয়েস সার।'

খট্ করিয়া জুতা ঠুকিয়া মিলিটারি কায়দায় হারানবাবু স্যালুট করিলেন। তাঁহার হাতে মশা-মাছির ওষুধ-ভরা পিচকারি।

ঘরে পিচকারি দিয়া ঔষধ দিবার সময় সাবইন্সপেক্টরবাবু শুনিলেন, বারান্দায় সাহেব দুইজন বলাবলি করিতেছেন যে, অসৎ কর্মচারিগণ সাধারণত বেশ কর্মপটু হয়। বিশেষ উৎসাহিত হইবার মত প্রশংসা নয়। তবে এই খবর নাজিরবাবুকে দেওয়া মাত্র, তিনি যে কাঁদিয়া ফেলিবেন, একথা সাবইন্সপেক্টরবাবু আন্দাজ করিতে পারেন নাই। কান্না আর থামিতে চাহে না। কাঁদিতে কাঁদিতেই তিনি নিজের বিপদের কথা হারানবাবুকে জানাইলেন। তাঁহাকে জেলে যাইতে হইবে এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে পথে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। নাজিরবাবুকে কী বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া যায়, সাবইন্সপেক্টরবাবু তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

দুইজনে নীরবে মুখোমুখি হইয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারা যায়। দুইজনই সমগোত্রের লোক। মাথার উপর খাঁড়া ঝুলিতেছে। কথা বলিলে, তবু সেই সময়টুকুর জন্য বিপদের ভয়টা একটু চাপা থাকে। মনের বোঝা হালকা করিবার জন্য নিজের নিজের দুঃখের কথা আরম্ভ করিতে হয়। দুইজনেরই আজ বাড়ী যাওয়া হয় নাই। বাড়ীর লোকরা কর্তাদের বিপদের কথা সম্ভবত জানেন না; তাঁহারা শুধু জানেন যে, বড়সাহেব আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ডাকবাংলা হইতে এক পা নড়িবার উপায় নাই। মুখে এই কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু উভয়ের মনে মনে ধারণা যে, এই বিষয় লইয়া এতক্ষণে পাড়ায় ঢিঢিক্কার পড়িয়া গিয়াছে। হিতৈষিণী প্রতিবেশিনীরা হয়ত

এতক্ষণে সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিবেকবুদ্ধি যে ভদ্রলোকদের বেশী, তাঁহারা হয়ত উপদেশবাণী শুনাইবার জন্য ডাকবাংলায় আসিয়া হাজির হইবেন। আরও কত কথা। আসন্ন সঙ্কটের চাপে দুইটি মন খুব কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বাবুর্চি একবার আসিয়া আশ্বাস দিয়া গেল যে, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। সাহেবরা ঠিক পথে চলিয়াছে। বহু সাহেব লইয়া সে প্রত্যহ ঘাঁটাঘাঁটি করে। নিজের অভিজ্ঞতায় সে বলিতে পারে যে, যে সকল সাহেব প্রাতঃকাল হইতে শরীর লইয়া বসে, তাহাদের খুশী করা খুব সহজ। সামলানো কঠিন, যাহারা দুই তিন পেগের অধিক পান করে না তাহাদের। এখানকার সাহেব দুইজন যে ভাবে মদ্য পান করিতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে যে, এত কষ্ট করিয়া রন্ধিত আহার্য দ্রব্যগুলি সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত রহিয়া যাইবে।

এই আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও বাবুদের উদ্বেগের নিরসন হয় না। তাহাদের দুশ্চিন্তার কারণ যে আরও গভীরে, তাহা কলিকাতার বাবুর্চির জানা নাই।

তবে নাজিরবাবুর বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিবার পর হইতে, নিজের বিপদকে আর সে রকম বড় বলিয়া মনে হইতেছে না সাব-ইন্সপেক্টরবাবুর। নাজিরবাবুকে অবধারিত শ্রীঘর বাস করিতে হইবে। সে তুলনায় তাঁহার বিপদ আর কতটুকু।

বিকালের দিকে সম্মুখের মাঠে টেবিল-চেয়ার দিবার হুকুম হইল। এতক্ষণ চলিতেছিল মদ্যপানের ছেলেখেলা। এইবার আসল মদ খাওয়া আরম্ভ হইল। হাতপাখা দিয়া দুইজন লোক সাহেবদের পিছনে দাঁড়াইয়া অনবরত হাওয়া করিতেছে। সাহেবরা কি যেন একটা মজার গল্প করিতেছেন। মোটর-গ্যারাজ হইতে দুই জোড়া চক্ষুর নিষ্পলক চাহনি সেইদিকে কেন্দ্রিত। সাহেবরা হাসিতেছেন ; মেজাজ তাহা হইলে এখনও ভাল আছে। এইটুকু ভরসা।

কলিকাতার বাবুর্চির আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হইল। সাহেবরা নৈশভোজন প্রত্যাখ্যান করিলেন না। ভাল জিনিসের কদর তাঁহারা বোঝেন।

এক্সাইজ্ কমিশনার হুঙ্কার ছাড়িলেন—'সাবইন্সপেক্টর !'

'ইয়েস সার।' ছুটিয়া গিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইয়াছেন হারানবাবু।

মুখে হাসি এক্সাইজ্ কমিশনার সাহেবের।

'এসব ব্যবস্থা কে করেছে ?'

'এই অধম সেবক, সার।'

'বেশ বেশ। উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।'

'আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করেছেন আমার বন্ধু নাজিরবাবু।'

এতক্ষণে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের টনক নড়িল। মুখের হাসি গিলিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার নাজির ?'

'ইয়েস সার।'

'আপনার বন্ধু ?'

'না সার, বন্ধু ঠিক নয় ; তবে হ্যাঁ, বন্ধুও বলা চলে। ডাকব তাঁকে সার।'

'না।'

হারানবাবু মোটর-গ্যারেজে ফিরিয়া অপেক্ষমান নাজিরবাবুকে জানাইলেন যে, দুই সাহেবই খুব খুশী।

সাব-ইন্সপেক্টরবাবুর মনের বল বাড়িয়েছে। মোটর-গ্যারাজের বাহিরে চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিলেন। এতক্ষণ তাঁহার এ সাহস ছিল না। সেজন্য সরকারী ধড়াচূড়া পরিয়া ওই গরমে ঘরের মধ্যে বসিয়া অনর্থক গলদঘর্ম হইতেছিলেন। নাজিরবাবু কিন্তু কিছুতেই বাহিরে আসিয়া বসিতে রাজী হইলেন না।

ডিনারের পরের পানীয়ের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। যে বেয়ারা মদ্য ঢালিয়া দিতেছে তাহার বিশ্রাম নাই। যে দুই ব্যক্তি হাতপাখা চালাইতেছে, তাহাদেরও না। সাহেবেরা শার্ট খুলিয়া শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়া বসিয়াছেন ; তবু অসম্ভব গরম লাগিতেছে। কিন্তু মেজাজ ভাল আছে। হাসি গল্প চলিতেছে। সম্ভবত রসের গল্প। অন্তত সরকারী কাজকর্মের যে নয়, এ কথা হাসির উচ্চরোল হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এইবার সাহেবরা গেঞ্জি খুলিতেছেন। গ্লাসে গ্লাসে ঠেকাইয়া আবার নতুন করিয়া আর এক দফা আরম্ভ হইল। গলার স্বর ক্রমে উচ্চ হইতেছে। দুইজনই হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার বাবুর্চি দুই প্লেট আহার্য ও একমুখ হাসি লইয়া মোটরগ্যারেজে উপস্থিত। সাহেবদের সে খুশি করিতে পারিয়াছে ; এখন সে নিজের প্রশংসা বাবুদের নিকট হইতে শুনিতে চায়। সেই খবর দিল যে,, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, খানা-পিনার জন্য নাজিরবাবু কত খরচ করিয়াছেন। সে বলিয়াছে একশ টাকা আর চারশ টাকা দিয়াছেন সাবইন্সপেক্টরবাবু। শতচেষ্টা করিয়াও সে নাজিরবাবুকে কিছু খাওয়াইতে পারিল না। হারানবাবুর দেখা গেল আহারে রুচি আছে ; সামান্য পানীয়ের উপরও তিনি বীতস্পৃহ নহেন। যাইবার সময় বেয়ারা বলিয়া গেল যে, সাহেব দুইজনের এতক্ষণে রঙ লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

রঙ লাগুক আর নাই লাগুক গরম লাগিতেছিল ঠিকই। সাহেবরা হাফপ্যাণ্ট খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আরদালী আসিয়া উঠাইয়া লইয়া গেল। মুহূর্তের জন্য নাজিরবাবু চোখ বুঁজিয়া ফেলিয়াছিলেন। চোখ খুলিলে দেখিলেন, আণ্ডার উইআর পরিহিত সাহেব দুইজন মাঠে পায়চারি করা আরম্ভ করিয়াছেন।

তাহার পর ইংরাজী গানের এক কলি শুনিতে পাওয়া গেল। দুইজনে গলা মিলাইয়া গান গাহিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজী কোন নৃত্যের ধরনে পদক্ষেপেরও চেষ্টা আছে! বাবুর্চি, আরদালী, বেয়ারা, পংখাপুলার সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাছাকাছি রাস্তার কুকুরের দল পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করিল। ডাকবাংলার গেটের কাছে এত রাত্রিতেও জনকয়েক লোক জড়ো হইয়া গেল।

'সাবইন্সপেক্টর!'

আবার হুংকার কেন? বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে হারামবাবুর!

'ইয়েস সার।'

'কুকুরদের এই উৎকট চীৎকার বন্ধ করতে পার না?'

'ইয়েস সার।'

ভাবিবার সময় নাই। কিছু বিহিত না করিতে পারিলে নিস্তার নাই। নাজিরবাবুকে পাঠান হইল থানায় একটা খবর দিতে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাম করিয়া বলিলে পাহারাওয়ালাদের যদি কুকুর তাড়াইবার হুকুম দেন দারোগাবাবু। থানার দারোগার এ লাইনে অভিজ্ঞতা অনেক কালের। তিনি বলিলেন, লাঠি হাতে পাহারাওয়ালাদের দেখিলে কুকুররা আরও বেশী করিয়া ডাকে।

'এখন উপায় ?'

ভগবানের নাম লওয়া ব্যতীত আর কোন উপায়ের কথা থানার দারোগার মনে পড়িল না।

সে রাত্রিতে ভগবানও বোধহয় সজাগ ছিলেন। নাম স্মরণের ফল ফলিতে দেরী হইল না। খামখেয়ালী কুকুরগুলো যেমন হঠাৎ ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তেমন অকারণেই ডাক বন্ধ করিয়া দিল। ধড়ে প্রাণ আসিল।

'সাব-ইন্সপেক্টর !'

আবার কি হইল ? ধাবমান হারানবাবু নিজের হৃৎস্পন্দনের ধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন।

'উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তোমার।'

'নো সার।'

'কী বললে তুমি ?'

'নো নো ! ইয়েস সার।'

'উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তোমার।'

'ইয়েস সার।'

'তবে কেন ইন্সপেক্টরটা তোমার দুর্নাম করবার চেষ্টা করে ?'

'জানি না সার।'

'জান না ? জানা উচিত। অবশ্য জানা উচিত।'

'ইয়েস সার।'

'আরদালী ! টেবিলের উপর থেকে ফাইলটা নিয়ে এস।'

'এই নাও। দেখ। পড় ! জোরে জোরে পড়।'

হারানবাবু জোরে জোরে পড়িলেন ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট।

'পনরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে।'

'ইন্সপেক্টর এখন কোথায় ?'

'একসাইজ্ ক্লাবে আছেন তিনি।'

'আমরা এখানে জেগে আছি, আর সে এক্সাইজ ক্লাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে ? এখনই ডেকে আন তাকে !'

'ইয়েস সার।'

উর্দি পরিয়া, কাগজ-পত্র লইয়া ডাকবাংলায় আসিতে আসিতে, ইন্সপেক্টরের ঘণ্টাখানেক সময় লাগিয়া গেল। এ এক ঘণ্টা সাহেবেরা বৃথাই নষ্ট হইতে দেন নাই। তাঁহাদের নৃত্যের সুবিধার জন্য নাজিরবাবুকে ডাকবাংলার চাপরাসীর ভাঙ্গা গ্রামোফোনটি বাজাইতে হইয়াছে। প্রতি রেকর্ড শেষ হইবার পর,

সাহেবরা একবার করিয়া তাঁহাদের পূর্ণ গ্লাস নিঃশেষ করিয়াছেন। কলিকাতার বাবুর্চি নাজিরবাবুর নিকট স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এরূপ একজোড়া কাবিল সাহেব দেখিবার সৌভাগ্য পূর্বে তাহার হয় নাই।

ইন্সপেক্টর যখন আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন তখন সাহেবরা চেয়ারে উপবিষ্ট।

'তোমার মধুর-স্বপ্নে ব্যাঘাত করবার জন্য আমি দুঃখিত। এস এই নাও তোমার রিপোর্ট। পড় জোরে জোরে!'

'পনরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে।...'

'কলম আছে তোমার কাছে? নাই?'

তাড়াতাড়িতে ইন্সপেক্টর কলম আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। হারানবাবু অতি কুণ্ঠার সহিত নিজের পকেট হইতে কলমটি বাহির করিয়া ইন্সপেক্টরের হাতে দিলেন।

এক্সাইজ কমিশনার সাহেব তাড়া দিলেন ইন্সপেক্টরবাবুকে—সাব-ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তবে না তুমি শহরের মদের দোকান দেখতে গিয়েছিলে? অমন করে ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছ কেন? বুঝতে তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের এত দেরী হওয়া উচিত নয়। সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া'—এই কথা কয়টি ঢুকিয়ে দাও, তোমার রিপোর্ট আরম্ভের জায়গাটায়। হ্যাঁ লেখ! হল! এবার পড় জোরে জোরে।'

ইন্সপেক্টর কম্পিত কণ্ঠে পড়িলেন—'সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া, পনেরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে।...'

'ঠিক আছে। ওতেই হবে। চোরাই গাঁজা বিক্রয়কারীকে ধরবার কৃতিত্ব তোমাদের দুইজনেরই সমান। ডিপার্টমেন্ট একথা মনে রাখবে। এখন তুমি যেতে পার।'

ইন্সপেক্টরকে নীরবে গেট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া হারানবাবু ফিরিতেছেন। হঠাৎ আবার হাঁক শোনা গেল—'সাব-ইন্সপেক্টর!'

'ইয়েস সার!'

'তোমার নাজিরকে ডাক।'

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবও চেয়ারে একটু যেন নড়িয়া বসিলেন।

'নাজির, এমন পরিপাটি ব্যবস্থার জন্য তোমাকেও আমাদের ধন্যবাদ জানান উচিত।'

নাজিরবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

সাহেব তাড়া দিলেন।

'উঠে দাঁড়াও! আমার কথার সত্য জবাব দাও। সেই সোনার গহনাটা ফেরত দিতে পার?'

'সে টাকা আমি হুজুরের খানা-পিনায় খরচ করেছি আজ।'

'শুধু চোর নও; তুমি একটি মিথ্যাবাদীও।' আরদালীকে ডেকে সাহেব ঘরের টেবিলের উপর থেকে খাতাপত্রগুলো আনতে বললেন।

'নাজির বার কর সেই পাতাটা। পেয়েছ? পড় কি লেখা আছে।'

'Gold bangles—one pair'

'কলম আছে?'

হারানবাবু নিজের কলমটা এগিয়ে দিলেন নাজিরবাবুকে।

'গোল্ড-এর আগে রোল্ড কথাটা লিখে দেবে তুমি, বুঝেছ। রোল্ডগোল্ড জানতো? রোল্ড গোল্ড-এর জিনিস যদি তিন বছর নাজারতে পড়ে থাকে তাহলে সেটাকে নষ্ট করে দিলে কোন অপরাধ হয় না। রোল্ড কথাটার বানান জান? জান না? আর, ও, এল, এল, ই, ডি—রোল্ড। না না আমার চোখের সম্মুখে লিখতে হবে না। রেজিস্টারখানাকে তুমি ওই মোটরগ্যারাজের মধ্যে নিয়ে যাও। রোল্ড রোল্ড কথাটা একখানা কাগজে আগে এক হাজারবার লিখবে ওই ঘরে বসে। এই হল তোমার শাস্তি। তারপর রেজিস্টারে লিখবে। তুমি একটি র‍্যাস্‌কাল! যাও! শিগগির যাও আমার সম্মুখ থেকে!'

হারানবাবু ও কৃষ্ণপদবাবু যে কলমটিকে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার সময় ব্যবহার করেন, সেই কলমটিই চ্যাটার্জি এণ্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাথমিক পুঁজি।

উপরোক্ত ঘটনার পরই হারানবাবু স্বপ্নাদেশ পান, ওই কলমটিকে আর্তসেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য। তখন হইতে এই লেখনী বিপন্নের উদ্ধারকল্পে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।

হারানচন্দ্র ও কৃষ্ণপদ উভয়েরই ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহারা উক্ত ধরনের সেবাকার্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। তাহার পরই আরম্ভ হয় পয়মন্ত লেখনী সংগ্রহের কাজ। এ কাজের ভার ছিল হারানচন্দ্রের উপর। কারণ এখান হইতে অন্যত্র বদলি হইবার হুকুম আসিবার পর, তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপদবাবুর পেন্সন লইবার বয়স হওয়া পর্যন্ত চাকরি করিয়াছিলেন।

স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী অষ্টোত্তর শত সুলক্ষণা লেখনী সংগৃহীত হইবার পর, আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। ইহার পরের বিবরণ এই কোম্পানীর জয়-যাত্রার ইতিহাস। সে কাহিনী আপনাদের সকলের জানা।

## বয়োকমি

অনেক দূর পর্যন্ত ভেবেচিন্তে আহ্লাদী কাজ করে। ছেলেকে জুতো পরে আসতে দেয় নি। সিধু এমনিতেই মায়ের খুব বাধ্য। তার উপর আবার কলকাতায় আসবার আগে মা সাবধান করে দিয়েছে যে মামাবাড়িতে থেকে এনজিনিয়ারিং পড়বার ইচ্ছা যদি থাকে, তবে যেন সে মামামাসীর সম্মুখে কোনরকম বেয়াড়াপনা না দেখায়। তাই বাড়ি থেকে খালি পায়ে বার হবার সময় সে কোন আপত্তি করে নি। এখন ফেরবার সময় পিচ্‌ গলানো গরম রাস্তার উপর প্রথম প্রতিবাদ জানাল।

'রবারের স্যাণ্ডাল পায়ে থাকলে ঠাকুরের প্রসাদ কি করে যে অপবিত্র হত বুঝি না।'

'যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস কেন ? পায়ের নীচে আমার ফোসকা পড়ছে না ? রোদে গরমে আমার মত মোটা মানুষদের কষ্ট তোদের চেয়ে অনেক বেশী, বুঝলি ?'

'আর মাথায় রোদ্দ লাগছে কার বেশী ?'

আহ্লাদী হাসল।

'আমিও একবার ছোটবেলায় মাথা নেড়া করেছিলুম।'

'কেন ?'

'উকুন হয়েছিল মাথায়।'

চৈত্রসংক্রান্তির মেলা কিনা আজ, তাই এত যাত্রীদের ভিড়। অন্যদিন এলে এ ভিড় ঠেলতে হত না। কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তির দিনই যে তার এখানে কাজ! কম ধকল যায়নি আজ আহ্লাদীর শরীরের উপর দিয়ে।

যাক, এতদিনে তবু কাজটা শেষ হল। ঠাকুরদেবতার কাছে কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারবার অশান্তি যে কী জিনিস, সে যার হয়েছে সেই জানে। কথাটা অষ্টপ্রহর মনের মধ্যে কিরকির করে বিঁধত এতদিন। আঠার বছর পরে মাথার উপর থেকে সে বোঝা নামল আজ। সিধুর জন্ম মাঘ মাসে ; মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র—তিন মাস। সিধুর বয়স হল আঠার বছর তিন মাস। সে কি আজকের কথা! আহ্লাদীর ঠাকুমা তখন মৃত্যুশয্যায়।

তাড়াতাড়ি নাতির মুখ দেখবার আশায় তিনি বাবা তারকনাথের কৃপাপ্রার্থিনী হয়েছিলেন। তিনিই নাতনীর কাছে মাদুলি পাঠিয়েছিলেন। কত আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয় সেই মাদুলি ধারণের সময়। প্রথম কিনা। এখন ভাবলেও হাসি আসে। সিধুর পর তার আরও সাতটি সন্তান হয়েছে।

'সিধু রুমালখান মাথায় বেঁধে নে না। দে প্রসাদের ঠোঙ্গাটা ততক্ষণ দে আমার হাতে।'

রুমাল বাঁধবার সময় আহ্লাদী বেশ করে তাকিয়ে দেখল ছেলের মুখখানা। যা বড় বড় দাড়ি গজিয়েছিল এই বয়সেই। দাড়ি গোঁফ ফেলতে দেয়নি। বাবা তারকনাথের কাছে ওর জট মানত ছিল। মাথার ছাঁটা চুল আঠার বছর থেকে এক থলের মধ্যে জমা করে রাখা হত। কিন্তু ছেলেমানুষের দাড়ি গোঁফের বেলা ও ব্যবস্থা অচল। সিধুরই হয়েছিল মুশকিল। কতবার সে মাকে বলেছে একবার তারকেশ্বরে গিয়ে এ পর্ব শেষ করে দিতে ; কিন্তু হয়ে ওঠেনি এতদিন। অভাব অনটনের সংসার আহ্লাদীর। তার মত মানুষ কি ইচ্ছা হলেই সেই দূর দেশ থেকে তারকেশ্বরে আসতে পারে। তাছাড়া কর্তার এসব বিষয়ে চাড় থাকে তবে তো। ছেলেপিলের দায়িত্ব শুধু যেন একা মায়ের। এবার ছেলের 'হায়ার সেকেন্ডারী' পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, আহ্লাদী সিধুকে সঙ্গে নিয়ে একরকম জোর করে চলে এসেছিল দমদমায় দাদার বাড়িতে। তারকেশ্বরের কাজটা ছাড়া, অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। এই অন্য উদ্দেশ্যটাই আসল। সতর বছর পরে এসেছিল বাপের বাড়িতে, দ্বিধা সংকোচ দূরে ঠেলে। বাপের-বাড়ি মানে দাদার বাড়ি। দাদা কখনও আসতে লেখেনি তাকে। দাদা বউদি চিঠি না লিখুক তাকে, সে কিন্তু কোন বছর বিজয়ার প্রণাম জানাতে ভোলেনি তাদের।

প্রসাদের ঠোঙাটা ছেলের হাতে আবার দিল আহ্লাদী।

'ঠোঙাটা বউদির হাতে দিবি কিন্তু সিধু। তারপর বউদিকে প্রণাম করতে ভুলিস না যেন।'

বাসস্ট্যাণ্ডের কাছের গাছতলায় পেঁছিতে পেরে তারা বাঁচল। এখানেও বেশ লোকজনের ভিড়। বাড়ি ফেরবার আগে এই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ির হাত থেকে নিস্তার নাই। তাদের লাইনের বাস পনের মিনিট পর পর ছাড়ে। আগের খানায় জায়গা পায়নি তাই এর পরের বাসখানার জন্য অপেক্ষা করছে দুজনে আর অন্যমনস্কভাবে বিভিন্ন বাসের যাত্রীদের আনাগোনা দেখছে। হঠাৎ নজরে পড়ল। ও কে? ওই যে বাস থেকে নামছে। বৃদ্ধা বিধবাটির সঙ্গের বউটির মুখখানা যেন চেনাচেনা ঠেকছে। রোগা ক্ষয়াক্ষয়া চেয়ারা। অসীমার মত না?

বৃদ্ধার চোখমুখে বিরক্তির ভাব।

'আগে নামতে দিন আমাদের, তারপরে তো আপনারা গাড়িতে উঠবেন!'

বৃদ্ধাটি বেশ কড়া টাইপের।

অসীমার মতনই তো লাগছে।—'অসীমা না?'

'কে?'

দুইজনের বিস্ময়েভরা দৃষ্টি কেন্দ্রিত হল কথাটা যে বলেছে তার মুখের দিকে।

'কোগো তুমি বাছা'—এই কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধা সামলে নিলেন নিজেকে। এমন গিন্নিবান্নি গোছের মহিলার সঙ্গে একটু সমীহ করে কথা বলতে হয়।

'আমার বউমাকে চেনেন নাকি আপনি?'

আহ্লাদী হাসল।

'বাগবাজারে পাশাপাশি বাড়িতে আমরা যে কতকাল কাটিয়েছি এক সঙ্গে।'

'অনেকদিন পর দেখছেন বুঝি?'

অসীমা বলল—'তা অনেকদিন হ'ল বই কি।'

আহ্লাদী তাকিয়ে অসীমার মুখের দিকে। এ কি? অসীমার মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন? মাথার কাপড় টেনে দেবার কথাই বা তাকে দেখবামাত্র তার মনে পড়ল কেন? আহ্লাদীর দিক থেকে অমন সলজ্জভাবে মাটির দিকে চোখই বা নামিয়ে নিল কেন? একটু কেমন কেমন যেন লাগল আহ্লাদীর।

'চল বউমা। পেঁছিতে পেঁছিতেই তো বেলা উতরে গেল।'

'তা এত দেরী করে এলেন কেন আপনারা?'

'দেরী করলুম কি আর ইচ্ছা করে। কথা ছিল, ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। হঠাৎ সকালে ফোন করে ডেকে পাঠালেন প্রিন্সিপালসাহেব। কি যেন কাজ পড়েছে। ছেলে এনজিনিয়ারিং কলেজে কাজ করে কিনা। এই আসছে এই আসছে করে তার জন্য বসে বসে, শেষকালে দেরী দেখে নিজেরাই বেরিয়ে পড়লুম। এখন তো আর সময় নেই। একদিন বরঞ্চ আমাদের বাসায় আসুন; দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসে গল্প করে যাবেন। আচ্ছা চলি। আপনিও আসবেন।'

শেষের কথাটা বলা সিধুকে।

তাঁরা এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে গেলেন—'সাত নম্বর নগেন বারুইয়ের গলি, বনহুগলী।'

বাস-এ বসে আহ্লাদী বলে—'কে যাচ্ছে! হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, মিটে গেল।'

তার উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছে বাল্য-বন্ধুর হাবভাব দেখে। আঠার বছর পর দেখা। কোথায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে তা নয়, একেবারে লজ্জায় জড়সড় শাশুড়ীর সম্মুখে। যেন কনে বউটি! আধিক্যেতা না? পঁয়ত্রিশ বছরের বুড়ী মাগী! হ্যাঁ, পঁয়ত্রিশ বছর তো হবেই। তার চেয়েও পাঁচ মাসের বড়, একথা ছোটবেলায় চিরকাল শুনে এসেছে। দেখতে ওকে চিরদিনই অনেক ছোট লাগে বয়সের চেয়ে। বেঁটে আর ক্ষয়াক্ষয়া গোছের যাদের চেহারা তাদের বয়স বোঝা যায় না। কিন্তু তাই বলে বয়স তো বসে থাকবে না!

মায়ের ফেলে-আসা স্বর্গরাজ্য বাগবাজারের গলির কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে সিধুদের মুখস্থ। সেখানকার স্বাদ, গন্ধ, বাতাস, লোকজনের কথাবার্তা, বন্ধুবান্ধবের ব্যবহার, ফেরিওয়ালার হাঁক, কলতলার ঝগড়া, গোলাপী-ঝির চীৎকার, সব মনে হত অন্য এক জগতের জিনিস সিধুদের কাছে। তাদের চেনা জগতের সঙ্গে একটুও মেলে না। জ্যোতির্মণ্ডলে ঘেরা সেই কল্পরাজ্যের মধ্যমণি ছিলেন অসীমা মাসী। কত গল্প আছে অসীমা মাসীকে নিয়ে। একবার ট্যাঁপারি গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে মরবার যোগাড়! একসঙ্গে দুটো ট্যাঁপারি গিলে ফেলবার ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে হয়েছিল এই কাণ্ড। তারপর থেকে মামারা ট্যাঁপারি বলে ডাকতেন অসীমা মাসীকে। সেই মানুষের সঙ্গে আজ চাক্ষুষ দেখা। কিন্তু ঠিক যেন ভাবা জিনিসটার সঙ্গে মিলল না। ওই পুঁচকে ঘোমটা টানা বউটাকে মায়ের সেই ছেলেবেলার বন্ধু বলে ভাবতে বাধে। মুখখানি কিন্তু বেশ কচি ঢলঢলে গোছের।

'আচ্ছা মা, ট্যাঁপারি মাসী তো তোমার সঙ্গে কথা বললেন না?'

'শাশুড়ী সঙ্গে ছিলেন কিনা।'

আহ্লাদী ভেবেছিল অসীমার ঔদাসীন্য বোধহয় ছেলের নজরে পড়েনি। ওই থাকে চুপ করে, কিন্তু আজকালকার ছেলেরা বোঝে সব।

'শাশুড়ী সঙ্গে থাকলে কি বন্ধুর সঙ্গেও কথা বলতে নেই?'

'কে জানে! শাশুড়ী নিয়ে ঘরও করিনি কোনদিন; ওসব কথা জানিও না।'

'বৃদ্ধার কথাবার্তা তো খারাপ না।'

'কেন, তোকে আপনি বলেছেন বলে?'

'ধুৎ!'

শেষ পর্যন্ত আহ্লাদীকে স্বীকার করতেই হ'ল।

'তুই ধরেছিস ঠিকই। চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ। আচ্ছা, যেতে দে এসব কথা। তুই কিন্তু নিয়ম করে দাদার ছেলেটাকে নিয়ে পড়াতে বসাবি সন্ধ্যাবেলা আজ থেকে।'

ও আর বুঝিয়ে বলতে হবে না সিধুকে।

পরের দিন রবিবার। দাদার ছুটি। আহ্লাদী প্রথম দিন দাদার বাড়িতে ঢুকেই ছড়া কেটেছিল—'বাপ রাজা তো রাজার ঝি; ভাই রাজা তো বোনের কি?' তখনই কথাটা না বললে পারত আহ্লাদী। শুনে দাদা একটু দুঃখিত হয়েছিলেন। নিজের কর্তব্যচ্যুতি সম্বন্ধে একটু সজাগও হয়েছিলেন। তাই রবিবারের দিন সকালে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমাদের সেই বাগবাজারের পুরনো পাড়া দেখতে যাবি নাকি রে আহ্লাদী?'

নেচে ওঠে আহ্লাদী। তুমিও চল না কেন বউদি। এক ঘণ্টার তো ব্যাপার। ছেলেমেয়েরা রইল তো কি হল। সিধু ওদের সামলাতে পারবে। তোমার তো মোটে তিনটি। আমি সেখানে আমার অতগুলো কাচ্চাবাচ্চাকে সিধুর উপর ফেলে দিয়ে কত সময় পাড়া বেড়াতে যাই। কত সময় ও আমার রান্না পর্যন্ত করে দেয়। গরীবের বাড়ির ছেলের সবরকমের কাজ নিজে হাতে না করতে শিখলে কি চলে।

তাদের পুরনো পাড়ায় গিয়ে আহ্লাদী চিনতেও পারে না কোথায় তাদের বাড়িটা ছিল। সেখান দিয়ে এখন প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা। ওই রাস্তাটা তয়ের হবার সময়ই ওদের এপাড়া ছেড়ে যেতে হয়। দাদা দেখিয়ে না দিলে সে ধরতেও পারত না তাদের বাড়িটা কোন জায়গায় ছিল। সে গলির চিহ্নমাত্র নাই।

'আর এইখানটাতে ছিল তোর সেই ট্যাঁপারিদের বাড়ি।'

'ট্যাঁপারি নামটা তোমার এখনও দেখছি মনে আছে দাদা। কাল যে ওর সঙ্গে দেখা হল তারকেশ্বরে। সঙ্গে ওর শাশুড়ীও ছিলেন।'

'মনে থাকবে না! এই তো তিন-চার বছর আগে ওর বিয়েতে নেমতন্ন খেয়ে এলুম। কী মুসকিলেই পড়েছিলেন ওর মা মেয়ের বিয়ে নিয়ে। বিয়ে হয়ই না, হয়ই না। যাক তবু ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ট্যাঁপারির ছোট্ট ভাই ফটিকের কথা মনে আছে না?'

'মনে আবার থাকবে না কেন। অষ্টপ্রহর অসীমার কোলে-কাঁখে থাকত ফটকেটা।'

'ফটিক বম্বেতে একটা চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল। খোঁজখবর বোধহয় বিশেষ নিত না। কেন না অসীমার বিয়ের সময়ও তাকে দেখলুম না। শুনলুম ছুটি পায়নি।'

'ছেলেপিলে মানুষ হয়েই বা কি, তবু মা-বাপে চায় তাদের ছেলেটা মানুষ হোক। বিশেষ করে বড় ছেলে। বড় ছেলেটা কোনরকমে তাড়াতাড়ি মানুষ হয়ে উঠলে বুকের বল বাড়ে মায়ের।'

'দেখা হলে অসীমা তোকে কি বলল, সে কথা তো তুই বললি না ঠাকুরঝি।'

'ছাই! শাশুড়ীর সম্মুখে একেবারে ভয়ে জুজু। ছেলেবেলার বন্ধুর দিকেও চোখ মেলে তাকাতে লজ্জায় মরে যায়। মাথার কাপড় টেনে দেবার সে কী ঘটা! কথা বলবে কী; যেন আপদ বিদায় হলেই বাঁচে!

'ঠাকুরঝি, জগতের ধারাই ওই।'

'হ্যাঁ, ঠিকই তাই। এ তো পাতানো সম্পর্ক; রক্তের সম্বন্ধ যেখানে সেখানেও জগতের ধারা এই!' খোঁচাটা যথাস্থানে লেগেছে। কেন না বউদি দাদা দুজনই চুপ করে গেলেন এরপর।

মঙ্গলবারের দিন সময় বুঝে আহ্লাদী আসল কাজের কথাটা পাড়ল বউদির কাছে।

সিধুর বাবার ইচ্ছা ওকে এবার চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার। সিধুর ইচ্ছা এনজিনিয়ারিং পড়বার। আজকালকার সব ছেলেই চায় এনজিনিয়র হতে। ওর অঙ্কে মাথা দেখে হেডমাষ্টারমশাইও ওকে এনজিনিয়ারিং পড়তে বলেছেন। বললেই তো হল না; তার জন্য রেস্তর দরকার। আর এদিকে সংসারের অবস্থা তো জানই বউদি। নুন আনতে পান্তা ফুরয়। আর, তোমার সংসারের পাত

কুড়িয়ে খেয়েও সিধুর মত দশটা ছেলে মানুষ হয়ে যেতে পারে। বউদি, তুমিও ছেলের মা। মায়ের দুঃখ-দরদ বোঝ। আপনজন বলতে তো এক তোমারই।···

'সে কথা তো ঠিকই ঠাকুরঝি।'

বউদি লোক ভাল।

এরপর জিজ্ঞাসা করতে হয় স্বয়ং দাদাকে। বউদির আপত্তি নেই; কাজেই দাদা রাজী।

ওই দূর থেকে মনে হয় ভাই পর করে দিয়েছে বোনকে। কিন্তু তা'ও কি সম্ভব। রক্তের সম্পর্ক যে। চিঠি না দিলে কি হয়; দাদা চিরকাল দাদাই থাকে।

মামা ভাগ্নেকে ডেকে বললেন—'স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হবে এনজিনিয়র হতে হলে। কাল থেকে সকালে ছাতে উঠে ডন-বৈঠক করবি বুঝলি? আর গুড়-ছোলাভিজে খাবি।'

চড়চড়ে রোদ জোছনার মত স্নিগ্ধ লাগল আহ্লাদীর। দমদমার হাওয়া বাতাসেও সেকালকার বাগবাজারের স্বর্গের স্বাদ গন্ধ।

খট্‌কা লাগল কলেজে ভরতি হবার কাগজপত্র আনবার পর। নিয়মাবলীর মধ্যে লেখা আছে যে, আবেদনকারীর নিম্নতম বয়স হওয়া উচিত সতর বছর। যার বয়স ষোল বছর এগার মাস উনত্রিশ দিন সেও দরখাস্ত দিতে পারবে না।

বাবা তারকনাথ সাক্ষী, সিধুর বয়স আঠার বছর তিন মাস। কিন্তু···

এই কিন্তু নিয়েই হয়েছে মুশকিল। সিধু বলছে যে, বাবা তারকনাথের সাক্ষ্য এনজিনিয়ারিং কলেজের কর্তারা মানেন না। তাঁরা দেখেন শুধু স্কুলে যে বয়সটা লেখান হয়েছে সেইটা। সেটা এখন মাত্র ষোল বছর।

স্কুলে ভরতি হবার সময় আর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তার সময়, বয়স কমানোটাই নিয়ম। এরই জন্য ছেলেটা এনজিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হতে পারবে না? বয়স কমিয়ে লেখানর মধ্যে যে এমন মারাত্মক ব্যাপার থাকতে পারে একথা আহ্লাদী কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এখন উপায়? এত গুছিয়ে এনে শেষ মুহূর্তে এমনভাবে সব ভেস্তে গেল! তার সব রাগ গিয়ে পড়ে সিধুর বাবার উপর। মানুষটাই ওই রকম। কাজ করতে না পারি, অকাজ করতে তো পারি—এ হয়েছে তাই! তখনই আহ্লাদীর মনে হয়েছিল, বাবা তারকনাথের দপ্তরে যে ছেলের বয়সের হিসাব লেখা-জোখা, তার বয়স কি কখনো কমাতে বাড়াতে আছে! কিন্তু সিধুর বাবার ভয়ে তখন সে কিছু বলেনি। এখন হল তো! তোমার আর কী হ'ল; যা কিছু হ'ল, ওই ছেলেটার! বাপ হয়েছ বলে কি এমনভাবে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অধিকার তোমার আছে?

আচ্ছা যা হবার তা তো হয়ে গেছে। ভুল শোধরাবার উপায়ও নিশ্চয়ই কিছু আছে।

'দাদা, তোমাদের তো অনেক কিছু জানাশোনা আছে। বলো এখন কি করা উচিত?'

দাদা হেসে আকুল।

'এতকাল সবাই চাইত বয়স কমাতে। এনজিনিয়ারিং কলেজগুলো দেখছি লোকের স্বভাব পালটে দেবে।'

আহ্লাদীর জীবন-মরণের প্রশ্ন আর দাদা হাসছে।

'না দাদা, তুমি অমনভাবে হেসে উড়িয়ে দিও না কথাটাকে।'

'হাসলুম আবার কোথায়। বয়স বাড়াবার উপায় থাকবে না কেন; হাজার গণ্ডা আছে। ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত দিয়ে অ্যাফিডেভিট করতে হবে যে আগে ভুল করে কম বয়স লেখানো হয়ে গিয়েছিল; এখন সঠিক বয়সটা জানতে পারায় বয়স এক বছর বাড়াবার দরকার পড়েছে। এই গেল নম্বর এক। দুই নম্বরের রাস্তা হচ্ছে, উপরে ধরাধরি করা। খুঁটির জোর থাকলে কোন কিছুতেই আটকায় না আজকালকার দিনে। কিন্তু সে খুঁটির জোর আমাদের নাই। তিন নম্বরের উপায় হচ্ছে, একখানা নতুন ঠিকুজি তয়ের করিয়ে নেওয়া। বলিস তো আমি ওই মোড়ের জ্যোতিষীকে বলে দিতে পারি। এত সস্তায় মিথ্যা ঠিকুজি তয়ের করে দেবার লোক এ তল্লাটে আর একটিও পাবি না।'

'কোন বিপদ-আপদ নেই তো এতে?'

'না না, সে-সব কিছু ভয় নেই। মামলা-মোকদ্দমার জন্য দরকার পড়লে লোকে হরদম এই করে বয়স বাড়ায়-কমায়। তবে...'

'হ্যাঁ, সেই তবেটাই ভাল করে বলো দেখি শুনি।'

'এখন কথা হচ্ছে যে কোর্টে যে জিনিস চলে, এনজিনিয়ারিং কলেজেও সে জিনিস চলে কি না। কলেজের সঙ্গে তো কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই ও সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলতে পারছি না।'

'তবে?'

এই সংকটের সময় আহ্লাদীর মনে পড়ল অসীমার বরের কথা। সে তো এনজিনিয়ারিং কলেজে কাজ করে। ঠিকই তো। দাদারও মনে পড়ল অসীমার বিয়ে হয়েছিল এনজিনিয়ারিং কলেজের প্রোফেসারের সঙ্গে। তার সঙ্গে দেখা করলে সঠিক খবর পাওয়া যেতে পারে। সে কোন রাস্তা নিশ্চয় বাতলে দেবে। আপনার লোক বলে একটু সুপারিশও করে দিতে পারে প্রিন্সিপালের কাছে।

গরজ বড় বালাই। মনে পড়ে গেল যে সেদিন তারকেশ্বরে অসীমার শাশুড়ী তাঁদের বাড়িতে যেতে বলেছিলেন তাকে। তাঁর গলার স্বরে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। নেহাত শিষ্টাচার হলে, বাড়ির ঠিকানাটা দূর থেকে চেঁচিয়ে ডেকে অমনভাবে জানিয়ে যেতেন না। মানুষটি নিশ্চয়ই ভাল। কি যেন বলেছিল ঠিকানাটা। সিধু তোর মনে আছে নাকিরে?

'সাত নম্বর নগেন বারুই-এর গলি, বনহুগলী।' সিধুর মনে থাকবে না? একবার যে বই পড়ে সে বই ওর মুখস্থ হয়ে যায়। এত মাথা ছেলেটার। কোন্ জিনিস থেকে যে কী হয় মানুষের, কেউ বলতে পারে না। এখন তার সংসারের ভবিষ্যৎ, তার ছেলের ভবিষ্যৎ, সব নির্ভর করছে অসীমার স্বামীর উপর। জয় বাবা তারকনাথ!

'বুঝলিরে সিধু, আমার আর অসীমার দু'জনেরই একই সময় মাথায় উকুন হয়েছিল। তাই দুইজনই একসঙ্গে মাথা নেড়া করিয়েছিলাম। আমাদের সব কিছু ছিল একসঙ্গে।'

'আগুপাছু শুধু বিয়ের বেলায়।' কথাটা বেসুরো লাগায় আহ্লাদী একবার আড়চোখে দেখে নিল ছেলের মুখখানা। বিরক্ত হচ্ছে সিধু। যার

জন্য করি চুরি সে-ই বলে চোর ! সিধুকে নিয়ে সেই সন্ধ্যায় আহ্লাদী গিয়ে হাজির অসীমার বাড়িতে।

দরজার পাশেই বসবার ঘর। অসীমার শাশুড়ী সিধুকে সেখানে বসিয়ে বললেন—'আমার ছেলে এখনই ফিরবে !'

অর্থাৎ সিধুকে একা একা বসে থাকতে হবে না বেশীক্ষণ।

তারপর আহ্লাদীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

'বউমা ! দেখ কে এসেছেন। কত সৌভাগ্য আমার, যে তোমার আহ্লাদী-দিদির পায়ের ধুলো পড়েছে এ বাড়িতে।'

দিদি ! আহ্লাদী একবার ভাবল বলে—দিদি আবার হলুম কবে থেকে। কিন্তু সে এসেছে নিজের গরজে। এখন বুড়ো মানুষের সামান্য একটা কথার প্রতিবাদ করে লাভ নাই।

'কী মা ?'

অসীমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর এক পা দু'পা করে আড়ষ্টভাবে এগিয়ে এল আহ্লাদীর দিকে।

আহ্লাদী ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল যে অসীমা তার আসায় খুশী হয় নি। তারকেশ্বরে প্রথম দেখা হবার সময় বন্ধুর মনের ভাব সম্বন্ধে একটু খটকা লেগেছিল। আর সংশয়ের অবকাশ নাই।

'বউমা তোমার আহ্লাদীদিদিকে সঙ্গে করে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও। আমি আসছি একটু পরে।'

অর্থাৎ তিনি একটু জলখাবারের যোগাড় করবেন ততক্ষণ।

'বাপরে বাপ ! যা বাঘা শাশুড়ী তোর অসীমা ! নে, এইবার মাথার কাপড় ফেল। দেখি ভাল করে কেমন চেহারা হয়েছে তোর। বর গেছে কোথায় ? তোর বর দেখতেই তো এলুম।'

পাথর গলল বুঝি এতক্ষণে।

'শোন আহ্লাদী, তোমাকে একা খুঁজছিলুম। এখনই শাশুড়ী এসে পড়বেন। একটু সাবধান করে দিই। এঁদের কাছে বল না যেন তুমি আমার সমবয়সী। এঁরা জানেন যে আমার এখন তেইশ চলছে। আমার স্বামীর বয়স এখন তেত্রিশ। আমি দু'বছরের বড় তাঁর চেয়ে।' ত্রস্ত চোখের চাউনিতে কাতর মিনতি।

ফিস ফিস করে বলা কথাগুলো এর মধ্যেও আহ্লাদী লক্ষ্য করেছে যে, অসীমা তাকে তুই না বলে তুমি বলেছে, বর কথাটা ব্যবহার না করে স্বামী কথাটা ব্যবহার করছে। ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চায় তাকে অসীমা।

'এঁরা সকলে জানেন ফটিক আমার দাদা। বিলাতে আমি ওকে চিঠি লিখি না, পাছে আবার চিঠিপত্র থেকে জানাজানি হয়ে যায়, ও আমার ছোট। সব সময় সশঙ্ক থাকি পাছে আমার আসল বয়স ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে। এ হয়েছে আমার এক শাস্তি।'

চাপা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলা কথাগুলো আহ্লাদীর কানে আসছে। সে তাকিয়ে অন্য দিকে।

'দিদির বিয়ের সম্বন্ধ করতে ছোটভাই যাবে, এই সঙ্কোচে ফটিক কোনদিন আমার বিয়ের খোঁজখবরে যায়নি কোথাও। বলত লজ্জা করে। আমার বিয়ের

সময় বন্বের এক কোম্পানীতে কাজ করত। সেই কোম্পানীই ওকে বিলেত পাঠিয়েছে। মারা যাবার আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মায়ের মুখে কেবল ওই ফটিকের কথা।'···

গলা ভিজে এসেছে। আড়ষ্টতা একটু একটু করে কাটছে।

···'সঙ্গে ওটি তোর ছেলে? আমারও তাই মনে হয়েছিল। শাশুড়ী ভেবেছেন দেওর। তোর ছেলেপিলে ক'টি?' 'চারটি ছেলে চারটি মেয়ে?' পারিস তো একথা চেপে যাস আমার বরের কাছে আর শাশুড়ির কাছে! একটু সাবধান থাকাই ভাল।'···

'বউমা!'

মাথার কাপড় টেনে দিল অসীমা। সাড়া দিতে দিতে শাশুড়ী উঠে আসছেন উপরে।

শেষ অনুরোধ এল চোখের ভাষায়।

সেই ভাষাতেই আশ্বাস জানাল আহ্লাদী।

কী ভাবিস তুই আমাকে অসীমা!

তবু কি সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে।

'দিদির সঙ্গে কী সব প্রাণের গল্প হচ্ছে—বউমা!'

'বলছে শাশুড়ী খেতে দেন না।'

হাসছেন বৃদ্ধা।

'তেমন বউ আমি আনিনি। নিজে দেখে শুনে যাচাই করে বউ এনেছি ঘরে।'

শাশুড়ী বউকে কি যেন ইশারা করায় অসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত চায়ের জল চড়াতে। ঘরের বাইরে গিয়ে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছে সে। চোখাচোখি হল বন্ধুর সঙ্গে।

অসীমা ভয় পাচ্ছিস কেন! সে বুদ্ধিটুকু আমার আছে বুঝলি?

শাশুড়ী আরম্ভ করলেন তাঁর দুঃখের কথা। এ-সব বউমার সম্মুখে বলা যায় না! তাঁর দশটি পাঁচটি নয় ওই একটি মাত্র ছেলে। চার বছর বিয়ে হয়েছে আজও বউমার সন্তান হ'ল না। এরই জন্য তিনি বউমাকে নিয়ে তারকেশ্বরে গিয়েছিলেন। সবই তাঁর হাতে।

আহ্লাদী সায় দিল—'হবে, হবে। বাবা তারকনাথের কৃপায় নিশ্চয়ই হবে।'

বৃদ্ধার হঠাৎ খেয়াল হল যে তিনি এতক্ষণ নিজের কথাই বলছেন।

'আপনার থাকা হয় কোথায়!'

'থাকি বিদেশে। বাঃ, আপনাদের বাড়িখানি ভারি সুন্দর। আর কি ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছেন। ফুলের টব দেখছি জানালার উপর। ছেলের খুব ফুলের শখ বুঝি? তা তো হবেই। ঠাকুর-ঘর নেই? তেতলায়? চলুন দেখি আপনার ঠাকুর-ঘর। বা; কী সুন্দর করে সাজিয়েছেন ঠাকুর ঘর।'

'থাকা হয় বিদেশে কোথায়?'

'অজ পাড়াগাঁ। সেখানে থাকতে থাকতে আমরাও পাড়াগেঁয়ে হয়ে গেছি একেবারে। শিয়ালের ডাক না শুনলে রাতে ঘুম হয় না। কাঁকড়া, গলদাচিংড়ি কিছুই পাওয়া না সে দেশে। থাকার মধ্যে আছে শুধু এক ষষ্ঠীতলা। সেখানকার ষষ্ঠী-ঠাকরুণ কিন্তু খুব জাগ্রত।'

'আপনার ছেলেপিলে ক'টি?'

'টিয়াপাখীও আছে দেখছি আপনার বাড়িতে। কোন কিছুর ত্রুটি নেই। ও টিয়াপাখী কি অসীমার? আমদের ওখানকার ষষ্ঠীতলায় আমি অসীমার নামে একখানা ইঁট বাঁধবো। সেখানে ইঁট বাঁধা নিষ্ফলা যেতে আমি আজও দেখিনি। আচ্ছা এবার আমরা চলি, আমাদের বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে।'

'সে কী কথা!'

'না না, চা জলখাবার না হয় আর একদিন এসে খেয়ে যাব, যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে। পথে মনে হ'ল আপনি সেদিন আসতে বলেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কাজ সেরে আবার আমাদের সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। না না, আর এক মিনিটও দাঁড়াবার সময় নেই। আমার চেয়ে তাড়া, যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার। ওর আবার রাত্রিতে আর এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে। না না খাওয়াটাই কি সব চেয়ে বড় কথা হ'ল? দেখাশোনা হল, সুখ-দুঃখের কথা হল এগুলো কি কিছু না? অসীমা! বেরিয়ে আয় রান্নাঘর থেকে। দেখলি তো আহ্লাদীদিদি তোর কথা ভোলে নি। না না চা করতে হবে না। সময় নেই। সেই এতটুকুনি দেখেছি তোকে; তোর সঙ্গে কি আমার শিষ্টাচারের সম্বন্ধ। বিশেষ তাড়াতাড়ি না থাকলে কি জামাইয়ের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাই। তোর শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলিস, আহ্লাদীদি চিরকাল কি রকম তড়বড়ে মানুষ।'

খিল খিল করে হাসতে হাসতে সে বৃদ্ধাকে প্রণাম করে।

দ্বিধা কাটিয়ে অসীমাও এসে টিপ করে একটা প্রণাম করল আহ্লাদীকে।

'হয়েছে হয়েছে, থাক থাক! সুখে স্বামীর ঘর করো।'

পায়ের উপর অসীমার আঙুলের চাপটা প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী জোরে মনে হয় আহ্লাদীর। তার অভিনয়ের মজুরি বোধহয়।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে শাশুড়ী বললেন—'ধন্যি মেয়ে বাবা!'

অসীমা চায়ের কেটলিটা নামিয়ে রেখে উনুনের দিকে মুখ করে বসল।

আর পথে, ছেলের কাছে এমন মজার গল্পটা করতে গিয়ে হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল আহ্লাদীর।

## জামাইবাবু

১

মেজদির বিয়ে। বেশ মনে আছে; দিব্যি নাদুসনুদুস বর। মণিদি বলল, 'বাব্বা! কী মোটা।' ছোট পিসিমা মেয়ের দোষ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'জমিদার মানুষ, ক্ষীর দুধ খেয়ে মানুষ…'

ডেঁপো বলে পাড়ায় একটা অখ্যাতি ছিল। তাই জন্যেই বোধ হয় ঐ অল্পবয়সেও বুঝতে পেরেছিলাম যে জমাইবাবুর রুচি আর কথাবার্তা বেশ মার্জিত নয়। বড়দির সঙ্গে গল্প করছিলেন, ব্রহ্মচারী থাকব বলেই ঠিক করেছিলাম। আর লোকে যা মনে করে সবই যদি করতে পারত তা হলে তো কথাই ছিল না।'

২

মেজদিকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হল না। মা চব্বিশ ঘণ্টাই মেজদির উপর

চটে আছেন। লজ্জায় তাঁর নাকি আর দশজনের কাছে মুখ দেখানোর জো নেই। মেজদিরও আবার রাগলে জ্ঞান থাকে না, বলেন, 'আমি তো আর স্বয়ংবরা হতে যাইনি।'

ওবাড়ির জ্যাঠাইমা ঠেস্ দিয়ে বলেন, 'আসছে পুজোয় বোধহয় নিয়ে যাবে।'

মেজদি আমাদের কাছে শ্বশুরবাড়ির কত গল্প করেন—বিয়ের কনে গিয়ে এক সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ি ছিলেন কিনা। বাবা খোঁজ করে জানলেন জামাইয়ের জমিদারীর আয় বছরে চুরাশি টাকা; আর সম্পত্তির মধ্যে আছে এক প্রকাণ্ড জরাজীর্ণ বাড়ির দুখানি ঘর।

৩

জামাইবাবু আমাদের বাড়িতেই চলে এলেন—শ্বশুরমশায়ের একটু ইয়ে influence আছে কিনা, যদি একটু চেষ্টা-টেষ্টা করেন···

চাকরিও হল।

কিছুদিন পরে চাকরকে ডেকে বলেন, 'আরে মঙ্গলু, আমার বিছানা আমি যে ঘরটায় শুই, তার পাশের ছোট খালি ঘরটায় করে দিস্। আর দেখিস মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিস্।' বড়দির কাছে বলেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম বিয়ে করা ইচ্ছে ছিল না।' পাড়ার বন্ধু নিলয়বাবুর কাছে বলেন, 'বৌটা কি ছিঁচকাঁদুনে, দাদা।' তবু পর পর তিনটি মেয়ে হয়।

মেজদার কাছে অযাচিত কৈফিয়ত দেন—'আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটু শিক্ষাদীক্ষার দরকার; নইলে পুরুষ মানুষ নিজের যা ইচ্ছে তা করতে করতে পারে না।'

৪

গত কয় বছরের নিয়ম মতো এবারেও মেজদির সময় এল। লেডী ডাক্তার বললেন, 'weak constitution' কী হয় বলা যায় না।'

হলও তাই।

ও বাড়ির জ্যাঠাইমা বললেন, 'বেশ গিয়েছে; নোয়া সিঁদুর নিয়ে যাওয়া কজনের ভাগ্যে ঘটে। এই দেখো না!'

বলে লম্বা নামের ফর্দ আওড়িয়ে গেলেন। মা মেয়ে তিনটিকে দেখিয়ে বলেন, 'মরেও শান্তি দিল না—হাড়ে দুব্বো গজিয়ে রেখে গ্যাল!' জামাইবাবু মেয়েদের বাঁশি কিনে দিলেন।

৫

আমার ছোট বোন টুলু ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে বসে কাঁদছে আর মাকে কী সব যেন বলছে।

যেতেই মা বলেন, 'তোরা যা না; তোরা এখানে কী কচ্ছিস? পরে শুনলাম টুলু বুড়ীকে কোলে করে যখন কোণের ঘরে বসে আচার খাচ্ছিল তখন জামাইবাবু সেখানে গিয়ে কী সব 'ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ডু' বলেছেন। ও তাই ছুটে ভাঁড়ার ঘরে পালিয়ে এসেছে।

মা বলেন, 'কাউকে যেন বলিস না। তোদের আবার যা সব মুখ আলগা —কী ঘেন্না···'

৬

শুনলাম জামাইবাবু রেলে বড় চাকরি পেয়েছেন। পান চিবুতে চিবুতে

রামকেষ্ট ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করেন। তারপর মা আর বাবার পায়ের ধুলো জিবে ঠেকিয়ে গাড়িতে চড়ে বসেন। বুড়ী, আর নেড়ী, বায়না ধরে বাবার সঙ্গে গাড়িতে চড়বে। বুলু বলে, 'বাবা আমার জন্যে একটা এততো বড় পুতুল এনো।' মা তাড়া দেন এখন পেছু ডাকিস না।

কিছুদিন পরে আবার জামাইবাবুকে বাজারে দেখি, দূর থেকে। আমাকে যেন দেখেও দেখেন না।

নিলয়বাবু বলেন, 'বেশ দিয়েছে থুয়েছে—চুয়োডাঙায় বিয়ে করে এল কিনা। মেসে এসে উঠেছে।' রেলের চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করতে আর সাহসে কুলোয় না।

মাকে এসে বলি।

মা বুড়ীকে বুকে চেপে ধরেন। নেড়ী বলে, 'বুলু বড় দুষ্টু ; না দিদিমা ? বাবা পুতুল আনলে আর কাউকে দেব না—খালি আমি-ই আর তুমি-ই,—না দিদিমা ?' মায়ের চোখ জলে ভরে ওঠে। আজ আর মা ওদের উপর রাগ করেন না।

## ওয়ার কোয়ালিটি

১৯৪৯ সালের মহেঞ্জদারো ইয়ারবুকের পাতা উল্টাইতেছিলাম। 'হু ইজ হু' পরিচ্ছেদে একটি পাতায় হঠাৎ নজর পড়িল ঃ

ডক্টর নরেশ ভদ্র। জন্ম ১৯০৫ সেপ্টেম্বর ; কুড়ুলহাটী, জেলা বর্ধমান, বাংলা। শিক্ষা—কুড়ুলহাটী হাই ইংলিশ স্কুল ; বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা ; ম্যাকগেভিন বিশ্ববিদ্যালয়, উইসকন্‌সিন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ডিগ্রী লইবার পর নানাপ্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ব্যবসায়িক কাজের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও অসীম কর্মপ্রেরণা তাঁহাকে গভীর অধ্যয়ন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি হইতে বিরত থাকিতে দেয় নাই। ইহার ফল তাঁহার ডক্টরেট ডিগ্রী। যুদ্ধোত্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লীতে জর্নালিজম ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন ও প্রচার-কল সম্বন্ধে যে জাতীয় গবেষণাগার খোলা হইয়াছে, তিনি তাহার অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।'

আমাদের সেই নরেশ ভদ্র। আজকালকার দুনিয়ার কিছুই খবর রাখি না। তিন বৎসর হইতে অজ পাড়াগাঁয়ে আছি। তবুও ইয়ারবুক দেখিয়া আপ-টু-ডেট থাকিবার চেষ্টা করি। সেই মেসের রুমমেট নরেশ ভদ্র ! ভাগ্যিস সে ভদ্র, তাই তো মনে পড়িল। একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া দেখিয়াছিলাম আমার ধোপদুরস্ত বিছানার চাদরের কোণ দিয়া ডিজ লণ্ঠনের চিমনী মুছিতেছে। ভদ্র না হইলে কি আর কেহ অপরের অসাক্ষাতে, তাহার চাদরের নিচের দিক দিয়া লণ্ঠনের কাচ মোছে ; চাদরের উপরের পিঠ দিয়া মোছা যে যায় না, তাহা তো নয়।

সেই নরেশ। বড়ই সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছে ইয়ারবুকে। আরও বড় করিয়া লেখা উচিত ছিল। অতবড় একজন মনস্বী লোকের জীবনী ; এই দুই কথায় সারিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধের সময় না হয় কাগজের অভাব ছিল, এখন তো আর তা নয়।

সারাদিন পান আর গুণ্ডি চিবাইত। প্রায় টেব্‌ল টেনিসের ব্যাটের মতন চওড়া চিবুকটিতে দু'কষ বাহিয়া পানের রস গড়াইয়া পড়িত। আমরা তাহাকে বলিতাম অভদ্র।

ব্যবসায়ে ঝোঁক তাহার ছোটবেলা হইতেই। বহুদিন আগের কথা পোস্টকার্ডের দাম এক পয়সা হইতে দুই পয়সা হইবে বলিয়া গুজব রটিয়াছে। নরেশ তাহার পুজোর পার্বণীর সঞ্চয় সাড়ে চার আনা দিয়া পোস্টকার্ড কিনিয়া রাখিয়াছিল—পরে দাম বাড়িলে বেশি দামে বিক্রয় করিবে বলিয়া।

বার কয়েক বি. এস-সি ফেল করিবার পর সে পড়া ছাড়িয়া দেয়। কোন বিষয়ে পাস করিত জানি না; কিন্তু প্রতিবার পরীক্ষার পর বলিত 'প্র্যাকটিকাল' খারাপ হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় পাস করিতে পারিব না।

মেসে আমার ঘরে থাকিয়াই সে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করে। বলিয়াছিল সায়েন্সের স্টুডেণ্ট, সায়েন্সের সহিত সম্বন্ধ নাই এমন ব্যবসা করা আমার দ্বারা পোষাইবে না।

কত রকমের ব্যবসা তাহাকে করিতে দেখিলাম। ধোপার কালি, স্নো, ক্রীম, জুতোর কালি, গন্ধ তেল, আরও কত কী মনে পড়িতেছে না। কোনোটাই পোষাইল না। কিছুদিন ধরিয়া এক একটি জিনিসের ব্যবসা চলে। তাহার পর দেখি নরেশ দুইদিন বিছানায় পড়িয়া থাকে। খায়ও না দায়ও না। কাহারও সহিত কথাও বলে না। তাহার পর হয়তো শুনি ধোপার কালিটি চলিতেছে না। তিন টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে! ধোপা এবং লণ্ড্রিগুলি নাকি বড় বড় মাড়োয়ারীদের কাছে বাঁধা;—না হইলে কি বলিলেই হইল যে, তাহার ধোপার কালি দিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। বের করুক না দেখি এরকম ভায়লেট রং। গরিব লোকের ব্যবসা করিবার দিন আর নাই! বাড়িতে আছে তো সবাই। কিন্তু বাবা ব্যবসা করিবার টাকা দিতে চান না।···আরো কত কী কথা সে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর বিরূপ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিত। বুঝিতাম সে এইবার টাকা চাহিবে। বলিবে পৃথিবীতে যদি লোক থাকে, বন্ধু থাকে, তাহা হইলে সে আমি।

বেশি কথা বাড়াইতে না দিয়া, নিজের চা জলখাবার বন্ধ করিয়া ভদ্রককে কিছু দিই। সে তাহাতেই খুশি। আবার কিছুকাল চলে অন্য জিনিসের ব্যবসা। কাগজপত্র, গঁদের শিশি, বুরেট, কাঁচি, ওষুধের বোতল, লিটমাস্ পেপার, স্টোভ আর মেজার গ্লাসে ঘর ভরিয়া উঠে। স্তূপীকৃত আবর্জনার মধ্যে বসিয়া সে দিনরাত পানের পিচ ফেলে, আর একখানি মোটা নীল মলাটের ইংরাজি বই হইতে ফর্মুলা দেখিয়া নূতন উদ্যমে নূতন জিনিস তৈরী করিতে বসে। বিজ্ঞানের কিছু বুঝিতাম না। ভাবিতাম হয়তো বা এডিসন কি কুরীর মতো একটা কিছু করিয়াও ফেলিতে পারে। তখন হয়তো ভদ্রক আমারই আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারিব। কতবার আমার এই বাসনা সফল হইতে একটুর জন্য কাঁচিয়া গিয়াছে।

'মনকুসুম' সুগন্ধী তেলটি বাজারে বাহির করিবার পর তাহার কী আনন্দ, কী উৎসাহ। বিস্রস্তকেশা সুন্দরীর ছবি সমন্বিত শিশিটি হইতে সবুজ চট্‌চটে তেল, স্নানের আগে আমার হাতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিয়া দিল। বলিল, এতেই হবে। এ তেল বেশি দরকার হয় না। ফাইন গন্ধটা! না?

বলিলাম, হাঁ। আর দিস না। বালিশের ওয়াড়ে সবুজ রং হয়ে যাবে।

সে দেখি দুঃখিত হইল।

বলিল, কখনই না। কে বললে, পাকা রং!

ছুটির দিন খাওয়া দাওয়ার পর একটু গড়াইব মনে করিলাম। নোংরা ঘরে ময়দার লেই-এর বাটিতে দিনরাত মাছি ভনভন করিত। মাছির ভয়ে মশারিটি ফেলিয়া শুইব মনে করিতেছি। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ঘরে একটিও মাছি নাই। লেই-এর বাটির পাশেই বিরাট কাঁচের বোতলটিতে, ফিলটার কাগজযুক্ত কাঁচের ফানেল হইতে টপ্ টপ্ করিয়া সবুজ তেল পড়িতেছে।

সেদিন শুইবার পর মুখে একটিও মাছি বসে নাই। রাতে ঘরে একটিও মশা ছিল না।

'মনকুসুম' তেল সুকেশা রমণীদের মনঃপুত হয় নাই। নিশ্চয়ই—কেন না তাহা বাজারে চলিল না।

কিছুদিন পরে ভয়ে ভয়ে, নেহাত সংকোচের সহিত ভদ্রককে 'মনকুসুমে'র মশামাছি বিতাড়নী ক্ষমতার কথা বলিয়াছিলাম। নোবেল হঠাৎ ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাবিলাম এবার হয়তো ভদ্রকের কপাল খুলিল।

আবার সে দ্বিগুণ উৎসাহে ঐ বোতলেই নূতন লেবেল আঁটিয়াছিল।

কিন্তু প্রতিবার যেরূপ হইয়া আসিতেছিল, এবারেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। বাজার জিনিস না লইলে বৈজ্ঞানিক কি করিতে পারে?

এইরূপেই চলিয়া আসিতেছিল।

যুদ্ধ লাগিবার বছর তিনেক পরের কথা। সকলেই রাতারাতি বড়লোক হইয়া যাইতেছে। 'ভদ্রক-স্নো' মাখিবার পর মুখে এক পোঁচ ময়দা গোলা লাগিয়া থাকিলেও তাহা বাজারে পড়িয়া থাকিতে পায় নাই। ভদ্রক ইহা হইতেই কিছু টাকা পাইয়াছিল। বেশি আর কী! তবে তাহার পুঁজির অনুপাতে মন্দ রোজগার সে করে নাই।

আমি তাহাকে বিজ্ঞানের পথের রোজগার ছাড়িয়া অন্যরূপ ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জনের কথা বলি। মাড়োয়ারীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, বুঝাইয়া শুনাইয়া, বকিয়া ঝকিয়া, তাহাকে অন্য ব্যবসা করিতে সম্মত করাই। তাহাকে দেখাইয়া দিই যে, সে সময় জিনিসের দাম বাড়িতেছে। চড়তি দাম—যাহা কেবল ফুলিয়া ফলিয়া উঠিবে। সে একদিন দেখি এক গাড়ি কাগজ ব্ল্যাক মার্কেটে কিনিয়া আনিয়াছে। আমারই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। ঘরে শুইবার স্থানের সংকুলান কঠিন হইয়া উঠে। ভদ্রক বলে যে চিঠির প্যাড তৈয়ারি করিবে। তাহাতে নাকি অনেক লাভ।

তাহার কথা ভাবিয়া নিজের অসুবিধার কথা ভুলি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে দেখি যে তাহার বৈজ্ঞানিক মন প্যাড তৈয়ারির মতো মাড়োয়ারী ব্যবসার উপর বিরূপ হইয়া উঠিতেছে। বুঝাইতে গেলে জবাব দেয়, সায়েন্স শিখেছিলাম কিসের জন্য?

হঠাৎ দেখিলাম কয়েক পিপা কর্ডলিভার তেল কিনিয়া আনিয়াছে। বলিল, খুব সস্তা পেলাম।

বলিলাম, কিছুদিন চেপে রেখে, তারপর ঝেড়ে দে।

সে হাসিতে লাগিল। ভাবিলাম তাহারও ঐ মত। কিছুদিন পরে দেখি,

সে আবার অসময়ে শুইয়া পড়িয়াছে। একদিন খাইল না, কাহারও সহিত কথাও বলিল না।

দুই দিন পরে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, বড্ড ঠকে গিয়েছি। শালা আমেরিকানরা জোচ্চর।

পরে সব শুনিলাম। আমেরিকান গ্যালন নাকি ব্রিটিশ গ্যালন অপেক্ষা পরিমাণে কম। সে গ্যালনের দাম শুনিয়া মনে করিয়াছিল যে, দাঁওয়ে কডলিভার তেল পাইয়াছে। বিক্রয়ের সময় দেখে যে খরিদ্দাররা ব্রিটিশ গ্যালনের হিসাব না হইলে কেনে না। বাজার দর বলিতে ব্রিটিশ গ্যালনের দরই বুঝায়। বেচারী প্রচুর লোকসানের মধ্যে পড়িয়াছে।

আবার এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তাহার মাথায় খেলে। আমিই আবার কিছু টাকা দিই। কডলিভার তেলের সহিত চন্দনের তেল মিলাইয়া, সে একটি তেল বাজারে বাহির করিবে। নাম হইবে 'আল্ট্রা ভায়লেট অয়েল'। ছেলে বুড়ো সকলকে মাখিয়া এক ঘণ্টা রৌদ্রে বসিতে হইতে মাত্র। তাহার পরই নূতন ভারতের নূতন মানব জয়যাত্রার পথে দৌড়াইবে। কেহই আর তাহাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। বৃদ্ধ লুপ্ত-যৌবন ফিরিয়া পাইবে। রিকেটি শিশু দাদামশায়ের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিবে,—প্ল্যাক্সোবালক তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পালাইবে। হ্যাণ্ডবিল, বিজ্ঞাপন, প্ল্যাকার্ড, চিঠিতে দেশ ছাইয়া যাইবে।

আল্ট্রা ভায়লেট তেল বাহির হইল। অর্থের অভাব, বিজ্ঞাপন কি করিয়া দেওয়া যাইবে। দৈনিক কাগজগুলিও আবার যুদ্ধের বাজারে বিজ্ঞাপনের দর লইয়া এমন নীচতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ভদ্রলোকের পক্ষে তাহাদের নিকট যাওয়া শক্ত। সম্বলের মধ্যে প্যাড তৈয়ারি করিবার কাগজগুলি; তাহা বিক্রয় করিয়া বিজ্ঞাপনের খরচ চালিতে পারে।

আমিই তাহা করিতে বারণ করি। টাকা ধার করিয়া তাহাকে দিই—ঐ কাগজগুলিতে হ্যাণ্ডবিল ছাপাইতে।

তাহার পর কিছুদিন চলে হ্যাণ্ডবিল ছাপানো ও ডাকে সারা ভারতের নানা স্থানে পাঠানোর কাজ। দিন নাই, রাত নাই, কেবল পার্সেল, প্যাকেট, ডাকটিকিট, আর গঁদের আঠার সমারোহ।

ফলাফলের জন্য মাস দুয়েক অপেক্ষা করি। সুপ্ত ভারতের কোনো স্থান হইতে সাড়া পাওয়া যায় না। হইল কী? একশো হ্যাণ্ডবিলের মধ্যে একটিও যদি লোকে পড়িত, তাহা হইলে চিঠির বোঝায় আমার ঘর ভরিয়া ওঠা উচিত ছিল। না কিনুক, কিন্তু ওষুধের অভাবের বাজারে, লোকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যও তো চিঠি লিখিত। খোঁজ লইবার জন্যও তো লোক আসিত। আসার মধ্যে তো এক দেখি, প্রেসের আরদালী আসে বাকি পয়সার তাগাদা করিতে, আর মেসের লেসী আসে অনুযোগ করিতে।

ভদ্রকের সন্ধানী মন হতাশা অপেক্ষা, কৌতূহলেই বেশি ভরিয়া উঠে।

হঠাৎ একদিন দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—এতদিনে বুঝলাম। লোকাল ট্রেনে দুটো ছেলে গাড়িতে উঠতে পারছিল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। উঠতে আর পারে না। দৌড়ে হাতল ধরল। আবার চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে-টড়ে না যায়, এই ভেবে তাদের হাত থেকে খাতা বইগুলো জানলা দিয়ে নিলাম।

হাতে নিয়ে দেখি দুজনেরই রাফ খাতা আমার হ্যাণ্ডবিলগুলো দিয়ে তৈরি। হ্যাণ্ডবিলের একপিঠ সাদা ছিল। যুদ্ধের বাজারে এক পিঠ সাদা হ্যাণ্ডবিল কি আর লোকে বিলোয়। সকলে বাড়ির ছেলেদের খাতা তোয়ের করে দিয়েছে!

তুই পড়েছিলি হ্যাণ্ডবিলটা? অপ্রস্তুত হইয়া জবাব দিই, না ঠিক পড়িনি। তবে তুই তো অনেকদিন পড়ে শুনিয়েছিস।

যাক, তাহলে ও হ্যাণ্ডবিল আমি ছাড়া আর কেউই পড়েনি—প্রেসে কম্পোজিটারটাও বোধ হয় না।

তাহার পর ভদ্রক ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

বছর দুয়েক পর দেখা। বলিল, ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি—সায়েন্স-টায়েন্স সব।

কী করছিস এখন?

জবাব দিল, ডক্টর ভদ্র, ডক্টর ভদ্র হে এখন আমি। সুটপরা দেখিয়া বুঝিতে পারি নাই। যুদ্ধের সময়ে খাঁকীর সুট তো সকলেই পরিতে শিখিয়াছে। এখন বুঝিলাম যে সে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হইয়াছে।—বোধ হয় নিজের গ্রামে প্র্যাক্‌টিস করিতেছে।

সে নিজেই ব্যাপারটি পরিষ্কার করিয়া দিল—থিসিস দিয়ে ডক্টরেট—আমেরিকায়।

অনেক গল্প-সল্প হইল। কথায় কথায় জানিলাম তাহার থিসিসের বিষয় 'যুদ্ধকালীন একপিঠে লেখা ইস্তেহার'। আরও শুনিলাম, ম্যাকগেভিন বিশ্ব-বিদ্যালয় নাকি পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসায়িক-বিজ্ঞাপনের স্নাতকোত্তর গবেষণার একমাত্র স্থান। নিজের অজ্ঞতার জন্যে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। পৃথিবীর একমাত্র ব্যবসায়িক-বিজ্ঞাপনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনকে আমার সম্মুখে পাইয়া, ঐ বিদ্যাপীঠের উপর শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া উঠিল।···

**ইয়ারবুকে সংক্ষিপ্ত জীবনী দিবার বিরুদ্ধে একটি বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিব মনে করিতেছি।**

## দিগ্‌ভ্রান্ত

রাখাল তরফদারের সেই গাছটাকে কাটা হচ্ছে। তার গর্ব ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি, সেই বিখ্যাত আমগাছটা। কাটছে মহেশপুর শ্মশানঘাটের কালু সর্দার আর তার ছেলে, বিনা পয়সায় গাছটা পেয়েছে বলে। এখানকার কেউ রাজী হয়নি। পাড়ার সকলে গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছে। নির্বাক, বিষন্ন।

এই কি ছকুদা চেয়েছিল? এইজন্যই কি ছকুদা এই গাছটাকে বেছেছিল? এ ছাড়াও কত কী হতে পারে। হতাশা? অনুশোচনা? কে জানে কী।

কিসের থেকে যে কী হয়, কে বলতে পারে। ছকুদার শত্রু ছিল না; বৃদ্ধ রাখাল তরফদারও সৎ, পরোপকারী ব্যক্তি। স্বার্থের সংঘাত নাই; বয়সের ব্যবধান অন্তত পঞ্চাশ বছরের; মন-কষাকষি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

তবু একটা ভুল বোঝাবুঝির পালা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। দুইজনের স্বভাবের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল ছিল বেশি। ছকুদা কথা কম বলত, আর একলা থাকতে ভালবাসত, বৃদ্ধ অনর্গল কথা বলে যেতেন যাকে সম্মুখে পেতেন তার সঙ্গে। কিন্তু দুই-জনেরই মন ছিল অনুসন্ধানী! অন্য দেশ হলে হয়তো দুইজনই বড় বৈজ্ঞানিক হতেন। ছকুদার ঝোক ছিল পশুপাখির দিকে; আর বৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ ছিলেন গাছপালা, ভেষজ প্রভৃতি বিষয়ে।

এই বয়সেও বৃদ্ধের স্বাস্থ্য ছিল অটুট। ভোরবেলাতে কি শীত কি গ্রীষ্ম ছাতা মাথায় দিয়ে যেতেন শেঠদের বাড়িতে। তারপর সারাদিন তাদের কাজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন। কারও সঙ্গে দেখা হলে তার আর রক্ষা নেই; আরম্ভ হয়ে যেত গল্প; এই গল্পের ভয়েই সকলে তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত।

এ-হেন ব্যক্তিকে নিয়ে ছেলেছোকরারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। হেন রোগ নাই, যার অব্যর্থ মহৌষধ তরফদার মশায়ের জানা ছিল না। সদ্যোমৃত শিয়ালের পেট চিরে তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে বসতে পারলে নাকি গোদ সারে। এইরকম সব বিদঘুটে ওষুধ দিয়ে রোগ সারাবার গল্প তাঁর মুখে শুনে ছেলেরা হেসে গড়িয়ে পড়ত। চন্দ্রগ্রহণের সময় ডালিমগাছের পরগাছা কেটে, তার ডাল কোমরে ধারণ করলে অর্শরোগ সারে। একবার পরগাছা কাটতে গিয়ে তাঁর পায়ে ডালিমের কাঁটা ফোটে। পরে সেটা বিষিয়ে ওঠায় বেশ কিছুদিন শয্যাগত থাকতে হয় তাঁকে। লজেন্‌স দেবার লোভ দেখিয়ে আমরা একটি ছোট ছেলেকে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছিলাম যে, তিনি ডালিমের কাঁটা ফোটার ওষুধ জানেন কি না। ছকুদা সে সময় আমাদের দলের মধ্যে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তার অভ্যাস মতো একটাও কথা বলেনি। ছেলেটিকে আমরা শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে, যদি বৃদ্ধ জানতে চান কে তাকে পাঠিয়েছে, তাহলে সে যেন ছকুদার নাম করে। ছকুদা সম্মতিও দেয়নি, আপত্তিও করেনি; এর আগেও মুচকি হাসছিল, এর পরেও মুচকি হেসেছিল। রাখাল তরফদার ছেলেটির কান ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে তাকে পাঠিয়েছে। এই থেকেই আরম্ভ।

বৃদ্ধের খুব বাগানের শখ ছিল। তাঁর বাগানে একটা আমগাছ ছিল, যেটা তিনি বোম্বাই আর ল্যাংড়া মিলিয়ে কলম তয়ের করেছেন বলে দাবি করতেন। পাড়ার লোকে ঠাট্টা করে এটাকে বলত ল্যাং-বোম আমের গাছ। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা সকলেই কতকটা এই কারণেই তরফদার মশাইকে গাছপালা ফলমূল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মনে করতেন।

একদিন গাছে চড়ে পেয়ারা খাওয়ার সময় ছকুদা বলল, 'দেখেছিস পেয়ারা বোঁটার দিক থেকে পাকতে আরম্ভ করে না, অথচ আম পাকতে আরম্ভ করে বোঁটার দিক থেকে।'

ফল পাকবার প্রক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তখন আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের দলের পাঁচুর কি জানি কেন মনে হল যে, বিজ্ঞানের এ একটা মৌলিক সমস্যা। সে চিন্তিত হয়ে পড়ল, ফল দুটো পাকবার পদ্ধতিতে বিভিন্নতা দেখে। আমরা উস্কানি দিলাম যে, সত্যিই এর কারণটা জানা দরকার। ল্যাং-বোমের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আর কারই বা আছে এখানে? জ্ঞানী

ব্যক্তির কাছেই জ্ঞান আহরণ করতে যেতে হয়। এখনই চল। ছকুদা কিছুতেই গেল না আমাদের সঙ্গে।

তরফদারমশাই বাগানেই ছিলেন।

'কী মনে করে ?'

'আম সম্বন্ধে আপনার মতো তো কেউ জানে না এখানে। তাই আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলল ছকুদা একটা কথা—'

'কে ? ছকু ? ছকু পাঠিয়েছে ? বেরো ! ফাজলামি করবার আর জায়গা পাওনি ! ঠেঙিয়ে তোদের আমি—'

আর আমরা এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করিনি সেখানে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, ছকুদার ডিপার্টমেন্ট হল জন্তু-জানোয়ার আর বুড়োর ডিপার্টমেন্ট হল গাছপালা। ছকুদা ওঁর ডিপার্টমেন্টে অনধিকার প্রবেশ করেছে বলে উনি এত চটে উঠলেন। আর উনি নিজে কী করেন। ছকুদার ডিপার্টমেন্ট থেকে শিয়াল নিয়ে টানাটানি করেন কেন নিজের রুগীর চিকিৎসার সময় ? অতি হিংসুটে আর বদ বুড়োটা ! পশুপাখি পোকামাকড় সত্যিই ছকুদা ভালবাসত ! সে বেজি কাঁধে বসিয়ে এক এক সময় বেড়াতে বার হত। ঘরের মটকায় যে শালিখপাখিটা বাসা বাঁধে সেটাও ওর পোষ মেনে গিয়েছিল ; মধ্যে মধ্যে এসে বসতে পর্যন্ত দেখেছি ওর মাথার উপর ! একবার একটা কাঠবেড়ালি পুষেছিল ; সেটাকে গরম কোটের পকেটে ভরে নিয়ে একদিন স্কুলে এসেছিল। সেদিন হেডমাস্টারমশাই ছকুদাকে বেত মেরেছিলেন। হেলে-সাপ হাত দিয়ে ধরতে তাকে আমরা বহুদিন দেখেছি ; বলত এগুলো কামড়াতে জানে না। আমাদের বাড়ির গোরুর চোখে একবার খোঁচা লেগে ঘা হয়েছিল ; সাবানজলে ভিজানো ন্যাকড়া দিয়ে ও প্রত্যহ ঘা পরিষ্কার করে দিয়ে যেত।

আর কুকুরের বেলা তো কোথাই নেই। ওর বাণ্টা নামের বোবা কুকুরটা চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে থাকত। ছকুদা বলত ছোটবেলা থেকে ভাতের মাড় খাওয়ানোর জন্যই কুকুরটা নাকি ডাকতে শেখেনি। বাণ্টাকে পেট ভরে ভাত না খাওয়াতে পারবার জন্য তার মনে মনে দুঃখ ছিল খুব। মনের কথা মনে রাখাই ছিল তার অভ্যাস ; তবু আমরা বুঝতাম কোথায় তার ব্যথা। বাড়ির লোকে তাকে অপদার্থ মনে করত, কেউ যা করে না তাই সে করতে ভালবাসে, কেউ যা জানতে চায় না, সেই বিষয় জানবার উপর তার ঝোঁক ; কাজের চেয়ে অকাজ বেশি। তবু ঠিক এই কারণেই আমরা তাকে ভালবাসতাম। একপাল কুকুর নিয়ে সে যখন জঙ্গলের দিকে যেত, তখন আমাদের সঙ্গে নিলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করতাম। আমরা বলতাম শিয়াল শিকারে যাচ্ছি ; কিন্তু শিয়াল মারা কোনোদিনই ছকুদার উদ্দেশ্য ছিল না। সে বলত, কুকুরদের জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ট্রেনিং দেবার জন্য। শিয়ালকে তাড়া করাই ছিল ট্রেনিং-এর প্রধান অঙ্গ।

পর পর তিনবার এক ক্লাসে ফেল করায় ছকুদাকে স্কুল ছাড়তে হয়। বাবা বললেন—'এবার ঘোড়ার ঘাস কাটো !' তাকে কাজের মানুষ করে গড়ে তোলবার চেষ্টায় বাবা সেবার ছকুদাকে পাঠালেন ধান কাটিয়ে ধানের ভাগ আনতে ভাগচাষীর কাছ থেকে। ছকুদা গেল বাণ্টাকে সঙ্গে করে ; সেখানে চার-পাঁচদিন থাকতে হবে। দুদিন পরে রাখাল তরফদার ছকুদার বাবার কাছে এসে বলে গেলেন, তাঁকে নিজে যেতে ধান আনবার জন্যে : ছেলের ওপর নির্ভর করে থাকলে

দু'আনা ধানও ঘরে আসবে না। ওদিক দিয়ে আসবার সময় তিনি দুদিনই দেখেছেন, ছকু মেঠো-ইঁদুরের গর্তের পাশে কোদাল নিয়ে বসে কুকুরটাকে উৎসাহ দিচ্ছে মাটি খোঁড়বার জন্য। বৃদ্ধের কথায় কান দেননি ছকুদার বাবা তখন। পরে যখন গোরুর গাড়িতে ধানের বস্তা নিয়ে ছকুদা বাড়ি ফিরল, বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—'মোটে এই ক'টা ধান ?' ছকুদা বলল—'না, আরও খানিকটা আছে। এই বস্তাটায় আলাদা করে রাখা। ইঁদুরের গর্ত থেকে বার করেছি।'

আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না ছকুদার বাবা। 'সারাদিন ধরে এই করতিস! তুই ধান কাটিয়ে আনতে গিয়েছিলি, না বাঘাটাকে ট্রেনিং দিতে গিয়েছিলি ? বেরো! এখনই বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে!'

বোধ হয় এক-আধ ঘা প্রহারও দিয়েছিলেন।

সেই রাত্রিতে ছকুদা একবার এখান থেকে পালায়। তরফদারমশাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাবাকে—'কিছু টাকাকড়ি নিয়ে যায়নি তো বাড়ি থেকে ? ওই ধান-টান বেচে ?'

বাবা বলেছিলেন—'মনে তো হয় না!'

'তবে ফিরে আসবে শিগগিরই।'

তিন-চারদিন পর সে ঠিকই ফিরে এসেছিল। বাঘাটা এ কয়দিন কিছু খায়নি। ফেন নয়; ভাত দিয়েছিলেন ছকুদার মা; তবে খায়নি। কাঠবেড়ালিটাও পালিয়েছে।

বহু পীড়াপীড়িতে ছকুদা আমাদের কাছে বলেছিল যে, সে গিয়েছিল কলকাতায়। চিড়িয়াখানায় যদি কোনো চাকরি পাওয়া যায় সেই চেষ্টায়। হল না কিছু।

কলকাতার রাস্তা চিনে কেমনভাবে যে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল, সেইটাই সে সময় আমাদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল। ছকুদা আমাদের চোখে আরও বড় হয়ে উঠল, এই পালাবার পর থেকে।

ঠিক হয়ে গেল রাখাল তরফদারের পিছনে এবার থেকে আরও বেশি করে লাগতে হবে।

শেঠদের পশ্চিম-বাগানে তাদের গোরু-মোষের বাথান। সেখানে একটা মোষের বাঁট থেকে ঢেমনা সাপ প্রতি রাত্রিতে দুধ খেয়ে যাচ্ছিল। মোষের বাঁটে সাপের দাঁতের দাগ দেখবার জন্য ছকুদা আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল যে, একটা গোরু নিজের চোনা খাচ্ছে। ছকুদা বলল, গোরুরা নুন খেতে না পেলে মাঝে মাঝে চোনা খায়।

শেঠদের সংসারের দেখাশোনার সম্পূর্ণ ভার রাখাল তরফদারের উপর।

পাঁচুর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধির ঝিলিক খেলে যায়।

'বুড়োটা নিশ্চয়ই গোরু-মোষের জন্য বরাদ্দ নুনের পয়সাটা মারছে।'

আমাদের কারও সন্দেহ নাই এ বিষয়ে। 'পাঁচু, তোরই তো সাহস সবচেয়ে বেশি আমাদের মধ্যে। শেঠদের গিন্নীঠাকরুনকে বলে আয়, তাঁদের গোরু-মোষগুলো চোনা খেয়ে খেয়ে মরছে, নুন না খেতে পেয়ে।'

গোমাতার সেবার কাজ, দেশের কাজ, দশের কাজ। দ্বিরুক্তি না করে পাঁচু ছুটে চলে গেল শেঠদের বাড়িতে!

শেঠগিন্নী শুনে অবাক!

'নিজের চোনা খায় ?'

'হ্যাঁ, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।'

'তাই বলো! এই জন্য তাহলে দুধ উনুনে চড়ানোমাত্র ছানা কেটে গিয়েছিল পরশু!'

'হ্যা, নিশ্চয়ই তাই। ছকুদা বলেছিল, ছানা কাটে ওরকম।'

'ওরে বিন্দি। ডাক্ তো দেখি তরফদারমশাইকে!' পাঁচু আর দাঁড়ায়নি সেখানে।

এর দিনকয়েক পরই তরফদারমশাই শেঠ-গৃহিণীকে বললেন যে, ছকুটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ; বাড়ীর শাসন কড়া না হলে এমনিই হয়, ও ছেলে এই বয়সেই বাইরে রাত কাটাচ্ছে অথচ ওর মা-বাবা কিছু বলে না।

শেঠগিন্নী আবার পাড়ার লোকের কাছে বলেন যে, ছকুকে নাকি অর্ধেক রাত্রিতে পশ্চিম-বাগানে দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা বুঝি এসব কথার ইঙ্গিত। শুনে আমরা চটি ; ছকুদা কিন্তু কোনো কথা বলে না ; শুধু হাসেই, তাকে কিছুতেই তাতানো গেল না। শেষ পর্যন্ত আমরাই গেলাম বৃদ্ধকে চ্যালেঞ্জ করতে। বৃদ্ধ মিষ্টি কথায় জানালেন যে, ছেলেমানুষদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চান না ; আর নিজের চোখকে তিনি অবিশ্বাসও করতে পারেন না।

আমাদের মনে পর্যন্ত খট্‌কা ধরে গেল। ছকুদাকে সেকথা বলাতে স্বীকার করল রাত্রে শেঠদের পশ্চিম-বাগানের বাথানে যাবার কথা।

'ছকুদা! ছি ছি ছি ছি ছকুদা!'

তখন ছকুদা পশ্চিম-বাগানে যাবার কারণটা বলে। শুনে আমরা ধাতস্থ হই। তখনই তাকে ধরে নিয়ে যাই শেঠগিন্নীর কাছে। ছকুদা তাঁর কাছে বলে যে, সে রাত্রিতে বাথানে থাকে কয়েকদিন থেকে, ঢেমনা সাপ কেমন করে মোষের বাঁট থেকে দুধ খায় তাই দেখবার জন্যে। কাল রাত্রিতে প্রথম দেখতে পেল।

'সাপটাকে মারলি তো ?'

'আমি মারি না কোনো জন্তু জানোয়ার।'

চলে আসবার আগে আমরা শেঠগৃহিণীকে উপদেশ দিয়ে এলাম, বাথানের চারিদিকে কার্বলিক এসিড ছিটিয়ে দেওয়াবার জন্য। এত ওষুধ জানেন তরফদারমশাই আর এটুকু জানেন না! আশ্চর্য!

বৃদ্ধের পিছনে লাগা আমাদের একটা খেলা হয়ে গেল। তিনি যত চটেন তত আমাদের উৎসাহ বাড়ে। কারি আমরা, তিনি চটেন ছকুদার উপর।

এ বিষয়ে ছকুদার ঔদাসীন্যও একটু একটু করে কাটছিল। পিথো সাঁওতাল রাখাল তরফদারের কাছে গলগণ্ডের ওষুধ নিতে গিয়েছিল। তরফদারমশাই তাকে প্রত্যহ গোরুর দুধ খেতে বলেছিলেন। পিথো গরিব মানুষ ; প্রত্যহ গোরুর দুধ খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একরকম পোকা আছে যেগুলো নাকি পিঁপড়েদের গরু। আমরা ছকুদাকে বললাম, সেই পোকা দুটো খুঁজে বার করতে! শিমপাতার উল্টো দিক থেকে একটা আর শিমুলতলা থেকে আর একটা পিঁপড়েদের গোরু ছকুদা তখনই খুঁজে বার করে আনে। একটা খামের মধ্যে পোকা দুটোকে ভরে, আমরা পিথোকে পাঠালাম তরফদারমশায়ের কাছে। সে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এর দুধ খেলে তার গলগণ্ড সারবে কি না ?

'কে পাঠাল তোকে এখানে ? ছকুবাবু ?'

'হ্যাঁ, বাবু।'

'আচ্ছা, যা এখন ! আর জ্বালাতন করিস না।'

ছকুদা বয়সে আমার চেয়ে চার বছরের বড়। স্কুলে যায় না। কাজেই তার স্বাধীনতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। দুপুরে ছুটি। প্রত্যহ সে কুকুরের দল সঙ্গে নিয়ে পেরীসাহেবের কুঠির জঙ্গলের দিকে যেত। আমরাও যে স্কুল পালিয়ে তার সঙ্গে কোনোদিন কুঠির জঙ্গলের দিকে যাইনি, এমন কথা হলপ করে বলতে পারব না।

রাখাল তরফদার পাড়ায় বলে বেড়াতে আরম্ভ করলো যে, ছেলেরা স্কুল কামাই করে কুঠির জঙ্গলে যায় সিগারেট খাওয়ার জন্য। ছকুই হচ্ছে পালের গোদা ; ও-ই পাড়ার সব ছেলেদের খারাপ করে দিল। ও-ই শেখাচ্ছে সকলকে বিড়ি খেতে।

'এর একটা বিহিত করতেই হয় ছকুদা

ছকুদা বললে—'কাল দুপুরে।'

তার ঠোঁটের কোণের সাদা হাসিটুকু আজ আর নাই।

পরদিন বেলা দুটোর সময় বাণ্টা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির বারোয়ারীতলার অশ্বথ গাছটার নিচে। ও এসেছে মালিকের পাইলট হিসাবে। অধীর হয়ে পিছনে তাকাচ্ছে। এসে পড়ল ছকুদা। নিচের ঠোঁট দুই আঙুল দিয়ে টেনে ধরে শিস দিচ্ছে। এত জোরে শিস এখানে আর কেউ দিতে পারে না।

ছুটে আসছে পাড়ার চার পাঁচটা কুকুর। যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিল। কুকুরগুলো এসেই বাণ্টার সঙ্গে মুখ শোঁকাশুঁকি করে নিল। ওই আসছে ট্যানা। ওই এল মাথায় রুমাল বাঁধা ঘ্যাণ্টা আর হরেন। কুকুরগুলো ছুটে গেল তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বারোয়ারীতলায় নিয়ে আসবার জন্য। সবচেয়ে শেষে এল পাঁচু। তার হাতে একখানা কোদাল। বাড়ি থেকে লুকিয়ে কোদালখানা আনতে গিয়ে তার দেরি হয়েছে। ওই দেখেই কুকুরগুলো বুঝে গেল যে, আজ আর ছেলেখেলা নয় অন্য দিনকার মতো ; আজ হবে সত্যিকার শিয়াল-শিকার ; এতদিনকার ট্রেনিং-এর পরীক্ষা। উল্লাসে লাফালাফি করতে করতে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এই কুড়ের বাদশা মানুষগুলোকে।

এসে গেল কুঠির জঙ্গল। শরের ঝোপ, কুল, বাবলা, আর দরদ-ময়দাগাছের মধ্য দিয়ে জঙ্গলের পথ। ঝুরিভরা বটগাছটার কাছে গিয়ে কুকুরের দল থামে। ছকুদা গাছে উঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা খানকয়েক ছোট ছোট বাঁশের লাঠি নামিয়ে আনল। লাঠি-হাতে পাড়া থেকে বেরুলে বড় বেশি লোক-জানাজানি হয়ে যায়। তাই এই ব্যবস্থা।

দুর্গা ! দুর্গা ! আজ আসবার সময় বারোয়ারীতলায় প্রণাম করে এসেছে সকলে। এখন দেখা যাক। সবই ভগবানের হাত !

শিয়ালের গর্তের বিশ পঁচিশটা মুখ। এক একটা সুড়ঙ্গের মুখ এখানে আরম্ভ হয়ে বহুদূরে গিয়ে উঠেছে। এর সবগুলো শিয়ালরা ব্যবহার করে না ; কতকগুলো আছে শুধু লোক ঠকাবার জন্য। এর মধ্যে কোন কোন সুড়ঙ্গ শিয়ালরা এখনও ব্যবহার করে তা বোঝে শুধু ছকুদা, বাণ্টা আর টম নামের

ছোট্ট দোআঁশলা কুকুরটা! টম একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে পা দিয়ে দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে। অন্য কুকুরগুলোও গন্ধ শুঁকে শুঁকে অন্য গর্তের মুখগুলোকে পরখ করছে। এক একটা আবার গন্ধ পেয়েছে ভেবে ঢুকছে; আর একটু মাটি খোঁড়াখুঁড়ির পর গন্ধটা হারিয়ে গেল দেখে তখনই বেরিয়ে আসছে। বাণ্টাকে নিয়ে ছকুদা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এখান থেকে বহুদূরের শরের ঝোপের ধারের গর্তের মুখে। ছুট্ করে অন্য একটা মুখ দিয়ে একটা শিয়াল ছুটে পালাল। কয়েকটা কুকুর ছুটল তার পিছনে। ছকুদা চেঁচাল—'তোরা কেউ যাস না। হুলে! হুলে! করিস না। তাহলে কুকুরগুলো এখনই ফিরে আসবে; পাঁচু, তুই ওখান থেকে কোদাল দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে এগিয়ে আয় এই দিকে।'

সুড়ঙ্গগুলো বেশি নিচে না। টমের সাহায্যার্থে পালা করে এক একজন সুড়ঙ্গ ধরে ধরে কোদাল চালিয়ে চলেছে। উপরের মাটি ধসে ধসে পড়ছে! ছকুদার কথায় সকলে বুঝে গিয়েছে যে, আর একটা শিয়াল ভিতরে আছে এখনও। হাঁপাতে হাঁপাতে কুকুরগুলো ফিরে এল। জিভ বেরিয়ে গিয়েছে তাদের শিয়ালের পিছনে ছুটে। ছকুদার শিকারের কৌশল হল—যাতে দুটো মুখ ছাড়া সুড়ঙ্গের বাকি মুখগুলো ভিতরের শিয়ালটা আর ব্যবহার করতে না পারে। কোদালের মাটি দিয়ে সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঠিক যা ভাবা গিয়েছিল! শিয়ালটা একবার মুখ বার করে, গতিক সুবিধার নয় বুঝে আবার মুখ ঢুকিয়ে নিল গর্তের ভিতর। আর রক্ষা নাই তার। বোঝা গিয়েছে ঠিক কোথায় আছে।

'রেডি!'

লাঠি মারবার সময় সে কী উল্লাস ও উত্তেজনা! বাণ্টা আর টমের ভাগ্য ভাল যে তাদের উপর এক ঘাও লাঠি পড়েনি ওই গোলমালের মধ্যে। সাফল্যের উত্তেজনা কুকুরের দলের মধ্যে মানুষদের চেয়েও বেশি। গম্ভীর শুধু ছকুদা।

সন্ধ্যা তখন হব হব। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সকলে ছকুদার নির্দেশ মতো। বুনোশুয়োর বার হয় এখানে মাঝে মাঝে। সেইজন্য এই সতর্কতা। দেরি করে বাড়ি ফিরলে সকলকেই বকুনি খেতে হবে। তার উপর গা ছমছম করছে। ওই গাছটার পাখিগুলো হঠাৎ অমন কিচিরমিচির আরম্ভ করল কেন?

ছকুদা বলল—'স্যাপটাপ কিছু হবে। আচ্ছা যা, তোরা এখন বাড়ি যা!'

ছকুদাকে এখন সেখানে বসে থাকতে হবে অনেক রাত্রি পর্যন্ত।'

পরের দিন সকালবেলাতেও রাখাল তরফদার বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারলেন দুপুরে পাঁচিলের উপর শকুন বসায়। ল্যাং-বোম গাছটার একটা মোটা ডাল থেকে ঝুলছে এক মরা পেটফোলা শিয়াল। মাছি ভনভন করছে, পিঁপড়ে থিকথিক করছে, কাকে চোখ ঠোকরাচ্ছে!

মেথর পাওয়া গেল না তখন। বাড়িতে আর কোনো পুরুষমানুষ নেই। পাড়ার লোকে মজা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লাঠির ডগায় কাস্তে বেঁধে, গামছা পরা তরফদারমশাই দড়ি কাটবার জন্য গাছতলায় এগিয়ে এলেন! ধপ্ করে গাছের উপর থেকে মরা শিয়ালটা পড়ল নিচে। একটুর জন্য তার পায়ের উপর পড়েনি! গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়েছে দর্শকদের। ভিড়ের

মধ্য থেকে কে একজন যেন চেঁচাল গলা বিকৃত করে—'এইবার গোদের চিকিৎসা হবে রে-এ-এ-এ।'

আঙুল দিয়ে নাক টিপে, আর এক হাতে দড়ি ধরে টানতে টানতে রাখাল তরফদার শিয়ালটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেললেন।

এই দিনই শেষ নয়। এর পর আরও বহুবার ওই ল্যাং-বোম আমের গাছে মরা শিয়াল, খট্টাশ, বনবিড়াল, সাপ, কাক, বক ইত্যাদি ঝুলতে দেখা গিয়েছে। কড়া পাহারা রেখেছেন তরফদারমশাই রাত্রিতে, কিন্তু কোনোদিন কাউকে ধরতে পারেননি।

ছকুদা মুদীখানার দোকান খোলবার পর ছেলেদের আড্ডা তার দোকানঘরে বসা আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু তরফদারমশায়ের আমগাছে মরা জানোয়ার ঝোলা তবু বন্ধ হয়নি। ছেলেদের এ একটা খেলা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল; দুপুরে দোকান বন্ধ রেখে, ছকুদা কুকুর নিয়ে শিয়াল শিকারে বার হত।

ছকুদারই তো দোকান। কত আর ভাল চলবে। সামান্য পুঁজি। হিসাব রাখবার ক্ষমতা নাই। বাবা দোকান খুলে দিয়েছেন; তাই বাধ্য হয়ে দোকান চালানো। সকলেই জানত এ দোকান চলবে না। তবু যে ক'দিন চলে।

তরফদারমশাই মাঝে মাঝে ছকুদার বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করেন যে, যেখানে অতগুলো বকাটে ছোকরা সবসময় বসে বিড়ি-সিগারেট খায় সেখানে কোনো জিনিস কেনবার জন্য ঢুকতে সংকোচ বোধহয় তার মতো খদ্দেরদের। দোকানও আবার সেই রকমই। কখন খোলে, কখন বন্ধ হয়, কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নাই!···আরও কত রকমের অভিযোগ।

প্রায়ই এইসব নিয়ে ছকুদার বাবা বকাবকি করেন। কোনো উত্তর না দিয়ে ছকুদা শুনে যায়। আমাদের কাছে বলে—'নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অবোলা জন্তুজানোয়ার মারা আরম্ভ করলাম, শুধু বুড়ো তরফদারটার মুখ বন্ধ করবার জন্যে। কিন্তু অসম্ভব! আর এখানে থাকা চলবে না দেখছি।'

ওর দোকানেই আড্ডা। ও কিন্তু কোনোদিন তার মধ্যে এক-আধটার বেশি কথা বলত না। ছকুদা প্রাণ খুলে কথা বলত শুধু বাণ্টার সঙ্গে। বোবা কুকুরটার চোখের ভাষা সে বোঝে।

এই বাণ্টাই হয়েছিল তার পথের বাধা। একদিন ছকুদা আমাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—'যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে বাণ্টাকে রাখতে পারবি তোদের বাড়ীতে?'

'চলে যাবে? পাগল না ক্ষ্যাপা!'

'ভাতের ফেন দিলেই ওর চলবে।'

'বলো তো বুড়োটার বাড়ীতে ঢিল ফেলা আরম্ভ করি রাত্রিতে? না হয় ওর বাগানের সর্পগন্ধা, ঘৃতকুমারী আর যত গাছগাছড়া আছে উপড়ে ফেলে দিই?'

'না, না, সে কথা নয়।'

'তবে চলে যাবে বলছ? যাবে কোথায়?'

'প্রথমে যাব লখ্নৌ।'

'সেখানে কী?'

'চিড়িয়াখানায় কাজের চেষ্টায়।'

'যদি কাজ না দেয় ?'

'দেখব চেষ্টা করে। গভর্নমেন্টের বনবিভাগেও শুনেছি অনেক রকম কাজ পাওয়া যায়।'

'মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তোমার ছকুদা। সব জায়গায় ঘুরতে গেলে যে টাকা লাগে।'

'সে টাকা আমি জমাচ্ছি।'

'তার চেয়ে জেলার ভেটার্নারি হাসপাতালে কম্পাউন্ডারের কাজ শেখ না। তবু তো কাছাকাছি থাকবে।'

'রুগ্ন জানোয়ার আমার ভাল লাগে না।'

আমাকে বারণ করেছিল কাউকে বলতে ; কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আমি না বলে থাকতে পারিনি। এ নিয়ে আমাদের বিস্তর সলাপরামর্শ চলে। টাকা জমিয়ে ও রেখেছে কোথায়, সেই খবরটা জানবার জন্য আমরা তক্কে তক্কে থাকি। আমাদের মধ্যে পাঁচুরই এসব কাজে উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।

ঠিক খুঁজে বার করেছে সে। শুনে আমরা খুব হাসি। ছকুদার কাণ্ড! টাকা রাখবার আর জায়গা পেল না সে! অদ্ভুত!

দোকানঘরের দেয়ালের একটা পুরনো ইঁদুরের গর্তের মধ্যে সে লুকিয়ে গুঁজে রেখে দেয় নোট।

ঠিক হল ছকুদার যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। যেমন-করেই হোক। ও যেন কিছুতেই টের না পায়, দেখিস!

পাঁচু দশ টাকার নোট বার করে এনেছে খানকয়েক ইঁদুরের গর্তের মধ্য থেকে। এ নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করি নিজেদের মধ্যে। কিন্তু খবরদার!

দিনকয়েক পর সকালে হুলস্থূল কাণ্ড পাড়ায়। কী ভেবে ছকুদা ওই গাছটাকেই বেছেছিল জানি না। রাখাল তরফদারের ল্যাং-বোম আমগাছের ঠিক সেই ডালটা থেকে তার দেহ ঠিক সেই রকম ঝুলছে। নিচে বাণ্টা বসে।

দোকানঘরের দেয়ালের গর্তটা থেকে নিচু পর্যন্ত খোঁড়া ; মেঝেতে একটা শাবল পড়ে আছে। ও বোধ হয় ভেবেছিল যে ইঁদুরটা খুনসুড় করেছে ওর সঙ্গে।

গাছের গুঁড়ির উপর শেষ কোপ মেরে কালুসর্দার আর তার ছেলে একটু দূরে সরে গেল। মড়মড় করে একটা শব্দ হল, রাখাল তরফদারের কীর্তি-গরিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়বার সময়।

নিজেদের বিবেক পরিষ্কার নয় বলেই বোধ হয় ভাবতে ভাল লাগছে যে ছকুদা এই চেয়েছিল।

## বাম-কপালিয়া

আপিসে অবশ্য একবার গিয়েছিলেন হাজরিটা দিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু না গেলে ক্ষতি ছিল না। খেলার জোরেই তাঁর চাকরি ; আর বড়সাহেবই এ অঞ্চলের লন্-টেনিস-অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। কাজেই সাতখুন মাপ।

আপিস থেকে ফিরে পিণ্টু বোস বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করছেন। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে শিথিল করে দিয়েছেন। বিকালের কঠোর পরিশ্রমর প্রস্তুতির অঙ্গ এগুলো। রেডিওর গানের আওয়াজ খুব আস্তে করে দেওয়া হয়েছে, যাতে স্নায়ুগুলো সুরের মৃদু মধুর সুড়সুড়ি খেয়ে ঝিমিয়ে পড়তে পারে কিছুক্ষণের জন্য। অথচ ঘুমিয়ে পড়তে চান না তিনি। কারণ ঘুমের পর খোলা রোদ্রের তীব্র আলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চোখের অনেক সময় লাগে। নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করবার কি আর জো আছে! খোকা ঘ্যান ঘ্যান করছে তখন থেকে।

'ওগো, খোকার পেট কামড়াচ্ছে না তো? একটু টিপেটুপে দেখ তো পেটটা!'

'না পেট তো স্বাভাবিক।'

'খিদে পায়নি তো?'

'খাওয়ার সময় তো এখনও হয়নি। কি রে খোকা বিস্কুট খাবি? হ্যাঁ - বিস্টু। বিস্কুট কখনো বলবে না ছেলেটা।'

'মালবিকা, কটা বাজল?'

'একটা বাজতে তিন মিনিট।'

'এইবার তোড়জোড় আরম্ভ করতে হয়।'

'হ্যাঁ।'

'নইলে আবার শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করতে হবে। তোমার সাজগোজ আরম্ভ করে নাও এইবার।'

'আজ সাজগোজ তোমার।'

'আমার তয়ের হয়ে নিতে দেরি হবে না। দেরি হয় তোমাদেরই।'

'না, না, মোটেই দেরি হবে না।'

'র‍্যাকেটের গাটের তেলটা মুছে দাও।'

'সে আমি আগেই মুছে রেখেছি।'

'ওটা আবার কান্না জুড়ল কেন? বিস্কুট শেষ হয়ে গেল বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে একটু ঘষে মুছে নাও জামা ইজের পরবার আগে। আর তুমিও সেরে নাও চট করে।'

'হ্যাঁ যাই।'

এইবার উঠলেন পিণ্টু বোস ইজিচেয়ার থেকে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখছেন। ক্যাম্বিসের জুতোয় খড়ি দিয়ে রাখা হয়েছে। তোয়ালে, রুমাল, মোজা, গেঞ্জি, জামা, হাফপ্যাণ্ট, দুখানা র‍্যাকেট, একটি অ্যাটাচিকেসে অতিরিক্ত কিছু জিনিস এক জায়গায় গুছিয়ে রেখে দিয়েছে মালবিকা।

'Chewing gumটা কোথায়?'

ওঘর থেকে মালবিকা বলল—'ওই অ্যাটাচিকেসের মধ্যে। ভাজামশলাও আছে কৌটোতে।' তার কোনো কাজে ত্রুটি নেই।

খোকার পোশাক বদলানো হল। সে আবার কান্না জুড়েছে।

'ওর আজ হল কী? এই রকম কাঁদুনে ছেলে নিয়ে কি অত লোকজনের মধ্যে যাওয়া উচিত? তুমি বাড়িতে থেকে গেলেই পারতে মালবিকা।'

'আমি যাবই। টুর্ণামেণ্টে তোমার সেমিফাইন্যাল খেলা; আর আমি দেখব না? সেখানে কাঁদে তো ও গাড়ির মধ্যে বসে থাকবে রামটহলের কাছে। খোকা! ছি, কাঁদে না! খোকা গাড়িতে চড়ে বেড়ু করতে যাবে আমাদের সঙ্গে? হ্যাঁ, ভোঁ ভোঁ। ওরে রামটহল, খোকাকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বস তো।'

ঘড়ি দেখলেন পিণ্টু বোস! হ্যাঁ, এইবার সময় হল। সব ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করছে মালবিকা। দেয়ালের মা কালীর ছবিখানিকে প্রণাম করে, পিণ্টু বোস এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। রামটহল গাড়ির সম্মুখের সিট্ থেকে খোকাকে তুলতে যাবে অমনি ওয়াক করে একঝলক বমি করে ফেলল খোকা সিটের উপর। হাঁ হাঁ করে উঠলেন পিণ্টু বোস। ছুটে এল মালবিকা। জল আনতে ছুটল রামটহল।

'জানি। ঠিক এই যাওয়ার সময়! তোমার আর গিয়ে কাজ নেই মালবিকা। তুমি খোকাকে নিয়ে বাড়িতে থাক!'

গাড়ির সিট্ পরিষ্কার করা হল। খোকাকে ধোয়ানো-পোঁছানো হল। ততক্ষণে পিণ্টু বোসের মেজাজ আবার একটু নরম হয়ে এসেছে। ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে বললেন—'উঠে পড় গাড়িতে। আর দেরি করো না।'

দুর্গা! দুর্গা! গাড়ি চলতে আরম্ভ করবার পর মালবিকা বলল—'এই জন্যই খোকাটা তখন থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছিল।'

অর্থাৎ, ছেলেমানুষে দুধ তুলেছে; ওতে কোনো দোষ হয় না! ওটাকে যাত্রার পথের বিঘ্ন বলে ভাববার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

দুর্গা দুর্গা। চোখ বুজে হাত জোড় করে প্রণাম করল মালবিকা 'তুমিও নোমো কর খোকা। হ্যাঁ, এমনি করে।' খোকার হাত জোড় করিয়ে কপালে ঠেকিয়ে দিল সে।

ঘন করতালির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন খেলতে নামলেন। দুই জনেরই মুখে জোর করে আনা হাসি। যুগোস্লাভিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড় কুলোভিক। ডেভিস কাপে খেলেছেন। গত বৎসর উইম্‌বল্‌ডন্ প্রতিযোগিতায় উনি শেষ ষোল জনের মধ্যে উঠেছিলেন। এখানকার ফাইন্যালে উনিই জিতবেন একথা সকলের জানা। তাই টেনিসকোর্টে নামবার সময় পিণ্টু বোসের দেহভঙ্গি আড়ষ্ট; পা যেন জড়িয়ে আসছে। এ জিনিস শ্যেনদৃষ্টি দর্শকদের নজর এড়ায় না। সকলের সহানুভূতি তার দিকে।...তোমার কপাল! 'টাই'-এর অন্য লাইনে পড়লে তোমার ফাইন্যালে যাওয়া আটকায় কে? এর আর কী করবে বলো!...

দর্শকদের চাউনির এই নীরব ভাষা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন বলেই পিণ্টু বোস কিছুতেই সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছেন না!

আরম্ভ হয়েছে খেলা। কুলোভিকের বুলেটের মতো সার্ভিস একটাও তুলতে পারছেন না। যত সাবধান হয়ে খেলতে চাচ্ছেন, তত খেলা খারাপ হচ্ছে। এত খারাপ যে পিণ্টু বোস খেলবে সে কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। প্রথম সেট্ কুলোভিক জিতল ছয়-এক গেমে।

হাওয়া বদলাল দ্বিতীয় সেট্ থেকে। মরিয়া হয়ে মেরে খেলা আরম্ভ করেছে পিণ্টু বোস। হারতেই যখন হবে, তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারার চেয়ে পিটিয়ে খেলে হারাই ভাল—এই হচ্ছে তার মনোভাব। কুলোভিকের সার্ভিস বুলেটের চেয়েও জোরে রিটার্ন করছে। প্রতিটি বল এই রকম জোরে জোরে মারছে।

আশ্চর্য! একটা বল কোর্টের বাইরে গিয়ে পড়ছে না, একটা বল নেটে গিয়ে লাগছে না! ঠিক কোর্টের যে দিকটা খালি সেই দিকটায় বল গিয়ে পড়ছে! ভলি, হাফ্ ভলি, ফোর্ হ্যাণ্ড্, ব্যাক্‌হ্যাণ্ড সব মার তার আয়ত্তে। ঘোড়ার মতো ছুটতে হচ্ছে কুলোভিক্‌কে। যেদিকে ইচ্ছা, যেমনভাবে ইচ্ছা তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পিণ্টু বোস। মনে হচ্ছে যেন বাইরের কোনো শক্তির সঞ্চার হয়েছে তার মধ্যে। দর্শকরা অবিরাম করতালি দিচ্ছে তার মণিবন্ধের ভেল্কি দেখে। সব চেয়ে বেশি অবাক হয়েছে কুলোভিক্। এমন মারাত্মক নিপুণতার সঙ্গে তাল রাখবার সামর্থ্য তাঁর নেই।

পাঁচ সেট্ খেলবার দরকার হল না! তুমুল হর্ষধ্বনি আর করতালির মধ্যে খেলা শেষ হল। তিন-এক-এ জিতেছে পিণ্টু বোস।

সাংবাদিকরা ফটো তুলে নিল—পরাজিত কুলোভিক্ নেটের ওপার থেকে করমর্দন করছে বিজেতা পিণ্টু বোসের সঙ্গে।

দর্শক, সাংবাদিক, অটোগ্রাফ-শিকারী পরিচিত অপরিচিতের ভিড় ঠেলে পিণ্টু বোস এগিয়ে গেলেন মালবিকা আর খোকার দিকে। বড়সাহেব হেসে দূর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বহু লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার একটু কাছে আসতে চায়, কিন্তু এখন তার সময় নেই। ম্যাসাজ (Message) সে করবে না; স্নান এখন করবে না এখানে; কাপড় জামা বদলাবে বাড়ি গিয়ে; আবার দেখা হবে পরে। এস মালবিকা। গাড়ি নিরাপদে বার করতে পারলে হয় এখন এই ভিড়ের মধ্যে। হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি; আবার দেখা হবে।

'খোকা! খোকা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?'

'গাড়ির দোলানিতে ঢুলুনি আসছে।'

'ও কি খুব জ্বালাতন করেছিল তোমাকে?'

'না, কান্নাকাটি মোটেই করেনি। প্রথমে লোকজন দেখে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। তারপর আলাপ জমিয়ে নিল পাশের সিটের লোকদের সঙ্গে। কে যেন বলে দিল, ও তোমার ছেলে। তারপর থেকে কি খাতির ওর আর আমার। টফি চকোলেটের ছড়াছড়ি। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সকালে ব্যায়াম কর কিনা। তুমি সকালে ভিজে ছোলা খাও সে কথাও আমি বলে দিয়েছি। তোমার বড়সাহেবের স্ত্রীও একবার এসে খোকাকে আদর করে গেলেন। কাল রাত্রিতে তাঁদের বাড়ির পার্টিতে আমাকে বার বার যেতে বলে গেলেন তোমার সঙ্গে। আমি বলি, ছেলে সামলাবার লোক নেই আমার বাড়িতে। কিছুতেই শুনবেন না সে কথা। বললেন ছেলেকে নিয়ে আসতে—কোনো সংকোচের কারণ নেই—তাঁর বাড়িতেও ছোট ছেলেমেয়ে আছে—ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করবার লোক থাকবে—কোনো চিন্তার কারণ নেই—প্রেসিডেণ্টের পার্টি—তাতে ফাইন্যালিস্টের স্ত্রী আসবেন না তাও কি হয়—ফাইন্যালিস্ট বলা বোধ হয় ভুল হল, বিজেতা বলা উচিত—কালকে মিস্টার বোসের জয়লাভ সুনিশ্চিত—আপনার কোনো আপত্তি শোনা হবে না—আসতেই হবে।...'

আরও কত কথা বলে চলেছে মালবিকা। তার মধ্যে কতক কতক কানে যাচ্ছে পিণ্টু বোসের। রামধনুর সেতু বেয়ে, হাওয়ায় উড়ে চলেছে বিজয়ী বীর, স্বর্গের সিংহদ্বারে হানা দিতে।

ভোরবেলাতেই বড়সাহেবের ফোন।

অভিনন্দন ! রাত আটটায় পার্টি—মনে আছে তো ? মিসিজ বোসকে নিয়ে আসবেন। কোনো ওজর শোনা হবে না। কুলোভিক্ ও ফুজিকাওয়াও আসবেন পার্টিতে। বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়রা সকলেই থাকবেন। যে কুলোভিক্‌কে হারিয়েছে, সে যে অনায়াসে ফুজিকাওয়াকে পরাজিত করতে পারবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আচ্ছা গুড্ লাক্।

মালবিকা তিনখানা কাগজ নিয়েছে আজ। তিনখানাতেই পিন্টু বোস আর কুলোভিকের ছবি। খেলার পাতার হেডলাইনগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন পিন্টু বোস। প্রথমখানায় আছে—'দৈত্য-হন্তারক পিন্টু বোস।'

দ্বিতীয় কাগজখানায়—'সম্পূর্ণ একতরফা খেলা। টেনিসে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।' তৃতীয়খানায় আছে—'সাবাস পিন্টু বোস! কুলোভিক্ হেরেছেন তাঁর চেয়ে ভাল খেলোয়াড়ের কাছে।'

কাগজ পড়বেন কি ; ফোন আর দর্শনপ্রার্থীদের কল্যাণে স্নানাহার বন্ধ হবার যোগাড়। পাড়ার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আজ দলে দলে আসছে পিন্টু বোসের অটোগ্রাফ নেবার জন্য ; এতদিন মনে পড়েনি। কয়েকজন সাংবাদিক দেখা করে গেলেন। একজন খেলার সাজ-সরঞ্জামের দোকানদার এসে অনুমতি নিয়ে গেলেন, তাঁদের প্রস্তুত একটা নূতন র‍্যাকেটের নাম তাঁরা পিন্টু বোস রাখতে চান। কাল সেমিফাইনালের দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিরিবিলিতে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে নিতে পেরেছিলেন ; আজ ফাইনালের দিন সে উপায় আর নেই।

দুটো থেকে খেলা আরম্ভ। তার আধঘণ্টা আগে সেখানে পৌঁছে যাওয়াই ভাল। ভয় ভয় করে, যদি কালকের মতো অত ভাল আজ না খেলতে পারেন ! এত শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও প্রশংসার পর আজ যদি তাঁর খেলা খারাপ হয় ! আজকের কাগজে রাশিফল দেখবার প্রচণ্ড ইচ্ছা অতি কষ্টে দমন করেন। যদি খারাপ লেখা থাকে—দরকার কি ওসব বিপদ ডেকে আনবার, সামান্য কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য !

'খোকা ! খোকা কোথায় ?'

'ওই যে খেলা করছে বারান্দায়। আজ একেবারে লক্ষ্মী ছেলে।'

'সব ঠিক করে রেখেছ তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব আর বলতে হবে না।'

'রাত্রিতে পার্টিতে যাবার কাপড়চোপড় ?'

'হ্যাঁ। আমার, তোমার, খোকনের সব আলাদা আলাদা করে রাখা আছে।'

'এইবার তৈয়ের হয়ে নাও। সময় হয়ে এল। রামটহলকে ডাক তো ; খোকাকে কালকের মতো নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসাক।'

বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পক্ষে এই সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

মালবিকা খোকাকে নিয়ে গিয়ে গাড়ির সম্মুখের সিটে বসাল।

'ভোঁ ভঁক্-ভঁক্। খোকা এই দেখ কেমন বাজছে—ভঁক্ ভঁক্। রামটহল খোকার পাশে এসে বস তো ! মধ্যে মধ্যে হর্ন বাজাস, তাহলেই চুপ করে থাকবে।'

একটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

পিন্টু বোস বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে খোকাকে আদর করা আরম্ভ করলেন।

তাকে তুলে উপরে ছ'নুড়ে দেন, আর নিচে পড়বার সময় আবার লুফে নেন। খোকন হেসে কুটি কুটি। বারকয়েক এইরকম করার পর, খোকনকে আবার গাড়ির সিটে বসিয়ে তিনি বাড়ির ভিতর ঢুকলেন।

'মালবিকা, আর সময় নেই। তুমি একবার দেখ তো খোকাকে।'

মালবিকা এসে খোকাকে বারকয়েক লোফালুফি করবার পর, আবার মোটর গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে গেল।

পিণ্টু বোস প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

স্ত্রী ঘাড় নেড়ে জানালেন—'না।'

'একটু দুধ দাও খোকাকে।'

দুধ খাইয়ে আবার খোকাকে এনে বসানো হল মোটর গাড়ির সিটে।

'ভোঁ ভ'ক্ ভ'ক্ ভ'ক্ ভ'ক্।' খোকার খুব ফূর্তি।

ভাগ্য আজ বোধ হয় বিরূপ, কিন্তু পিণ্টু বোস উদ্যোগী পুরুষ ; হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। বাড়ি থেকে রওনা হবার সময় হয়ে গিয়েছে। খোকাকে নামিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করলেন।

'খোকা, আনি-মানি-জানি না করতে পার ? এই এমনি করে—এমনি করে। আনি-মানি জানি না ; পরের ছেলে মানি না। আনি-মানি জানি না ; পরের ছেলে মানি না।'

বারকয়েক খোকনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ঘুরপাক খেতে হল পিণ্টু বোসকে।

খোকার এ খেলা পছন্দ নয়। মালবিকাও চায় না যে এতবড় ম্যাচ খেলার আগে তার স্বামী এমন ভাবে ঘুরপাক খান। খেলবার সময় যদি মাথা ঘোরে বা গা বমিবমি করে ওঠে ! ভাবতেও ভয় হয়।

'তুমি ছাড়, আমি দেখছি। দৌড়তে পার খোকা ? দেখি খোকা কেমন দৌড়তে পার আমার সঙ্গে।'

হাতের আঙুল ধরে মালবিকা খোকাকে কিছুক্ষণ দৌড় করাবার চেষ্টা করল। এতক্ষণকার ধস্তাধস্তিতে খোকা ক্লান্ত হয়েছে ; কিছুতেই দৌড়তে রাজী নয়। দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে স্বামী-স্ত্রীর মুখেচোখে।

'একটা তেইশ। রামটহল খোকাকে নিয়ে একটু ব'স তো গাড়িতে। ভোঁ ভ'ক্ ভ'ক্ খোকন !'

'একটু জল খাইয়ে দেখলে হয়।'

শেষ চেষ্টা। গাড়ির সিটে উপবিষ্ট খোকাকে একটু জল খাইয়ে দিতে গেল মালবিকা। খোকা কিছুতেই খাবে না। ধস্তাধস্তি বেধে গেল। ঠাস করে খোকার গালে এক চড় লাগাল মালবিকা।

'বদ ছেলে কোথাকার ! দিন দিন বদ হচ্ছেন !'

খোকা কান্না জুড়েছে। এই ছেলেটার জন্য সব মাটি হল বুঝি আজ। এতক্ষণকার এত চেষ্টা সব বিফল হল। খোকাকে কিছুতেই কালকের মতো গাড়ির সম্মুখের সিটে বমি করানো গেল না। কপাল !

দেড়টা বেজে গিয়েছে। মা কালীর ছবিতে প্রণাম করে, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্বামী-স্ত্রী উঠে গাড়িতে বসলেন। গাড়ি স্টার্ট দিল।

দুর্গা ! দুর্গা !

ফাইনাল খেলা। সমারোহ কালকের চেয়ে অনেক বেশি।

পিণ্টু বোস প্রথম থেকে পিটিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন। ফুজিকাওয়া সাবধানী খেলোয়াড়। তার প্রতিটি বল ওজন করে মারা। ঠাণ্ডা মেজাজ; মুখ দেখে মনের ভাব বোঝবার উপায় নাই। চোখ-ধাঁধানো খেলার পক্ষপাতী সে নয়; কোনো রকমে পয়েণ্ট জেতাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু আজ পিণ্টু বোসের হল কী? যা মারে তাই ভুল হয়। নেটে লাগে, না হয় বাইরে চলে যায়। র‍্যাকেটের সেই যাদু-পরশ গেল কোথায়! নিক্তিতে-মাপা কালকের সেইসব মার কি একেবারে ভুলে গেল? এত নার্ভাস কেন?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারছে পিণ্টু বোস। পড়তা খারাপ তার আজ।

দর্শকদের সহানুভূতি ক্রমেই হারাচ্ছে।

'কব্জিতে ব্যথা নাকি বাবা!' 'কাল আন্দাজে ভাল খেলেছিলে।' দুম দাম্ করে এলোপাতাড়ি মারলেই কি তাকে টেনিস খেলা বলে! নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলো!' 'এখানে মুগুর ভাঁজতে আসনি পিণ্টু বোস!' 'হোপ্‌লেস্।' 'কপাল যেদিন খারাপ হয়, সেদিন এমনি হয়!'

একটা সেট্‌ও নিতে পারেনি পিণ্টু বোস। পর পর তিন সেট্ হারায়, খেলা শেষ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

সাংবাদিক ক্যামেরাম্যান, অটোগ্রাফ-শিকারী, সব আছে, কালকের মতন; কিংবা হয়তো তার চেয়েও বেশি। নেটের দু'দিকে দাঁড়িয়ে বিজেতা ও বিজিতের করমর্দনও আছে। নেই শুধু কালকের সেই পিণ্টু বোস। রানার্স-আপ্ কাপটা নেবার সময় সে জোর করেও মুখে হাসি আনতে পারল না।

তার আর এখন এখানে অপেক্ষা করবার সময় নেই। স্ত্রী আর খোকাকে নিয়ে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। রাত আটটায় প্রেসিডেণ্টের দেওয়া ডিনার পার্টি। স্নান করে পোশাক বদলে যেতে হবে।

'এ আমি আগেই বুঝেছিলাম।'—এই হল স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম কথা গাড়িতে।

মালবিকারও মতদ্বৈধ নেই এ বিষয়ে। তাই সে চুপ করে রয়েছে।

খোকা কী যেন বলতে চায়। গাড়ির হর্ন সংক্রান্ত কী যেন একটা জরুরি কথা তার মনে পড়েছে। প্রথমে মাকে ডাকল। তারপর বাবাকে ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। দুইজনই অন্য দিকে তাকিয়ে।

ডিনারে যাওয়ার ইচ্ছে নেই; তবু যেতে হবে। না গেলে খারাপ দেখায়। বড়সাহেব কী ভাববেন। বিদেশী খেলোয়াড়রা ভাববে যে পিণ্টু বোস এল না হেরে গিয়েছে বলে। মালবিকাকেও যেতে হবে ছেলে নিয়ে বড়সাহেবের স্ত্রীর অনুরোধ। অনুরোধ না, হুকুম।

না না, খেলোয়াড়দের মন হবে উদার। হারজিতে কী আসে যায়। যুদ্ধ তো আর নয়, এ হচ্ছে খেলা। সাড়ে সাতটার সময় গেলে, ঠিক আটটার সময় বড়-সাহেবের ওখানে পেঁাছানো যাবে।

মালবিকা বলল—'হ্যাঁ, আগে পেঁাছে কোনো লাভ নেই!'

রওনা হবার আগে মালবিকা গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে বলে গেল, 'বাড়ি ছেড়ে আবার পাড়ায় টহল মারতে বেরোস না যেন রামটহল!'

অত বড় পার্টি! প্রথমে গিয়েই কী দেখবে, কী বলবে, কী করবে সেই সব

কথা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে মনে মনে। নিরিবিলিতে ভাববারও কি জো আছে। খোকন খ্যান খ্যান করছে। পার্টি আরম্ভ হবার পর কান্না জুড়লে কেলেঙ্কারি ; রামটহলকেও সঙ্গে নিয়ে আসা হয়নি। প্রায় এসে গেল বড়সাহেবের বাড়ি।

'কী হয়েছে খোকন ? ওখানে গিয়ে খোকা কত বিস্কুট খাবে, টফি খাবে, চকোলেট খাবে। না খোকা ?'

একটা বিদিকিচ্ছিরি আওয়াজ বার হল খোকার গলা থেকে।

অ্যাঁ ! কী হল ?

খোকা বমি করে ফেলেছে—নিজের জামা ইজেরে, মালবিকার কাপড়ে-চোপড়ে। গাড়ির সিটেও। ঘ্যাঁচ করে একটা হেঁচকা টান পড়ে গাড়ি থামল।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট দেরি। এই নোংরা কাপড় পরে পার্টিতে যাওয়া অসম্ভব। বাড়ি ফেরা ছাড়া আর উপায় নেই। যে যা ভাবে ভাবুক।

ঠাস্ করে খোকার গালে এক চড় মারল মালবিকা।

—ঃ শেষ ঃ—